

মাঘ ১৩৮৬

৮২তম বর্ষ

১ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা:—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

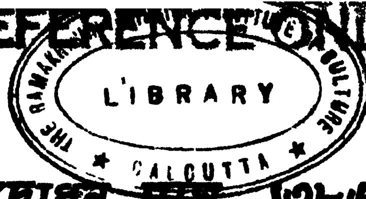
বিশেষ দ্রষ্টব্য:—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৮৬

সূচীপত্র

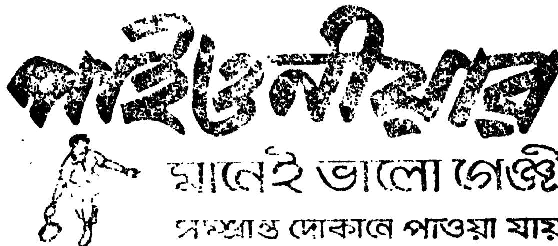
প্রকাশিত হয়েছে

শ্রীশ্রীসারদা দেবী : আত্মকথা	দাম— ৭·০০ টাকা
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ :	দাম—৩৫·০০ „
ছোটদের সারদাদেবী :	দাম— ৪·০০ „
তব কথামৃত ১ম ও ৩য় ভাগ	দাম— ১·৫০ „
তব কথামৃত ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ভাগ	দাম— ১·৭৫ „

রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতা—৭০০০২৯

—: প্রাপ্তিস্থান :—

উদ্বোধন, নাথ ব্রাদার্স, দেবী পুস্তকালয়, মাতৃমন্দির (জয়রামবাটী) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র



পাইওনীয়ার
মানেই ভালো গেঞ্জী
সমস্ত প্রসিদ্ধ দোকানে পাওয়া যায়



৮২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৮৬

দিব্য বাণী

আমাদিগকে 'সংসার' ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসার ত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি?—ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য কি? তাৎপর্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমাকে ঈশ্বর দর্শন করিতে হইবে। সন্তান-সন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি?—সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন কর। এইরূপ সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত বলে: তুমি জগৎ সম্বন্ধে যেরূপ অনুমান করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর; কারণ তোমার অনুমান আংশিক অনুভূতির উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে-জগতে আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র; উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই উহার সেরূপ অস্তিত্ব ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতে-ছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান। তিনিই সন্তান-সন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে, তিনিই পাপে ও পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে, এবং মরণেও তিনিই রহিয়াছেন।

- স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় সং ২।১৬৯]

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষ

শ্রীভগবানের কৃপায় 'উদ্বোধন' এই মাসে ৮২তম বর্ষে পদার্পণ করিল। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা 'উদ্বোধনে'র লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। সর্বার্তিহারিণী, সর্বশুভদায়িনী জগজ্জননী সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধান করুন—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

বিগত বৎসরটি নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। ছাপাখানায় ধর্মঘট ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের ফলে পত্রিকাটি বৎসরের প্রথম সাত মাস যথানির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। পত্রিকা ডাকখানায় দিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা ও লেখক-লেখিকা তাহা পান না—এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন সুরাহা করিতে পারা যায় নাই, যদিও আমাদের তরফ হইতে সর্ববিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতারও কোনও প্রতিবিধান করা সম্ভব হয় নাই।

বর্ষারম্ভে আমরা কি আশা করিতে পারি যে, বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে, কাগজ সস্তা ও সহজলভ্য হইবে এবং ডাকে-দেওয়া প্রত্যেকটি পত্রিকাই প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছিবে? যদিও আমরা আশাবাদী, তথাপি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এতটা আশা করা যায় না বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে সেবাব্রতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে আমরা দৃঢ়সংকল্প। একাশি বৎসর পূর্বে এই 'উদ্বোধন'-পত্রিকারই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন: 'কার্যে আমাদের অধিকার, ফল প্রভুর হস্তে; আমরা কেবল বলি—'হে ওজঃস্বরূপ! আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্যস্বরূপ! আমাদিগকে বীর্যবান কর; হে বলস্বরূপ! আমাদিগকে বলবান কর।'

গীতা ও বেদ-ভিত্তিক স্বামীজীর এই মহাবাণী বিগত একাশি বৎসর ধরিয়া আমাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছে, নববর্ষের প্রারম্ভেও করিতেছে এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও করিবে।

'মায়ার ছাল'

১৮৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন জাহাজে বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধনে'র প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লিখিতেছেন: 'মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন গপ ক'রে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বলো।'[1] কিন্তু নিসর্গসৌন্দর্যবোধ যে স্বামীজীর প্রচুর পরিমাণেই ছিল, তাহার পরিচয় আমরা পাই ঐ লেখাতেই একটু পরে। স্বামীজী লিখিতেছেন: 'আমাদের গঙ্গার কিনার—বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে গঙ্গায় না প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৬।৬০

নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো—ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল—পাতাই পাতা—গাছ ডাল পালা আর দেখা যাচ্চে না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে—যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরাণী তুর্কীস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও—সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক ক'রে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল।'[২]

দার্শনিকদের কাছে যতই সরস হউক, যে নীরস বিষয়ের আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তাহার ভূমিকা হিসাবে সর্বজনবোধ্য কিছু সরস কথার অবতারণা করিলাম। এখন আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করিতেছি।

স্বামীজী লিখিয়াছেন, 'মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে...।' ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি ব্রহ্মফলটি খাইবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন—খান নাই। ব্রহ্মফলটি তিনি খাইয়াছিলেন ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বেই—১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে, কাশীপুরে যখন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় তিনি নির্বিকল্পসমাধিলাভ করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে—'মায়ার ছালটি' কী? সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'রাহোঃ শিরঃ'—রাহুর শির। 'রাহুর শির' বলিতে রাহুকেই বোঝায়, কারণ শির ছাড়া রাহুর আর কিছুই নাই। এক্ষেত্রেও তাহাই। 'মায়ার ছালটি' বলিতে 'মায়াই', অধিকন্তু 'ছাল' শব্দটির প্রয়োগহেতু মায়া যে পরিত্যাজ্য, তাহাই সূচিত। এই মায়া কী? সরস্বতীরহস্যোপনিষদ্ বলিতেছেন (২৩-২৪):

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপ নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥

অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক বস্তুতে অস্তি (সৎ), ভাতি (প্রকাশস্বরূপ চিৎ), প্রিয় (আনন্দ), রূপ এবং নাম—এই পাঁচটি অংশ আছে; ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি (সৎ, চিৎ ও আনন্দ) ব্রহ্মের স্বরূপ এবং পরবর্তী দুইটি (নাম ও রূপ) জগতের স্বরূপ। 'জগতের স্বরূপ' আর 'মায়ার স্বরূপ' একই কথা। কারণ মায়াই জগতের উপাদান।[৩] এই নাম ও রূপ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' (১।১।৫) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শংকর লিখিয়াছেন: 'তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্[৪] অনির্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে' অর্থাৎ 'অব্যাকৃত' যাহার অপর অভিধা, সেই নাম ও রূপকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না—উহারা অনির্বচনীয়।[৫] নাম ও রূপই যে মায়া, ইহা 'তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ' (২।১।১৪)

২ ঐ, ৬।৬৩-৬৪

৩ 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি' (শ্বেতাশ্বতর উপ. ৪।১০)—মায়াকে প্রকৃতি (জগতের উপাদান) বলিয়া জানিবে। দ্রষ্টব্য সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১।৫।৪।

৪ তত্ত্ব=সত্তা [তৎ=সৎ। তৎ+ত্ব=তত্ত্ব ('তৎ'-এর ভাব)। সৎ+তা=সত্তা ('সৎ'-এর ভাব)। ত্ব=তা (প্রত্যয়)।] অন্যত্ব='তৎ' হইতে ভিন্নত্ব=অসত্তা। নামরূপ সত্তাও নহে, অসত্তাও নহে—অনির্বচনীয়।

৫ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নামরূপাত্মক জগতের মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয়। সুতরাং জগৎকে 'সৎ' বলা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্বে জগতের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাংম্

সূত্রের ভাষ্যে শংকরাচার্য সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন : 'সর্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্বচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চ-বীজভূতে সর্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়া, শক্তিঃ, প্রকৃতি ইতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অভিলপ্যেতে।' অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন নিজস্বরূপভূত, অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ, যাহারা তত্ত্ব ও অন্যত্বের দ্বারা অনির্বচনীয় [উপরে ব্যাখ্যাত] এবং যাহারা সংসারের বীজস্বরূপ, তাহারা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়া, শক্তি ও প্রকৃতি, এইরূপে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, শংকর নাম ও রূপকে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 'আত্মভূতে ইব' (যেন আত্মভূত) বলিয়াছেন। 'যেন' বলিবার কারণ এই যে, নাম ও রূপ যদি ঈশ্বরের আত্মভূত অর্থাৎ নিজস্বরূপভূত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর 'মিথ্যা' হইয়া পড়েন, কারণ নামরূপ 'মিথ্যা'। সেইজন্য ভাষ্যের অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন : "তাভ্যাম্ অন্যঃ সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ 'আকাশঃ বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্বহিতা, তে যদন্তরা তৎ ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য উপ. ৮।১৪।১) ইতি শ্রুতেঃ।" অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর নাম ও রূপ, এই দুইটি হইতে ভিন্ন, যেহেতু উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, আকাশ (ব্রহ্ম) নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্তা, নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রহ্ম।

এই নামরূপই 'মায়ার ছাল', যাহা পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মফল আস্বাদন করা যায় না। জ্ঞানমার্গের সাধনাই হইল প্রত্যেকটি বস্তুর বা ব্যক্তির নাম ও রূপ, এই অংশদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া 'অস্তি', 'ভাতি' ও 'প্রিয়', এই অংশত্রয়কে গ্রহণ করা—নামরূপকে মিথ্যা জানিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। নিঃসন্দেহে ইহা অতীব কঠিন কাজ। স্বামীজী তাঁহার 'ভক্তিযোগে'র 'পরাভক্তি' অংশে ত্যাগই যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম, এই চতুর্বিধ যোগের অপরিহার্য অঙ্গ ইহা প্রথমে বলিয়া পরে লিখিয়াছেন : 'জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাঁহাকে প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে মিথ্যা মায়া বলিয়া জানিতে হয়।…সুতরাং কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে তাঁহাকে একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যায় তাঁহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ করিতে চেষ্টা করেন।'[৬]

যাঁহারা তীব্র বৈরাগ্যবান উত্তম অধিকারী, তাঁহারা অনায়াসেই মিথ্যা নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দবস্তুকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। মধ্যম ও অধম অধিকারীকে অনাদি কাল হইতে নামরূপের প্রতি যে আকর্ষণ তাঁহাদের মনে সংস্কাররূপে বর্তমান, তাহার সহিত প্রতিপদে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। তথাপি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকিলে কালে তাঁহাদেরও সিদ্ধি অবধারিত। বিদ্যারণ্য-মুনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন :

বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সাদরঞ্চাভ্যস্যমানে সর্বথৈব নিবর্ততে ॥ (৮২)

জগৎকে 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন) বলা যায় না। যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, তাহাকেই 'অনির্বচনীয়' বলা হয়। 'অনির্বচনীয়', এই পারিভাষিক শব্দটির দ্বারা মনুষ্যবুদ্ধির অসামর্থ্য সূচিত হয় না, প্রাচুর্যই সূচিত হয়।

৬ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৪।৫৩-৫৪

—[নামরূপ উপেক্ষা করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি] দীর্ঘকাল নিরন্তর সাদরে অভ্যাস করিলে অনেক কালের (জন্মজন্মান্তরের) বাসনা (নামরূপের সংস্কার) সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

ব্রহ্মাভ্যাস কী, তাহাই বলিতেছেন :

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ (৮১)

—সেই (ব্রহ্ম) বিষয়ে চিন্তা, সেই বিষয়েরই কথা, পরস্পর বিচার করিয়া পরস্পরকে প্রবোধিত করা, এই একপরতাকে—এক-ব্রহ্ম-বিষয়িণী নিষ্ঠাকে—পণ্ডিতগণ ব্রহ্মাভ্যাস বলিয়া জানেন।

এই ব্রহ্মাভ্যাসের ফল কী, তাহাই বলিতেছেন :

তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং সুস্থিতায়াময়ং পুমান্।
জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা ॥ (৮০)

—[মিথ্যা নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া] ব্রহ্মাভ্যাসের দ্বারা বিদ্যা সুস্থিতা হইলে—জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠ হইলে—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়, তাঁহার শরীর যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন।

'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ'—ত্যাগের দ্বারাই বিরল কোন কোন ব্যক্তি অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন। কৈবল্যোপনিষদের এই উক্তিটি স্বামীজীর অতি প্রিয় ছিল এবং তাঁহার একাধিক বক্তৃতায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ত্যাগ অবশ্য অনেক প্রকারের হয়—দীনদুঃখীদের অর্থাদি দানও ত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করাও ত্যাগ, আবার অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আরাধ্যতম ইষ্টদেবতার নামরূপকে পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়াও ত্যাগ। সুতরাং ত্যাগের ক্ষেত্র বহু-বিস্তৃত। অবশ্য যে কোন ত্যাগই নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ করিয়া নিজের ও অপরের কল্যাণসাধন করিবেন। কিন্তু যিনি অধ্যাত্মপথের পথিক এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি যাঁহার অভীপ্সিত, তাঁহাকে সর্বপ্রকার নামরূপকে বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাই আসল ত্যাগ।

নামরূপের ত্যাগের প্রসঙ্গে কর্মের কথাও বলা প্রয়োজন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন, 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম' (১।৬।১)—নাম, রূপ ও কর্ম, এই তিনই ইহার (ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের) স্বরূপ। এই তিনটি পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। কর্ম আর কিছুই নহে, নাম ও রূপের ব্যাপার মাত্র—ব্রহ্মে কোন কর্ম নাই। ব্রহ্ম নির্ব্যাপার। সুতরাং নাম ও রূপ বলিলেই বস্তুতঃ সবটাই বলা হয়—তথাপি যেহেতু জগতে আমরা ক্রিয়া দেখি, সেইহেতু উপনিষদ্ আরও স্পষ্ট করিয়া কর্মের কথা—নামরূপের ব্যাপারের কথাও বলিয়াছেন। তাই জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক নাম, রূপ ও কর্ম, এই তিনটি যে-সচ্চিদানন্দবস্তুর আশ্রয়ে স্ফুরিত হয়, প্রতি নামে, প্রতি রূপে, প্রতি কর্মে অধিষ্ঠানভূত সেই নিত্য নিষ্ক্রিয় বস্তুতেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে সচেষ্ট। ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধনার ধারা। স্বামীজী বিশ্বাস করিতেন যে, অদ্বৈত-বেদান্তই ভাবিকালের শিক্ষিত মানুষের ধর্ম হইবে।[৭] সুতরাং সকলেরই অদ্বৈততত্ত্ব ও তাহার সাধনার ধারা সম্বন্ধে অন্ততঃ পরোক্ষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭ 'ইহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্মের এবং চিন্তার শেষ কথা; কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম।' (পত্রাবলী ১৩৮৪, পৃঃ ৬৩৪)

অখণ্ডানন্দজীর কথা

স্বামী অন্নদানন্দ

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ ; ২০শে ভাদ্র ১৩৩৬,
বৃহস্পতিবার

সান্ধ্য ভজনের পর বাবাকে প্রণাম করা হইলে একজন কর্মীকে বাতাস করিতে আদেশ করিলেন। বাতাস করিবার সময়ে তাহাকে বলিলেন,—"কাল ভেবেছিলাম, তোমাকে নির্জনে কিছু বলব। দেখ ক্রোধ একেবারে ত্যাগ করে ফেল। মাটির মানুষ হয়ে যাও। ক্রোধকে পায়ে দলে ফেল। তোমরা সাধু হতে এসেছ। এখানে এমন কিছু নেই যাতে তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য হ'তে পারে। একেবারে 'অক্রোধ পরমানন্দ' হয়ে যাও দেখি।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের মধ্যে কেউ কোন দিন রেগেছে বলে আমার মনে হয় না। আগে নিরঞ্জন মহারাজ মাঝে মাঝে রেগে যেতেন বটে, আবার তখুনি জল হয়ে যেতেন। কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, আর সেবা করতেন। তাঁর ভেতর অনন্ত গুণ ছিল। তা না হলে ঠাকুর কি অত ভালবাসতেন।

"মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন,—'তোদের মন না ছটাক ? মন কেমন ভারী গম্ভীর, আর ছটাক —ছট্ ছট্ ছটাক।' স্বামীজী মহাপুরুষের এই কথা শুনে বড়ই আনন্দিত হতেন ; বলতেন, 'দাদা কি সুন্দর বলেছেন।'

"মনটাকে সমুদ্র কি হ্রদের মত করে ফেল। নচিকেতার মন কত বড় ছিল। যমরাজ কত প্রলোভন দেখালেন, কত ভোগ-ঐশ্বর্য,—কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বিচলিত করতে পারলেন না। আত্মজ্ঞান লাভ ছাড়া অন্য কিছুই তিনি প্রার্থনা করলেন না।

"আমাদের মধ্যে স্বামীজীর তুলনা ছিল না। তিনি 'অক্রোধ পরমানন্দ' ছিলেন। রাজপুতানায় গেছি, সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর বলছে,—'মহারাজ আপনাদের স্বামীজীর তুলনা নেই। আমরা মূর্খ, তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় কি বুঝব ? কিন্তু অমন ধৈর্য ও ক্রোধ-সংবরণ করার ক্ষমতা কারও দেখিনি। পণ্ডিতেরা তাঁকে বিচারে পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানসূচক উত্তর দিচ্ছে, আর তিনি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তাঁর নিন্দা করছিল, তারাই তাঁর গোলাম হয়ে গেল।

"উত্তরকাশীতে এক পীড়িত হিন্দুস্থানী সাধুকে পথ থেকে তুলে কাণ্ডীতে করে আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। ধরমশালার সাধুরা আমাকে একজন পাহাড়ী মনে করে গালাগাল করতে থাকে—তাদের অসুবিধা হবে বলে। রুগ্ন সাধুটিকে ধরমশালার এক কোণে শুইয়ে নিজে বেরিয়ে এসে একটা গাছের তলায় ময়লা জায়গায় রাত কাটাই। পরদিন সকালে ঐ সাধুরা আমার কাছে এসে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও বলে, 'মহারাজ কাল আপনাকে আমরা একজন সামান্য পাহাড়ী মনে করে অযথা গালাগাল দিয়েছি, আমরা তার জন্য অনুতপ্ত। আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন, মহারাজ। আপ্ পরমহংস হৈঁ !'

"আমি ছেলেবেলা প্রার্থনা করতাম,—ভগবান

আমার অদৃষ্টে অনন্ত দুঃখ কষ্ট দিন, নিজের দুঃখ কষ্ট ছাড়া অন্যের দুঃখ কষ্টটা নিতে চাইতাম। ১৫।১৬ বছর বয়স থেকে ৫।৬ বছর হিমালয়ে অনেক বিপদের মধ্যে কাটিয়েছি; তিব্বতে আমার প্রতি কি অত্যাচারই হয়েছে! তারপর মহুলায় সেও চরম।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের দিনগুলো কিভাবে যেত তার হুঁশ থাকতো না। ধ্যান হচ্ছে, ভজন হচ্ছে, তারপর স্বামীজী কীর্তন ধরলেন। আর আমাদের মধ্যে নৃত্য, অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হত। রাত্রে শ্মশানে ধ্যান জপ করতে করতে কত রাতই না কেটে গেছে! কোথায় তখন কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অভিমান!

"যখন তোমার কোন কষ্ট হবে, তখন আমাকে জানাবে। কিছু গোপন করতে চেষ্টা করবে না। দোষ ত্রুটিও স্বীকার করবে। এরূপ না করলে স্বামীজী ভীষণ চটে যেতেন।

"যেবার দার্জিলিঙ থেকে প্রথম অনাথ বালকদের আনি, সেবার গাড়ি ছাড়বার সময় দুটি ছেলে উঠে বলে,—'আমরা অনাথ, আপনার সঙ্গে যাবো।' শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে জানতে পারি যে এরা অনাথ নয়। তখনই ফেরত পাঠিয়ে দিই।

"দার্জিলিঙে থাকতে দার্জিলিঙ ও ঘুমের মাঝামাঝি Wilki Hall নামে বাড়িতে Miss Muller-এর কাছে ছিলাম। দার্জিলিঙের Govt. Pleader, M. N. Banerjee কয়েকটি পাহাড়ী ছেলে দেন, অনাথ আশ্রমের জন্য।

"কলকাতায় মায়ের বাড়িতে পৌঁছেই দেখি সামনে স্বামী সদানন্দ (স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য) দাঁড়িয়ে, স্বামীজীর নামে একটি টেলিগ্রাম হাতে, তাতে লেখা ছিল,—'যে ছেলে দুটি গাড়িতে উঠেছিল তাদের পিতামাতা তাদের জন্য Govt. Pleader-এর কাছে কাঁদছে। তোমাদের লোক তাদের নিয়ে গেছে,...ইত্যাদি।' আমি বললাম, তাদের শিলিগুড়ি থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। স্বামীজী এসেই বললেন,—'অনাথ বালকের জন্য লাল গড়িয়ে পড়ছে।'—প্রথমে কিছুই বললাম না, পরে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলাতে তিনি বললেন,—'এত ব্যাপার হয়ে গেছে? এবার যখন কোথাও যাবে, সঙ্গে চিঠিপত্র (credentials) নিয়ে যাবে।'

"আশ্রমে যতীন ব্রহ্মচারী দুধের প্যান পুড়িয়ে ফেলে কি রকম কেঁদেছিল! কোন অপরাধ করলে frankly বলবে, গোপন করার চেষ্টা করবে না। এ রকম boldness, frankness আমি পছন্দ করি।

"এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে ভীষণ রাগ হবার কথা, কিন্তু তবুও রাগবে না। ছোট ছেলেরাও যদি কিছু অন্যায় বলে তবুও রেগ না। তারা দেখবে তুমি মাটির মানুষ।

"গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের কথা পড়েছ। আর ঠাকুর আমাদের কি সুন্দর উপদেশ দিতেন, 'শ, ষ, স' অর্থাৎ সহ্য কর; যত সহ্য করবে, ততই তোমার শক্তি বাড়বে, এমন উপদেশ এ পর্যন্ত কেউই দেন নি। তিনি আরো বলতেন, গীতা মানে কি জানিস? ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী! অর্থাৎ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, ত্যাগ কর।

"আমি কোন কথা বললে সমস্ত মন দিয়ে তা শুনবে, আর consider করবে। জানি জানি ভাল নয়।"

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯; ২১শে ভাদ্র ১৩৩৬।

আজ সন্ধ্যায় কৃষ্ণনগরের Livestock officer শ্রীঅমূল্যবাবু পলাশী হইতে আশ্রমের জনৈক ব্রহ্মচারীর সহিত আসিলেন। বাবা তাঁহার সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমার ধারণা ছিল যে, এরা সেই

নীলকর সাহেবদের মত, কিন্তু তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে জেনেছি, ঐ অপবাদ ওদের সম্বন্ধে খাটে না। ওদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল লোক ছিলেন। কেয়ো (Keogh) সাহেব রোমান ক্যাথলিক হ'য়েও আশ্রমে চাঁদা দিতেন এবং বলতেন,—'স্বামীজী আপনাকে আমি চাঁদা দিই, এটা আমার principle-এর বিরুদ্ধে। কিন্তু কি করি, আপনি লোকের এত উপকার করেন, তাই আপনাকে এড়াতে পারি না।' স্বামীজী এই কথা শুনে বলেন,—'ভাই, তুমি খুব বাহাদুর; Roman Catholic-রা পাদ্রীকেও চাঁদা দেয় না আর তুমি চাঁদা বাগিয়েছ।' "

সাহেবরা মনকরায় (আশ্রমের নিকট একটি স্থান) কিরূপ mock fight (মেকি যুদ্ধ) করিত তাহা বলিয়া বাবা বলিলেন,—"সাহেবরাই ত এ আশ্রমের ভিত্তিস্বরূপ, আমার উপর দিয়ে যখন ভয়ানক ঝড় বইছিল, যখন মহুলার ব্রাহ্মণরা আমাকে উচ্ছেদ করার জন্য কৃতসংকল্প, তখন এই কেয়ো সাহেব বহরমপুর Grant Hall-এ আমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। আমায় বলতেন,—'স্বামীজী তুমি ভাবছ কেন? We are always on your side. Thrash them down. Never yield. (আমরা সর্বদা তোমার পক্ষে। ওদের দাবিয়ে দাও। হার মেন না)।' "

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯; ২২শে ভাদ্র ১৩৩৬, শনিবার

আজ রাত্রে জনৈক ব্রহ্মচারীর ভগবানগোলা যাত্রার কিছু পূর্বে বাবা বলিলেন,—"ভুলো (কুকুর) কি noble দেখ! আজ সারা দিন কিছু খেতে দিইনি, তবুও একটু কেঁউ কেঁউ করছে না, কি সামনে গেলে কামড়াতে আসচে না। আর তোমাদের? এক বেলা খেতে না পেলে খ ভার হয়ে যায়। কুকুরের মত faithful জন্তু আর নেই।

"স্বামীজী শেষটায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে হতাশ হয়ে জীবজন্তু নিয়ে থাকতেন। তাঁর অনেক হাঁস, পায়রা, কুকুর, বেড়াল, মেড়া ইত্যাদি ছিল। দস্তুর মত একটা চিড়িয়াখানা তৈরী করেছিলেন। নিজের সেবার টাকা থেকে তাদের জন্য ১০০ টাকা খরচ করতেন। তাঁর হাঁসের মধ্যে চীনে, বম্বেটে, পাতি হাঁসও ছিল। কুকুরের নাম Mary, Tiger, মেড়ার নাম মটরু, চীনে হাঁসের নাম যশোমতী রেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বামীজীর দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পশু পাখী সব মরে যায়। তিনি যাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, তার একটিও বেশী দিন বাঁচেনি। ভক্তেরা বলেন, 'তারা সব উদ্ধার হয়ে গেল।' "

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯; ১লা আশ্বিন ১৩৩৬।

সকালে চা পানের সময় বাবা জনৈক সেবককে বলিলেন,—"কই, আমাকে আজ বিস্কুট খেতে হবে, কেউ বললে না তো? কাল থেকে উপবাসী। দেখ এটা একটা বেশী কথা নয়, আমি ইচ্ছা করলেই চেয়ে নিতে পারতাম। এ সমস্ত feelings-এর কথা, হৃদয়ের খেলা। আমার কাছে থেকে যদি এ সব না হয় ত কোথাও হবে না। আমার চেয়ে feelings-এর পরিচয় কেউই দিতে পারবে না।

"আমার হৃদয় পাষাণের মত ছিল। তিন বোনের পর আমার জন্ম। কাজেই মা-বাপের কি রকম আদরের ধন ছিলাম—বুঝতেই পারছ। ছেলেবেলায় মা আদর করে সোনার হার পরিয়ে দিয়েছিলেন—আর আমি তা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সাধু হব বলেই জন্মেছি—এ সংস্কার আমার বাল্যকাল থেকেই ছিল। তারপর হিমালয়ে যাই। আমার প্রাণ বড় কঠিন ছিল। তাই মনে হয় হিমালয়

পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তবে আমার হৃদয় ভাঙে। হিমালয়ে না গেলে আমার কঠিন প্রাণ নরম হত না, আর রাজপুতানায় পতিত অন্ত্যজ জাতিদের জন্য কেঁদে উঠত না। সেখান থেকে ত আমিই প্রথম স্বামীজীকে লিখি,—'My nation first, myself second. I for others.'

"তখন (১৮৯৪ সাল) আমার মনের ভাব এই ছিল,—স্বামীজী যদি আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত না করেন, তা হলে এদেশে থাকব না, Central Asia চলে যাব। স্বামীজী আমাকে উৎসাহিত করলেন ও আর সব গুরুভাইদেরও বুঝাতে লাগলেন।

"স্বামীজী সমুদ্র। যখন তিনি আমেরিকায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন,—'ভারত রুটি চায়, ধর্ম চায় না', তখন সেই দেশপ্রেমের ঢেউ আমায় যেভাবে আঘাত করেছিল এমন আর কাউকে করেনি।

"স্বামীজী যদি আমার চিঠির উত্তরে লিখতেন,—'পরের দরদে তোর হিয়ে বিদরিয়ে যায় কেন? তুই তোর আত্মার স্মরণ মনন নিয়ে থাক, ধ্যান জপ কর। তা হলেই তোর হল।' তা হলে আমি জন্মের মত এ দেশ ছেড়ে Central Asia চলে যেতাম। আমার তখন যে রকম tempera-ment, আমি কিছুতেই এ সহ্য করতে পারতাম না দেখ, সমস্ত হৃদয়ের খেলা। 'গহনা কর্মণো গতিঃ'

"চোবেজী হিন্দুস্থানী। প্রথমে পাচক হয়ে আসে, তারপর সাধু হয়ে গেল। সুরেশ্বরানন্দের সঙ্গে প্রথমে বনত না—বলত কায়স্থ সাধুর সকড়ি নেব না। পরে সেই লোক আশ্রমের ছেলেদের মলমূত্র দু হাতে সাফ করেছে। রাস্তা দিয়ে অভুক্ত কেউ গেলে নিজের বাড়া ভাত খাইয়ে নিজে ফেন খেয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে, এমন এক দিন নয়,—আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিত না। বেচারা শেষে যক্ষ্মারোগে মারা গেল। এরূপ আর কে করবে?

"আজকালকার ছেলেদের কাছ থেকে এরূপ আশা করতে পারি না। স্বামীজীকে যখন ওর কথা বলি, তিনি বললেন,—'ধন্য ভাই তোমার চোবেজী! তুমি এমন এক worker তৈরী করেছ যে, নিজের বাড়া ভাত অভুক্তকে দিয়ে অম্লান বদনে ফেন খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে! এ কি কম 'প্রাণের' কথা। ওর মত worker কজন আছে! তোমার কাছে থেকে ও অত বড় হয়ে গেল।'"

বাবা শেষে বলিলেন,—"সাধু হতে এসেছ পারব না বললে চলবে না। তোমাদের হৃদয়ে একটু মাত্র স্পন্দন নেই,—সব callous!"

১৩ই মে ১৯৩০; ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৭,

মঙ্গলবার।

আজ সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর বাবাকে প্রণাম করিলে মণিদা, উদ্ধবদা, মণিচৈতন্য, বিজয়দা প্রভৃতিকে নিকটে বসিতে আজ্ঞা করিলেন ও সাধু পরমহংসদিগের কি লক্ষণ, তাঁহারা কি করেন, এই সব বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল। বাবা বলিলেন,—"ঠাকুরের সঙ্গ ও কৃপালাভ করে কি আমাদের দুটো শিং বা লেজ বেরিয়েছে? তা নয়, এই অনুভূতি হয়েছে যে, আমি একা নই, আমি সবার মধ্যে, একের মধ্যে এক গুণ, দশের মধ্যে আমি দশ গুণ, দশের সুখ দুঃখে আমার সুখ দুঃখ দশ গুণ।

"যদি তোমরা কোন নির্জন স্থানে গিয়ে তাঁর স্মরণ মনন কর, তা হলে এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন নেই। নিজের জপ ধ্যান নিয়ে থাকলেই যথেষ্ট। এই রকম কোন Public Institution-এ থাকলে দেখতে হবে কি করে আমি অন্যকে সুখী করতে পারি।

"একবার আলমবাজার মঠে রয়েছি। সকলেই কৌপীন পরা, ভীষণ গরমে আমার ঘুম হচ্ছে না। এদিকে যে গুরুভাইদের ও অন্যান্য সাধুদের সবে ঘুম ধরেছে, তাদেরও ভাল ঘুম হচ্ছে না। তখন কি আর স্থির থাকতে পারি? আলমবাজার মঠে একখানা বড় পাখা ছিল। তাই দিয়ে সকলকে বাতাস করতে লাগলাম। সাধুরা বেশ ঘুমুতে লাগল। তাতেই আমার শরীর যে কি ঠাণ্ডা ও মন কি তৃপ্ত হয়েছিল তা আর কি বলব! সেদিন আমার অনুভূতি হয়েছিল যে দশের সুখ আমার সুখ।

"এই কেদারমাটিতে শুধু চা খেয়ে উৎসবের জন্য খেটেছি। উৎসবশেষে দরিদ্রনারায়ণসেবার পর প্রসাদী খিচুড়ি দু'এক দানা মুখে দিয়ে আমার পেট ভরে গিছল।"

[ক্রমশঃ]

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি

('সিদ্ধান্তরত্নম্' ২।৭-১২)

ব্রহ্ম বা বিষ্ণুকে চিৎ-স্বরূপ ব'লে গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু তাঁর মধ্যে নিম্নলিখিত আঠারোটি বা অন্ততঃ ষোলোটি 'মহাদোষে'র প্রাবল্য দেখা যায়:

(১) 'মোহ' বা অজ্ঞান।

উদাহরণ—(ক) বৃন্দাবনে নন্দ এবং অন্যান্য গোপগণ যখন ইন্দ্র-যজ্ঞ-সম্পাদনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞের ন্যায় তাঁদের এই যজ্ঞ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

(খ) ব্রহ্মা তাঁর মায়া-শক্তি দ্বারা যখন যমুনাতট থেকে বৎস ও গোপ বা বৎসপালকগণকে হরণ করেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞের ন্যায় তাদের বনে বনে অন্বেষণ ক'রে বেড়াতে লাগলেন।

(২) 'তন্দ্রা' বা নিদ্রা।

উদাহরণ—যুদ্ধক্লান্ত শ্রীকৃষ্ণ তমালতলে গোপগণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন ক'রে নিদ্রা যাচ্ছেন—এরূপ বহুবার দেখা যায়। এ থেকে তিনি যে পার্থিব জীবের ন্যায়ই 'খেদ' বা দুঃখ এবং 'শ্রমে'র অধীন—এ কথা প্রমাণিত হয়। [পরপৃষ্ঠায় (১০) ও (১১) দেখুন]

(৩) 'ভ্রম' বা দোষ-ত্রুটি।

উদাহরণ—বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ যশোদা ও রোহিণীর কাছে যেতেন অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত, নির্বোধের ন্যায়ই—এবং এতেই তাঁর ভ্রম বা দোষ-ত্রুটি প্রমাণিত হয়

(৪) 'রুক্ষরসতা' বা প্রেমসম্বন্ধবিহীন অনুরাগ।*

(৫) 'উল্বণ কাম' বা দুঃখহেতু কামনা।*

(৬) 'লোলতা' বা অস্থিরমতিত্ব বা চঞ্চলতা।

উদাহরণ—বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও বৎসদের বন্ধনরজ্জু খুলে দিতেন এবং গোপীগণ তাতে ক্রুদ্ধ হলে তিনি অস্থিরমতি বা চঞ্চলচিত্ত জনের ন্যায় সানন্দে হাস্য করতেন।

(৭) 'মদ' বা দম্ভ।

* এই দুটি মহাদোষের কোন উদাহরণ দেওয়া নেই মূল গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তরত্নম্'-এ।

উদাহরণ—তিনি গোপগোপীগণের সঙ্গে চক্ষুঘূর্ণন-পূর্বক অত্যন্ত দাম্ভিকের ন্যায় ব্যবহার করতেন।

(৮) 'মাৎসর্য' বা হিংসা।

উদাহরণ—যখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-পর্বত ধারণ করেছিলেন, তখন তিনি ঈর্ষা ও হিংসায় বলেছিলেন যে, তিনি ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করবেন।

(৯) 'হিংসা' বা হিংস্রতা।

উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ নিন্দনীয় হিংস্রতা সহকারে পুতনাকে বধ করেন।

(১০) 'খেদ' বা দুঃখ।

উদাহরণ—(২)-তে দেখুন।

(১১) 'পরিশ্রম'

উদাহরণ—(২)-তে দেখুন।

(১২) 'অসত্য' বা মিথ্যাচরণ।

উদাহরণ—(ক) 'মৃৎভক্ষণ'-লীলায় 'আমি ত মৃত্তিকা খাইনি' ব'লে শ্রীকৃষ্ণ অসত্যভাষণ করেছিলেন।

(খ) জরাসন্ধ-বধাদি-লীলাতেও তিনি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রে অসত্যাচরণ করেছিলেন।

(১৩) 'ক্রোধ'।

উদাহরণ—'মৃৎভক্ষণ'-লীলায় ও 'জরাসন্ধ-বধাদি' লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধও তীব্রভাবে প্রকটিত।

(১৪) 'আকাঙ্ক্ষা' বা লোভ।

উদাহরণ—যখন যশোদা-মাতা দধি-মন্থন করছিলেন, তখন দুগ্ধলোলুপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলপূর্বক নিবারণ করেন।

(১৫) 'আশঙ্কা' বা বিতর্ক বা সন্দেহ।

উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ যখন বৎস ও গোপ বা বৎসপালকগণকে বনে বনে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিলেন [পূর্বপৃষ্ঠায় (১) দেখুন], তখন তিনি বিতর্কপূর্বক এই সন্দেহ করলেন যে, ব্রহ্মাই সেই সব হরণ করেছেন।

(১৬) 'বিশ্ববিভ্রম' বা বিশ্ব-ভ্রম।

উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয় হলেও বহু হতে ইচ্ছা ক'রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশ্বভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।

(১৭) 'বিষমত্ব' বা পক্ষপাতিত্ব।

উদাহরণ—যদিও শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি, কারো প্রতি তাঁর প্রেমও নেই, দ্বেষও নেই, তাহলেও তিনি একই সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে, ভক্তগণই তাঁর বিশেষ প্রিয় এবং যাঁরা তাঁর ভজনা করেন, তাঁদের মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন; তাঁরাও তাঁর মধ্যেই অবস্থান করেন।

(১৮) 'পরাপেক্ষা' বা পরনির্ভরশীলতা।

উদাহরণ—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বারংবার বলেছেন যে, তিনি ভক্তের অধীন ও ভক্তের দাস।

এই আঠারোটি 'মহাদোষে'র মধ্যে, 'রুক্ষরসতা' ও 'উল্বণ কাম' ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর মধ্যে না থাকতেও পারে। কিন্তু অবশিষ্ট ষোলোটি 'মহাদোষ' তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং তাঁকে নির্দোষ বলা যায় না কোনোক্রমেই এবং সেজন্য, তিনি চিৎ-স্বরূপও হতে পারেন না কোনোক্রমেই—যেহেতু জ্ঞান থাকলে দোষ থাকতে পারে না, মল থাকতে পারে না, অশুদ্ধতা থাকতে পারে না—জ্ঞানের স্বরূপই হল নির্মলতা, পবিত্রতা, পাপ-কলঙ্কলেশহীনতা, দোষলেশশূন্যতা প্রভৃতি।

খণ্ডন

এই আপত্তির খণ্ডন ত বৈষ্ণব-বৈদান্তিকদের পক্ষে অতি সহজ—যেহেতু তাঁদের হাতে রয়েছে তাঁদের সেই সুবিখ্যাত 'লীলাবাদ', যা তাঁদের ঈশ্বর-জীবের মধ্যে নিকটতম, ঘনিষ্ঠতম, মধুরতম সম্বন্ধভিত্তিক মতবাদের প্রধান স্তম্ভ। এই 'লীলাবাদ' জগৎ-সত্যতাবাদী বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ ব্যবহার করেছেন তাঁদের 'পরিণামবাদ'মূলক সৃষ্টি-রহস্য সমাধানের জন্য। এই সমস্যা ত একটি

মূলীভূত সমস্যা, যে সম্বন্ধে পূর্বে বহুবারই বলা হয়েছে। এস্থলে প্রশ্ন হল: ব্রহ্ম কেন জীব-জগৎ-সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবেন? আমরা জানি যে, কোনো অভাব মেটাবার জন্যই, কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ করবার জন্যই, কোনো অপূর্ণ কামনা পূর্ণ করবার জন্যই, আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু শ্রীভগবানের ত কোনো অভাব নেই, কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, কোনো অপূর্ণ কামনা নেই। তাহলে তিনি অকারণে সৃষ্টিরূপ কার্যটি করবেন কেন? তার উত্তরে বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ তাঁদের সুবিখ্যাত 'লীলাবাদে'র অবতারণা করেছেন। 'লীলা' বা খেলা এরূপ একটি অপরূপ অনুপম কার্য, যা অভাবপ্রসূত নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত। কোন অভাব না থাকলে, অর্থাৎ, পরিপূর্ণ আনন্দ মনে থাকলে, সেই আনন্দ স্বভাবতঃই বাইরের কার্যকলাপে অভিব্যক্ত হয়—যেমন লীলা বা খেলাতে। পুনরায়, লীলা বা খেলার জন্য প্রয়োজন লীলাসঙ্গীর, প্রয়োজন লীলাক্ষেত্রের। যেজন্য পরমানন্দরসঘন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম জীবগণকে সৃষ্টি করছেন তাঁর দিব্যানন্দের বহিঃপ্রকাশ দিব্যলীলার পরমাদরের সঙ্গীরূপে; জগৎকে সৃষ্টি করছেন সেই অপূর্ব দিব্যলীলার ক্ষেত্র রূপে।

অতএব পূর্বোক্ত তথাকথিত 'মহাদোষ'গুলি সবই শ্রীভগবানের এরূপ দিব্যলীলারই অংশীভূত; এবং সেজন্য কোনোক্রমেই প্রকৃত 'দোষ' নয়। ভক্তবৎসল ভক্তদাস ভক্তাধীন পরমেশ্বর ভক্তদের তৃপ্তির জন্য, সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের ইচ্ছানুসারে নানাভাবে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করেন—পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রভুরূপে, প্রিয়রূপে; এবং সেজন্য শ্রীভগবানের এরূপ বিবিধ-বিচিত্র, আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যোচিত কার্যকলাপ, আচারব্যবহার তাঁর ক্ষেত্রে 'মহাদোষ' ত নয়ই, বরং তাঁর অপূর্ব গুণগ্রামেরই পরিচায়ক; অর্থাৎ, জীবের জন্য তাঁর পরমকারুণ্য, পরমপ্রীতি, পরমমৈত্রী, পরমসহানুভূতি প্রভৃতিরই প্রতীক।

সুতরাং, সিদ্ধান্ত হল এই যে—নিত্য-নিরঞ্জন, 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' (ঈশোপনিষদ্ ৮) পরমেশ্বর নিশ্চয়ই চিৎ-স্বরূপ।

ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি

('সিদ্ধান্তরত্নম্' ১।৫৫)

ব্রহ্মকে 'আনন্দস্বরূপ' ব'লে গ্রহণ করা চলে না—কারণ সীতাদিসঙ্গলালস শ্রীরামচন্দ্রাদির বৈষয়িক আনন্দের বা সুখের অভিলাষ দেখা যায়। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাদির উপভোগেই বৈষয়িক সুখের উৎপত্তি হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে এরূপ বৈষয়িক 'সুখ'ই ইহলোকে ও পরলোকে 'স্বর্গ' নামে অভিহিত হয়ে থাকে, এবং এরূপ 'সুখে'রই অপর নাম 'আনন্দ'। এরূপ 'আনন্দে'র অভিলাষেই লোকে সমস্ত মর্যাদা লঙ্ঘন ক'রেও মূঢ়বৎ কার্যে প্রবৃত্ত হন। সেজন্য, শ্রীভগবান যদি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর এরূপ বিষয়সুখে আসক্তি জন্মাত না।

খণ্ডন

প্রকৃতকল্পে, 'সুখ' ও 'আনন্দ' এক ও অভিন্ন ত নয়ই, বরং পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব। যাঁরা কেবলমাত্র বিষয়রসে রসিক, তাঁরা বিশুদ্ধ ভগবদানন্দের আস্বাদই জানেন না বলেই মূঢ়ের ন্যায় 'বিষয়সুখ' এবং 'ভগবদানন্দ'কে এক ও অভিন্ন ব'লে মনে করেন। কিন্তু একথা স্থির নিশ্চিত যে, বিষয়াতিরিক্ত সুখ বা আনন্দ আছেই আছে। যেমন, সুষুপ্তিকালে নির্বিষয় সুখ বা আনন্দের কথা সর্বজনবিদিত ও সর্বজনস্বীকৃত। অতএব, এমন কি, জীবও এরূপ অপার্থিব বিষয়শূন্য-সুখস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ; শ্রীভগবান ত এরূপ বিপুল সুখ-স্বরূপ বা বিপুলানন্দস্বরূপ অতি অবশ্যই।

পুনরায়, সাধারণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিষয়-গ্রহণের পরেই বৈষয়িক সুখের আবির্ভাব হয়; বিষয়-গ্রহণ না হলে এরূপ সুখের তিরোভাব হয়। কিন্তু শ্রীভগবদ্রূপ সুখের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ব্যাপারই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে বিষয়-ত্যাগেই সুখ, বিষয়-গ্রহণেই সুখের অন্তর্ধান। সেজন্য, বৈষয়িক সুখ ত্যাগ ক'রে, পার্থিব সমস্ত রূপরসাদি বিষয়কে উপেক্ষা ক'রে যাঁরা শ্রীভগবানে একচিত্ত হন, মতি স্থির করেন, তাঁরাই কেবল তাঁর শাশ্বত দিব্যানন্দের আস্বাদ লাভে ধন্যাতিধন্য হন। অতএব, এরূপ দিব্যানন্দদাতা পরমেশ্বরও স্বয়ং দিব্যানন্দস্বরূপ অতি নিশ্চয়ই—কারণ যাঁর যে জিনিস নেই, তিনি অপরকে সেই জিনিস দান করবেন কিরূপে?

পুনরায়, সীতা-সত্যভামাদিসঙ্গলালসা কদাপি শ্রীভগবানের সাংসারিক ভোগলালসা নয়। কারণ, তাঁরাই শ্রীভগবানের হ্লাদিনী বা শক্তি—আনন্দ-স্বরূপ কামনা করছেন আনন্দস্বরূপাকে—আনন্দের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে আনন্দ—এ কি সাধারণ বৈষয়িক কামনা-বাসনা? অসম্ভব। এ ত কেবল পরমলীলাময় পরমেশ্বরের একত্ব-দ্বিত্ব খেলা, নিজেরই সঙ্গে নিজের খেলা—একদিকে চিৎ-শক্তি জীবের সঙ্গে খেলা; অন্যদিকে আনন্দ-শক্তি শ্রীরাধার সঙ্গে খেলা—এতে আর দোষ কি?

দ্বিতীয় আপত্তি

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ হলে আনন্দপিয়াসী সকল জীবই নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল হতেন। কিন্তু সেরূপ ত দেখা যায় না জগতে। বরং দেখা যায় যে, যাঁরা বিষয়-সুখে অধিকারী ও সক্ষম, তাঁরা ভগবদানন্দের জন্য বিন্দুমাত্রও ব্যস্ত নন এবং এও দেখা যায় যে, যাঁরা বিষয় পাননি, বা তদ্-ভোগে অক্ষম, তাঁরাই—যেমন কতগুলি পঙ্গু অন্ধ বধির অলস জরাতুর লোকই—তথাকথিত বৈরাগ্যের ভান ক'রে 'আমরা সুখী' ইত্যাদি অসত্য কথা ব'লে সকলকে প্রতারিত করবার প্রচেষ্টা করেন।

খণ্ডন

এটি জীবের অজ্ঞতা-অবিদ্যারই ফলমাত্র। যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁরা জানেন যে, প্রকৃত সুখ বা আনন্দলাভ হতে পারে একমাত্র শ্রীভগবান-লাভেই। বস্তুতঃ, পঙ্গুপ্রমুখ অক্ষম ব্যক্তিদের ভগবদ্‌লালসা 'সহেতুকী বৈরাগ্য'ই কেবল—সকাম-প্রবৃত্তিই কেবল; কিন্তু বিষয়সুখে সক্ষম ব্যক্তিদের, ভগবদ্‌লালসা 'নির্হেতুকী বৈরাগ্য'—নিষ্কাম প্রবৃত্তিই কেবল। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের সেবা থেকে নিজের সুখ হবে, এই প্রবৃত্তি সকামা প্রবৃত্তিই কেবল। কিন্তু কেবল সুখস্বরূপ ভগবানের আকর্ষণে তাঁতে যে প্রবৃত্তি, তা পরে সুখদায়ক হলেও, তাকে নিষ্কামা প্রবৃত্তিরূপেই অভিহিত করা হয়—কারণ, এরূপ সুখের সেবায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি সেবাতিরিক্ত কোনো সুখই কামনা করেন না। এরূপে 'কেবল সুখের সেবা' যে 'সুখসাধনের সেবা'র ন্যায় সকামা নয়, সম্পূর্ণরূপেই নিষ্কামা—এ ত সর্বজনস্বীকৃত।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, সমস্ত জীবকে বিপুলানন্দদায়ক ব্রহ্ম, স্বয়ং বিপুলানন্দস্বরূপ।

উপরে বলদেবের পূর্বপক্ষ বা পরমত-খণ্ডন ও উত্তরপক্ষ বা স্বমত-স্থাপনের পদ্ধতির বিষয় যা সংক্ষেপে বলা হ'ল, তা প্রকৃত যুক্তিবিচারের দিক থেকে প্রায় মূল্যহীনই বলা চলে। প্রবল-প্রচণ্ড-প্রখর যুক্তিতর্কের প্রতাপ যে কতদূর ভীষণ হতে পারে, অকাট্য হতে পারে, অপরাজেয় হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শঙ্করাচার্যের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রথিতযশা রামানুজের বিশ্ববিশ্রুত 'শ্রীভাষ্য'—এই সুযোগ্যনামধারী 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য'। বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তার পর থেকেই ক্রমশঃ যুক্তি হয়ে উঠছে পরিম্লান, তার স্থান নিয়ে নিচ্ছে 'শ্রুতি' ও 'ভক্তি'—জ্ঞানজা ভক্তি

নয়, শ্রুতিজা ভক্তি; এবং পরিশেষে, বলদেবের ক্ষেত্রে যুক্তির ঘটেছে অপমৃত্যু অনেকস্থলেই—তাঁর প্রাণপণ পরমত-খণ্ডন ও স্বমত-স্থাপনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। বিশেষ ক'রে এসব ক্ষেত্রে এসে মিশেছে আরেকটি নূতন অবাঞ্ছনীয় বস্তু—অর্থাৎ, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা—বিষ্ণু বড়, কি শিব বড়; বিষ্ণুরই অধীন শিব—প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়-মূলক আলোচনা-প্রপঞ্চনা, যা প্রকৃত দর্শন এবং ধর্মের দিক থেকে একেবারেই নিরর্থক এবং অবাঞ্ছনীয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বলদেবের ন্যায় অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্ন সাধকও এরূপ সম্প্রদায়গত ভাব-ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি; এবং কতই না শক্তি ও সময় ব্যয় করেছেন এইসব মূল্যহীন ব্যাপারে অকারণে। এ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মানবহৃদয়ের সংস্কারসমূহ কিরূপ দৃঢ়মূল—যা শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌গণকেও অনেক সময়ে ক'রে তোলে দুর্বল, ক'রে তোলে হৃতবুদ্ধি, ক'রে তোলে বিভ্রান্ত, ক'রে তোলে পথভ্রষ্ট, অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

সে যাহোক, নামতঃ 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী' হলেও কার্যতঃ বলদেবের এরূপ চিন্তা-প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সমাদরযোগ্য। [ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা তাঁর ফরাসীচর্চা।

প্রথমবার আমেরিকায় থাকার সময়ই তিনি সারা বার্নহার্ডের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন—সারা বার্নহার্ড ফরাসী ছাড়া অন্য ভাষায় অভিনয় করতেন না। এ বিষয়ে স্বামীজীর 'পত্রাবলী'তে সারা বার্নহার্ড অভিনীত বুদ্ধ-বিষয়ক 'ইংশীল' নাটকটি দেখে তাঁর মজাদার মন্তব্য স্মরণীয়। (১৩ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৬; নিউ ইয়র্ক থেকে লেখা পত্র।)[১]

দর্শকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে মাদাম বার্নহার্ড নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সারার অভিনীত ফরাসী নাটক দেখে স্বামীজী সে নাটকের মর্মগ্রহণ করতে পেরেছিলেন।

তখনকার পাশ্চাত্যে মননশীলদের মধ্যে ফরাসী সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ভাষা—সুতরাং এ ভাষা-চর্চায় তাঁর আগ্রহ স্বাভাবিক।

১ "ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে 'ইংশীল' (Iziel) অভিনয় করছেন। এটি কতকটা ফরাসী ধাঁজে উপস্থাপিত বুদ্ধজীবনী। এতে রাজনর্তকী ইংশীল বোধিদ্রুম-মূলে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করতে সচেষ্ট; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্তু সারাক্ষণ বুদ্ধের কোলেই বসে আছে। যা হোক, শেষ রক্ষাই রক্ষা—নর্তকী বিফল হ'ল। মাদাম বার্নহার্ড ইংশীলের ভূমিকায় অভিনয় করেন।"

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-পরিক্রমার সময় পারিতে এসে জুল বোওয়ার সঙ্গে একত্রে থাকার ব্যাপারে স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল অবাধ ফরাসীচর্চা, সে উদ্দেশ্যসাধনে খুব বেশী অগ্রসর হওয়ার আগেই তিনি পারি ছেড়ে ভিয়েনা হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পথে যাত্রী হলেন। তখনও জুল বোওয়া এবং মাদাম কালভে—এ দু'জন ফরাসী প্রতিভা তাঁর সঙ্গী। এই সঙ্গে আমেরিকান মিস ম্যাকলাউড থাকলেও পাশ্চাত্য শিষ্টতা অনুযায়ী অধিকাংশের বোধ্য হিসাবে ফরাসীতেই তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হ'তো। স্বাভাবিকভাবেই ফরাসীচর্চায় ইচ্ছুক স্বামীজী এতে বিশেষ খুশী—"এদের সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া আর কেউ ইংরেজী জানে না; ইংরেজী ভাষায় কথা একদম বন্ধ, কাজেই কোন রকম ক'রে আমায় কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী।" মধুসূদন এই সঙ্গে (ইংরেজী) ভাষা-শিক্ষা-প্রসঙ্গে স্বপ্ন দেখাও যোগ করেছিলেন! স্বামীজী ঠিক অতটা না করলেও ভারতবর্ষে ফিরেও ফরাসীচর্চা বজায় রেখেছিলেন।

ফ্রান্সে প্রতি বৎসর তখন পারি প্রদর্শনী[২] (Paris Exposition) নামে এক বিরাট মেলার আয়োজন হ'তো। স্বামীজী যে বছর (১৯০০) এই প্রদর্শনী দেখেন, সে বছর এই প্রদর্শনীর বিপুল বিত্ত বৈভবের সঙ্গে চমৎকারিত্বের অন্যতম উপাদান ছিল নব-আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিক আলোকসজ্জা। লক্ষণীয়, স্বামীজীর রচনাতে ইলেকট্রিকের উপমা ঘুরে-ফিরেই দেখা দিয়েছে। এই প্রদর্শনীর অবসান-বর্ণনায় বৈদান্তিক বিবেকানন্দের অন্তর্লোকে জাগতিক সত্যের ক্ষণস্থায়িত্ব এক নিগূঢ় বিষাদ ও হাস্যরসের মিশ্রণে রূপায়িত—"সকল জিনিসেরই অন্ত আছে। আজ আর একবার পুঞ্জীকৃতভাবরূপস্থিরসৌদামিনী, এই অপূর্ব-ভূস্বর্গ-সমাবেশ প্যারিস-এগ্‌জিবিশন দেখে এলুম।

"আজ দু-তিন দিন ধরে প্যারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্চে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্যদেব আজ ক-দিন বিরূপ। নানাদিগ্‌দেশাগত শিল্প, শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয়বিলাসের স্রোত দেখে ঘৃণায় সূর্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগ-রঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর আশু বিনাশ ভেবে তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকলেন।

"আমরাও পালিয়ে বাঁচি—এগ্‌জিবিশন ভাঙা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূ-স্বর্গ, নন্দনোপম প্যারিসের রাস্তা এক হাঁটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু-একটা প্রধান ছাড়া এগ্‌জিবিশনের সমস্ত বাড়ীঘরদোরই, কাটকুটরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চুনকামের বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার!" একটু গুরুগম্ভীর ও আপাতবিষণ্ণ ভাষাভঙ্গীর অন্তরালে বৈদান্তিকের সত্যদৃষ্টির হাস্যরসচ্ছটা এ বর্ণনার অন্তরে এক গভীরতার আভাস সঞ্চার করেছে। মেঘে-ঢাকা সূর্যকে উপলক্ষ করে পারি-প্রদর্শনীর পরিসমাপ্তিপ্রসঙ্গে স্বামীজী বিদ্রূপে ও ব্যঙ্গে বিষাদমিশ্রিত হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত সংসারই যে পারি-মেলার মতো ক্ষণস্থায়ী নয়নাভিরাম দৃশ্যের সমষ্টি, সে কথা মনে রেখেই স্বামীজীর মন্তব্য—'আমরাও পালিয়ে বাঁচি।'

২৪শে অক্টোবর, ১৯০০ সন্ধ্যায় ট্রেন প্যারিস ছাড়লো। সকালে উঠে স্বামীজী দেখলেন ট্রেন জার্মানিতে উপস্থিত। এ উপলক্ষে স্বামীজীর

২ দ্রষ্টব্য স্বামীজীর 'পারি প্রদর্শনী' প্রবন্ধ: ভাববার কথা: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ড।

দৃষ্টিতে ফরাসী ও জার্মান সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ —যেমন মনোজ্ঞ তেমনি হাস্যরসে দীপ্ত।—"জার্মানি পূর্বে বিশেষ ক'রে দেখা আছে; তবে ফ্রান্সের পর জার্মানি—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। 'যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং' — এক দিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্চে; আর এক দিকে কেন্দ্রীভূত নূতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জার্মানির স্থূলহস্তাবলেপ।"

ফরাসীসভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী স্বামীজী তুলনামূলকভাবে জার্মান সভ্যতার অপেক্ষাকৃত স্থূলরুচির দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করলেও সাহিত্যে, সঙ্গীতে, দর্শনে, যুদ্ধবিদ্যায় জার্মানদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। আপাতত জার্মান ও ফরাসী সৌন্দর্যচেতনার পার্থক্য বিশ্লেষণে স্বামীজীর হাস্যরসসৃষ্টির নিপুণতা আমাদের লক্ষণীয়—"প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল—অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বল-বিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জার্মানির রূপবিকাশচেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মতো—কস্তুরীর মতো এক মুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মান সভ্যতা পেশীময়, সীসার মতো—পারার মতো ভারি, যেখানে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। জার্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত অশ্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর—মেয়েমানুষের মতো, কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।"—চলতিভাষা এখানে যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় অথচ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসে ভরে উঠেছে, তার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের গদ্যরীতির সঙ্গে করা চলে। ছিন্নপত্রের লেখাগুলি স্বামীজীর আগে হলেও রবীন্দ্রনাথ তখনও চলতিভাষাকে তাঁর চিঠিপত্র ছাড়া অন্যত্র বাহন করতে সাহস করেন নি। স্বামীজীই চলতিভাষাকে সাহিত্যের আঙিনায় প্রথম প্রকাশ্যে সব ভাব ও জ্ঞানের প্রকাশশক্তিদীপ্ত রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। জার্মান ও ফরাসী সভ্যতার তুলনার আর একটু নমুনা—"জার্মান ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ী অট্টালিকা বানাচ্চেন, বৃহৎ বৃহৎ মূর্তি—অশ্বারোহী, রথী—সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জার্মানের দোতলা বাড়ী দেখলেও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, এ বাড়ী কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতী-উটের 'তবেলা'? আর ফরাসীর পাঁচতলা হাতী-ঘোড়া রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে বুঝি পরীতে বাস করবে!" দু'কথায় এ দুই সভ্যতার সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্বন্ধে এমন অভ্রান্ত মন্তব্য লেখকের মনন ও অনুভবের আশ্চর্য রূপায়ণ।*

[ক্রমশঃ]

* অন্যভাবে উল্লেখিত না থাকলে এ প্রবন্ধের সব উদ্ধৃতিই স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' থেকে গৃহীত।

হে স্বামীজী এসো পুনর্বার

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের শেষ শিলাতলে
হে স্বামীজী, এসে তুমি বসো পুনর্বার।
নিশ্চয় শুনিতে পাবে
কী দারুণ জীবন-যন্ত্রণা
অস্ফুট ভাষায়
ব্যক্ত হতে চায়;
নিশ্চয় দেখিতে পাবে
কী কঠিন যুগের জিজ্ঞাসা
করেছে চঞ্চল
আসমুদ্র হিমাচল—কোটি কোটি মানুষেরে
মানুষের মাঝে তুমি দেখেছিলে ভগবান;
বলেছিলে—'জীবরূপে শিব'।
কিন্তু দেবতারা
ভুলে গেলো পরিচয় নিজেদের।
ক্ষণিক স্বার্থের মোহে
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে
হারালো তাদের মাঙ্গলিকী শুভবুদ্ধি।
শ্রেণীসংঘর্ষের দারুণ তাণ্ডবে
ভাগ হয়ে গেলো তারা।
শুরু হোলো বঞ্চনা শোষণ নিপীড়ন
একের অন্যের হাতে;
অগণিত বঞ্চিত দেবতা
পেলো না তাদের বুভুক্ষার অন্ন—
পেলো না তাদের পূজার নৈবেদ্য!
পীড়নের অভিমানে ভাঙতে চাইলো তারা
নিজেদের শ্রীমন্দির—
তাদের প্রজ্ঞার মণিকোঠা!
দীর্ঘ বঞ্চনায় বললো তারা ক্রোধে:
'চাই না দেবতা হতে—
দেবতা কোথাও নেই।
এসো, হয়ে উঠি দানব আমরা;
শক্তি আছে দানবের।
সেই শক্তি দিয়ে—ভাঙো, কাটো, লোঠো
আদায় করো হিসসা নিজেদের—
এই হোলো বাঁচার সংগ্রাম!'

হয়তো কোথাও সংগ্রাম সফল হোলো,
হয়তো দখল হোলো—দিনকয়েকের জন্য
দিনযাপনের রুজি;
কিন্তু মন?—মনের বুভুক্ষা
মেটাতে পারলো না সেই সংগ্রামের জিগির
দিতে পারলো না সেই মূল প্রশ্নের উত্তর—
'কোনটা বড় সত্য?—
পেট ভরাবার ধান্দা কিংবা মন ভরাবার ব্রত?'
ভেঙে লুঠে খেয়ে বাঁচা যায়—
পশুও তো বাঁচে!
পেটে খেয়ে বাঁচে আর মরে—
তবু, শুধু বাঁচা-মরা দিয়ে
মানুষের ইতিহাস শেষ তো হয় না!
মানুষের সত্যকার ইতিহাস
সে তো পূর্ণমানুষের
ভরা জোয়ারের ইতিহাস!

তুমি জেনেছিলে, অকিঞ্চন প্রেমে মন ভরে
কিন্তু এও শুনেছিলে শ্রীগুরুর কাছে
জঠর-অনল-জ্বালা
জীবনের মূল ছিন্ন ক'রে
ঘটায় মনের ভরাডুবি।
তাই, তুমি বলেছিলে :
'প্রাণে বাঁচো আগে—
সকলেরি খেয়ে পরে বাঁচবার
আছে অধিকার, দাবি আছে
স্বাধীন শোষণ-মুক্ত সুস্থ-জীবনের।'
তুমি ডেকেছিলে দীপ্তকণ্ঠে স্বজাতিরে :
'ওঠো, জাগো, মোহনিদ্রা ছেড়ে
হও অধিকারী পূর্ণ-ঐশ্বর্যের ;
হও বীর্যবান—লাভ করো
লৌহময় পেশী, স্নায়ু ইস্পাতের।
বুঝে নাও
বিশ্বের ঐশ্বর্যাগারে
তোমারো যে আছে অধিকার।
দাসবৃত্তি বংশক্রমে ! মুখেতে বৈরাগ্য—
ক্লীবত্বের নামান্তর ! জাড্য করো ত্যাগ
সিংহের বিক্রমে যোগ দাও কর্মযজ্ঞে
শুধু, ভুলিও না—
সে নহে ইন্দ্রিয়সুখ, স্থূল ভোগ লাগি—
সে তোমার দেবপূজা।
জীবনের সর্বকর্ম সর্বসেবা দিয়ে
সাঙ্গ হবে শ্রেষ্ঠ পূজা—পূর্ণপ্রেমে।
জীবন বিলায়ে পাবে জীবন-ঈশ্বরে।'

তুমি বলেছিলে :
'ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু
সর্বভূতে সেই প্রেমময়।'
তুমি জেনেছিলে
আত্মবোধে বিশ্বপ্রেম।
তাই বিশ্বজনে আগামী দিনের
পীড়ন-শোষণ-মুক্ত সুস্থ-সমাজের
মূল মন্ত্র—নব বেদান্তের বাণী
দিয়েছিলে তুমি :
'হও শ্রদ্ধাবান, হও বীর্যবান, লভি আত্মজ্ঞান
জীবন সঁপিয়া দাও পরহিতে।'
তবু, এখনো তো
সে মন্ত্র শুধুই বন্দী পুঁথির পাতায়—
পণ্ডিতের বুদ্ধির জগতে !
বুদ্ধি ও বোধির মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান !
এই ব্যবধান ভেঙে দিয়ে যাও
হে বিপ্লবী, আরবার এসে।
বুদ্ধির পারের রাজ্যে মানুষের বোধে
এনে দাও সেই সত্য :
'জড় ও চেতন, কর্ম ও চিন্তার মাঝে
সদা দীপ্যমান
সর্বব্যাপী সেই প্রেমময়।
স্বার্থহীন কর্মচেষ্টা
তা-ই শ্রেষ্ঠ পূজা।
স্বার্থপর যে রয়েছে পরাঙ্মুখ সেবাধর্ম হতে
নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে
সে করেছে
নিজেরে নিলীন।'

রাষ্ট্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের আজব দেশ 'কুয়াইত'-এ

শ্রীসচ্চিদানন্দ কর*

প্রথম যেদিন মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষুদ্র দেশ কুয়াইত (Kuwait) অভিমুখে রওনা হলাম, সেদিন সেদেশ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। অথবা যে কাজে এবং যাঁদের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে সেখানে যাচ্ছিলাম, সে সম্বন্ধেও বিশেষ স্পষ্ট জ্ঞান ছিল না। সেটা ছিল ১৯৬২ সালের জুলাই মাস। আমি যাচ্ছিলাম 'রাষ্ট্রসংঘ বিকাশ কার্যক্রমে'র (United Nations Development Programme, সংক্ষেপে U. N. D. P.) কাজ নিয়ে। কাজটি ছিল কুয়াইত সরকারকে তাদের সরকারী কাজকর্ম কি করে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ও সাহায্য করা।

আমি এবং আমার স্ত্রী বোম্বাই থেকে রাত বারোটার পর রওনা হয়ে সূর্যোদয়ের কিছু আগে কুয়াইতে গিয়ে পৌঁছাই। আমাদের প্লেন যখন সমুদ্রের উপর থেকে কুয়াইতের তীরের দিকে এগোচ্ছে, তখন উপর থেকে এক অভিনব দৃশ্য দেখলাম। মরুভূমির মধ্যে অসংখ্য চুল্লী হু হু করে জলছে—মনে হোল যেন রাবণের অনির্বাণ চিতা। পরে অবশ্য জানলাম যে, তেলের কূপ থেকে বের হওয়া তেলের সঙ্গে যে গ্যাস মিশ্রিত থাকে তাই পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এই গ্যাস জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু ওখানে অত গ্যাস কে ব্যবহার করবে! এখন অবশ্য ঐ গ্যাসের কিছুটা খুব ঠাণ্ডা করে তরলে রূপান্তরিত করে জাহাজের ঠাণ্ডা ট্যাঙ্কারে করে চালান দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বাড়তি গ্যাস এখনও পুড়িয়ে ফেলা হয়।

যাই হোক কুয়াইতে নেমে কিন্তু দেখলাম দেশটা বেশ আধুনিক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝকমকে অট্টালিকা, আধুনিক সাজে সজ্জিত ঘরবাড়ি, প্রশস্ত রাজপথ রাত্রে নানা রং-বেরং আলোয় ঝলমল, চকচকে দ্রুতগামী বড় বড় বিদেশী মোটরগাড়ি—সব মিলিয়ে পশ্চিমদেশের, বিশেষতঃ আমেরিকার কোন শহর বলে বিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। অবশ্য লোকজনদের চেহারা ও তাদের বেদুইনী পোশাক দেখলে সে ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যাবে। তবে খুব কম লোকই সেখানে রাস্তায় হেঁটে চলে।

তখন জুলাই মাস। মরুভূমির প্রচণ্ড গরম, তাপমাত্রা 50°C অর্থাৎ 122° F। তার উপর মাঝে মাঝে বালির ঝড়। মরুভূমির সে বালির ঝড় যে কি ভয়াবহ তা না দেখলে বোঝানো যায় না। বালিতে সমস্ত আকাশ ও জমি ছেয়ে যায়, তিনহাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না, বাড়ির সমস্ত জানালা কপাট সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ করেও সে বালির ঝাপটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মনে হয় আকণ্ঠ বালুতে ভর্তি হয়ে গেছে। বহু দুর্ঘটনা ঘটে এই বালির ঝড়ে, প্রতি বৎসর কিছু লোক মারা যায় এর ফলে।

কাজেই কুয়াইতের জীবনযাত্রা মোটেই সুখকর হবার কথা নয়। কিন্তু অর্থ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে

* এম. এ. (অর্থনীতি)। রাষ্ট্রসংঘের প্রাক্তন আধিকারিক। U. N. D. P.'র কাজে কুয়াইত, ইরাক, নাইজেরিয়া ও আমেরিকায় পনের বৎসর অতিবাহিত করেন।

অনেক মুশকিলেরই আসান হয়। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা শুধু বাড়িতে নয় গাড়িতেও বাইরের প্রচণ্ড গরম বুঝতে দেয় না। এমনকি এমন কথাও হয়েছিল যে, সমস্ত কুয়াইত শহরটিকে একটি প্লাস্টিক ছাউনিতে আবৃত করে পুরোটা শীতল রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এতে শহর-বাসীদের আর আলাদা করে এয়ারকনডিশনিং করতে হবে না। কিন্তু এতবড় একটা ব্যবস্থা করতে ওখানকার তৈলকূপের কর্তারাও শেষপর্যন্ত রাজী হননি।

তারপর ওখানকার আর একটি প্রধান অসুবিধা ছিল জলের, বিশেষতঃ পানীয় জলের। কুয়াইত এর জন্য বরাবর নির্ভর করত ইরাকের বসরার উপর। সেখান থেকে সাট্-এল-আরব নদীর মিষ্টি জল চামড়ার থলিতে ভরে তা গাধার পিঠে অথবা নৌকায় করে ৬০ কিলোমিটার পথ এনে কুয়াইতীদের তৃষ্ণা নিবারণ করা হোত। বর্তমানে কুয়াইতের সমুদ্রের ধারে একাধিক বিরাট জলশোধনযন্ত্র (Distillation Plant) বসানো হয়েছে। এর সাহায্যে সমুদ্রের নোনাজল ফুটিয়ে বাষ্প করে আবার তা ঠাণ্ডা করে বিশুদ্ধ জলে পরিণত করে সেই জল ট্যাঙ্কারে করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এবং তা পাম্প করে বাড়ির ছাদে চৌবাচ্চায় ভর্তি করা হচ্ছে। সুতরাং জলের কষ্ট সেখানে আর নেই। এমনকি অনেকে এই জলে বাগান পর্যন্ত করছেন, যদিও কুয়াইতে বাগান করা সহজ নয়। শুধু জলের অভাবই নয়, ওখানকার বালি এবং মাটিও নোনা এবং তার ৩।৪ ফুট নীচে এক শক্ত চুন জাতীয় স্তর আছে। গাছ লাগাতে হলে এসব তুলে ফেলে অন্য জায়গা থেকে ভাল মাটি এনে ফেলতে হয়, তবে গাছপালা হবে। এসব প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ, তা সত্ত্বেও কুয়াইতে এখন কিছু গাছপালা, এমনকি একটি পার্কও তৈরী হয়েছে এইভাবে।

আগেই বলেছি রাষ্ট্রসংঘের বিকাশ কার্যক্রমের কাজে আমাকে কুয়াইতে যেতে হয়েছিল। এইখানে রাষ্ট্রসংঘের এই কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটু বলা দরকার, কেননা অনেকেরই এ সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা নেই। রাষ্ট্রসংঘের নাম আমরা অবশ্য সবাই জানি ; এই প্রতিষ্ঠানটি গত মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মোট ৪৬টি রাষ্ট্র নিয়ে এটি তৈরী হয়, এখন অবশ্য এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হোল পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করা। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্‌স্ (League of Nations)-ও একই উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এর সংগঠন ও কার্যপ্রণালী সে উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা লীগের চরম ব্যর্থতা প্রমাণ করে। এই ব্যর্থতার কথা মনে রেখেই বর্তমান রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন ও কার্য-প্রণালী এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে এর মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের তিনটি প্রধান অঙ্গ[১] : একটি General Assembly বা সাধারণ পরিষদ যেখানে সমস্ত সদস্যদেশের প্রতিনিধিরা একত্রে সমভাবে মিলিত হয়ে কাজ করেন। দ্বিতীয়, Security Council অথবা নিরাপত্তা পরিষদ যার সদস্য

১ এই তিনটি প্রধান অঙ্গ ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের আরও তিনটি অঙ্গ আছে, যথা International Court of Justice, Trusteeship Council এবং Secretariat অর্থাৎ Secretary-General এবং তাঁর অফিস। প্রথম দুটি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তৃতীয়টি অবশ্য অন্য সকল অঙ্গের কাজের সহায়তা করে।

সংখ্যা হোল ১৫। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, চীন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এর স্থায়ী সদস্য, বাকী দশজন সদস্য প্রতি দু'বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। এঁদের কাজ হোল পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করা। যেহেতু এইটিই রাষ্ট্রসংঘের মূল উদ্দেশ্য সেহেতু এই পরিষদটি সংঘের সব চাইতে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী অঙ্গ। তৃতীয়টি হচ্ছে Economic and Social Council অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সমাজসম্বন্ধীয় পরিষদ। এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কেননা পৃথিবীতে বেশীর ভাগ যুদ্ধ ও অশান্তির কারণ, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, মূলতঃ অর্থনৈতিক একদেশের ধনদৌলতের উপর অন্যদেশের লোভ এবং সেটা লুণ্ঠন করার চেষ্টা, একদেশ দ্বারা অন্যদেশকে শোষণ এবং সে শোষণ কায়েম করতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার, ইত্যাদি। কাজেই পৃথিবী থেকে অশান্তি ও যুদ্ধের মূল কারণ দূর করতে হলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ধনবৈষম্য দূর করা দরকার। অর্থাৎ অনুন্নত জাতিদের অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে ধনী দেশগুলির কাছাকাছি আসতে হবে। এর জন্য দরকার দুটি জিনিসের—একটি হচ্ছে মূলধন এবং অপরটি হচ্ছে কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতি যার দ্বারা ঐ মূলধনকে কাজে লাগিয়ে ধন উৎপাদন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তথা বিকাশ ঘটান যায়।

উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘের আওতায় দুটি সংস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমটি হোল World Bank বা বিশ্বব্যাঙ্ক। এটি ১৯৪৬ সালে স্থাপিত হয় এবং এর কাজ হোল উন্নতিশীল[২] দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মূলধন ধার দেওয়া। এ কাজ বিশ্বব্যাঙ্ক বেশ বিরাটভাবেই করছেন এবং আজ পর্যন্ত বহু হাজার কোটি ডলার উন্নতিশীল দেশগুলিকে ধার দিয়েছেন। দ্বিতীয় সংস্থাটি হোল U. N. D. P. অর্থাৎ রাষ্ট্রসংঘ বিকাশ কার্যক্রম। এটি মূল রাষ্ট্রসংঘেরই একটি অংশ এবং সাধারণভাবে Economic and Social Council-এর অন্তর্গত। এর কাজ হোল উন্নতিশীল দেশগুলিকে কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতিতে সহায়তা করা।

পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখতে হলে যে উন্নতিশীল জাতিসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজন এবং তার জন্য দরকার কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতা, এ সত্য রাষ্ট্রসংঘ প্রায় প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদের এক প্রস্তাবের ফলে খুব ছোট আকারে এ কাজ আরম্ভ করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় Technical Assistance Programme, অর্থাৎ কারিগরী সাহায্য কার্যক্রম। ১৯৪৯ সালে এটাকে আরও বাড়ান হয় এবং এর নাম রাখা হয় Extended Programme of Technical Assistance. ১৯৬৬ সালে এর কার্যক্রমকে আরও অনেক বড় করা হয় এবং একটা নূতন রূপ দেওয়া হয়। তখন তার নামকরণ করা হয় U. N. D. P.

এই কাজের জন্য যে অর্থব্যয় হয় সেটা কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ বাজেট থেকে আসে না। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যসরকার স্বেচ্ছায় এই টাকা আলাদাভাবে দান করেন। এর জন্য প্রতি বৎসর শরৎকালে সাধারণ অধিবেশনের শেষের দিকে সকল সদস্যদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। সেখানে সদস্য দেশগুলি পরের বৎসর কে কত টাকা U. N. D. P.'র কাজের জন্য দেবেন তা জানিয়ে দেন। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নন

২ 'অনুন্নত' কথাটা অনেকের কাছে অপমানজনক বোধ হওয়াতে আজকাল সরকারীভাবে 'উন্নতিশীল' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এমন দেশও এখানে নিমন্ত্রিত হন এবং অর্থদান করেন, যেমন সুইজারল্যাণ্ড। বর্তমানে এইসব দেয় টাকার পরিমাণ ৫০ কোটি ডলারের উপর। এই টাকাটা U. N. D. P.'র আয়ত্তে আসে এবং এই সংস্থা প্রতিটি উন্নতিশীল দেশের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন কোন্ কোন্ ধরনের কারিগরী সাহায্য তাঁদের প্রয়োজন। সেই অনুসারে একটি কার্যক্রম তৈরী করা হয়। সাধারণতঃ এটা সেই দেশের জাতীয় বিকাশ কার্যক্রমের (National Development Plan) সঙ্গে মিল রেখে সেই কার্যক্রমকে রূপায়িত করতে সাহায্য করে।

কার্যক্রম ঠিক হলে তারপর আসে তাকে রূপায়িত করার কাজ। এটা কিন্তু U. N. D. P. নিজে করে না। রাষ্ট্রসংঘের গোষ্ঠীভুক্ত কতগুলি Specialised Agencies অর্থাৎ বিশেষ সংস্থা আছে, যেমন F. A. O. (Food and Agriculture Organisation) বা খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, UNESCO (U. N. Educational, Scientific and Cultural Organisation) অর্থাৎ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সংস্থা, W. H. O. (World Health Organisation) অর্থাৎ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, I. L. O. (International Labour Organisation) অর্থাৎ বিশ্ব শ্রম সংস্থা, ইত্যাদি। এইরূপ ১৬টি বিভিন্ন সংস্থা আছে যারা মানব সমাজের প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ বিষয় ও সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এই সংস্থাগুলি রাষ্ট্রসংঘের গোষ্ঠীভুক্ত হলেও এদের আলাদা নিজস্ব সংগঠন ও কার্যক্রম আছে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি আলাদাভাবে এদের অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায়। এদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে এরা সাধারণভাবে এবং সদস্য দেশগুলির বিশেষ সমস্যা নিয়ে চিন্তা, আলোচনা করে এবং প্রয়োজনমত সমাধান করার চেষ্টা করে।

সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে U. N. D. P. তাদের কার্যক্রম রূপায়িত করতে এইসব সংস্থাগুলির সাহায্য নেয়। অর্থাৎ যদি নির্ধারিত কার্যক্রমের কোন প্রকল্প কৃষি সম্বন্ধ হয় তবে FAO-কে তার ভার দেওয়া হয়, যদি শিক্ষা সম্বন্ধে হয় UNESCO সেটা করে, যদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হয় তবে WHO, ইত্যাদি। এরা তখন নিজেদের বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে এবং দরকার হলে নূতন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে আবশ্যকমত উপকরণাদি যোগাড় করে কাজ আরম্ভ করে দেয়। তারপর কাজ আরম্ভ হলে তার তদারকি করার দায়িত্বও তাদের। অবশ্য এ সম্বন্ধে U. N. D. P.'রও দায়িত্ব আছে। টাকা যোগাচ্ছে তারা, সুতরাং সে টাকা ফলপ্রসূভাবে খরচ হচ্ছে কিনা দাতা রাষ্ট্রদের কাছে তার জবাবদিহি তাদেরই করতে হয়। এজন্য U. N. D. P. প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশে একটি করে অফিস খুলেছে, সেখানে তাদের একজন প্রতিনিধি থাকে। তাঁকে বলা হয় Resident Representative অথবা স্থানীয় প্রতিনিধি। তিনি সেই দেশের U. N. D. P. কার্যক্রমের সর্বময় কর্তা এবং দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনা তাঁর মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

আমি যখন কুয়াইতে গেলাম তখন কুয়াইত সবে এক বৎসর হোল ইংরেজের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে। অবশ্য কুয়াইত কোনদিনই ভারতবর্ষের মত সম্পূর্ণ ইংরেজ শাসনাধীনে ছিল না। অনেকটা আমাদের দেশীয় করদ রাজ্যের মত সুকঠিন মৈত্রী ও রক্ষাচুক্তি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। দেশটা খুবই ছোট (৬৮৮০ বর্গ মাইল—২৪ পরগণা জেলা থেকে কিছুটা বড়) এবং একেবারে পুরোপুরি মরুভূমি। পারস্য উপসাগরের শীর্ষে অবস্থিত এই দেশটির সামরিক গুরুত্ব ছাড়া আর কোন মূল্যই ছিল না ইংরেজের কাছে।

অবশ্য এ সবই বদলে যায় প্রথম মহাযুদ্ধের

পর—তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে। সেই সময় বিরাট তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় কুয়াইতের রুক্ষ বালুভূমির নীচে। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে এই পরম মূল্যবান সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর উৎপাদন ও বিক্রয় হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে আর সেই সঙ্গে বন্যার স্রোতের মত টাকা আসতে থাকে কুয়াইতের ভাণ্ডারে। আমি যখন ওখানে গেলাম তখন কুয়াইতের তৈল-উৎপাদনের পরিমাণ আমেরিকা, রাশিয়া ও ভেনেজুয়েলার পরেই।

তখন কুয়াইতের লোকসংখ্যা আনুমানিক দেড় লক্ষ মাত্র এবং তার মধ্যে আবার বিদেশীদের সংখ্যাই বেশী। এদের মধ্যে ছিল প্যালেস্তিনী ও অন্যান্য দেশের আরব, ইরানী, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ও আমেরিকান। কাজেই এই বিপুল পরিমাণ তৈল-উৎপাদনের দরুণ যে অপরিমিত অর্থ কুয়াইতীদের জাতীয় আয় হোত তাতে তাদের গড়পড়তা মাথাপিছু আয় পৃথিবীর সর্বোচ্চে দাঁড়িয়েছিল।

এখন কথা উঠতে পারে এহেন ধনী দেশকে উন্নতিশীল আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাহায্যের আওতায় আনা কি সমীচীন? এর উত্তর হোল:

কুয়াইত ধনী বটে এবং সেজন্য অর্থসাহায্যের প্রয়োজন তার নেই। বরঞ্চ সে-ই উল্টে অন্যকে অর্থসাহায্য করতে পারে এবং সেটা সে তখন থেকেই করতে আরম্ভ করেছে। বিশ্বব্যাঙ্কে কুয়াইত অনেক টাকা ধার দিয়েছে এবং নিজেও অন্য একটা তহবিল তৈরী করে অন্যান্য গরীব আরব দেশকে সাহায্য করতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অর্থ থাকলেই কারিগরী দক্ষতা হবে এটা স্বতঃসিদ্ধ নয়। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও কুয়াইত একটা আরব বেদুইনের দেশ ছিল। তারা উট, ভেড়া চরাত, সমুদ্রে মাছ ধরত ও মুক্তা তুলত এবং কাঠের নৌকা বানিয়ে তা বিক্রি করত অথবা তা চড়ে ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। সেই অবস্থা থেকে অল্পদিনের মধ্যে তেলের জোরে ওরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী দেশে পরিণত হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা হয়েছে সম্পূর্ণ বিদেশীদের উদ্যোগে। একটি বিদেশী কোম্পানী (আধা ইংরেজ ও আধা আমেরিকান) তেল আবিষ্কার করেছে, তা মাটির তলা থেকে তুলছে এবং বিক্রি ও বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে আর সেই সঙ্গে রাশি রাশি টাকা কুয়াইতের ভাণ্ডারে জমা পড়ছে —এর জন্য কুয়াইতীদের কিছুই করতে হচ্ছে না একেবারে। কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা জমান যত সহজ, সারা দেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় উন্নত করা তত সহজ নয়। তার জন্য দরকার বাইরে থেকে আনা শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং তার আনুষঙ্গিক উপকরণ। এবং এইখানেই প্রয়োজন রাষ্ট্রসংঘের কারিগরী শিক্ষাবিস্তারের কার্যক্রমের সাহায্য। অবশ্য কুয়াইত ধনী বলে U. N. D. P. এ সাহায্য বিনা পয়সায় করত না, বেশীর ভাগ খরচ কুয়াইত নিজেই বহন করত। তবু রাষ্ট্রসংঘের মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন দেশ বা জাতির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণী লোককে পাওয়া যেতে পারে, টাকা দিয়েও তাদের সাহায্য পাওয়া কম কথা নয়। সুতরাং কুয়াইত এ সাহায্য কৃতজ্ঞতাসহকারে গ্রহণ করত। এছাড়া অবশ্য কুয়াইত সরাসরি ভাবে বাইরে থেকে অনেক শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে তাদের সাহায্যে নিজেদের উন্নতিবিধান করেছিল এবং এখনও করছে।

কুয়াইতের U. N. D. P. প্রকল্পের মধ্যে ছিল মরুভূমিতে বন তৈরী, মাটি ছাড়া শুধু জলের সাহায্যে গাছপালা তথা সবজি উৎপাদন (hydroponics), শাসনব্যবস্থার উন্নতিসাধন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, যোগাযোগ-ব্যবস্থার

উন্নতি, অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধীয় উচ্চস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। আমি ওখানে থাকা কালে এই সব প্রকল্পের সংখ্যা ও কাজকর্ম বাড়তে থাকে, বিশেষতঃ ১৯৬৩ সালে কুয়াইত রাষ্ট্রসংঘের পুরো সদস্য হবার পর। এর আগে ওখানে U. N. D. P.'র নিজস্ব কোন অফিস ছিল না, ওখানকার কাজকর্ম নিকটস্থ লেবাননের রাজধানী বেরুটের অফিস থেকে দেখাশুনা হোত। কিন্তু ক্রমশঃ কাজ বাড়ার জন্য তাতে অসুবিধা হচ্ছিল এবং এইজন্য ১৯৬৪ সালে কুয়াইতে একটি আলাদা অফিস খোলা হয় এবং আমাকে তার ভার নিতে হয়। এরপর ওখানকার কাজ আরও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে।

এইবার কুয়াইতীদের সম্বন্ধে কিছু বলে প্রবন্ধটি শেষ করব। কুয়াইতীরা সত্যকারের মরুভূমির আরব। এদের বেশীর ভাগই আদিতে বেদুইন ছিল। এছাড়া কিছু আছে ইরানী বংশোদ্ভব। এরা অতীতে দক্ষিণ ইরান থেকে সমুদ্র পার হয়ে কুয়াইতে এসে বসবাস করতে থাকে এবং এরাও কুয়াইতী বলে বিবেচিত হয়। পোশাকে ও কথাবার্তায় আরবদের মত হলেও ঘরে এখনও অনেকেই ইরানী ভাষা বলে। ইরান থেকে তখনও বহুলোক কুয়াইতে আসত এবং বেশীর ভাগ মজুর এরাই ছিল। পরে অবশ্য এই লোক আসা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা হয়। তবু রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে নৌকা করে এরা আসত এবং ধরা পড়লে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে আসবার চেষ্টা করত। বহুলোক মারাও যেত এভাবে, তবু চেষ্টার বিরাম ছিল না, কুয়াইতের ধনদৌলতের আকর্ষণ এতই তীব্র ছিল এই গরীব ইরানীদের পক্ষে!

তেলের কল্যাণে কুয়াইতীরা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী, কিন্তু এ প্রাচুর্য এত তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণ বিনা আয়াসে এসেছে যে এর ফলে সমস্যাও কম সৃষ্টি হয়নি। বলতে গেলে রাতারাতি আলাদীনের অলৌকিক প্রদীপের ছোঁয়ায় একটি অনগ্রসর জাতি প্রায় মধ্যযুগ থেকে একেবারে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে উপস্থিত! ওখানকার একজন ভারতীয় রহস্য করে বলতেন যে, এরা 'Donkey to Dodge' অথবা 'Camel to Cadilac'-এ এসে উপস্থিত হয়েছে মাঝামাঝি সব অবস্থাগুলি ডিঙিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার আপাতদৃষ্টিতে এরা খুব সহজেই এ পরিবর্তনটা মেনে নিয়েছে। অনেক সময় আমার মনে হোত যেন বহুদিন ধরেই ওরা এরকম আধুনিক ও উচ্চ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। আর একটি ব্যাপারে অবাক লাগত যে, এরা পুরোনো কোন জিনিসের প্রতি মমত্ববোধ করত না। সব ভেঙে-চুরে ঝেঁটিয়ে নূতনকে আহ্বান করে এনে বসিয়েছে। আফ্রিকাতেও নূতনের প্রতি এরূপ বলিষ্ঠ মনোভাব দেখেছি। পুরাতনের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধায় অভ্যস্ত আমাদের কাছে এটা আশ্চর্য বলে মনে হোত।

আমি যখন কুয়াইতে যাই, তখনও পুরোনো কুয়াইতের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছি —পুরোনো মাটির বাড়ি, তার দরজা জানালা, ইত্যাদি। কিন্তু চোখের সামনে সেগুলি ধূলিসাৎ করা হোল। শুধু তাই নয়, তেল আসার পর প্রথম যুগে যে সব বাড়িঘর তৈরী হয়েছিল, সেগুলিও যথেষ্ট আধুনিক নয় বলে ভেঙে ফেলা হোল। অবশ্য তেলের আয়ের পরিমাণও প্রায় জ্যামিতিক হারে বাড়ছিল, সেটা কাজে লাগাতে হবে ত!

একটা বিষয়ে কুয়াইতীরা হঠাৎ-তেলে-বড়লোক-হওয়া অন্যান্য অনেক আরব দেশ থেকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। তেলের বিপুল আয় শুধু আমীর ও তার পরিবারবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণের মধ্যে এর বেশ কিছুটা বণ্টন করেছে। এটা তিনটি অভিনব

উপায়ে করা হয়েছে : প্রথম, কুয়াইতীদের সরকারী চাকুরি দিয়ে। যে কোন কুয়াইতী চাকুরি চাইলেই তাকে তা দিতে হবে এবং তার মাইনেও বেশ ভাল, তা সে ব্যক্তি কাজ জানুক আর নাই জানুক! দরকার হলে পরে তাকে শিখিয়ে নেওয়া হোত। দ্বিতীয়তঃ, কোন বিদেশী কুয়াইতে ব্যবসা করতে চাইলে তাকে একজন কুয়াইতী অংশীদার নিতে হবে এবং তার ভাগ অন্ততঃ অর্ধেক হবে। এর ফলে বহু কুয়াইতী স্রেফ নামমাত্র অংশীদার হয়ে এবং কোন মূলধন অথবা পরিশ্রম না জুগিয়ে বিদেশীদের কাছ থেকে মোটা টাকা পেত। কেননা কুয়াইত বস্তুতঃ একটি নিষ্কর বন্দর (Free Port) হওয়াতে এবং অন্য কোন প্রকার কর, বিশেষতঃ আয়কর, না থাকাতে এখানে ব্যবসা করা খুব লাভজনক ছিল। তৃতীয়তঃ, কুয়াইত সরকার সাধারণ কুয়াইতীদের কাছ থেকে অনেক উঁচু দামে জমি কিনত, যে জমি সম্পূর্ণ মরুভূমি এবং আসলে যার কোন অর্থনৈতিক মূল্যই নেই। শহর তৈরী ও বাড়াবার নামে এটা করা হোত। এর ফলে সাধারণ গরীব কুয়াইতীরা অনেক টাকা পেত। অবশ্য দেশে অনেক ধনী কুয়াইতী ও শেখরাও ছিল। এরা সরকারকে অনেক জমি বিক্রি করে অথবা নিজেরা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিল। এরা বিলাসব্যসনে অভাবনীয়রূপে অর্থব্যয় করত দেশে এবং বিদেশে। আমি একজন শেখের কথা জানি যিনি তাঁর লেবাননীয় স্ত্রীকে খুশি রাখবার জন্য মরুভূমির মধ্যে একটি অপূর্ব সবুজ প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এবং বহু অর্থব্যয় করে তার সংলগ্ন ভূমিতে একটি বন তৈরী করেছিলেন।

যাহোক, কুয়াইতে শুধু যে শীর্ষস্থানীয় শেখদের ঘরেই টাকা ছিল তা নয়, সাধারণ লোকের হাতেও প্রচুর অর্থ ছিল এবং সেজন্য ওখানে কোন অসন্তোষ ছিল না। তার উপর আমি থাকাকালীন ওখানে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হোল, যার ফলে জনসাধারণকে ক্ষমতার অংশীদার করা হোল নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলের মাধ্যমে। অবশ্য আমীর ও তার পরিবারের হাতে শেষ পর্যায়ের ক্ষমতা থেকে গেলেও জনসাধারণ অনেক ব্যাপারেই ক্ষমতার অধিকারী হোল।

এ প্রসঙ্গে কুয়াইতের তদানীন্তন আমীর শেখ আবদুল্লা-আল-সালাম-আল-সাবাহ্'র কথা না বললে আমার লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কুয়াইতের যা কিছু উন্নতি—শুধু রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ির উন্নতিই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উচ্চতর রাজনৈতিক বিকাশ—এর সব কিছুর মূলে ছিলেন এই মানুষটি। সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং পোশাকে ও ব্যবহারে অতি সাধারণ লোকের মতো ছিলেন এই শেখ আবদুল্লা। অন্যদিকে একজন অসাধারণ নেতা ছিলেন পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ধনী। যদিও তাঁর পরিবারের কেউ কেউ পরম বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করত, তিনি নিজে অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন—এমন কি ঘর ঠাণ্ডা করার জন্য 'এয়ারকনডিশনিং'-এর ব্যবস্থা পর্যন্ত করতেন না তাঁর বাসগৃহে। একটি সাধারণ খাটে অতি সাধারণ বিছানায় তিনি শুতেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁর জীবন সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত ছিল।

শেখ আবদুল্লা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের ভালবাসতেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে অফিসের কাজে এবং সবসময়ই হৃদ্যতাপূর্ণ অতি অমায়িক ব্যবহার পেয়েছি তাঁর কাছে। যখন অন্যান্য শেখ ও ধনী কুয়াইতীরা ওখানকার ভয়াবহ গ্রীষ্মকে এড়াবার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা অথবা নিদেনপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যের ভোগ-কেন্দ্র লেবাননে বেড়াতে যেতেন, শেখ আবদুল্লা কেবল বোম্বাইতে আসতেন এবং বিকেলে বেড়াতে বের হয়ে মেরিন ড্রাইভের একটি বেঞ্চিতে অতি সাধারণভাবে বসে থাকতেন। সঙ্গে মাত্র দু-এক জন অনুচর থাকত এবং কেউ জানতেও পারত না

যে, এই বৃদ্ধ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং তাঁর দেশের মাটির তলায় রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর অর্থনৈতিক জীবনের জন্য একটি অতি মূল্যবান সম্পদ।

আমি ওখানে থাকাকালীন শেখ আবদুল্লা মারা যান ১৯৬৫ সালের শেষদিকে। তাঁর মৃত্যুতে ওদেশের জনসাধারণ তাদের সত্যকারের হিতকারী পিতাকে হারাল। তাঁর আড়ম্বরহীন অতি সাধারণ, শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে গিয়ে যে বিরাট জনসমাবেশ এবং তাদের যে গভীর আন্তরিক শোক দেখেছি তা অবর্ণনীয়। এই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী ধনী ব্যক্তিটির স্মৃতি আমার কুয়াইত-বাসের একটি পরম সম্পদ।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয়পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্রণার **উত্তরোত্তরবর্ধমান** *রূপ* **ভক্তগণের নিকট ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। কিন্তু যাঁকে নিয়ে সকলে** ভাবিত বা যাঁর শারীরিক অবস্থাও দুর্বোধ্য বলে বিমূঢ়, তিনি সর্বক্ষণ জীবহিতার্থে আত্মনিয়োজিত। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র শুনেছিলেন তাঁর স্বমুখে, 'যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি, তাহাও সার্থক বোধ করব।'[১] ঈশ্বর ও ঈশ্বরনির্যাস অমৃতত্বে মানুষকে পৌঁছে দেওয়া যেন তাঁর দায়। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর-মনের অদৃশ্যপূর্ব অবস্থা ব্যাখ্যা করে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত পরবর্তী কালে বলেছিলেন: "ঠাকুরের শরীরের অত কষ্ট কিন্তু এক সেকেণ্ডের জন্যও ভোলেন নাই ঈশ্বরকে। কত ভালবাসা হ'লে এটি হয়। যেই একটা কথা হ'ল, কি গান হ'ল—যে কোন ঈশ্বরীয় বিষয় হউক না অমনি দপ্ করে যেন জ্বলে উঠতো ঈশ্বরীয় ভাব। যেন দেশলাই, একটু ঘষা পেলেই জ্বলে ওঠে। তখন মন দেহেতে নেই, ঈশ্বরে নিমগ্ন। 'মা, মা' বলে *বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন* ঈশ্বর যখন মানুষ-শরীর নিয়ে আসেন কেবল তখনই এই অবস্থা সম্ভব। অপরের পক্ষে অসম্ভব।"[২]

সেদিন সোমবার, ২০শে মাঘ, পৌষকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। স্কুলফেরত মাষ্টারমশাই কাশীপুরের পথে দেখতে পান পাইকপাড়া রাজবাড়ীর সামনে গঙ্গাসাগর মেলা হতে প্রত্যাবৃত্ত এক বালযোগীকে। বেলা সাড়ে চারটা পেরিয়ে গেছে।

মাষ্টারমশাই কাশীপুরে বাগানবাড়ীতে পৌঁছান। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহব্যাধির প্রবল প্রকোপ। সেবকেরা রোগীর ঘরে লোকজনের যাওয়া-আসা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেন। মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরের দরজার সামনে অপেক্ষা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক শশীকে জিজ্ঞাসা করেন: **কবিরাজ দিগেছে?**

শশী: (না দিয়ে যান নি, এখনও; তাঁর কাছে) যাব?

১ রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারের সাপ্তাহিক সভায় ২৯।৮।১৮৯৭ তারিখে গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রদত্ত ভাষণ।

২ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ: শ্রীম-দর্শন, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৩২৩-২৪

শ্রীরামকৃষ্ণ আধাসম্মতি জানান। মাষ্টারমশাই ঘরে ঢোকেন। তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: **তুমি কি রকম দেখছো?**

মাষ্টার: দুদিন [রোগটা] একটু বেড়েছে—রাতে কাশি, ঘুম হয় নি···কবিরাজ আসছেন [তিনি যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন]।

বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ মাষ্টারকে আবার জিজ্ঞাসা করেন: **তুমি কি রকম দেখছো?**

মাষ্টার নীরব থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় শুয়ে পড়েন। এবার মাষ্টার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর ছেড়ে নীচের তলায় যান, দানাদের ঘরে উপস্থিত হন। ত্যাগী যুবকদের মানসপটে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ভগবানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। তাঁদের শরীর-মনে কাজেকর্মে সে-ভাবের ব্যঞ্জনা। যাঁকে আশ্রয় করে, যাঁর কৃপা-ভিখারী হয়ে এত সাধনভজন, তিনিই যেন তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সে-সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরই উৎসাহ ও আগ্রহে নরেন্দ্রপ্রমুখ তাপসগণ তপস্যার তীব্রতার গহনে প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে অন্যতম সঙ্গী স্বামী সারদানন্দ তাপস নরেন্দ্রনাথের তৎকালীন মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছিলেন, '···তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক উন্নতির কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানাপ্রকার সাধন করিতেছেন।'[৩] সেবকদের এধরনের আচরণ কারুর কারুর নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। এর ব্যাখ্যাস্বরূপই যেন সেবক লাটু বলেছিলেন, 'শরোট্ ভাই বলত—আমরা বুঝি আর না বুঝি, এর মধ্য দিয়ে একটা মহান উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে।'[৪]

'দানা'দের ঘর। কালীপ্রসাদ ও নরেন্দ্রনাথ যেন শিষ্য ও গুরু। এমনই সম্পর্ক তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে কালীপ্রসাদ স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ আমার অপেক্ষা প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল।···আমি যে তাহাকে শুধু ভালবাসিতাম তাহা নহে, তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। বলিতে গেলে আমি নরেন্দ্রনাথের ছায়ার মতো সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম এবং নরেন্দ্রনাথ যাহা করিত আমিও নির্বিবাদে তাহা করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যাহা করিতে বলিত অকুণ্ঠিত হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম।···এই সকল বিষয়ে নরেন্দ্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত, তখন আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্দ্রনাথ যেমনটি ভাবে ও সুরে মোহমুদ্গর, কৌপীনপঞ্চক, বিবেকচূড়ামণি ও অষ্টাবক্রসংহিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিত আমিও অনুরূপ করিতাম।'[৫]

কালীপ্রসাদ সুর করে বিবেকচূড়ামণি আবৃত্তি করছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে ধরেন: একটু গান না!

শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গনে মাষ্টারমশাই অন্যতম গায়ক। গায়ক মাষ্টারমশায়ের চরিত্রের সুস্পষ্ট কয়েকটি পর্যায় আমরা দেখতে পাই। সুকণ্ঠ মাষ্টারকে দেখি লাজুক প্রকৃতির, অপরের সম্মুখে গান গাইতে তাঁর খুবই সঙ্কোচ। একদিন গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট অভিযোগ করেন:

৩ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৬২ সাল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৭

৪ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, উদ্বোধন, পৃঃ ২৪২

৫ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৬-৮৭

'মাষ্টার কোনমতে গান গাইছে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিরক্তিপ্রকাশ করেই মন্তব্য করেন: ও স্কুলে দাঁত বার করবে; গান গাইতে যত লজ্জা। মাষ্টার মুখ চুন করে বসে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি মাষ্টারমশাই গান শিখছেন জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হয়েছেন। বলেন, "তোমার ওটা অভ্যাস আছে? থাকে ত বল না। 'আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে।'" তৃতীয় পর্যায়ে দেখি তিনি সুগায়ক, সঙ্গীতের সমঝদার। বেশ কয়েকদিনের ঘটনাই উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্যামপুকুরের বাটীতে একদিন মাষ্টারমশাই একক ও মিলিতভাবে দশটি গান পরিবেশন করে সকলকে তৃপ্ত করেছেন। আবার অনেকক্ষেত্রেই দেখি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মধুমাখা কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গেয়েছেন। মাষ্টারমশায়ের সুর ও বাণীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠত তাঁর অধ্যাত্ম ভাব-ব্যঞ্জনা, তাঁর ভক্তহৃদয়ের আকৃতি।

আজকের আসরে নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে মাষ্টারমশাই গান ধরেন —

হরিকাণ্ডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে।
পার করেন দীনজনে অধমতারণ চরণ দিয়ে॥
তরণীর এমনি গুণ নাইকো হাল তার নাইকো গুণ।
চলে সে আপনি তরী অধমতারণ চরণ পেয়ে॥[৬]

নরেন্দ্র এ-গানে তৃপ্ত হন না। তিনি মাষ্টার-মশায়কে বলেন: ও না—আপনি 'গেরুয়া বসন' গানটি করুন।

সমঝদার শ্রীরামকৃষ্ণের বিচারে 'মাষ্টারের মেয়ে সুর।' মিহি সুরে তিনি গান ধরেন,

আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি॥

এরপর রাধাকৃষ্ণভাবে মাতোয়ারা নরেন্দ্রনাথকে তিনটি গান গেয়ে শোনান মাষ্টারমশাই।

(১) 'শ্যামের বাঁশরী' ইত্যাদি।
(২) 'রাধে গোবিন্দ জয়' ইত্যাদি।
এবং (৩) 'নিবেদন আর কিছু চাই না।' ইত্যাদি।

গান শুনে নরেন্দ্রনাথের ভাবান্তর—বিহ্বলভাব পরিলক্ষিত হয়। এই ভাবঘন পরিবেশের মধ্যে সুরেশচন্দ্র মিত্র একটি ভজন গান শুরু করেন। নরেন্দ্র স্থানান্তরে যান।

পরবর্তী দৃশ্য। দানাদের ঘর। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও ত্যাগী তাপসদের কয়েকজন উপস্থিত। সুরেন্দ্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'সুরেন্দর', কখনও বা সুরেশ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গনের অর্ধেক রসদদার ছিলেন। ডস্ট্ কোম্পানীর মুৎসুদ্দীর কাজ করতেন। সিমলায় নরেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী। মুরুব্বী ব্যক্তি। তিনি নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন: Examination দেবে,[৭] এখন কি সাধুগিরি কর্ম নিয়ে মাতামাতি কর্তে হয়?

নরেন্দ্র সরাসরি উত্তর দেন না। ভাবের রেশ ধরে তিনি সুরেলা কণ্ঠে গান ধরেন—

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
ইত্যাদি।

নরেন্দ্রের অন্তররাজ্যে ভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর মনের ভাব যেন 'নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।' সুরেন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

৬ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত 'গীতিগুচ্ছ', পাটনা, ১৩৩৬, পৃঃ ১৭৩

৭ এখানে বি. এস. পরীক্ষার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সাধনভজনের তোড়ে এ-পরীক্ষা নরেন্দ্রনাথের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

নরেন্দ্র তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলেন: [এসব ভেবে কি হবে ?] যাঁর কাছে আমরা [রয়েছি] তিনি তো সব তাতে হাঁ দিচ্ছেন—আমরাও তাই দিই না কেন ?

মত-সংঘর্ষের ধূলোবালি উড়বার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথের উদারভাবের মলয় হাওয়া পরিবেশকে নির্মল করে তোলে। কথাবার্তা বেশীদূর অগ্রসর হবার পূর্বেই নরেন্দ্র একপাশে সরে যান। প্রেমে মাতোয়ারা তিনি। দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভৈরবী মিশ্র —একতালা গান ধরেন—

আমি প্রেমের ভিখারী
কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়,
যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা
তাই তো আমি এলাম হেথা।
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥[৮]

মাষ্টারমশাই ভাবের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের সুরেলা কণ্ঠের সাথে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দেন।[৯] [ক্রমশঃ]

৮ গিরিশচন্দ্র ঘোষ: ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী (প্রথম ভাগ), ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৭০

৯ এ লেখার অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৮৫৩-৫৪

প্রসঙ্গত

অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ সংখ্যায় 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস' প্রবন্ধে ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ লিখিয়াছেন, "এই ফরাসী বা 'ফ্রেঞ্চ'-চর্চা স্বামীজী প্রথম কখন শুরু করেছিলেন ? মনে হয় প্রথমবার আমেরিকায় থাকতেই।" (পৃঃ ৬২০)

প্রকৃত তথ্য কিন্তু এই যে, স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকাযাত্রার পূর্বেই ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ যখন পোরবন্দরে কয়েক মাস ছিলেন, তখনই সেখানকার দেওয়ান শ্রীশঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের পরামর্শে ফরাসীভাষা অনেকটা আয়ত্ত করেন। ('যুগনায়ক বিবেকানন্দ', প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৪২)। 'শিবানন্দ-বাণী'র দ্বিতীয় ভাগে (২য় সং, পৃঃ ৪৫-৪৬) এ বিষয়ে যে বিস্তারিত বিবরণ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, স্বামীজী পাণ্ডুরঙ্গ মহাশয়ের নিকটই ফরাসীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং ঐ ভাষায় চার পাতার একটি পত্র লিখিয়া আলমবাজার মঠে গুরুভাইদের নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্র শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি উহা বাংলায় অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেন।

প্রবন্ধটির সম্পাদনাকালে লেখকের বাক্যে যে ত্রুটি আছে, তাহা আমাদের নজর এড়াইয়া যাওয়ায় আমরা দুঃখিত। এ বিষয়ে শ্রীলোকেন্দ্রনাথ বসু উল্লিখিত তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

—সংযুক্ত সম্পাদক

মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার ধর্ম

ডক্টর রমণীমোহন শর্মা

পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে ত্রিপুরায় (বৃটিশ আমলে যাকে পার্বত্যত্রিপুরা বলা হতো) মাণিক্য শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মাণিক্যবংশীয় রাজা মহামাণিক্যই (খ্রীঃ ১৪০০-১৪৩০) এর প্রতিষ্ঠাতা। এই রাজবংশীয় রাজারা বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাজত্ব করে গেছেন। রাজাদের ধর্মমত অনেক সময় জনসাধারণের ধর্মমতকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। সুতরাং এই বংশের রাজাদের ধর্মমত ও ধর্মীয় কার্যকলাপ আলোচনা করলে মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরার ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য জানা যেতে পারে। বলা দরকার, মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরার ধর্মই বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য। 114976

মাণিক্যযুগের শিলালেখ, তাম্রলেখ এবং ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজমালার (১) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরায় বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হতো। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ত্রিপুরাধীশ ধন্যমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৯০-১৫২০) এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে উদয়পুরস্থিত (২) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের একটি শিলালেখে আভাসিত। এই যজ্ঞে নাকি স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন বলে উক্ত শিলালেখে উল্লিখিত। এই রাজবংশের প্রথম বিজয়মাণিক্য (খ্রীঃ ১৫৩২-৬৩), অমর-মাণিক্য (খ্রীঃ ১৫৭৭-৮৫), কৃষ্ণমাণিক্য (খ্রীঃ ১৭৬০-৮৩) প্রমুখ রাজারা তুলাপুরুষ, কল্পতরু ও অন্যান্য দানাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে রাজমালায় বিধৃত। তাম্রলেখ, শিলালেখ ও রাজমালা থেকে রাজাদের বহু ভূমিদানের কথাও জানা যায়। আর জানা যায় মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ছাড়া দেবদেবীর পূজার ব্যয়-সংকুলানের জন্যে ব্রাহ্মণদের করমুক্ত ভূমিদানের কথা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অমরমাণিক্য ব্রাহ্মণদের করমুক্ত বহু তালুক দান করেছিলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেবদেবীর পূজার ব্যয়-সংকুলান। কল্যাণমাণিক্য (খ্রীঃ ১৬২৬-৬০) ভগবতী দেবীর পূজা পরিচালনার জন্যে বিশ্বনাথ শর্মাকে নিযুক্ত করা ছাড়া পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্যে রাজকোষ থেকে অর্থদানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভূমিদানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতো। মাণিক্য-রাজারা ভূমিদানের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথম ধর্মমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৩১-৬২), প্রথম রত্নমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৬৪-৮৮), ধন্যমাণিক্য, প্রথম বিজয়মাণিক্য, কল্যাণমাণিক্য প্রমুখ নরপতিগণের উল্লেখ করা যায়। প্রথম ধর্মমাণিক্য শস্যপূর্ণ ২৯ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, যার প্রমাণ মেলে তাঁর ১৩৮০ শকের তাম্রশাসনে। রাজমালাতে প্রথম রত্নমাণিক্যের বহু দানাদি পুণ্যকাজের উল্লেখ আছে। ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের শিলালেখ থেকে জানা গেছে ধন্যমাণিক্য ছিলেন দানে কর্ণসম। প্রথম বিজয়মাণিক্যের ৫ দ্রোণ ভূমিদানের কথাও এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। পাত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বাধাদান সত্ত্বেও রাজধরমাণিক্য (খ্রীঃ ১৫৮৬-১৬০০) যে ব্রাহ্মণদের বহু ভূমিদান করেছিলেন রাজমালার পাঠক তা বিলক্ষণ জানেন। কল্যাণ-

মাণিক্যের ১৫৭৩ শকের তাম্রশাসন থেকে জানা যায় তিনি মুকুন্দ বিদ্যাবাগীশকে ১০০ দ্রোণ করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। রাজমালাও তাঁর বহু ভূমিদানের সাক্ষ্য দেয়। কল্যাণমাণিক্যের পরবর্তী ভূমিদানকারী রাজাদের মধ্যে গোবিন্দ-মাণিক্য (১৬৬০-৭৩), দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৪-২৯), মুকুন্দমাণিক্য (১৭২৯-৩৯), কৃষ্ণমাণিক্য (১৭৬০-৮৩) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাও পুণ্যকাজ বলে গণ্য হতো। অধিকাংশ ভূপতিরা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধন্যমাণিক্যের ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভুবনেশ্বরী মন্দির (৩), কল্যাণমাণিক্যের গোপীনাথের মন্দির (শক ১৫৭২), গোবিন্দমাণিক্যের ১৫৮৩ শকের বিষ্ণু-মন্দির, রামমাণিক্যের ১৫৯৫ শকের বিষ্ণুমন্দির, ইত্যাদি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। সুতরাং মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরায় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের, বিশেষতঃ বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাণিক্যরাজত্বে ত্রিপুরায় শৈবধর্মের প্রসার থাকার প্রকৃষ্ট পরিচয় মেলে রাজমালা ছাড়া শিলা-লেখ এবং রাজাদের বিভিন্ন মুদ্রার উপরের লেখা থেকে। প্রথম রত্নমাণিক্যের ১৩৮৬ শকের মুদ্রায় 'পার্বতীপরমেশ্বর' লেখা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে এই নৃপতির শাসনকালে ত্রিপুরায় শিবপূজার প্রচলন ছিল। ধন্যমাণিক্য ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শৈব এবং শৈবধর্মের যথার্থ পৃষ্ঠপোষকদের একজন। ষোড়শ শতকের প্রথম বিজয়মাণিক্যও ছিলেন শৈবধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এই নৃপতির ১৪৫৪ শকের মুদ্রার একপিঠে 'ত্রিশূল', ১৪৮২ শকের মুদ্রায় 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তি এবং ১৪৮৫ শকের মুদ্রায় 'শিবলিঙ্গ' দৃষ্ট হওয়াতে সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে তাঁর রাজত্বকালে শৈবধর্মের প্রাধান্য ছিল। রাজমালার পাঠকমাত্রেই জানেন যশো-মাণিক্য (খ্রীঃ ১৬০০-২৩) ছিলেন একজন পরম শৈব। তিনি কাশীধামে একমাস কাল বসবাস করে পূজার্চনার মাধ্যমে শিবের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বলে রাজমালায় বিধৃত। একই উৎস থেকে জানা গেছে, কল্যাণ-মাণিক্য মুদ্রার একপিঠে নিজের নাম এবং অপর পিঠে 'শিবলিঙ্গ' ক্ষোদিত করে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। তাঁর ১৫৪৮ শকের মুদ্রা এর পরিপোষক, কেননা এই মুদ্রায় তাঁর নিজের নামছাড়া শিবলিঙ্গও ক্ষোদিত রয়েছে। এসব কল্যাণমাণিক্যের শৈব-ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচায়ক। সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে অষ্টাদশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যন্ত ত্রিপুরায় শৈবধর্ম জনপ্রিয় থাকার সংশয়াতীত প্রমাণ রয়েছে ঐ সময়কার রাজাদের বিভিন্ন মুদ্রায়। ছত্রমাণিক্যের (১৬৬১ খ্রীঃ) ১৫৮৩ শকের মুদ্রার উপরে লেখা হরগৌরী, রামমাণিক্য (১৬৭৩-৮১), দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, দ্বিতীয় জয়মাণিক্যের যথাক্রমে ১৫৯৮, ১৬০৩ ও ৬৬৮ শকাব্দের মুদ্রায় শিবলিঙ্গের উপস্থিতি এবং দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য, কৃষ্ণমাণিক্য, দ্বিতীয় রাজধর-মাণিক্য, রামগঙ্গামাণিক্য প্রমুখ রাজাদের বিভিন্ন শকের, যেমন—১৬৩৬, ১৬৮২, ১৭০৭, ১৭২৮ এবং ১৭৪৩, মুদ্রায় 'শিবদুর্গা' লেখা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঐ সময়ে ত্রিপুরায় শৈবধর্ম মর্যাদার আসনে সমাসীন ছিল।

মুদ্রালেখ ছাড়া শিলালেখেও মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরায় শিবপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার অনেক নিদর্শন মিলেছে। ধন্যমাণিক্যের উদয়পুরস্থিত মহাদেব-মন্দিরের শিলালেখ এর বিশেষ দৃষ্টান্ত। কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। তাঁর ১৫৭৩ শকের শিলালেখ এর সঠিক উদাহরণ। গোবিন্দমাণিক্যের বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত চট্টগ্রামের 'চন্দ্রশেখর' নামে শিবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মন্দিরও এপ্রসঙ্গে

স্মরণীয়। এসব মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাণিক্য-নরপতিগণ শৈবধর্মের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্যই শুধু নিবেদন করেননি, এর পৃষ্ঠপোষকতাও করেছিলেন।

মাণিক্যযুগে ত্রিপুরায় শংকর (দয়ালু), পরমেশ্বর (শ্রেষ্ঠ প্রভু), হর, শিব (শিবের কল্যাণময় রূপ), চন্দ্রশেখর, অর্ধনারীশ্বর (শিব-শক্তির এক দেহে অধিষ্ঠান), ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে শিবপূজার প্রচলন ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন শিলালেখ ও মুদ্রালেখে যাদের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আগেই করেছি। এসব নামে শিবপূজা শৈবধর্মের জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে।

আর একটি স্মরণীয় তথ্য এই, মাণিক্যযুগের ত্রিপুরায় 'শিবলিঙ্গ' পূজার বহুল প্রচলন ছিল। উপরি-উক্ত মাণিক্যরাজাদের মুদ্রায় 'শিবলিঙ্গ' ক্ষোদিত থাকায় এই সিদ্ধান্ত। উদয়পুরস্থিত মহাদেব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ মাটিতে আজও প্রোথিত আছে, এই তথ্যটিও এ সূত্রে স্মরণীয়। ধন্য-মাণিক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবলিঙ্গ পূজা করতেন বলে রাজমালা-সমালোচক রেভারেণ্ড জেমস লং (৪) উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মশাই শৈবধর্মকে ত্রিপুরার আদি-ধর্মরূপে উল্লেখ করেছেন। উপরি-উক্ত আলোচনার নিরিখে বলা চলে যে, মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরায় শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বেশ দৃঢ় ছিল।

মাণিক্যরাজাদের শাসনাধীন ত্রিপুরায় শৈব-ধর্মের মতো শক্তিপূজারও বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। শক্তির ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে পূজা আজও চলছে ত্রিপুরায়। তন্ত্রানুসারে ত্রিপুরাসুন্দরীদেবী ত্রিপুরাদেবীর সঙ্গে যুক্ত। শক্তিপূজার বিশিষ্ট প্রমাণ মেলে মাণিক্যরাজাদের বিভিন্ন মুদ্রায়। প্রথম রত্নমাণিক্যের ১৩৮৬ শকের মুদ্রায় লেখা 'শ্রীদুর্গারাধানাপ্তবিজয়' ও 'পার্বতী-পরমেশ্বরচরণ-পরৌ' তাঁর আমলের ত্রিপুরায় দুর্গা এবং পার্বতী-রূপী শক্তিপূজার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শৈব ধন্য-মাণিক্যের উদয়পুরস্থিত ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভুবনেশ্বরী মন্দির দুটি তাঁর অসামান্য কীর্তি। তিনি চট্টগ্রাম থেকে কালীমূর্তি এনে উক্ত ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে রাজমালাতে বিবৃত। কালীমূর্তিখানি বড় আকারের একখণ্ড উৎকৃষ্ট কষ্টিপাথর কেটে তৈরী করা হয়েছে। প্রতিমার সুডোল গঠন, কমনীয় কান্তি, অনিন্দ্য-সুন্দর মুখমণ্ডল নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালের ভাস্কর্য-নৈপুণ্যের সার্থক পরিচয়। এক মন সোনা দিয়ে ভুবনেশ্বরীর মূর্তি গড়ানো তাঁর আর একটি অনন্য-সাধারণ কীর্তি। এসব ধন্যমাণিক্যের শাক্তমতের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় বহন করা ছাড়া শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও সূচিত করে। গৌরী-রূপে শক্তিপূজার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল প্রথম বিজয়-মাণিক্য, যশোমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্যের আমলে। ছত্রমাণিক্যের ১৫৮৩ শকের মুদ্রায় 'হরগৌরী' লেখা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তাঁর শাসনকালে গৌরীরূপী শক্তির পূজা হতো। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত দুর্গাপূজার বিশেষ প্রচলন ছিল ত্রিপুরায়। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য, কৃষ্ণমাণিক্য, দ্বিতীয় রাজধর-মাণিক্য, রামগঙ্গামাণিক্য প্রমুখ রাজাদের মুদ্রার একপিঠে 'শিবদুর্গা-পদে' লেখা রয়েছে। এজন্যেই এরূপ সিদ্ধান্ত। উপরের এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ত্রিপুরাসুন্দরী, কালী, দুর্গা, গৌরী, চণ্ডী, ভুবনেশ্বরী, ইত্যাদি রূপে মহাশক্তি পূজার বিশেষ প্রচলন ছিল মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরায় এবং আজও আছে।

শৈব ও শাক্তধর্মের মতো বৈষ্ণবধর্মমতও মাণিক্যযুগে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরায় এই ধর্মের জনপ্রিয়তার পর্যাপ্ত প্রমাণ মাণিক্য-নরপতি-গণের বিভিন্ন শিলালেখ, মুদ্রালেখ ও রাজমালায় বিধৃত। রাজমালার পাঠকমাত্রেই জানেন প্রথম রত্নমাণিক্যের নারায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

এই নৃপতির তারিখবিহীন ও তারিখযুক্ত মুদ্রায় যথাক্রমে 'শ্রীনারায়ণচরণপরঃ' ও 'নারায়ণ' লেখা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রথম রত্নমাণিক্য ছিলেন নারায়ণের পরম ভক্ত। মুকুটমাণিক্যের (১৪৮৯-৯০) ১৪১১ শকের মুদ্রার একপিঠে 'নরনারায়ণে শ্রীশ্রীমুকুটমাণিক্য' লেখা থেকে এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে মুকুটমাণিক্য ছিলেন নারায়ণরূপী বিষ্ণুর একনিষ্ঠ সেবক এবং জনসেবাই যে নারায়ণের সেবা তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। শৈব ও শাক্তধর্মের উদার পৃষ্ঠ-পোষক ধন্যমাণিক্যও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ করেছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্য (১৫২০-১৫৩০) প্রথম জীবনে জগন্নাথের (বিষ্ণুর অপর রূপ) একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বলে অনুমান। অনুমানের কারণ তিনি এক মহামূল্য শিরোভূষণ জগন্নাথের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এটাও ঐ সময়ে বিষ্ণুপূজা প্রচলিত থাকার পরিচয়বহ। দেবমাণিক্য তাঁর শাসনকালের শেষপর্বে মৈথিলী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণের সংস্পর্শে এসে একজন তান্ত্রিকে পরিণত হন। অনুমান করি দেবমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। তাঁর পরবর্তী রাজা প্রথম বিজয়মাণিক্যের আমলে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং তিনি নিজে ছিলেন একজন পরম বৈষ্ণব যদিও বা শৈব ও শাক্তধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেহাত কম ছিল না। বিজয়মাণিক্যের ১৪৮৫ শকের মুদ্রায় ক্ষোদিত বিষ্ণুমূর্তিবহনকারী গরুড়ের অবয়ব এর প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত। এছাড়া এই রাজার ১৪৭০ শকের মহারানী শিলালেখ এবং হীরাপুরের (উদয়পুরের কাছাকাছি স্থান) বিষ্ণুমন্দির তাঁর বিষ্ণুপ্রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আর একটি উল্লেখ-যোগ্য তথ্য এই যে ঐ সময়ে সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ (প্রধান সেনাপতি) এক মন্দির নির্মাণ করে সেখানে একটি জগন্নাথ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। বলা প্রয়োজন, সেনাপতিমশাই মূর্তিখানা উৎকল (বর্তমান ওড়িশা) থেকে এনেছিলেন। এসব উদাহরণ প্রথম বিজয়-মাণিক্যের আমলের ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্মের জনপ্রিয়তার সুনিশ্চিত প্রমাণ। অমরমাণিক্য জগন্নাথের মন্দির নির্মাণের মাধ্যমে বিষ্ণুর প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। অমরমাণিক্যের উত্তরাধিকারী ও পুত্র রাজধর-মাণিক্য (১৫৮৬-১৬০০) কৃষ্ণমন্ত্রে শুধু দীক্ষাই নেননি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মন্দিরও দান করেছিলেন। তাছাড়া, অহোরাত্র হরিনাম সংকীর্তনের জন্যে ৮ জন সুগায়কও নিযুক্ত করেছিলেন। ১৫২২ শকের মুদ্রার একপিঠে ক্ষোদিত ত্রিপুরাসিংহের উপর বাঁশীবাদনরত কৃষ্ণের মূর্তি তাঁর কৃষ্ণপ্রীতি প্রমাণ করে। শৈব কল্যাণমাণিক্যের ১৫৭২ শকের গোপীনাথের মন্দিরের শিলালেখ তাঁর বৈষ্ণবধর্মের প্রতি সম-শ্রদ্ধাশীল থাকার প্রমাণস্বরূপ। কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গোবিন্দমাণিক্য শুধু শিবমন্দির নির্মাণ করেননি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যেও ১৫৮৩ শকে এক অনুপম সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে গোবিন্দ-মাণিক্যের ধর্মপ্রাণা মহিষী গুণবতী মহাদেবী যে অতুলনীয় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাও এসূত্রে স্মরণযোগ্য। সুতরাং বলা চলে গোবিন্দমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল এবং এই উৎকর্ষের মূলে ছিল রাজারানীর একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা। রামমাণিক্যের ১৫৯৯ শকের বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের শিলালেখ তাঁর বিষ্ণুপ্রীতির সাক্ষ্য দেয়। কৃষ্ণমাণিক্যের রাজত্বকালেও বৈষ্ণবধর্ম প্রচলিত ছিল যার সঠিক প্রমাণ হিসাবে পঞ্চরত্নমন্দিরের উল্লেখ করা যায়। বলা দরকার, বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদনের জন্যে মন্দিরটি তাঁর ধর্মপরায়ণা সহধর্মিণী জাহ্নবীদেবী উৎসর্গ করে-

ছিলেন। এই মন্দিরের শিলালিপি বর্তমানে আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে। দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্য (১৭৮৫-১৮০৬) বৃন্দাবনে 'বৃন্দাবনচন্দ্র'মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে রামগঙ্গামাণিক্যের বক্ষোপরি শালগ্রামশিলা স্থাপন করায় অনুমিত হয় যে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্য (১৮৩০-১৮৪৯), ঈশানচন্দ্রমাণিক্য (১৮৪৯-১৮৬২), বীরচন্দ্রমাণিক্য (১৮৬২-১৮৯৬), রাধাকিশোরমাণিক্য (১৮৯৬-১৯০৯), বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য (১৯০৯-১৯১৯), বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য (১৯২০-১৯৪৭) প্রমুখ রাজারা যে সব মুদ্রা প্রবর্তন করেন তাদের একপিঠে বাংলা অক্ষরে 'রাধাকৃষ্ণপদে' লেখা আছে। এই মুদ্রালেখ থেকে কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের শাসনকাল থেকে বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্মে যে রাধাকৃষ্ণের বিশেষ প্রাধান্য ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অনুমান করি, ঐ সময়কার বৈষ্ণবগণ রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের উপাসক ছিলেন। রাধাকিশোরমাণিক্যের জগন্নাথমন্দির, বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্যের লক্ষ্মীনারায়ণমন্দির, এবং বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্যের পুরীর জগন্নাথমন্দিরের সংস্কারসাধনের ঐকান্তিক অভীপ্সা তাঁদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় বহন করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বৈদিকধর্মের অন্তর্গত ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য ছিল মাণিক্যযুগের ত্রিপুরায়। আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল না, বরং সদ্ভাবই ছিল। রাজারা ধর্মবিষয়ে সমন্বয়ী উদার মত পোষণ করতেন। প্রমাণসহ এর বিশদ আলোচনা করা হলেও দু'চারটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পুনরায় প্রদর্শন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শৈব ধন্যমাণিক্য একদিকে যেমন শিবমন্দির নির্মাণ করেছেন অপরদিকে শক্তি ও বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে। প্রথম রত্নমাণিক্য ও প্রথম বিজয়মাণিক্য বৈষ্ণব হলেও সর্বধর্মের প্রতি ছিলেন সম-শ্রদ্ধাশীল যার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আগেই করেছি। মোটামুটিভাবে বলা যায় মাণিক্যবংশীয় রাজারা ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। পরম বৈষ্ণব বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য আগরতলায় বুদ্ধমন্দির ও উমা-মহেশ্বর মন্দির দুটি নির্মাণের মাধ্যমে পরমতসহিষ্ণুতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। মাণিক্যযুগের ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতি যে যথেষ্ট পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল এসব দৃষ্টান্ত তারই পরিচায়ক।

মাণিক্যবংশীয় রাজারা শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের উপাসক ও যথার্থ পৃষ্ঠপোষক হলেও কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতাকে পরিত্যাগ করেননি। বলাবাহুল্য, ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা চতুর্দশ দেবতার পূজা ত্রিপুরাবাসীদের ধর্মীয় জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব ও হিমাদ্রি হলেন এই চতুর্দশ দেবতা। এঁদের কোন সম্পূর্ণ অবয়ব নেই। অষ্টধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত চৌদ্দটি মুণ্ডই পূজা হয়ে থাকে। এঁদের মধ্যে শিবের প্রতীকমুণ্ডটি রজতমণ্ডিত, আর বাকী সবকয়টি স্বর্ণমণ্ডিত। কথিত আছে সুদূর অতীতে ত্রিলোচন নামে এক রাজা এই চতুর্দশ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ত্রিপুরায়। এটা কতটুকু সত্য বা আদৌ সত্য কিনা আজ বলা শক্ত, কেননা এর সমর্থনে কোন

বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আজও মেলেনি। তবে মাণিক্যশাসনের প্রথম পর্বে ত্রিপুরায় চতুর্দশ দেবতার পূজা প্রচলিত থাকার একটি প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে : প্রথম রত্নমাণিক্যের ১৩৮৬ শকের একটি মুদ্রার একপিঠে লেখা রয়েছে 'শ্রীচতুর্দশদেবচরণপর' এবং উপর-নিচে প্রলম্বিত ১৪টি স্তম্ভপংক্তি। ত্রিপুরাতে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই আজও চতুর্দশ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ত্রিপুরাতে এই দেবতাদের পূজা খার্চিপূজা নামে পরিচিত। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি থেকে শুরু হয় এই পূজা, আর চলে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। পূজার প্রধান পূজক 'চন্তাই' এবং অন্যান্য পূজকবৃন্দ 'দেওড়াই' বলে পরিচিত। এটি ত্রিপুরারাজ্যের জাতীয় পূজা।

তথ্যপঞ্জী

(১) ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজমালা বাংলা ভাষায় পয়ার ছন্দে ৪টি খণ্ডে লেখা। বর্তমানে দুটি রাজমালা পাওয়া যায়। এদের একটি ৺কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, নাম শ্রীরাজমালা। শ্রীরাজমালা চারটি লহরে (খণ্ডে) বিভক্ত। রাজমালার আগে 'শ্রী' তিনি নিজেই যুক্ত করেছেন। 'লহর' নামটিও তাঁর দেওয়া। প্রথম তিনটি 'লহর' যথাক্রমে ১৯২৬, ১৯২৭ ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হয়। তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য বাহাদুর (খ্রীঃ ১৯২০-৪৭)। চতুর্থ লহরটি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে, সম্ভবতঃ এখনও প্রকাশিত হয়নি। এই লহরের ছাপানো কাগজগুলো আমি দেখেছি আগরতলার Govt. Museum-এ। সেনমশাই প্রতিটি লহরের প্রথম অংশে দিয়েছেন 'পূর্বাভাষ', তারপর মূল Text এবং পরে 'মধ্যমণি' নামে টীকা। 'মধ্যমণি'-নামকরণ তিনি নিজেই করেছেন।

১ম 'লহরে'র Textটির রচয়িতাগণ বাণেশ্বর, শুক্রেশ্বর ও দুর্লভেন্দ্র চন্তাই। রচনাকাল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। এই 'লহরে'র (Text সহ) পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-৩১৬। তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন প্রথম ধর্মমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৩১-৬২)। ২য় 'লহরে'র রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীতে অমরমাণিক্যের (খ্রীঃ ১৫৭৭-৮৫) শাসনকালে। মূল Text সহ এতে আছে ১-৩৪২ পৃষ্ঠা। ৩য় 'লহর'টি রচিত হয় সপ্তদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের (খ্রীঃ ১৬৬০-৭৩) আমলে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (মূল Text সহ) ১-৩৮০। ৪র্থ 'লহর' উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার। বলা বাহুল্য, সব কটাই বাংলা ভাষায় লেখা। ৪র্থ 'লহরে'র পৃষ্ঠাসংখ্যা ১-১৭৬। ২য় ও ৪র্থ লহরে'র লেখকের নাম অজ্ঞাত। ৩য় 'লহরে'র রচয়িতা সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিধারী প্রাচীন দ্বারপণ্ডিত।

এবারে অপর রাজমালা প্রসঙ্গ। কিছুকাল আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গ্রন্থশালায় রাজমালার একটি প্রাচীন পুঁথির (নং ২২৫৯) সন্ধান মেলে। পুঁথিটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত। এর পত্রাঙ্ক যথাক্রমে ১-৪০ এবং ৪৩-৬৫। ৪১-৪২ সংখ্যক পাতাটি নেই। পৃষ্ঠা ৬০ ছাড়া শেষের পৃষ্ঠার কিছু কিছু অক্ষর পড়া যায় না। তুলট কাগজে লেখা বইটির শিরোনামা এবং লেখকের নাম নেই। নকলকারী হিসাবে রাজনারায়ণদেবের নাম ৪৯ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক তথ্যমূল্যে সমৃদ্ধ এই বইখানি ত্রিপুরার শিক্ষা-অধিকার 'রাজমালা' নামে ১৯৬৭ সালে ছেপে প্রকাশ করেন। বইটি পয়ার ছন্দে বাংলা ভাষায় লেখা।

(২) ত্রিপুরার (বৃটিশ আমলে যাকে পার্বত্যত্রিপুরা বলা হতো) গোমতী নদীর তীরে

অবস্থিত উদয়পুর ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী। ত্রিপুরার গৌরবভূমি উদয়পুরের প্রাচীন নাম ছিল 'রাঙামাটি'। উদয়মাণিক্যের (খ্রীঃ ১৫৬৭-৭২) শাসনকালে এর নাম হয় উদয়পুর। এখানে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী অবস্থিত। পীঠস্থান বলে স্থানটি ভারতবিখ্যাত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় এখানে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হয়েছেন। উদয়পুর ৫১ পীঠের একটি। এই স্থানে রয়েছে ত্রিপুর ভূপতিগণের অনুপম কীর্তি বৃহদাকারের জলাশয় ও দেবদেবীর মন্দির, রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, ইত্যাদি। দেবদেবীর মন্দিরগুলির মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির, ভুবনেশ্বরীমন্দির, মহাদেবমন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) ত্রিপুরাসুন্দরীমন্দিরটি ত্রিপুরাধীশ ধন্যমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৯০-১৫২০) ১৪২৩ শকাব্দে (=খ্রীষ্টাব্দ ১৫০১) লোকজননী অম্বিকাকে (ত্রিপুরাসুন্দরীকে) দান করেন। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে যে দুই খণ্ড শিলালিপি বঙ্গাক্ষরে লেখা আছে তাতে ধন্যমাণিক্যের দ্বারা মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৪২৩ শকাব্দ লিখিত আছে। ভুবনেশ্বরীমন্দিরটির নির্মাণসময় জানা যায়নি। রাজমালাতে উল্লেখ আছে যে ধন্যমাণিক্য এক মন সোনা দিয়ে ভুবনেশ্বরীদেবীর মূর্তি গড়ান ও একটি মন্দির নির্মাণ করে তাতে ভুবনেশ্বরী দেবীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। (উৎস : শেষোক্ত রাজমালা, পৃষ্ঠা ৩১)

(৪) Rev. James Long বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ রাজমালার সমালোচনা করেছেন ইংরেজীতে। *Analysis of the Rajmala* তাঁর লেখা। এটি *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, vol. XIX, 1850-তে প্রকাশিত হয়। Long সাহেবের *Analysis of the Rajmala* ত্রিপুরা ইতিহাসের এক অতি মূল্যবান উৎস।

স্মৃতি থেকে

স্বামী শিবস্বরূপানন্দ

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হবে। সে সময়ে সরস্বতী পূজাও সন্নিকট। স্বামী সম্ভাবানন্দ মিহিজামে থেকে দেওঘর বিদ্যাপীঠের আশ্রম তৈরীর কাজ শেষ করেছেন। যে জমির উপর আশ্রমটি হয়েছে তার নাম 'দর্শনীয়া মাঠ'। আগের দিনের তীর্থযাত্রীরা এই দর্শনীয়া মাঠে তাদের জিনিসপত্র রেখে দূর থেকে তীর্থদেবতা বৈদ্যনাথের মন্দির দর্শন করত। আশ্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠ থেকে ৩০।৩৫ জন সাধুসহ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ একই ট্রেনে দেওঘর যাত্রা করলেন। পূজনীয় মহারাজ নূতন আশ্রমের ঠাকুরঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করবেন। আশ্রম-সংলগ্ন ভক্তের বাড়ী বিপিন কুটীরে তিনি অবস্থান করছেন। হাঁপানির টানে শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও এই শুভ অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন। উৎসবের দিন স্নানান্তে মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছে সেখানে। সেদিন একবার বালানন্দ মহারাজের আশ্রমও ঘুরে এসেছেন। সারাদিনের ব্যস্ততা ও অনিয়মে রাত্রিতে হাঁপানির টান খুব বেড়েছিল। বিপিন কুটীরে তাঁর ঘরে তিনি একাই থাকতেন। পরদিন প্রত্যুষে একে একে

সকলে এসেছেন পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে। দাঁড়িয়ে আছেন স্বামী ওঁকারানন্দ, গঙ্গেশানন্দ, ব্রহ্মচারী জ্ঞান মহারাজ, ভব মহারাজ প্রভৃতি ৩০।৩৫ জন সাধু। সেবকরাও আছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—'সারা রাত হাঁপানির খুব টান ছিল। এত কষ্ট যে কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছিল না। তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম আত্মার তো কোন সুখ-দুঃখ নেই। তখন দেখছি দেহটা সামনে পড়ে আছে, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে আর হাঁপাচ্ছে, আর আমি কিনা খুব আনন্দ করছি।' মহারাজ তখন সোজা হয়ে বসলেন। সাধুরা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলেন কথা কয়টি বলা মাত্র মহাপুরুষের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে গভীর প্রশান্তি। তাঁকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে সাধুদের মনে এক নূতন অনুভূতির আনন্দ খেলে গেল। সকলেরই মনে হল দেহের সঙ্গে আত্মার তো কোন যোগ নেই। দেহের কষ্টে নিজের কষ্ট হওয়ার তো কথা নয়। আত্মাতে আনন্দের অভাব হয় না কখনো। বেদান্তে অধীত সচ্চিদানন্দ আত্মা যে দেহ-মন-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে সেদিন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের বাণী ও তার প্রত্যক্ষরূপ দেখে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা তার মর্ম প্রাণে প্রাণে অনুভব করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন।

সমালোচনা

বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (**৩য় খণ্ড**): শঙ্করীপ্রসাদ বসু। **প্রকাশক**: মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (১৩৮৫), পৃঃ ৫৩৭, মূল্য: ত্রিশ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত। ইতিপূর্বে তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' মহাগ্রন্থের দুটি খণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় খণ্ডটিও সেই পূর্ববর্তী ধারাকে অব্যাহত রেখে সুধীসমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভ করবে সন্দেহ নেই। শঙ্করীপ্রসাদ তাঁর দীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও সুবিপুল পরিশ্রমের পরিচয় দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়কে যেভাবে উপস্থিত করে চলেছেন তাকে অভাবনীয় ও অভিনব বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম দুটি খণ্ডে ঐতিহাসিক তথ্যসমাবেশের পর তৃতীয় খণ্ডে লেখক বিবেকানন্দের সেই ভূমিকাটিকে বিশেষভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন যাতে স্বামীজীর বিরাট মনীষা ও প্রজ্ঞাভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত এবং যার প্রাসঙ্গিকতা বহুদিন বর্তমান থাকবে। মোট ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত তৃতীয় খণ্ডের সূচনা ভারত-প্রত্যাগত বিবেকানন্দের কলকাতা সংবর্ধনার সংবাদ পরিবেশন করে। সেই বিপুল গণ-সংবর্ধনা বিবেকানন্দের মনে এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজী চেয়েছিলেন, তাঁকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী এক আলোড়ন উপস্থিত হোক, যা সমগ্র দেশের চিন্তাকে গভীরভাবে নাড়া দেবে। কলকাতায় ফিরে তিনি স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেছেন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ আলোড়ন যতখানি বাহ্যিক ততখানি আন্তরিক

নয়। সেই মুহূর্তেই তিনি পরিবর্তন করেছেন আপন কর্মপন্থা। বাগ্মিতার পথ ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রতের সৌধ নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেও স্বামীজী সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। শুধু নিস্পৃহতা নয়, তিনি স্বয়ং তাঁর সংবর্ধনার পথ নষ্ট করতেও অগ্রসর হয়েছেন। মাদ্রাজে 'আমার সমরনীতি' বক্তৃতার পূর্বেই তিনি জানতেন সে বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা সেই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করে তাঁকে নিবৃত্ত করতেও চেয়েছিলেন সে বক্তৃতা থেকে। কিন্তু সত্য প্রকাশে আগ্রহী বিবেকানন্দ সমস্ত জেনেও সুবিধাবাদী আপসের পথ গ্রহণ করেন নি। ফলে থিয়োজফিস্টদের আক্রমণের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে তাঁকে। বেদান্ত-চিন্তাবিরোধী অলৌকিক ভোজবাজির সমর্থনের শর্তে সায় দিতে পারেন নি বলে থিয়োজফিস্টরা আমেরিকা অবস্থানকালে যে বিবেকানন্দের নানাভাবে শত্রুতা সাধনে তৎপর হয়েছিলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বিবেকানন্দের বিপুল জনপ্রিয়তার সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং আমেরিকায় অবস্থানকালে তাঁরা স্বামীজীকে কতভাবে সাহায্য করেছিলেন তার গালগল্প ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। স্বামীজী তাঁদের সেই দু-মুখো নীতির মুখোশ খুলে দিয়ে মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলেন। শাণিত আক্রমণের মুখে অবিচলিত বিবেকানন্দ সংগ্রাম করেছেন এবং থিয়োজফিস্ট আন্দোলন যখন যথেষ্ট জনপ্রিয় তখন বিবেকানন্দ কিভাবে সেই আন্দোলনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন—লেখক তার তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তৃত ইতিহাস উপস্থিত করেছেন।

'স্বামীজীর মতো গালাগালি আর কোনো হিন্দু-প্রচারকের ভাগ্যে জোটেনি।' সে গালাগালি যেমন তিনি লাভ করেছেন বিদেশী মিশনারীদের কাছ থেকে তেমনি নিজের স্বদেশবাসীর কাছ থেকেও। বোধহয় শেষোক্ত দিকেই পাল্লা ভারী। বিদেশে বিশ্বসভায় যিনি ভারতকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এলেন, তিনি এই বিদেশযাত্রার জন্যেই স্বদেশীয় রক্ষণশীল সমাজের কাছে শুনেছেন 'কোনো প্রায়শ্চিত্তই বিলাতফেরত হিন্দুদের পাপ ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারবে না—স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্যের ঐ সব আত্তিলগুলোর সংশোধন নেই' কিংবা 'এইসব বদমাসগুলোর সম্বন্ধে কড়া মনোভাব বজায় রেখেছে বলেই হিন্দুধর্ম এখনো কিছুটা প্রাণাগ্নি রক্ষা করতে পেরেছে।' এই প্রাণাগ্নি বজায় রাখতেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে স্বামীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। শূদ্রের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে দক্ষিণেশ্বরের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণ পতিত বলে গণ্য হয়েছিলেন, আবার সেই মন্দিরে তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানের প্রবেশের ফলে দেবীমূর্তির পুনরভিষেকের ব্যবস্থা হয়েছিল! এই রক্ষণশীল সমাজের আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সংস্কারবাদীদের শাণিত অস্ত্রগুলি। স্বদেশের বহুমুখী আক্রমণের সম্মুখে অবিচলিত বিবেকানন্দের সংগ্রামের ইতিহাস সমকালীন সংবাদের ভিত্তিতে উপস্থিত করেছেন শঙ্করীপ্রসাদ।

তৃতীয় খণ্ডের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ শেষ অধ্যায়টি। স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে এই অংশে। তাঁর সহনশীলতা ও সংগ্রামী চেতনাকে গড়ে তুলেছে সেই আদর্শের প্রেরণা। বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সাম্যবাদী বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর সমাজতান্ত্রিক মানসিকতা কোন বিদেশী দর্শনগ্রন্থ-সঞ্জাত নয়—এ চিন্তার ভিত্তি ভারতীয় সমাজের দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সূত্রে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

নির্দেশিত ধর্মচেতনায়। আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করে অসীম দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে তিনি যেমন দুঃখের স্বরূপকে চিনেছিলেন তেমনি মানবাত্মার মহত্ত্বের পরিচয়ও উপলব্ধি করেছিলেন। শঙ্করীবাবু বহু তথ্যসমাবেশে সাম্যবাদী বিবেকানন্দের উপলব্ধির সূত্রসন্ধান করেই ক্ষান্ত হন নি—সেই সঙ্গে ভারতে সোসালিস্ট আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চিন্তানায়কদের সোসালিজম সম্পর্কিত মনোভাব বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে যতগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্যায়ন করে সমগ্র বিষয়টির একটি সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। সেই কারণে এই অধ্যায়টি একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের মর্যাদা দাবী করতে পারে।

বিপুল তথ্যসম্ভারের আড়ালে শঙ্করীপ্রসাদের সাহিত্যবোধ কোথাও কুণ্ঠিত হয় নি। পরিচ্ছন্ন উপস্থাপনারীতি, প্রয়োজনে সাবলীল নাটকীয়ত্ব এবং স্বচ্ছন্দ ভাষার গতিবেগ ইতিহাসকে কতোখানি সুখপাঠ্য করতে পারে, তার নিদর্শন হয়ে রইল 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ।'

আমরা শেষ খণ্ডটির জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করব।

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অনুধ্যান ও নানা চিন্তা : শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়। **প্রকাশক :** শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৩। (১৯৭৮), পৃঃ ১৬+১৩২, মূল্য : পাঁচ টাকা।

বইটি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলিকে 'অনুধ্যান' ও 'নানা চিন্তা'—এই দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে দশটি এবং দ্বিতীয় অংশে আটটি প্রবন্ধ আছে। সমস্ত বইটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখাগুলির মধ্যে প্রধানতঃ দু'রকমের প্রচেষ্টা আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে পরিস্ফুট করবার এবং শিক্ষাপ্রণালীকে উন্নত ক'রে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ করবার। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী, সেজন্য তাঁর সমস্ত চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় সিঞ্চিত। ফলে লেখাগুলি এমন একটি বলিষ্ঠ রূপ পেয়েছে যে, তাদের অন্তর্নিহিত যুক্তিগুলিকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'শিক্ষা-প্রসঙ্গে', 'আমাদের দেশে শিক্ষাসংস্কারের উপায়', 'শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী', এবং 'মানুষ গড়ার কাজে চাই শিক্ষক'—এই চারটি প্রবন্ধে লেখকের শুধু যে শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে, তা নয়, এগুলিতে ফুটে উঠেছে একজন আদর্শ শিক্ষকের অভিজ্ঞতালব্ধ আত্মপ্রত্যয়।

আজকের দিনে দেশের শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে অনেকেই চিন্তিত। দেশী ও বিদেশী নানা রকমের চিন্তাধারা একে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। অনেকেই মনে করেন যে, স্বামীজীর বাণীর মধ্যে এ-সমস্যার সমাধান নিহিত আছে। এই বইখানিতে স্বামীজী প্রদর্শিত পথনির্দেশ ত আছেই, তা ছাড়া আছে দেশের বরণীয় আরও কয়েকজন মহান পুরুষের অমৃতময় উপদেশ। শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা ছাত্রছাত্রীরা যদি এই বইখানি পড়বার সুযোগ পান, এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা যে তাঁদের খানিকটা প্রভাবিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তার দ্বারা হবে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল। বইটি স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে স্থান পাবার যোগ্য।

সমালোচনা করতে হচ্ছে ব'লে বইটির ত্রুটির কথাও বলতে হচ্ছে। বইটির নামকরণ সুষ্ঠু হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ শিরোনাম থেকে বিষয়বস্তুর

ক্ষীণতম আভাসও পাওয়া যায় না। কয়েকটি প্রবন্ধের শিরোনামেও ত্রুটি আছে। যেমন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবন' প্রবন্ধে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সুনির্দেশ নেই; 'ভারততীর্থ' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ' ছোট প্রবন্ধটি মূল্যবান হলেও পরিশিষ্টে না দিয়ে গ্রন্থের মধ্যেই উপস্থাপিত করা কিছুটা অভিনব। এই ধরনের কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে পড়ে। তবে আমরা আশা করবো পাঠকবর্গ এগুলি উপেক্ষা করবেন এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুর প্রতিই দৃষ্টি দিবেন। তাহলেই তাঁরা যে উপকৃত হবেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৩ই জানুআরি ১৯৮০, বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসী ও গৃহী সদস্যবৃন্দের এই সম্মিলিত সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী।

মঠের ব্রহ্মচারিবৃন্দের বেদপাঠের দ্বারা মঙ্গলাচরণের পর গত বৎসরের সভার বিবরণী পাঠ করা হয়। তাহার পর লোকান্তরিত সদস্যবৃন্দের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিয়া সদস্যগণ যথারীতি এক মিনিট নীরবতা পালন করিলে মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর ১৯৭৮-৭৯ সালের প্রতিবেদনটি পাঠ করেন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দ। (বিবরণীটি 'উদ্বোধনে'র পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। অতঃপর ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসাব পাঠ, হিসাব-পরীক্ষকদের নিয়োগ এবং নূতন সদস্যদের নামও ঘোষিত হয়। ইহার পর রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং ১৯৮০ সালের মহাসম্মেলনের কার্যকারিণী সমিতির সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সুদীর্ঘকাল পরে ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাতে রামকৃষ্ণ সংঘের অগণিত ভক্ত এবং ত্যাগী সেবকগণ একত্র মিলিত হইয়া সংঘের আদর্শ, সংঘের কার্যাবলীর মূল্যায়ন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংঘের কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন।

সভাপতির অভিভাষণে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন: "রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক-মণ্ডলীর যে প্রতিবেদনটি পাঠ করা হ'ল, তা থেকে আপনারা জেনেছেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কি অসুবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের গত বৎসর কাজ চালাতে হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সঙ্কটকাল চলেছে। তাই আজকের দিনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হ'ল স্বামীজী-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণবাণী।

"কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা স্বামীজীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচার ক'রে চলেছি, কিন্তু দেশের বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে আমাদের সে প্রচার আরও কার্যকর করতে হবে। সমগ্র পৃথিবীতে—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে—ফলপ্রসূ প্রচার চালাতে হবে, যাতে ক'রে আমরা নতুন ভারত

গড়তে পারি। আর এর জন্য প্রয়োজন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা। স্বামীজী সংঘের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, কারণ সংঘ ছাড়া কোন বড় কাজ এককভাবে করা যায় না। তাই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সমস্ত ভক্ত ও অনুরাগীদের আজ সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে আর এই উদ্দেশ্যেই মঠ ও মিশন 'মহাসম্মেলনে'র পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে তা বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর হয়েছেন।

"স্বামীজী বহু স্থানে বহু বার বলেছেন যে, জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের দেশের অবনতির কারণ। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক—সকল দিক থেকেই আমরা তাদের বঞ্চিত করে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। এর প্রতিকার করতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা জনসাধারণের জন্য গ্রামে গ্রামে কাজ করছি, কিন্তু এ বিশাল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুব কম। সুতরাং আমাদের নতুন কর্মপদ্ধতির কথা ভাবতে হবে। নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও যাতে ক'রে স্বামীজীর প্রদর্শিত পন্থায় কাজ করতে পারে, সেজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। আর তা করতে হ'লে আমাদের প্রত্যেককেই স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে। তা না হ'লে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

"আমাদের প্রত্যেকের ওপর স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীজীর ভাবধারা ছাড়া এদেশ কখনও উঠতে পারবে না, বাইরে থেকে আমদানী-করা যত বুলিই আওড়ান যাক না কেন। বিদেশী চিন্তাভাবনা এদেশে শিকড় গাড়তে পারবে না। ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতিসহায়েই যদি ভারতের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হ'ত, তাহলে ঠাকুর-স্বামীজীর আসবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাঁরা এসেছিলেন এটা দেখাতে যে এদেশের আদর্শ হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, যা আমরা হাজার হাজার বছরের উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি এবং তা-ই বর্তমানে আমাদের প্রচার করতে হবে। এজন্য আমি উপস্থিত সব সদস্যদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন স্বামীজীর গ্রন্থাবলী ভাল ক'রে পড়েন, স্বামীজী আমাদের কী করতে বলেছিলেন তা অনুধাবন করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী কাজ করেন। তবেই আমরা নতুন ভারত গড়তে পারবো।"

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়।

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য: দিঘড়া গ্রামে (হুগলী জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চল) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য নির্মীয়মান ৬৩৬টি পাকাবাড়ির মধ্যে সম্পূর্ণপ্রায় ১১৬টি বাড়ি ও একটি দোতলা সমাজমন্দির-আশ্রয়শিবিরের শীঘ্রই উদ্বোধন হইবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। গৃহনির্মাণ ব্যতীত দারকেশ্বর নদীর উভয় তীরের সহিত সংযোগ-রক্ষাকারী একটি রাস্তা নির্মাণের কাজও স্থানীয় গ্রামবাসী এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হইতেছে।

(খ) গুজরাত: মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালনায় ভানালিয়া গ্রামে ও মোরভি শহরে গৃহনির্মাণের কাজ গত ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ শুরু করা হইয়াছে।

(গ) অরুণাচল প্রদেশ: জিরোর নিকটস্থ রেরু এবং হাজং গ্রামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের মধ্যে আলং কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৬০টি পশমী কম্বল বিতরিত হয়।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

বিবিধ

১৯১৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ পুরাতন মালদহে যে গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই পূত গৃহে তাঁহার পুণ্যস্মৃতিরক্ষার্থে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী গত ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৯, মার্বেল প্রস্তরনির্মিত একটি স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন এবং এই উপলক্ষে মুদ্রিত একটি স্মরণিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত করেন।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ ব্লকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৭৯, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নার্সদের জন্য নবনির্মিত 'শ্রীরাধা-লীলা-বিহারী নার্স-নিবাস'-এর উদ্বোধন করেন।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ১২৭তম আবির্ভাবতিথি গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ (সোমবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬), যথারীতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে রান্না-করা প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে মঠপ্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী অনন্যানন্দ, অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন ও সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দ।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, মধ্যাহ্নে ভক্তসেবা ও সন্ধ্যায় ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ইহা ব্যতীত ১১ই ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম 'দেবেন্দ্র হলে', ১২ই ডিসেম্বর মানিকপাড়া লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে এবং পাঁশকুড়া শ্যামসুন্দরপুর পাটনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলন মন্দিরে তিনটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর জন্মতিথি স্মরণে উপরি-উক্ত চারিটি সভাতে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রতিটি সভায় প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পীবৃন্দ ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

দেহত্যাগ

স্বামী হৃদানন্দ (শরৎ মহারাজ) গত ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, ভোর ৫-২৫ মিনিটে ৫৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগিতে-ছিলেন। সাত-আট মাস পূর্বে তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রে উপসর্গ দেখা দেয় এবং বৃক্কের ক্রিয়া ব্যাহত হইতে থাকে। সেবাপ্রতিষ্ঠানেই তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। সুচিকিৎসা সত্ত্বেও ঐ সকল অসাধ্য উপসর্গের ফলে তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে সংঘের টাকি কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। টাকি ব্যতীত তিনি আসানসোল, পাটনা, বৃন্দাবন এবং উদ্বোধন (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) কেন্দ্রে কাজ করিয়াছিলেন। যাহারাই তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, অমায়িক স্বভাবের জন্য তাঁহাদের সকলেরই তিনি প্রিয় ছিলেন।

স্বামী বগলানন্দ (শ্রীশ মহারাজ) গত ১২ই ডিসেম্বর বেলা ২-১০ মিনিটে ৭৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্কের রক্ত-

চলাচল ব্যাহত হওয়ায় এবং ফুসফুস সংক্রমিত হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরিয়া তিনি বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগিতেছিলেন এবং সেবাপ্রতিষ্ঠানেই তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ সালে স্বীয় গুরুর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। আলমোড়া কেন্দ্র ব্যতীত জলপাইগুড়ি, জামতাড়া, কামারপুকুর, মালদা ও শ্যামলাতাল কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। মাদ্রাজ মঠেও তিনি কাজ করেন। তাঁহার সারল্য ও দয়াবত্তার জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স্বামী সত্যাত্মানন্দ (শৈলেন মহারাজ) গত ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯, বেলা ১০-৫০ মিনিটে ৮৫ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত অতি দুর্বলতার ফলে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২১ সালে সংঘের এলাহাবাদ কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯২৭ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। দশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের সেবক ছিলেন। এলাহাবাদ ব্যতীত তিনি বারাণসী সেবাশ্রম, কনখল, লক্ষ্ণৌ এবং কানপুর কেন্দ্রের কর্মী ছিলেন। তাঁহার মধুর শিশুসুলভ স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মজয়ন্তী ও খ্রীষ্টোৎসব

পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের বহুস্মৃতিধন্য উদ্বোধন কার্যালয় তথা—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৭৯) সারাদিনব্যাপী আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহার জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভজনকীর্তনাদি এবং সারাদিন সমবেত সাধু ও ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় নূতন বাড়ীর 'সারদানন্দ হলে' স্বামী সারদানন্দজী ও ভগবান যীশুখৃষ্টের সুসজ্জিত প্রতিকৃতির সম্মুখে ভোগারতির পরে বাইবেল পাঠ করা হয়। পরে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ এই দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন, 'এই দিনটি রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ত্রিধন্য এই দিনের স্নিগ্ধ সন্ধ্যাটি ভগবান ঈশামসির আবির্ভাবের পূর্বসন্ধ্যা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর এমনই এক সন্ধ্যার কিছু পরে আঁটপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগব্রতী যুবক শিষ্যবৃন্দ একত্র সমবেত হয়ে সংঘ-গঠন ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ প্রচারের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। আর এবারে এই দিন ভগবান রামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাপরিকর পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীর আবির্ভাবতিথি হিসাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তাই আজকের দিনটি ত্রিধন্য।'

সুদীর্ঘ আলোচনার অবসরে তিনি ভগবান যীশুখৃষ্টের ত্যাগপূতজীবন ও সহজ সরল উপদেশাবলীর অনুধ্যান করেন। পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার অসাধারণ সহনশীলতা, ধীরস্থির বুদ্ধি ও সংঘপরিচালনার ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের ভাষ্যকার হিসাবে মহাগ্রন্থ 'লীলাপ্রসঙ্গ' রচনা, জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সেবা ও ভক্তগণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি, স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সহিত

তাঁহার মধুর সম্পর্ক এবং দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্তি হিসাবে উদার হৃদয়বত্তার বহু ঘটনার উল্লেখ করেন। আলোচনার পর সমবেত সকল ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ২৯শে নভেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৩০শে নভেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল:

কথামৃত—

ত্যাগীর বাদশা শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের কাছে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করছেন, গঙ্গার বুকে চলমান স্টীমারে বসে। আগে বলেছেন, ভগবানের মায়ায় ভুলে মানুষ সংসারে মেতে থাকে। তিনি কৃপা করে মনকে ফিরিয়ে না দিলে নিস্তার নেই। তাই তাঁর শরণাগত হয়ে মুক্তির জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। কিন্তু শরণাগত হওয়া কি সহজ? অহংকারের নাশ না হলে শরণাগতি আসে না। কামকাঞ্চনে আসক্তি না গেলে ঠিক ঠিক শরণাগত হওয়া যায় না। ভগবান যীশুখৃষ্টও বলেছেন, 'It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God.' মনে বিন্দুমাত্র ভোগবাসনা থাকলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়। আর মহামায়া এই বন্ধনে বেঁধে খেলছেন জীবকে নিয়ে। এই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করছেন, 'মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না?'

উত্তরে রসিকচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকতা করে বলছেন, 'নাগো, তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা রসে বসে বেশ আছো। সারে মাতে।' তিনি লোকগুরু যুগাবতার, জানেন কার পেটে কি সয়, কারা কতদূর বুঝবে। সেই জন্য ব্রাহ্ম গৃহস্থ ভক্তদের বলছেন, সব ত্যাগ করা বড় কঠিন; কিন্তু মনের দিক থেকে ত্যাগ চাই-ই। সব কিছু ত্যাগ করা সংসারীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মনোবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। Sublimation চাই—বৃত্তিগুলির ঊর্ধ্বগতি করতে হবে। মানুষের জীবনের কোন শক্তি যখন নিম্নমুখী হয়ে ভোগের পথে যায়, তখন তা মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। আবার সেই শক্তিই যখন ঊর্ধ্বগ হয়ে শুভবৃত্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন সেইটাই হয় আধ্যাত্মিক শক্তি। পুরো মনটাই ঈশ্বরে দিতে হবে, যেন ঘোগ দিয়ে জল বেরিয়ে না যায়, সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। ব্রাহ্মভক্তেরা জানতেন ঠাকুর বারবার কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথাই বলেন, সেইজন্য এই প্রশ্ন করেছেন। তাঁদের সাধনায় কিছু পাঠ, ভজন, প্রার্থনা—এই সবই মূল, সেখানে ত্যাগের অবকাশ নেই। এমন কি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ সেযুগের বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতারা ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের লেখা একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তাঁকে লিখে পাঠান যে, রামকৃষ্ণ কতকগুলি দোষে দুষ্ট—তিনি মাতাল ও বেশ্যাদের ঘৃণা করতেন না, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক রাখেন নি ইত্যাদি। এর উত্তরে ম্যাক্সমুলার তাঁর রচিত 'রামকৃষ্ণ—তাঁর জীবন ও উক্তিসমূহ' গ্রন্থে লেখেন, 'যদি পাপীতাপীদের সংস্পর্শে আসা রামকৃষ্ণের পক্ষে দোষের হয়, তাহলে এ-ব্যাপারে ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ নন।' ম্যাক্সমুলারের এই মন্তব্যের সমর্থনে স্বামীজী লিখেছিলেন, 'আহা! কি মিষ্ট কথা—শ্রীভগবান বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অম্বাপালী ও হজরৎ ঈশার দয়া-প্রাপ্তা সামরীয়া নারীর কথা মনে পড়ে।' আর দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে ম্যাক্সমুলার লেখেন, 'এহেন সম্পর্ক মোটেই পূর্ব-দৃষ্টান্তশূন্য নয়। একে বর্বরোচিত বলা চলবে না, যেহেতু সম্মতিতে কৃত।...খুবই বিচিত্র কথা, মজুমদারের মতো জ্ঞান

ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ রামকৃষ্ণের স্ত্রীর রামকৃষ্ণের কাছে সন্ন্যাসিনীর মতো থাকার সিদ্ধান্তকে বর্বরোচিত মনে করবেন! রামকৃষ্ণের স্ত্রী স্পষ্টতই তা মনে করেননি।...সন্তানের জন্মদান ভিন্ন কি সত্যই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সম্ভব নয়?' স্বামীজী এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'অধ্যাপকের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক; তিনি বিজাতি, বিদেশী হয়ে আমাদের একমাত্র ধর্মসহায় ব্রহ্মচর্য বুঝতে পারেন এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নয়, বিশ্বাস করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরেরা বিবাহে শরীর-সম্বন্ধ বই আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না!'

ত্যাগ চাই। তবে অধিকারীভেদে যার যতটুকু সামর্থ্য সেটা ভেবেই ঠাকুর বলছেন, 'তোমাদের অতোটা নয়।' রসে বসে থাকতে বলছেন, সংসারও করতে হবে আবার ভগবানেও মন রাখতে হবে। নিজের সম্বন্ধে বলছেন, তাঁর জীবনে সংসারখেলা শেষ হয়ে গেছে—তিনি বেশী কাটিয়ে হ্বলে গেছেন, রহস্য করে বলছেন, ব্রাহ্মভক্তেরা সেয়ানা—তাদের খেলা চলছে, তারা বেশী কাটিয়ে জ্বলে যায় নি।

বলেই প্রসঙ্গ একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছেন, দেখাচ্ছেন কিভাবে সংসারে থেকে কর্ম করতে হবে। তাদের আশা দিয়ে বলছেন, সংসারে থাকা দোষের নয়। এ তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং।' মানুষ কি করবে? তার মনের গতিটিকে ঊর্ধ্বদিকে তুলে রাখবে, ঈশ্বরের দিকে মন দিতে হবে। নিষ্কামকর্মযোগের কথাই এখানে তাদের তিনি শেখাচ্ছেন, 'যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্।' একহাতে কাজ করা অন্যহাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকা। 'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ / যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্।' এইভাবে সর্বকর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে শেষে দুই হাতে তাঁকে ধরতে হবে। সংসার যখন আর টানবে না, মন থেকে সংসার যখন চলে যাবে, তখন সব ছেড়ে ভগবানকেই ধরবে। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশে' বলেছেন,

'ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্॥
শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে' ইত্যাদি।

তাৎপর্য এই যে, যাঁরা ত্যাগের জন্যই অর্থসঞ্চয় করতেন, সত্য বলার জন্যই মিতভাষী হতেন, ক্ষত্রিয়ের কাম্য যশের জন্যই রাজ্যজয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন, সন্তানলাভের জন্যই গৃহস্থ হতেন, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে বিষয়ভোগ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন এবং সবশেষে যোগবলে দেহত্যাগ করতেন, সেই রঘুবংশীয় রাজাদের কথা কালিদাস বলবেন। প্রাচীন ভারতে আদর্শ গার্হস্থ্যজীবনচর্যা যে কী ছিল, তা এঁদেরই জীবন থেকে আমরা জানতে পারি।

কিন্তু এর জন্য মনকে তৈরী করতে হবে। 'মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।'—মনই মানুষের বন্ধন ও মুক্তির কারণ। ঠাকুর তাঁর অনবদ্য উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, মনকে যেভাবে চালাবে মন সেইভাবেই চলবে—ধোপা যেমন একই কাপড়কে তার খুশীমত নানা রঙে রাঙাতে পারে, সেইরকম যদি সৎসঙ্গ হয়, মনের সৎ চিন্তা হবে, অসৎসঙ্গে অসৎ চিন্তা হবে। সেইজন্য নারদ বলছেন, 'দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ', 'কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণত্বাৎ।'—অসৎসঙ্গ সর্বপ্রকারে ত্যাগ করতে হবে, কারণ অসৎসঙ্গ থেকে কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ—সর্বনাশ হয়ে থাকে। দুঃসঙ্গের দ্বারাই মনে এই সব অসৎ-বৃত্তির উদয় হয়, যা সর্বনাশের কারণ। আবার ঐ মনকে ভক্তসঙ্গে রাখলে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তার সৎ-

বৃত্তিই হবে। বৌদ্ধশাস্ত্র 'ধম্মপদে'ও সেই কথাই বলা হয়েছে, 'মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা / ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং'ব বহতো পদম্।' অর্থাৎ প্রদুষ্ট মনে কেউ কিছু বললে বা করলে দুঃখ তার অনুগমন করে, শকটচক্র যেমন শকটবাহক বলীবর্দের পদচিহ্ন অনুসরণ করে।

সুতরাং মনই সব। একই মন সংসারে কাউকে আপন ভেবে আত্মবৎ সেবা করছে, আবার অন্য কারো সঙ্গে কোন সম্পর্কই বোধ করছে না। এমনি মনের স্বভাব। সেইজন্য মনটিকে সংযত রাখতে হবে। সংসারে সবকাজ করা হচ্ছে, কিন্তু এই বুদ্ধিতে যে আমি ভগবানের সেবা করছি, তাঁর প্রীতির জন্য করছি। এইভাবে কর্ম করতে করতে শেষে সব মন ভগবানকেই দেওয়া যায়। (১।২।৫)

গীতা—

শ্রীভগবান অর্জুনকে নিষ্কামকর্মযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু অনধিকারীর কাছে নৈষ্কর্ম্যের কথা বলতে নিষেধ করছেন। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি স্বয়ং কাজ করে যাচ্ছেন, কর্মাধিকারী লোকেদের নিষ্কামকর্মযজ্ঞে উৎসাহিত করবার জন্য। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'

কর্মরহস্যটি বলছেন পরমপ্রীতিভাজন অর্জুনকে: তুমি সর্বকর্ম আমাতে—সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরে—সমর্পণ করো। কী উপায়ে সমর্পণ করবে? না, 'অধ্যাত্মচেতসা'—বিবেকবুদ্ধির দ্বারা। সেটা কেমন? 'অহং কর্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমি ইতি অনয়া বুদ্ধ্যা'—আমি কর্তা, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য ভৃত্যবৎ তাঁরই সেবা করছি, এই বুদ্ধিতে। এইভাবে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে তাঁকে সমস্ত কর্মের ফল অর্পণ করে, ভালমন্দ সব ফলের আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, মমত্বহীন ও শোকরহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলছেন। কর্মক্ষেত্ররূপ রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হতে বলছেন। 'আমি-আমার' এই বুদ্ধির ফলে কর্মে বিফল হলে দুঃখ আসে, কিন্তু বিচারশীল মানুষ 'আমি-আমার'-বুদ্ধি-বিমুক্ত হলে শোকহীন হতে পারেন, এই উপদেশ দিচ্ছেন ভগবান। (৩।৩০)

কিন্তু এই যে নিষ্কামকর্মযোগ এটি হচ্ছে উপায়, এর উপের বা লক্ষ্য কি? না, মুক্ত হওয়া। ভগবান বলছেন যেভাবে নিষ্কামকর্মযোগ করতে বলা হয়েছে তাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এবং 'ভগবান আমাদের দুঃখাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন', এইরকম দোষ না দিয়ে কর্ম করতে পারলে কর্মদ্বারাই মানুষ মুক্ত হয়। অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথায় বিশ্বাসী হয়ে তাঁর উপদিষ্ট প্রণালীতে কর্ম করলে জীব আর কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়ে না। কর্মই তার মুক্তির কারণ হয়। (৩।৩১)

আর তা যদি না করে? তাহলে পরমার্থভ্রষ্ট হয়। সেই কথাই ভগবান বলছেন—যারা আমার এই মতের—নিষ্কামকর্মযোগের নিন্দা করে এবং এইভাবে কর্মানুষ্ঠান করে না, সেই সব বিবেকহীন মূঢ়—সর্বপ্রকারে জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের সকল পুরুষার্থ থেকে বিনষ্ট বলে জানবে। এখানে একটা কথা আমাদের মনে হচ্ছে: গীতার জন্মকালে সম্ভবতঃ এই নিষ্কামকর্মযোগকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নতুবা 'অভ্যসূয়ন্তঃ' এই কথাটির উল্লেখের কারণ কী হতে পারে? সেইজন্য অর্জুনকে ভগবান সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, অর্জুন হয়তো এই মতের নিন্দা-সমালোচনা শুনতে পাবে, কিন্তু জানবে যে সেগুলি তাদের কথা, যারা নির্বুদ্ধি, সত্যদৃষ্টি যাদের অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, আর তারই ফলে যারা পুরুষার্থলাভে অক্ষম।

এইভাবে নতুন একটা সাধনার ধারা শ্রীভগবান উন্মোচিত করে দিয়েছেন। এর পূর্বে উপনিষদে এটি বীজাকারে ছিল। শ্রীভগবানই গীতাতে এর বিস্তারিত আলোচনা করলেন। (৩।৩২)

নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান যদি এরকম মহাফলপ্রসূ হয়, তাহলে লোকে নিষ্কাম কর্ম করে না কেন? তার উত্তরে ভগবান বলছেন, প্রত্যেকেই—এমনকি জ্ঞানীব্যক্তিও আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম করে চলেছে। আমার বা অন্যের শাসনে কী হবে? আচার্য শংকর বলছেন, পূব পূর্ব জন্মের কৃত ধর্ম ও অধর্মজনিত সংস্কারই বর্তমান জন্মের শুরুতেই অভিব্যক্ত হয় আর এইটাই প্রকৃতি। জ্ঞানী, মূর্খ সকলেই এই প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হচ্ছে। (৩।৩৩)

সবাই যদি নিজেদের প্রকৃতি অনুযায়ী চলতে বাধ্য হয়, তাদের হাত-পা যদি বাঁধা হয় তাহলে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কোন সার্থকতা থাকে না—পুরুষকার বলেও কোন কিছু থাকতে পারে না। তাই ভগবান বলছেন, প্রকৃতির বশে আমরা চালিত হলেও, শাস্ত্রের বিধি নিষেধ জেনে পুরুষকার অবলম্বন করে প্রকৃতিকে জয় করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলির অনুকূল বিষয়ে আমাদের রাগ বা আসক্তি আছে, তাদের প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ বা বিরক্তি আছে। এই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত হলে চলবে না। এ দুটি সাধকের বিঘ্নকারী, এদের জয় করতে হবে।

(৩।৩৪)

এই কথা বলে ভগবান আবার পূর্বের কথায় ফিরে যাচ্ছেন। অর্জুন বলেছেন, তিনি যুদ্ধ করবেন না, সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। তাই অর্জুনকে আবার বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এটা ঠিক পথ নয়। অর্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তার বৃত্তি, তার স্বধর্ম। স্বধর্ম পরিত্যাগ করা অন্যায়। স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কিছু ত্রুটি হলেও স্বধর্ম ছাড়তে নেই। যার সন্ন্যাসের অধিকার আসেনি, সে যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষে সন্ন্যাস রক্ষা করা কঠিন হবে। তার চেয়ে গৃহে থেকে সৎভাবে সমস্ত কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে নিষ্কামভাবে কর্ম করলে তার দ্বারাই সে মুক্তির অধিকারী হবে। যুদ্ধরূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বরং মরাও ভাল, তবু পরধর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। কারণ পরধর্ম ভয়াবহ, অর্থাৎ অধোগতির কারণ।

(৩।৩৫)

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, হুগলী জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের ডিহিবড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হইতে বহু লোক ঐ দিন সকালে নবনির্মিত সমাজমন্দির-আশ্রয়শিবিরের (এই সংখ্যার পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য) সামনে জমায়েত হইতে শুরু করে। ঐস্থানে শ্রীশ্রীমায়ের একটি বড় ছবি দোতলার উপরে ফুল ও মালা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল। হাজার হাজার গ্রামবাসী—পুরুষ, মহিলা ও শিশু—মায়ের সেই ছবির সামনে আসিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ঐ দিন ১০টি গ্রামের প্রায় ১,৬০০ পরিবারের মধ্যে ২,১০০ খানি শাড়ি, ১,১০০খানি ধুতি এবং ২,৬০০ খানিরও বেশী শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া প্রায় ছয় হাজারেরও বেশী লোক তৃপ্তিসহকারে খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় হাজার হাজার গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে 'রানী রাসমণি' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

খিদিরপুর সুরবিতানে গত ২৫শে ডিসেম্বর যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে 'যীশুখৃষ্ট ও শ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক আলোচনা-প্রসঙ্গে মূল ভাষণ দেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসু। ভক্তিমূলক সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

ভাংগড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সংঘ কর্তৃক গত ১লা জানুয়ারী ১৯৮০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু' উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষে গীতা ও কথামৃত পাঠ প্রভাতফেরি, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণ-গীত, ভজন, শ্যামাসংগীত প্রভৃতি হয়। মধ্যাহ্ন হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রায় আট হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে শ্রীনিত্যানন্দ দাসগোস্বামী কর্তৃক ভাগবত পাঠ ও শ্রীযোগেন প্রামাণিক কর্তৃক কল্পতরু বিষয়ক পাঠ হয়। সন্ধ্যায় সংঘ-মন্দিরে সন্ধ্যারতি ও নাম-সংকীর্তন হয়।

খিদিরপুর গীতাসংসদ ... প্রতিষ্ঠিত গত ৯.১.৮০ তারিখে এক মনোজ্ঞ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উদযাপিত হয়।

কার্যবিবরণী

কটক রামকৃষ্ণ সেবক সম্প্রদায়ের ১৯৭৮-'৭৯ সালের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সার সংক্ষেপ:

শিক্ষা: শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ কয়েকজন যুবক ১৯৭৬ সালে ভাড়াবাড়িতে (তোলন্ধা বাজার, কটক) দরিদ্র ছাত্রদের জন্য 'রামকৃষ্ণ কুটীর' নামে একটি আবাসিক ছাত্রনিকেতন স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে উহা কটকস্থিত বাঙালী-সাহীতে নিজস্ব দ্বিতল বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্কুল ও কলেজে পাঠরত ছাত্রদের দুইটি পৃথক্ ব্লকে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্তমানে মোট ছাত্রসংখ্যা ৪৬। দুইজন অবৈতনিক সহকারী সহ একজন অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কের উপর ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়মিত ক্লাস হয়। নিজস্ব গ্রন্থাগার ও খেলাধুলার ব্যবস্থা আছে।

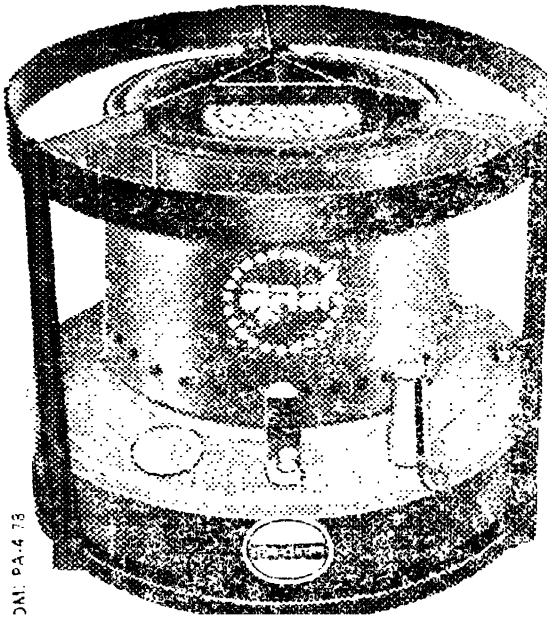
উৎসবাদি: প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও ১লা জানুয়ারী কল্পতরু উৎসব পালিত হয় এবং বিভিন্ন বক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

আলোচ্য বৎসরে প্রতিষ্ঠান পরিচালন-ব্যয়ভার বিভিন্ন আহুত সভা-সমিতির পূর্বাহ্নে সংগৃহীত চাঁদা এবং নিদিষ্ট ছাত্রগণ ছাড়া বাকী আবাসিক ছাত্রদের থাকা-খরচ বাবদ সংগৃহীত অর্থ হইতে মিটান হইয়া থাকে।

মাসিক বৃত্তি ও পুরস্কার ব্যবস্থা: দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের পুরস্কার ও বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। ... মাসিক ... টাকা বৃত্তি (সেপ্টেম্বর '৭৮-এপ্রিল '৭৯) এবং ... একজন এককালীন ... টাকা পরীক্ষা ... পাইয়াছে।

আবাসিক ছাত্রগণ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫ জনের মধ্যে ৫ জনই প্রথম বিভাগে, আই ৭, আই. এসসি পরীক্ষার ১০ জনের মধ্যে ৭ জন, এবং বি.এ, বি. এসসি পরীক্ষার্থী ৪ জনের মধ্যে ৪ জনই অনার্স ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রামকৃষ্ণ সেবক সম্প্রদায় নিয়মিত উড়িষ্যা সরকারের অনুদান এবং স্থানীয় ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মাসিক বা এককালীন চাঁদাও পাইয়া থাকেন।



উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ; পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র—মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ২য় ভাগ ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—মূল্য ০'৮০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য; ৭ম সংস্করণ, মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ভগিনী নিবেদিতা—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ— স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩৭, মূল্য ৪'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

UDBODHAN PUBLICATIONS (In English)

WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA

CHICAGO ADDRESSES
Price : Re. 0·85

MY MASTER
Price : Re. 0·60

VEDANTA PHILOSOPHY
Price : Rs. 1·50

CHRIST THE MESSENGER
Price : Re. 0·80

SIX LESSONS ON RAJA YOGA (Tenth Edition)
Price : Rs. 1·50

RELIGION OF LOVE
Price : Rs 3·50

A STUDY OF RELIGION
Price : Rs. 4·25

REALISATION AND ITS METHODS
Price : Rs. 3·00

THOUGHTS ON VEDANTA
Price : Rs. 1·50

THE SCIENCE AND PHILOSOPHY OF RELIGION
Price : Rs. 3·80

WORKS OF SISTER NIVEDITA

THE MASTER AS I SAW HIM
Price : Rs. 12·00

CIVIC AND NATIONAL IDEALS (Sixth Edition)
Price : Rs 7.00

HINTS ON NATIONAL EDUCATION IN INDIA (Sixth Edition)
Price : Rs. 6·00

AGGRESSIVE HINDUISM (Fifth Edition)
Price : Rs. 1·10

SIVA AND BUDDHA
Price : Re. 1·00

NOTES OF SOME WANDERINGS WITH THE SWAMI VIVEKANANDA
(Sixth Edition)
Price : Rs. 7·50

BOOKS ON SRI RAMAKRISHNA

WORDS OF THE MASTER
COMPILED BY SWAMI BRAHMANANDA
Price : Rs. 1·50

RAMAKRISHNA FOR CHILDREN
(Pictorial)
By SWAMI VISHWASHRAYANANDA
Price : Rs. 4·50

MISCELLANEOUS BOOK

VEDANTA, ITS THEORY AND PRACTICE
BY SWAMI SARADANANDA
Price : Re. 0·70

UDBODHAN OFFICE, 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003

Udbodhan Phone : 55-2447 JANUARY 1980 Regd. No. WB/NC-19

[illegible] গ্রে স্ট্রীট কলিকাতা-[illegible] বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও উদ্বোধন লেন কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত
[illegible] — স্বামী [illegible]

ফাল্গুন ১৩৮৬
৮২তম বর্ষ
২য় সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭৷৷টা হইতে ১১টা; বিকাল ২৷৷টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনের (১৯২৬) বিবরণগ্রন্থ

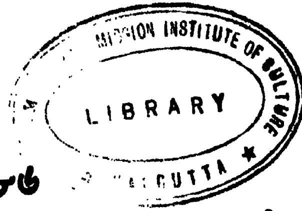
শীঘ্রই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। সমস্ত পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সাধু এবং ভক্তজনের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দিবেন। ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে প্রথম মহাসম্মেলনের ইংরেজী বিবরণগ্রন্থ (THE RAMAKRISHNA MATH & MISSION CONVENTION—1926) পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহা একটি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ, যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অপূর্ব ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে। যাঁহারা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভক্ত ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁহাদের সকলেরই ইহা অবশ্যপাঠ্য। স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

মূল্য ২৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী



উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৬

সূচীপত্র



৮২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাল্গুন, ১৩৮৬

দিব্য বাণী

যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)।···যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ' (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, Onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—Onward, এই কথাটি খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৬।৪৫৭]

কথাপ্রসঙ্গে

'সকলি তোমার ইচ্ছা'

বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে যে সকল ঘটনা ঘটে বা পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, সে সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সকল কার্যের কারণ হইতেছে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ইহাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্থির সিদ্ধান্ত। তাঁহার এই বিশিষ্ট মানসিকতা এবং তাঁহার শিষ্যগণের উপর উহার অপরিমেয় প্রভাব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, কলেজে তড়িৎশক্তি সম্বন্ধে পাঠ করিয়া একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে ঐ বিষয় লইয়া তিনি সঙ্গীদের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। আলোচনায় 'ইলেকট্রিসিটি' শব্দটি বারংবার উচ্চারিত হইতেছে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বালকের ন্যায় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে, তোরা ও কি বলছিস? ইলেক্‌টিক্‌টিক্‌ মানে কি?' ইংরেজী শব্দটির ঐরূপ বালকের ন্যায় উচ্চারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে শুনিয়া তাঁহারা হাসিতে থাকেন। পরে তড়িৎশক্তি-সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি তাঁহাকে বুঝাইয়া বজ্র-নিবারক দণ্ডের প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন যে, উচ্চ পদার্থের উপরই বজ্রপতন হয়, এইজন্য বজ্রনিবারক দণ্ডের উচ্চতা বাটীর উচ্চতা অপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন। কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, তিনি কিন্তু দেখিয়াছেন যে, ত্রিতল বাটীর পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র চালাঘরেই বাজ পড়িয়াছে, ত্রিতল বাটীতে পড়ে নাই, সুতরাং ঐ সকল সিদ্ধান্ত যে একেবারে ঠিক-ঠিক, তাহা বলা চলে না—ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই আইন, আবার তাঁহার ইচ্ছাতেই আইনের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। স্বামী সারদানন্দ (তখন শরৎচন্দ্র) ও তাঁহার সঙ্গীগণ—বাজটা প্রথমে ত্রিতল বাটীর দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল, কি-এক অজ্ঞাত কারণে সহসা তাহার গতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যে অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, ইহা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিছুতেই বুঝিলেন না—তিনি তাঁহার স্ব-সিদ্ধান্তে অটল রহিলেন।

এই ঘটনার বহু বৎসর পূর্বে রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসও অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যুক্তি উত্থাপন করেন এবং পরাস্ত হন। সুবিদিত। তথাপি এই প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা অসমীচীন হইবে না।

একদিন ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে মথুরামোহন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগতের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়—তিনি ইচ্ছা করিলেই সব করিতে পারেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর সিদ্ধান্ত অস্বীকার করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তিনি ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন মথুরবাবু: 'ঈশ্বর কি ইচ্ছা করলেই লাল জবা-ফুলের গাছে সাদা জবা ফোটাতে পারেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তা পারেন বৈ কি! তাঁর ইচ্ছা হলে লাল জবার গাছেই সাদা জবা ফুটতে পারে।' মথুরবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরদিনই শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখিলেন যে, একটি লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুইটি ফেঁকড়িতে দুইটি ফুল—একটি লাল, অপরটি সাদা ধবধবে। দেখিয়াই তিনি ডালটি ভাঙিয়া আনিয়া মথুরবাবুকে দেখাইলেন।

মথুরবাবু অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'বাবা, আর তোমার সঙ্গে তর্ক করবো না।'

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্-প্রকৃতির আলোচকেরা শ্বেত বা রক্ত বর্ণের পুষ্পপ্রসবকারী উদ্ভিদ্সমূহে কখন কখন তদ্ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সুতরাং মথুরবাবুর জানা না থাকিলেও, বিজ্ঞানীদের জানাই আছে যে, ঐরূপ হইয়া থাকে; ফলতঃ বাক্‌সিদ্ধ সত্যসংকল্প শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতেই যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া ঐভাবে অকস্মাৎ একটি লাল জবার গাছে সাদা জবা প্রস্ফুটিত করিলেন, তাহা নহে। ইহাই বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুন না কেন, যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, বলা বাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্তের নড়চড় হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

বাহ্যপ্রকৃতিতে যেরূপ, অন্তঃপ্রকৃতিতেও সেইরূপ যে সকল পরিবর্তন ঘটে, যাহার ফলে স্থূলশরীরেও পরিবর্তন দেখা দেয় (যথা—কোন ভাববিশেষের প্রাবল্যে মেরুদণ্ডের শেষভাগের অস্থি পশুপুচ্ছের ন্যায় অল্প-স্বল্প বর্ধিত হওয়া, স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে পুরুষশরীরে সাময়িকভাবে স্ত্রীশরীরের ন্যায় ক্রিয়া হওয়া, ইত্যাদি)—সে সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাসম্ভূত বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মনে করিতেন। ইহাও 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি 'কথামৃতে' একাধিকবার পাওয়া যায়—কোথাও বিস্তারিতভাবে, কোথাও বা সংক্ষেপে। সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, "রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; এই বোধ। তাঁতী যেমন বলেছিল, 'রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা, রামের ইচ্ছাতেই ডাকাতি হ'ল; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়লো। রামের ইচ্ছাতেই আমাকে পুলিশে নিয়ে গেল, আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে ছেড়ে দিল।'"

কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। অন্যান্য ব্যক্তিদেরও এই একই কথা বহুবার বলিয়াছেন।

'কথামৃতে' তাঁহার আরেকটি উক্তি: 'তাঁর ইচ্ছাতে জীবজগৎ হয়েছে। তিনি ইচ্ছাময়।' এই উক্তির প্রথমাংশে আছে সৃষ্টিতত্ত্বের সূত্র। এ বিষয়ে অনেক দার্শনিক আলোচনা উপস্থাপিত করা যায়। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে তাহার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই।

'সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি—'[১] গানটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব গাহিতেন এবং ইহা তাঁহার অতি প্রিয় গান ছিল। গানটি তিনি যে

---

১ গানটির রচয়িতা সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় মতভেদ দেখা যায়। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত 'সঙ্গীত সংগ্রহে' (৯ম সং, পৃঃ ৫৯-৬০) প্রচলিত গানটির শেষে 'প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন' ইত্যাদি কয়েকটি অতিরিক্ত কলি সংযোজিত দেখা যায় এবং, বলা বাহুল্য, রামপ্রসাদই রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত। বেলুড় মঠ হইতে প্রকাশিত 'সাধন-সঙ্গীতে' রচয়িতার নাম 'অজ্ঞাত' (১৩৫৭ সালের সং, পৃঃ ২৪২ দ্র)। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে রামপ্রসাদকেই রচয়িতা বলা হইয়াছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'আমাদের গান'-এ (ষষ্ঠ সং, পৃঃ ৪৯) রচয়িতার নাম 'রাজা নবচন্দ্র'। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'সাধনা' সঙ্গীতগ্রন্থে (৭ম সং, পৃঃ ১৭৫) রচয়িতার নাম 'নবচন্দ্র রায়'। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রচয়িতা—রাজা নবচন্দ্র ('সংহতি', শারদীয়া ১৩৮৬, পৃঃ ৪৪)। স্বামী প্রভানন্দের মতে রচয়িতা—দেওয়ান রামদুলাল সরকার

শুধু গাহিতেন, তাহাই নহে ; উহার ভাব এবং ভাষা পর্যন্ত তাঁহার কথাবার্তায় বারংবার প্রকাশ পাইত—ইহা আমরা 'কথামৃতে' বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। যে গানই তিনি গাহিতেন, তাহার ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। ফলে শ্রোতারাও গানের ভাবে ভাবিত হইতেন। ভাবের সংক্রামিকা শক্তি আছে। আধার শুদ্ধ হইলে সেই শক্তি অবাধে ক্রিয়া করে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখে যাঁহারা এই গান শুনিয়াছেন এবং এই গানের ভাবের অনুকূল কথাও শুনিয়াছেন, বিশুদ্ধসত্ত্ব সেই সকল শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের অন্তরে যে, 'সকলি তোমার ইচ্ছা'—ভাবটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি ! আমরা দেখি, সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 'What we call nature, fate, is simply God's will.'—'আমরা যাকে স্বভাব বা অদৃষ্ট বলি, তা কেবল ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র।' স্বামীজীর এই উক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক গীত এই গানটিতে বা শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত 'রামের ইচ্ছা' গল্পটিতে যে তত্ত্ব আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই পাওয়া যাইবে না। স্বভাব কী ? স্বভাব আর প্রকৃতি—একই কথা। শংকরাচার্য বলিতেছেন, 'প্রকৃতির্নাম পূর্বকৃত-ধর্মাধর্মাদি-সংস্কারো বর্তমান-জন্মাদৌ অভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিঃ', অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত শুভাশুভ কর্মের ফলে যে সংস্কার বর্তমান জন্মের প্রারম্ভে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই প্রকৃতি বা স্বভাব। অদৃষ্ট আর দৈবও—একই কথা। 'দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম যৎ পূর্বদৈহিকম্।'—পূর্ব পূর্ব দেহে আমরা স্বয়ং যে কাজ করিয়াছি, তাহাই দৈব বা অদৃষ্ট। আমরা সুখ, বিশেষতঃ দুঃখ, ভোগের সময়ে বলি—'অদৃষ্টে ছিল।' শাস্ত্র বলিতেছেন, সুখদুঃখের কারণটা আমরা দেখিতে পাই না, তাই বলি অ-দৃষ্ট ; বস্তুতঃ আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মে কৃত কর্মই—যাহার অপর নাম 'অদৃষ্ট'—সুখ-দুঃখাদি ফলের কারণ। তাহা হইলে স্বামীজীর উক্তিটিতে আমরা এই পাইলাম যে, জন্মজন্মান্তরে আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা ঈশ্বরেচ্ছাতেই কৃত। এই সিদ্ধান্তের স্বতঃস্ফূর্ত অনুসিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, বর্তমান জন্মেও আমরা যাহা কিছু করিতেছি, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাতেই।

স্বামীজী তাঁহার 'Who knows how Mother plays !' কবিতাতেও লিখিয়াছেন :

What law would freedom bind ?
What merit guide Her will,
Whose freak is greatest order,
Whose will resistless law ?'
—'মুক্তিরে বাঁধিবে কোন্ নিয়মশৃঙ্খলে ?
ইচ্ছারে ফিরাবে তাঁর কোন্ পুণ্যবলে ?
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি—খেয়াল তাঁহার
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান।'

['কে জানে মায়ের খেলা !', ৪র্থ স্তবক]

('উদ্বোধন', অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৬১৫)। ফলতঃ এ বিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ আছে উল্লিখিত 'সাধন-সঙ্গীত' অনুসারে সম্পূর্ণ গানটি নিম্নরূপ :

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী,
আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি।

স্বামীজীর এই সকল উক্তি নিছক তত্ত্বমূলক উক্তি নহে, কেতাবী উক্তি নহে—তাঁহার জীবনের প্রতিপদে অনুভূত সত্য। ইহা তাঁহার পত্রাবলীতে আমরা লক্ষ্য করি। ১৮৯৪ সালে চিকাগো হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত একটি পত্রে আছে: 'প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই, বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্র দ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন।' পত্রটিতে 'তাঁর ইচ্ছা', 'প্রভুর ইচ্ছা' ইত্যাদি কথা বারবার পাওয়া যায়। ঐ পত্রেরই এক জায়গায় স্বামীজী লিখিতেছেন: 'সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হবো বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হ'লে সকল ল্যাটা চুকে যায়।'[২]

এই অনুভূতি শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী সারদানন্দজীরও। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন: 'The thing is, it is literally true, and I am finding it to be so every day at present that we cannot do anything, however little or simple, unless the Divine Being wills it.'—আসল কথা এই, ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, এবং বর্তমানে প্রত্যেকটি দিন আমি এইরূপই অনুভব করিতেছি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত আমরা কোন কাজই করিতে পারি না, সে কাজ যতই ছোট বা সহজ হউক না কেন।

তাঁহার আরেকটি পত্রে আছে: 'শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা তিনিই জানেন, আমরা উহার কি বুঝিব! উহা না বুঝিতে পারার জন্য যে কষ্ট তাহা ভোগ করিতেই হইবে—সেটাও তাঁহারই ইচ্ছায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১০ সালে অতিশয় অসুস্থ হইলে তাঁহাকে কনখল সেবাশ্রমে আনা হয়। সেখানে তাঁহার একান্ত ভক্ত স্বামী অতুলানন্দ তাঁহাকে স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তুরীয়ানন্দজী বলেন, 'গত ছয়মাস ধরে খুব ভুগছিলাম, কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করিনি। আমার কোন ভয়ও ছিল না। আমি মহাযাত্রার জন্য সদা প্রস্তুত। কিন্তু মা এখনও সেটি হতে দেননি। আরও গভীরভাবে এখন বুঝতে পারছি, তিনিই সব করছেন। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। তাঁর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি না

তাঁহার একটি পত্রে আছে: 'নিরুৎসাহ বা হতাশ হইও না। কেন সর্বদা সুদিন ও সুসময় আশা কর? মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সুদিনে দুর্দিনে আমরা যেন মাকে না ভুলি।'

স্বামী তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় একবার অসুস্থ হইয়া পড়িলে জনৈকা নার্স তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন। নার্সটি স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতিচারণ করিয়া পরবর্তী কালে বলেন: "মানবশক্তি অপেক্ষা জগন্মাতার শক্তি অধিক—এ কথা তিনি

২ এই উদ্ধৃতিতে 'ইচ্ছা' কথাটি না থাকিলেও, উহা অধ্যাহার করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ 'তোলেন'-এর অর্থ 'তুলিতে ইচ্ছা করেন', 'ফেলেন'-এর অর্থ 'ফেলিতে ইচ্ছা করেন'। এই ধরনের কথা উপনিষদেও আছে। কৌষীতকি উপনিষদ্ (৩।৮) বলিতেছেন: 'এষ হি এব এনং সাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে, এষ উ এব এনম্ অসাধু কর্ম কারয়তি তং, যম্ অধঃ নিনীষতে। এষ লোকপালঃ, এষ লোকাধিপতিঃ, এষ সর্বেশঃ···।'—যাঁহাকে ইনি ইহলোক হইতে উর্ধ্বলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সাধু কর্ম করান, আবার ইনিই তাঁহাকে অসাধু কর্ম করান, যাঁহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি সর্বেশ্বর···।

প্রায়ই আমাকে বলতেন। তিনি জগন্মাতার সন্তান। জগন্মাতা তাঁর জন্য যে ব্যবস্থা করবেন, তাতেই তিনি বিনা অভিযোগে সন্তুষ্ট থাকবেন। 'মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক'—এই বাক্য তাঁর জিহ্বা সদা উচ্চারণ করত এবং তাঁর মনও ইহা সদা অভ্যাস করত।"

শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর এই বিষয়ক কয়েকটি উক্তি :

> 'ভগবানকে ডাকলে তিনি বাধাবিঘ্ন সব কাটিয়ে দেন—কর্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন?'
>
> 'ভগবান কাউকে কর্ম না করিয়ে দয়া করেন, আর কাউকে কর্ম করিয়ে দয়া করেন—সে ভগবানের খুশী।'
>
> 'ভগবানই আমাদের কাজের মধ্যে রেগেছেন—তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের কর্মের পাশ কেটে দিতে পারেন।'

এই সকল উক্তিতে একদিকে কর্মবাদ, অন্যদিকে ঈশ্বরেচ্ছা—এই উভয়ের আপাতদ্বন্দ্ব আমাদের চিত্তকে আলোড়িত করে। শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী শিবানন্দের কথায় ইহার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। একদিন বেলুড় মঠে তিনি বলিয়াছিলেন : 'সর্বশক্তিমান করুণাময় শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং কর্মবাদকে যদি একই মতবাদের অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়, তাহা হইলে উহারা পরস্পর সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ যাঁহারা কর্মবাদে বিশ্বাসী, তাঁহারা উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানে বিশ্বাসী নহেন। আবার যাঁহাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা তাঁহারা কর্মবাদকে অতটা আমল দেন না; তাঁহারা বলেন, সুখ-দুঃখ কর্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে।' এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই ভক্ত অথবা লোককল্যাণে ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভক্তবৎ বিচরণ করেন, কারণ জগতের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে ভক্তির সাধনাই সহজসাধ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নিম্নলিখিত হৃদয়গ্রাহী উক্তিগুলি স্মরণীয় :

> 'প্রকৃত ভক্ত যারা, তারা কিছু আশ্চর্য দেখলেই মনে করে এ ভগবানের খেলা। তোমরা দেখছ, পাতা নড়ছে, বাতাস বইছে। কিন্তু ভক্ত মনে করে—তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতাও নড়তে পারে না।'
>
> 'প্রভু, আমি কর্মফল মানি না, তোমার রাজ্যে এ অবিচার কেন? এই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কি পাপ করেছে যে, তারা দুটি না খেতে পেয়ে মরছে? তুমি যদি এর একটা বিহিত না করো তো আমি এইখানে প্রাণত্যাগ করবো। প্রভু, আমি কপর্দকশূন্য পথিক সন্ন্যাসী, তুমি আমাকে এ দৃশ্য কেন দেখালে?'

এ পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে লোককল্যাণে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্তানগণের যে-ভাব অবলম্বনে মর্তস্থিতি, তাহার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 'সবই ঈশ্বরেচ্ছায় হইতেছে', এই ভাবটি কিন্তু পুরাতন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক গীত 'সকলি তোমার ইচ্ছা' গানটিই এ বিষয়ে প্রমাণ। নিঃসন্দেহে ঐ গানটি রচিত হইবার পূর্বেও বহু ভক্ত—সাধক ও সিদ্ধপুরুষ—ঐ গীতোক্ত ভাবের ভাবুক ছিলেন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছার কথা বলিয়াছিলেন—'সঃ অকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈত্তিরীয় উপ. ২।৬)। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে ভগবান যীশু প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন : 'Thy will be done in earth, as it is in heaven. (Mathew 6 : 10)—স্বর্গে

যেরূপ মর্তেও সেইরূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সুতরাং সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত 'ঈশ্বরেচ্ছা' কথাটি লোকমুখে যত্র তত্র শুনিতে পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। তবে অনেকেই উহা বলিলেও, সে-বলা মৌখিক মাত্র, তাঁহাদের জীবনের মর্মমূল উহা স্পর্শ করিতে পারে না। এই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন: 'কোন্‌টা তাঁর ইচ্ছা, কোন্‌টা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তাঁর ইচ্ছা সংসার করা, তুমি বলছ। যখন স্ত্রী, পুত্র মরে, তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না—দারিদ্র্য—তখন ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য 'শ্রীম'র রচনায় এবং স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ রচিত 'পরমার্থপ্রসঙ্গে'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহার শ্রীমুখে 'রামের ইচ্ছা' গল্পটি শুনিয়া 'শ্রীম'র হৃদয়ে যে দিব্য ভাব স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ তিনি 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগে 'সেবকহৃদয়ে' শীর্ষকে (ত্রয়োদশ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখান হইতে আমরা প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতেছি: "ঈশ্বরকে না জানলে, তাঁর দর্শন না হ'লে 'রামের ইচ্ছা', এটি ষোল আনা বোধই হবে না। তাঁকে লাভ না করলে এটি এক-একবার বোধ হয়; আবার ভুল হয়ে যাবে।···ঠাকুর বুঝালেন, 'রামের ইচ্ছা।' তোতাপাখির মত 'রামের ইচ্ছা' মুখে বললেই হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তাঁর ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয়, যতক্ষণ না 'আমি যন্ত্র' ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ-পুণ্যবোধ, সুখ-দুঃখবোধ, শুচি-অশুচিবোধ, ভাল-মন্দবোধ রেখে দেন; sense of responsibility রেখে দেন; তা না হ'লে তাঁর মায়ার সংসার কেমন ক'রে চলবে?"

'পরমার্থপ্রসঙ্গে' স্বামী বিরজানন্দ লিখিতেছেন: "[তথাকথিত 'বুদ্ধিমন্ত'রা] নিজেদের নির্বুদ্ধিতা, অকর্মণ্যাদি যত দোষ-ত্রুটি তাঁর (ঈশ্বরের) ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে খালাস! কোন কাজে নিজেদের দোষে বা চেষ্টার অভাবে বিফল হ'লে বলেন, 'তাঁর ইচ্ছা নয়।' আর যেটা করার ভারি ঝোঁক, ক'রে ফেলে পস্তান, আর বলেন, 'ঈশ্বরেচ্ছায় হয়েছে।' পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করছেন না করছেন, তাঁরা সব জেনে ফেলে দিয়েছেন! তাহলে তাঁরা তো কেউ-কেটা নন—সর্বজ্ঞেরও মর্মজ্ঞ! তাঁরা এও বলেন, 'বে ক'রে সংসারী হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত, সকলে সাধু হ'য়ে গেলে সৃষ্টিরক্ষা হবে কি ক'রে?' যেন জগৎ-সুদ্ধ লোক সাধু হবার জন্যে ছুটছে!

"আমরা কথায় কথায় যে, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা' বলি ও ঈশ্বরের দোহাই দিই, সেটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র; যেমন ছোট ছেলেমেয়েরা বলে, 'মাইরি, ঈশ্বরের দিব্যি'···। 'ঈশ্বরেচ্ছা' বোধ তারই ঠিক হয় ও ঐ ভাবের কথা বলা তার মুখেই সাজে, যে সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করেছে, যে জানে 'আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী', যার নিজের ভাল-মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা কিছুই নেই, সে নিন্দাস্তুতিতে, লাভালাভে, সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাসন্ন শুভ আবির্ভাবতিথি-স্মরণে আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা জানাই যে, 'সকলি তোমার ইচ্ছা' তাঁহার এই অতি প্রিয় গানটিকে তোতাপাখির শেখানো বুলিতে পরিণত না করিয়া আমরা যেন উহার অন্তর্নিহিত ভাবকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হই—ঐ ভাবে সিদ্ধ হইতে পারিলেই জীবন্মুক্তি—চিরশান্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি—এই অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা যেন সাধনপথে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে পারি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় আমাদের সাধনা যেন জয়যুক্ত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

পরিশিষ্ট

[ভাদ্র ১৩৮৪ সংখ্যার পর]

আমরা নারায়ণসেবার উদ্দেশ্যে আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গঠন করি, অনেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় করি, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এমনই ছিল যে, উহাকে একাধারে ভগবদুপাসনার স্থান—মন্দির, সুশিক্ষার প্রতিষ্ঠান—বিদ্যালয়, দীন-আর্ত-সেবার আশ্রম এবং নিরাশ্রয় রোগীর হাসপাতাল বলা চলে। যাঁহারা মায়ের নিকটে থাকার, তাঁহাকে দর্শন করার ও তাঁহার সহিত কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য লাভ করিতেন, তাঁহাদের সকলেরই অন্তরে মায়ের সর্বক্ষণ ভগবানের স্মরণ-মনন, সর্বাবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চলা এবং অতুলনীয় বিশ্বাস-ভক্তির ছাপ কম-বেশি কিছু-না-কিছু পড়িত। ঠাকুরের জন্য আলাদা ঘর বা মন্দির নাই; মা যেখানে যান বা থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আছেন। জয়রামবাটীতে মাটির দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গিতে ঠাকুরের আসন আছে। নিদ্রাভঙ্গে ঠাকুরদর্শন, প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া জপ-ধ্যান, সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম, কুটনোকোটা, স্নান, পূজা, রন্ধনাদির ব্যবস্থা করা, পান সাজা, ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া, প্রসাদ-গ্রহণ, বিশ্রাম; অপরাহ্নে সমাগত ভক্ত ও অন্যান্য লোকেদের সহিত আলাপ-আলোচনা, সকলের খোঁজ-খবর লওয়া; সন্ধ্যায় ধূপ-দীপ দিয়া ঠাকুরের চিন্তা; রাত্রে ঠাকুরকে ভোগ দিয়া প্রসাদ-গ্রহণ, নিদ্রা। অধিকন্তু অতিথি, কুটুম্ব, সাধু, ভক্ত প্রভৃতির সেবা। সংসারের কোন কাজে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা নাই। সবই ঠাকুরের জন্য। ঠাকুরেরই সংসার—তাঁহারই কাজ। তাঁহারই প্রেরণায় জীবনধারণ। তিনিই মালিক—তাঁহারই সংসারে দাসীগিরি; তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার সেবাই জীবনধারণের একমাত্র উদ্দেশ্য!

উচ্চকোটির সাধু হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি পর্যন্ত, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-স্ত্রী, ধনী-নির্ধন, বালক-বৃদ্ধ—সকল শ্রেণীর লোকই, নানা প্রশ্ন লইয়া মায়ের কাছে উপস্থিত হন। মা সকলের কথাই মনোযোগ দিয়া শুনেন এবং এমন সরল-সহজভাবে সকল সমস্যার সুমীমাংসা করিয়া দেন যে, সকলেরই সন্দেহভঞ্জন হয়, হৃদয় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের, সাধনভজনের, ঘর-সংসারের কাজকর্মের, শরীর-মনের ব্যাপারের—জীবনের সকল স্তরের দুরূহ বিষয়ের—মীমাংসার জন্য বহু সংশয়াকুল ব্যক্তি সর্বদা মায়ের সমীপে সমাগত হইতেন। মা মায়েরই মত পরম স্নেহে সকল সন্তানকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সুশিক্ষা প্রদান করিতেন সদাসর্বদা। দীন, দরিদ্র, রুগ্ন, আতুর, অনাথ—যে কেহ মায়ের নিকট উপস্থিত হইত, মা সাধ্যমত তাহাদের দুঃখমোচনে যত্ন করিতেন। বরাবরের জন্য সকলের অভাব-অনটন দূর করা সম্ভব হইত না বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে তাহাদের ম্লান, বিষণ্ণ বদনে মা প্রসন্নতা আনিতেন এবং অন্তরে আশা-ভরসাও জাগাইতেন। তাঁহার মুখের মিষ্ট কথা, চক্ষের সস্নেহ দৃষ্টি আর অন্তরের সহানুভূতি সকল দুঃখীর দুঃখ, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও, দূর করিয়া দিত। মা আর্ত, ক্ষুধার্তকে সাহায্য দিতেন—একমুষ্টি অন্ন

দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি, কর্মফলে দুঃখভোগ, সৎকর্ম ও ভগবৎকৃপায় সুখ-শান্তি লাভ ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন হৃদয়গ্রাহী অমৃতোপম উপদেশ দিতেন যে, তাহাদের মনে নিরাশায় আশার আলো দেখা দিত। মাকে অনেক ভক্ত ফল, মিষ্টি, বস্ত্রাদি, ঔষধ-পথ্য—বহু জিনিস দিতেন। মা সেগুলি অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অকাতরে বিলাইয়া দিতেন; এজন্য সর্বদাই তাঁহার দ্বারে, নানা প্রয়োজনে সমাগত, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে দূরাগত প্রার্থীদেরও দেখা যাইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুটে-মজুর, বেহারা, গাড়োয়ানদেরও মা আপনার সন্তানজ্ঞানে অতিশয় স্নেহপ্রীতির সহিত মিষ্টবাক্য বলিতেন, এবং কিছু-না-কিছু জলখাবার দিতেনই। ঐ অঞ্চলে গরীব মেয়েরা মাথায় তেল মাখিতে পাইত না, এজন্য তাহাদের চুলগুলি শণের মত খড়খড়ে হইয়া থাকিত। তাহারা মায়ের বাড়ীতে কোন কাজে আসিলে মা তাহাদের ভাল করিয়া তেল মাখিতে দিতেন এবং পেট ভরিয়া জলখাবার খাইবার জন্য মুড়ি-গুড় দিতেন।

মায়ের এই অদ্ভুত সংসারযাত্রাই কি 'অদ্বৈত-জ্ঞান আঁচলে বেঁধে' সংসার করা! মায়ের কাছে যাঁহাদের কিছুসময়ও থাকার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই দেখিয়াছেন এই 'অনলস, অনায়াস, নিষ্কাম কর্ম'। মায়ের এই অদ্ভুত কর্মযোগের বিষয় আগে অনেক বলা হইয়াছে, এখানেও দু-একটির উল্লেখ করিব।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশে বস্ত্রাভাবে ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত। বস্ত্রাভাবে মানুষের লজ্জানিবারণ কঠিন হইয়াছে। দেশড়া গ্রামে হরিদাস বৈরাগী নামে একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বেহালা বাজাইয়া, গান শুনাইয়া ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। অদ্য তিনি ভিক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের হরিনাম-কীর্তন, ভগবানের লীলাকথার বর্ণনামূলক সুমধুর সঙ্গীত লোকের মনোরঞ্জন ও ধর্মভাববৃদ্ধি করিয়া হৃদয় শান্ত-শীতল করিত। গান গাহিয়া ভিক্ষা করাই ইঁহাদের বৃত্তি। এদেশে সর্বসাধারণের বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি ভগবানের সকল নাম ও রূপেরই প্রতি ভক্তি-প্রীতি আছে, যদিও প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ইষ্টে নিষ্ঠা এবং সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য বর্তমান। হরিদাস বৈষ্ণব হইলেও শিব-শক্তির মহিমা গান করিয়া লোককে মোহিত করিতেন। তাঁহার মুখে 'কি আনন্দের কথা উমে! লোকের মুখে শুনি, সত্যি বল শিবানী, বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে' ইত্যাদি সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া, ভক্তপ্রবর নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে পাঁচ টাকা দান করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র মাতৃ-স্নেহের আকর্ষণে পল্লীগ্রামের বালক হইয়া তখন জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে বাস করিতেছিলেন। হরিদাস বৃদ্ধ, অধিকাংশ দাঁতই পড়িয়া গিয়াছে। বেহালাও পুরাতন, ভগ্নপ্রায়। কিন্তু বৃদ্ধের কণ্ঠের মিষ্টত্ব তখনও খুব আছে এবং ভাবে তন্ময় হইয়া গান গাহিয়া লোকের অন্তর পুলকিত করেন, পূর্বেরই ন্যায়। তাই তিনি গ্রামে আসিলে সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকে ও তাঁহার গান শুনে।

অদ্য মায়ের ঘরের বারান্দায় বসিয়া তিনি অনেক গান গাহিলেন। 'কি আনন্দের কথা উমে' গানটিও গাহিলেন কয়েকবার; সকলের মনে খুব আনন্দ হইল। বেলা হইয়াছিল। মা তাঁহাকে তেল দিয়া স্নান করিতে বলিলেন এবং তিনি স্নান করিয়া আসিলে আসন ও জল দিয়া কাঁসিতে করিয়া মুড়ি-গুড় ও প্রসাদ খাইতে দিলেন। হরিদাস মুড়ি ঢালিয়া বসিলেন, একটু নরম করিবার জন্য; মা-ও পাশে বসিলেন, আদরে খাওয়াইবার জন্য। সুখ-দুঃখের নানা কথা আরম্ভ হইল। হরিদাসের

নিজের সন্তানাদি নাই ; একটি বালককে পালন করিয়া বড় করিয়াছেন, কণ্ঠি দিয়াছেন, সে চেলা হইয়াছে—গান-বাজনা কিছু শিখিয়াছে। ভিক্ষা করিয়া সংসার চালাইতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু চালাক-চতুর নহে ; স্বাস্থ্যও খারাপ ; তাই বিশেষ কিছু রোজগার করিতে পারে না, অভাব-অনটনের সংসার খুব কষ্টেই চলে। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া মা তাঁহার দুঃখে খুব সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধের হৃদয় বিগলিত হইল, অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করা দায়, খুব কষ্টে দিন চলিতেছে। পেট ভরিয়া ভিজে মুড়ি-গুড় খাইয়া বৃদ্ধ খুব তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং আহারান্তে কাঁসিখানা ধুইয়া আনিয়া স্থানটি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মাকে প্রণামান্তর বিদায় মাগিলেন। মা সকালে স্নানান্তে যে কাপড়খানা বাহিরে রোদে শুকাইবার জন্য মেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আজকাল কাপড় বেশী আসছে না, তা না হ'লে একখানা নতুন কাপড় তোমাকে দিতুম, তবে এখানাও নতুন, দু'চার দিন ব্যবহার হয়েছে মাত্র।' বৃদ্ধ কাপড়খানি লইতে অতি সঙ্কুচিত হইলেন। মা বৃদ্ধকে অভয় দিয়া জানাইলেন, তাঁহার পরনের কাপড়ের অভাব নাই, আরও আছে। বৃদ্ধ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কাপড়খানি মাথায় জড়াইয়া মায়ের চরণে প্রণত হইলেন এবং মায়ের শুভাশীর্বাদ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক অতীব প্রসন্নচিত্তে বিদায় লইলেন। মায়েরও মুখ প্রসন্ন দেখা গেল।

গরীব-দুঃখীদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের সহানুভূতির প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত, বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর দেহত্যাগের সময়ে আমি বলরাম মন্দিরে ছিলাম। রামবাবুর শরীর যাইবার দুই-চারি দিন পূর্বে তিনি একটি উইল করেন। তখন শ্রীশ্রীমা অসুস্থ অবস্থায় উদ্বোধনে ছিলেন। ঐ উইল হইবার পরদিন অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট ঐ উইলের কথা জানাইয়া বলেন যে, রামবাবু তাঁহার উইলে ঠাকুরসেবা ও অনেক সাধুদের সেবার জন্য বহু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি সেই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত ছিলাম। সরলা দেবীর ঐ কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গরীব-দুঃখীর জন্য কিছু করলে ?'[১] আমি কিছু জানিতাম না। শ্রীশ্রীমায়ের গরীব-দুঃখীদের প্রতি দরদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শুধু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের অসুখে জয়রামবাটী আসিয়াছেন। সুস্থ হইবার পরও মা কলিকাতায় যাইতে অসম্মত হওয়ায় 'মায়ের দ্বারী' মাতৃসন্নিধানে পরমানন্দে মাসাধিক কাল বাস করিয়া উদ্বোধনে প্রত্যাবর্তনের জন্য দিন স্থির করিয়াছেন। তদনুসারে অদ্য সকালে মাকে ভক্তি-ভরে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণান্তর সকলে বাহির হইয়া পদব্রজে কামারপুকুর গেলেন। সেখান হইতে পরদিন যোগেন-মা ও গোলাপ-মা গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া যাইবেন ; শরৎ মহারাজ পালকিতে বদনগঞ্জ হাই স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইবেন এবং মধ্যাহ্নে শ্যামবাজারে ভক্ত হেডমাস্টার প্রবোধবাবুর বাড়ীতে আহার করিয়া সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়ায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন। অতিশয় ভক্তিমান প্রবোধবাবু অনেক খুঁজিয়া মহারাজকে বহন করিবার উপযোগী সেকেলে এক সুবৃহৎ পালকি ও জোয়ান আটজন বেহারা ঠিক করিয়াছেন। স্কুল পরিদর্শন ও

[১] উইলে উল্লেখিত বলরাম মন্দির সংক্রান্ত ট্রাস্ট ডীডে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী পরিচালনার নির্দেশ আছে।—সঃ

আহারে অবেলা হইল। মায়েরই স্বভাবপ্রাপ্ত মাতৃভক্ত সারদানন্দ নিজের সুখসুবিধার জন্য অপরকে উদ্‌ব্যস্ত করিতে অপারগ। শ্যামবাজারে ভক্তগণের অত্যধিক আগ্রহে ও উৎসাহে মহারাজের সেবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজনের ফলে বিলম্ব হইয়াছিল। তাহাদের খুব চিন্তিত দেখিয়া মহারাজ সকলকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ব্যস্ত হইয়া তাড়াহুড়া করিবার প্রয়োজন নাই। মহারাজের সঙ্গিগণ মনে-মনে বিরক্ত হইলেও মহারাজের জন্য কিছু বলিতে পারিলেন না এবং বিলম্ব হইলেও সকলে পরম সন্তোষে ভোজন ও বিশ্রামাদি করিলেন.

বিশ্রামান্তে দেখা গেল, কোয়ালপাড়া পৌছিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাইবে। সেজন্য স্থির হইল, জয়রামবাটী আসিয়া মহারাজ রাত্রে মায়ের বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে কোয়ালপাড়া যাইবেন। সন্ধ্যাকালে পালকিতে করিয়া মহারাজ জয়রামবাটী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পৌছিয়া পালকি হইতে অবতরণ করিলেন। মায়ের ও ঠাকুরের জন্মস্থানে তিনি খালিপায়ে যাতায়াত করেন। খালিপায়ে হাঁটিয়া, জুতা হাতে করিয়া মায়ের বাড়ীতে যখন পৌছিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। তৎপূর্বেই স্বামী ভূমানন্দ আসিয়া মায়ের বাড়ীতে তাঁহাদের পুনরাগমন ও রাত্রিবাসের কথা এবং রাত্রে আহারাদির প্রয়োজন নাই, জানাইয়াছিলেন। মহারাজের আগমনে সকলে খুব খুশি। মহারাজের বিছানা-পত্র কোয়ালপাড়ায় চলিয়া গিয়াছিল। মা নিজের ঘর হইতে বিছানাদি দিয়া, ভাল করিয়া বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন। মহারাজ মাকে প্রণাম করিয়া 'রাত্রে কিছু আহারের প্রয়োজন নাই, অবেলায় খুব বেশী খাওয়া হইয়াছে' জানাইলেও, মা একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জল খাইতে বলিলেন—একেবারে খালিপেটে ছেলেরা রাত্রে শুইয়া থাকিবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না—মনে দুঃখ হইবে। মায়ের কথায় তাঁহারা মিষ্টিমুখ করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলেন। পালকির বেহারাদের বড়মামার বৈঠকখানায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রে জলখাবারের জন্য ভূমানন্দজী পূর্বেই তাহাদের একটা টাকা দিয়াছিলেন। মা বেহারাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, সে সব ঠিক করা হইয়া গিয়াছে।

সকল হাঙ্গাম মিটিয়া গেলে, মা খুশি ও নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিলেন। বাহিরের ঘরে সকলে মহারাজের সঙ্গে বসিয়া বদনগঞ্জ স্কুলের অভ্যর্থনাদি, শ্যামবাজারে প্রবোধবাবুর বাড়ীতে সকলের উৎসাহ, সাদর অভ্যর্থনা, ভোজনের পরিপাটি ইত্যাদির গল্প শুনিতেছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। হঠাৎ মায়ের ঘরের দিকে, সদর দরজার কিনার হইতে শব্দ শুনা গেল, 'ওগো, তোমরা সব শুয়ে পড়লে, আমাদের জলখাবার দিলে না?' উচ্চ আওয়াজ না হইলেও নিস্তব্ধ রাত্রে সেই শব্দ অকস্মাৎ বৈঠকখানাতে আলোড়ন উপস্থিত করিল। ভূমানন্দস্বামী তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দরজা খুলিয়া বাহিরে গেলেন এবং সেই বাক্য-উচ্চারণকারীর নিকটে গিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিলেন। মা যে-ছেলের কাছে বেহারাদের জলখাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি বৈঠকখানার পিছনের দরজা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং এক হাতে মুড়ির টিন ও অপর হাতে গুড়ের পাত্র লইয়া আসিয়া নিমেষের মধ্যে সেই লোকটির কাপড়ে মুড়ি যথেষ্ট ঢালিয়া দিয়া গুড়ও দিলেন। ভূমানন্দস্বামী সেই লোকটিকে লইয়া বড়মামার বৈঠকখানার দিকে গমন করিলেন।

মায়ের নিদ্রাবেশ হইয়াছিল। পূর্বোক্ত উচ্চ আওয়াজে তাঁহার নিদ্রাবেশ কাটিয়া গেল। শুইয়া

শুইয়াই ডাকিলেন, 'বাবা—'। সন্তান তত্ক্ষণে মুড়ি দিয়া তাঁহার বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জবাব দিলেন, 'মা'। 'বাবা, বেহারাদের জলখাবার দেওয়া হয়নি?'—মা জিজ্ঞাসা করিলে সন্তান জানাইলেন যে, তিনি মুড়ি-গুড় দিয়া আসিয়াছেন এবং পূর্বেও তাহাদের একটি টাকা জলখাবারের জন্য দেওয়া হইয়াছিল। মায়ের ভাঁড়ার হইতে মুড়ি-গুড় দিয়া, তাহাদের খুশি করা হইয়াছে শুনিয়া মা আনন্দিত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

এদিকে বড়মামার বৈঠকখানায় ভীষণ ব্যাপার! ভূমানন্দস্বামীর রুদ্রমূর্তি ও কঠোর বাক্যে গরীব বেহারারা কম্পিতকলেবর,—জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। স্বামীজী শাসনবাক্যে বলিতেছেন, 'তোমাদের প্রথমেই জলখাবারের জন্য একটি টাকা দিয়ে ব'লে দিয়েছি, আর কিছু চেও না; তবে এই গভীর রাত্রে আবার বিরক্ত করতে গিয়েছিলে কেন? মায়ের ঘুম ভাঙিয়েছ, বাড়ীসুদ্ধ সকলকে উদ্‌ব্যস্ত করেছ কেন?' বেহারাদের সর্দার, যে খাবার চাহিতে গিয়াছিল, সে অত্যন্ত কাতরভাবে নিবেদন করিল, "মশায়, আমরা পাড়ায় মুড়ি কিনতে গিয়েছিলুম—পাড়ার লোক সব বললে, 'ব্যাটারা আহাম্মক! মায়ের বাড়ী এসে রাত্রে মুড়ি কিনতে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছ? যাও, দরজার পাশে গিয়ে চাইলেই, এক্ষুনি পেটভরা মুড়ি-গুড় পেয়ে যাবে।' মশায়, আমরা যেতে চাইনি, ওরা বার বার বলতে লাগল, আর আমাদের ক্ষিদেও পেয়েছে—কোথায় মুড়ি পাব-না-পাব ঠিক নেই, তাই ভেবে-চিন্তে গিয়ে আস্তে আস্তে একবার বললুম, আর মুড়ি-গুড়ও পেয়ে গেছি। আমাদের কোন অপরাধ নেই—এখানকার লোকেরাই আমাদের শিখিয়ে পাঠিয়েছে।" ভূমানন্দজীর রাগ অনেকটা কমিল বটে, তবুও বলিলেন, 'দে টাকা ফেরত।' তাহারা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিলে, আর টাকা লইলেন না। মায়ের বৈঠকখানায় ফিরিয়া গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজকে যখন সকল ঘটনা জানাইলেন, তখন মহারাজ খুব কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'মায়ের বাড়ীর মুড়ি-গুড় ত তাদের পাওনা, ঠিকই আদায় করেছে—যাঁরা বেশী সাবধান হয়ে অগ্রিম টাকা দিয়েছেন, তাঁরাই ত ঠকেছেন।'

এমনি অপরিচিত বেহারা-মজুরদের পর্যন্ত মা কিরূপ স্নেহমমতা করিতেন এবং তাহা লোকের অন্তরে কিরূপ মুদ্রিত হইয়া যাইত, এই ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

পরদিন ভোরে, মা ভালভাবে জলযোগের আয়োজন করাইলেন, কারণ রাত্রে ছেলেদের খাওয়া হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ঘাটে চমৎকার মাছও ধরা পড়িল, টাটকা মাছ ভাজা, গরম গরম লুচি, ছেঁচকী, মিষ্টি ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল। মহারাজ সকালেই আমোদরে গিয়া তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরকে তাড়াতাড়ি ভোগ দিবার জন্য মা নির্দেশ দিলে একটি সন্তান সব ঠিক করিয়া ভোগ দিলেন। মায়ের বারান্দায় মায়ের সামনে বসিয়া সঙ্গিগণ সহ মহারাজ খুব তৃপ্তির সহিত টাটকা আস্ত বাটামাছ-ভাজা চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেছেন, মা চাহিয়া দেখিতেছেন। ঘোমটা-ঢাকা মুখে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করিয়া মা ভাল করিয়া দেওয়াইয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইলেন। মহারাজের প্রিয় চায়ের জন্যও সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

মা ঘোমটা টানিয়া খাটের উপর বিছানায় বসিয়া আছেন। মহারাজ নীচে বসিয়া হাঁটু গাড়িয়া মায়ের পদযুগল দুইহাতে ধরিয়া ধীরে ধীরে মস্তকে ধারণ করিলেন এমনই ভক্তিভাবে যে, দেখিয়া সকলেরই নয়ন আর্দ্র ও মন দ্রবীভূত হইল। মা স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তে আস্তে আশীর্বাণী

উচ্চারণ করিলেন। মহারাজ অতি কাতরভাবে করজোড়ে প্রার্থনা জানাইলেন, মা যেন তাঁহার নিজ দেহের প্রতি একটু নজর দেন, যাহাতে দেহ সুস্থ-সবল থাকে।

এই সময়ে একটি বিসদৃশ ঘটনা ঘটায় মহারাজ একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন। মহারাজ মাকে প্রণামান্তর ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে যাইবেন, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া তাঁহার পদে প্রণত হইলে মহারাজ আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মচারী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব। তখন একজন প্রাচীন ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'গুরু-সমীপে প্রণাম লইতে নাই।' ব্রহ্মচারী লজ্জিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরে মহারাজ বাহিরে বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইয়া সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন দেখিয়া নিকটস্থ হইয়া আবার প্রণাম করিয়া মহারাজের শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। উভয়েরই মন প্রসন্ন হইল।

শীতকাল। দুইটি সন্তান দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন মাকে দর্শন করিতে। মা তখন জ্বরে অসুস্থ। তাঁহারা অপরাহ্ণে মায়ের বাটীতে পৌঁছিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে মুড়ি ছাড়া অন্য কিছু খাবার আছে কিনা; সারাদিন তাঁহাদের আহার হয় নাই, অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়াছেন, বড়ই ক্ষুধার্ত। মায়ের বাটীতে অবস্থানকারী একজন সন্তান বলিলেন যে, দ্বিপ্রহরে খিচুড়ি হইয়াছিল, সেই খিচুড়ি আছে, তবে উহা ঠাণ্ডা, শীতকালে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া উচিত নহে। একটু অপেক্ষা করিলে উহা গরম করিয়া দেওয়া যাইবে। তাঁহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, অপেক্ষা না করিয়া সেই ঠাণ্ডা খিচুড়িই তৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া খাইলেন। মাকে এসম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মা অপরের নিকট একথা শুনিয়া সেই খিচুড়ি-পরিবেশনকারী সন্তানকে ডাকিলেন। মা বিছানায় পড়িয়া আছেন, সন্তান নিকটে উপস্থিত হইতেই কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, 'বাবা, ওদের ঠাণ্ডা খিচুড়ি খেতে দিলে—যদি অসুখ করে?' মায়ের দুঃখ ও উদ্বেগ দেখিয়া তাঁহারও মনে চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি মাকে অতিশয় নম্রভাবে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারও ইচ্ছা ছিল না ঠাণ্ডা খিচুড়ি দিতে, কিন্তু উঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ করায় বাধ্য হইয়া দিয়াছেন। মা আপসোস করিতে লাগিলেন—তাঁহার অসুখ দেখিবার জন্য ছেলেরা কত কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, নিজে কিছু খাওয়াইতে পারিলেন না, এখন এই ঠাণ্ডা খিচুড়ি খাইয়া নিজেরাই না অসুস্থ হয়! সন্তানও বুঝিলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিলেই ভাল হইত। উভয়ে উদ্বেগে রহিলেন, কিন্তু ঠাকুরের কৃপায় তাঁহাদের কোন অসুখ করে নাই দেখিয়া প্রভাতে উভয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন।

মায়ের অতি স্নেহ-যত্নে ছেলেদের খাওয়ান সম্বন্ধে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একটি সন্তান অসুস্থ হইয়া চিকিৎসা ও বায়ু-পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র গিয়া মাসখানেক থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, শরীর বেশ ভালই হইয়াছে। রাত্রে আহারে বসিয়াছেন অপরের সঙ্গে। মা খাওয়াইতেছেন, সকলকে রুটি দিতেছেন; তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখানা রুটি দিবেন। তিনি চারখানা দিতে বলিলে মা আতঙ্কিত হইয়া আর্তস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'এ্যা—কি! তুমি এখনও চারখানা রুটির বেশী খেতে পারনি?' মায়ের স্বরে এমনই একটি বেদনা প্রকাশ পাইল যে, শুনিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন; মনে হইল, যেন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সন্তান মাকে আশ্বস্ত করিয়া জানাইলেন, তাঁহার শরীর খুব

ভালই আছে, আর রাত্রে চারখানির বেশী রুটি তাঁহার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় ঘটনা। একটি সন্তান মায়ের বাড়ীতে রহিয়াছেন। তিনি যেদিন পরিশ্রমের কাজ,কিংবা ডন, বৈঠক, কুস্তি ইত্যাদি বেশী করেন, সেদিন রাত্রে রুটি বেশী খাইয়া ফেলেন। রাঁধুনী ব্রাহ্মণী এজন্য তাঁহার উপর চটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে রাঁধুনী সেই সন্তানটিকে রুক্ষস্বরে বলিল, রাত্রে তিনি কয়খানি রুটি খাইবেন যেন ঠিক করিয়া বলেন। রাঁধুনীর বাক্য মা শুনিতে পাইলেন, খাওয়া সম্বন্ধে এরূপ কর্কশ বাক্য বলায়, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি রাঁধুনীকে লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'জোয়ান ছেলে, পেটভরে রুটি খাবে। যতখানা খেতে পারে খাবে, তার আবার গোনাগুনি কি? তোমায় কিছু করতে হবে না, আমিই ছেলেদের দেখবো'খন!' মায়ের কথায় লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া রাঁধুনী সরিয়া গেল, আর রুটির সংখ্যা সম্বন্ধে খোঁজ করিল না। খাওয়ানোতেই মাতৃহৃদয়ের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র।

গর্ভধারিণীর ন্যায় ছেলেদের খাওয়ানোতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শরীরের পুষ্টি হয়; মা-ও সেইভাবেই তাঁহার সন্তানদের খাওয়াইতেন। আহার্যবস্তু যাহাতে সুসিদ্ধ, স্বাদিষ্ঠ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তাহার জন্য মা যত্ন করিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু জিহ্বার লালসাবৃদ্ধি বা ভোজনে বিলাসিতা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। বিশেষ উপলক্ষেই উত্তম ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হইত, কিন্তু তাহাও অতি অল্প পরিমাণে। মায়ের তৈরী খাবার খাইয়া কোন সন্তানের কখনও অসুখ করিতে দেখা যায় নাই। সন্তানের শারীরিক উন্নতির মতো মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও মা কিরূপ আগ্রহান্বিতা থাকিতেন, সে সম্পর্কে দুই-একটি ঘটনা লিখিতেছি। একটি সন্তান ম্যালেরিয়ায় অনেকদিন ভুগিয়া জন্মস্থানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'কিছুদিন থেকে হাওয়া বদল করে এসো।' তিনি তখনও সংসার-সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছাড়েন নাই। যাইবার সময় মা বলিয়া দিলেন, 'বাপ-মাকে হর-গৌরীর মত দেখবে, তাঁদের সেবা করবে—এতে মনের উন্নতি হবে।' ইহার বৎসর-তিনেক পরে আবার শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি দেশে যাইবার অভিপ্রায় মায়ের নিকট নিবেদন করিয়া অনুমতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে ও তাঁহার আশীর্বাদ লইতে উপস্থিত হইলেন, তখন মা অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, 'বাড়ীতে বেশী দিন থেকো না, মোহে পড়ে যাবে।' মা সন্তানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলেন সত্য, কিন্তু মায়ের কষ্ট ও ভাবনা সন্তানের হৃদয় স্পর্শ করিল। বাস্তবিক পক্ষে মা কি ভবিতব্য চক্ষের সামনে দেখিতেছিলেন? সত্যসত্যই সন্তান দেশে যাইয়া নানা হাঙ্গামে জড়িত হন এবং প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্যপথে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, শুধু মায়ের সেই সাবধানবাণী ও ব্যাকুলতা তাঁহাকে মোহগর্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। একটু একটু করিয়া তিনি যখন অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন, তখন হঠাৎ মায়ের সেই সকরুণ বদনমণ্ডল চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল; আর কোন দিকে না চাহিয়া, পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া মায়ের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। মা যেন তাঁহার স্নেহের শিকলেই সন্তানকে টানিয়া আনিলেন!

সংসারে কিভাবে জীবনধারণ করিতে হইবে? বিষয়ের মোহ সকলেরই চিত্ত কলুষিত করে। সাধুদের পক্ষে কামকাঞ্চনের সম্পর্ক হইতে দূরে থাকার সুবিধা যেমন আছে, তেমনি আবার ব্যক্তিবিশেষের অতৃপ্ত

ভোগতৃষ্ণায় বিড়ম্বিত হইবার ভয়ও থাকে। গৃহস্থের পক্ষে ধর্মপথে ভোগবাসনার তৃপ্তি কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও, মোহবন্ধন সমধিক দৃঢ় দেখা যায়। সেজন্য সাধারণ ঘটনাতেও ঠাকুরের গভীর তত্ত্ব-দৃষ্টির উল্লেখ করিয়া মা বলিতেন, "ঠাকুর দেখতেন হালদার পুকুরে পানকৌড়ি জলে ভাসে, ডোবে, সাঁতার দেয়, কিন্তু তার গায়ে একবিন্দু জল থাকে না, সব ঝেড়ে ফেলে দেয়। তাই দেখে বললেন, 'সংসারে ঠিক এইভাবেই থাকতে হবে, বিষয়ের মধ্যে মানুষ থাকবে বটে, কিন্তু মন থেকে বিষয়াসক্তি সব ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।' সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকার জন্যে ঠাকুর সকলকে শিক্ষা দিতেন।"

সংসারের বহু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিবারাত্র থাকিলেও, সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক পাঁচজনেরই একজন হইলেও, সকল প্রকার কাজকর্মের দায়িত্ব বহন করিলেও মা অন্তরে সর্বদা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতেন। ঠাকুরের সংসার, তিনি যেমন রাখেন তেমনি থাকিতে হইবে; ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ স্বীয় কর্মফলে আসিতেছে, যাইতেছে। উহাদের ভাবনায় চিত্ত চঞ্চল না করিয়া, ভগবানে ভক্তিভাব স্থির রাখিয়া সব কিছু সহ্য করা, সংসারের কোন বিষয়ের প্রতি টান না রাখা, সব টান অন্তর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া, পানকৌড়ির জল ঝাড়ার মত—মায়ের উপদেশে, শিক্ষায়, ব্যবহারে, কাজকর্মে, ইহাই সর্বদা দেখা যাইত।

সংসারের জাঁকজমক, ঐশ্বর্যভোগ ক্ষণস্থায়ী—এই আছে এই নাই। মা কামারপুকুর-গ্রামে প্রথম জীবনে যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন, পরে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই সকল কথা উল্লেখ করিয়া সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। কামারপুকুরে ঠাকুর-বাড়ীর উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত যুগীদের সম্বন্ধে বলিতেন, 'ঐ যুগীদের বাড়ীতে কত লোকজন, কি রকম সুখসমৃদ্ধি ছিল, এখন দেখ,—সব শেষ। [পূর্বপার্শ্বে] লাহাদের ঐশ্বর্যসমৃদ্ধির কথা ত বলবারই নয়, ঐ অতিথিশালা, সদাব্রত, ঠাকুরবাড়ী, লোকজন, উৎসব, পর্ব, বার মাসে তের পার্বণ; [ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে] ঐ খিড়কী পুকুর—নীল জল থই থই করত, কোথায় গিয়েছে সে সব! [ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপার্শ্বে] পাইনরাও ধনী পরিবার, বহু লোকজন, দেখতে দেখতে সব নিঃশেষ!' সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, ধন-ঐশ্বর্যের অস্থিরতা চিন্তা করিয়া সন্তানদের অন্তরে যাহাতে ঐশ্বর্যের মোহ-মদ না আসে, সেজন্যই এই সকল বিষয় উল্লেখ করিতেন। এ সকল ভোজবাজীর খেলা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে একদিন, ইহা মনে রাখিতে পারিলে, অন্তরে সত্যই বৈরাগ্য আসে।

নিজের সুখভোগের জন্য অন্তরের দয়া-ভাব যাহাতে কখনও লোপ না পায়, সেই বিষয়ে ঠাকুরের একটি গল্প বলিয়া মা শিক্ষা দিতেন। ঠাকুর ভূতির খালের দিক হইতে বাড়ী ফিরিতেছেন। বৃষ্টি হইয়াছিল। জলধারা পুকুরে পড়ায় পুকুর হইতে একটি মাগুর মাছ সেই ধারা বাহিয়া উপরে উঠিয়াছিল, এখন ডাঙ্গায় আটকা পড়িয়া ছটফট করিতেছে। দয়ার শরীর ঠাকুর ইহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জলের অভাবে মাছের কষ্ট তাঁহার প্রাণে অনুভূত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মাছটিকে হাতে করিয়া তুলিয়া নিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিলেন। জলে পড়িয়া মাছের কি আনন্দ! ঠাকুরও তাহার খেলা দেখিয়া পরম পুলকিত। হৃদয় পিছনে আসিতেছিল, ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইয়া বলিল, 'মামা, করলে কি? এমন মাছটা পুকুরে ছেড়ে দিলে?' ঠাকুর হাসিলেন, নিজের খাওয়ার সুখ তাঁহার মনে নাই,

অপরের প্রাণরক্ষার আনন্দেই তিনি আনন্দিত।[২] নিজের সুখভোগের আশা না ছাড়িলে অপরকে সুখী করা যায় না; অপরকে সুখী করিতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা—এই শিক্ষাই মা দিতেন।

ইদানীং ঠাকুরের মহিমা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, ঠাকুর এবং মায়ের সহিত নিজেদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া নানা প্রকার গল্পগুজবের সৃষ্টি করা হইতেছে এবং সরলপ্রাণ ভক্তদের নিকট উহা প্রচার করিয়া লোকে মতলব হাসিল করিতেছে, ইহা মা উত্তমরূপেই জানিতেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহার সন্তানদিগকেও সাবধান করিয়া দিতেন। একদিন জনৈক সন্তান শিহড়ে বেড়াইতে গিয়া হৃদয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে হৃদয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরিচয় দিয়া জনৈকা বালবিধবা ও তাঁহার কনিষ্ঠ অনুজ পরিচয় দিয়া জনৈক প্রৌঢ় তাঁহাকে অনেক অনেক প্রাচীন গল্পগুজব শুনাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া মায়ের নিকট ঐ সকল বর্ণনা করিলে মা গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'কি জানি বাবা, আজকাল তাঁর সম্বন্ধে কত লোকে কত কথা বলে! আগে এসব শুনিনি।' সে বহুকাল পূর্বের কথা; ঠাকুর-মার মহিমা দিন দিন অধিকতর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতীয় প্রাচীন কাহিনী অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন কামারপুকুর-জয়রামবাটী অঞ্চলে বহিরাগত ভক্তগণ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাবলী শ্রবণ করেন, যাহা ৪০।৫০ বৎসর[৩] পূর্বেও আমরা শুনি নাই। এই সকল গল্পগুজব প্রচার করা দোকানদারী ও অর্থোপার্জনের নূতন ফিকির হইলে, বড়ই দুঃখের বিষয়।

ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, ত্যাগ ও তপস্যার দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া লোকব্যবহার করিবার জন্য মা তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁহার কোনও সন্তানকে ঠাকুরবাড়ীর (কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীর) কিংবা মামাবাড়ীর (জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পিত্রালয়ের) সঙ্গে সাংসারিক সম্পর্ক রাখিতে কখনও বলেন নাই, কখনও উৎসাহিত করেন নাই। সেজন্য, মা স্থূল-দেহে বর্তমান থাকা-কালে ঐ সকল স্থানে যে সকল সন্তান সময় সময় অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা ঠাকুর-মায়ের পিতৃ-মাতৃ-কুলের সকলকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করিলেও, এমন কি গ্রামবাসীদের প্রতি সম্মান ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেও বেশী মেলামেশা করিতেন না এবং মা-ও সর্বতোভাবে তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণকে বৈষয়িক প্রভাব ও বিষয়ী লোকের নিকট হইতে দূরে রাখিতেন। ভগবৎ-সম্পর্ক ব্যতীত অন্য সকল সম্পর্ক মা তাঁহার সন্তানগণের অন্তর হইতে মুছিয়া দিবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। ইদানীং কুটুম্ব-কুটুম্বিতার ভাব দিনে দিনে প্রবল হইতেছে। ভগবানের লীলায় মায়িক ব্যবহার মিশাইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সহিত তাঁহার অভীষ্টদাত্রী জগজ্জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মা ও মেয়ে উভয়রূপের লীলাভাস আমাদের ক্ষুদ্র মনোবুদ্ধির ধারণাতীত বস্তু হইলেও সেই

২ এই ঘটনার বিবরণ স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী ঈশানানন্দ সামান্য পৃথক্‌ভাবে দিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ৫৩-৫৪ ও পৃঃ ২৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য। অবশ্য তিনটি পৃথক্ বিবরণ যে একই ঘটনার, ইহা প্রমাণ করা কঠিন। —সঃ

৩ লেখকের রচনার যে প্রতিলিপি হইতে আমরা এই স্মৃতিকথা প্রকাশিত করিতেছি, তাহার শেষে ৭. ৬. ৬৬ তারিখ লেখা আছে। —সঃ

অলৌকিক শুদ্ধ প্রেমাভক্তির বিদ্যুচ্ছটায় সময় সময় চোখ ঝলসাইয়া গিয়াছে নিঃসন্দেহে। প্রশান্ত বারিধির ন্যায় গভীর গম্ভীর, হিমাচল-সদৃশ অচল অটল, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কর্ণধার সারদানন্দ মহারাজ জয়রামবাটীতে মায়ের দরজায় বসিয়া পল্লীগ্রামের সাধারণ লোকের, বালক-বৃদ্ধ সকলের সহিত সমানভাবে মিশিয়া খোলা প্রাণে হাসি-তামাসা রঙ্গরস করিতেছেন, তাহাদের দাকাটা মোটা তামাক খাইতে খাইতে গল্প বলিতেছেন ও শুনিতেছেন! ক্ষেতের কড়াইশুটি, ঘরের মুড়ি কি উপাদেয় বস্তু! পোস্তচাটুই, কলায়ের ডাল, চুনো মাছের টক, পোনা মাছের ঝোল, দু'সিদ্ধ চালের ভাত কি উপাদেয়! স্বর্গেও এমন সুস্বাদু সুন্দর ভোজ্যদ্রব্য দুর্লভ। মায়ের দেওয়া-জিনিসের মত প্রিয় জিনিস সন্তানের আর কি থাকিতে পারে! আবার কন্যার অসুখে পিতার কি চিন্তা ও উদ্বেগ! কোথায় কলিকাতা শহরের সুখ-সমৃদ্ধি-আরাম এবং চলাচলের যানবাহনের সুবিধা, আর কোথায় দুর্গম ম্যালেরিয়াপূর্ণ, কোন প্রকার আধুনিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লেশমাত্রশূন্য ক্ষুদ্র পল্লী জয়রামবাটী! সর্বপ্রকার দুঃখ অকাতরে সহ্য করিয়া দূর পথ অতিক্রম করিয়া স্নেহময় পিতা ছুটিয়া চলিয়াছেন, প্রাণের দুলালী কন্যারত্নকে দেখিবার ও সুচিকিৎসা-ঔষধপথ্যাদির সুব্যবস্থার জন্য। রুগ্না কন্যার পার্শ্বে পিতা যখন দাঁড়াইলেন, তখন উভয়ের চক্ষুতে কি দৃষ্টি—মাত্র তাঁহারাই বুঝিলেন! অপরের কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল দুইটি অস্ফুট মধুর ধ্বনি—'বাবা' 'মা'।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়ের চারিজন প্রাচীনা, অতি উচ্চশ্রেণীর ভক্তিভাবাশ্রিতা মহিলাকে দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় করিয়াই তাঁহারা তখন জীবনধারণ করিতেছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহারা আমাদের মত মনুষ্যশরীরী হইলেও অন্তরে তাঁহাদের সিদ্ধদেহে তাঁহারা ভগবল্লীলারস কিরূপে আস্বাদন করিতেন তাহা তাঁহাদের স্বসংবেদ্য; তবে আমাদের ক্ষুদ্রদৃষ্টির সম্মুখে যে সামান্য লীলাভাস প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে অনুমিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে তাঁহারা মা ও মেয়ে উভয়-ভাবেই যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। উঁহারা চারিজনেই এক এক কন্যার জননী ছিলেন এবং অল্পায়ু দুদিনের কন্যাকে হারাইয়া নিত্যা অবিনাশিনী কন্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন চিরকালের জন্য। সারা জগতের সকল কন্যার একীভূত সার-সত্তার মূর্ত বিগ্রহ হইয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের নিকট বাৎসল্যরসের পরাকাষ্ঠা প্রকট করেন—কন্যারূপে; আবার নিখিল-মাতৃ-হৃদয়-স্নেহ-পারাবার হইয়া তাহাদের চরম বাৎসল্যরস-পানও করান মাতৃরূপে।

১। পূজনীয়া গোলাপ-মা একমাত্র কন্যাকে হারাইয়া শোকার্তা হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের শরণাপন্না হইয়াছিলেন। 'শোকাতুরা ব্রাহ্মণী'—এই ছদ্মনামে 'কথামৃতে' তাঁহার উল্লেখ আছে। পরবর্তী জীবনে মাতাঠাকুরানীকে আশ্রয় করিয়া তিনি উদ্বোধনে বাস করেন। সেই সময়ে আমরা তাঁহার দর্শনলাভ করি। সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে মাতাঠাকুরানীকে তিনি যেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, তেমনি তাঁহাকে সাক্ষাৎ স্বীয় তনয়ারূপেও দেখিয়া হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা ঢালিয়া দিয়া দিবারাত্র সেবা-শুশ্রূষা ও লালন-পালনে সচেষ্ট থাকিতেন।

২। পূজনীয়া যোগেন-মার কথাও 'কথামৃতে' আছে। যেদিন ঠাকুর গোলাপ-মার বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করেন, সেই দিন 'গণুর মা'র (যোগেন-মা) গৃহেও শুভাগমন করিয়া উহা পবিত্র করেন। যোগেন-মা ছিলেন তন্ত্রসমূহের সারসংগ্রহ 'প্রাণতোষিণী'র প্রকাশক প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের

পুত্রবধূ। অতুল বৈভব নষ্ট হওয়ায় তিনি কষ্টে জীবনযাপন করিতেছিলেন। তদুপরি একমাত্র সন্তান, কন্যাকে হারাইয়া তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তখন সাক্ষাৎ জগদম্বা শ্রীশ্রীমা এই উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধিকার সকল সাধনার সিদ্ধিফলরূপে তাঁহার মা ও মেয়ে হইয়া সকল দুঃখের অবসান করেন। মাতাঠাকুরানীর দেহত্যাগের কিছুকাল পরে একদিন যোগেন-মার জনৈক স্নেহভাজন তাঁহাকে উদ্বোধনে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ায় দুঃখ প্রকাশ করিলে যোগেন-মা শ্রীশ্রীমার পটের দিকে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অতীব আর্তস্বরে বলিলেন, 'কি করব বাবা! দেহ ভেঙে পড়েছে, উনিই যে ভেঙে দিয়ে গেলেন, বাবা।' তারপরে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে বিছানার উপরে মায়ের চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩। ভানি পিসী (মানগরবিনী)। মায়ের পিত্রালয়ের নিকটেই তাঁহার জন্মস্থান। মায়ের বাবার যজমানের মেয়ে, গ্রাম সম্পর্কে মায়ের পিসী, মায়ের সমবয়সী, ছোটবেলা হইতেই ভাব। শ্যামবাজারে বিবাহ হইয়াছিল। অল্পবয়সেই বিধবা হন। একটি মেয়ে জন্মিয়াছিল—ছোট-বেলায় মারা যায়। বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেন। পতিকুলে সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মভাব প্রাপ্ত হন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও কৃপালাভে ধন্যা হইয়া মাকে আশ্রয় করিয়া জীবন-ধারণ করেন। পতি ও কন্যাহারা বালবিধবার জীবন মায়ের স্নেহমমতায় আনন্দময় হইয়াছিল। মায়ের ছেলেরা তাঁহার নাতি। নাতিদের সহিত ঠাকুর-মার কথায় তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইত। মায়ের প্রতি তাঁহার অন্তরের অতুলনীয় ভক্তি ও বাৎসল্যভাব দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হইয়াছে। কলিকাতায় ও তীর্থপর্যটনেও তিনি মায়ের সঙ্গে সময় সময় ছিলেন। এক সময় কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে মায়ের অসুখের সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধার উৎকণ্ঠা, কুশল সমাচার শুনিবার জন্য বারংবার সকলকে জিজ্ঞাসা ও মায়ের দর্শনের জন্য অধীরতা দেখিয়া অতীব বিস্ময় জন্মিয়াছিল। সারাদিন ঘর-বাহির করিতেছেন আর রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে কত লোককে বৃদ্ধা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে মিনতি করিতেছেন, 'একটিবার আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল, একবার চোখের দেখা দেখে আসব।' 'তোমাদের পায়ে পড়ি দাদা, একটিবার নিয়ে চল'—মায়ের বাড়ীর ব্রহ্মচারীদের হাত ধ'রে কাকুতি ক'রে অশ্রুপূর্ণলোচনে বারংবার বলিতেন (‘মানগরবিনী’র ডাকনাম হয় 'মানি'। তাহা হইতে 'ভানি'; ভক্তগণ শুদ্ধ করেন, 'ভানু' গ্রাম সম্পর্কে মায়ের পিসী, মা পিসী বলিতেন। সেই সূত্রেই পরিচয় হয়, ভানি পিসী—ভানু পিসী)।

৪। কোয়ালপাড়ার কেদারের মা প্রথম জীবনে ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার স্বামী জয়রামবাটীতে মায়ের পিত্রালয়ে থাকিয়া গ্রামের পাঠশালায় পণ্ডিতি করিতেন। মা তাঁহাকে 'দাদা' সম্বোধন করিতেন। ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় ও সৌহার্দ্য ছিল। প্রৌঢ়বয়সে কেদারের মা মায়ের মহিমা জ্ঞাত হইয়া একান্তভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করেন এবং একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করিলে মাকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়ের দুর্জয় শোক-জ্বালা নিবারণ করেন। মায়ের পাদপদ্মে যেমন তাঁহার অবিচলিত ভক্তিশ্রদ্ধা ও সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে সেবাপূজার ভাব দেখা যাইত, তেমনি মাকে কচি মেয়ের মত দেখিয়া সন্তানবাৎসল্যের ও অন্তরের টানের যে পরিচয় পাওয়া যাইত তাহাতে মনপ্রাণ মোহিত হইত। মা কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন—কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে ঘোড়ার

গাড়ীতে বিষ্ণুপুর যাইতেছেন। সঙ্গে মহারাজেরা, লোকজন, খাওয়ার ও জলখাবারের সব কিছু ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। মায়ের যাত্রাকালে কেদারের মা একখানা ন্যাকড়াতে কিছু ক্ষুদ্‌ভাজা বাঁধিয়া সেবিকার হাতে দিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, 'রাস্তায় ক্ষিদে পেলে মাকে তু'টি খাওয়াবার জন্যে—।' কচি মেয়ের জন্য মায়ের প্রাণ অস্থির! (ক্ষুদ্‌ভাজা লঘুপাক সুখাদ্য; মুড়িচাল হইতে ভাঙ্গা চাল পৃথক্ করিয়া পৃথক্ ভাজিয়া তৈয়ার করা হয়, রোগীদের জন্য)।

একদিন উদ্বোধনে জনৈক ব্রহ্মচারী কোন বিষয়ে স্বীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজকে যখন জানাইলেন, 'মা বলেছেন।', তখন তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ছাখো, আমিই অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারি না, মা বললেন, না আমি বললাম।' ব্রহ্মচারী লজ্জিত হইয়া হেঁটমুণ্ডে নীরবে প্রস্থান করিলেন। বস্তুতঃ তিনি নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় নিবেদন করিলে, মা উহাতে তাহার (সন্তানের) প্রীতির জন্য সায় দিয়াছেন মাত্র; নিজের কথাকেই মায়ের মুখে ব্যক্ত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে। ছেলে আকাশের চাঁদ চায়, মা অবোধ শিশুকে খুশী করিবার জন্য আকাশে হাত বাড়ান—চাঁদ ধরিয়া আনার জন্য। সেজন্য কথাটা মায়ের কথা, কি আমার নিজের কথা, বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কোন কারণে মা ব্যক্তিবিশেষকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্বসাধারণের উপকারক হইবেই, এরূপ মনে করা ভুল

পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের উক্তিসমূহ প্রকাশ করা সম্বন্ধে যে সাবধান-বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ হইল:

> শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ দুই প্রকারে ব্যক্ত হইয়াছিল। কতকগুলি উপদেশ ব্যক্তি-বিশেষের সাময়িক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছিল। সেজন্য ঐগুলি দেশকাল-পাত্রানুযায়ী প্রযোজ্য। অপরজাতীয় উপদেশ সর্বসাধারণের জন্য, সকল অবস্থাতেই সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। নির্বিচারে সকল উপদেশ সর্বক্ষেত্রে খাটাইলে লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনা অধিক।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রকাশের পূর্বে পূজনীয় রাসবিহারী মহারাজ বলেন, তাঁহার ডায়েরীতে যেমনটি লিখা আছে, ঠিক তেমনটি প্রকাশ করিতে হইবে, উহাতে একটুও অদলবদল করা চলিবে না; কারণ, তিনি শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখে যেমনটি শুনিয়াছেন, তেমনটি লিখিয়া রাখিয়াছেন, ঠিক তাহাই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, সম্পাদনা না করিয়া কিছু প্রকাশ করা উচিত নহে। রাসবিহারী মহারাজ উহাতে বিশেষ আপত্তি করিলে তদুত্তরে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'তুমি কার জন্য এসব কথা প্রকাশ করতে চাও? লোকের উপকারের জন্য ত? যাতে লোকে শ্রীশ্রীমার উপদেশে জীবন উন্নত করতে পারে, সেই জন্য ত? তাহলেই লোকে যাতে তাঁর উপদেশের মর্ম ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে পারে, সেইভাবে প্রকাশ করা দরকার।' রাসবিহারী মহারাজ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিজের মত দৃঢ় রাখিবার জন্য জেদ করিলে পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'তুমি একদিন প্রসঙ্গক্রমে মায়ের একটি উক্তি শুনে লিখে রেখে দিয়েছ, সেই বিষয়ে মা হয়ত সময়ান্তরে অন্যরূপ উক্তিও করেছেন, তা তোমার খাতায় লেখা নেই; কাজেই পাঠকের ধারণা হবে, তোমার লেখা বাক্যটিই মায়ের সিদ্ধান্ত। এই সব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিশেষ বিচার-বিবেচনা করেই, তবে সর্বসাধারণ পাঠককে দেওয়া উচিত।' এই বিষয়ে আরও সাবধান

করিয়া রাসবিহারী মহারাজকে বলিলেন, "তোমরা ত জান, অমুকেরা মাষ্টারমশাইকে অপমান করতে গিয়েছিল। 'কথামৃতে' এক ব্যক্তির সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ প্রশংসা পড়ে তারা তাঁর সঙ্গলাভ করবার জন্য যাতায়াত করছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা সেই ব্যক্তিকে হীনস্বভাব দেখে ব্যথিত হয় আর মাষ্টারমশাইকেই এজন্য অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে ক্ষোভে-দুঃখে তাঁকে অপমান করে।" রাসবিহারী মহারাজ নিজে সেই সকল ঘটনা বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন, সেজন্য পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের কথা সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করিলেন। তবে ঐ বিষয়ে বিশেষ আপসোস করিয়াও পরমুহূর্তে তিনি বলিলেন, সেই ব্যক্তির অধঃপতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সময় সময় তাঁহার গভীর ভাবাবিষ্ট হওয়া শেষ অবধি বর্তমান ছিল এবং তাহা অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইবার পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের ধৈর্যের বাঁধ যেন ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন, 'তোরা বুঝি মনে করছিস ভাব-সমাধি হলেই একটা বড় কিছু হয়ে গেল। চরিত্রবল, ত্যাগ, তপস্যা, বিশ্বাস ও ভক্তির দৃঢ়তা যদি না থাকে, তবে সাধুর আর রইল কি?' বলিয়াই মহারাজ গম্ভীর নিস্তব্ধ স্থির-দৃষ্টি হইলেন। উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ; নীরব নিথর নিশীথে আমাদের অন্তরের অন্ধকার গুহায় বিদ্যুৎ ঝলসাইয়া গেল—আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক নূতন প্রকাশ!

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে যাঁহাদের কিছুদিনও বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, মা তাঁহার সন্তানদের জীবনগঠনের জন্য চরিত্রবল, ত্যাগ, সংযম, ভগবদ্ভজন এবং সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি ও নির্ভরতা শিখাইতেন। তাঁহার নিজের যেমন, তেমনই তাঁহার সন্তানগণের মধ্যেও ভাবাবেশের বা ভাবুকতার আড়ম্বর কখনও দেখা যাইত না। সকলেই ছিলেন সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির।

[সমাপ্ত

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব

নিজের সুবিখ্যাত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য 'গোবিন্দভাষ্যে' (১।১।৬—১১), বলদেব এই প্রমাণিত করতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ব্রহ্ম একটি বিশেষ অর্থে, অত্যাবশ্যক অর্থেই 'নির্গুণ'। এই প্রসঙ্গে এটি উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মসূত্রের অধিকাংশ ভাষ্যকারই—যেমন শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, ভাস্কর প্রভৃতি—১।১।৬—১১ সূত্রে সাংখ্য-দর্শনের 'প্রকৃতি' বা 'প্রধান'ই যে জগতের মূল কারণ, এই মতবাদ খণ্ডনের প্রয়াস করা হয়েছে ব'লে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু কেবলমাত্র বলদেবেরই মতে এই ১।১।৬—১১ সূত্রগুলিতে ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ব' প্রমাণিত হয়েছে। ('সিদ্ধান্তরত্নম্', চতুর্থ-পাদও দেখুন

প্রথম আপত্তি

ব্রহ্মকে 'শব্দবাচ্য' এবং 'শ্রুতিগম্য' ব'লে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, ব্রহ্মকে শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং শ্রুতি দ্বারা জানা যায়।

কিন্তু যে কোনো বস্তুকে শব্দ বা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করার অর্থই হ'ল এই যে, তার গুণাবলীর দ্বারাই তা করা হয়—যেমন, একটি পদ্মকে শব্দ বা বাক্য দ্বারা বর্ণনা আমরা করি এই ব'লে—'এই পদ্মটি রক্তবর্ণ' ইত্যাদি। পুনরায়, যে কোনো বস্তুকে জানাও যায় তার গুণাবলীরই মাধ্যমে। যথা, আমরা পদ্মটিকে জানি তার রক্তবর্ণত্ব, সৌরভময়ত্ব, কোমলত্ব প্রমুখ গুণাবলীরই মাধ্যমে। অতএব যদি কোনো বস্তুকে শব্দবাচ্য ও জ্ঞানগম্য ব'লে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, সেই বস্তুটির কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে, যাদের মাধ্যমেই কেবল তাকে শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, এবং মনের দ্বারা জানা যায়। তাহলে এস্থলে একথাও স্বীকার করতেই হয় যে, ব্রহ্মকে যখন শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং মনের দ্বারা জানা যায় শ্রুতির মাধ্যমে, তখন ব্রহ্মও অতি নিশ্চয় 'সগুণ', 'নির্গুণ' হতেই পারেন না।

খণ্ডন

ব্রহ্ম যে 'শব্দবাচ্য' এবং 'শ্রুতিগম্য'—এ কথা সর্বজনবিদিত সত্য। সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ এ কথাই বারংবার বলেছেন। যথা—'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।১।৩), 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (ঐ ১।১।৪) ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে একমাত্র শাস্ত্র থেকেই জানা যায়। এবং সমস্ত শাস্ত্র সমন্বিতভাবে একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে।

অন্যপক্ষে ব্রহ্মকে সমস্ত শাস্ত্র বা শ্রুতিতে একটি মূলীভূত, সার্বজনীন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থাৎ 'আত্মা', এবং 'আত্মা' শব্দে এইমাত্র বোঝা যায় যে, 'আত্মা' কেবল একটি স্থিতিই মাত্র, সত্তাই মাত্র, অস্তিত্বই মাত্র—আর কিছুই নয়—আত্মার গুণ, শক্তি, কার্যাদির লেশমাত্র 'আত্মা' শব্দটির মধ্যে নেই অর্থাৎ, এই শব্দটির দ্বারা ব্যক্ত হয় না। যেমন—সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে—

'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ' (বৃহদারণ্যকোপ-নিষদ্ ১।৪।১) 'পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন।'

এরূপ নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মোক্ষদাতা। যথা—

'যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽ-নিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।' (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৭)।

'যখন তিনি এই অদৃশ্য, অশরীর, নির্বিশেষ ও অনাধার ব্রহ্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তখন তিনি অভয় (বা মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি।

বস্তুতঃ যদি ব্রহ্ম সগুণ হতেন, তাহলে তিনি হয়ে দাঁড়াতেন পৃথিবীর অন্যান্য সকল সগুণ বস্তুরই সমতুল; এবং এই সকল সাংসারিক সগুণ বস্তুকে শাস্ত্রেই বলা হয়েছে 'হেয়'—অর্থাৎ ঘৃণ্য ও পাপ-পঙ্কিল ব'লে সর্বথা সর্বদা সর্বত্রই পরিত্যাজ্য। কিন্তু ব্রহ্ম কি এই প্রকারের 'হেয়'? অসম্ভব।

পুনরায় ব্রহ্মকে সর্বদাই বলা হয়েছে 'পূর্ণ'। যথা—

'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।' (বৃহদারণ্য-কোপনিষদ্ ৫।১।১)।

'ঐ পূর্ণ; এই পূর্ণ; পূর্ণ থেকেই পূর্ণ উৎপন্ন হন; পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকেন অবশিষ্ট।'

এস্থলে বলদেবের মতে 'অদঃ' বা 'ঐ' শব্দটির অর্থ হ'ল—মূলরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম, অথবা মূলীভূত অপ্রকট ব্রহ্ম—যিনি সকল বস্তুর ভিত্তিস্বরূপ; এবং 'ইদম্' বা 'এই' শব্দটির অর্থ হ'ল—প্রকাশরূপ, অবতাররূপ, রাসলীলাকারক ব্রহ্ম—অথবা, ব্যক্ত বা প্রকট ব্রহ্ম, যিনি রূপান্তরে অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং জীবের সঙ্গে লীলা করছেন। এই উভয় প্রকারের ব্রহ্মই 'পূর্ণ'; এবং প্রথম 'পূর্ণ' থেকেই দ্বিতীয় 'পূর্ণে'র উৎপত্তি—অব্যক্ত ব্রহ্ম থেকেই ব্যক্ত ব্রহ্মের উৎপত্তি; এবং

পরে অব্যক্ত ব্রহ্মেই ব্যক্ত ব্রহ্ম বিলীন হয়ে যান; এবং এইভাবে, নিজের সঙ্গেই নিজে এক হয়ে যান। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যক্ত হওয়া মাত্রই সগুণ হয়ে পড়তেন, তাহলে শাস্ত্রে নিশ্চয়ই এরূপ কথাই বলা থাকত যে, সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হয়ে গেছেন—কিন্তু সেরূপ কিছুই বলা নেই কোনোস্থলেই। অতএব, এইটিই স্থির যে, নির্গুণ ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্মে বিলীন হন

দ্বিতীয় আপত্তি

শ্রুতি-স্মৃতিতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপের উল্লেখ সর্বত্রই পাওয়া যায়—অর্থাৎ নির্গুণ রূপ এবং সগুণ রূপ। নির্গুণ রূপে, ব্রহ্ম সন্মাত্র, চিন্মাত্র, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। কিন্তু সগুণ রূপে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান—এবং একমাত্র তিনিই ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন, পালন করতে পারেন, ধ্বংস করতে পারেন নির্গুণ ব্রহ্ম যিনি কেবলই স্থিতি করেন, যাঁর কোনো গুণ ও শক্তি নেই—তিনি কিরূপে, কি উপায়ে জীবজগৎ সৃষ্টি করবেন? কারণ, সৃষ্টির অর্থই হ'ল স্বীয় শক্তির দ্বারা স্বীয় গুণ প্রকটিত করা; এই কার্য সেজন্য নির্গুণ ব্রহ্মের পক্ষে সম্পাদিত করা কিরূপে সম্ভবপর?

খণ্ডন

শাস্ত্রে কেবল এক প্রকারের ব্রহ্মেরই উল্লেখ আছে—অর্থাৎ, নির্গুণ ব্রহ্মের—বিজ্ঞানঘন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, পূর্ণ, বিশুদ্ধ পরমাত্মার। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ শাস্ত্রসম্মত নয়; এবং যেহেতু শ্রুতিতে কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মকেই স্বীকার করা হয়, তখন নির্গুণ ব্রহ্মকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা রূপে গ্রহণ করা ব্যতীত আর উপায় কি?

[ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[পূর্বানুবৃত্তি]

বড় দেশগুলির চাইতে ছোট ছোট দেশগুলিতে কাস্টম্‌স বা বিভিন্ন জিনিসের উপর দেয় শুল্কের হাঙ্গামা সম্বন্ধে স্বামীজীর সরস টিপ্পনী—'এ খুদে পিঁপড়ের কামড় ডেওদের চেয়ে অনেক অধিক।'

সমকালীন অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য—"তুর্ককে ইওরোপে 'আতুর বৃদ্ধ পুরুষ' বলে; অস্ট্রিয়াকে 'আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী' বলা উচিত।" হৃতশক্তি তুরস্ক ও বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে এককথায় অমোঘ ইঙ্গিত!

ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত অস্ট্রিয়া এবং পোপের ক্ষমতাহরণকালীন ইতালীর মধ্যে মনোমালিন্যের বিবরণ এবং ইতালীর অদূরদর্শিতা সম্বন্ধে স্বামীজী লিখছেন—'অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অথবা পোপ-সহায় অস্ট্রিয়ার বহুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে—নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অস্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী মহাসৈন্য-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হ'ল। সে টাকা কোথায়?…আবার কোথা হতে উৎপাত—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেল। হাবশি বাদশার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে বসে পড়েছে।' ইতিহাসের ঘটনাধারার আড়ালে নানা জাতির মানসিকতায় যে কৌতুক ও ঘটনাগত অসঙ্গতির হাস্যরস দেখা দেয়, তার বর্ণনায় স্বামীজীর স্বভাবদক্ষতা।

অস্ট্রিয়ার রাজবংশের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে নেপোলিয়নের ভ্রান্তি সম্বন্ধে স্বামীজীর কটাক্ষ—"অস্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইওরোপের সকল রাজবংশ অপেক্ষা গুমর !…এ বংশের বে-থা বড় দেখে-শুনে হয়। ক্যাথলিক না হ'লে সে বংশের সঙ্গে বে-থা হয়ই না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে মহাবীর ন্যাপোলয়ঁর অধঃপতন !! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুকলো যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে ক'রে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, 'আপনি কোন বংশে অবতীর্ণ ?'—এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'আমি কারু বংশের সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক' অর্থাৎ আমা হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্ব-পুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরেরও বংশমর্যাদারূপ অন্ধকূপে অধঃপতন হ'ল !"—নেপোলিয়নের পূর্বঘোষণা এবং পরবর্তী আচরণ এ দুয়ের পার্থক্য স্বামীজী মৃদুহাস্যে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাতে নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যয়ের দুর্ঘটনাও হাস্যরসের উপাদানে পরিণত। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বীররূপে নেপোলিয়নের প্রতি স্বামীজীর শ্রদ্ধাও আন্তরিক।

জার্মানির কাছে পরাজিত ফ্রান্স তখন জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় নেপোলিয়নকে নানাভাবে স্মরণরত। সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছে এডমঁ রস্তাঁ-র (Edmund Rostand) লেখা ও মাদাম বার্নহার্ডের অভিনীত 'লেগল' বা 'গরুড়-শাবক' নাটক। নেপোলিয়নের ছেলে অস্ট্রিয়ার রাজার নাতি—নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর এই ছেলেকে নেপোলিয়নের স্থলাভিষিক্ত করে আবার ফ্রান্সের নেতৃত্ব দেওয়ার এক পরিকল্পনা হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার রাজার মন্ত্রী মেটারনিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। নেপোলিয়নপুত্র অল্প বয়সে (২১ বছরে) প্রাণত্যাগ করে। এই নেপোলিয়ন-পুত্রই এগ্‌ল' বা ঈগল-শিশু। স্বামীজীর অনুবাদে 'গরুড়-শাবক'। এই বালকপুত্রের ভূমিকায় দেশ-প্রেমমহিমাসমুন্নত এক অসামান্য চরিত্রে রূপ দেন স্বয়ং সারা বার্নহার্ড।[১] এ নাটকের পটভূমিটি যথাযথ ফুটিয়ে তোলার জন্য সারা বার্নহার্ড অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় যে রাজপ্রাসাদে নেপোলিয়নপুত্র থাকতেন, সেই প্রাসাদটি ভালোভাবে দেখে আসেন। ভিয়েনায় এসে স্বামীজীও সেই সানব্রান-প্রাসাদটি দেখতে যান। দেখতে গিয়ে তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—"এ সানব্রানপ্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ, অবশ্য ঘর-দোর খুব সাজানো বটে ;…কিন্তু এখন যত লোক এ প্রাসাদ দেখতে যাচ্চে, সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—সেই সব দেখতে যাচ্চে। অনেক আহাম্মক ফরাসী-ফরাসিনী রক্ষিপুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, 'এগ্‌ল'র ঘর কোন্‌টা, কোন্ বিছানায় 'এগ্‌ল' শুতেন !! মর্ আহাম্মক, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম ক'রে কেড়ে নিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ ; সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি—রাখতে হয়, নিরাশ্রয়—রেগেছিল। তারা 'রোমরাজ' প্রভৃতি কোন উপাধিই দিত না ; খালি অস্ট্রিয়ার নাতি—কাজেই ডুাক, বস্। তাকে এখন তোরা 'গরুড়-শিশু' ক'রে এক বই লিখেছিস, আর তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে,

১ সারা বার্নহার্ড 'লেগল' নাটকের একাধারে প্রযোজিকা, পরিচালিকা ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয়কারিণী ছিলেন। নেপোলিয়নের তরুণ পুত্রের ভূমিকায় তিনি যখন অভিনয় করছেন তখন তাঁর বয়স ৫৬, আর যে ভূমিকায় নেমেছিলেন সেই ভূমিকার চরিত্র নেপোলিয়নপুত্রের বয়স ২০-২১—এই রূপান্তরে সারা বার্নহার্ডের আশ্চর্য সিদ্ধির অন্যতম সাক্ষী স্বামীজী স্বয়ং !

মাদাম বার্নহার্ডের প্রতিভায় একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে, কিন্তু এ অস্ট্রীয় রক্ষী সে নাম কি করে জানবে বল ? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে ন্যাপোলঁ-পুত্রকে অস্ট্রিয়ার বাদশা মেটারনিক মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেললেন।"—এই পর্যন্ত বর্ণনা করে স্বামীজী প্রাসাদ-রক্ষীর মতিগতি নিয়ে বর্ণনা শুরু করলেন। এই বর্ণনাটি কৌতুক-রঙ্গের দিক দিয়ে একান্ত উপভোগ্য—"রক্ষী—'এগ্‌লঁ' শুনে, মুখ হাঁড়ি ক'রে, গজগজ করতে করতে ঘর-দোর দেখাতে লাগলো; কি করে, বকশিশটা ছাড়া বড়ই মুশকিল। তার উপর, এসব অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিকবিভাগে বেতন নাই বললেই হ'ল, এক রকম পেটভাতায় থাকতে হয়; অবশ্য কয়েকবৎসর পরে ঘরে ফিরে যায়। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ করলে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল। ফরাসীর দল রক্ষীর হাতকে রৌপ্যসংযুক্ত ক'রে, 'এগ্‌লঁ'র গল্প করতে করতে আর মেটারনিককে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরল; রক্ষী লম্বা সেলাম ক'রে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত-পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।"

রক্ষী-চরিত্রটির স্বদেশানুরাগ ও টাকার প্রতি অনুরাগের সহাবস্থানটি তাকে কী রকম অসুবিধায় ফেলেছে, সেই বাস্তব সত্যের রূপায়ণে স্বামীজীর কৌতুকদৃষ্টি আমাদের কাছে ও-চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে।

প্যারিসের পর য়ুরোপ দেখা প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখছেন—'প্যারিসের পর ইউরোপ দেখা—চর্ব্যচূষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা।' এই একটি উপমায় ফ্রান্সের সঙ্গে অন্য দেশগুলির পার্থক্য যতখানি ফুটেছে, ততখানি দীপ্যমান স্বামীজীর হাস্যরসের ভঙ্গী। তারপর য়ুরোপে ও ভারতবর্ষে জীবনযাত্রার গতানুগতিকতা কেমন করে মানুষের প্রাণশক্তিকে নিষ্পিষ্ট করে চলেছে, সে কথা বলতে গিয়ে স্বামীজী গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে মানবজীবনের এক আশ্চর্য অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন—'সেই কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া, সেই সব এক ঢঙ, দুনিয়াসুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপী! তার উপর—উপরে মেঘ আর নীচে পিল্ পিল্ করছে এই কালো টুপী, কালো জামার দল; দম যেন আটকে দেয়! ইওরোপসুদ্ধ সেই এক পোশাক, সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্রকৃতির নিয়ম—ঐ সবই মৃত্যুর চিহ্ন!'

য়ুরোপের এই বর্ণনার পাশাপাশি ভারতবর্ষের জীবনধারায় অতিরিক্ত অতীতের অনুসরণ প্রসঙ্গেও স্বামীজীর তুলনামূলক মন্তব্য—"শত শত বৎসর কসরত করিয়ে আমাদের আর্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন যে, আমরা এক ঢঙে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি; ফল—আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি; প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি! যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হাঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ'—(বাপ দাদা যেদিক দিয়ে গেছে) সে দিকে চলে যায়, তারপর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে! 'কালস্য কুটিলা গতিঃ'—সব এক পোশাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি—হ'তে হ'তে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব 'যেনাস্য পিতরো যাতাঃ' হবে, তার পর পচে মরা !!"

য়ুরোপে একঘেয়ে জীবনযাত্রা এক কারণে, ভারতে অন্য কারণে। কিন্তু দু'ধরনের জীবনযাত্রার মধ্যেই অন্ধ অনুকরণের ফলে জীবনীশক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। মানবজীবনের এই যান্ত্রিক পরিণতির বিরুদ্ধে স্বামীজীর উদ্ধত মন্তব্য অনেকদিন পরে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকের তাসদের

যান্ত্রিক জীবনের কথা মনে পড়ায়।[২] মানব-জীবনে স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই মনীষীই একমত। তবে স্বামীজীর লেখায় এই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের প্রাধান্য, রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকে হিউমার বা আনন্দদৃষ্টির প্রকাশ।

য়ুরোপময় তখন তুরস্কের দাসত্বমুক্ত সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্বাধীন দেশ দেখা দিচ্ছে। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাতিরা এই সব সদ্য স্বাধীন দেশের অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করতো। কিন্তু স্বামীজী এদের সপক্ষে স্বাধীনতার জয়গান করে লিখছেন—'তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক; পরে যদি জোর ক'রে করায় তো অতি ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই'—'পরিব্রাজকে'র এই অংশটি পড়লে বোঝা যায়, কেন সেকালের বিপ্লবীরা স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্বামীজীকে প্রেরণাদাতা মনে করতেন। ভারতবাসীরা নিজের হাতে ক্ষমতা পেলে রসাতলে যাবে—এমন কথা সেকালের ইংরেজ থেকে একালের ভারতবাসী অবধি অনেকেই বলে থাকেন। স্বামীজীর কথা তাঁরা মনে রাখলেই দেশবাসীকে আর অহেতুক অযোগ্য বলে হেয় করতে পারবেন না। স্বামীজীর মতে—'দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ হয়।' দেশ স্বাধীন হওয়াতে আমরা দেশবাসীর হাতে দায়িত্ব তুলে দেবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি, না মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালীর হাতে ভারতবাসীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছি, সেকথা ভাববার সময় এসেছে।*

[ক্রমশঃ]

২ 'তাসের দেশ' নাটকে অবশ্য মূলতঃ ভারতবর্ষের জীবনধারাকেই পরিহাসে বিদ্ধ করা হয়েছে। 'পরিব্রাজকে' স্বামীজী দেখিয়েছেন এ যান্ত্রিকতা য়ুরোপেও কম নয়!

* অন্যভাবে উল্লেখিত না থাকলে এ প্রবন্ধের সব উদ্ধৃতিই স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' থেকে গৃহীত। অধোরেখা লেখক-প্রদত্ত।

ভাবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু যুগাবতারের পুণ্য বেদীতে প্রতিষ্ঠিত নন, সাধকভাবের ভক্তিময় সত্তাকে প্রকাশ করবার নতুন পথের লোকোত্তর দিশারীও। শুভ্রোজ্জ্বল আনন্দোপলব্ধির সঙ্গে তাঁর সাধকভাব যুক্ত হয়েছিল প্রাত্যহিক জীবনের শিশু-সরল প্রতিটি বাক্যালাপ, সংগীত এবং স্বচ্ছ-সুন্দর হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র-মূলস্থিত পরম শক্তির আধার হয়ে তিনি মানব-সাধারণের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর বুকে নেমে এসে ধ্যানসুন্দর এক অপরূপ ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে অত্যন্ত সহজ হওয়ার মধ্য দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের শান্ত পবিত্র মন্দির-অঙ্গনে তপস্যার মঙ্গল-প্রদীপটি জ্বেলে দিয়েছিলেন। দিব্য-চেতনার আলোকচ্ছটা নিয়ে তাঁর ভাগবত-সত্তার প্রকাশ ঘটেছিল মাটির পৃথিবীতে। সাধকভাবের যে-অপার্থিব জ্যোতির্ময়তার মধ্যে

তাঁর অন্তর-বাহিরের আনন্দদীপ্তি পরিস্ফুরিত হয়ে উঠেছিল, সেখানেই তাঁকে পাওয়া যায় পরিপূর্ণরূপে, প্রত্যক্ষ করা যায় সাধারণের মধ্যে থেকেও তাঁর অলৌকিকত্বকে। তাই সাধকভাবের দিব্যোজ্জ্বল দিকগুলিকেই আমাদের সর্বাগ্রে দেখে নিতে হয়।

সাধনার এক সর্বব্যাপী স্বর্গীয় প্রকাশ ঘটেছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে মনে,—যেমনটি পৃথিবীর আর কোনো যুগাবতার বা পুণ্যপুরুষের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় নি। যে-কোনোরূপ ভক্তির ভাব কারুর মধ্যে দেখলে, কিংবা ভক্তির অনুভূতিমণ্ডিত কোনো কথা ও গান শুনলে মুহূর্তের মধ্যে একেবারে সমাধির অতল গহনে ডুব দেওয়া এক চৈতন্যদেবকে বাদ দিলে জগতের আর কারুর মধ্যে দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে শুধু একটি ভাবই সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল,—যে-ভাবটিকে এক কথায় বলা চলে প্রেমভাব। এ-প্রেমও অলৌকিক; শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানকে প্রিয়ভাবে সাধনাই তাঁর জীবনের ভাববিহ্বল প্রতিটি মুহূর্তের একমাত্র সাধনা। এই প্রেমকেই বলা হয় গোপীপ্রেম বা কান্তাপ্রেম এবং ভাব হচ্ছে অধিরূঢ়ভাব। মহাভাবের আবিষ্টতায় সাত্ত্বিক-ভাবের অপূর্ব প্রকাশের নামই হচ্ছে অধিরূঢ়ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-ভাবেরও সিদ্ধসাধক। তাঁর সমাধি হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকট্যের উপলব্ধি, এবং তখন তাঁর মাঝে মাঝে হৃদয়ের স্পন্দন পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যেতো। তাঁর জীবনে প্রতিটি ভাবই অপরূপভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল; চির আনন্দের মঞ্জুধ্বনি তাঁর হৃদয়ের তারে যে-কোনো লগ্নে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত। সমাধির অতলান্ততায় তাঁর চেতনা নিজেকে হারিয়ে ফেলত। তিনি নিজেই বলেছেন, 'সমাধির পর অবতারাদির "আমি" আবার ফিরে আসে—বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। এই বিদ্যার আমি দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। শঙ্করাচায "বিদ্যার আমি" রেখেছিল। চৈতন্যদেব এই "আমি" দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন।' আর শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিদ্যা' ও ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ হয়ে লোকশিক্ষার ভাণ্ডার সর্বসাধারণের কাছে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যে-কয়টি ভাবের সাধনার কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, সবগুলি ভাবেরই শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তরূপ,—সে-রূপটিকে মহাকাল প্রোজ্জ্বল মহিমায় করপুটে ধারণ করে আছেন। তিনি নিজেই বলতেন—'সাধনের খুব দরকার, ফস করে কি আর ঈশ্বরদর্শন হয়?' পরম সত্যের দর্শনে ও স্পর্শনে তিনি সিদ্ধ হলেও লোকশিক্ষার জন্য এ-কথা না বলে পারেন নি। সত্যবাণীর মধ্য দিয়েই তো তাঁর হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল! শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের ২য় ও ৩য় খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা শুধু এখানে আমাদের বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিক-তার সঙ্গে সম্পর্কিত সাধকভাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমৎ তোতাপুরীর কাছ থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এক দিনেই নির্বিকল্প সমাধির গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। বেদান্তশাস্ত্রধৃত নির্বিকল্প সমাধির দ্বারাই শ্রীভগবানের সঙ্গে অদ্বৈত-ভাবে মিলিত হওয়ার পরমতম উপলব্ধি ঘটে। তার পূর্বেই তন্ত্রোক্ত সর্বপ্রকার সাধনপথের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয়লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। ভৈরবী তাঁকে তন্ত্রোক্ত সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শুধু নির্দেশই দেন নি, পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন এবং ঠাকুরও সিদ্ধিলাভ করেছেন। দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর অভ্যাগম ঘটলে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে তোতাপুরীর সঙ্গে অতিরিক্ত মেশামেশি করতে নিষেধ করতেন; কারণ অদ্বৈতসাধনার শুকনো-ভাবের মধ্যে নিমগ্ন থাকলে ভক্তি ও প্রেমভাবের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ঠাকুর কিন্তু তা

মানেন নি। তাঁকে যে সমস্ত ভাব একাকার করে নিতে হবে; ভাববৈচিত্র্যের প্রদীপ জেলে দিতে হবে সকলকে ডেকে ডেকে।

সাধনার সমগ্রতায় তিনি নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলে সকলের মধ্যে থেকেও অনন্য। শ্রীশ্রীজগদম্বার চরণে জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম, ভালমন্দ, পাপপুণ্য, যশ-অযশ, বাসনা-কামনা সমস্ত কিছুই নৈবেদ্যের মত নিবেদন করে দিয়ে অতল গভীর রসের সাগরে একেবারে ডুব দিয়েছিলেন তিনি। রসস্বরূপের সাধনায় সর্বপ্রকার ভাবরসকেই সাধন-জীবনে উপজীব্য করে নিয়েছিলেন। জগদম্বার পাদপদ্মে সব সমর্পণ করেও 'সত্য ও মিথ্যা নাও' বলে নিজেকে নিঃস্বত্ব করতে পারেন নি। সত্যকে সমর্পণ করলে নিজের মধ্যে সত্যকে তিনি রাখবেন কি দিয়ে? সত্যনিষ্ঠা দিয়েই তো সত্যস্বরূপ ভগবানকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের অবতারেরা তাঁদের ভাবের রাজ্যে কোনোরূপ ধরাবাঁধা গণ্ডীর ভেতর নিজেকে আটকে রাখতে পারেন না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের রাজ্যে নির্বিচারে তাঁরা অনির্বচনীয় আনন্দস্বাদ বুকে বহন করে পরিক্রমা করেন। এই পরিক্রমার মধ্য দিয়েই তো সর্বজীবের মঙ্গলসাধন করতে পারেন।

এক কথায় বলা চলে 'পাকা আমি'র অধিষ্ঠানভূমিতে স্থিত হয়ে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ভাবে মগ্ন থাকতেন। কখনো বালকভাব, কখনো দাস বা দাসী-ভাব, কখনো সখীভাব, কখনো বাৎসল্যভাব, কখনো বা অদ্বৈতভাব। তিনি ভক্তদেরকে বলতেন, 'যতক্ষণ আমিটা তিনি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাকতে হয়—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এই সব। আমি দাসী-ভাবে এক বৎসর ছিলাম—ব্রহ্মময়ীর দাসী।...মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।' তখন যে তাঁর অন্তররাজ্যে 'পাকা আমি'র আনন্দোৎসব! 'পাকা আমি' যে তাঁর কথায় দাস-আমি, ভক্তের আমি! 'আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই।' আবার সাধকভাবের অন্তরঙ্গতার মাধুরীতে ভক্তগণকে নিষিক্ত করে তিনি বলেছেন. 'আমি থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। "আমি"-রূপ কুম্ভ।' এই প্রসঙ্গে আবারও বলেছেন, 'ভক্তেরা আমি রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না।' স্বস্বরূপে কিভাবে থাকা যায়, ন্যাংটা উপদেশ দিতেন তাঁকে। মন বুদ্ধিতে লয় করে, বুদ্ধিকে আত্মাতে লয় করে স্বস্বরূপে থাকা চলে। অদ্বৈতভাবেই তো পাকা আমিত্বের স্থির জ্যোতি! এই জ্যোতিস্বরূপে অবস্থান করে সাধনার জীবন দিয়ে বিভিন্ন ভাবের আরতি-প্রদীপ জ্বালানো যায়। সেই প্রদীপ জ্বালানোতেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলময় করুণাঘন রূপ!

ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক অবর্ণনীয় ভাব দেখা দিত। তিনি মনে করতেন এ-বুঝি তাঁর কোনো ব্যাধি। তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করব?' এই সহজাত উন্মাদ-ব্যাধিতেই তো তিনি ঈশ্বরকে অতি সহজে বিভিন্ন ভাবে ডাকতে আরম্ভ করে দুই নয়নে ধারা বইয়ে সমস্ত মানবসাধারণকে সহজ ডাকের সহজ পদ্ধতিতে ভক্তির ব্যাকুলতা অনুভব করতে পথ দেখিয়েছিলেন। সাধন-পথের পরিক্রমায় এর চেয়ে বড় পথ আর কে দেখিয়েছেন?

একদিন ফুল নিয়ে একবার মাথায়, তারপর ক্রমান্বয়ে কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে রাখছেন।

এইরূপ করতে করতে শ্রীমকে অত্যন্ত সহজভাবে বলেছিলেন, 'এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে এরূপ কচ্ছি।' ভক্তির মাধুর্য অন্তরে নিয়ে সহজ-সুন্দর সারল্যের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটালেই তো বালকভাব আসে! এই ভাবের অকৃত্রিমতা সকলকে শুধু মুগ্ধ করে না, একান্তভাবে কাছে টেনে আনে। কাছে টানার পরিশুদ্ধ স্বাভাবিক আকর্ষণেই তো বালক! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার বালক।

তিনি বলেছিলেন, 'তাঁকে (ঈশ্বরকে) কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল মা বলে ডাকি। মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। বিড়াল-ছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য জানে না! জানতে চায়ও না। সে জানে আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? চাকরানীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, "আমি মাকে বলে দেব। আমার মা আছে!" আমারও সন্তানভাব।' মা ডাকার মধ্য দিয়ে যাঁর বুকের বেদনা ও ব্যাকুলতা সাধনার রূপ ধরে জাগে, সন্তানভাবের মধ্যেই তো তাঁর পরিতৃপ্তি। মা আর সন্তান যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; উভয়ের সুখ-দুঃখ এক সূত্রেই গাঁথা। এই জন্যই ঠাকুরের কণ্ঠে দিব্যবাণী উচ্চারিত হয়, 'সন্তানভাব বড় শুদ্ধভাব।' একদিন গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'আমার তিনভাব—সন্তান-ভাব, দাসীভাব আর সখীভাব। দাসীভাব, সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। সন্তানভাব খুব ভাল।' এই উত্তমের অনুভবেই তো তিনি সর্বোত্তম। তিনি গিরিশ ঘোষকেই প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, 'আমি দাসীভাবে এক বৎসর ছিলাম —ব্রহ্মময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় ওড়না এই সব পরতাম। মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় হয়।' কখনো বলেছেন, 'আমি মার দাসী-ভাবে, সখীভাবে দুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তানভাব।' এইজন্যই ঠাকুর আদ্যাশক্তির পূজা করতে গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন করতে গিয়ে সাধনার প্রথম পর্বে অনেক সময় রমণীরূপ ধারণ করেছেন। এর পরেই তিনি বলেছেন, 'তাই আমার মাতৃভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। তন্ত্রে বামাচারের কথাও আছে, কিন্তু সে ভাল নয়, পতন হয়। ভোগ রাখলেই ভয়।' যিনি সকল ভাবের অধীশ্বর, তিনি তাঁর অতিলৌকিক সাধনপীঠে উপবিষ্ট হয়ে মাতৃভাবকে মনে করেন যেন নির্জলা একাদশী; কোনো ভোগের গন্ধ নেই তাতে। মাতৃভাবের সুনিবিড় আবিষ্টতায় মগ্ন হয়েই তিনি ষোড়শী পূজা করেছিলেন। এইজন্যেই তাঁর সাধনোপলব্ধির সব চেয়ে নিগূঢ় কথা ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে, 'এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা—তুমি মা, আমি তোমার ছেলে, এই শেষ কথা।' অশেষের মূলাধার ব্রহ্মোপাসনার পরমতম পর্যায় থেকে সাধনার অতি অন্তরঙ্গ শেষ সোপানটির পানে তিনি এইভাবেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর কাছে 'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।' আর একটু স্পষ্ট করে ঠাকুরের কথায় বলা যাক, 'যখন নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি।' এই অশেষ শক্তিরূপিণীই তাঁর কাছে মা। মায়ের বাৎসল্যের সুধাধারাতেই তিনি রাত্রিদিন অভিসিঞ্চিত।

রামকৃষ্ণাষ্টকম্

অধ্যাপকশ্রীবিধুভূষণভট্টাচার্যসপ্ততীর্থেন বিরচিতম্

যৎপাদপঙ্কজসঙ্গতচিত্তং
লভতে বিশ্বং চিন্ময়বিত্তম্ ।
ব্রহ্মরসামৃতনির্ঝরকায়ং
নৌমি বিমর্দিতদুর্জয়মায়ম্ ॥১

দিব্যসমাধিজভাবতরঙ্গং
নিশ্চলতনুবরমমিতমসঙ্গম্ ।
রামকৃষ্ণমতিপাবনসত্ত্বং
বন্দে লম্ভিতসাধনতত্ত্বম্ ॥২

পঞ্চবটীতলসাধনসারং
মোহবিজৃম্ভণকুমতিবিদারম্ ।
কথয়ন্ প্রতিপদমুত্তমতত্ত্বং
ত্বং মম শরণং ভুবি ভব নিত্যম্ ॥৩

ত্রিজগদীশ্বরীপালিতপুত্রং
মর্ত্যজনামৃতযোজনসূত্রম্ ।
কল্পদ্রুমমিব ফলদং লোকে
নৌমি, সমুদ্ধর কর্মবিপাকে ॥৪

রমণীকাঞ্চনবর্জনশুদ্ধি-
র্জনয়তি নৃণাং পরমামৃদ্ধিম্ ।
ইত্যুপদিশতোঽখিলবুধবন্দ্যং
স্যান্মম শরণং তব পদপদ্মম্ ॥৫

কুমতিতিমিররাশিধ্বংসশংসৎকটাক্ষং
দুরধিগমমপীশং দর্শয়ন্তং সমক্ষম্ ।
ধরণিতলমবাপ্তং ভাস্বরং মূর্তিমন্তং
নিরবধি খলু বন্দে দেবমেকং মহান্তম্ ॥৬

হৃদয়নভসি শশ্বৎকামগাঢ়ান্ধকারে
ত্বমসি বিমলচন্দ্রস্ত্যাগকারুণ্যদীপ্তিঃ ।
জলধিরিব নদীনাং সর্বধর্মাশ্রিতানাং
বিবুধ ! শরণমেকস্ত্বামতঃ সংশ্রয়েঽহম্ ॥৭

ভোগোত্তুঙ্গোর্মিদুষ্পারভবাব্ধিপারসেতবে
সর্বদেবস্বরূপায় নমস্তে মোক্ষহেতবে ॥৮

ত্রিরত্ন

ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর

ধর্মগ্লানি করি' দূর স্থাপিবারে ধর্ম,
সমন্বয় সাধিবারে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম,
সাকার ও নিরাকারে করি' এক জ্ঞান
রামকৃষ্ণ নররূপে মূর্ত ভগবান ।
রামকৃষ্ণলীলা পূর্ণ করিবার তরে
শ্রীসারদা লক্ষ্মী এল নররূপ ধরে ।
রামকৃষ্ণ-সারদার দিব্যলীলাছন্দ
ব্যাখ্যা তরে অবতীর্ণ শ্রীবিবেকানন্দ ॥

সন্ন্যাসী আর গৃহস্থের যুগধর্মসার
এ তিন বিগ্রহ মিলে এক অবতার ।
বিবেক-বৈরাগ্য-মূর্ত এ তিন জীবন
ভক্তি-মুক্তি তরে জীব ! করহ চিন্তন ।
রত্ন ধরে' মূঢ় জন গ্রহশান্তি চায় ।
এ ত্রিরত্ন যেবা ধরে চতুর্বর্গ পায় ॥

বৈজয়ন্তী

দিলীপকুমার রায়

তোমার আলোর হবেই জয় !

আমি এই ধুয়াই আজ সাধব "তোমার নেই কিরণের ক্ষয় ।"

যত কালো ঝড়ই গর্জাক না—আলোর অভিসার
আমার পারবে না কেউ রুখতে, আমি মানব না নাথ, হার ।
তুমি আছ যখন পারী—তুফান কী দেখাবে ভয় ?
তোমার আলোর হবেই জয় ।

নয় জীবন শুধু ফুলবাগানে হাল্কা ফুলের মেলা ।
তপন হাসে না মিথ্যুক সকালে, কাঁদতে সন্ধ্যাবেলা ।
হয় হানাহানি—শেষে তবু হয় জয়ী প্রণয় ।
তোমার আলোর হবেই জয় ।

দেখি চোখে যেমন, তেমনি শিখি, জীবনকে ভুল দেখে :
নয় চোখের রায়ে, গুরুর জ্ঞানমন্ত্রেই মন শেখে ।
হয় সে-ই অপারে পার যে ধ্রুবতারার শরণ লয় ।
তোমার আলোর হবেই জয় ।

দেখি বাইরে যখন পাষাণকারা, রুদ্ধ সব দুয়ার,
ঐ ! মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটে কে ?—বাধা নেই আর !
তাকে নাই দেখলাম চোখে—যখন দেখেছে হৃদয় ।
তোমার আলোর হবেই জয় ।

আজ না জেনেও জানি—গুরুর দীক্ষা যে পায় তার
নেই ভয় আর—নিশান উড়িয়ে আলোর যেই চলে হয় পার :
দেখা দেয় সে তাকে—যে হয় প্রেমের মুরলীতন্ময় ।
তোমার আলোর হবেই জয় ।*

---

* [স্বহস্তে এই কবিতাটি লিখিয়া দিলীপকুমার 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য পাঠান এবং উহার নীচেও স্বহস্তে লেখেন—"I saw a beautiful dream last night (19.3.79) in which in a temple I sang at the behest of a Yogi : 'তোমার আলোর হবেই জয়…' । I wrote the song out this morning." —সম্পাদক]

যুগে যুগে আসেন শ্রীহরি

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সত্য ছিল নামে মাত্র, শুদ্ধ সত্য পালনের তরে
আসিলেন সত্যব্রত রামচন্দ্র ধরণীর 'পরে।
তাঁর সত্যনিষ্ঠা হ'তে সত্যনিষ্ঠ মানব-অন্তর
সত্য ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সত্য নর-নারী বুঝিল তৎপর।

কর্ম ছিল সর্বকালে পৃথিবীর সৃষ্টি যদবধি
সকলে করিত কর্ম জন্ম-কর্ম-ভেদে নিরবধি।
নিষ্কাম কর্তব্য করি' সৃষ্টিচক্র ঘুরাইতে ধরি'
ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে, শিখালেন কৃষ্ণ অবতরি।

নানাবিধ যজ্ঞ ছিল,—স্বর্গ ভোগ লাগি অনুষ্ঠান
পশুবলি দিয়া বলে হবে তা'র পশু-জন্ম-ত্রাণ!
করিলেন বোধি দান ভগবান বোধিসত্ত্ব আসি
করুণার সান্দ্র মূর্তি—সর্বজয়ী মুখে স্মিত হাসি।

মানুষ, 'মানুষ' হোল,—ভজিল না তথাপি ঈশ্বরে
'চৈতন্য' চৈতন্য দিয়া, শিখালেন প্রেমভক্তি পরে।
ঈশ্বরে 'ঈশ্বর' নহে প্রাণ হ'তে প্রিয় প্রেমভাব
মানুষে ঈশ্বরে হ'ল কুণ্ঠাহীন 'শুদ্ধ প্রেম' লাভ।

ধর্ম ছিল গুহাগর্ভে অন্ধকারে ধুন্ধুমারাবৃত
পরাধীন জনগণ মূঢ়চিত্ত বিবেক-বিকৃত।
অনাসক্ত নিজধর্মে, অনুরক্ত পরধর্ম প্রতি,—
মতিভ্রান্ত পতিতের পরানুকরণে ছিল মতি।

শিখাইতে জীবসেবা জীব-শিব-তত্ত্ব'পরকাশি'
অবতীর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা-মাতার সহ আসি।
ভক্তিতে সাকার তিনি নেতির বিচারে নিরাকার—
নানামতে নানাপথে এক গম্য ব্রহ্ম সবাকার।

লীলাসুখে নারায়ণ নানা ভাবে নরদেহ ধরি'
লইতে নরের তত্ত্ব যুগে যুগে আসেন শ্রীহরি।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবিলাস সাধারণভাবে কিছুটা বা বোধগম্য হয়, কিন্তু কাশীপুর বাগানে ব্যাধিরূপ শরশয্যায় শায়িত পুরুষপ্রবরের আচরণ নিঃসন্দেহে মনে হয় দুর্বোধ্য। তরুণ সেবকগণ ভীত, মুরুব্বী ভক্তগণ ত্রস্ত—সেসা[illegible] তাঁরা সকলেই বিস্ময়ভরা চোখে দেখেন ব্যাধিবি[illegible] শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক অত্যাশ্[illegible] তপোভূমি।

দিন গড়িয়ে চলে। সেদিন মঙ্গলবার, ২১[illegible] মাঘ। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬। স্কুলফের[illegible] মাষ্টারমশাই বিকাল পাঁচটায় কাশীপুর বাগা[illegible] বাড়ীতে পৌছান। তিনি সেবকপ্রধান নরেন্দ্রনাথে[illegible] নিকট শোনেন, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহব্যাধির প্রাবল[illegible] সেবকদের মহাভাবিত করে তুলেছে। নরেন্দ্রনা[illegible] বলে[illegible] কাল প্রায় এক সের রক্ত রাত চারটার সময় পড়েছে··· ।

শঙ্কাপূর্ণ একথা শুনে মাষ্টারমশাই বিচলিত হন। নীচতলার ঘর হতে বেরিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দোতলার ঘরের দিকে অগ্রসর হ[illegible] সেবক নিরঞ্জন ঠাকুরের ঘরে লোকজনের গমনাগ[illegible] নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। গমনোদ্যত মাষ্টারমশাই[illegible] লক্ষ্য করে নিরঞ্জন বলেন: মাষ্টারমশাই, যাবে[illegible] না এখানে··· !

মাষ্টারমশায়ের বিহ্বল মনে যেন চাবুকে[illegible] আঘাত লাগে। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে বাগানে[illegible] যান, সুপরিচিত গাছের নীচু ডালটির উপর বসেন কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিজ[1] এগিয়ে যান তাঁর কাছে তাঁকে প্রায় অনুগমন করেন সেবক নিরঞ্জন। মনে[illegible] হয় নিরঞ্জন তাঁর রূঢ় আচরণের জন্য অনুতপ্ত তিনি শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

নিরঞ্জন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ করেন নিরঞ্জন বলেন, "খোকার[2] ভাবের বিষয় উল্লেখ কর[illegible] পরমহংসদেব বলেছিলেন: **এই ভাবোন্মত্ত লাটুরও একবার হয়েছিল।**[3] সে-ভাবে[illegible] ঘোর আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন: [illegible] **[illegible] পারলে না।**

---

১ দ্বিজর বয়স ১৭।১৮ বছর। পিতা ছিলেন এক সওদাগর অফিসের ম্যানেজার। তিনি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি দ্বিজর তীব্র আকর্ষণ কিন্তু দ্বিজর পিতা সুনজরে দেখতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: দ্বিজর কি অবস্থা!···সব মন কুড়িয়ে যদি আমাতে এলো, তাহলে তো সবই হ'ল। (কথামৃত ৪।২৩।২)

২ পরবর্তী কালে স্বামী সুবোধানন্দ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ১৯শে জানুয়ারী বাগানবাটীতে খোকার নৃত্য ও ভাবোন্মত্ততার উল্লেখ এখানে করা হয়েছে।

৩ তাপস লাটু সম্বন্ধে সেবক শশী একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "একদিন লাটুকে ঠাকুর মাথায় হাত বুলোতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি লাটুর হাত থেমে গেছে, দেহ স্থির, গভীর ধ্যানমগ্ন। আমি দু'চারবার তাকে ডাকলুম, কোন উত্তর পেলুম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, তাতেও কোন সাড়া পেলুম না। তখন ঠাকুর বললেন—ওকে এখন বিরক্ত করিস নি। ওর মন কি এ জগতে এখন আছে?" (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা, পৃঃ ২৪৯)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গে বলেন : **শ্রীরাধিকা হচ্ছেন আত্মাশক্তি।**

তিনি আরও বলেছিলেন—

'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।

কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়॥

'[একমতে] **শ্রীকৃষ্ণই রাধিকার রূপ ধরেছিলেন—রাধিকা** [ভিন্ন কোন সত্তা] **নন।'**

ঠাকুরের দেহব্যাধির চিকিৎসার জন্য একজন নূতন চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেবক নিরঞ্জন বলেন : আমি ভবানীপুরের বৈদ্য মহাফেজকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ঠাকুরের অসুখের বাড়াবাড়ি দেখে মা-ঠাকরুন তাঁকে ডাকতে বলেছিলেন, আর উনিও (ঠাকুর) আনতে বলেছিলেন।

নিরঞ্জন চলে যান তাঁর কর্তব্যকর্মে। চিন্তামগ্ন মাষ্টারমশাই পদচারণা করতে থাকেন। সঙ্গে দ্বিজ। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হন নরেন্দ্রনাথ।

মাষ্টারমশাই মন্তব্য করেন : সব খাঁ খাঁ করছে…।

নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রস্তাব করেন : উপরে যাবেন, চলুন। আমি অনেকক্ষণ যাই নি।

নরেন্দ্রনাথের দয়াবৃত্তি প্রসন্ন করে মাষ্টারমশায়ের মনকে। তিনি নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। দেখেন ঠাকুর সম্পূর্ণ শয্যাশ্রয়ী। তাঁর শ্বাসকষ্ট প্রবল। এই করুণ দৃশ্য মাষ্টারের পক্ষে দুঃসহ। মাষ্টার সরে দাঁড়ান কিছুক্ষণ পরে তিনি নীচে চলে যান।

নরেন্দ্রও নীচে নেমে আসেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন : কালী[৪] বলছিল ঠাকুর এ-কঠিন অবস্থার মধ্যেও অবতারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ; তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, **'হ্যাঁরে, ওরা যা বলে তা কি সত্য ?'** অবতারপুরুষের আচরণ অবোধ্যপ্রায়, জগতে প্রচলিত তর্কবিচারের সীমাতীত তার ভাবব্যঞ্জনা।

শীতের সন্ধ্যা। সময় প্রায় সাতটা। পুকুরের ঘাটে বসে আছেন তাপস যোগীন্দ্র ও মাষ্টারমশাই। প্রাণপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে যোগীন্দ্র তাঁর নিজ জীবনের মধুর কয়েকটি গোপ্য ঘটনা ব্যক্ত করেন।

ধীর, বিনয়ী, মধুরপ্রকৃতি যোগীন্দ্র সম্বন্ধে নরেন্দ্র বলেছিলেন যে তিনি সর্বতোভাবে কামজিৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ঈশ্বরকোটি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সেই শুদ্ধচিত্ত যোগীন্দ্র একদিন বৃন্দে ঝির কুমন্ত্রণায় একটি গর্হিত কাজ করে বসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে রাত্রিবাসকালে গভীর রাত্রে জেগে উঠে তিনি দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শয্যায় নাই। হঠাৎ তাঁর মনে ঝিলিক দেয় একটা কুৎসিত সন্দেহ ; বৃন্দে ঝির কথা মনে পড়ে। তিনি সন্দেহ করেন, 'তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ স্ত্রীর কাছে গেলেন ?' কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীর দিক হতে

৪ এরকম কোন সময়ে কালী বা কালীপ্রসাদ (পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ) নাস্তিকতার ভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যাঁরে তুই নাকি নাস্তিক হয়ে গেছিস ?' কালীপ্রসাদ নীরব থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই ঈশ্বর মানিস ? তুই শাস্ত্র মানিস ? তুই লোকাচার মানিস ?' তাঁর নেতিবাচক উত্তর শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'অপর কোন সাধুর কাছে এরকম কল্লে সে তোর গালে চড় মারতো।' কালীপ্রসাদ নিবেদন করেন, 'আমাকে বুঝিয়ে দিন এবং আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিন, তখন আমি সব মানব।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা দেন, 'সময়ে তুই সব বুঝতে পারবি ও মানবি…।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ২৩) এর পূর্বে গুরুকৃপায় কালীপ্রসাদের এক দিব্যদর্শন ঘটেছিল। তিনি দেখেছিলেন, সকল দেবদেবী, আধিকারিক ও অবতারপুরুষের মিলন ঘটেছে রামকৃষ্ণ-বপুতে। (আমার জীবনকথা, ৪১-২)

প্রত্যাবর্তন করেন। অপেক্ষমান যোগীন্দ্রকে দেখতে পান। সব কিছু বুঝতে পারেন। ক্ষমাশীল গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে বলেন, 'বেশ বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭)

যোগীন্দ্র আরও বলেন তাঁর বিবাহ-সংক্রান্ত একটি ঘটনা। পিতামাতা পীড়াপীড়ি করে একটি ছলনার আশ্রয় নিয়ে পুত্র যোগীন্দ্রকে সংসারী করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যোগীন্দ্রের উদ্বাহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্বন্ধন। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশামৃতে তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে সংসার পাতকুয়োর মত। কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ মানুষের নিকট ঈশ্বরলাভ সুদূরে। হতাশা ও লজ্জায় ক্লিষ্ট যোগীন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত বন্ধ করে দেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বারংবার খবর পাঠিয়েও দক্ষিণেশ্বরে আনতে পারেন না। শেষে একটি কৌশল করে তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আনেন। যোগীন্দ্র এসে দেখেন ঠাকুরের পরিধানের বস্ত্র তাঁর বগলে। তিনি অর্ধবাহ্যদশায় যোগীন্দ্রকে বলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস, তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস—তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব; আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস, তাহা হইলে তাহাই করিয়া দিব।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪)

এই ঘটনারই উল্লেখ করে যোগীন্দ্র এখন শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়বাণী বলেন মাষ্টারমশাইকে, **'তোর ভয় কি? তোর দ্বিতীয় বিবাহের সময়** [বউকে] **আনবি—এমন করে দেবো যে কাম চলে যাবে…এমন করে দেবো যে চৈতন্য যাবে না।'** ঠাকুরের আশ্বাস যোগীন্দ্রের মর্ম স্পর্শ করে, তাঁর জীবনাঙ্গন নূতন আলোর স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির বৃদ্ধির জন্যই মাষ্টারমশাই সেদিন কাশীপুর বাগানে রাত্রি কাটিয়েছিলেন। তিনি পরদিন প্রত্যুষে বাড়ীতে ফিরে যান।

বাড়ী ফিরেও মাষ্টারমশায়ের মন পড়ে থাকে কাশীপুর বাগানে, যেখানে ভক্তদের প্রাণারাম শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যাগত, তাঁর শরীরের অবস্থা ভীতিপ্রদ। স্কুলের কাজকর্ম সেরেই মাষ্টারমশাই ২-১৫ মিঃ কাশীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

আজ ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬। ২২শে মাঘ, বুধবার। মাষ্টারমশাই দোতলার ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পান ভবানীপুরের বৈদ্য মহাফেজকে। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত তাঁর বন্ধু—ইনি সৌরীন্দ্র ঠাকুরের ভাই। বন্ধুটি নিজে ক্যান্সারের রোগী। ঘরে আরও উপস্থিত নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন সেবক।

মহাফেজ বৈদ্য বলেন: গলার ঘা সান্তপুরু কলাপাতা দিয়ে রাখতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **তা হবে না—**

মহাফেজ: ওতে যদি না হয় তবে একটা পরামর্শ করা যাবে, দু' তিন জন বসে [ঠিক করা যাবে]।

শ্রীরামকৃষ্ণ: **আমি কিছু জানি না, তোমরা যা** [হয়] **কর।**

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের অশ্রু উদ্গত দেখে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হন। তিনি বালকের মত আবদার করে বৈদ্যকে বলেন: **হাতে ধরে তোমাকে দেখতে হবে**…।

মহাফেজ: দিন কতক দেহ রাখুন—এই ছোকরারা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে। নিরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: খাওয়া হয়েছে?

বৈদ্যের বন্ধু : আপনাকে একটা ওষুধ চিবুতে হবে—আমার হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ : **কি বুড়ি গোপাম ?**

বৈদ্যের বন্ধু : আজ্ঞে হাঁ, এনেছি।

মাষ্টার ভাবেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি অন্তর্যামী। তিনি কি করে এই তথ্য জানলেন ? না কি তিনি তাঁর সহজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই এসব ধরতে পারেন ?

মাষ্টার অগ্রসর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন : ওর এতে ভাল হয়েছে, আপনিও খান।

শ্রীরামকৃষ্ণ নীরবে মাষ্টার ও উপস্থিত সকলকে চেয়ে চেয়ে দেখেন। তাঁর শরীরে কষ্ট।

সকলের অনুরোধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৈদ্যের ঔষধ সেবন করেন। ঔষধটি মুখে রেখে চিবুতে হবে—বৈদ্যের এই নির্দেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ বলেন : **গিলে ফেলেছি—**

মহাফেজ বৈদ্য হতাশ হন, বলেন : পাগল ! বৈদ্যের বাবারও সাধ্য নাই এ রোগ সারায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় সকলে নীচে নেমে যান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাফেজ বৈদ্যকে বলেন : **বসো তুমি।**

পরবর্তী দৃশ্যে দেখতে পাই মাষ্টারমশাই বাগানে প্রাগুক্ত গাছের ডালে বসে মহম্মদের একখানা জীবনী পড়ছেন।

তিনি মহম্মদের জীবনীতে মাতৃগর্ভে নাড়ী বদলের কাহিনী দেখে বিস্মিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মকাহিনীর অলৌকিকত্ব তাঁর মনে পড়ে। উক্ত জীবনীতে পড়েন, মহম্মদ পিতৃহারা হয়ে মাতা আমিনার কোল আলো করে উপস্থিত হয়েছেন। আরবদেশের প্রথানুযায়ী কয়েকদিনের মধ্যেই শিশু মহম্মদকে ধাত্রী হালিমার কোলে তুলে দিতে হয়। ছ'বছর পরে শিশু মহম্মদ ফিরে পান মাতা আমিনার স্নেহছায়া। অল্পদিনের মধ্যেই শিশু মাতৃহারা হন। মায়ের কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হতেন। পিতৃ-মাতৃহীন বালক পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের স্নেহ-লাভ করেন। তাঁর মৃত্যু হলে মহম্মদের অভিভাবক হন চাচা আবু তালেব। কিশোর বয়সেই মহম্মদ চাচাজীকে ব্যবসায়ে সাহায্য করেন। অভিভাবকের মৃত্যুর পর তিনি চাকুরী গ্রহণ করেন। মরুভূমির উপর দিয়ে উটের দড়ি ধরে চলতে হত দিনের পর দিন। চাকুরীদাত্রী বিবি খাদিজা তাঁর উপর প্রসন্ন হন। মহম্মদ তাঁকে বিয়ে করেন, সংসার পাতেন। দুই পুত্র ও চার কন্যার জন্ম হয়। তবুও সংসারের মায়া তাঁকে সম্পূর্ণ বিমোহিত করতে ব্যর্থ হয়। তিনি হেরা পাহাড়ের গুহায় নির্জনে প্রতিদিন আল্লাহতালার ধ্যান করতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞান-ভক্তির উদ্ভব হয়। ভাব উপস্থিত হয়। তিনি আবেশের মধ্যে শোনেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। তিনি ঈশ্বরদূত গেব্রিয়েলের দর্শন পান। মহম্মদের বহু পত্নীর মধ্যে খুদা ও আয়েসা ছিলেন যোগ্য ধর্মপত্নী। সর্বশেষে স্বর্গারোহণের বর্ণনা।

পরবর্তী দৃশ্য একতলায় দানাদের ঘর। সেখানে উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেন্দ্র-মাষ্টার প্রভৃতি। নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরদর্শন ও ভাবভক্তি নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ : তখন কি দেখো ?

নরেন্দ্রনাথ : তাতে কি হলো ?

দেবেন্দ্র : সব দেখছি পাতলা—

নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরদর্শনের সমালোচনা করেন। প্রচলিত জনপ্রিয় মতামতের তুচ্ছতা দেখান। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ অনুযায়ী তিনি ব্যাখ্যা করেন। তিনি উপনিষদের মন্ত্র উদ্ধার করে ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ বলেন :

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

(মুণ্ডক ২।২।৮)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে তিনি তুলে ধরেন উদাহরণস্বরূপ। বলেন: আমি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা বল্লেন, **'মনেতেও কাম হয় না।'**

ঈশ্বরভাবনায় নরেন্দ্রনাথের প্রাণ আকুলি-বিকুলি করছিল।[৫] তাঁর বৈরাগ্যবিধৌত মনের চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাঁর নিজের কথায়। তিনি বলেন: Suicide করতে ইচ্ছা হচ্ছে—রাতে ঘুম নেই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ গান ধরেন:

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
(ও যার) বিমল তটে, রূপের হাটে,
বিকাত নীলকান্ত মণি॥...
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে
রাই বিনোদিনী॥ ইত্যাদি[৬]

'খাপখোলা তলোয়ার' দেবেন্দ্রনাথের বৈরাগ্য সাধন সম্বন্ধে ঠাট্টা করেন। নরেন্দ্র বলেন দেবেন্দ্রনাথকে: এ ব্যক্তি ফিরবে—জগতের মধ্যে যাকে ভালবাসে তার দশা এই। তারপর হবে পাগল—তারপর ছেলেরা আমাশায় ভুগবে—[৭]

এ সকল কথা শুনে মাষ্টারমশাই মনে মনে পর্যালোচনা করেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ভাবটি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনোবীণায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় বাণী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি॥
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটি॥[৮]
(কথামৃত ২।২৩।৩)

এবার নরেন্দ্রনাথও নিজের মনের কপাট খুলে দেন। তিনি বলেন: আমার আগে এরকম অবস্থা হয়েছিল। তা পরমহংসদেব জানতে পেরে ডাকিয়ে ছ্যা করে দিতে উবে গেল।

উপস্থিত হরমোহন মিত্র নরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু। শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির প্রকাশের একটি ঘটনা তিনি বলেন: রামবাবুর বাড়ীতে পরমহংসদেব তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে

৫ নরেন্দ্রনাথের সেই সময়কার মনের অবস্থা বর্ণনা করেছেন গুরুভাই শশী। তিনি পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "His (Narendra's) longing to realise God was so intense that he declared: 'If by taking a handful of filth and swallowing it, I could realise God, I would do it.'" (Sister Devamata: Sri Ramakrishna and his disciples, 1928, p. 159)

৬ স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত: গীতিগুচ্ছ, পৃঃ ১৫২

৭ দেবেন্দ্রনাথ প্রচুর যোগাভ্যাস করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন: তুমি অনেক করেছ বটে; কিন্তু খাপে খাপ লাগেনি। শেষে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বরাহনগর মঠের একটি ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণের অননুমোদিত বলা সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথের পীড়াপীড়িতে দেবেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন। প্রবল বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। সন্ন্যাসের সে-ঘোর কাটতে এক মাস সময় লেগেছিল। (শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৮-৪৩)

৮ সাধক রামপ্রসাদ গাইতেন: "এই সংসার ধোঁকার টাঁটি।
ও ভাই আনন্দে বাজার লুটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ও মা যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর মা,
তুমি গো পাষাণের বেটী॥

দিয়েছিলেন। তাতে তোমার ভাল হ'ল তো ?

নরেন্দ্রনাথ : তা হলেই বা।

—তা বলে আমায় কি বিশ্বাস করতে হবে ?

পরবর্তী দৃশ্যে কথোপকথনে রত নরেন্দ্রনাথ ও মাষ্টারমশাইকে দেখা যায়।

মাষ্টারমশাই বলেন : মশারির বাইরে শোয়াতে…

নরেন্দ্রনাথ : আমরা সুস্থির হব না, কে শুনছে ?[৯]

[ক্রমশঃ]

রামপ্রসাদের স্বগ্রামস্থ ও সমসাময়িক আঁজু গোঁসাই গানেই জবাব দেন :

এই সংসার মজার কুটি
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি
যার যেমন মন…
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিল না ত্রুটি।
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে
খেতে পেত দুধের বাটি ॥

(হারাণচন্দ্র রক্ষিত : বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ১০৪৮ দ্রষ্টব্য)

৯ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৫৪-৫৮।

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

Sri Ramakrishna Mission Ashram
Mahula P.O. (Murshidabad)
25. 2. 35

পরমস্নেহাশীর্ব্বাদমস্তু—

পরে তোমার ২২।২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার পূর্ব্বের একখানা পত্র এখনও আমি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি। যখনই তাহার উত্তর লিখিতে বসি, তখনই একটা না একটা বাধা পড়ে, আর লেখা হয় না। তোমার পত্রের উত্তরও নিজেই লিখিতে ইচ্ছা হয়। চিঠি লেখার মহারাজ এখন আর একজন আছেন। আমার শরীর সপ্তাহের মধ্যে ৩।৪ দিনই ভাল থাকে না। ভক্তসমাগমও রোজই দেশ দেশান্তরের লাগিয়া আছে। তাহার উপর আমার চক্ষের ছানি দিন দিন বড় হওয়ায়, সব সময় পত্র লিখিবার সুবিধা হয় না। তোমার পত্রের উত্তর দিয়া ফেলিলে তোমাকে এত মনে থাকিত না। যাহা হোক বাবা ! কিছু মনে করিও না। আমার পত্র না পাইলেও তোমার সংবাদ আমাকে দিতে ভুলিও না। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার মঙ্গল হোক।

আমিও প্রায়ই অখিলানন্দজীদের পত্র পাই। তাহারা Atlantic-এ বড় ঝড় পাইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তাহারা ভালয় ২ দেশে পৌঁছিয়াছে।

তোমার ভ্রাতৃবধূকে তুমি এখানে লইয়া আসিলেই আমি তাহাকে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিব। আমার স্নেহাশীষ জানিবে। অপর শুভ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅখণ্ডানন্দ

সমালোচনা

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ : শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীসুনীল মণ্ডল, মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (১৩৮৬), পৃঃ ২৭২+৪, মূল্য : কুড়ি টাকা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য আবির্ভাব মানব-ইতিহাসের একটি অভিনব ও পরম গৌরবময় অধ্যায় রচনা করিয়াছে। কেবল ধর্মাচার্যরূপে বা অধ্যাত্ম-সাধনার চরমোৎকর্ষের একটি জীবন্ত প্রতীকরূপেই যে তিনি পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা নহে। সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের জগতেও তাঁহার উপস্থিতি কি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার তত্ত্ব ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইতেছে। অল্পকাল পূর্বে শ্রীনলিনী-রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' নামক সুলিখিত গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণা বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জগৎকে কিভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার একটি সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রালোচক শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার একটি নব পরিচয় আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

সঙ্গীতের মধ্য দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়া সঙ্গীতের লোকোত্তর ব্যঞ্জনার ইতিহাস এই গ্রন্থে স্মরণীয় কুশলতার সহিত লিপিবদ্ধ। ভূমিকায় লেখক তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'শ্রীঠাকুরের সঙ্গীতসত্তার আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় বিবরণ যথাসম্ভব সন্নিবিষ্ট করেছি।' এই কার্য সমাধানে অগ্রসর হইয়া তিনি 'গায়ক-রূপে, শ্রোতা-রূপে, সমালোচক-রূপে, গুণগ্রাহী-রূপে, তাত্ত্বিক-রূপে, ভাবুক-রূপে' সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের বিবিধ বর্ণ-রঞ্জিত একটি রসঘন চিত্র পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছেন।

গায়ক শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন—'অনেক সময়েই দেখা গেছে যে-ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথোপকথন করছেন, সেই ভাবেই গান গাইছেন। আবার কারুর কোন বিশিষ্ট অধ্যাত্ম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গানের মাধ্যমে। যে কোন ঈশ্বরীয় বিষয় হোক শ্রীরামকৃষ্ণ তার উপযোগী সঙ্গীত সেই স্থলেই শুনিয়ে দেন—এ এক পরমাশ্চর্য। গীত-নির্ঝর চির প্রবহমান তাঁর চিত্ততটে।' (পৃঃ ৩০)

নানা স্থানে, নানা লোকের উপস্থিতিতে, নানা প্রশ্ন ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গীতশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ কি বিস্ময়কররূপে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক সঙ্গত ও সার্থকভাবে মন্তব্য করিয়াছেন—'কখনো আকস্মিক প্রেরণায়, কখনো প্রাসঙ্গিক আলোচনায়, কখনো শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, কখনো কখনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে, কখনো ঈশ্বরীয় ভাবমত্ততায় তাঁর গান গাওয়া। বিনা প্রস্তুতিতে সদা সপ্রতিভ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতকণ্ঠ! স্মৃতিশক্তির অলৌকিক নিদর্শন তাঁর গীত-পরিবেশনা। সিদ্ধ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এমন ঘটনা বিরল-দর্শন।' (পৃঃ ৯৭-৯৮)

কত অসঙ্কোচে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরও সঙ্গীতসুধা বিতরণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ লেখক দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ বিখ্যাত প্রতিভাধরেরাও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। বিচিত্র বিষয় এই যে—'তাঁর গীতিকণ্ঠ, সুরবোধ ও সঙ্গীতপটুত্ব স্বভাব-

দত্ত।...ভাব-জীবনের তুল্য তিনি গায়ন-জীবনেও সহজ-সিদ্ধি প্রাপ্ত।...তাঁকে কোন অভ্যাস করতে হয়নি এজন্যে।' (পৃঃ ৯৯)

তাঁহার কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতার যে সাক্ষ্য বহন করিয়াছেন শ্রীম, স্বামী সারদানন্দ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ গুণীজন, তাঁহাদের বক্তব্যও লেখক পরিবেশন করিয়াছেন। সমাজের প্রতিভাবান ব্যক্তি ব্যতীত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পীও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে কি তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন তাহার উল্লেখও লেখক করিয়াছেন। 'অত প্রসিদ্ধ পেশাদার পালা-গায়ক নীলকণ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গান গাহিতে আসিয়া যেমন ঠাকুরের প্রিয় গান—'শ্যামাপদে আশ নদীর তীরে বাস' প্রভৃতি গান শুনাইয়াছেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের গান শুনিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। লেখকের বর্ণনায় পাই—"এত বড় সঙ্গীত-ব্যবসায়ীকে শোনাতে লাগলেন দ্বিতীয় গান—'গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।' কিছুক্ষণ পরে তিনি (ঠাকুর) হেসে হেসে বললেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাবুরামদের দিকে চেয়ে, 'আমার বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি—এঁদের যাত্রা-ওয়ালাদের) আবার আমি গান শোনাচ্ছি।' নীলকণ্ঠ উত্তর দিলেন—'আমরা যে গান গেয়ে বেড়াই তার পুরস্কার আজ হলো।'" (পৃঃ ২৬-২৭)

শ্রোতারূপে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া লেখক বলিয়াছেন—'সঙ্গীত তাঁর ভগবদ্-আরাধনার, ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। যেমন স্বয়ং গায়করূপে, তেমনি শ্রোতার ভূমিকাতেও।...অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে তাঁর তুল্য সঙ্গীতের এমন গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার আধারও বিরল-দৃষ্টান্ত। শ্রোতারূপে অতিশয় সংবেদনশীল শ্রীরামকৃষ্ণ। আদর্শ শ্রোতার সর্বগুণে অলঙ্কৃত।' (পৃঃ ১২৩-২৪

শ্রীরামকৃষ্ণের একান্ত আপন প্রিয় শিষ্যগণও সঙ্গীতবিদ্যায় কতখানি পারদর্শী ছিলেন লেখক তাহার বিস্তৃত ও সযত্নে আহরিত বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ত প্রথম জীবনে বিশিষ্ট ও দক্ষ সঙ্গীতশিল্পীরূপেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বন্ধেও লেখক মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন।

জীবনের অন্তিম পর্বে ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যেও শ্রীরামকৃষ্ণ যে কত সচেতন শ্রোতা ছিলেন লেখক তাহারও দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন যে, এক ভক্ত একটি গানের পদ কিছু ভুল করিয়া গাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সে ভুলটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। (পৃঃ ১৬৩)

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার চারিপার্শ্বে কি মাধুর্যময় একটি সঙ্গীতলোক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার অনুপম পরিচয়টি লেখক গভীর অভিনিবেশ ও কৃতিত্বের সহিত তুলিয়া ধরিয়াছেন।

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সামূহিক পরিচয়' বিভিন্ন সাঙ্গীতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সুচিন্তিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে লেখক নিপুণভাবে প্রদান করিয়া এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, 'সঙ্গীতের কোন বিভাগেই অনবহিত ছিলেন না পূর্ণজ্ঞানী শ্রীঠাকুর।' (পৃঃ ২৭০)

লেখকের সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকার এবং সঙ্গীত বিদ্যার চিন্তাশীল আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রকাশ করিবার সহজ দক্ষতা সঙ্গীতজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঐশ্বর্য বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার একটি বিস্ময়কর, সুবিস্তৃত ও তথ্যনির্ভর পরিচয় পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের একটি নূতন দিকের উদ্ঘাটন এই পরম আকর্ষণীয় গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নূতন ও সমৃদ্ধ রচনা সংযোজনে প্রকাশক শ্রীসুনীল মণ্ডলের উৎসাহ অভিনন্দনযোগ্য। প্রচ্ছদ-অঙ্কনে শ্রীগণেশ বসু শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্ণনীয় ভাব-তন্ময়তাকে অবিস্মরণীয়রূপে আভাসিত করিয়াছেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

মুক্তিসংগ্রাম : শ্রীমাখন গুপ্ত। **প্রকাশক :** শ্রীরমেশ ভট্টাচার্য, ভট্টাচার্য ব্রাদার্স, ৩০/১, কলেজ রো কলিকাতা-৯, (১৩৮৪), পৃঃ ১৮১, **মূল্য :** পনের টাকা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস ভারতবাসীর কাছে 'অমৃত সমান', এ কথা বলতে পারলে সত্যিকারের পরিতৃপ্তি লাভ করা যেত; কিন্তু বাস্তব এ বিষয়ে বড় পরিহাস-রসিক। আজ চারদিকে ইংরেজি মিডিয়ম বিদ্যালয়ের, বিশেষত শিশুশিক্ষা-নিকেতনের যেরকম বাড়-বাড়ন্ত, ইংরেজি কেতাকায়দার প্রতি যে প্রকার বিশ্রী আগ্রহ, কথায় কথায় স্বদেশকে তুচ্ছ করার যে ধরনের কদর্য মানসিকতা তাতে প্রায় সদ্যবিগত একটি যৌবন-তেজদৃপ্ত গৌরবোজ্জ্বল যুগের কীর্তিকাহিনী শোনানোর প্রয়াসকে 'অপ' বিশেষণে হয়ত ভূষিত হতে হবে। কিন্তু না, এ-ই বুঝি প্রকৃষ্ট সময় যখন আত্মবিস্মৃত জাতির মর্মে অগ্নিময় সেই অধ্যায়ের রূপ সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত করে দিতে হবে। শ্রীমাখন গুপ্ত সেই জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

মাখনবাবু প্রচলিত সংজ্ঞায় ঐতিহাসিক নন, তিনি তথ্য ও তত্ত্বের প্রচুর সম্ভার সাজিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন নি। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই তিনি দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে আত্মনিবেদিত এবং তিনি স্বভাব-কবি। একদিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামকে কেন্দ্র করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে তাঁর কবিমনে মূর্ত হয়ে ওঠা এই সংগ্রামের গভীর গম্ভীর ভাবরূপ তাঁকে 'মুক্তিসংগ্রাম' রচনায় প্রণোদিত করেছে।

'মুক্তিসংগ্রাম' শুরু হয়েছে পলাশির প্রহসনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে, শেষ হয়েছে স্বাধীন ভারতের সংবিধান কার্যকর হওয়ার সংবাদ-দানে—অর্থাৎ ১৭৫৭-র ২৩ জুন থেকে ১৯৫০-এর ২৬ জানুআরি—এই কালসীমায় ভারতের বুকে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছে, ভারতীয় জনসমাজ যেভাবে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছে—কখনও 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' মনে করে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে, কখনও বা অহিংস নীতিতে অবিচল থেকে—তার মর্মস্পর্শী পরিচয় এই স্বল্প-পরিসর গ্রন্থে লেখক দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকার ঐতিহাসিক নন; সুতরাং এ গ্রন্থ সনতারিখ, টীকাটিপ্পনী, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি-সজ্জিত নয়। দেশসেবার ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতাকে আপন হৃদয়ে লালিত অক্ষুন্ন আদর্শবাদের দ্বারা সমৃদ্ধ করে, স্বতোৎসারিত কবি-মনের প্রেরণায় লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেইজন্যই গদ্যে রচিত এই গ্রন্থে মাঝে মাঝেই আমরা পদ্যের সন্ধান পাই—অবশ্য রচনাধর্মে গদ্য পদ্য উভয়ই কবিত্বমণ্ডিত। 'রণনিপুণ ইংরাজ সেনানায়কদের বুদ্ধি ও রণকৌশলে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমিত হল। সিন্ধুপারের হিন্দুস্থান-পাগলা ঘোড়ার লাগাম আবার ফিরে এলো হাতের মুঠোয়।' সিপাহী বিদ্রোহের পরিণতির এমন কাব্যময় প্রকাশ প্রচলিত ইতিহাস-পুস্তকে কি লভ্য? কিংবা বিশ্বাসহন্তা নরেন গোঁসাইকে সত্যেন ও কানাইলাল যে পরিস্থিতিতে পিস্তলের গুলিবিদ্ধ করে শাস্তি দিয়েছেন সেই পরিস্থিতির কাব্যরূপের একটি অংশের কথা মনে করা যেতে পারে—

" 'মরণেরে ভয়, এই পথে তবে
কেন এসেছিলি সাথে?
অবিশ্বাসের বিষদাঁত, তোরে
তুলে গেনু নিজহাতে।'
তার পর—
বিচারের শেষে, বিচার-আদেশে
গলায় পরিয়া ফাঁস—
সাগরের দোলে পলকে লুকালো
প্রলয় জলোচ্ছ্বাস।"

শেষের অংশটি অর্থাৎ 'সাগরের দোলে পলকে লুকালো প্রলয় জলোচ্ছ্বাস' একটি গভীর অনুভূতিতে, বেদনার এক তীব্র সংবেদনায় আমাদের মনকে ভরে দেয়।

বস্তুত এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে শেষ করা যায় না। আসলে ইতিহাসের নিজস্ব একটা রসলোক বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতা, 'গোরা' উপন্যাস, 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা ইতিহাস-রসের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থখানি এই ইতিহাস-রসের সম্যক্ পরিচয় পাঠকচিত্তে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। এ বই আমাদের তরুণসমাজের অবশ্যপাঠ্য হওয়ার যোগ্য।

অধ্যাপক শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য

হাতের কাজ নিজেরই কাজ: শ্রীহরিপদ সরকার। প্রকাশক: শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩। (১৯৭৮) পৃঃ ৬৩+৭, মূল্য: ৪ টাকা ৫০ পয়সা।

কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাধারণ উপকরণ থেকে কিভাবে লাভজনক শিল্পসম্ভার গড়ে উঠে এবং স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকার্জন করা যায়—এ পুস্তকটিতে তারই সুস্পষ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লেখক। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে ও বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা আর অবসর-সময়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজের উপকরণ সংগ্রহ করার সূত্রে বইখানা লেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। ভারত সরকারের শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণ দপ্তর এ পুস্তকটির পাণ্ডুলিপির জন্য লেখককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। বইটির নাম খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও উপযুক্ত হয়েছে, কারণ এর মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেওয়া যে, হাতের কাজ নিজেরই কাজ, এতে শ্রমের যথার্থ মর্যাদা আছে। দরিদ্র অ-দরিদ্র সকল স্তরের নরনারীর পক্ষেই হাতের কাজগুলি সহজে আয়ত্ত করা যায় অবসর-সময়ে এবং অতিরিক্ত কিছু উপার্জনও হয়। এজন্যই লেখক তেইশটি ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প বেছে নিয়ে তৎসম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন। লেখকের উপদেশের সঙ্গে চিত্রগুলি সংযোজিত হওয়ায় বিষয়বস্তু সহজে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

ক্ষুদ্র কুটীরশিল্পগুলির মধ্যে শোলা থেকে ডাকের সাজ, খড়কুটো থেকে প্যাকিং, বাঁশ ও বেতের মোড়া, বাঁশের ঝুড়ি তৈরী, তালপাতার হাতপাখা, তালপাতার টুপি, হাতে তৈরী বুরুশ, ফেলনা জিনিসের খেলনা, কাঠের গুঁড়োর খেলনা, কাঠের পুতুল ও খেলনা, শিংয়ের চিরুণী ও খেলনা, মাটির কাজ, গালার কাজ, কড়ির কাজ, ঝিনুকের বোতাম তৈরী, হাতে তৈরী ছোট কাঠের চামচ, খড়িমাটির সাদাকালি, তুচ্ছ চটের শৌখীন ব্যাগ, হাতে তৈরী সোয়াব, ধূপকাঠি, হাতে তৈরী খাম, বাঁধাই (বই ও খাতা) কাজও একটি কাজ, স্প্রে-পেইন্টিং: একটি রং করার আধুনিক কাজ—এই ২৩ (তেইশ) রকমের হাতের কাজের প্রত্যেকটির জন্য কি কি উপকরণের প্রয়োজন, কোথায় এগুলি পাওয়া যায়, তৈরী করবার পদ্ধতি বা প্রণালী কি, নির্মিত দ্রব্যগুলি কোথায় বিক্রী করা যায়, বিক্রী ক'রে কত লাভ হয়, দৈনিক উপার্জনই বা কত হয় ইত্যাদি অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সহজ সরল ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। মোটের উপর বইটি ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প সম্বন্ধে অতি কার্যকর গাইড্-বুক বা সাহায্যকারী নির্দেশিকা।

পুস্তকটির মলাট চৌদ্দটি নানা রঙের কুটীর-শিল্পের ছবিতে সুশোভিত ও আকর্ষণীয়। তাছাড়া

প্রতিটি শিল্পের পরিচয় দেবার সঙ্গে একটি ছবিও দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট ধারণা জন্মাবার জন্য। গ্রামের ও শহরের বেকার স্ত্রী-পুরুষ, যুবক ও যুবতী সকলেই জীবিকার অবলম্বনরূপে যে-কোন দু-একটি শিল্প-নির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে উপকৃত হবেন। উপার্জনশীল যাঁরা তাঁরাও অবসর-সময়ে কুটীরশিল্পের কাজে তাঁদের আয়বৃদ্ধির পথ ক'রে নিতে পারেন।

আমরা আশা করি বইখানির সাহায্যে সাক্ষর ও নিরক্ষর স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী সকলেই কর্মজীবনে নতুন নতুন হাতের কাজের সন্ধান পেয়ে আত্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর হতে পারবেন। এজাতীয় বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়)—**পুনর্বাসনকার্য :** বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে নূতন জমিতে মাল পরিবহনের জন্য ছাত্রবৃন্দ, গ্রামবাসী এবং অন্যান্যদের সাহায্যে আরামবাগ মহকুমার বালি অঞ্চলে একটি নূতন রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। গত ১২ই জানুআরি ১৯৮০, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী উক্ত সংযোজক সরণীটির উদ্বোধন করেন। প্রায় ১২০টি পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য একটি নূতন কলোনির ভিত্তি-প্রস্তরও তিনি স্থাপন করেন।

গত ৩১শে জানুআরি ১৯৮০, আরামবাগ মহকুমার দিঘড়া গ্রামে 'অভয়বাড়ি' (•২টি পাকা-বাড়ি) ও 'নিশ্চিন্ত নীড়' (৬৪টি পাকাবাড়ি) নামক দুইটি নবনির্মিত কলোনি এবং একটি দোতলা সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও দুইজন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, উভয় সহকারী সম্পাদক, অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং প্রায় ছয় হাজার গ্রামবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ—খরাত্রাণ : 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' প্রকল্প অনুসারে কর্মরত খরাপীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুলিয়া কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০ পশমী কম্বল বিতরিত হয়।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ—গঙ্গাসাগর মেলায় সেবাকার্য : সাগর দ্বীপে আয়োজিত গঙ্গাসাগরের মকর-সংক্রান্তির মেলায় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ও মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম এবং সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সহযোগিতায় মূলকেন্দ্র কর্তৃক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মেলা-প্রাঙ্গণে চিকিৎসা-শিবিরে ৩১ জন অন্তর্বিভাগীয় ও ৫,৪৯১ জন বহির্বিভাগীয় রোগীর চিকিৎসা করা এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। বিতরিত ঔষধপত্রের মূল্য ৮,৩২৫ টাকা।

(ঘ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়)—পুনর্বাসনকার্য : বন্যাদুর্গত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন-কল্পে গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

উৎসব

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম আবির্ভাবতিথি গত ৯ই জানুআরি ১৯৮০, যথারীতি এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় ২০,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্ণে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ।

বিবিধ

গত ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ **নতুন দিল্লী** কেন্দ্রের বক্তৃতাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদা-দেবীর প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন এবং 'দি রামকৃষ্ণ মুভমেণ্ট' নামে একটি স্মরণিকাও আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

সিঙাপুর কেন্দ্র গত ১৯৭৯'র ডিসেম্বরে উহার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করে এবং এই উপলক্ষে গত ২২শে ডিসেম্বর ১৯৭৯, একটি ধর্মসম্মেলনের আয়োজন করে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৭৮-৭৯ সালের কার্যবিবরণী

১৩ই জানুআরি ১৯৮০, বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের ৭০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পঠিত পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

সংযোজন ও সম্প্রসারণ

গত ১৯৭৮-৭৯ সালে সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কার্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বরিষায় একটি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারি; কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ১২টি শয্যাযুক্ত একটি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট; কনখলে দ্বিতীয় ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারি; সারদাপীঠে নবনির্মিত 'শো-রুম'; কোয়েম্বাটুর বিদ্যালয়ে পলিটেকনিক ছাত্রগণের জন্য 'বিবেকানন্দ ইল্লম' নামক একটি চারতলা হোস্টেল; মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনাধীন একটি ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয় ও একটি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোতলার নির্মাণ; নরোত্তমনগরের বিদ্যালয়টিতে একটি নবনির্মিত গৃহসহ উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের সংযোজন; সোহবরপুঞ্জীতে ছাত্রীদের হোস্টেলে একটি নূতন তলার নির্মাণ; চেরাপুঞ্জীর উমডিয়েনংপোতে একটি নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন; টাকীতে নবনির্মিত শ্রীরাম-কৃষ্ণ-মন্দিরের এবং চেরাপুঞ্জীতে নূতন পূজাকক্ষের উৎসর্গীকরণ।

(আলোচ্য বর্ষে রামকৃষ্ণ মঠের উন্নয়নাদিকার্য নিম্নরূপ :

নটরমপল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণের নূতন মন্দির; এলাহাবাদে নবীকৃত পূজাকক্ষের ও ত্রিবান্দ্রামে নবীকৃত প্রার্থনাকক্ষের উৎসর্গীকরণ; বৃন্দাবনে নব-নির্মিত 'মুরলী-মনোহর সন্ত নিবাস' নামক সাধু ও ব্রহ্মচারীগণের বাসগৃহের এবং দিনাজপুরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত উপগৃহের উদ্বোধন; তিরুভাল্লাতে একটি গ্রন্থাগারের ভিত্তিস্থাপন।)।

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী

রামকৃষ্ণ মিশনের মূল কেন্দ্র বেলুড় ব্যতীত ১৯৭৯'র মার্চে উহার ৭৪টি শাখাকেন্দ্র ছিল—যাহার মধ্যে ৬২টি ভারতে; ৭টি বাংলাদেশে; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙাপুর, শ্রীলংকা এবং মরিশাসে ১টি করিয়া। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামকৃষ্ণ মঠের ভারত এবং বহির্ভারতের ৬৪টি কেন্দ্রের কার্যাবলীর বিষয় এখানে বিবৃত করা হইতেছে না।

মিশনের কার্যাবলী মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) ত্রাণকার্য (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা

(৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার (৫) গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য এবং (৬) বিদেশে প্রচার।

(১) ত্রাণকার্য: আলোচ্য বর্ষে ত্রাণকার্যে মোট ৭১,৪২,৪০৫ টাকা খরচ হইয়াছে। অধিকন্তু বিতরিত নানাবিধ ত্রাণসামগ্রীর মূল্য ৩৯,৬৭,৭৬৩ টাকা।

(ক) বন্যাত্রাণ: শাখাকেন্দ্রসমূহের সহযোগিতায় মূলকেন্দ্র কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের ৫৬টি জায়গায়; উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদে, বিহারে হারাঘাট, নাওগাছিয়া ও কাটিহারে এবং দিল্লীতে রূপনগর ও বুদ্ধজয়ন্তী গার্ডেনে ত্রাণকার্য পরিচালিত হয়।

(খ) ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ: পুরী মিশন কর্তৃক পুরানাবাঁধ গোড়ায় (কেওঁনঝর)।

(গ) দণ্ডকারণ্য-পরিত্যাগীদের ত্রাণ: মূলকেন্দ্র কর্তৃক খড়্গপুর ও হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে।

(ঘ) অগ্নিত্রাণ: নরোত্তমনগর শাখাকেন্দ্র কর্তৃক ত্রিপুরা জেলাতে।

(ঙ) চিকিৎসামূলক ত্রাণকার্য: মনসাদ্বীপ ও সেবা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলায়, তমলুক আশ্রমের মাধ্যমে দাসপুর এবং মূলকেন্দ্র কর্তৃক পুর্নাল, আগুন্সী ও বাগনানে।

(চ) পুনর্বাসনকার্য: (১) আলোচ্য বর্ষে মূলকেন্দ্র কর্তৃক অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষ্ণা জেলার দিভি তালুকে ৬৮৪টি পাকাবাড়ি এবং একটি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয় এবং ৩২০টি গৃহ ও ২টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকার্য চলিতে থাকে। আলোচ্য বর্ষের পর শেষোক্ত ৩২০টি গৃহ ও ২টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় সমগ্র প্রকল্পটি (১০০৪টি ঘূর্ণিবাত্যা-প্রতিরোধক বাসগৃহ ও ৩টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণ) রূপায়িত হইয়াছে। (২) হায়দ্রাবাদ মঠের উদ্যোগে বাপাংলায় ৯৬টি পাকাবাড়ি এবং একটি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকার্য চলিতেছে। (৩) মাদ্রাজ ত্রাণকেন্দ্রের প্রচেষ্টায় ৫৭টি পাকাবাড়ি এবং ২টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

(ছ) বাংলাদেশে ত্রাণকার্য: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বাগেরহাট ও দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে বস্ত্রাদি ও খাদ্যবস্তু বিতরণ এবং চিকিৎসাকার্য অব্যাহত ছিল।

উপরি-উক্ত ত্রাণকার্য ছাড়াও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র নিজ নিজ এলাকায় নিয়মিতরূপে অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া দরিদ্রদের সাহায্য করিয়াছে। মূলকেন্দ্রও ৯৭টি পরিবার ও ২২৬টি ছাত্রকে নিয়মিতভাবে এবং ৭৪টি পরিবার ও ৬৫টি ছাত্রকে সাময়িকভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪২,০৯০ টাকা। কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে পোশাক, কম্বল, বস্ত্রাদি এবং চিকিৎসা-সাহায্যও দেওয়া হয়।

(২) চিকিৎসা: জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ভারতে মিশনের বহু শাখাকেন্দ্র অনেকগুলি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ডিসপেনসারি পরিচালিত করে। আলোচ্য বর্ষে ৮টি হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ছিল ১,৩১০ এবং চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৩,১৫১। ৮০টি বহির্বিভাগীয় ডিসপেনসারিতে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৫,১২,৪৬৮। রাঁচির স্যানাটোরিয়াম এবং নূতন দিল্লীর টি. বি. ক্লিনিকে যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা করা হয়। কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান পূর্ববৎ আলোচ্য বৎসরেও (অন্যান্য বিভাগ ছাড়াও) একটি পরিচর্যা ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষণ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। উক্ত বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগে (সহকারী ও সাধারণ) ২১৭ জন শিক্ষার্থিনী ছিলেন। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও ডিগ্রির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত একটি ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল

সাফেন্সও সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। উহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩৫।

(মঠ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৩২৩টি শয্যাযুক্ত ৫টি অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে ১১,৮৪১ জন এবং ১৭টি বহির্বিভাগীয় ডিসপেনসারিতে ৪,৯২,২৪৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ইহা ছাড়া ত্রিবান্দ্রাম হাসপাতাল পরিচালিত পরিচর্যা ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীনীর সংখ্যা ছিল ৫৩।)

(৩) শিক্ষা : আলোচ্য বৎসরে মিশন পরিচালনা করে ৫টি ডিগ্রি কলেজ, ২টি বি. এড্. কলেজ, ১টি স্নাতকোত্তর বেসিক শিক্ষণ কলেজ, ৪টি জুনিয়র বেসিক শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক শিক্ষণ স্কুল, ১টি শারীর-শিক্ষা কলেজ, ১টি কৃষি বিদ্যালয়। ৪টি পলিটেকনিক, ৮টি জুনিয়র কারিগরি ও শিল্পবিদ্যালয়, ৮৩টি বিদ্যার্থীভবন, ছাত্রাবাস ও অনাথাশ্রম, ১টি চতুষ্পাঠী, ৩৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৯টি অন্যান্য পর্যায়ের বিদ্যালয়, ১৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র তথা কমিউনিটি সেণ্টার, ১টি অন্ধ বালকদের বিদ্যালয়, ২টি বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা বিদ্যালয়, ১টি বিশ্বধর্ম বিদ্যালয় এবং ১৬টি অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৮,৬৪৫। ইহাদের মধ্যে ৫৬,৬০১ জন ছাত্র এবং ২২,০৪৪ জন ছাত্রী।

(মঠ কেন্দ্রগুলি পরিচালিত ২৪টি বিদ্যালয়ে ও বিদ্যার্থীভবনে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭,০২৩)।

(৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার : এই বিভাগে—বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, বক্তৃতা ও আলোচনা-সভা, ধর্ম ও শিক্ষামূলক ছায়াচিত্র-প্রদর্শন, নিয়মিত ক্লাশ, নৈমিত্তিক প্রদর্শনী এবং সর্বজনীন উৎসব অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ করা যায়। বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের প্রকাশনবিভাগের কার্যকলাপও প্রশংসনীয়। (মঠকেন্দ্রগুলিও কয়েকটি বড় প্রকাশনকেন্দ্র ও মন্দিরাদির পরিচালনা করে এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করে।)।

(৫) গ্রামে এবং উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেবাকার্য : সীমিত অর্থবল ও লোকবল লইয়া মিশন দরিদ্র এবং অনুন্নত ব্যক্তিদের ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে সেবার কাজ করে। প্রধানতঃ লক্ষ লক্ষ দরিদ্র এবং অনগ্রসর মানুষ মিশন পরিচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সেবায় উপকৃত হয় এবং মিশনের ত্রাণকার্যগুলিও ইহাদেরই জন্য। এই বিভাগের কার্যের প্রসঙ্গে আরও বলা যায় যে, বেশ কয়েকটি বড় বড় কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। ১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ; ৪৯টি উচ্চ-বুনিয়াদী, নিম্ন-বুনিয়াদী, উচ্চ-প্রাথমিক, মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ; ৪৮টি নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় ; ৭৩টি বয়স্ক-সাক্ষরতা ও কমিউনিটি কেন্দ্র ; ২৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় ; বহু গ্রন্থাগার, যাহাদের মধ্যে ৮টি ভ্রাম্যমাণ ; ৫৪টি দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র ; ১০টি সবাকচিত্র-প্রদর্শক ইউনিট ; ১০টি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্র ; ১টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর এলাকাগুলিতে অবস্থিত। ইহা ছাড়া ৮টি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসারির মাধ্যমে ২,২০,৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছেন। নরেন্দ্রপুরে গ্রামপর্যায়ে কর্মিশিক্ষণ কেন্দ্র এবং রাঁচীতে দিব্যায়ন উপজাতীয় ও গ্রামের যুবকদের কৃষি, দুগ্ধাগার, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষণ দিতেছে। চেরাপুঞ্জি, আলং ও নরোত্তমনগরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ অঞ্চলে শিক্ষা ও চিকিৎসার কাজে স্থানীয় উপজাতিদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। কুকী, মিজো এবং অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে শিলচর সেবাশ্রম নানাপ্রকার কল্যাণমূলক কাজ করিতেছে।

(৬) বিদেশে প্রচার : ফ্রান্স, মরিশাস, সিঙাপুর, ফিজি এবং শ্রীলংকায় অবস্থিত কেন্দ্রগুলি আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সহিত সংস্কৃতিমূলক

কাজও করিতেছে। মরিশাস, সিঙাপুর ও ফিজি কেন্দ্রে কিছু কিছু শিক্ষামূলক কাজও করা হইতেছে।

ভারতের বাহিরে অবস্থিত ১৫টি মঠকেন্দ্রের সন্ন্যাসীগণ কেন্দ্র ছাড়াও কেন্দ্রের বাহিরে অন্যান্য স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দেন; শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ পূজা সহ ধর্মীয় উৎসব পালন, শিক্ষামূলক সভাদির ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার পরিচালন, এবং অধ্যাত্ম শিক্ষা ও দর্শনের উপর রচিত গ্রন্থাদির প্রকাশনও করেন।

বাংলাদেশে ১০টি মঠ ও মিশনকেন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস, গ্রন্থাগার এবং দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা ছাড়াও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারে নিযুক্ত রহিয়াছে।

উপসংহার

বহু প্রতিকূলতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের কর্মীবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মিশনের আদর্শ অনুসরণে সংকল্পবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কট চলিতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার মিশনে বিশ্বাসী সকলেরই সুসংহত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮০'র ডিসেম্বরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার কর্মসূচীও নির্ধারিত হইতেছে। এই মহাসম্মেলনকে সফল করিতে আমরা সকলেরই অকুণ্ঠ সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ৩রা ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৭ই ডিসেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

মন নিয়ে কথা হচ্ছিল। এরপর ঠাকুর পাপের কথা বলবেন। 'আমি পাপী', 'আমি পাপী'—এই বুদ্ধি থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, সেই প্রসঙ্গের ভূমিকা হিসাবে মাষ্টারমশাই গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥'—এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিলেন এই পরিচ্ছেদের (১।২।৬) সূচনায়। শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—'ধর্মাধর্ম সব কিছু ছেড়ে একমাত্র আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবো—শোক কোরো না।'

ঠাকুর বলছেন, মনেতেই মানুষ বন্ধনে পড়ে আবার মনই মানুষের মুক্তির কারণ হয়। 'মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি। কিংবদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥'—যেমন মতি তেমনি গতি। 'আমি মুক্ত'—এই ভাব মনে রাখলে সে সত্যিসত্যিই মুক্ত, হয়ে যায়; আর যে ভাবে সে তো বদ্ধ জীব, সংসারের মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না, সে সত্যিসত্যিই বদ্ধ হয়ে যায়। এই জন্যই বিচার করতে হবে আন্তরিকভাবে। নিত্য কিছুক্ষণ এই বিচার—'আমি মুক্ত', 'আমি মুক্ত'—'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধস্বভাব আত্মা আমি', 'কোন বন্ধন আমার নেই, কোন হীন কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় যাতে আমি বন্ধনে পড়ি।' আর এরই ফলে মুক্তি সত্যি-সত্যিই আসবে। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে, 'আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা'—'রাজরাজেশ্বরী

আমার মা—আমায় আবার পাপ কিসের ?' তাই তো সাধক কবি বলেছেন, 'এ সংসারে কারে ডরি, রাজা যার মা মহেশ্বরী।' তাই ঠাকুর বলছেন, "যদি সাপে কামড়ায়, 'বিষ নেই' জোর করে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি 'আমি বদ্ধ নই, আমি মুক্ত' এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।" মনের এই রকম জোর চাই। নিজের শক্তির ওপর এই বিশ্বাসের নামই স্বামীজী বলেছেন আস্তিকতা। তিনি বলেছেন, 'ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ, সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ।'— যারা নিতান্তই দেহসর্বস্ব, তারাই 'আমরা দুর্বল, হীন, আমরা বদ্ধ, আমাদের কিছু হবে না'—এই সব বলে। তারাই নাস্তিক আর যাঁরা ভগবদ্-বিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসী তাঁরা বলেন, 'প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা। আস্তিক্যাস্তি-দন্ত...॥'—আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন আমরা ভয়শূন্য ও বীর—এই হল আস্তিক্য।

ঠাকুরও সেই কথাই বলছেন, "খৃষ্টানদের একখানা বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল 'পাপ আর পাপ'।" কেশবচন্দ্রকে বলছেন—ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনাতেও ঐ পাপের কথা। যে-রাতদিন 'আমি পাপী', 'আমি পাপী' এই করে, সে তাই হয়ে যায়।

এই কথা বলেই ঠাকুর থেমে যাচ্ছেন না। এর হাত থেকে বাঁচবার পথও দেখাচ্ছেন: "ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—'কি আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে! আমার আবার পাপ কি ?' " এই রকম মনের জোর চাই। ভগবানের নামের এমনি প্রভাব— 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে, আর শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।' শুধু ভগবানের নামের জোরে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়। আর এই শুদ্ধ মনেই পরা ভক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণকিশোর পরম ধার্মিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর কথার উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলছেন, মানুষ যদি অন্তর থেকে ভগবানের নাম করে, তাহলেই দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে সে মুক্ত হয়ে যায়। শুধু বিশ্বাস —নামের মহিমায় বিশ্বাস। নামের অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস। শত অন্যায় করেও যদি কেউ অনুতপ্ত হয়ে আর সেপথে পা না বাড়ায় আর নামের শক্তিতে বিশ্বাস করে ভগবানের শরণাগত হয়, তার মুক্তি হবে। এই কথা বলে নামের মহিমার বিষয়ে ঠাকুর গান ধরেছেন—

> 'আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
> আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
> জানা যাবে গো শঙ্করী॥'

আমি দুর্গানাম করেছি, আমার আবার চিন্তা কি ? অন্তিমে ঠিক তুমি আমায় উদ্ধার করবে— ঠিক ভক্তের এই বিশ্বাস থাকে।

তারপর ঠাকুর বলছেন মার কাছে তিনি নিজে কেমন ক'রে প্রার্থনা করতেন। তাঁর চরণে সব সমর্পণ করেছিলেন—পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি সব তাঁকে দিয়ে শুধু চেয়েছিলেন শুদ্ধা ভক্তি। মনকে শুদ্ধ রাখতে হবে। মনে বিশ্বাস রাখতে হবে, তাঁর করুণায় আমি শুদ্ধ। এই বুদ্ধিই মানুষকে নিষ্পাপ করে তুলবে।

ঠাকুর আবার গান ধরলেন—'আয় মন বেড়াতে যাবি...।' গানটিতে বলা হয়েছে, 'প্রবৃত্তি' আর 'নিবৃত্তি' দুই পত্নী। এদের মধ্যে প্রবৃত্তি মানে ভোগবাসনা ছেড়ে দিয়ে নিবৃত্তি অর্থাৎ ত্যাগকে সঙ্গে রাখতে হবে। আর এই নিবৃত্তি বা ত্যাগ থাকলে 'বিবেকে'র উদয় হবে। সেই বিবেক-বুদ্ধিই জানিয়ে দেবে কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক —কোন্‌টা শ্রেয়, কোন্‌টা প্রেয়। এইটিই 'তত্ত্ব'-বিচার। প্রবৃত্তি থেকে কামনা-বাসনার উৎপত্তি। প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকতে হবে। তার সঙ্গ হলেই আসক্তি আর তার ফলেই সর্বনাশ। বৌদ্ধশাস্ত্রেও এই প্রবৃত্তিকে 'তণ্‌হা' বা তৃষ্ণা

বলে বলা হয়েছে, 'তণ্‌হায় জায়তে সোকো তণ্‌হায় জায়তে ভয়ং, তণ্‌হায় বিপ্‌পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতো ভয়ং।'—তৃষ্ণা থেকেই শোক উৎপন্ন হয়, ভয়েরও কারণ তৃষ্ণাই। কিন্তু তৃষ্ণা থেকে বিমুক্তি যাঁর হয়েছে তাঁর শোক নেই আর ভয়ই বা হবে কোথা থেকে? এই 'তণ্‌হা'র পূর্ণ নিবৃত্তিই পরা শান্তির কারণ। জ্ঞানবিচারের সহায়তায় অজ্ঞান আপনিই নষ্ট হবে। তখন সর্বত্র সমবুদ্ধি আসবে, শুচি-অশুচি-ভেদ-বুদ্ধি চলে যাবে—গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক বোধ হবে। তখনই দিব্যজ্ঞান। এরপর গানটিতে এসেছে 'অহংকার' আর 'অবিদ্যা'র কথা। বলা হয়েছে এরা মনের বাপ-মা। সাংখ্যশাস্ত্রে আছে 'অহংকার' থেকেই মনের উৎপত্তি। বেদান্তে 'অবিদ্যা'কে সৃষ্টির মূল বলা হয়। 'মোহে'র ফাঁদ পাতা আছে এই বিশ্বভুবনে। 'ধৈর্য' ধরে বিবেক অবলম্বন করে সেই মোহের আকর্ষণ থেকে বাঁচতে হবে। এই দুঃখময় জগৎকে সুখকর মনে করে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি। এই মোহ দূর করতে হবে। মুক্ত হতে হলে 'ধর্মাধর্ম' ত্যাগ করতে হবে। 'অধর্ম' বা পাপ যেমন ত্যাগ করতে হবে, তেমনি 'ধর্ম' বা পুণ্যও ত্যাগ করতে হবে। পুণ্যকামনায় মানুষ অনেক কষ্ট করে। কিন্তু কামনা থাকলে মুক্তি নেই। তাই গানটিতে জ্ঞানরূপ খড়্গ দিয়ে ধর্মাধর্ম রূপ ছাগ-দুটিকে বলি দেবার কথা বলা হয়েছে। 'প্রথম ভার্যার সন্তানেরে' অর্থাৎ প্রবৃত্তি থেকে যে-সব কামনা-বাসনার উৎপত্তির কথা আগেই বলা হয়েছে, তাদের জ্ঞানবিচারসাগরে বিসর্জন দিতে হবে। আর তাহলেই মহাকালের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারা যাবে, 'আমি মুক্ত—আমার আবার ভয় কিসের?' এইটিই মনের 'মনের মত মন' হওয়া।

তারপর ঠাকুর বলছেন, 'সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনকরাজার হয়েছিল।' কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে জনকরাজা হওয়া সোজা নয়। জনকরাজা হতে গিয়ে, এদিক ওদিক দুদিক রাখতে গিয়ে অনেকে গুপ্তভাবে ভোগ করতে আরম্ভ করে। 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।' এ রকম বলতে কজন পারে? সংসারে থেকেও জনকরাজা অসংসারী ছিলেন, এমন অল্পই হয়। সেইজন্য ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি-বিশ্বাস রেখে সংসার করলে এই সংসারই তখন মজার কুঠি হয়ে যায়। তবে সেটি সাধন সাপেক্ষ। (১।২।৬)

গীতা—

শ্রীভগবান প্রিয় সখা অর্জুনকে তাঁর স্বধর্ম—ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। আর তিনি যদি তা না করে যুদ্ধে বিরত হয়ে অক্ষত্রিয়োচিত পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করেন, তাহলে তার ফল তার পক্ষে ভয়াবহ হবে সে কথাও বলেছেন এই 'ভয়াবহঃ' শব্দটির ব্যাখ্যা করে আচার্য শংকর বলছেন, 'নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি'—পরধর্ম ভয়াবহ কেন? না, পরধর্ম নরক ও পশুপক্ষীযোনিতে জন্মের কারণ। অর্জুনকে নিষ্কামভাবে স্বধর্মে প্রোৎসাহিত করবার জন্য নানাকথা বলে শেষে ভয় দেখাচ্ছেন, যদি অর্জুন তাঁর কথামত না চলেন, তাহলে কি বিপদ হতে পারে। এসব শোনার পর অর্জুনের মনে একটা প্রশ্ন এলো—রাগদ্বেষ থেকে মানুষের কোন কর্মে যে প্রবৃত্তি এবং কোন কর্মে যে অনীহা হয়, যার ফলে নরকভোগও হতে পারে, এর প্রেরণা কে দেয়? কেন মানুষ পাপ করে? তাই জিজ্ঞাসা করছেন তিনি ভগবানকে,—'মানুষের ইচ্ছা না থাকলেও কে জোর করে, যেন তার ঘাড় ধরে তাকে পাপকর্মে নিয়োজিত করে?' মনে মনে হয়তো দৃঢ় শুভ সংকল্প করা হয়েছে সব রকম অন্যায়কর্মচিন্তা থেকে দূরে থাকবো। কিন্তু হঠাৎ যেন কি একটা প্রচণ্ড আলোড়ন সবেগে এসে

সব সংকল্প ভাসিয়ে দিয়ে গেল। কিছুতেই নিজেকে সামলানো গেল না, অন্যায়স্রোতে সব প্রতিজ্ঞা ডুবে গেল। কিন্তু কেন এমন হ'ল? কে আমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিল? এই চিরন্তন প্রশ্নটি করলেন অর্জুন। (৩।৩৬)

চণ্ডীতে এই ধরনের ব্যাপারের পেছনে দেবী মহামায়ার প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিদেরও চিত্ত তিনি সবলে আকর্ষণ করে মোহাচ্ছন্ন করেন। কিন্তু এখানে শ্রীভগবান বলছেন, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, তার মধ্যে রজোগুণ ক্রিয়াত্মক, তার সৃষ্টি কাম ও ক্রোধ মানুষের পরমশত্রু। এরা উগ্রস্বভাব। এদের ক্ষুধার শেষ নেই, উপভোগের দ্বারা কামনা নিঃশেষে চরিতার্থ হয় না। এই কামের পরিপূর্তির জন্য মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। আর কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধ। কাম আর ক্রোধ আলাদা নয়। প্রতিরুদ্ধ কামই হচ্ছে ক্রোধ। মানুষের সমস্ত কুপ্রবৃত্তির মূলে এই কাম ও ক্রোধ। তাই ভগবান এদের কাছ থেকে সাবধান হতে বলছেন। (৩।৩৭)

কামের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা শ্রীভগবান বলছেন উপমা দিয়ে—যেমন ধোঁয়ায় আগুনের দীপ্তি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, আয়নার ওপর ময়লা জমলে যেমন সেটি অস্বচ্ছ হয়ে যায়, জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করে রাখে ঠিক তেমনি কামাসক্ত বুদ্ধি শুভবুদ্ধিকে ঢেকে রাখে, জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেইজন্য তুলসীদাসজী বলেছেন— 'যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহী।' পাপের যা কিছু প্রবৃত্তি সবই কামনা থেকে আসে। (৩।৩৮)

এই কাম দুষ্পূরণীয় আগুনের মতো। একবার কারও মনে ঢুকলে আগুনেরই মতো সব ছারখার করে দেয়। যাঁরা জ্ঞানলাভেচ্ছু, তাঁদের পরম শত্রু এই কাম। তার আগুন কখনও নেভে না। কামনা মেটাতে সাধকের সর্বস্ব যায়। সেইজন্য এটি জ্ঞানীদের চিরশত্রু। তাঁদের একান্ত কাম্য জ্ঞানপ্রাপ্তির পথে এটি কঠিনতম বাধা। (৩।৩৯)

কিন্তু এটি থাকে কোথায়? জ্ঞানীর পরমশত্রু কামনার অধিষ্ঠানভূমি হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন আর বুদ্ধি। শত্রুর অধিষ্ঠানভূমি অর্থাৎ আশ্রয়স্থল যদি জানা যায়, তাহলে তাকে জয় করা সহজ হয়। তাই ভগবান কামের অধিষ্ঠানভূমির কথা বলছেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হচ্ছে কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা আর নাসিকা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বচন, আদান, গমন, ইত্যাদির কারক হচ্ছে বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। এই দশটি ইন্দ্রিয়কে নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত করে কাম বিবেক জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে। এইভাবে কাম দেহাভিমানী জীবকে বিশেষভাবে মোহিত করে থাকে। (৩।৪০)

সমস্ত পাপের মূল কারণ মহাশত্রু কামকে পরিহার করা প্রয়োজন। তাই ভগবান বলছেন— প্রথমেই ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করো, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশকারী এই শত্রুর বিনাশ সম্ভব হবে। অদ্বৈতবেদান্তে জ্ঞানলাভের অধিকারীকে সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হতে বলা হয়েছে। নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই চারটি সাধনের প্রয়োজন। ষট্সম্পত্তির প্রথম দুটি—শম ও দম হচ্ছে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। ভোগ্যবস্তু থেকে কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধিকে গুটিয়ে এনে স্ববশে রাখতে হবে। কাজেকাজেই প্রথমেই ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে হবে। তা না হলে চরম জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। (৩।৪১)

ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা কিভাবে এগোতে হবে সেই কথা বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন—স্থূল-দেহের চেয়ে ইন্দ্রিয়গুলি শ্রেষ্ঠ, তাদের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কেননা যদিও আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব

করি, তবুও যদি মন তাতে সংযুক্ত না হয়, তাহলে বিষয়জ্ঞান হয় না। অনেক সময় চোখ খোলা থাকলেও বা কান ঠিক থাকলেও দেখতে বা শুনতে না পেয়ে আমরা বলি, অন্যমনস্ক ছিলাম। আবার মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি। কি রকম? না, এটা চাল না ডাল, চিনি না কাঁকর ঠিক করতে সংকল্পবিকল্পাত্মক মন যখন পারছে না, তখন এটা চালই বা চিনিই বলে দেবে যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, সেটি বুদ্ধি। কিন্তু যা আমাদের গন্তব্যস্থল—পরমা গতি, সেখানে বুদ্ধির গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বুদ্ধির পারে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সেই আত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ। (৩।৪২)

সেইজন্য ভগবান অর্জুনকে, তিনি সব কিছু জয় করবার ক্ষমতা রাখেন বলে, 'মহাবীর' বলে সম্বোধন করে বলছেন—পূর্বোক্ত ক্রমে ইন্দ্রিয়াদি দমন করে তিনি স্বরূপতঃ যে বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির কর্তা, এটা জেনে শুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করে, কামরূপ দুর্দম যে শত্রু তাকে যেন নাশ করেন। ইন্দ্রিয় থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত কামের অধিষ্ঠানভূমি। কামভূমিতে থেকে কামজয় অর্থাৎ কামনাজয় সম্ভব নয়। কামনাকে জয় করতে হলে—তার মূলোচ্ছেদ করতে হলে বুদ্ধির অতীত ভূমিতে যেতে হবে অর্থাৎ আত্মাকে জানতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মাকে জানা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কামনার দাস থাকে। (৩।৪৩)

বিবিধ সংবাদ

প্রয়াত দিলীপকুমার

গভীর দুঃখের বিষয়, প্রখ্যাত গায়ক, গীতিকার, সুরকার, কবি, সাহিত্যিক ও সাধক দিলীপকুমার রায় গত ৬ই জানুআরি, ১৯৮০ বোম্বাইতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান, সুকণ্ঠ গায়ক ও গীতিকার কার্তিকেয়চন্দ্র ছিলেন তাঁহার পিতামহ। পিতামহী প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন শ্রীচৈতন্যপার্ষদ অদ্বৈত গোস্বামীর বংশের কন্যা। দিলীপকুমারের পিতৃদেব খ্যাতনামা নাট্যকার ও কবি স্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ছিলেন সুগায়ক। বংশগত ঐতিহ্যের স্বাভাবিক ধারায় দিলীপকুমার অসাধারণ কণ্ঠমাধুর্যের তথা ভক্তিভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

১৯১৮ সালে অঙ্কে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কে অনার্স (Tripos Part I) এবং সঙ্গীতের বিশেষ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। বিলাতে কিছুদিন আইনও পড়িয়াছিলেন। মাঝপথে এ সব ছাড়িয়া দিয়া বার্লিনে যাইয়া জার্মান ও ইতালীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯২০ সালে রমাঁ রল্যাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২২ সালে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি আব্দুল করিম, ফৈয়জ খাঁ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখ ওস্তাদদের নিকট শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যান এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যোগদান করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের দেহান্ত (১৯৫০) পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মিশরে সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু সঙ্গীত, সাহিত্য ও ভক্তিসাধনায় নিরত থাকেন। তাঁহার রচিত

প্রসিদ্ধ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থগুলির সংখ্যা ৫০।

'উদ্বোধন' পত্রিকার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল প্রায় চুয়াল্লিশবর্ষব্যাপী। এই সময়ের মধ্যে 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত তাঁহার রচিত কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও ভাষণের সংখ্যা ৯২। (অধিকন্তু বর্তমান সংখ্যাতেও তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশিত—পৃঃ ৭৮ দ্রষ্টব্য)। এই সকল রচনার অনেকগুলিতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীম-র উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

দিলীপকুমার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম অনুরাগী ছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সান্নিধ্যে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। আজ হইতে ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'তের বৎসর বয়সে প্রথম পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।…প্রথম তিনটি খণ্ড আমি অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশবার পড়েছি, চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বোধ হয় বিশ ত্রিশবার। এখনো প্রায়ই পড়ি। আমার ধর্মজীবনের সূচনা হয় এই মহাগ্রন্থ থেকে।…আমি যেতাম স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে, শ্রীম-র কাছে, স্বামী সারদানন্দের কাছে, শ্রীমা সারদামণির কাছে, শিবানন্দের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। আর একথা আমি প্রমাণ করতে না পারলেও বলবই বলব যে, তাঁদের সে পরম আশীর্বাদ আমাকে নানা দুঃসময়ে বল দিয়েছে। মনঃকষ্টে সান্ত্বনা, শঙ্কায় অভয়, নির্ভরসায় বিশ্বাস।'

বাগ্দেবীর এই বরপুত্রের উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

শ্রীসন্তোষকুমার দত্তের সংযোজন :

দিলীপকুমারকে আমি নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠানে দেখেছি। অবিস্মরণীয় সে সব স্মৃতি! একবার রবীন্দ্র সদনে আচার্য সত্যেন বসুর সংবর্ধনা-সভায় গেছি। আচার্য বসু তাঁর পাশে-বসা দিলীপকুমারকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনারা আমাকে সংবর্ধনা না জানিয়ে যদি ওঁকে জানাতেন, তাহলে তা সার্থক হতো—উনি হচ্ছেন ভারত-সংস্কৃতির চলমান দূত। আপনারা পারেন তো ওঁর কথা আর গান টেপ ক'রে সেটা ডকুমেণ্টারি ফিল্ম ক'রে রাখুন, সেটা দেশের একটা বড় সম্পদ হবে।' জানি না তাঁর সেদিনের কথামতো কাজ কেউ করেছিলেন কিনা। তবে আচার্য বসুর ঐ অল্প কথায় দিলীপকুমারের মহত্ত্বের যে পরিচয় পেলাম, তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

কলকাতায় এলে দিলীপকুমার থাকতেন এলগিন রোডে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীমিলন সেনের বাড়ীতে। একবার জানতে পারলাম তিনি কলকাতায় এসেছেন। সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করার উদ্দেশ্যে। এলগিন রোডের বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, তিনি গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হ'ল—উনিও এসেছেন দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এলেও দিলীপকুমারের সঙ্গে এবেলা দেখা হবে না। অগত্যা নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছোট শয়নঘরটি তাঁকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। ঐ ঘরটিতে ঢুকতে না ঢুকতে তাঁর মনে 'জেগে উঠত ভক্তির জোয়ার'—একথা তিনি বলেছিলেন তাঁর একটি ভাষণে। তাই কলকাতায় এলে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর যাওয়া চাই-ই।

আবার গেলাম সন্ধ্যায়। দেখলাম বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এসেছেন দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা করতে, আর এসেছেন বিখ্যাত বাউল পূর্ণদাস তাঁকে গান শুনাতে। আরও অনেক সুধীসজ্জনবৃন্দের সমাবেশ হয়েছে। আমি উপরে গিয়ে সুপুরুষ, সুদর্শন, শ্বেতশ্মশ্রু,

পীতবসন দিলীপকুমারকে দর্শন ও প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর উপর লেখা তাঁর কিছু গান ও কবিতা টেপ করার ইচ্ছা ছিল। সে ইচ্ছা পূর্ণ না হ'লেও আমি পরিতৃপ্ত মনে ফিরলাম।

একবার কলকাতা বর্ধমান রোডের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে দিলীপকুমার কয়েকটি বক্তৃতা দেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই বক্তৃতা শোনার ও টেপ করার। 'বিবেকানন্দ হল' পূর্ণ। বাহিরের করিডোর লোকে লোকারণ্য। দিলীপকুমার যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি কলকাতায় এলে তাঁর কথা ও গান শুনতে শত শত অনুরাগীর ভিড় হ'ত। তাঁর বই, তাঁর গানের রেকর্ড যখন যা বেরিয়েছে, তা পাঠক ও শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। এমনি ছিল তাঁর প্রতিভা।

এরপর আর একদিন অরবিন্দ ভবনে তাঁর কথা ও গানের আসর বসেছিল। সেদিন লোকসমাগম এত বেশি হয়েছিল যে, নির্ধারিত স্থানের পরিবর্তে নিচে আসর বসাতে হয়েছিল। সঙ্গের সাথী টেপ রেকর্ডারটি নিয়ে আমিও আসরে বসেই ধরে রেখেছিলাম তাঁর কিছু কথা ও গান—অমূল্য সম্পদ আমার! আর একদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে তাঁর গানের আয়োজন হয়েছিল। 'বিবেকানন্দ হলে' তিলধারণের স্থান নেই। শ্রোতা-নিয়ন্ত্রণের জন্যই টিকিটের ব্যবস্থা। নিমেষে সব টিকিট নিঃশেষিত। শ্রোতারা আকণ্ঠ পান করছিলেন তাঁর পরিবেশিত সুরসুধা। উন্মুখ শ্রোতাদের সঙ্গে আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সে সুরলহরী শুনছিলাম। আজও তা কানে লেগে আছে। সে তো ভোলবার নয়।

তাঁর জীবনের আর একটি দিক আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। সেটি হচ্ছে তাঁর 'কথামৃত'-প্রেম। তের বছর বয়সে তিনি কথামৃত, প্রথম ভাগ পড়েন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, "বইটি পড়তে না পড়তে কেন জানি না বুকের মধ্যে যাকে বলে 'অশ্রুসাগর উথল হলে দুলে দুলে ফুলে দুলে'।...গেলাম শ্রীম-র ওখানে। গিয়ে যা দেখলাম আমার 'তীর্থংকর' দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছি, 'Among the Great' বইটিতেও আছে। কাজেই সেসবের পুনরুক্তি করব না। শ্রীম আমার মুখে যেই শুনলেন যে, আমি তাঁর কাছে এসেছি ঠাকুরের কথা শুনতে—সেই তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন: 'ওরে প্রভাস! আয় আয়—দেখে যা একটি ছোট ছেলে এসেছে আমার কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে রে, ঠাকুরের কথা শুনতে!' বলেই আমার দিকে চেয়ে: 'দেখ বাবা! দেখ—আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে।' আমি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই রোমহর্ষণ যাকে বলে। মনে হ'ল গুরুভক্তি বটে।

"সেই থেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে করতাম রোজ ধ্যান, ডাকতাম তাঁকে 'ঠাকুর! তোমার উপদেশ মেনে যেন চলতে পারি—সব ছেড়ে যেন ভগবানকে চাইতে পারি।' ...তার 'কথামৃত' হয়ে রইল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বেদ বা গীতা। কতবার যে পড়েছি এ অপূর্ব বইটি—সারা জগতে যার জুড়ি নেই। আর পড়তে না পড়তে হৃদয় হয়েছে উধর্বমুখী। এখনো প্রায় রোজই কয়েকপাতা পড়ি এই বইটি থেকে।"

জন্মজয়ন্তী

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক গত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০, উক্ত [illegible] ভবনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জীবন ও বাণীর মাধ্যমে [illegible] তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করিতে থাকিবেন। তাঁহার সর্বজীবে প্রেমের উৎস [illegible]। [illegible] ধরে [illegible] প্রেরণা [illegible] এবং ইহাই [illegible] সমাজে [illegible] আছে। প্রধান আচার্য [illegible] ভাষণে স্বামী [illegible]নন্দজী বলেন, [illegible] বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্মই ভারতবাসীর মেরুদণ্ড—ধর্মই আধ্যাত্মিকতা [illegible] দেয়। সর্বস্তরে—এমনকি [illegible], ধর্ম আমাদের মানুষ হইতে সাহায্য করে। অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন তাঁহার ভাষণে স্বামীজীর জীবনের অন্যান্য দিকের উল্লেখ করেন। স্বাগত ভাষণে সোসাইটীর সম্পাদক শ্রীশশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সোসাইটীর ৭৮ বৎসরের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মধারার পরিচিতি দেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : পুরা সেট ১৩৫৲ টাকা
বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড— ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র

দ্বিতীয় খণ্ড— জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত

তৃতীয় খণ্ড— ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান

চতুর্থ খণ্ড— ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে

পঞ্চম খণ্ড— ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ

ষষ্ঠ খণ্ড— ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী

সপ্তম খণ্ড— পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)

অষ্টম খণ্ড— পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ

নবম খণ্ড— স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন

দশম খণ্ড— আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	মূল্য
কর্মযোগ—	পৃঃ ১৪১,	মূল্য ৩·৫০
ভক্তিযোগ—	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ২·৮০
ভক্তি-রহস্য—	পৃঃ ৯৮,	মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ—	পৃঃ ২৯০,	মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ—	পৃঃ ২১৪,	মূল্য ৫·৬০
সন্ন্যাসীর গীতি—	পৃঃ ২৩,	মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—	পৃঃ ২৯,	মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ—	পৃঃ ৩৬,	মূল্য ১·২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ—	পৃঃ ৪০২,	মূল্য ১০·০০
শেষার্ধ—	পৃঃ ৪২৪,	মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)—		মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী—	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ২·৪০
পওহারী বাবা—	পৃঃ ১৮,	মূল্য ০·৫০
স্বামীজীর আহ্বান—	পৃঃ ৮০,	মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা—	পৃঃ ১৩০,	মূল্য ২·৫০
বেদান্তের আলোকে—	পৃঃ ৮৫,	মূল্য ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ—	পৃঃ ৪২৪,	মূল্য ১০·০০
দেববাণী—	পৃঃ ১৬০,	মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ২৩৮,	মূল্য ৪·০০
কথোপকথন—	পৃঃ ১৩৫,	মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব—	পৃঃ ৬২,	মূল্য ১·৯০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—	পৃঃ ১৪৩,	মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা—	পৃঃ ৫২,	মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ১৩৪,	মূল্য ৬·০০

(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)

গ্রন্থ	পৃষ্ঠা	মূল্য
পরিব্রাজক—	পৃঃ ১৩২,	মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—	পৃঃ ১৩৬,	মূল্য ২·২৫
ভাববার কথা—	পৃঃ ৬৪,	মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন—	পৃঃ ৩১৬,	মূল্য ৭·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৩'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ১৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০ ; ২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ২'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫ মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ০'৮০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২'০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'৮০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫'০০

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২১, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

সংস্কৃত

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪১৫, মূল্য ৭'৮০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায় (চারখণ্ডে) ১৭'০০, ৩য় অধ্যায় ১৩'০০ : ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ১'৮০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি— পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'০০, বোর্ড বাঁধাই ৩'৫০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

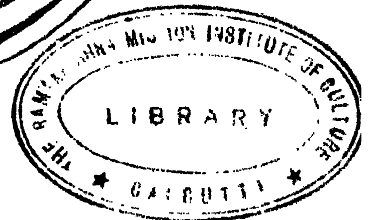
Udbodhan—Phone : 55-2447 FEBRUARY 1980 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

চৈত্র ১৩৮৬

৮২তম বর্ষ

৩য় সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা:—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

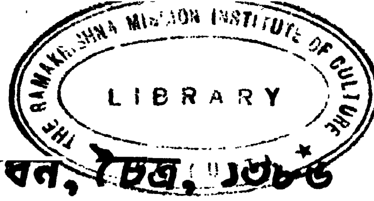
বিশেষ দ্রষ্টব্য:—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে
প্রচার হোক
এই বাণী। শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৮৬

সূচীপত্র



৮২তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৮৬

দিব্য বাণী

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়; দিবারাত্র বলো, 'তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই না। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।' ধন চলে যায়, সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়, জীবন দ্রুতগতিতে চলে যায়, শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন, প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই—তুমি যে জড় নও তার একমাত্র প্রমাণ।

ঈশ্বরে লেগে থাকো—দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে, কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে, তখন বলো, 'হে আমার ভগবান্, হে আমার প্রিয়'; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হ'তে থাকে, তখনও বলো, 'হে আমার ভগবান্, হে আমার প্রিয়'; জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আসতে পারে তা এলেও বলো, হে ভগবান্, হে আমার প্রিয়, তুমি এখানেই রয়েছ, তোমাকে আমি দেখছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব করছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও, প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না।' হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মহা সুযোগ—তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা ক'রে সংসারের সুখ খুঁজতে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হ'লে নিশ্চয়ই সেই পরম বস্তু লাভ করবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

['স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী', ৪র্থ সং, পৃঃ [illegible]]

কথাপ্রসঙ্গে

পঞ্চম পুরুষার্থ

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। মানুষের সংস্কার অনুসারে এইগুলির কোন একটি অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু শাস্ত্রকারগণ মোক্ষকেই পরম ও চরম পুরুষার্থরূপে নির্ণীত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অর্থ ও কামও নিন্দনীয় নহে, যদি উহারা ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ'—'হে অর্জুন, জীবগণের মধ্যে যে কামনা ধর্মের অবিরোধী, সে কামনা আমিই।' ইহা গীতার সপ্তম অধ্যায়ের কথা; দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্বীয় বিভূতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এখানেও সেই একই ভাষা। সুতরাং এখানেও ভগবদ্বিভূতিই দর্শনীয়। অর্থাৎ যখন আমরা কোন মানুষকে তাহার ভোগাকাঙ্ক্ষা শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থায় চরিতার্থ করিতে দেখি, তখন সেখানেও ভগবানেরই বিভূতি দেখিতে হইবে—ইহাই গীতার নির্দেশ। এইভাবে গীতা দুর্বলতম অধিকারীকেও, অবজ্ঞা করা দূরে থাকুক, প্রশংসাই করিতেছেন—উৎসাহই দিতেছেন, যাহাতে সে ধীরে ধীরে উত্তরোত্তর উন্নত জীবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া পরিশেষে চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গীতার মতে চরম লক্ষ্য—পরম পুরুষার্থ—কী? গীতা বলিতেছেন:

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
(১৮।৫৪)

—ব্রহ্মভূত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিছুতে শোক করেন না, কোন কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না; সর্বভূতে সমদর্শী সেই ব্যক্তি শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন।

যিনি ব্রহ্মভূত, যাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, শোক নাই, ভেদদৃষ্টি নাই, যিনি সদাসন্তুষ্ট, তিনি অবশ্যই মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তি যখন পরাভক্তি লাভ করেন, তখন বুঝিতে হইবে পরাভক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য—ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগামীদের সিদ্ধান্ত।

গীতাতে এই ধরনের আরও শ্লোক আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে:

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥
(১।৭।১০)

অর্থাৎ আত্মারাম মুক্ত মুনিগণও শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করেন—শ্রীহরি এই রূপই গুণসম্পন্ন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটি ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পুরীতে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এই শ্লোকটির নয় প্রকার[১] ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, উহার অধিক অর্থ স্বয়ং বৃহস্পতিও করিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের ঐ নয় প্রকার অর্থ একেবারে বাদ দিয়া ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক আঠারো প্রকার নূতন অর্থ করেন। ইহাতে অতীব বিস্মিত হইয়া বাসুদেব সার্বভৌম সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করেন।

১ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে নয় প্রকার। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত অনুসারে ত্রয়োদশ প্রকার।

তখন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রথমে চতুর্ভুজরূপে ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন দেন।

পরবর্তী কালে কাশীতে সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকৃত ঐ আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ইহাতে—

'প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলপিতাম তারে নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে॥'

এই বলিয়া কথাচ্ছলেই শ্লোকটির একষট্টি প্রকার অর্থ করেন। পরেও কাশীতেই একটি সভায় সকলের আগ্রহে ঐ একষট্টি প্রকার অর্থ পুনরায় বিবৃত করেন।

উল্লেখ্য যে, বাসুদেব সার্বভৌম পুরীতে যখন শ্লোকটির শ্রীচৈতন্যদেবকৃত আঠারো প্রকার অর্থ শোনেন, তখন তাঁহার দৃঢ় ধারণা হয় যে, মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি গরীয়সী; শুধু তাহাই নহে, তিনি মুক্তিকে ভয় ও ঘৃণা করিতে থাকেন। একদিন তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন। ঐ স্তবের একটি শ্লোকের শেষ দুইটি চরণে আছে:

'হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্‌ নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্‌॥'
(১০।১৪।৮)

অর্থাৎ [ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—] যিনি কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে জীবনধারণ করেন, তিনি 'মুক্তিপদে' দায়ভাগী ('মুক্তিপদ'রূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী) হন।

বাসুদেব সার্বভৌম 'মুক্তিপদে'র স্থলে 'ভক্তিপদে' পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যদেব প্রশ্ন করেন, "মূল গ্রন্থে 'মুক্তিপদে' পাঠ আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' পাঠ করিতেছ কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?" উত্তরে বাসুদেব বলেন, 'ভক্তির ফল মুক্তি নহে, মুক্তি হইতেছে ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তির দণ্ড।' প্রত্যুত্তরে শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, "'মুক্তিপদ' শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বর'ও হয়।[২] সুতরাং মূল পাঠের পরিবর্তন নিষ্প্রয়োজন।" কিন্তু কে শুনে কাহার কথা! বাসুদেব বলেন:

'মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥'

বাসুদেবের কথায় শ্রীচৈতন্যদেব স্মিতহাস্যে সানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন।

মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি যে শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত। প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইতেছে

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
(৬।১৭।২৮)

—নারায়ণপরায়ণ সকলেই স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে সমান প্রয়োজন দর্শন করেন বলিয়া অকুতোভয় হন।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।[৩]
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(৩।২৯।১৩)

২ শ্রীচৈতন্যদেব দুই প্রকারে 'ঈশ্বর' অর্থটি সিদ্ধ করেন—(১) মুক্তি পদে যাঁহার—(বহুব্রীহি সমাস); (২) মুক্তির পদ (আশ্রয়)—(ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস)। শ্রীমদ্ভাগবতে দশটি পদার্থের কথা বলা হইয়াছে (২।১০।১)। উহাদের মধ্যে নবম পদার্থ 'মুক্তি' এবং দশম পদার্থ 'আশ্রয়'। 'আশ্রয়'-এর অর্থ 'ঈশ্বর'—'স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে' (ভাগবত, ২।১০।৭)। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন, 'মুক্তি পদে যার সেই মুক্তিপদ হয়। নবম পদার্থ মুক্তির কিংবা সমাশ্রয়॥' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২।৬)

৩ সালোক্য=সমানলোকে (বৈকুণ্ঠাদিতে) বাস। সার্ষ্টি=সমান ঐশ্বর্য। সারূপ্য=

—সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও ভক্তগণ উহা গ্রহণ করেন না—আমার (ঈশ্বরের) সেবা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই চান না।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥
(৯।৪।৬৭)

—আমার সেবায় যাঁহারা পূর্ণকাম, সেই ভক্তগণ আমারই সেবার ফলে সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সার্ষ্টি, এই মুক্তি-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা কামনা করেন না ; সুতরাং কালে যাহার নাশ হয়, সেই অনিত্য [স্বর্গাদি] বিষয় তাঁহারা কিরূপে কামনা করিতে পারেন !

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
(১।১৮।১৩)

—[ঋষিগণ সূতকে বলিতেছেন—] ভগবদ্‌-ভক্তগণের সঙ্গের কণিকামাত্রের সহিতও আমরা স্বর্গ বা অপবর্গের তুলনা করি না, মর্ত্যজনের প্রার্থিত রাজ্যাদিলাভের আশীর্বাদ তো অতি তুচ্ছ !

শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই আছে—'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র' অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতা-বর্জিত ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, 'প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' অর্থাৎ 'উজ্ঝিতকৈতবঃ'-এর পূর্বে 'প্র' উপসর্গ ব্যবহৃত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, মুক্তির অভিসন্ধিও নিরাকৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকসমূহের ভিত্তিতে শ্রীচৈতন্যদেব ভগবৎপ্রেমকে চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিতেন এবং 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বলিয়া প্রচার করিতেন, ইহা আমরা তাঁহার জীবনীতে বারংবার লক্ষ্য করি। অবশ্য 'পঞ্চম পুরুষার্থ' কথাটি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার গুরুর নিকটই শ্রবণ করেন। কাশীতে 'সর্বসন্ন্যাসিপ্রধান' প্রকাশানন্দ যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, সন্ন্যাসী হইয়া তিনি কি কারণে বেদান্ত-পাঠ না করিয়া ভাবুকদের লইয়া নৃত্যগীত করেন, তখন শ্রীচৈতন্যদেব উত্তর দেন :

'গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা—এই মন্ত্র সার॥'

শ্রীগুরুর আজ্ঞানুসারে অনুক্ষণ কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যদেব ভাবোন্মত্ত হইলেন এবং অবশ হইয়া হাস্য, রোদন, নৃত্য, গীত ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। গুরুদেবকে নিজ অবস্থা নিবেদন করিলে, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে বলিলেন :

'কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥

সমানরূপত্ব। সামীপ্য=সমীপে অবস্থিতি। একত্ব=সাযুজ্য। 'সাযুজ্য' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আচার্য শংকর লিখিয়াছেন, সাযুজ্যের অর্থ একাত্মত্ব—'সাযুজ্যং সযুগ্‌ভাবম্ একাত্মত্বম্' (বৃহ. উ. ১।৫।২৩, ভাষ্য)। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলেন, সাযুজ্য দুই প্রকার—(১) ব্রহ্মসাযুজ্য (২) ঈশ্বরসাযুজ্য ; ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষা ঈশ্বরসাযুজ্য অধিকতর হেয়। কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মসাযুজ্যই জীবের পরম ও চরম পুরুষার্থ। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মতও অনুরূপ। স্পষ্টই বুঝা যায়, নিম্বার্ক ও রামানুজ যে অর্থে 'সাযুজ্য' শব্দটি ব্যবহার করিতেছেন, কবিরাজ গোস্বামী সে অর্থে উহা ব্যবহার করিতেছেন না। নিম্বার্ক ও রামানুজের মতে সাযুজ্যের অর্থ সাধর্ম্য, কবিরাজ গোস্বামীর মতে একাত্মত্ব বা লয়। বিষয়টির সম্পূর্ণ স্পষ্টীকরণ করিতে হইলে অনেক কথার অবতারণা করিতে হয়—পাদটীকায় তাহার স্থান নাই।

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥'

ইহার পর শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশানন্দকে শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, প্রেমই পরম ও চরম পুরুষার্থ—উহাই 'মূল প্রয়োজন':

'সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন
'এবে শুন প্রেমে যেই মূল প্রয়োজন
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ॥

কাশীতেই শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে বলেন:

'সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজনবিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন॥'
'পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥'
'চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ॥'

ইহার পূর্বে প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে তিনি একই কথা বলিয়াছিলেন:

'এই ত পরমফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥'

আরও পূর্বে যখন শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন করিতেছিলেন, তখন উড়ুপীতে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের জনৈক 'তত্ত্ববাদী'কে তিনি বলেন:

'কর্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন॥'
'শ্রবণ কীর্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ পুরুষার্থসীমা॥'
'পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥'

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত এই সকল পয়ার হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 'পঞ্চম পুরুষার্থ', এই নূতন কথাটি শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, যদিও কথাটির তাৎপর্য শ্রীমদ্‌ভাগবতেই নিহিত। চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তিকেই এদেশের মানুষ এতকাল জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া জানিত এবং উহার জন্য ব্যগ্র হইত, কিন্তু মুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের অধিকাংশেরই কোনও সুনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না এবং আজও নাই। কোন সন্দেহ নাই, ভারতীয় দর্শনে মুক্তি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। যে বিষয় সম্পর্কে এত প্রবল মতভেদ, তাহার জন্য লালায়িত হওয়া অপেক্ষা যে বিষয়ে মতভেদ নাই,[৪] সেই ভগবৎপ্রেমকে চরম লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করিলে মানুষের যথার্থ কল্যাণই হইবে—মনে হয়—'পঞ্চম পুরুষার্থ' প্রচারের মূলে শ্রীচৈতন্যদেবের এই অভিপ্রায়ই ছিল। অজানা মুক্তির জন্য অস্থির না হইয়া শান্তচিত্তে ভগবদ্‌ভজন করাই শ্রেয়ঃ—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। এই কথাই তিনি প্রয়াগে রূপ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন:

'কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত॥'

মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক কথা

---

৪ 'তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ'—এই সূত্র দিয়া উপোদ্‌ঘাত করিয়া নারদ পূজাদিতে অনুরাগ, ভগবৎকথাদিতে অনুরাগ, আত্মরতি, সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ ও ঈশ্বরবিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা—ভক্তির এই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ইত্যাদি 'নবলক্ষণা' ভক্তির উল্লেখ আছে। লক্ষণগুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যাহার লক্ষণ, সেই ভক্তির স্বরূপে কিন্তু ভেদ নাই। সম্প্রদায়বিশেষে বৈধীভক্তির প্রকারভেদ থাকিলেও রাগানুগা ভক্তির স্বরূপে কোনও ভেদ নাই—দাস্য, বাৎসল্যাদির ভেদ, ভাবেরই ভেদ মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন ভাবে বিভোর হইয়া তিনি তাঁহার সহজাত সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেন :

'আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই।'

শ্যামপুকুরে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'আমি মুক্তি চাই না; ভক্তি চাই।'

জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানীরা মুক্তি চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,—অহৈতুকী ভক্তি।'

অপর একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'অহৈতুকী ভক্তি—তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়। মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না,—কেবল তোমায় চাই! এর নাম অহৈতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে দেখতে আসে, তাহলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।'

শিষ্য হরিনাথকে (পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, "যারা নির্বাণ চায়, তারা হীনবুদ্ধি। কেবল ভয়ে ভয়ে সারা। যেমন দশ পঁচিশ খেলায় কেবলই চিক খুঁজছে, কিসে ঘরে উঠে যায় সেই চেষ্টা।…যারা নির্বাণ চায়, খেলা ভেঙে দিতে চায়, মা তাদের ওপর খুশী নন। মা খেলতে ভালবাসেন তাই ভক্তেরা নির্বাণ চায় না। তারা বলে—'চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি।'"

স্বামী তুরীয়ানন্দ তাঁহার একটি পত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লিখিত কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য…' শ্লোকটিও (পূর্বে ব্যাখ্যাত) তিনি তাঁহার পত্রাবলীতে একাধিকবার উদ্ধৃত করিয়া প্রেমভক্তির মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যে চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তিই যখন জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত, তখন অকস্মাৎ 'প্রেম'কে 'পঞ্চম পুরুষার্থ' কেন বলা হইল এবং এ বিষয়ে সামঞ্জস্য কী? 'কেন বলা হইল?'—ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সামঞ্জস্যটি আমরা অদ্বৈতবেদান্তের দিক হইতে দেখাইয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করিব। শংকরাচার্য তাঁহার ভাষ্যে অসংখ্যবার বলিয়াছেন যে, মুক্তি কোন কর্মের দ্বারা সাধ্য নহে; কারণ কর্মের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা অনিত্য; মুক্তি অনিত্য হইলে তাহার কোন মূল্যই থাকে না; মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু; অবিদ্যা দূর হইলে মুক্তি স্বতঃ প্রকাশিত হয়। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তে বলা হয়, 'অবিদ্যা-অস্তময়ই মোক্ষ'; বলা হয়, 'অবিদ্যানিবৃত্তি-উপলক্ষিত ব্রহ্মই মুক্তি।' মুক্তি আর ব্রহ্ম বা আত্মায় কোন পার্থক্য নাই; নিত্যসিদ্ধ বস্তু একটিই হয়—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সুতরাং মুক্তি যদি নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মুক্তি আত্মাই, ব্রহ্মই। আর ব্রহ্ম বা আত্মা তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ।'

একদিকে শংকরাচার্যপ্রমুখ অদ্বৈতবাদীদের এই কথা অন্যদিকে দেখি, শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেছেন :

'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥'

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ[৫] বস্তু, উহা কোন কর্মের দ্বারা,

৫ যেখানে 'প্রেম' 'সাধ্য' বলিয়া উল্লেখিত দেখা যায়, সেখানে 'সাধ্য' শব্দটির প্রয়োগ

কোন সাধনার দ্বারা লভ্য নহে। শ্রবণ, কীর্তনাদির ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে উহা স্বতঃই প্রকাশিত হয়।[৬]

অদ্বৈতবাদীরা বলেন, শম-দমাদি সাধনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রবণাদিসহায়ে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম তো সর্বদাই প্রকাশিত রহিয়াছেন! অবিদ্যার আবরণ থাকায় তাঁহার প্রকাশ দেখা যায় না মাত্র, যেমন মেঘ থাকিলে সূর্যকে দেখা যায় না—সূর্য নাই, এমন নহে।

সুতরাং অদ্বৈতবাদীদের প্রেমস্বরূপ মুক্তিও যাহা, শ্রীচৈতন্যদেব কথিত কৃষ্ণপ্রেমও তাহাই। কিন্তু এই সকল দার্শনিক বিচার সর্বসাধারণের জন্য নহে। এইজন্যই 'প্রেম'-এর পঞ্চম পুরুষার্থ' নামকরণ ও প্রচার। চতুর্থ পুরুষার্থ ও পঞ্চম পুরুষার্থ একই—অন্ততঃ অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে।

ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণার্থে—মুখ্যার্থে নহে, বুঝিতে হইবে। বৈধী ভক্তিই সাধ্য, পরাভক্তি বা প্রেম নিত্যসিদ্ধ।

৬ স্বামী বিবেকানন্দও বলিতেন, 'প্রেমভক্তি সকলেরই ভিতর আছে, কামকাঞ্চনের আবরণ দূর করলেই প্রকাশিত হয়।'

অখণ্ডানন্দজীর কথা

স্বামী অন্নদানন্দ

[মাঘ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

১৬ই এপ্রিল ১৯৩০ ; ৩রা বৈশাখ ১৩৩৭, বুধবার।

ভগবানগোলা হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যায় বাবাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন,—"দেখ, সোনা রাত্রে কাশে, আর আমার যে কি কষ্ট হয় কি করে বুঝাব? আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করে ওঠে। দুপুরবেলা (আশ্রমের গোয়ালে) গরুগুলো বাঁ বাঁ করে উঠলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ি। আমার মত feeling তোমাদের কারো হবে না, তা না হলে কি প্রভু আমাকে দিয়ে এই কাজ করাতেন।

"১৩।১৪ বছর বয়সের সময় ঠাকুরের কাছে নেংটা হয়েছি, লজ্জা করেনি। ঐ বয়সে মেয়েদের কাছেও গেছি, এমন বোধ হয়নি যে, আমি পুরুষ, ওরা স্ত্রীলোক।"

তারপর কর্মপ্রসঙ্গে বলিলেন, "কর্মযোগ অতি কঠিন, নিঃস্বার্থ কর্ম কি চারটিখানি কথা?" আশ্রমের ভূতপূর্ব কর্মী কার্তিক বাবু ও গঙ্গা-চৈতন্যের কথা পাড়িয়া বলিলেন,—"যারা নিঃস্বার্থ কর্ম করে তারা বসে থাকতে পারে না। যারা গা আড়াল দিয়ে থাকতে চায় তাদের কিছু হয় না। লোক ঠকিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কি হবে!

"ঠাকুর এসে ধর্মের বন্যা বইয়ে গেছেন। বন্যায় বাহাদুরি কাঠও ভেসে আসে, জঙ্গলও ভেসে আসে। সবই কি বাহাদুরি কাঠ—ভেসে আসবে?"

১৭ই এপ্রিল ১৯৩০ ; ৪ঠা বৈশাখ ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার।

বাবা বলিলেন, "যতই উৎসব আসছে, ততই আমার ভেতরটা কি রকম করে উঠছে। দিন দিন শরীর অথর্ব হয়ে পড়ছে। গত বৎসর আমি যা ছিলাম, এ বৎসর আমি তা নেই। ঠাকুরের যা ইচ্ছা তাই হবে। প্রভু আমার সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। আমি এক গুণ চেয়েছি, তিনি

বিশ গুণ দিয়েছেন। ৩ মাস relief করতে চেয়েছিলাম, আজ ৩৩ বছর ধরে গলা টিপে—প্রভু আমাকে এই কাজ করাচ্ছেন। তিনি যদি আমাকে এই কাজ না করাতেন—তা হলে আজ এই revolution হত না।"

তারপর ভাণ্ডারঘর গোছানোর নির্দেশ ও উপদেশ প্রসঙ্গে বাবা বলিলেন,—"আমি একজন পাকা গিন্নি, father and mother combined (একাধারে পিতা ও মাতা)।

"আমরা তাঁকে ছুঁয়ে সোনা হয়ে গেছি। আমাদের চেয়ে তোমাদের আপনার আর কে আছে? শুধু পেটে ধরলেই কি মা হয়? বাপ মাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম; আমাদের এত feelings (অসহায় মানুষের জন্য তীব্র অনুভূতি) এল কোথা থেকে?

"আমাকে দেখেই তোমরা এসেছ। আর আমার কাছ থেকে গা আড়াল দিয়ে, থাকতে চাও যেখানে ফষ্টি-নষ্টি হচ্ছে সেখানে। আমার কাছে বসবে। আমার আর কতদিন!" জনৈক সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমার সেবা তোমার সকল কাজের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় মনে করবে,—নচেৎ বিসমিল্লায় গলদ।"

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০; ৬ই বৈশাখ ১৩৩৭, শনিবার।

বৈকালে উপস্থিত দুই জন ব্রহ্মচারীকে বাবা বলিতেছিলেন,—"দেখ দুপুরবেলা চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। কে যেন বারে বারে আমাকে খুঁচিয়ে তুলে দিলে। ঠাকুরের কাজ,—শরীর অথর্ব হলেও কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? আমরা সে তন্ত্রের লোক নই, work is worship, even unto death। আমাদের এই ideal। কর্মযোগ বড় শক্ত! আমাদের কাছে থেকেও যদি না শেখ ত কবে শিখবে? আমরা আর ক দিন! Ideal দেখে নাও! তোমরা ব্রহ্মচারী, কর্মঠ সহিষ্ণু হতে হবে।

"আমরা সাক্ষাৎ ঠাকুরের সন্তান। তাঁকে দেখেছি—স্পর্শ করেছি—তাঁর প্রসাদ খেয়েছি। তোমাদের ঘুমটা আমাকে দাও—তার বিনিময়ে তাঁর কাছে যা পেয়েছি দিচ্ছি।"

সন্ধ্যার পর তাঁকে প্রণাম করিলে বাবা কাছে বসিতে বলিয়া বলিলেন,—"আজ দুপুরবেলা আমার মনে এই হচ্ছিল যে, দেহরক্ষা করি,—না হলে কোন নিরিবিলি জায়গায় চলে যাই। এই সব সবুজ তরুণের দল আমাদের বুঝতে পারবে না। আমাদের কথা বোঝা শক্ত। নির্জনে এই সব চিন্তা করবে; ঝট্ করে উত্তর দিও না। অনেক ভেবে চিন্তে আমরা কিছু বলে থাকি। তোমাদের কোন মতে বোঝাতে পারলাম না।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগ, ত্যাগ তপস্যা ভালবাসার লক্ষাংশের একাংশও আমাদের কারো নেই। তিনি ভগবান, তাঁর কথা আলাদা তিনি মোটামুটি যেসব কথা বলতেন তাও এত করে বলার পর তোমরা পালন করতে চাও না; তিনি বলতেন,—'দাঁড়িয়ে জল খাবে না, গালে হাত দিয়ে বসবে না, হাত পা নাড়াবে না, দিনের বেলা ঘুমুবে না। ভোর ভোর উঠে গুরুমূর্তি স্মরণ মনন করবে।'

"তোমরা কথায় কথায় temper lose করে ফেল। কি আর বলব? শরীর ছাড়বার আগে আরো কত শুনবো। তোমরা আমায় ভালবাস। মনে করি সব overlook করব, কিন্তু তোমাদের ভালবাসি বলেই, না বলে থাকতে পারি না। কেষ্টা, সনন্দকে কেন এত ভালবাসি? এরা বালক। পাপ-পুণ্যের কোন ধার ধারে না—নেংটা বেলায় ভগবানের দরবারে—এদের সাত খুন মাপ। ১২ বছর পর্যন্ত এদের কোন পাপ নেই। তা বলে তুমি যদি একটি ফড়িং মারো, তা হলে তোমার

দোষ হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি হয়েছে। তোমার বেলায় আলাদা বিচার।

"এরা আমাকে কত ভালবাসে, সেবা করে, তোমরাও প্রভুর কাজ, ভগবানের কাজ দিল দিয়ে করবে।"

২০শে এপ্রিল ১৯৩০ ; ৭ই বৈশাখ ১৩৩৭, রবিবার।

সান্ধ্যভজনান্তে বাবাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। উৎসবের আয়োজন সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল। বাবা জনৈক ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—"মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে স্বভাব ছেড়ে দাও। প্রভুর কাজে অগ্রসর হও। মাথা ধরে ছিল, গরমে ছট্‌ফট্‌ করেছি, তা বলে কি বসে থাকতে পারি! আমাদের principle হচ্ছে work even unto death—তবেই না work is worship। প্রভুর কাজ—হাতে কাজ করছি—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মরণ মনন করাও চলেছে—এমন করতে করতে মরলেও সে সুখের মরণ। জীবনের অর্ধেকটা তো এখানেই কাটিয়ে দিলাম।"

নানান কথার পর তাঁর বই পড়ার কথায় বলিলেন,—"উদয়পুরে রাজার লাইব্রেরীতে ও নাথদ্বারে শালগ্রাম ব্যাসজীর লাইব্রেরীতে কত বই পড়েছি—Sir Alexander Cunningham-এর Historical works, Theodore Parker-এর works, Buddhistic literature যা পেয়েছি প্রায় সব, তাছাড়া Megasthenes, Fa-hien, Hiuen-Tsang ইত্যাদির সম্বন্ধে এবং Sir Monier Monier-Williams-এর গ্রন্থাবলী ও আরও অনেক গ্রন্থ পড়ি।"

এই সব বলিয়া বলিলেন,—"শিখতে ইচ্ছা করলে কতদিন লাগে?

"জয়পুরে ১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন,—'ভাই, তোমাকে সেই তিব্বত-ফেরৎ বরফানী বাবারূপে দেখেছিলাম—ভগবানের স্মরণ মনন ও কঠোর তপস্যার প্রতিমূর্তি। আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার কি পরিবর্তন হয়েছে! এখন তুমি একজন patriot, statesman, philanthropist, কি অদ্ভুত পরিবর্তন না হয়েছে!' আমি বললাম,—'তিব্বতে থাকার সময় বাংলাভাষা এক প্রকার ভুলে গেছলাম। বাংলা বলতে দু-এক মিনিট ভেবে নিতে হত। স্বামীজী 'নর' শব্দের রূপ করতে বলেন। ভুল হয়েছিল। তারপর কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি পড়েছি। সমস্ত অমরকোষ মুখস্থ করেছি। এটাওয়ায় মহাভারত পড়ি। ইন্দোরে একাসনে বসে একুশ দিনে সমগ্র রামায়ণ গান করে পড়ি।' "

১৩ই মে ১৯৩০ ; ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৭।

এইদিন বাবা চোবেজী প্রসঙ্গে আরও বলিলেন,—"আমি মুসাহারদের বসন্তরোগাক্রান্ত একটি অনাথ ছেলেকে এনে যখন সেবা করতে লাগলাম, তখন চোবেজী বলছে—'স্বামীজী এ কি আপনার শোভা পায়?' আমি তখন রাস্তার নোংরা ছেলে দেখতে পেলে তাকে ধরে এনে, তেল মাখিয়ে, গরম জল [আর] সাবান দিয়ে স্নান করাতাম আর 'সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ…' এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতাম। সচ্চিদানন্দ স্বামী তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ও 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় ঐ সম্বন্ধে article (প্রবন্ধ) লিখেছিলেন। কিছুদিনের পর চোবেজী দুহাত দিয়ে এই সব ছেলেদের বমি পরিষ্কার করেছিল।

"স্বামী ত্রিগুণাতীত যখন এখানে ছিলেন সেই সময়ে চোবেজীকে সন্ধ্যা গায়ত্রী শিখাবার জন্য বই কিনে দিয়েছিলেন। দু' একদিন পড়েছিল; তারপর [আমাকে] বললে, 'দেখুন স্বামীজী! আপনি, ত্রিগুণাতীত স্বামী,—সকলেই পণ্ডিত।

সবাই পণ্ডিত হ'লে শোভা পাবে না। আমি একটা মুখ্যু রয়ে যাই।' স্বামী ত্রিগুণাতীত এই কথা শুনে ভারি মুগ্ধ হয়েছিলেন ও আমায় বলেছিলেন, 'চোবেজী তোর একটা acquisition, তোর প্রভাবে তার কি পরিবর্তনটাই না হয়ে গেল! ও মহাপুরুষ! কি হৃদয়! দশজন B.A. M.A. পাশ কর্মীর চেয়েও ঢের বেশী!'

"পল ডয়সন (Paul Deussen), জার্মানীর একজন বিখ্যাত বৈদান্তিক, একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমি বেদান্তের পক্ষপাতী এই জন্যে যে—বাইবেল বলে, 'Love thy neighbour', আর বেদান্ত বলে, 'Love thy self'—

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥' "

* * *

স্বামীজীর দেহরক্ষার পর খোকা মহারাজ তাঁর কয়েকটি পশুপক্ষী বাবাকে দিয়েছিলেন। একটি বেড়াল স্বামীজীর পায়রাটিকে লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। অমূল্য মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ) সেই সময়ে আশ্রমে ছিলেন। তিনি বেড়ালটাকে এমন ঘুষি মেরেছিলেন যে, তাঁর হাত থেঁতলে গিয়েছিল। বাবা তাঁকে কর্ণের সঙ্গে তুলনা করেন।

[ক্রমশঃ]

শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

সমবেত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলী!

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথির পূর্বলগ্নের এই অনুষ্ঠানের[১] দ্বারা আমরা সকলে তাঁর জন্মজয়ন্তীর অধিবাসকৃত্য সম্পন্ন করলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর সদাসর্বদা বর্ষিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও সেই অহৈতুকী করুণা বর্ষিত হতে থাকবে অজস্র ধারায়।

দেশ-বিদেশে ধর্ম সম্পর্কে নানা মতবাদ, নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায় রয়েছে। তাদের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়সূত্র আবিষ্কৃত দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। আমরা আজ বুঝতে না পারলেও একথা সম্পূর্ণভাবে সত্য—যেকথা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'সোনার বাংলায় এমন সোনার চাঁদ, গোরা-চাঁদের পর—আর উদয় হয় নাই।' আমার এ-প্রসঙ্গে আরও একটু বলতে ইচ্ছে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের যে-আবির্ভাব, সেটি পৃথিবীতে অভূতপূর্ব, সেটি তুলনাবিহীন। একথা আমি তাঁর দাসানুদাস হিসাবে তাঁর প্রতি ভক্তিবশতঃ যে বলছি তা নয়। একথা হচ্ছে অধুনা লোকান্তরিত, বিখ্যাত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবীর কথা। তিনি বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে একটি নবীন ভাব। তিনি unique শব্দটি এখানে ব্যবহার করেছেন। কেননা ধর্মজগতের অন্য কোন অবতার-পুরুষ বা আচার্য নিজের জীবনে বিশ্বের প্রচলিত প্রায় সমস্ত ধর্মমতকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা গ্রহণ করেননি এবং সেগুলিও যে ভগবানলাভের উপায় হিসাবে সমানভাবে সত্য, সেটি বলেননি।

১ ১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ১৭ই ফেব্রুআরি প্রাতে আবাল-বৃদ্ধবনিতার একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) হইতে বাহির হইয়া দেশবন্ধু পার্কে মিলিত হয়। সেই সার্থক শোভাযাত্রাকেই 'এই অনুষ্ঠান' বলা হইয়াছে।

বর্তমান যুগে ভারতের এবং বাইরের যুগযুগান্তরের যত ধর্মীয় মতবাদ আছে, যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহে সেই সবগুলির সাক্ষাৎ রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই। সুতরাং ধন্য আমরা সকলে যারা তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছি।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একবার বলেছিলেন যে, রামকৃষ্ণনামের এমনই মহিমা যে, যে-কোন পাপ তাপ তা দূর করে দিতে পারে। আজ তাঁর পুণ্য জন্মতিথির প্রাক্কালে সেই কথা স্মরণ করে আমাদের কত সৌভাগ্যবান মনে হয়!—আমরাও তো তাঁর সেই পরমপাবন নামেরই আশ্রয় পেয়েছি! তাঁর কৃপার তুলনা নেই, সেই কথা বলতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন :

কভু রোষান্বিত হন জনক-জননী
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিবর ;
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর ;
স্নেহমায়া পাশরিয়া দুষ্টা কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,
অবিশ্বাসী—পুত্রসম পালিত কিঙ্কর।

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়
হে দীনশরণ!
মাগে বা না মাগে—কৃপা বিলাও ধরায়,
বরিষার বারি-বরিষণ ;
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী-গমন ;
ত্যজি কন্যা-পুত্র-নারী পানাসক্ত অত্যাচারী
লোকত্যাজ্য ঘৃণিত-জীবন—
তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন!

এই পতিতপাবনের আশ্রয় আমরা পেয়েছি, একথা আমাদেরও সর্বদা মনে রাখতে হবে।

এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। সেই সূচনার পাদদেশে আমরা সবাই এসে দাঁড়িয়েছি। সুদূর দিগ্বলয় আমাদের সম্মুখে। দিক্‌চক্রবালে রক্তিমাভ সূর্যের উদয় আমরা দেখছি। সেই প্রভাত-সূর্য ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন-গগনের দিকে ক্রম-অগ্রসর। যখন মধ্যগগনে তার স্থিতি হবে, সেই সময়কার প্রচণ্ড দীপ্তি, সেই মধ্যাহ্ন-মার্তণ্ডের প্রখর দ্যুতি—শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার বিরাট ঐশ্বর্য—কালে সমগ্র ভারত তথা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত করবে। এবিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ নতুন যুগধর্মের কথা বলেছেন। কত জ্ঞানীগুণী আসছেন, তাঁদের মতবাদ সকলের সামনে তুলে ধরছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের যে সনাতন ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম, সেই বৈদিক ধর্মের চিরন্তন সত্যকে শ্রীরামকৃষ্ণই সহজ-সরল ভাষায় সকল যুগের উপযোগী করে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন, এটিই নব যুগধর্ম। তিনি বলেছেন—পুরাতন ধর্মের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরো না, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, সম্মুখে তোমার নতুন জগৎ, নতুন ধর্ম। তিনি বলেছেন, 'হে মানব, মৃত ব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি, গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি, লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান বুঝিয়া লও। যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর।...এবং এই মহাযুগচক্র পরিবর্তনের সহায়তা কর। আমরা প্রভুর দাস...এই বিশ্বাস

হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।'

আমরা প্রায়ই বলে থাকি, 'আমাদের কতটুকু ক্ষমতা, আমরা দুর্বল নরনারী, ক্ষুদ্রসীমিতবুদ্ধি মানুষ—আমাদের দ্বারা কি কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব?' এই ভাব কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব নয়। এসব চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমাদেরই ভেতর রয়েছে সমস্ত শক্তি। তার প্রবোধনই হবে আমাদের তপস্যা। আচার্যশ্রেষ্ঠ স্বামীজী বলছেন: 'পুরাতন ধর্ম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, যে-মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। আর আমি বলছি নতুন ধর্মের কথা, যে-ধর্ম বলছে, তুমি তোমার আত্মশক্তিতে যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি নাস্তিক। তোমার ভেতরেই রয়েছে অনন্ত শক্তি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রকৃত আস্তিক্যবুদ্ধি।' সেই আত্মবলে বলীয়ান হওয়াই প্রকৃত ধর্ম। সেইজন্যই তিনি বলছেন, 'কিন্নাম রোদিষি সখে!' সব সময়েই আমরা কান্নাকাটি করছি: 'কি হ'ল আমাদের? কি হবে আমাদের?' কিছুই হয়নি আমাদের। আমরা যা ছিলাম, তাই আছি, তেমনই থাকবো।

জীবের আত্মা চিরন্তন, অবিকৃত, শাশ্বত, জন্মমরণহীন, সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তাতে দুঃখসুখের লেশমাত্র নেই, নেই কোন পরিবর্তনও। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে যেন আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চীৎকার করে উঠেছি। সেই আর্তনাদ শুনেই যেন স্বামীজী বলছেন অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে: 'কিন্নাম রোদিষি সখে!'—হে বন্ধু! কেন কাঁদছ? এ স্বপ্ন থাকবে না, টুটে যাবে, মিথ্যা ভয়ে ভীত হচ্ছো। এ তোমার সাজে না। 'ত্বয়ি সর্বশক্তিঃ'—তোমার ভেতরেই রয়েছে সমস্ত শক্তি। 'আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপং'—আমন্ত্রণ করো, আকর্ষণ করে আনো তোমার সেই ঐশ্বর্যশালী যে প্রকৃত স্বরূপ তাকে। 'ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে'—অনুভব করো এই স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোমার পদানত। 'আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ'—জড়ের কোন ক্ষমতা নেই—আত্মার শক্তিই প্রবল।

এই তত্ত্ব, এই বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—পরিব্রাজকাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেদিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী, যা তিনি সারা ভারতে প্রচার করেছেন, যা চিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভয়মন্ত্র স্বামীজীর জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাঁর কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে। তাই তিনি বলেছেন: 'বাণী তুমি বীণাপাণি কণ্ঠে মোর।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর এই কথাটি সদা স্মরণীয় যে, যেখানেই আমরা যাই না কেন, যে-অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। সর্বদা ভাবতে হবে, আমরা তাঁর দাস, তাঁর পদাশ্রিত। তাহলে আর আমাদের পা বেতালে পড়বার ভয় থাকবে না। যারা তাঁর ভক্ত, অনুরাগী—সকলকেই এই ভাব নিতে হবে। দুঃখকষ্ট শরীর-মনের ধর্মে আসবে যাবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও বাণীকে যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধরে রাখতে পারা যায়, তাহলে সে দুঃখকষ্ট আর আমাদের বিক্ষুব্ধ করতে পারবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণই আমাদের তাই একান্ত শরণ।*

* ১৭ই ফেব্রুআরি ১৯৮০ প্রাতে দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও স্বামী অচ্যুতানন্দ কর্তৃক অনুলিখিত।

ধন্য সেই বিশ্বসম্বোধন*

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

ধন্য সে মাহেন্দ্রক্ষণ
ধূর্জটির ধ্যানভঙ্গ—মহাকাল প্রসন্ন আনন !
ধন্য সেই বিশ্বসম্বোধন
কালের গহন তলে যে দীপ প্রজ্ঞায় জ্বলে
সীমানার অন্তরালে···ছিল বসে প্রচ্ছন্ন হেলায়—
অকস্মাৎ সূর্যের বিভায়
—নেমে এল বিশ্বরঙ্গতলে।
জনতাসমুদ্র কুতূহলে
চেয়ে রয়—ভেসে চলে বিস্ময়-সীমায়—
ভারতের মহাজ্ঞান
হাসে—ভাষে—ঐশী মূর্ছনায়—
সন্ন্যাসীর মুক্ত রসনায় !
'আল্লা' আর নহে আরবের
খৃষ্টানীও হারাইল বেড়া—
'ভগবান' নহেক হিন্দুর
"বিশ্বনাথ"—বাজিছে নাকাড়া !
ঈশ্বরের ছুটে গেল জাত
সম্প্রদায় নিস্তব্ধ নিপাত
'নিরুপাধি' শোভে বিশ্বনাথ—
পঙ্ক ঝরে—পদ্ম ফোটে আজ—
নব যুগ—নব ভাব—
দিকে দিকে মানবসমাজ—
দেখে চেয়ে রক্তে মাংসে
সুপ্রত্যক্ষ সন্ন্যাসীর মাঝ !

---

* চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দ-উচ্চারিত সম্বোধন স্মরণে। 'আমেরিকা' শব্দটি উপলক্ষণে।

কী ছিল সে সম্বোধনে ?
মহাচল হিমালয়—কেঁপে উঠে নবীন স্পন্দনে !
জীবনের ভাষা
মন্দির-মিনার-গির্জা ছিল যার বাসা—
সে ধ্বনিল অনন্ত গগনে
দেবদেব সন্ন্যাসীর বিশ্বসম্বোধনে
ধর্ম আজ মুক্তপক্ষ—
তৃপ্ত মহিমায়—
দেশে দেশে···দিশে দিশে···সুকণ্ঠ ছড়ায়।

হৃদয়-গোলাপ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সবাইকে ভালবাসতেই আমি চাই—
ভালবাসতেই :
অকপট হৃদয় দিয়েই
অবিচল খুশি থাকা—এই বাসনাই
সতত লালন করি : কারো প্রতি ঘৃণা
আমি আমার উষ্ণরক্তে পোষণ করি না।

স্বচ্ছতোয়া নদী হ'য়ে
কুলুকুলু নিঃসংশয়ে
যেতে চাই ব'য়ে।
নদী সে পরের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ।
তার ওষ্ঠ নয় ক্লিন্ন, স্বার্থমাখা ম্লান,
বরং, আতপ্ত-মাঠে সে ছড়াবে জল,
ফলাবে সবুজ ধান, সোনার ফসল,
মেঘ হ'য়ে—জলধারা শেষে
ঝম্‌ঝমিয়ে ঝরাবে ভালবেসে
উষর মাটির দেশে—
যোগাবে পানীয় ;
সবাইকে ভালবাসতেই আমি চাই—সবাই
আমার বরণীয়,
ঘৃণা—জানি পাপ,
তাইতো ফুটিয়ে রাখি সদা-সুরভিত
হৃদয়-গোলাপ।

স্মৃতিতে মায়াবতী

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কি যেন হারিয়ে গেছে অথচ উজ্জ্বল আছে স্মৃতিতে সতত
শতদল পদ্মশোভা চোখের তারায় ধরা জানি তো শাশ্বত
অসীম অপূর্ব রূপী—রুপোলী শিখর যত হিমালয় দেশী
হাতছানি দিয়ে ডাকে যখন দেখার ভাগ্য হয়েছে নিমেষী।

শুধু তো স্বদেশী নয় বিদেশী প্রবাসী কত সাধক-সাধিকা
দূর উচ্চ বনানীর পাহাড়িয়া প্রদেশের শ্যামল সেবিকা—
মায়ের স্নেহের কোলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের পেয়েছে আবাস
নিরাকার অদ্বৈতের অভাবনীয়ের ধ্যানে বুঝেছে সুবাস।

সুরভিত জীবনের ছন্দিত লীলার তীর্থে আশীর্বাদ কত—
প্রকৃতির হাতে গড়া আনন্দ বিভূতি নিয়ে চিত্ত স্বভাবত
নিম্নভূমি ছেড়ে এসে উঠে বসা ঊর্ধ্বভূমি উন্নত মালঞ্চে,
উজ্জ্বল নীলাভ নভে মায়াবী সবুজ বন ধ্যানস্থিত মঞ্চে।

চঞ্চল চলোর্মি গতি, ধীরস্থির দেবদারু সরলবর্গীয়
পাইনের বনে বনে বাতাসের খেলা চলে অথচ স্বর্গীয়
সুষমায় সুসময় ভোরে বা বিহানে জাগে মনের প্রশান্তি,
বিস্তৃত ভূখণ্ডে এসে ধ্যানীর জ্ঞানীর মুক্তি স্বাধীন সুক্রান্তি।

কোথায় হারিয়ে গেছে ? আছে আছে মায়ের যে হাজারো হাতের
কোমল মায়ার স্পর্শ মাটিতে পাথরে গাছে ফুলের ফলের
আকাশ বাতাসে আর তারা-ভরা রাতে কিংবা সূর্য-ওঠা ভোরে
অথবা সূর্যাস্তে রূপ গৈরিক গরিমা-ভরা আনন্দ বিভোরে।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

[ব্রহ্মের নির্গুণত্ব সম্পর্কে]

তৃতীয় আপত্তি

এ ত বড় আশ্চর্য কথা! অসম্ভব কথা! স্ববিরুদ্ধ কথা! ব্রহ্ম নির্গুণ; অথচ সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব প্রমুখ গুণাবলীর আধার! কিরূপে তা সম্ভবপর?

খণ্ডন

'নির্গুণ' শব্দের অর্থ 'সর্বগুণহীন' নয়, যা শঙ্করাচার্য বলেছেন। 'নির্গুণ' শব্দের অর্থ: প্রকৃতিজ ত্রিগুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ—ব্রহ্মে একেবারেই নেই। এই তিনটি গুণ পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুতেই কম-বেশী পরিমাণে বিরাজ করছে, এবং সেজন্যই জগতে এরূপ বিভিন্ন প্রকারের বস্তু দেখা যায়। যেমন, সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকলে বহির্জগতে আলোক, ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্যময়ত্ব, স্বচ্ছত্ব প্রভৃতির এবং তৎসঙ্গে লঘুত্ব প্রভৃতির; এবং অন্তর্জগতে জ্ঞান, সুখ প্রভৃতির উদয় হয়। সমভাবে, রজোগুণের আধিক্য হ'লে বহির্জগতে কর্মতৎপরতা, গতিবেগ প্রভৃতির; এবং অন্তর্জগতে বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতির প্রাবল্য দেখা যায়। সমভাবে. তমোগুণের আধিক্য হ'লে বহির্জগতে অন্ধকার, গুরুত্ব প্রভৃতির; এবং অন্তর্জগতে অজ্ঞান, অনাচার, অলসতা, দুর্বলতা প্রভৃতির প্রকাশ হয়। কিন্তু ব্রহ্মে এই সকল পার্থিব গুণের চিহ্নমাত্র নেই; এবং এই বিশেষ অর্থেই তিনি 'নির্গুণ'। অন্যদিক থেকে, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব প্রমুখ অসংখ্য কল্যাণ-গুণগণের আকর। সেজন্য, একটি বিশেষ অর্থে ব্রহ্ম 'নির্গুণ'। অর্থাৎ, তিনি এই দিক থেকে নির্গুণ যে, তাঁর মধ্যে কোনো হেয়, মন্দ, পার্থিব গুণ একেবারেই নেই; এবং আরেকটি বিশেষ অর্থে, তিনি 'সগুণ'। অর্থাৎ, তিনি সেই দিক থেকে সগুণ যে, তাঁর মধ্যে অসংখ্য উপাদেয়, ভালো, অপার্থিব গুণ আছে (১৷১৷১—গোবিন্দভাষ্য)। (নিম্নে দেখুন)

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, শঙ্করের নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ এবং বলদেবের নির্গুণ-ব্রহ্মবাদের মধ্যে রয়েছে মূলীভূত প্রভেদ। শঙ্করের নির্গুণ ব্রহ্মে সত্যসত্যই কোনো গুণ—তা ভালই হোক বা মন্দই হোক; পার্থিবই হোক বা অপার্থিবই হোক—একেবারেই নেই। বস্তুতঃ, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম একেবারেই নির্গুণ, কেবল ঈশ্বরই সগুণ; কিন্তু ঈশ্বরও ত শেষ পর্যন্ত জীব-জগতের ন্যায়ই মিথ্যা। সেজন্য সগুণত্বও একটি মিথ্যা ব্যাপারই মাত্র। কিন্তু বলদেবের মতে নির্গুণত্ব ও সগুণত্ব সমসত্য; ব্রহ্ম ও ঈশ্বরও ঠিক তাই। নিজের সুকঠোর কেবলাদ্বৈতবাদানুসারে শঙ্কর অবশ্য বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কেবল নির্গুণ-বাক্যসমূহই পারমার্থিক দিক থেকে শাশ্বতভাবে সত্য; সগুণ-বাক্যসমূহ কেবল ব্যাবহারিক দিক থেকেই কেবল সাময়িকভাবেই সত্য। কিন্তু বলদেবের মতে, নির্গুণ-সগুণ-বাক্যসমূহ সমভাবে সত্য ও শাশ্বত।

সে যা হোক, আমরা দেখেছি যে, সগুণ-নির্গুণ-ব্রহ্ম বিষয়ে বলদেব যা বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন, তাতে সত্যই অভিনবত্ব

ব'লে কিছুই নেই। কারণ, রামানুজ, নিম্বার্ক প্রমুখ অন্যান্য সকল ত্রিতত্ত্ববাদী, ভেদাভেদবাদী, জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকেরাই সেই একই মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন—যেহেতু তাঁদের সকলেরই মতে ব্রহ্ম অনন্ত-অচিন্ত্য-কল্যাণ-গুণাধাররূপে সগুণ; এবং সকল মন্দগুণবর্জিতরূপে নির্গুণ।

তবে, একটি দিক থেকে বলদেব এই প্রসঙ্গে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সেটি হ'ল এই :

সাধারণতঃ, অবশ্য কেহই এরূপ নির্বোধ নন যে, পার্থিব মন্দ গুণ শ্রীভগবানে আরোপ করবেন; যেমন—অজ্ঞান, কুশ্রীতা, পাপপঙ্কিলতা, শোকাকুলতা, অপবিত্রতা, অপূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা, বাসনা-কামনাধীনতা প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের যাঁরা বিশেষ জ্ঞানি-গুণিজন, তাঁরাও প্রায়ই পার্থিব ভালো গুণগুলি শ্রীভগবানেও আরোপ ক'রে থাকেন; যেমন—জ্ঞান, সৌন্দর্য, শক্তি, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি। এস্থলে বলদেবের বিশেষ বক্তব্য এই যে, এরূপ পার্থিব ভালো গুণও ব্রহ্মে আরোপ করা উচিত নয়, যেহেতু শ্রীভগবানের গুণগ্রাম জীবের গুণগ্রাম থেকে কেবল পরিমাণগত (quantitative) ভাবে নয়, স্বরূপগত (qualitative) ভাবেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন ধরুন, ব্রহ্মের জ্ঞান ও জীবের জ্ঞান। ব্রহ্মের জ্ঞান যে জীবের জ্ঞানের চেয়ে কোটী কোটী গুণ অধিক, পরিমাণের দিক থেকে, কেবল তা-ই নয়—তার চেয়েও বড় কথা এই যে, ব্রহ্মের জ্ঞান জীবের জ্ঞানের চেয়ে একেবারে অন্য ধরনের জ্ঞান, অন্য স্বভাবের জ্ঞান, অন্য স্বরূপের জ্ঞান। সেজন্য জীবের জ্ঞান কোটী কোটী গুণ বর্ধিত ক'রেও, ব্রহ্মে ন্যস্ত করলে ভুল হবে সম্পূর্ণরূপেই। অতএব প্রকৃতকল্পে, সাংসারিক মন্দ গুণই যে কেবল ব্রহ্মে নেই, তা-ই নয়, এমন কি সাংসারিক ভালো গুণও ব্রহ্মে একেবারেই নেই, উপরের অর্থে—এবং সেজন্য সাংসারিক দিক থেকে বরং তাঁকে 'নির্গুণ' বলাই ভালো। অতএব, সুবিখ্যাত বৃহদারণ্যক উপনিষদে যা বলা হয়েছে—'নেতি নেতি' (৩।৯।২৬)—'এ নয়, সে নয়'—ব্রহ্ম এ নন, সে নন, পৃথিবীর কিছুই নন—তা-ই গ্রহণ করা উচিত। এই কারণেই উপনিষদে বহুস্থলেই ব্রহ্মের এরূপ নঞর্থক (negative) বর্ণনা আছে—যথা, একটি মাত্র অতি সুপ্রসিদ্ধ, সুন্দর, সুস্পষ্ট, সজোর উদাহরণ—

'স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং, ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৮।৮)

'তিনি (যাজ্ঞবল্ক্য) বললেন—হে গার্গি! ব্রাহ্মণগণ বলেন—ইনিই সেই 'অক্ষর' বা ক্ষয়হীন। ইনি স্থূল নন, অণু নন; হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন; লোহিত নন; স্নেহবস্তু বা তৈলাদির ন্যায় তরল নন; ছায়া নন; অন্ধকার নন; বায়ু নন; আকাশ নন; আসক্ত নন—যাঁতে লাক্ষাদির ন্যায় কোনো বস্তু লগ্ন হতে পারে; তাঁর রস বা আস্বাদ নেই, গন্ধ নেই, চক্ষু নেই, কর্ণ নেই, মন নেই, তেজ নেই, প্রাণ নেই, মুখ নেই, পরিমাণ নেই, অন্তর নেই, বাহির নেই; তিনি কিছুই ভোজন করেন না, তাঁকেও কেহ ভোজন করেন না।'

সেজন্য বলদেব বলেছেন যে, প্রথমে আমরা এই মহাসত্য, শাশ্বত তত্ত্বটিই যেন পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি যে, ব্রহ্ম প্রকৃত অর্থেই, প্রকৃষ্ট অর্থেই, পরিপূর্ণ অর্থেই 'অনুপম' বা 'নিরুপম'। অর্থাৎ, পৃথিবীতে তাঁর কোনো উপমা নেই, উদাহরণ নেই, দ্বিতীয় নেই; সেজন্য তিনি সত্যসত্যই 'অচিন্ত্য'—সাধারণ উপমার সাহায্যে তাঁকে জানা যায় না, তা সে যত ভালোই হোক না কেন। যেমন,

প্রদীপ যতই উজ্জ্বল হোক না কেন, একেবারেই সূর্যের উপমা বা উদাহরণ নয়; এবং সেজন্য প্রদীপের সাহায্যে সূর্যকে জানবার বা ধারণা করবার প্রচেষ্টা বাতুলতাই মাত্র, হাস্যকরই মাত্র, নির্বুদ্ধিতাই মাত্র। একই ভাবে, অত্যন্ত জ্ঞানিগুণী, শ্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ-গরিষ্ঠ, সর্বগুণশক্তি-বিভূষিত মহাপুরুষও একেবারেই ব্রহ্মের উপমা বা উদাহরণ নন—এবং তাঁর সাহায্যে ব্রহ্মকে জানবার বা ধারণা করবার প্রচেষ্টাও আরো কোটীগুণ অধিক বাতুলতা, আরো কোটীগুণ অধিক হাস্যকর, আরো কোটীগুণ অধিক নির্বুদ্ধিতাই মাত্র। অর্থাৎ, প্রথমে আমরা যেন জানি যে, সাংসারিক দিক থেকে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ 'নির্গুণ'—যেহেতু পার্থিব ভালো মন্দ কোনো গুণই তাঁতে একেবারেই নেই। তার পরেই, পূর্বে নয়, অতি সাবধানতার সঙ্গে, অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে, অতি বিনয়ের সঙ্গে, অতি নম্রতার সঙ্গে, অতি দীনতার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন সামান্য মাত্রও ধারণা করতে প্রচেষ্টা করি যে, ব্রহ্ম যে গুণবিহীন তা নয়; পার্থিব গুণবিহীন হলেও, তিনি অপার্থিব, ধারণাতীত, অচিন্তনীয়, অবর্ণনীয় অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর—যা আমরা চিন্তা মাত্রও করতে না পারলেও তাঁর মধ্যে আছেই আছে শাশ্বতকাল পরিপূর্ণভাবেই। কেন ? কারণ, তিনি কেবল দ্রব্য নন, বস্তু নন, সত্তা বা অস্তিত্ব-মাত্রই নন—এরূপ কোনো কিছুই থাকতেই পারে না—'কেবল সত্তা' (absolute existence) —যার স্বপ্ন শঙ্করের ন্যায় মহাপণ্ডিতও দেখেছেন—অলীক স্বপ্নই মাত্র, বৃথা কল্পনাই মাত্র, মায়া মরীচিকাই মাত্র, মিথ্যা মোহই মাত্র, অসত্য বিভ্রান্তিই মাত্র; কারণ, সত্তা থাকলেই, থাকতেই হবে তার প্রকাশ— গুণে, শক্তিতে, কর্মে। সেজন্য আমরা যখন এইটুকুও মাত্র জানি নিঃসংশয়ে, স্থির বিশ্বাসে যে, ব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব আছেই আছে, তখন সেটুকুও আমাদের জানতে হবেই হবে, তুল্য নিঃসংশয়ে ও স্থির বিশ্বাসে যে, সেই সঙ্গে তাঁর প্রকাশও বা গুণ, শক্তি, কর্মও আছেই আছে—তা আমাদের নিকট যতই 'অনুপম' বা 'নিরুপম'ই হোক না কেন; যতই অচিন্তনীয় অবর্ণনীয়ই হোক না কেন; যতই বিস্ময়কর আশ্চর্যজনকই হোক না কেন!

অতএব, 'ব্রহ্ম-শব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়-গুণযোগাৎ' (গোবিন্দভাষ্য ১।১।২)।

অর্থাৎ, ব্রহ্মশব্দের অর্থই হ'ল—যিনি নিঃসীম নিরতিশয় গুণবিমণ্ডিত।

এরূপে, এক্ষেত্রে বলদেবের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, রামানুজ-নিম্বার্কাদি ত্রিতত্ত্ববাদী, ভেদাভেদবাদী, জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকগণের অপেক্ষা অনেক অধিক জোরের সঙ্গে তিনি বারংবার বলেছেন যে, ব্রহ্ম আক্ষরিক অর্থেই 'অনুপম' বা 'নিরুপম'— অর্থাৎ, ব্রহ্মে পৃথিবীর কোনো কিছুই নেই, এমন কি, ভালো জিনিসও নেই, ভালো গুণ-শক্তি-ভাবও নেই; যা আছে, তা নিশ্চয়ই আছে—আমরা জানতে পারি বা না পারি, কিন্তু তা স্বভাবগত স্বরূপগত ভাবেই আমাদের জগতের সব কিছু থেকেই ভিন্ন, নিঃসন্দেহে।

বস্তুতঃ, রামানুজ-নিম্বার্কাদির পক্ষে বলদেবের ন্যায় এরূপ জোরের সঙ্গে এ কথা বলা একটু কঠিন ও মুশকিল। কারণ তাঁরা বলদেবের ন্যায় 'অচিন্ত্যবাদী' নন; কারণ তাঁদের মতে ব্রহ্মকে জানা নিশ্চয় যায়, বর্ণনাও নিশ্চয় করা যায়, অবশ্য সাধারণ উপায়ে নয়, বিশেষ উপায়েই কেবল। কিন্তু তাহলেও আমাদের ভাবতেই হবে যে, সংসারের অতি ভালো, শ্রেষ্ঠ জিনিস যা, তা খানিকটা তাঁর গুণশক্তির মতই—যাতে অন্ততঃ সেইভাবেই তাঁকে সামান্যমাত্র হ'লেও আমরা চিন্তা করতে পারি—একেবারে তাঁকে 'অচিন্ত্য' ব'লে দূরে সরিয়ে না রেখে। কিন্তু বলদেব পুরোপুরি 'অচিন্ত্যবাদী' ব'লে তিনি নির্দ্বিধায়

সংসারের ভালো মন্দ সব কিছুকেই 'নস্যাৎ' ক'রে দিয়েছেন ব্রহ্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবেই ; এবং দাবী করেছেন যে, তাঁর 'সগুণ-নির্গুণবাদ' একটি নূতন, অভিনব তত্ত্ব—যেহেতু, রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতে ব্রহ্ম সগুণ—যেহেতু তাঁতে জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণই আছে শত সহস্র লক্ষ কোটী গুণে বর্ধিত হয়ে—অর্থাৎ, এই দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবে আছে পরিমাণগত (quantitative) ভেদই মাত্র। কিন্তু বলদেবের মতে ব্রহ্মে জগতের ভালো মন্দ কোনো গুণই নেই, এমন কি ভালো গুণও শত সহস্র লক্ষ কোটী গুণ বর্ধিত হয়েও নেই—অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও জীবে পরিমাণগত (quantitative) ভেদমাত্রই নেই—আছে স্বভাবগত ভেদও (qualitative)—যা পূর্বেই বলা হ'ল। কারণ, সগুণ ব্রহ্মের গুণাবলী জীবের ভালো শ্রেষ্ঠ গুণাবলী থেকে কেবল পরিমাণে (quantity) নয়, স্বভাবেও (quality) ভিন্ন সম্পূর্ণরূপেই। পুনরায়, রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতে ব্রহ্ম 'নির্গুণ', যেহেতু তাঁতে পার্থিব মন্দ গুণ নেই। কিন্তু বলদেবের মতে ব্রহ্ম 'নির্গুণ', যেহেতু তাঁতে পার্থিব মন্দ গুণ ত নেই-ই ; উপরন্তু এমন কি, ভালো গুণও নেই (উপরে দেখুন)। সেজন্যই তিনি তাঁর মতবাদকে বলেছেন 'নির্গুণবাদ' বারংবার ; এবং ব্রহ্মকে বলেছেন 'নির্গুণ', যা হঠাৎ শুনলে চমকে যেতে হয়—মনে হয় যেন, অদ্বৈতবাদীদের কথাই শুনছি। কারণ যাঁরা অদ্বৈতবাদী নন, তাঁরা ব্রহ্মকে ত সাধারণতঃ 'সগুণ'ই বলেন—যেমন রামানুজ-নিম্বার্কাদি।

[ক্রমশঃ]

ধর্মপ্রাণ কর্মযোগী যদুলাল মল্লিক

ডক্টর কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

ছেলেবেলায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পুণ্যশ্লোক সমাজসেবক যদুলাল মল্লিকের কথা ও তাঁহার বাড়িতে ও বাগানবাড়িতে পরমহংসদেবের আসা-যাওয়ার আনন্দময় বিবরণগুলি পড়িয়াছিলাম। আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার মাত্র উল্লেখ করিব তাঁহার জীবনাদর্শ ও কীর্তিকলাপের পরিচয় দিবার জন্য।[১]

যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপায় একটি অনতি-দীর্ঘ জীবন দেশের ও দশের সেবায় কি অলোক-সামান্য কীর্তি স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারে, যদুলাল মল্লিক তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমার মনে হয় তাঁহার একটি সুলিখিত জীবন-বিবরণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইলে বর্তমান শিক্ষা ও সমাজের আদর্শের মান উন্নত হইতে পারে।

'যদ্‌যদ্‌ আচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥'

যদুলাল মল্লিক যে একজন সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার কীর্তি, জীবনাদর্শ, অধ্যবসায় ও স্বাধীনচিত্ততা যে অনুকরণযোগ্য তাহাতে

১ প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার বংশাবতংস শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় হওয়ার ফলে তাঁহার জীবনকথা জানিবার এবং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য হয়। এই প্রাচীন ও কীর্তিমান বংশধারা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ শ্রীযুক্ত রসরাজ প্রকাশিত 'বংশ গৌরব' (৩২ পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত) গ্রন্থে এবং 'স্বাধীনচেতা বাগ্মী যদুলাল মল্লিকের জীবনকথা' গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

সন্দেহ নাই।

'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত-শির, নাহি ভয়।
...সত্যের নাহি পরাজয়॥'

যদুলালের জীবনে এই মহান সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে উনিশ শতক বঙ্গসংস্কৃতির একটি স্মরণীয় যুগ। ইহাকে রেনেসাঁস অর্থাৎ জাতির নবজন্ম বা নবজাগৃতির যুগ বলা হয়। এই শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ২৯শে এপ্রিল ১৮৪৪ খ্রীঃ যদুলালের জন্ম হয় মতিলাল মল্লিকের পাথুরিয়াঘাটার বাসভবনে—বাং ১৮ই বৈশাখ, সোমবার, ১২৫১ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে। তিনি মতিলালের শ্যালিকাপুত্র ছিলেন। মতিলাল তাঁহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং হাইড্ সাহেবের নিকট আইন শিক্ষা করেন। তৎকালীন অভিজাত সমাজে উচ্চশিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং স্বাধীনচেতা বাগ্মীপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হন। বাল্যকালে মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

লর্ড ডাফরিনের আমলে লাট ভবনের এক সভায় তিনি জাতীয় কল্যাণার্থে লবণ করের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। স্বয়ং লাট সাহেব তাহাতে বক্র ইঙ্গিত করিয়া বলেন—তিনি হয়তো এইরূপ প্রতিবাদের জন্য সাধারণের নিকট হইতে কিছু আর্থিক দক্ষিণা (উৎকোচ?) পাইয়া থাকিবেন। যদুলাল সদর্পে তাঁহার মুখের উপর প্রতিবাদ করিয়া বলেন—তাহা হয় তো তাঁহাদের বিলাতী সভ্যতায় সচল হইতে পারে কিন্তু প্রাচ্য সভ্যতায় উৎকোচ লওয়ার প্রথা একান্ত অচল। এইরূপ বলিষ্ঠ ও বীরোচিত ব্যক্তিত্বের জন্যই তিনি রাজা উপাধির যোগ্য বিবেচিত হইয়াও সেইরূপ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হন নাই। কর্তব্যনিষ্ঠা ও নীতির বিনিময়ে মানসিক দুর্বলতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই।

তিনি পিতৃপুরুষের সকল পূজা, পালপার্বণ, দয়াদাক্ষিণ্য বজায় রাখিয়াছিলেন, উপরন্তু নানাবিধ নূতন নূতন কীর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি দত্তকপুত্ররূপে ধনকুবের মতিলাল মল্লিকের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও অতি সংযত, সদাচারনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র, ধর্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী ছিলেন।

এইরূপ গৃহীদেরই প্রকৃত কর্মযোগী বলা যায়। কারণ, তাঁহারা শুধু স্বীয় মুক্তিচিন্তায় বিভোর না থাকিয়া সমাজের সেবায় পরম্পরাগত নীতিগুলি পালন করিয়া থাকেন অথচ ভগবৎপদে মতি রাখিয়া নিজেরাও নিঃশ্রেয়সলাভে বঞ্চিত হন না। রাজর্ষি জনক তাঁহাদের আদর্শ।

তিনি অন্যূন ১২ বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত কমিশনার ছিলেন। পরে সরকার ঐ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করায় তিনি স্বেচ্ছায় ঐ পদ ত্যাগ করেন। মিউনিসিপ্যালিটি যখন বস্তিবাসী প্রজাদের দেয় ট্যাক্স আদায় করিবার ভার অযথা এবং অবিধিপূর্বক জোর করিয়া বস্তির জমিদারের উপর চাপাইয়া দেন, তখন অন্যান্য জমিদারগণ ভয়ে ভয়ে তাহা নীরবে সহ্য করিলেও তিনি ঐ প্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাহাতেও কোন ফল না হওয়ায় এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ তিনি নিজের বস্তির সম্পত্তির ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু যুগ পূর্বেই তিনি এই 'নো ট্যাক্স ক্যাম্পেন' বা ট্যাক্স না দেওয়ার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাহির করেন।

স্যার হেনরি হ্যারিসন (যাঁহার নামে 'হ্যারিসন রোড' নাম হয়, যাহার বর্তমান নাম 'মহাত্মা গান্ধী রোড') আই. সি. এস., তখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং সর্বেসর্বা ছিলেন। তিনি যদুলালের উপর সমন জারি করিয়া

তাঁহার ঘোড়ার গাড়ি ক্রোক করেন। যদুলাল এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানি ও ক্ষতিপূরণের জন্য হাইকোর্টে মামলা করেন। ফলে যদুলাল জয়ী হন। বিচারপতি স্যার ট্র্যাভেলিয়ন ২৫০০ টাকা ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির তীব্র নিন্দা করেন। হ্যারিসন সাহেব পদচ্যুত এবং অন্যত্র অপসারিত হন। এই মামলা জয়ের ফল সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলিতে এবং বিলাতেও প্রকাশিত হয়। সমগ্র দেশ যদুলালের ভূয়সী প্রশংসায় মুখরিত হয়। এইরূপ সৎসাহস প্রদর্শন করিয়া তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে 'দি স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা (৬. ৫. ১৮৯২) বলেন—'Babu Jadu Lall Mullik···deserves a civic crown in fighting against the CalcuttaCorporation a battle···' অর্থাৎ এই কঠিন যুদ্ধজয়ের জন্য জনসাধারণের দ্বারা মুকুটমণ্ডিত হইবার সম্মান তাঁহার যোগ্য প্রাপ্য। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' (৫ই মে, ১৮৯২) বলেন—'(He) has laid the rate payers of Calcutta under great obligation···by exposing the doings of municipal officers in such a thorough manner.' 'হিন্দু' পত্রিকা (মাদ্রাজ) বলেন—'Mr. Mullik has rendered a valuable service to the public having dragged to the light of day the oppressive conduct of the Municipality.'

যদুলালকে জাতীয় কংগ্রেসের একজন প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিহিত করিয়াছেন অক্টোভিয়ান হিউম সাহেব—'But for your support that first day, there would have been no League now.' এই League হইতেই পরে জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়।

যদুলাল প্রেসিডেন্সি জেলের পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও সুপারিশে কয়েদীগণের আহারাদির অনেক সুবন্দোবস্ত হয়। তাঁহার কার্যকরী প্রতিভা ও কৃতিত্ব বহুমুখী ছিল। Bengal Social Service Association, Indian Association for the Cultivation of Science, Zoological Garden, Indian Currency Commission প্রভৃতির তিনি সদস্য ছিলেন। London Indo-colonial Exhibition-এর তিনি স্থানীয় সভ্য ছিলেন। 'বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন'-এর তিনি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

দেশের ও দশের স্বার্থে গভর্নমেণ্টের সঙ্গে বারংবার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মহারানী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতেশ্বরী বা 'এমপ্রেস্ অব ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ করেন (ইং ১৮৭৭) তখন তাঁহাকে অতি উচ্চ সম্মানসূচক 'সার্টিফিকেট অব অনার' বা মানপত্র দেওয়া হয়। বিরোধিতা না করিলে গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিতেন একথা সে সময় একাধিক সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়।

ধর্মচর্চা ও সাধুসঙ্গ। যদুলাল বৃন্দাবনধামের ব্রহ্মচারী ও সিদ্ধযোগী শ্রীশ্রীগিরিধারীশরণবাবার শিষ্য ছিলেন। জিরাট বলাগড়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত ভাগবতাচার্য জগদানন্দ গোস্বামীর নিকট তিনি ভাগবত আদি ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহার একান্ত শুভানুধ্যায়ী ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার নিজবাটিতে এবং দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই আসিতেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন দিনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ শ্রীম-কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের বিভিন্ন ভাগে লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'তোমার সংসারেও মন আছে আবার ঈশ্বরেও ভক্তি আছে।' যদুলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে ছোট ভটচায বলিতেন—কারণ

শ্রীরামকৃষ্ণের অগ্রজই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রথম পুরোহিত ছিলেন।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ যদুলালকে সকৌতুকে প্রশ্ন করেন—'হ্যাঁ গো বাবু, তোমার এত টাকা তবু তুমি টাকা চাও কেন?' উত্তরে যদুলাল যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যদুলালের উক্তির ভাবার্থ হইল: 'ঠাকুর, তুমি মায়ের এত কৃপা পেয়েছো তবু আরো চাও কেন? আমি বিষয়ী মানুষ, টাকা আমার কাছে মাটি নয়, টাকাই আমার পূজার ফুল,—তা না হলে আমি দীনদুঃখীর সেবা, ঠাকুর সেবা এবং সমাজের কল্যাণ কি করে করব বল তো?' যদুলালের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু সন্তুষ্ট নয়, আনন্দিতও হইয়াছিলেন।

যদুলাল তাঁহাদের সপ্তগ্রামীয় সমাজ হইতে বিবাহের পণপ্রথা দূর করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে সফলও হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তখন হইতে বিবাহে কন্যাকে যে অলঙ্কার উপহারাদি দেওয়া হয় তাহা তাহার নিজস্ব স্ত্রীধন রূপে গণ্য হইবে, তিনি সমাজ-মুখ্যদের দ্বারা ইহা অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন।

খড়দহে শ্রীমন্ নিত্যানন্দের গৃহবিগ্রহ ৺শ্যামসুন্দরের বিষয় উদ্ধার ও পূজা-পার্বণের সুবন্দোবস্ত করা যদুবাবুর এক বিশেষ কীর্তি। মন্দিরে আগত ভক্তদের অর্পিত প্রণামী ও অলঙ্কারাদি পালাদার গোস্বামীরা লইতেন, নাবালক এবং বিধবা পালাদারেরা বঞ্চিত হইতেন। তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া ও বহু অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরের সমস্ত আয় ট্রাস্টি বা ন্যাসরক্ষাকারীদের হস্তে ন্যস্ত করেন। তাহার ফলে পাল-পার্বণের ভোগরাগ পূজাদি নির্বাহের পর অতিরিক্ত আয়, পালাদারদের অংশ অনুসারে বণ্টন করিয়া দিবার সুব্যবস্থা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

যদুলাল বাটীর নিকটস্থ জগন্নাথঘাটটিরও বিশেষ যত্নসহকারে সংস্কার করেন।

পুরীধামে জলসরবরাহ ও শহরের জল-নিকাশ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সংস্কার প্রভৃতিতেও বহু অর্থব্যয় করেন।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়টিকে মাসিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য দেন এবং স্কুলটিকে পুনর্গঠিত করেন। এই স্কুলের ১৫০টি ছাত্রের বেতন এবং শিক্ষার ব্যয়ভারও তিনি বহন করিতেন।

কেশব অ্যাকাডেমি বিদ্যালয়টিও ঐরূপ অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তিনি নিজে স্কুলটির বাড়িভাড়া লওয়া স্থগিত রাখেন এবং নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া বিদ্যালয়টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অদ্যাপি ঐ বিদ্যালয় দুটি সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে ও তাঁহার তৎকালীন সাহায্যের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে।

তাঁহার প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতা সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনটিও স্থাপিত হয়। তিনি ইহার আজীবন সভ্য এবং কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

তিনি আহিরীটোলায় যদুপণ্ডিতের পাঠশালার, হিন্দু স্কুলের, সিটি, রিপণ ও মেট্রোপলিটান প্রভৃতি কলেজের দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে বার্ষিক বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিতেন। ডাফ সাহেবের স্কুলে ছয়টি ছাত্র তাঁহার দানে বিনা বেতনে পড়িতে পাইত।

ইহা ছাড়াও তিনি বহু দুঃস্থ দরিদ্র অনাথ আতুর বিধবা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের অকৃপণ-ভাবে সাহায্য করিতেন। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানে শীতকালে তিনি শীতবস্ত্র দান করিতেন।

মাহেশ বা বল্লভপুরের বিখ্যাত রথযাত্রায় তিনি যাত্রীদের ও দরিদ্রদের সেবার জন্য প্রতিবৎসর বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি স্বয়ং রথযাত্রার

সময় সেখানে যাইতেন, থাকিতেন এবং মেলা পরিদর্শন করিতেন।

এক কথায় এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি এই সকল জনহিতকর কাজে পূজা শিক্ষা সেবা চিকিৎসা ইষ্টাপূর্ত প্রভৃতি খাতে ৩২ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন, যাহা অদ্যকার মুদ্রামূল্য ধরিলে অন্ততঃ ৩৪ কোটি টাকা হইবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, যদুলাল সংসারের কুরুক্ষেত্রে ধর্মে কর্মে সব্যসাচী একজন ধর্মপ্রাণ কর্মযোগী ছিলেন। তৎকালীন সমাজে এমন কোনো সৎকাজ ছিল কিনা সন্দেহ যাহাতে তিনি সাহায্যদান বা অংশগ্রহণ না করিয়াছেন।

মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে, ২৪শে মাঘ ১৩০০ বঙ্গাব্দে (ইং ৭. ২. ১৮৯৪ খ্রীঃ) তাঁহার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয় এবং ভগবদ্ভক্ত পুণ্যাত্মা যদুলাল তথায় সজ্ঞানে শ্রীভগবচ্চরণে লীন হন।

তাঁহার বংশের সুসন্তানগণ অদ্যাপি তাঁহার প্রবর্তিত সমাজসেবার ধারা যথাসাধ্য বহন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায় অনাথনাথ মল্লিক বাহাদুর তাঁহাদের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লেডি ডাফরিন হাসপাতালের গৃহ-নির্মাণের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

৩৪। ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না।' ২।৮৩

৩৫। ঠাকুর বলতেন, 'মহামায়ার এমনি খেলা যে, যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়েও একটা বেরাল পুষিয়ে সংসার করাবে।' ২।১১০

৩৬। ঠাকুর বলতেন, 'এ-ও কর, ও-ও কর।' বলতেন, 'তুঁহু তুঁহু'। জীব অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ ক'রে তবে বলে, তুঁহু তুঁহু। ১।২৭৮

৩৭। সুরেন্দ্রকে (মিত্র) তিনি [ঠাকুর] বলেছিলেন, 'যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।' ।২৮১

৩৮। ভয় কি, বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি ? ঠাকুর যে বলে গেছেন, যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' ১।১৯৫

৩৯। ঠাকুর বলতেন,—'সাধু সাবধান !' সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্বদা সাবধানে থাকবে। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সবদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা ? ১।৩২০

৪০। ঠাকুর বলতেন দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযত থাকতে। ১।১৩৮

৪১। ঠাকুরের তখন অসুখ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরের) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজো দেবে ব'লে জিনিসপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখছ, কি অন্যায় করলে ! জগদম্বার জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে।' আমি তো ভয়ে মরি, ভাবি—এই তো অসুখ, কি জানি কি হবে। একি বাপু, কেন ওরা এমন করলে ! ঠাকুর তখন বারবার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, 'দেখ,

এর পর ঘর ঘর আমার পূজা হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা ক'রো না।' সেই দিনই 'আমার' বলতে শুনলাম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন, 'এই খোলটার' বা আপনার শরীর দেখিয়ে 'এই এর'। ১।১৫০

৪২। ঠাকুর বলতেন, 'বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই ভাল থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।' ১।২৭৮

৪৩। একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে আমাকে বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে, তা তুমি তাকে রুটি, লুচি যা হয় করে দিও, নইলে এক্ষণি এসে আবার বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়।' ১।১৩৭

৪৪। দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল-মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়লো, কোন দিন বা নাই পড়লো, তাই বলে বসা ছেড়ো না।' জপ বাড়িয়ে দাও। ১।১৩৩

৪৫। ঠাকুর বলতেন, 'বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যার জোর বেশী'—অর্থাৎ অবিদ্যামায়া সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে। ১।২৭৮

৪৬। ঠাকুর বলতেন, 'জরু, গরু, ধান—এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান।' ১।৫১

৪৭। মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু! সংযম নেই, কিছু নেই! ঠাকুর তাই বলতেন, 'ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল! কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি।' ১।১০৫

৪৮। বিষ্ণু বলে একটি ছেলে সংসারের ভয়ে আত্মহত্যাই করলে। তা ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ও যে আত্মহত্যা করলে, ওর পাপ হল না?' তিনি বললেন, 'ও ভগবানের জন্যে দেহ দিয়েছে, ওর আবার পাপ কি? কোন পাপ নেই, তবে এ কথাটি সবাইকে বলো না। সবাই ভাবটি বুঝবে না।' ১।১৪৬-৪৭

[ক্রমশঃ]

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

[অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নতুন কোডের বর্ণবৈষম্যমূলক ধারাগুলির কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয়দের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার ও ভারতীয়দের প্রতি নির্যাতনের বহু ঘটনা কাগজে প্রকাশ করা হতে থাকে। বোম্বাই-এর 'নেটিভ ওপিনিয়ন' (Native Opinion) মন্তব্য করে যে ভারতীয়রা আশা করছিল ধীরে ধীরে সমগ্র শাসন-কার্যে ভারতীয়দের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা হবে এবং উচ্চমর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে যোগ্য ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হবে। শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি রহিত করা হবে। কিন্তু এই সব আশা বিফল হয়েছে। ঐ কাগজেরই অন্য এক সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয় যে একজন ভারতীয় আই. সি. এস. যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক পদে নিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু তিনি মফঃস্বল

অঞ্চলে একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পকেটমারের বিচার করবার অধিকার আশা করতে পারেন না। 'অরুণোদয়' নামে একটি মারাঠী কাগজ মন্তব্য করে যে এইরকম একটি আইনের প্রবর্তন খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী কাজ হবে। 'পাতিয়ালা আখবর' এই আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলির সংশোধনের দাবী জানিয়ে লেখে যে তা যদি না হয় তাহলে সম্ভ্রান্ত ভারতীয়দের বিচার একমাত্র হাইকোর্টে হওয়া উচিত। এইটুকু করলে অন্ততঃ আংশিকভাবে বর্তমান অন্যায়ের প্রতিকার করা হবে। দক্ষিণ ভারতের পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে নতুন ফৌজদারী কোড শিক্ষিত বিত্তশালী ভারতীয়দের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই কোড চালু হলে সাধারণ বিত্তহীন ভারতীয়েরা অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গদের হাতে নির্যাতন থেকে অব্যাহতি পাবে না।

কলকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফৌজদারী কোডের বিরুদ্ধে এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে। আবেদনপত্রে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় যে প্রস্তাবিত নতুন কোডে আইনের দৃষ্টিতে সমতানীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়নি। শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস. এবং ভারতীয় আই. সি. এস.দের মধ্যে যে অন্যায় স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট হয়েছে তা ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক ন্যায়নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এই বৈষম্যনীতি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রেরও (১৮৫৭) বিরোধী। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদনপত্রটি ইংলণ্ডে ভারতসচিবের কাছে পাঠানো হয় (৫ আগস্ট, ১৮৭২)। আবেদনপত্রের উত্তরে তিনি স্বীকার করেন যে নতুন কোডে 'যথেষ্ট কারণ' (adequate reason) ছাড়াই পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু বহু চিন্তা ও পরিশ্রমের পর কোন নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে অল্পদিনের মধ্যেই তার সংশোধন করা বাঞ্ছনীয় নয়। কালক্রমে নতুন ব্যবস্থার দোষত্রুটি দেখা দিলে সরকার সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন (১৬ অক্টোবর, ১৮৭২)।

সমসাময়িক সংবাদপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার এবং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদপত্রের বক্তব্য ও সুরের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য ছিল। সংবাদপত্র-পত্রিকায় বিচারব্যবস্থার দুর্নীতি ও সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় আই. সি. এস.দের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সংক্রান্ত বৈষম্যের অবসান সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহী ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফৌজদারী কোডের বিরূপ সমালোচনায় আইন-আদালতে বর্ণবৈষম্যের অবসান সম্বন্ধে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল। এই বিক্ষোভ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-ভাবে জড়িত ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও বিকাশের গতি দ্রুততর হতে থাকে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হতে থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাবিস্তারের আরও অগ্রগতি হয়। দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মেধাবী, সুযোগ্য ও উচ্চাভিলাষী। চাকুরীর ক্ষেত্রে, শাসনব্যবস্থায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য এই শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশচেতনা সৃষ্টি করেছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) প্রতিষ্ঠিত হবার পর

থেকেই প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। উইলিয়াম জোন্স, প্রিন্সেপ, ক্যানিংহাম, উইলসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সকলে অবহিত হন। এই সব নতুন জ্ঞান ও তথ্য ভারতীয়দের মনে গর্ববোধ ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, কালের আবর্তে ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষ বর্তমানে গৌরবহীন ও পরাধীন হয়ে পড়লেও একদিন ভারত ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠদেশ। এই নতুন প্রেরণা ভারতীয় নবজাগরণ এবং জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁর Society for the Promotion of National Feeling-এর Prospectus প্রকাশ করেন। ঐ বছরেই মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুমেলার সূচনা হয়। রাজনৈতিক সংস্থা না হলেও হিন্দুমেলা হিন্দুদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও ঐতিহ্যচেতনার সৃষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তা-বোধকে নতুন রূপদানে প্রাণবন্ত করে তোলে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নব-অধ্যায়ের সূচনা হয়। হিন্দুদের এই নবলব্ধ আত্মবিশ্বাস ও জাতি-গৌরব শ্বেতাঙ্গদের জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে সেই যুগে এমন কোনও প্রখ্যাত বাঙালী ছিলেন না যিনি জীবনে কখনও না কখনও শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষ ও প্রচলিত বর্ণ-বৈষম্যের ফলে অপমানিত বোধ করেননি। স্বভাবতই তাঁরা এই অবমাননা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষ স্মরণীয়। আত্মমর্যাদাবোধের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। উচ্চপদাভিষিক্ত শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক প্রতিবাদের কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কারসাহেব তাঁর অফিসে টেবিলের ওপর পা তোলা অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলে-ছিলেন। কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজে তাঁর অফিসঘরে বিদ্যাসাগর কারসাহেবকে অনুরূপভাবে অভ্যর্থনা জানান। ক্রুদ্ধ অপমানিত কার-সাহেব বিদ্যাসাগরের অসভ্য আচরণের বিরুদ্ধে Council of Education-এর সচিব এফ. জে. মোয়াটের কাছে প্রতিবাদ জানালে বিদ্যাসাগর নিজের আচরণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে এই 'পাশ্চাত্য সভ্যতা' তিনি কিছুদিন আগে স্বয়ং কারসাহেবের কাছ থেকেই শিখেছেন। বিচক্ষণ মোয়াট ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কারকে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে বিরোধটি মিটিয়ে ফেলতে উপদেশ দেন।

একই পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগর দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও জাতিবৈষম্যমূলক সরকারী নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তখনকার দিনে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকরা ভারতীয় অধ্যাপকদের থেকে অনেক বেশী বেতন পেতেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলন, সমাজকল্যাণ এবং আর্তের সেবায় নিজের রোজগার এবং সঞ্চয়ের সবকিছু ব্যয় করে বিদ্যাসাগর আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েছিলেন। এই সময় তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর জানান যে যদি তাঁকে ঐ কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের সমান বেতন দেওয়া হয় তবেই তিনি ঐ পদে যোগদান করতে পারেন।

কিন্তু সরকার তাতে সম্মত না হওয়ায় বিদ্যাসাগর ঐ চাকুরি গ্রহণ করেননি।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর আর একটি আপাতসামান্য কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য ও অসৌজন্যমূলক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ সময় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ভবনে ভারতীয় জুতা পরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রবেশ-ইচ্ছুক ভারতীয়দের হয় তাদের জুতা বাইরে খুলে রেখে যেতে হোত, নয়তো নিজেদের হাতে করে বহন করতে হোত। কিন্তু ইউরোপীয় ধরনের জুতা পরে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করা যেত। বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত 'চটি' জুতা খুলে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে অসম্মত হন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের কাছে এই বৈষম্যমূলক নিয়মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক পত্র লেখেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ইংলিসম্যান (The Englishman) পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সমর্থন করে বৈষম্যমূলক নিয়মটি তুলে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়।

অন্যান্য প্রখ্যাত সমসাময়িক বাঙালীদের মধ্যে যাঁরা বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পিককবিলের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, অল্পকাল পরেই তিনি সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এবং বিশেষ করে তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের তিনি বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন। সকলেই অনুমান করেছিল যে কিশোরীচাঁদের বরখাস্তের মূলে রয়েছে বর্ণবিদ্বেষ।

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরাজী অনুবাদ সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি ছিলেম মরডণ্ট ওয়েলস্। এই মামলা চলাকালে বিচারপতি ওয়েলস্ ভারতীয়দের সম্বন্ধে অসৌজন্যমূলক কটূক্তি করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে শোভাবাজার রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে এক বিরাট জনসভা হয় (২৬ আগস্ট, ১৮৬১)। সভাপতিত্ব করেন রাধাকান্ত দেব। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সত্যানন্দ ঘোষাল, রামনাথ ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবাব আসগর আলি। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিচারপতি ওয়েলসের আচরণের তীব্র নিন্দা করে বলা হয় যে তিনি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ ভাষায় কটূক্তি করে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট এবং বর্ণবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই ধরনের আচরণ ও মনোভাব নিরপেক্ষ বিচার এবং শাসনব্যবস্থার পক্ষে সুসঙ্গত নয়। কুড়ি হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র ভারতসচিব চার্লস উডের কাছে প্রেরণ করা হয়। উড্ বিচারপতি ওয়েল্‌সকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল। বর্ণবৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গদের জাতি-বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও আচরণ বিদেশী শাসন-বিরোধী মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলে, হিন্দুমেলা হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করে। নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশানাল পেপার' (National Paper) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করে লেখে (৭ আগস্ট, ১৮৭২) যে শিক্ষিত বাঙালীদের মনে এক পরিবর্তন এসেছে। তাদের মধ্যে স্বদেশীয় চিন্তাধারার শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। লোকে উপলব্ধি করতে সুরু করেছে যে অন্যের অনুকরণ করলেই জাতীয় অগ্রগতি হয় না। স্থায়ী কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য নিজস্ব

অর্থাৎ জাতীয় ভিত্তি থাকা একান্ত আবশ্যক।

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অসহিষ্ণুতা এবং সমালোচনার ভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে ইংরাজ রাজকর্মচারীদের গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে জোর করে সম্মান আদায়ের প্রবণতার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি শ্লেষের সঙ্গে লেখেন, এই সব শ্বেতাঙ্গ যারা ম্যাগনাকার্টা এবং 'বিল অফ রাইটস্' এর (Bill of Rights) বড়াই করে তারাই ভারতের গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে জোর করে 'সেলাম' আদায় করতে অধীর হয়, তারা সাম্য ও স্বাধীনতার কথা বলে এবং তারই সঙ্গে ভারতীয়রা ক্রীতদাসের মত তাদের খেয়ালখুসি মর্জিমত সব আদেশপালন করবে তাই চায়। সতীশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'Reminiscences of a Kerani's life' বা 'কেরানী জীবনের স্মৃতিচারণ'-এ অনুরূপভাবে শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত মনোভাব ও আচরণের সমালোচনা করেন। এই রচনাটি 'Mookerjee's Magazine'-এ (জুন, ১৮৭৩—জুন, ১৮৭৪) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত হতাশা, চাকুরীর ক্ষেত্রে পদোন্নতিতে বাধা, তিক্ত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণেই শিক্ষিত ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদের সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের মূলে যে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয়দের মধ্যে শ্বেতাঙ্গবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। তারা আশঙ্কা করতে থাকে যে অদূর ভবিষ্যতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিপন্ন হতে চলেছে। তারা বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, কেননা তাদের ধারণা হয় যে বাঙালীরাই এই অনিষ্টের মূলে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম প্রধান মুখপত্র 'Indian Daily News' বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে লেখে যে বাঙালীরা হল 'a set of empty-headed hobbledehoys smirking with boundless self-conceit writing windy rubbish to their patriotic newspapers, and claiming to be put on an equality with Europeans.' অর্থাৎ নির্বোধ, বাকসর্বস্ব, আত্ম-প্রবঞ্চক বাঙালীরাই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমতা দাবী করে তাদের কাগজগুলিতে অন্তঃসারশূন্য গরম গরম কথা লিখছে। বাংলা সংবাদপত্র-পত্রিকার সরকারী অনুবাদক রেভারেণ্ড জে. রবিনসন আক্ষেপ করে লেখেন যে শিক্ষা-বিস্তারের পূর্বে বাঙালীরা ছিল বিনীত, ভদ্র এবং নম্র। কিন্তু তাদের শিক্ষাদান এবং উৎসাহদান করার ফলে এখন তারা মনে করছে যে তারা সর্ববিষয়ে শাসক শ্বেতাঙ্গদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যদি নাও হয় সমতুল্য নিশ্চয়।

শ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত সংবাদপত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা বিদ্বেষমূলক হলেও সম্পূর্ণ অবান্তর বা অসত্য ছিল না। শিক্ষার বিস্তার অবশ্যই বাঙালীদের মধ্যে এক বড় পরিবর্তন এনেছিল। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত করে তাদের আরও সচেতন করে তুলেছিল। ইতালি এবং জার্মানীর ঐক্যসাধন আন্দোলনের সাফল্য, লাইবেরিয়াতে নিগ্রোরাজ্য-প্রতিষ্ঠা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের এবং রাশিয়ায় সার্ফদের মুক্তি ইত্যাদি শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বর্ণবৈষম্য ও জাতিশ্রেষ্ঠত্বের দাবী সম্বন্ধে অসহিষ্ণু করে তোলে। 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় শিশিরকুমার ঘোষ লেখেন যে কিছু জাতি শুধুমাত্র দাসত্ব করারই উপযুক্ত এই মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরনের অভিমত ও মন্তব্য অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিত হতে থাকে। এর ফলে

শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন ও বিরক্তবোধ করতে থাকে এবং তাদের মনোভাব ইংরাজী কাগজগুলিতে ব্যক্ত হতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের বিরূপতা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন ছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে অভিমত প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীদের বিরূপভাজন হওয়া সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। 'Mookerjee's Magazine'-এ লেখার জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্পষ্টতই জানান যে রাজনীতি নিয়ে লিখতে তিনি ইচ্ছুক নন, কেন না তাহলে ইউরোপীয়েরা ঐ পত্রিকার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল যে বঙ্কিম ঐ সময় মানুষে মানুষে সমতার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নটির গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে 'সমতা' প্রশ্নটির নানান দিক আছে—যথা সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং জাতিবৈষম্য। এই অসমতা বা বৈষম্যগুলিকে তিনি 'স্বাভাবিক' বৈষম্য বলে গণ্য করতেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে অসমতা প্রভৃতিকে তিনি 'অস্বাভাবিক' বলে মনে করতেন। একজন ইংরাজ এবং ভারতীয়ের মধ্যে যে বৈষম্য করা হত তার থেকে একজন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের বৈষম্যকে তিনি নিকৃষ্টতর বলে মনে করতেন। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লেখেন যে একথা সত্যি যে কোনও ভারতীয় বিচারপতি একজন অভিযুক্ত ইংরাজের বিচার করার অধিকারী নন। এদেশে ইংরাজদের ও ভারতীয়দের মধ্যে আইনের সমতার নীতি নেই। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনও শূদ্র কি কখনও কোন ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতেন? বঙ্কিমের এই রচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ঐ সময় তিনি বর্ণবৈষম্য অবাঞ্ছিত মনে করলেও এই সমস্যাটিকে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু এই রচনাটির অল্পকাল পরেই বঙ্কিমের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে জাতিবৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গদের জাতিপ্রাধান্যবোধ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর ক্যানটনমেন্টের কাছে একটি খেলার মাঠ পালকিতে চেপে অতিক্রম করছিলেন। ঐ সময় কিছু ইংরাজ যুবক ঐ মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। বঙ্কিমকে পালকিতে করে মাঠ পেরোতে দেখে ইংরাজ যুবকেরা খুবই ক্রুদ্ধ হয় এবং ডাফিন নামে এক শ্বেতাঙ্গ অফিসার বঙ্কিমকে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় দর্শকদের সামনে নিগৃহীত করে। অপমানিত বঙ্কিমচন্দ্র ঐ দুর্বিনীত সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে তার আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। লক্ষণীয় বিষয় হল যে এই ঘটনাটির পরবর্তী সময় হতে বঙ্কিমের বিভিন্ন রচনায় বিদেশী শাসনের কুফল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যেতে থাকে। প্রায় এক দশক পরে ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় বঙ্কিম তাঁর বিখ্যাত শ্লেষাত্মক রচনা 'ব্র্যানসনিসম্' (Bransonism) লিখেছিলেন। এই রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র কঠোরতম ভাষায় শ্বেতাঙ্গদের বর্ণবিদ্বেষমূলক আচরণ ও মনোভাবের সমালোচনা করেন।

বর্ণবৈষম্যের এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উদ্ধত ও দুর্বিনীত আচরণের ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের যে দুর্ভোগ হচ্ছিল তা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটির নাম প্রথমেই মনে আসে। পরবর্তী কালেও একাধিক বাংলা নাটকে দরিদ্র কৃষকদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের মাধ্যমে এই সমস্যাটির প্রতি পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হন। হরলাল রায় তাঁর 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকে (১৮৭৪) গ্রামাঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ জমিদার ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বাঙালীদের ভীরুতার তীব্র সমালোচনা করে লেখেন যে তারা কাপুরুষের মত 'ম্লেচ্ছ'দের অর্থাৎ বিদেশীদের প্রাধান্য মেনে নিয়ে মাতৃভূমির অবমাননা করছে। একই বছরে প্রকাশিত তাঁর 'হেমলতা' নাটকে হরলাল রায় ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন যে 'ম্লেচ্ছ'দের হাতে অপমান অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁর নাটকেও বর্ণবৈষম্য এবং শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগ্ন জাতিবৈষম্যের প্রকাশ স্বদেশপ্রেমিক উপেন্দ্রনাথকে গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৪) এবং 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' (১৮৭৪) নাটকে উপেন্দ্রনাথ বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের অমানবিক আচরণ ও অত্যাচারের কঠোরতম সমালোচনা করেন। আইন-আদালতে বৈষম্য এবং শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি ও রাজকর্মচারীদের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণেরও তিনি নিন্দা করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে লেখেন যে যেখানে বিচারকরা নিজেরাই জাতিগর্ব ও প্রাধান্যবোধের অহমিকায় অন্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে এদেশের মানুষ কখনই ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করতে পারে না। 'শরৎ সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটক দুটি বহুলাংশে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) বলবৎ করতে সরকারকে বাধ্য করেছিল। [ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা। তাঁর দুঃখকষ্ট দেখে ভক্তদের, সেবকদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সদাহাস্যানন। তিনি বলেন, 'এই ব্যায়রাম হয়েছে ক্যান? এর মানে ঐ—যাদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে!'[১]

সেদিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীঃ। ২৩শে মাঘ, ১২৯২। বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা তিথি।

মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানবাটীতে এসেছেন। তখন বেলা সাড়ে চারটা। তিনি দুটো হাতপাখা এনেছেন। হাতপাখা দুটো নিয়ে তিনি দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ লাটুকে বলেন: এঁকে বল—কানের দিকে ফুলো বেড়ে গেছে···। মাষ্টার চুপ করে থাকেন।

আরও কিছু সময় পরে মাষ্টারমশাই নীচে হলঘরে যান। সেখানে দেখেন নরেন্দ্রনাথ, গঙ্গাধর প্রভৃতিকে। মাষ্টারমশাই জানতে পারেন যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। সেবকরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮১৫-১৯২৮) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী ও হিন্দুধর্মের প্রচারক। ১২৯১ সালের বৈশাখ মাসে তর্কচূড়ামণি মশাই কলকাতায়

[১] শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীরামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, পৃঃ ৪৪৫-৪৬।

ও আশেপাশে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় তাঁর প্রথম বক্তৃতা হয় এলবার্ট হলে। সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরীতে লেখেন, 'একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিমবাবু বললেন—রবিবাবু, আপনি শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন—শুনিবেন, তাহাতে জিনিষ আছে।... কিন্তু শীঘ্রই দেখিতে পাইলাম, বঙ্কিমবাবুর admiration বেশীদিন স্থায়ী হইল না।'[২] শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুয্যেদের বাড়ীতে। সেদিন ছিল ১৮৮৪ খ্রীঃ ২৫শে জুন, রথযাত্রার দিন। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে বলেছিলেন, 'বাবা! আর একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন সাধনভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।' (কথামৃত ১।১১।৩) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত শুনে শশধর তর্কচূড়ামণি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। তর্কচূড়ামণি কথায় কথায় শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন, 'মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?' অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?' একথা শুনে শশধর তর্কচূড়ামণি নিরুত্তর হন।[৩] পণ্ডিত শশধর চলে যাবার পর নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে "ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা না সারা মা-র হাত।' নরেন্দ্রনাথ: 'তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তোরা তো বলছিস, কিন্তু ও-কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না-রে।' নরেন্দ্রনাথ: 'তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আচ্ছা দেখি, পারি তো বলবো।'

"কয়েক ঘণ্টা পরে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন: 'মশায়, বলেছিলেন? মা কি বল্লেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ: "মাকে বললুম, এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে দুট খেতে পারি করে দে। তা মা বল্লেন তোদের সকলকে দেখিয়ে, 'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্ছিস।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।" বিদেহ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ

২ 'দেশ, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৬০, পৃঃ ৭০।

৩ এ-ঘটনার তাৎপর্য অবধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি। ১৩২৭ সালের ২৫শে পৌষ তিনি বহরমপুর হতে একটি চিঠিতে লেখেন: '...কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় নাই। তিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে ৫।৬ মাস পর্যন্ত গলরোগের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন এই যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি একাগ্রতার

সেবকদের মুগ্ধ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের তখনকার নিত্য আহার 'বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বার্লি মাত্র।' "[৪]

এখন নরেন্দ্রনাথ বলেন মাষ্টারমশাইকে : [আশ্চর্য !] মানুষ সিদ্ধাই খোঁজে এত জিনিস থাকতে। 'মনের কথা জানা' [এই সব সিদ্ধাইয়ে কি হবে ?] strike করলে যার যা ভাব [বেরিয়ে পড়ে।]

গঙ্গাধরকে অনুসরণ করে নরেন্দ্রনাথ যান দানাদের ঘরে। নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাধরকে বলেন : 'আমি আর ভগবান বই জানবার যো নাই।'

'তুমি কি কি কর—ধ্যানাদি ?'

এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঘরে ঢোকেন। নরেন্দ্র গঙ্গাধরকে নিয়ে বেরিয়ে যান, গাছতলায় গিয়ে বসেন।

মাষ্টারমশাই বাড়ী ফিরে যান। তাঁর মন পড়ে থাকে কাশীপুর বাগানে।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬। ভোররাতে মাষ্টারমশায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন নবগোপাল ঘোষ। তখন ভোর প্রায় চারটা। নবগোপাল বলেন মর্মন্তুদ কাহিনী : ঠাকুরের অসুখ বড় বেড়েছে— সাড়ে তিনটার সময় blood vomitting। গিরিশবাবু প্রভৃতিকে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম,…প্রতাপ ডাক্তার গিছলো…

গতরাতে নরেন্দ্র প্রভৃতি ছিলেন বাগানবাড়ীর পূর্ব বারাণ্ডায়। প্রথম দিকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ছিলেন শরৎ, কালীপ্রসাদ ও লাটু। পরে কালীপ্রসাদ নীচে গিয়েছিলেন জল খেতে ; লাটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শরৎ ছিলেন জাগ্রত। নীচে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, নবগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। সে-সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের গলার ক্ষত হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ডাবর ভরে যায় রক্তে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : গামছা দে…।

সেবক নিরঞ্জন ঠাকুরের দেহখানি সাবধানে ধরে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার বলে ওঠেন : 'মা, এত যন্ত্রণা সহ্য হয় না'[৫] শ্রীরামকৃষ্ণের কাতর যন্ত্রণা ভক্তসেবকদের চিত্ত উদ্বেলিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ অসহ্য যন্ত্রণায় নিরঞ্জনের বাহুডোরে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান।

কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রের মুখে দেখা যায়

চেষ্টা করিলে ইষ্টদেবতার দিকেই লক্ষ্য বাড়ে। সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।' তাহা হইলেও তিনি যোগশক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন আর নাই পারুন, একটি সাধু-প্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের কিছু-দিন পূর্বে তিনি কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।' (পদ্মনাভ ভট্টাচার্য : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০)

লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাই যে, শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন : 'সমাধির সময় দেহের উপর মন ফেলতে পারবো না গো।' (শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫৭)

৪ স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০।

৫ এ-প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য রামচন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথা। "তিনি বারবার বলিয়াছেন, 'তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিয়া আমি অসুস্থতা ভোগ করিতেছি।'…যেদিন রাত্রে 'অ্যাসেটিক অ্যাসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রীবা ধারণপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন ?' আমরা পাষণ্ড বর্বর, স্বচ্ছন্দে কহিয়াছিলাম, 'যাওয়া উচিত ছিল।'…এখন সেই কথা স্মরণ হইয়া আপনার শিরোদেশে আপনি করাঘাত করিতেছি।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৮৫)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কণ্ঠনিঃসৃত টাটকা রক্তের অংশ।[৬] এ-বিষয়ে মাষ্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে মন্তব্য লিখেছেন, 'Lord's supper—Fresh blood.'

শ্রীরামকৃষ্ণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে পর তিনি ক্ষীণকণ্ঠে লাটুকে বলেন: **'দেখছি [ভবিষ্যতে] হাড় কখানা থাকবে—তাইতে প্রাণ ডুপ্ ডুপ্ করবে।'**

আমরা দেখতে পাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎবাণী আক্ষরিকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল।

* * *

নবগোপাল ঘোষের নিকট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্কটাকীর্ণ অবস্থার কথা শুনে মাষ্টারমশাই সঙ্কল্প করেন, তিনি কাশীপুরে যাবেন, বাগানবাড়ীতে বাস করে ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা করবেন। প্রয়োজনবোধে স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীও সেখানে যাবেন। নিকুঞ্জদেবীর মাথায় গণ্ডগোল চলছিল।

নবগোপাল সম্ভবতঃ নিজের বাড়ীতে যান সকাল সাতটায়। এদিকে সাড়ে আটটার সময় মাষ্টারমশাই সস্ত্রীক ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রা করেন। পথে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাসিক্ত স্মৃতিভার তাঁর হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। চোখের জল ঝরতে থাকে।

তাঁর স্মরণপথে জীবন্ত হয়ে ওঠে ৺জগদম্বার নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা: 'মা [এরা] সংসারে থাকবে ওদের এক এক বার দেখা দিও মা।'

তাঁর মনে ভেসে ওঠে একটি মধুর ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরের বেলতলায় মাষ্টারমশাই জপধ্যান করতেন। একদিন দুপুরে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শেষকালে মাষ্টারকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'এত বেলা হ'ল দেখে তোমায় খুঁজতে যাচ্ছিলুম। তোমার [তখনকার] মুখের [ভাব] ভঙ্গী দেখে বোধ হলো—বুঝি বেরিয়েই না যায়—তা তুমি স্থির-বুদ্ধি।'[৭]

মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'মা সচ্চিদানন্দের কথা কব সাধুসঙ্গে।' রামবাবুর বাগান থেকে এসেছিলেন এক সাধু। তাঁর কথা শুনবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

মাষ্টারমশায়ের দক্ষিণেশ্বরে কয়েক সপ্তাহের তপস্যার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন: 'তুমি আবার বাড়ী ফিরে যাবে?'

আরও মনে পড়ে ভক্ত অধর সেনের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। শোকার্ত শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদে কেঁদে

---

৬ মনে হয় এ-ঘটনাই ভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে। সেখানে দেখি, '...অধুনা যদিও ইহা সুবিদিত যে, ক্যান্সার সংক্রামক রোগ নহে, তথাপি সেকালে উহা অবিসংবাদিত সত্য ছিল না। ইহার ফলে দেখা যাইত যে, ঠাকুরের যখন রোগবৃদ্ধি হইল, তখন অনেকেই এই বিষয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেন এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গিতে একটা আত্মরক্ষা করিয়া চলার চেষ্টা লক্ষিত হইত। এই মনোবৃত্তি দমন করিবার জন্য...নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরের পথ্যগ্রহণের পর তাঁহার নিষ্ঠীবনমিশ্রিত পথ্যের পাত্রটি হস্তে লইয়া অম্লানবদনে পথ্যাবশিষ্ট পান করিলেন। সেদিন হইতে সকলের সন্দেহ চিরতরে নিস্তব্ধ হইল।' (স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮)।

৭ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯শে ডিসেম্বর। মাষ্টারের বেলতলা হতে ফিরতে দুপ্রহর হয়েছে। দেরী দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বেলতলার দিকে যাচ্ছিলেন। পঞ্চবটীর কাছে মাষ্টারকে দেখতে পান। তাঁর হাতে সতরঞ্জি আসন, জলের ঘটি। মাষ্টার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'আমি যাচ্ছিলাম তোমায় খুঁজতে। ভাবলাম এতো বেলা, বুঝি পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালালো! তোমার চোখ

বলেছিলেন : 'মা কেন আমায় লেখাপড়া জানি না দেখে ভক্তি [ভক্ত] নিয়ে থাকতে দিলি ?'

মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত। তিনি বলতেন : 'মা তোর নামগুণ গাইব, চলে বেড়াব, ব্রহ্মজ্ঞান চাই না।'

মনে পড়ে একটি ঘটনা। তিনি শ্রীশ্রীমাকে পান সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন।

আরেকটি ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপবাদ রটেছিল। চরিত্রহানির অপবাদ শুনে তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন।

মাষ্টারমশাই ভাবাবেগে তাঁর স্ত্রীকে বলেন : 'তুমি আত্মহত্যা কর [আর যাই কর] আমি আর [সংসারে] থাকব না। ঃ আপনি মরে যাব···এখন আর বড় [বাড়ীতে] যাচ্ছি না।'[৮]

পরবর্তী দৃশ্য কাশীপুর বাগানবাড়ীর দোতলা। সকাল সাড়ে দশটা। শ্রীরামকৃষ্ণ নিদ্রাভিভূত। সেবক শশী দণ্ডায়মান। গতরাতের ব্যাধির প্রচণ্ড ঝাপটাঝাপটির পর শান্তভাব।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি মাষ্টারকে ইঙ্গিতে বলেন : **রক্ত এত···**

প্রতাপ ডাক্তারের দেওয়া এসেটিক্ এসিড খেয়েছিলেন। তারপরই রক্তক্ষরণ ও রক্তবমনের বাড়াবাড়ি ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : **রাম যদি ঔষধ খেতে বারণ করতো বেশ হতো।**

আবার ইঙ্গিতে বলেন : **শরীর হাটতে পারছে নি।···**

আরও বলেন : **খিদে নেই।**

মাষ্টার : একটু বেলা হলে হবে।

কিয়ৎসময় পরে মাষ্টার বলেন : একটু সারলে বৈদ্যনাথ প্রভৃতি জায়গায় গেলে হয় না ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটু ভেবে নিয়ে বলেন : **না···।**

পরবর্তী দৃশ্যে মাষ্টারমশাই নীচের তলায়। সেখানে উপস্থিত অতুলচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি। ভূমিতে শায়িত নরেন্দ্র স্ফূর্তির মেজাজে বলেন : মাষ্টার সরে এসো না—'তোমার মুখ দেখলে আমি থাকি ভাল।'

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান, সঙ্গে গুট্‌কো গোপাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন **তাঁর মাথা উঁচু করে দেবার জন্য।** আদেশ পালনের জন্য মাষ্টার ছুটে যান লেপ আনতে। ঠাকুর ইঙ্গিতে বলেন **বাইরে রোদে দেওয়া গাত্রবস্ত্রখানি আনার জন্য।** মাষ্টার আদেশ পালন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইঙ্গিতে বলেন **তাঁর দৃষ্টিপথ হতে ইট, মাটির সরা, কাপ সরিয়ে দিতে।** তিনি আবার ইঙ্গিতে বলেন **পা টিপতে।**

কিছুক্ষণ পরেই আবার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ বিছানায় উঠে বসেন, বলেন : **কি হবে ?**

মাষ্টার : পাশ ফিরে শুবেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যাগ্রহণ করেন।

মাষ্টারের কাসি পাওয়াতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে আসেন। নীচে মুরুব্বি গোপালের সঙ্গে দেখা হয়। গোপাল বলেন : আমারও কাসি পেয়েছিল তাই সেদিন ···।

তখন যা দেখেছিলাম—ভাবলাম বুঝি নারায়ণ শাস্ত্রীর মত পালালো। তারপর ভাবলাম, না সে পালাবে না ; সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।২।৩)

৮ পরবর্তী কালে মাষ্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে পেন্সিল দিয়ে মন্তব্য লিখেছেন : Did I keep my promise ?—No.

পরবর্তী দৃশ্য। সেবক শশী পূব বারাণ্ডায় শুয়ে আছেন। নরেন্দ্রনাথ ঘরের ভেতর হতে বলেন: কেন ঢুটো বেলায় খাস? পান খাবি?

শশী: কে আনতে যায়?

নরেন্দ্রনাথ: আমি আনছি।

নরেন্দ্র ও মাষ্টারমশাই বাগানবাড়ী হতে বেরিয়ে দোকানে যান। পথে যেতে যেতে নরেন্দ্রনাথ বলেন: আমি আগে ভাবতুম [it is] meanness to go ashopping.

তাঁরা ঢুজনে দোকানে গিয়ে কড়াই মুড়ি ভাজান। মাষ্টারমশাই শ্রীক্ষেত্রে যাওয়ার বিষয় আলোচনা করেন।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায় মাষ্টারমশাই ও অতুল ঘোষ বাগানে গাছের নীচু ডালটির উপর উপবিষ্ট। বাগানবাটীতে ১লা জানুয়ারীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-বিতরণের ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্ধবাহ্যদশায় অতুলের বুকে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমার কিছু হলো?

অতুল: কৈ না।

শ্রীরামকৃষ্ণ: হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তের সম্পর্কে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। রামলাল সম্বন্ধে কথা হয়। রামলাল শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন: এতদিন আমায় কৃপা করেন নি কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ: সময় হলেই হয়।[৯]

এবারে অতুল মন্তব্য করেন: আমার এঁর সম্বন্ধে [মতামত] এখনও ঠিক নাই—ভাবছি—এই ঝামেলাতে অবস্থা বদলাবে।

অতুল বলেন শিশির ঘোষের কথা। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট প্রথম গিয়েছিলেন। শিশির ঘোষ শেকস্পীয়রকে মানেন না। মানেন না বলে হঠ কোঁদল।

অতুল শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে: ও (অতুল)

অতুল নিন্দা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ অতুলকে লক্ষ্য করে বলেন: কি বলছে…কি বলছে?

অতুল: রাজহাঁস

শ্রীরামকৃষ্ণ: ওতো বেশ বলেছে।[১০]

অতুল একবার নব রায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। অতুল বলেন: ভেবে গেলুম [কোন] ইঙ্গিত করবেন—তা বুঝতে পারলুম না।

মাষ্টারমশাই: কি কি?

অতুল: আমাদের গায়ের কাপড়ে হাত দিয়ে এ কিসের তৈরী ইত্যাদি খোঁজ করেন—প্রথমে একটা রাঙা সুতো নিয়ে খেলা করতে থাকেন—

এই বর্ণনায় মাষ্টারমশায়ের মনে প্রশ্ন জাগে—এই ঘটনা কি ঠাকুরের বালকভাবের পরিচায়ক?

৯ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য রামলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর সেদিনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছিলেন: 'অত্য ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ' ইষ্টমূর্তি হৃদয়পদ্মে সহসা আবির্ভূত হইয়া এককালে নড়িয়া চড়িয়া ঝলমল করিয়া উঠিল।' [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ. ৫, পৃঃ ৩০৭]

১০ স্বামী সারদানন্দজীকে অতুল বলেছিলেন: 'ঠাকুর ঘরের ভেতর এসে বসলেন।… মেজদাদা আমাকে দেখিয়ে ঠাকুরকে—ইনি আমার ভাই…ইনি আপনার নিন্দা করেন, এইমাত্র করছিলেন।—বলেই আমাকে বললেন, এখন যে চুপ করে রয়েছ? Now, you are charmed by his presence!—শুনে ভাবলুম—বটে?…ঠাকুরকে বললুম—মশাই, আপনি পরমহংস নন, রাজহংস, এই কথা আমি বলছিলাম। ঠাকুর—উনি তো নিন্দা করে নি, হংসের স্বভাব ঢুধে জলে মিশিয়ে দিলে, ঢুধটুকু চুষে খায়…।' (স্বামী সারদানন্দ: ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, পৃঃ ১৮)

না ঠাকুর এর দ্বারা অতুলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করছিলেন ?

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপস্থিত হন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। মাষ্টারমশাই সেখানে অনুপস্থিত। ঠাকুরের শরীরের দুরবস্থা দেখে বিজয়কৃষ্ণের চোখে জল ঝরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণকে বলেন : **কেন হল ?**

বিজয়কৃষ্ণ : আপনিই জানেন—আপনি কোথায় কি লীলা করছেন—আপনিই জানেন !—জীবশিক্ষা !

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় আচরণ শুধুমাত্র জীবশিক্ষার উদ্দেশে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে স্বর্গ দেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : **এত কষ্ট !** তিনি আবার ইঙ্গিতে কপাল দেখান।

বিজয়কৃষ্ণ : যেখানে যাচ্ছি সেখানেই···

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নীচতলায় হলঘরে নেমে আসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মচারী, মাষ্টারমশাই, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

বিজয়কৃষ্ণ বলেন : **কষ্ট** দেখতে **কেমন** [**কষ্ট**] হয়

রামচন্দ্র : **কি** বললেন ?

বিজয়কৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বর্ণনা করে বলেন : বেশী লোকও ভাল নয়।

মাষ্টারমশাই : আমাদের ওখানে বেশী যাওয়া ভাল নয়।

বিজয়কৃষ্ণ : না, কেবল যারা সেবা করবে।

মাষ্টারমশাই : তবে চলুন আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।

নরেন্দ্রনাথ : ভবি ভুলবার নয়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা দানাদের ঘরে উপস্থিত হন। সেখানে সেবক নিরঞ্জনও উপস্থিত।

স্বভাবতই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পীড়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বিজয়কৃষ্ণ বলেন যে জীবশিক্ষাই এর লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন যে চতুর্দিকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ধর্মের স্রোত প্রবাহিত। তিনি যেখানেই যান সেখানেই দেখেন ধর্মভাবের বিকাশ ও প্রকাশ।

তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও বলেন : দেহ নাশ হলেও উনি থাকবেন। দেহ তো মায়া বৈ নয়।

নরেন্দ্রনাথ : ইনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) কোন্ শ্রেণীর ?

বিজয়কৃষ্ণ . এঁর সিদ্ধ থাক নয়।—এ আর এক রকম।

নরেন্দ্রনাথ : তবু কি ?

বিজয়কৃষ্ণ : যার যা ভাব তার কাছেই থাকা ভাল। একটু থেমে বিজয়কৃষ্ণ বলেন : অন্য লোকেদের না [বলাই ভাল]।

নরেন্দ্রনাথ : হ্যাঁ, যেমন কোন ব্যক্তির ধন আছে, তবুও সে দাতা নয়।

নরেন্দ্রনাথ আরও বলেন তোতাপুরীর চল্লিশ-বছরের সাধনায় আয়ত্তীকৃত নির্বিকল্প সমাধির কথা।[১১] বলেন, হাজরা ও পঞ্চবটীর কাহিনী।

বিজয়কৃষ্ণ : দেখুন। তাঁকে দেখা—তা তাঁর ভক্তকে দেখলেই হল। দীনবন্ধু ! (যাবার **পূর্বে**) [দেহত্যাগের পূর্বে] কি সমাধিস্থ হবেন ?

---

[১১] চল্লিশবছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় উপলব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে প্রস্ফুরিত দেখে তোতাপুরীজী বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া !' শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও ঘটনাপরম্পরায় তোতাপুরীজী নির্বিকল্প সমাধি আয়ত্ত করার অনেক পরে 'ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ' এই তত্ত্ব আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিপূর্ণতা দেখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখেছেন, 'কোথায় আছিল তোতা এখন কোথায়। ভাবরাজ্যেশ্বর প্রভু তাঁহার কৃপায় ॥'

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বিদায় নিয়ে স্থানান্তরে যাবার পূর্বে রামচন্দ্র দত্ত ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে একান্তে কথা বলেন।

রামচন্দ্র বলেন: ঠাকুর বলেছিলেন—"বুকে হাত দেবো আর বলবো 'চৈতন্য হোক্', আর হবে… ।"

বিজয়কৃষ্ণ মাষ্টারকে একপাশে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন: চিঠি লিখেছিলেন—তা কি বলেছিলেন?

মাষ্টারমশাই তা স্মরণ করতে পারেন না।

* * *

রাখালচন্দ্র দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বভাব বালকের মত। তিনি ইঙ্গিত করে বলেন, **এত্তো রক্ত**!

কণ্ঠদেশে স্ফোটক পুনরায় দেখা দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র লিখেছেন, 'মধ্যে মধ্যে ঐ অন্তঃক্ষত শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন। এমন কি, কখন কখন এই স্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তদ্দ্বারা শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইত। যতদিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। এক পোয়া দুগ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। এমন সূত্রবৎ লালা নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক ফাটিয়া পূঁজ বহির্গত হইত।'[১২]

রাখালচন্দ্র এখন শ্রীরামকৃষ্ণের মাথায় ও পায়ে হাত বুলিয়ে দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং ইঙ্গিতে বলেন **একটা দরজা খুলে দিতে**। মাষ্টারমশাই ও উপস্থিত অন্যান্য সকলে গৃহত্যাগ করেন।

নীচে দানাদের ঘরে রামচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মচারী, নরেন্দ্রনাথ, চুনীলাল বসু প্রভৃতি উপস্থিত। রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে একখিলি পান দেন এবং বলেন: চৈতন্যলীলা দেখাবেন—সুবিধা কি হবে?

মাষ্টারমশায়ের মনে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মধুর স্মৃতি। সেটি চয়ন করে তিনি নরেন্দ্রনাথ ও চুনীবাবুকে বলেন: গিরিশবাবু (শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট) পয়সা নেবে না, তা দেবেনই—আবার বলছেন তোমার তো কষ্ট হবে না?[১৩]

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্র মিত্র এসে উপস্থিত হন। তাঁর সঙ্গে রামবাবুর সাময়িক মন কষাকষি হয়েছিল। মাষ্টারমশাই গায়ে পড়ে দুজনের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেন।[১৪]

[ক্রমশঃ]

---

১২ রামচন্দ্র দত্ত: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩-৭৪।

১৩ গিরিশচন্দ্র নিজে লিখেছেন 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে: (বলরাম ভবনে) তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলিলেন, 'আর এক দিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।' আমি উত্তর করিলাম, 'যে আজ্ঞে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।' তিনি বলিলেন, 'কিছু নিও।' আমি বলিলাম, 'ভালো আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন—'সে বড় র‍্যাজলা জায়গা।' আমি উত্তর করিলাম, 'না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।' তিনি বলিলেন, 'না, একটি টাকা নিও।' আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় একথা শেষ হইল। (গিরিশ রচনাবলী: সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২৫৮)

১৪ এ নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৮০১-৬

সমালোচনা

ন্যায়দর্শনে পরামর্শ: ডক্টর অরুণা চক্রবর্তী। প্রকাশক: ডাঃ নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য, ২৪।১ বি, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। (১৯৭৮), পৃঃ [illegible]-৩০, মূল্য : ৩৫ টাকা।

বহুতথ্যসমৃদ্ধ জটিলতত্ত্বের আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। গ্রন্থখানি পড়িয়া প্রথমেই বলিতে পারা যায় যে, ন্যায়শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুরূহ তত্ত্বের সুসঙ্গত প্রণালীতে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা ন্যায়শাস্ত্রে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবীণ অধ্যাপকের বিশাল প্রজ্ঞার স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিক লেখিকার এইরূপ সুচিন্তিত এবং সুলিখিত গ্রন্থ পণ্ডিতব্যক্তির হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করিবে।

যদিও গ্রন্থের নাম 'ন্যায়দর্শনে পরামর্শ', তথাপি স্বাভাবিক কারণেই নব্যন্যায়ের পরামর্শ বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং 'ন্যায়দর্শনে পরামর্শ' এই নামকরণ কতখানি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তনীয়। গ্রন্থের মধ্যে যে বিষয়ের আলোচনা প্রাধান্য লাভ করে, সেই বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়। সেই দিক হইতে 'পরামর্শ' শব্দটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু প্রাচীনতম ন্যায়দর্শনে পরামর্শের আলোচনা থাকিলেও নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডেই পরামর্শের জটিল বিচার রহিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্রীও নব্যন্যায়ভিত্তিক আলোচনারই প্রাধান্য দিয়াছেন। সুতরাং 'ন্যায়দর্শনে পরামর্শে'র পরিবর্তে 'ন্যায়শাস্ত্রে পরামর্শ' নাম দিলেই যুক্তিসঙ্গত হইত বলিয়া আমার ধারণা।

এই পুস্তকের আলোচনা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ পরামর্শের লক্ষণ, স্বরূপবিচার ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা; অপরদিকে অন্যান্য দর্শনের এই বিষয়ের বক্তব্য বিশ্লেষণ করা। তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত আলোচনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও কতগুলি ক্ষেত্রে কিছু কিছু নূতন চিন্তাধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তথাপি সেই সমস্ত বিষয়ে কিছু প্রশ্নের অবকাশও আছে। যেমন, প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শের স্থলে লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্বের (২৭ পৃঃ) সহাবস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি ধর্মকে জাতি বা অখণ্ড ধর্মরূপে স্বীকার না করিয়া প্রত্যক্ষগত বিষয়তাবিশেষ স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে লৌকিকত্ব ও অলৌকিকত্বকে জাতি বা অখণ্ডধর্ম স্বীকারের বাধক কোনও যুক্তির উল্লেখ করা হয় নাই। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শ সিদ্ধ করিবার জন্যই এই দুইটি ধর্মকে বিষয়তাবিশেষ বলা হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বাধক যুক্তির উল্লেখ না করিয়া কেবল স্বীয় মত স্থাপন করিবার জন্য যদি যে কোনও ধর্মকে জ্ঞানগতবিষয়তাবিশেষ বলা হয়, তাহা হইলে সর্বত্রই এই নীতি গৃহীত হওয়ার বাধা না থাকিলে জাতি বা অখণ্ডধর্ম স্বীকার করিবার পক্ষেও সুদৃঢ় যুক্তির আবশ্যকতা থাকিবে না। সর্বত্রই জ্ঞানীয়বিষয়তাবিশেষ বলা যাইবে। সুতরাং এই বিষয়টি আরও আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

পরমত আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কারণ বৌদ্ধদর্শনে অতি বিশাল বিচারের দ্বারা নৈয়ায়িক মত খণ্ডন করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীর্তি প্রমাণবার্তিক, ন্যায়বিন্দু, হেতুবিন্দু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই বিষয়ের অতি দুরূহ বিচার করিয়াছেন।

এই পুস্তকে বৌদ্ধমতের কোনও আলোচনা না থাকায় গ্রন্থখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। আশা করি ভবিষ্যতে লেখিকা এই বিষয়ে অবহিত হইবেন।

অতি জটিল একটি বিষয়ের বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুমানরসিক বিদ্বজ্জনের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বাংলাভাষায় দুরূহ ন্যায়শাস্ত্রের একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়া বিদুষী লেখিকা বঙ্গভাষীগণের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ভাষার কাঠিন্য অবশ্যই রহিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের বিষয় সহজ ভাষায় আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার কাঠিন্য আরও একটু পরিহার করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সপ্ততীর্থ
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রামকৃষ্ণ সাধন পরিক্রমা : শ্রীমনোরঞ্জন বসু। প্রকাশনা : শ্রীমতী মীরা বসু, ৫০ বি, হালদারপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬। (জুলাই ১৯৭৮), পৃঃ তেইশ + ১১৪। মূল্য : বারো টাকা।

গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। প্রাক্কথন—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্পর্কে শ্রীভট্টাচার্যের মন্তব্য—"তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে 'মানুষ' গদাধর 'সাধক রামকৃষ্ণে' পরিণত হলেন এবং 'সাধক' রামকৃষ্ণের 'সিদ্ধসাধক লোকগুরু' পর্যায়ে 'উত্তরণ' কী ভাবেই বা সম্ভব হয়েছিল।" শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মানুষ'-রূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ; কেননা আমরা যদি তাঁকে 'মানুষ'-রূপে গ্রহণ করি তাহলে "তাঁর কার্যকলাপ অনুসরণ করি, দৈনন্দিন জীবনে তাঁর উপদেশ অনুযায়ী চলি। সেইজন্যই বোধ হয় ভগবান বারে বারে মানুষ-দেহ গ্রহণ করেন। অথচ আমরা স্বভাবসুলভ আলস্যে প্রতিবারেই মানুষ-দেহধারী অবতারকে খাঁটি ভগবানের পর্যায়ে ফিরিয়ে দিই।"—শেষ বাক্যটি স্ববিরোধী। ভগবান মানুষ-দেহধারী হলেই অবতারপদবাচ্য ; বিপরীতক্রমে বলা যায়, অবতার বলে স্বীকার করলেই ভগবত্তা স্বীকার করতে হয়—এখানে খাঁটি-অখাঁটির প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীভট্টাচার্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধ লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের তিনটি অমর বাণী স্মরণ করেছেন, যা "তাঁর অনন্যসাধারণ মানুষ-সত্তা ও অশেষ কল্যাণকর মানবতা-বোধের পরিচায়ক। বাণী তিনটি হল—(১) 'যত মত তত পথ', (২) 'ভাবমুখে থাক' এবং (৩) 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা।'"—'ভাবমুখে থাক' শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীরূপে গ্রহণ করা যায় কি? বাস্তবিক পক্ষে এটি সমাধি থেকে ব্যুত্থানমুখে লব্ধ জগদম্বার নির্দেশ।—"রামকৃষ্ণ নিজেই এই পথ বেছে নিয়েছিলেন"—এ মন্তব্য যথার্থ নয়। লব্ধসমাধি অথবা জীবন্মুক্ত সাধক বা সিদ্ধপুরুষদের উদ্দেশে 'ভাবমুখে থাক' বলে বা অন্য কোনো নির্দেশ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কেননা সে স্তরে পৌঁছলে সিদ্ধসাধকদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলতে কিছু থাকে না, সবই ভাগবতী ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীভট্টাচার্য রামকৃষ্ণদেবের উক্তি বা অনুশাসন বলে কয়েকটি বাক্য সন্নিবেশ করেছেন—প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তাঁর স্বকৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাষ্য।

'প্রস্তাবনা'র পর গ্রন্থটি তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। 'গদাধর চট্টোপাধ্যায়—কামারপুকুর' ; 'সাধক রামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বর' ; 'লোকগুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস'। লেখক তিনটি পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকে বিভক্ত করে আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর ক্রমোত্তরণের ধারা অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে 'মানুষ'-রূপেই বিচার করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রারব্ধ বা

প্রাক্তনের উল্লেখ করে (পৃঃ ৩৯, ৬২, ৬৮) প্রকারান্তরে অবতারপুরুষরূপে তাঁর স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর কাছে এ ভাবনা স্বভাবতই মর্মপীড়াকর হলেও 'মানুষ' ভাবে লোকগুরুর জীবন ও সাধনার বিশ্লেষণের অবকাশ এবং সার্থকতা আছে। তা ছাড়া যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতাররূপেই গ্রহণ করেছেন তাঁরাও 'নরলীলা নরবৎ' এই ন্যায়ে 'মানুষ' শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন; জিজ্ঞাসু অধ্যাত্মপথিকের কাছে সে বীক্ষা যথার্থ কল্যাণের নিদানই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার বিচারযোগে বিশ্লেষণ অবশ্যই অতি দুরূহ। স্বামী সারদানন্দ পর্যন্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে ঠাকুরের সাধকভাবের পরিচয় দিতে বা বিশ্লেষণ করতে কিছুটা সংকোচ বোধ করেছেন। মানবিক ভূমিকা থেকে ঐ সাধনার বিচার করলেও প্রত্যেকটি সাধনপর্যায় তথা সিদ্ধির সূক্ষ্ম তাৎপর্য সম্পর্কে যথার্থ বোধ কেবল সিদ্ধসাধক বা স্বাধ্যায়বান সাধনব্রতীর পক্ষে সম্ভবপর। বিশেষত শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপক আর সুবিস্তৃত সাধনধারার স্তরবিন্যাস অর্থাৎ বিভিন্ন সাধনার অন্তে আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমোত্তরণ-বিচার এক অসম্ভব ব্যাপার। গ্রন্থকার মুখ্যত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা আর কিছু কিছু সাধনশাস্ত্র অবলম্বন করে ঐ সাধনার বুদ্ধিগত বিচার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কোনো কোনো অংশে তাঁর বিশ্লেষণ বা কোনো কোনো উক্তি বা মন্তব্য উপাদেয় হলেও প্রায় সমগ্র গ্রন্থেই, বিশেষত দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বিশ্লেষণে অগভীরতা, শিথিলতা, আর অসংলগ্নতার নিদর্শন সুপ্রচুর এবং বিষয় সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।

'ভাবমুখে থাক'—এই উক্তিটির কথা আগেই বলা হয়েছে। লেখক মূল গ্রন্থে এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করেন নি, পরিশেষে 'দ্রষ্টব্য' অংশে (পৃঃ ১০৬-১১০) এ সম্পর্কে যে ভাষ্য সংযোগ করেছেন তার অনেক অংশই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ'-বর্ণিত বিশ্লেষণের তরলায়িত বিবৃতি। অবশ্য লেখক স্পষ্টভাবে ঋণ-স্বীকার করেন নি। অন্য অনেক ক্ষেত্রেও ঐ ব্যাপার দেখা যায়। এটি গ্রন্থের একটি বিশেষ ত্রুটি। গ্রন্থমধ্যে চিহ্নযুক্ত বহু অংশ আছে, কিন্তু ক্বচিৎ উৎসনির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত বলে 'দ্রষ্টব্য' অংশে (পৃঃ ১১০) ২২-সংখ্যক মন্তব্য অকস্মাৎ ইংরেজীতে কেন দেওয়া হল? 'প্রস্তাবনা'য় বা প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় ক্রিস্টোফার ঈশারউড-কথিত 'রামকৃষ্ণ ফেনোমেনন'-এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঐ লেখকের নামোল্লেখ করা সংগত ছিল না কি?

কর্মকে কি উচ্চমার্গের সাধন (পৃঃ ৩২) বলা যায়? জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সম্পর্কে মতবিরোধ অবশ্যই আছে; কিন্তু কর্মকে 'জ্ঞানের ছায়া' (পৃঃ ৩৩) কোন্ দিক থেকে বলা হয়েছে? শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন অর্থাৎ ইষ্টদর্শন কি 'মানসিক' স্তরের অনুভব যা সত্যের স্তরে পৌঁছয় না (পৃঃ ৩৪)? "শংকর-বেদান্ত অধ্যাত্ম-শক্তি-পথগামী যতি সম্প্রদায়ের একান্ত কাম্য" (পৃঃ ৪৩)—এ উক্তির তাৎপর্য কী? শাংকর-বেদান্ত অর্থাৎ অদ্বৈতবাদের স্বাধ্যায়-সাধনের ব্যবস্থা কেবল হরিদ্বারে গুরুকুল সম্প্রদায়ে নয়, আচার্য শংকর-প্রতিষ্ঠিত চার মঠে তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত উত্তরাংশে বহু মঠে বা আশ্রমে আছে। "সাধনার দিক থেকে শক্তি ও ভক্তি এ দুটি পদ বিরোধী নয়" (পৃঃ ৩৩)—বিরোধের প্রশ্নই ওঠে কোথা থেকে? যিনি শক্তিসহায়ে অর্থাৎ ভাগবতী অভিব্যক্তি অবলম্বন করে সাধনায় প্রবৃত্ত হন ভক্তিই তো তাঁর মুখ্য অবলম্বন। গ্রন্থকারের কোনো কোনো উক্তি আচার্য শংকরের

অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের বিরোধী। সম্ভবত লেখক শৈব বা শাক্তাদ্বৈত দর্শনের সঙ্গে শাংকরদর্শন মিশিয়ে ফেলেছেন। ভাবাবেগপ্রসূত অনেক উক্তি আপাতদৃষ্টিতে উপাদেয় বলে মনে হলেও তাত্ত্বিক বিচারের দিক থেকে গ্রহণীয় নয়। যেমন—তন্ত্রসাধনায় "ব্রহ্মলোক অতিক্রম করে শিবলোকে অবস্থান, সৃজনীশক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করে পূর্ণতা লাভ। আবার বেদান্তের মহাবাক্যের প্রায়োগিক বা সাধনার দিক হল তন্ত্র।" (পৃঃ ৪৭)—"ভাবসাধনার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে তিনি উঠেছিলেন বস্তুরাজ্যের সূক্ষ্মতম স্তরে; সেখানে প্রত্যক্ষ করলেন শক্তি-মহিমার উৎস জ্যোতিঃ-সমুদ্র।" (পৃঃ ৫১)—"নিঃশ্রেয়স বা অধ্যাত্ম-মুক্তি (আত্মমুক্তিই হোক বা স্বর্গপ্রাপ্তিই হোক), ভারতীয় জীবনে সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।" (পৃঃ ৫৭)

"জনসাধারণ-স্বীকৃত বহু-ঈশ্বরবাদ রামকৃষ্ণ সহানুভূতির চোখে দেখতেন" (পৃঃ ৬৭)—এ উক্তির অর্থ কী? একই পরম তত্ত্বের প্রকাশরূপে বিভিন্ন দেবে ভক্তি বহু-ঈশ্বরবাদ নয়। লেখকের মন্তব্য উনিশ শতকের গোড়ার দিকের খ্রীষ্টীয় মিশনারিদের ভারতীয় ধর্মচেতনা সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সহানুভূতি' বলতে কী বোঝায়? এই সহানুভূতি কি অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর কৃপাকটাক্ষ? তিনি কি দেবাকারে ভাগবত প্রকাশ অস্বীকার করতেন! "সম্ভবত রামকৃষ্ণের অদ্বৈত-বোধ উপলব্ধিগত ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত" (পৃঃ ৬৮)—উক্তিটি পড়লে মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের অপরোক্ষ অদ্বৈতানুভূতি হয়েছিল কিনা লেখক সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করছেন।

"'স্ত্রিয়ঃ সমস্তা [এবম্] সকলা জগৎসু'—একথা শুনে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর কখনও কোন আকর্ষণের ভাব জাগেনি" (পৃঃ ৪০)—লঘূক্তির মতো শোনায়। 'প্রস্তাবনা'য় ষোড়শী-পূজা সম্পর্কে লেখকের একটি মন্তব্য অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়—"বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পূজার অর্থ হল নারীশক্তিকে দৈবী শক্তিতে রূপান্তরিত করা এবং কামকীট দগ্ধ করে দেহাদি কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া।" (পৃঃ সতর) —শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই জানেন যে এর আগেই তিনি শ্রীশ্রীমার সঙ্গে এক শয্যায় থেকে ভাগবতী কথায় ও ভাগবত ভাবে বিভোর হয়ে রাত কাটিয়েছেন। এই ষোড়শী-পূজায় "শিব-শক্তি সামরস্যের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হল।···ভারত তথা পৃথিবীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে রহস্য-পূজার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিখিত হল। ভক্ত সাধকগণ ধর্মজগতে এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথা শুনলেন। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পূজার মধ্য দিয়ে দেব-মানবের ব্যবধান ঘুচে গেল, সাধন রাজ্যে নারী দেবীশক্তিতে রূপান্তরিত হল।" (পৃঃ ৪২)—এই আবেগময় উক্তিটি মনোহর হলেও তথ্য হিসাবে সত্য নয়। ভারতীয় তন্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত লেখকের পক্ষে (গ্রন্থশেষে সংযোজিত গ্রন্থপঞ্জী থেকে জানা যায়) এ ধরনের অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাস শোভা পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগী ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিতের নিজের স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার কথা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পাঠক-মাত্রেই জানেন। "নারী দেবীশক্তিতে রূপান্তরিত হল"—এ মন্তব্য কি শ্রীশ্রীমার উদ্দেশে? ষোড়শী-পূজাই তাঁর দেবীত্বের কারণ!

স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনের 'উত্তরসাধক' কোন্ হিসাবে বলা হয়েছে? লেখক যে সাধনশাস্ত্রের এই শব্দটির তাৎপর্য সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ নন ভৈরবী-ব্রাহ্মণীকে 'কুশলী উত্তরসাধিকা'-রূপে উল্লেখে (পৃঃ ৩৭) তা জানা যায়। এই জাতীয় গ্রন্থে বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের এ ধরনের অপপ্রয়োগ গ্রন্থের মর্যাদাহানি

ঘটায়। "বিবেকানন্দের 'শিবোহং' [এবম্] বা 'সোঽহং'-বাদ শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রতিধ্বনি।" (পৃঃ ৪৭ ; অনুরূপ উক্তি—৬১, ৮১)—এ উক্তির তাৎপর্য কী? 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের মতোই 'শিবোঽহম্' বা 'সোঽহম্' তো অদ্বৈত-বেদান্তের চিরায়ত সিদ্ধান্ত। একে স্বামীজীর মতবাদ বা শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রতিধ্বনি (? মাত্র) বলা যায় কী করে? স্বামী বিবেকানন্দ তথা শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে 'শিবোঽহম্' বা 'সোঽহম্' প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় ছিল, নিছক মতবাদ নয়। 'বিশ্বপ্রেমিক' বিবেকানন্দ কি ঈশ্বরানুধ্যানের জন্যই 'সর্বহারাদের মাঝে' আশ্রয় নিয়েছিলেন (পৃঃ ৮০)? শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানদের পরিচয় প্রসঙ্গে (পৃঃ ৮৪-৮৬) স্বামী ব্রহ্মানন্দের পরিচয়ে কি কেবল 'রামকৃষ্ণ মঠ মিশন সংগঠন'-এর উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হয়? আধ্যাত্মিক শক্তির দিক থেকে তাঁর মহত্ত্বের কথা স্বয়ং স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমে অতুলনীয় সেবাব্রতের কথা লেখক কি জানেন না? বিশেষত যখন মানবিকতার দিক থেকেই সব বিচার করা হচ্ছে, এ বিষয়ে অনুল্লেখ প্রমাদের পর্যায়ে পড়ে।

গ্রন্থশেষে 'দ্রষ্টব্য' অংশে বিস্তারিতভাবে কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনা আছে। ঐ আলোচনার অনেক অংশ মূল নিবন্ধে থাকলে ভালো হত। অনেক উদ্ধৃতিরই উৎসনির্দেশ নেই, যেকথা আগেই বলা হয়েছে।

গ্রন্থটি মূল্যবান কাগজে শোভনভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সুন্দর বাঁধাই। গাঢ় কমলা রঙের প্রচ্ছদপট আর ভিতরে ভূগোলকে দণ্ডায়মান শ্রীরামকৃষ্ণের রেখাচিত্র মনোরম। মুদ্রণে পারিপাট্য থাকলেও মুদ্রণগত ত্রুটি যথেষ্ট আছে—প্রায়ই পীড়াদায়ক। শব্দগত ত্রুটিও আছে। যেমন—অন্তঃস্থল, বিশালাক্ষী, ব্রাহ্মণ্যদেব, পরা-জ্ঞান, পরা-বিজ্ঞান।

উৎসুক পাঠক শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার পরিচায়ক এই গ্রন্থটি স্বভাবতই আগ্রহসহকারে পাঠ করতে প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ এবং বিমুখই হতে পারেন। লেখকের বিশ্লেষণশক্তি আর সাবলীল রচনাভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও পরিমিতিবোধ আর সংগতির অভাবের জন্য গ্রন্থটিতে বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্ব হারিয়ে গেছে।

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী (প্রথম খণ্ড): শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। **প্রকাশক:** মহালয়া প্রকাশনী, ১০৩ লেক টাউন, কলিকাতা ৭০০০৫৫। (১৯৭৯), পৃঃ ৩৬৭+৮, মূল্য : কুড়ি টাকা।

মননশীল ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিশিষ্ট ভাব ও ভাবনায়, জ্ঞান ও সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। নিবন্ধ রচনায় বা ভাষণদানের কালে সেই সকল বিশেষ বোধ ও বোধিতে আমরা উদ্বোধিত হই আমাদের সুপরিচিত প্রবীণ কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর প্রজ্ঞালব্ধ এবং বিবেক-সমৃদ্ধ রসবোধে জাগ্রত হয়ে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নিবন্ধ ও ভাষণগুলি উপভোগ্য।

আলোচ্য সংকলনে দু'ধরনের রচনা সংকলিত। তা গ্রন্থের নামকরণেই প্রকাশিত। প্রজ্ঞাবান প্রবীণ পুরুষের এই উভয়বিধ আলোচনাই জ্ঞানমার্গের এবং যথেষ্ট সমন্ব-উপযোগীও। তিনি যেমন কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে রচনা লিখেছেন তেমনি আবার সেক্সপীয়র, মহাত্মা গান্ধী, বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গেও আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে চারটি রচনা গ্রথিত হয়েছে। শিশিরকুমার ভাদুড়ির উপরও একটি আলোচনা রয়েছে।

'সমাজের পটভূমিতে বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও আশুতোষ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে। 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণে শাস্ত্র এবং যুক্তি', 'বেদান্তের বৈষ্ণব ভাষ্য এবং শাক্ত বৈষ্ণব ভাবধারার সমন্বয়', 'গীতায় গৃহধর্ম ও ভক্তিসাধনা' অথবা 'উভয়লিঙ্গ নির্বাণ' এবং 'প্রেমের স্বরূপ ও রূপ' বিশিষ্ট চিন্তার আলোকেই উদ্ভাসিত রচনা। মৌলিকতার সন্ধান যে-কোনো পাঠকের অনুসন্ধিৎসায়েই ধরা থাকবে। 'ভারতের সংস্কৃতি', 'ঘরের কথা', 'মানব জমি', 'আদর্শ ভক্তের মহিমা', 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি রচনায় কবিমনের চেয়ে সারস্বত সাধক মনের পরিচয়ই বেশি ফুটেছে। তিনি সাহিত্যিকের দায়িত্ব প্রসঙ্গের কয়েকটি রচনা এবং 'বিগত পঁচিশ বৎসরে সামাজিক বিবর্তন' বিষয়ের রচনায় মানব-হিতৈষণার মৌলবিন্দুতে অবস্থান করে যথার্থ কল্যাণব্রতেই মানবসমাজের উন্নতির চিন্তা করেছেন।

কতকগুলি ভাষণ অবশ্য মুদ্রিত রয়েছে যেখানে তাঁর বক্তব্য সমসাময়িক বা পরিবেশ উপযোগী। তবে 'কবিতার ধর্ম ও মর্ম' এবং 'দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে লেখকের বলিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা সকল বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত। মোট তেত্রিশটি রচনার সংকলন গ্রন্থ এটি। নানা ভাবের ও নানা রসের আলোচনা। তবে মৌলভাবে সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম প্রভৃতির মধ্যেই আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনাগুলি অনুবর্তিত হয়েছে।

'সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইল শুদ্ধিজনক কার্য। এই সংস্কৃতি নির্ভর করে মানুষের সভ্যতাজনিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপর।' লেখক 'ভারতের সংস্কৃতি' সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে এমনি বহু শাশ্বত সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। 'ঐহিক জীবনে সংস্কৃতির সাধনায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু সে ভোগ সংকীর্ণ স্বার্থের অন্বেষণ বা পরস্বাপহরণ করিবে না, বৃহত্তর জীবনাদর্শে ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে।' লেখক ঈশোপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাণীই স্মরণ করিয়েছেন।

'ধর্মই সমাজকে ধরিয়া রাখে, হৃদয়বৃত্তিজাত সহানুভূতির দ্বারা এবং বিবেকবুদ্ধিজাত নৈতিক বিধিবদ্ধ মানবিক আদর্শের দ্বারা। ধর্মের ভিত্তি সত্য ও প্রেম এবং লক্ষ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত কল্যাণ। তাই রাজনীতি ও সমাজনীতির সকল বিধি ব্যবস্থা সত্য ও সততার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, তবেই আমরা আমাদের উপেয় বা লক্ষ্য প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারিব, নচেৎ নহে।' সাহিত্যতীর্থের রজতজয়ন্তীবর্ষে 'বিগত পঁচিশ বৎসরে সামাজিক বিবর্তন' প্রসঙ্গের প্রবন্ধে লেখক উপরের সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন—'যে ধর্মকে আমরা মূঢ়তাবশতঃ কদর্থ করিয়া সংবিধান হইতে বিদায় দিয়াছি—সেই ধর্মকেই সংবিধানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিশেষ ধর্মকে নহে—সকল ধর্মকেই সমান সম্মান দিতে হইবে নিরপেক্ষ ভাবে।'

লেখক এক কথায় সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস করেন 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'—এই বৈদিকমন্ত্র। তিনি আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির সদা জাগৃতির প্রার্থনা করেছেন। তিনি শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে কর্মে সাহিত্যে সাধনায় সর্বতোমুখী উন্নতিকেই অভ্যর্থনা জানাতে চান—তাই তাঁর অভিমতগুলি অনেকাংশেই বর্তমানে অভিনন্দন-যোগ্য।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

অমৃত-বাণী : লেখক ও প্রকাশক : শ্রীসুধীরেন্দু রায়, ১২এ, কর্ণেল বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-১৯। (১৩৮৫), পৃঃ ৬৪, মূল্য : চার টাকা।

অধ্যাত্মজগতে ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনার মূল্য অসামান্য। অধিকাংশ লোকই দর্শনের কূট-বিচার পছন্দ করেন না। তাঁহারা সগুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং এই উপাসনার মূল উপকরণ ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনা।

'অমৃত-বাণী' পুস্তকখানি আমাদের ঈশ্বরচিন্তা ও প্রার্থনার খোরাক যোগায়। উপরন্তু প্রার্থনার ভঙ্গিতে পুস্তকখানিতে বিভিন্ন শীর্ষকে তত্ত্বালোচনাও স্থান পাইয়াছে। উহা যেন প্রেমময়ের উদ্দেশে আমাদের নিজেদেরই প্রার্থনা

যে সকল পাঠক তাঁহাদের মনকে ভগবন্মুখী করিতে চান, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিবে।

'ধ্যান', 'প্রার্থনা', 'কান্না', 'আবাহন' 'সমর্পণ' ইত্যাদি বিভিন্ন শীর্ষকে ভগবদুদ্দেশে লিখিত এই পুস্তকখানি আবেগমধুর গদ্যময় 'গীতাঞ্জলি'তে পরিণত হইয়াছে।

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ। শোভন প্রচ্ছদ। কাগজও উত্তম। ভাষা প্রাঞ্জল ও সরস। ছাপার ভুল নজরে পড়ে না।

সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ধর্মার্থীমাত্রেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। ইহার বহুল প্রচার কামনা করি

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ

ভ্রম-সংশোধন

ফাল্গুন ১৩৮৬ সংখ্যার পৃষ্ঠা ৫৭, উত্তরার্ধের ৩২তম পঙ্‌ক্তিতে 'মুড়ি ঢালিয়া' স্থলে 'মুড়িতে জল ঢালিয়া' হইবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়)—**পুনর্বাসনকার্য :** বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে আরামবাগ মহকুমার (হুগলী জেলা) জগৎপুরে নূতন জমিতে গৃহনির্মাণকার্য অব্যাহত আছে।

(খ) আসাম-সঙ্কটে ত্রাণব্যবস্থা : গৌহাটী কেন্দ্রের সহযোগিতায় কামরূপ জেলার নলবাড়ীর বিশেষ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, যথা—মোকালমা, জলখানা, সাথ্যেবাটী, বারিকাডাঙ্গা, রাঙাফালী এবং নাহারবাটীতে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু করা হইয়াছে। ১৭১৭ সেট (প্রতি সেটে—১টি হাঁড়ি, ১টি কড়াই, ২টি রান্নার হাতা, ১টি থালা, ১টি গেলাস এবং ১টি মগ) অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্রাদি; ১৭১৭টি হ্যারিকেন লণ্ঠন, ১৫০০টি ধুতি, ১৫০০টি শাড়ি, ১৪২২টি চাদর, ১৩,৮০০টি শিশুদের পোশাক এবং ২০০০টি পশমী কম্বল সহায়সম্বলহীন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরিত হয়।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধ বিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

উৎসব

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম আবির্ভাবতিথি উৎসব গত ১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রায়

২৮,০০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে মঠপ্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন স্বামী বন্দনানন্দজী ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। ২৪শে ফেব্রুআরি সারাদিন-ব্যাপী সাধারণ উৎসবে প্রায় ৪০,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৮ই ফেব্রুআরি হইতে ২২শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮ই প্রভাতে বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ এবং মধ্যাহ্নে ভক্তনরনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় স্বামী অমলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দুইদিন সন্ধ্যায় রামায়ণগান এবং একদিন দক্ষিণেশ্বর-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজারেরও বেশী ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ ধারণ করেন।

বিবিধ

গত ৪ঠা ফেব্রুআরি ১৯৮০, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ **শিলচর** কেন্দ্রের নবনির্মিত ভোজন-কক্ষের উদ্বোধন করেন।

গত ৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবননারায়ণ সিং **পুরুলিয়া** বিদ্যাপীঠের সংগ্রহশালার নূতন ভবনের উদ্বোধন করেন। এই অনুষ্ঠানে বহু ব্যক্তির সমাগম হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ১০ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত এবং ১৪ই ডিসেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল:

কথামৃত—

ঠাকুর বলছিলেন সংসারে থেকেও কিভাবে ঈশ্বরলাভ করা যায়। সেই প্রসঙ্গে জনকরাজার উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে সংসার করলে সংসার দুঃখের আগার বলে মনে হয় না। কিন্তু এই অনাসক্তি সাধনলভ্য—সহজে হয় না। এর জন্য জনকরাজাকে নির্জনে অনেক তপস্যা করতে হয়েছিল। সাধনজীবনে এই নির্জনবাসের প্রসঙ্গ আগেও এসেছে। মাষ্টার-মশায়ের 'ঈশ্বরে কি করে মন হয়?' (১।১।৫) এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।' দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়েছিলেন, 'যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।' এখানেও সেই একই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। 'প্রথমাবস্থায় বেড়া দিতে হয়; গুঁড়ি হলে আর বেড়ার দরকার থাকে না। তখন গুঁড়িতে হাতী বেঁধে দিলেও কিছু হয় না।'

অধ্যাত্মজীবনের সূচনায় এই নির্জনতা অপরিহার্য। এতে নিজের মনকে ঠিক ঠিক বোঝা যায়—আত্মসমীক্ষা, বিবেক-বিচার সম্ভব হয়। জনকরাজাও প্রথমজীবনে কত তপস্যা করেছেন! বৃহদারণ্যক উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে

যাজ্ঞবল্ক্য জনককে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করছেন জনকের আত্মবিদ্যাবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে। এইভাবে জনক নিজের জীবন গড়ে তুলেছেন। তার ফলে জগতের অনিত্যত্বে ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন চারাগাছ বড় হয়ে গিয়েছে, হাতী বেঁধে রাখলেও কিছু হবে না।

ঠাকুর আরেকটি উপমা দিচ্ছেন : বিকারের রোগীর কাছেই যদি তার লোভের জিনিস থাকে, তবে আর রক্ষা নেই, সেইজন্য তাকে ঠাঁই-নাড়া করতে হবে। সংসারী মানুষ ভোগোন্মত্ত স্বাভাবিকভাবেই, আর যদি সদাসর্বদা ভোগের মধ্যে থাকে, তবে বাঁচবে কি করে? তাই কামকাঞ্চন ও ভগবদ্‌বিশ্বাসের পরিপন্থী বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে

ঠাকুর বলছেন, এইভাবে নির্জনে সাধনভজন করে 'বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়।' বিবেক বৈরাগ্য ভিন্ন অধ্যাত্মজীবন গঠিত হতে পারে না। মানুষের যে গতানুগতিক জীবনযাত্রা, সেখানে তো পশুর মতোই তার চালচলন। 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।' আহার, নিদ্রা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষ আর পশুতে কোনই তফাত নেই। পার্থক্য শুধু একটি ক্ষেত্রে—সেটি ধর্মাচরণে। মানুষ যদি ধর্মহীন হয়, তাহলে সে পশুরই সমান। এই ধর্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিবেকবৈরাগ্যের উপর। কোন্‌টা সৎ, কোন্‌টা অসৎ—এই বিচারের নাম বিবেক। ভগবানই সৎ, শাশ্বত, চিরকালীন নিত্যবস্তু আর জগৎ-সংসার অসৎ, মিথ্যা, অনিত্য—এটা বুদ্ধিতে পাকা করে নেওয়া। বিবেক থেকেই বৈরাগ্য আসে। বৈরাগ্য কী?—বিষয়ে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাই বৈরাগ্যের কথার সুর ধরেই ঠাকুর বলছেন, যেমন অনিত্যবস্তুতে বিরাগ দরকার, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চাই নিত্যবস্তু যে ভগবান, তাঁতে অনুরাগ। তাঁকে ভালবাসলে অন্য সব আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কই সম্পর্ক, অন্য সব সম্পর্ক অনিত্য। যখন মানুষের দেহত্যাগ হয়, তখন পুত্র-পরিজন কোথায় থাকে? কেউ কি সঙ্গে যায়? বরঞ্চ সেই যে গানে আছে—'সেই প্রেয়সী দিবে ছড়া অমঙ্গল হবে বলে।' কী নির্মম সত্য! যাদের আমরা এতো আপনার ভেবেছি, যাদের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তারাই অমঙ্গলের ভয়ে জল ছড়ায়! শরীরের সঙ্গে প্রাণেরই সম্বন্ধ থাকে না, তা আত্মীয়স্বজন! এই তো সংসার!! এই বিবেকবোধ জাগিয়ে তুলে ভগবানকেই একমাত্র সত্যবস্তু জেনে তাঁতে সব ভালবাসা অর্পণ করতে হবে। ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছেন গোপীদের যে কৃষ্ণে রতি সেই অনুরাগ আনতে হবে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে আমরা দেখি, বৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনে আকুল হয়ে ছুটে যাচ্ছেন, সংসার—আত্মীয়-পরিজন কুলমান সব ভুলে। এই যে ব্যাকুলতা, এই টান আনতে হবে ভগবানের জন্য। একথা বলেই এই ভাবের একটি গান ঠাকুর গাইলেন, 'বংশী বাজিল ঐ বিপিনে…আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা…বাঁশী আমার বাজে হৃদয়মাঝে' ইত্যাদি। এ টান বাইরের তুচ্ছ টান নয়, এটি একান্ত আন্তরিক। হৃদয়ের সবকিছু আলোড়িত করে সেই বাঁশীর আকর্ষণ ভক্তকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ঈশ্বরের দিকে। ভাবের আবেগে এই গান গাইতে গাইতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুর কেশবদের বলছেন, 'রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও; ভগবানের জন্য কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।'

একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কেশবপ্রমুখ

ব্রাহ্মদের ধারণা ছিল রাধাকৃষ্ণের এই দিব্যলীলা অশ্লীল। তাঁদের মতে এই পরপুরুষের প্রতি টান কুরুচিপূর্ণ। তাঁদের সেই ভাব মনে রেখেই ঠাকুর বলছেন, 'রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো', কিন্তু ঈশ্বরের জন্য এই যে আকর্ষণ, তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে লাভ করবার জন্য সব কিছু ছেড়ে তাঁর প্রতি এই যে টান—এইটি নিতে দোষ কি? আমাদের ভক্তিশাস্ত্রেও ভগবানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে উপাসনার কথা বলা হয়েছে—পঞ্চ ভাবসাধনার কথা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এগুলি উত্তরোত্তর উচ্চতর ভাবের সাধন এবং গভীরতর মাধুর্যবিকাশের ক্ষেত্র। শেষ ভাব, যেটি মধুরভাব, তাতে ভগবানকে কান্তভাবে সাধনার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে তিনিই একমাত্র পুরুষ—পুরুষোত্তম, আর সকলেই প্রকৃতি। বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামী যখন স্ত্রীলোক বলে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না, তখন মীরাবাঈ বলে পাঠালেন বৃন্দাবনে এক কৃষ্ণ ছাড়া আরও কেউ পুরুষ আছেন নাকি? সকলেই তো তাঁর সেবিকা! এইটি মধুর ভাবের কথা। স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক শুধু তাই নয়, পঞ্চদশীতে আছে, 'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্'—পরপুরুষে আসক্তা কুলরমণী ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্তরে সর্বদাই সেই পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ আস্বাদন করে। এই হচ্ছে তীব্র ব্যাকুলতা। বহু বৈষ্ণব সাধক এই ধরনের মধুরভাবও অবলম্বন করে থাকেন। ব্রাহ্মভক্তদের দৃষ্টি ঠাকুর এই ব্যাকুলতার দিকেই আকর্ষণ করছেন। (১।২।৬)

গীতা—

তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলেছেন। বলেছেন কামনাই মানুষের মহাশত্রু, সকল অনর্থের মূল; কামনার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সব বৃত্তি নিরুদ্ধ করে আত্মসাক্ষাৎকার করা। তাহলেই কামনার হাত থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে আর সেইভাবেই কর্মযোগের সাধনেও সিদ্ধি আসবে। এখন অর্জুনের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে, এই যে কর্মযোগপ্রসঙ্গ এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ করলেন এটা তিনি পেলেন কোথায়? কারণ প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রাদিতে কোথাও স্পষ্ট করে এসম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সুতরাং এবিষয়ে তিনি জানলেন কি করে? শ্রীভগবান অর্জুনের মনের এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আরম্ভ করলেন একটা নতুন বিষয়।

অর্জুনকে তিনি বললেন, এই যে অক্ষয় নিষ্কাম কর্মযোগ, এটি তিনিই প্রথম বলেছিলেন সূর্যকে। যে বংশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব সেই বংশের আদিপুরুষ বিবস্বান্, তাঁর অপর নাম সূর্য। তাঁকেই তিনি প্রথম এই নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি (সূর্য) আবার তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে, যাঁর কথা চণ্ডীতে আছে, তাঁকে এই যোগের উপদেশ দেন। মনু আবার তাঁর সন্তান ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ শিক্ষা দেন। এইভাবে বংশপরম্পরাক্রমে ভগবানের উপদিষ্ট যোগধারা চলে আসছে। (৪।১)

হে শত্রুনিসূদন অর্জুন, এইভাবে এই নিষ্কাম কর্মযোগ রাজর্ষিরা—যাঁরা রাজা হয়েও সত্যদ্রষ্টা, তাঁরা বিদিত ছিলেন এবং অভ্যাস করতেন। কালক্রমে চর্চার অভাবে সেই যোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য একেবারে যে ছিল না তা নয়, ঈশোপনিষদে এর সামান্য মাত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং'—ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে সবই ব্রহ্মের দ্বারা আবৃত। এইটা জেনে, 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং

সমাঃ'—শতবর্ষ বেঁচে থাকতে উৎসুক যিনি তিনি কাজ করেই বেঁচে থাকবেন। গীতার বক্তব্য অবশ্য একটু অন্যরকম—রাজর্ষি জনক যেমন বলছেন তাঁর সমগ্র রাজ্য মিথিলা যদি পুড়েও শেষ হয়ে যায় তাহলেও তাঁর কিছু হবে না; এই যে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা—এইটি যোগ। রাজর্ষিরা এটি অভ্যাস করতেন। কিন্তু কালক্রমে চর্চা না করার ফলে এটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। (৪।২)

তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তোমার যাতে কল্যাণ হয় সেইজন্যই সেই পুরাতন যোগকথা যা রাজর্ষিরা শুনেছিলেন, তাই তোমাকে বললাম। এটি অত্যন্ত গুহ্যতত্ত্বকথা, গূঢ় রহস্য। সকলে জানে না কিভাবে এটি সাধন করতে হয়। সংসারে মানুষ জানে না কিভাবে সংসার করতে হয়, কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। তোমাকে স্নেহ করি বলেই তোমাকে বললাম এই রহস্যবিদ্যা, যাতে তুমি সংসারে লিপ্ত না হয়েও কর্ম করতে পারো। যা আমি নিজে সূর্যকে দিয়েছিলাম তাই আজ দীর্ঘকাল পরে তোমাকে দিলাম। (৪।৩)

এই অপূর্ব কথাটি শুনে সাধারণ মানুষের মতোই অর্জুন একটি প্রশ্ন করে বসলেন। যদিও তিনি সুকৃতি, উচ্চকোটির ভক্ত, নারায়ণের সখা, তবুও তিনি বললেন, 'তোমার জন্ম তো অনেক পরে হয়েছে, আর সূর্যের জন্ম বহু শত বৎসর আগে, তাহলে সৃষ্টির আদিতে তাঁকে তুমি উপদেশ করলে কি করে? এটা আমি কি করে বুঝবো? (৪।৪)

এইখানে ভগবান একটি নতুন বিষয়ের উপর আলোকপাত করছেন। আমাদের যে আর্যধর্ম বা বৈদিকধর্ম তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জন্মান্তরবাদ। তাতে এই বিশ্বাসই করা হয় যে, মানুষ বহু বার জন্মগ্রহণ করে এক এক দেহ ত্যাগ করার পরে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণেও আনতে পারে। তাদের বলে জাতিস্মর। মনস্তত্ত্বের মতে parapsychology'র সাহায্যে আমরা এমন কিছু কিছু ঘটনার কথা জানতে পারি। আমরা এখনও মাঝে মাঝে এমন দু' চারটি ঘটনার কথা শুনি বা কাগজে পড়ি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর শিষ্যদের কারও কারও জীবনের পূর্ব ঘটনা জানতে পেরেছিলেন এবং পরে কি কি ঘটবে তাও বলে দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের এই পুনর্জন্মবাদ এবং ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গের অবতারণা আমরা এবারে দেখতে পাবো।

অর্জুনের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এখন বলছেন, আমাকে এবং তোমাকে এর আগে আরও বহু শরীর ধারণ করতে হয়েছে। আমি সেই সব জন্মের কথা জানি। কিন্তু তুমি সে সব কথা জান না। (৪।৫)

কেন তিনি জানেন এবং কেন অর্জুন জানেন না—সেই কথা বলছেন। তাঁর নিজের মহিমার কথা—অবতারতত্ত্বের কথা বলছেন। যেটি গীতাতে একটি নতুন তত্ত্ব। আচার্য শংকর এ প্রসঙ্গে বলছেন, 'ধর্মাধর্মাদিপ্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ'—ধর্ম ও অধর্ম দুটি প্রতিবন্ধক কারণ অর্জুনের মধ্যে রয়েছে, অজ্ঞান বা অবিদ্যা দ্বারা তাঁর জ্ঞানশক্তি আবৃত হয়ে রয়েছে, তাই তাঁর পূর্বজন্মকথা জানতে পারছেন না। কিন্তু ভগবান 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ'—তিনি সনাতন পুরুষ, সকল মালিন্যবর্জিত, সর্বপ্রকার জ্ঞানের আকর, সকল বন্ধনের ঊর্ধ্বে—এই তাঁর স্বভাব; তাঁর জ্ঞানশক্তি এইজন্য অনাবৃত, মায়াধীশ তিনি—মায়া তাঁর অধীন, অবিদ্যা তাঁকে আবৃত করে না। এই কথাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেছেন—'মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'—প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়াশক্তির অধীশ্বর বলে জানবে। শ্রীকৃষ্ণের

জ্ঞান সকল কালে অবাধিত; সকল কালের, সমস্ত জন্মের কথাই তাঁর জানা আছে। তাঁর পরিচয় তিনি নিজেই দিচ্ছেন—তিনি বলছেন, তিনি জন্মরহিত, অবিনাশী, সকল জীবের ঈশ্বর হয়েও নিজের প্রকৃতিকে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে বশীকৃত করে সেই নিজ মায়ার দ্বারাই দেহধারণ করেন। তাঁর স্বরূপ তিনি প্রকাশ করছেন, কেন অন্য জীবের থেকে তিনি পৃথক্, কোথায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। সাধারণ জীবের মত তিনি ধর্মাধর্মের অধীন নন। আচার্য শংকর এপ্রসঙ্গে বলছেন—'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবান্ ইব ভবামি, জাত ইব, আত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ।'—ভগবান নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে অর্থাৎ তাকে বশীভূত করে সম্ভূত হন অর্থাৎ আত্মমায়ার দ্বারা যেন দেহধারণ করেন, যেন জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু 'লোকবৎ পরমার্থতঃ' নয়। 'লোকবৎ পরমার্থতঃ' নয়—একথাটির তাৎপর্য কী? এর তাৎপর্য হচ্ছে: সাধারণ মানুষ মায়াধীন বলে, তাদের জ্ঞান আবৃত থাকে এবং তারা মনে করে যে, তারা সত্যিসত্যিই জন্মগ্রহণ করেছে, সত্যিসত্যিই দেহধারণ করেছে। কিন্তু ভগবান মায়াধীশ বলে, তাঁর জ্ঞান কখনও আবৃত নয় এবং সেইজন্যই তিনি সর্বদা জানেন যে, তাঁর জন্ম, তাঁর দেহধারণ পারমার্থিক নয়—মায়িক। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের ও ভগবানের দেহধারণ উভয়ই মায়িক, কিন্তু পার্থক্য এই যে, ভগবান মায়াধীশ বলে, নিজ মায়াকে বশীভূত করে তিনি দেহধারণ করেন এবং তিনি অলুপ্তজ্ঞানশক্তি বলে, তাঁর সর্বদাই এই জ্ঞান থাকে যে, তাঁর দেহধারণ পারমার্থিক নয়। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকেরা মায়াধীন বলে মায়াবশীভূত হয়েই নিজ নিজ পাপপুণ্য কর্মের ফলে দেহধারণ করে এবং তারা আবৃতজ্ঞানশক্তি বলে সর্বদাই মনে করে যে, তাদের জন্ম পারমার্থিক। (৪।৬)

*

গত ১৭ই ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথির পূর্বদিন সকালে উদ্বোধন হইতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রায় বেলঘরিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী আশ্রম, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, উদ্যানবাটী, কাশীপুর বিবেকানন্দ চক্রগোষ্ঠী, বাগবাজার ও বেলেঘাটা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, সারদা সংসদ, শ্যামপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সংঘ, কুমারটুলি রামকৃষ্ণ-অনুধ্যান সমিতি, করুণাময়ী কালীকীর্তন সমিতি, বিবেকানন্দ সেবা সংঘ (সিমলা), বিবেকানন্দ শিশু সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যার্থী ও ভক্তবৃন্দ এবং বাগবাজার ও উত্তর কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী অসংখ্য ভক্ত পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে আরম্ভ হইয়া এই শোভাযাত্রাটি দেশবন্ধু পার্কে শেষ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত পট ট্রাকে ও টেম্পোতে বাহিত হয়। যুবকেরা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি এবং বালকেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে সাজাইয়া স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া লইয়া যায়। বহু বাণী ও পতাকায় শোভিত, ব্যাণ্ড-বাদ্য ও কীর্তনে মুখরিত, ধূপের গন্ধে সুরভিত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জয়ধ্বনিতে মহিমান্বিত সমগ্র শোভাযাত্রাটি সারা পথ এক আনন্দ-উৎসবময় পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। সমবেত প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত নরনারী, বালকবালিকা এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের এই সুশৃঙ্খল শোভাযাত্রাটি সমগ্র পরিক্রমাপথের অগণিত দর্শকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্থানীয় পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি সর্বক্ষণই সহযোগিতা করে। শোভাযাত্রাশেষে দেশবন্ধু পার্কে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করেন। সমবেত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবিধ সংবাদ

প্রয়াত রমেশচন্দ্র

গভীর দুঃখের বিষয়, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ১১ই ফেব্রুআরি, ১৯৮০ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তাঁহার নিউমোনিয়া হয়। নিউমোনিয়ার উপশম হইলেও হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ দেখা দেয় এবং হৃদ্‌রোগেই তাঁহার জীবনাবসান হয় নিউ আলিপুরে কন্যাগৃহে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল একানব্বই বৎসর, দুইমাস।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ফরিদপুর জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র যৌথ পরিবারে রমেশচন্দ্রের জন্ম। উক্ত গ্রামের মাইনর স্কুলে তাঁহার ছাত্রজীবনের শুরু। তাহার পর কলিকাতা, ঢাকা, হুগলী ও কটকের নানা স্কুলে পড়িয়া ১৯০৫ সালে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতা রিপণ কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করিয়াও বৃত্তি পান। ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্স সহ স্নাতক হন এবং এই কলেজ হইতেই ১৯১১ সালে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯১৩ সালে অক্ষকুষাণ আমল সম্পর্কে থিসিস লিখিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান এবং ঐ সালেই ঢাকায় গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের লেকচারার হন এবং সাত বৎসর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। রমেশচন্দ্রের মতে এই সাত বৎসরই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের মূল ভিত্তি। এই সময়ে বহু প্রখ্যাত পত্রপত্রিকায় তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল প্রবন্ধের একটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গ্রিফিথ পুরস্কারে সম্মানিত করেন। Corporate Life in Ancient India—এই বিষয়ক গবেষণার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এচ্‌. ডি. উপাধি লাভ করেন।

১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। তাঁহার উদ্যোগে সেখানে একটি গবেষণা-কেন্দ্র গঠিত হয়।

উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য রমেশচন্দ্র ১৯২৮ সালে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, লাইডেন, প্যারিস, ইটালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, আন্নাম, ক্যাম্বোডিয়া, শ্যাম, মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এক বৎসর ধরিয়া নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন।

প্রথমে অধ্যাপক ও পরে (১৯৩৭ খ্রীঃ) উপাচার্য হিসাবে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ২১ বৎসর (১৯২১—১৯৪২) যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে তিনি বারাণসী, বরোদা, নাগপুর, শিকাগো ও পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ History and Culture of the Indian People গ্রন্থটি তিনি প্রায় ৩২ বৎসর ধরিয়া অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের সহিত সম্পাদনা করেন। ইহার অধিকাংশ অধ্যায় তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র বলিতেন, ইতিহাসচর্চার দিক হইতে ইহাই তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কার্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি স্বদেশের ও বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সুদীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন—সভাপতি, উপসভাপতি বা সদস্যরূপে। ভারতেতর দেশে বহু কমিশন ও কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করিতে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ঐ কার্য করিতে সম্মত হইলেও নীতিগত মতানৈক্যের ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ সরকারী কার্য করেন নাই। স্বতন্ত্রভাবে নিজেরই দায়িত্বে তিনি তিন খণ্ডে History of the Freedom Movement in India রচনা করেন। গবেষণার ফলে তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, প্রকৃত ঐতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রকাশ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

রমেশচন্দ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম: বাংলা দেশের ইতিহাস (৪ খণ্ডে), জীবনের স্মৃতিদীপে, Hindu Colonies in the Far East, Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, History of the Freedom Movement in India (in 3 Vols.), Corporate Life in Ancient India, History of Bengal—Vol. I, Outlines of Ancient Indian History and Civilization, On Ram Mohun Roy, Classical Accounts of India.

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা তিন-শতাধিক।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তিনি সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৭০ সাল হইতে আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের পরিচালক-মণ্ডলীর উপসভাপতি ছিলেন। মিশনের এই শাখাকেন্দ্র হইতে প্রকাশিত 'The Cultural Heritage of India' গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন এবং চতুর্থ খণ্ডটি তাঁহার একটি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। এই কেন্দ্রের 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থটিও তাঁহার প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন দীর্ঘকাল।

বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত (১) 'Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume'-এর তিনি ছিলেন সম্পাদক এবং (২) 'Parliament of Religions' গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক।

লেখক হিসাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সহিত তিনি বিগত ৪২ বৎসর ধরিয়া যুক্ত ছিলেন। যদিও তাঁহার প্রবন্ধের সংখ্যা বেশী নহে, তথাপি প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাঁহার মনীষার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, দেশবরেণ্য এই নির্ভীক সত্যান্বেষীর উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

শ্রীসন্তোষকুমার দত্তের সংযোজন:

আচার্য রমেশচন্দ্রকে আমি প্রথম দেখি এবং তাঁর ভাষণ শুনি বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকীর নানা অনুষ্ঠানে—কখনো বেলুড় মঠে, কখনো কাশীপুর উদ্যানবাটীতে, কখনো বা গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি যখন সভাপতি ছিলেন, তখন তাঁর অনেক ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যারোহণ-ত্রিশতাব্দী-সমারোহ সমিতি (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে আয়োজিত সভায় অনেক বিশিষ্ট বক্তার বক্তৃতার মধ্যে

আচার্য রমেশচন্দ্রের শিবাজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-ভাষণটি আমার মন কেড়ে নেয়। হিন্দুধর্মে ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা এবং মারাঠা জাতিকে একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা—শিবাজীর এই দুটি অবিস্মরণীয় কীর্তির তিনি সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষণটি টেপ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল

আচার্য সুনীতিকুমারের ৮৬তম জন্মোৎসব হচ্ছে তাঁর বাড়িতে—'সুধর্মা'য়। গড়িয়াহাটের মোড় থেকে রজনীগন্ধার মালা নিয়ে গেছি তাঁকে প্রণাম জানাতে। গিয়ে দেখি অনেক মনীষীর মধ্যে আচার্য রমেশচন্দ্রও রয়েছেন। আচার্য সুনীতিকুমার বললেন, 'যাঁরা আশি পেরিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে একটা ফটো তুললে হয়।' তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য আমি যখন একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে এলাম তখন দেখি আচার্য রমেশচন্দ্র চলে গিয়েছেন—তিনি অসুস্থ ছিলেন। অগত্যা আচার্য সুনীতিকুমার আর তাঁর বাল্যবন্ধু রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফটো তোলা হয়। পরে আমি যখন সুনীতিবাবুকে সেই ফটো দেখাই, তিনি আনন্দিত হয়ে তা গ্রহণ করলেও আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'কী ভালই না হত, যদি রমেশবাবু এই সঙ্গে থাকতেন!—আমার খুব খারাপ লাগছে এই ফটোতে তাঁকে না পেয়ে।' এমনি ছিল তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব!

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে School of World Religions-এর উদ্বোধন হচ্ছে। উদ্বোধন করবেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী। সভাপতি আচার্য রমেশচন্দ্র। সে-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তাঁদের ভাষণ-দুটি টেপ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত করার আয়োজন করেছেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী ইনস্টিটিউট অব কালচারের foyer-এ। আয়োজন হয়েছে চা-চক্রেরও। আমন্ত্রিতদের মধ্যে আছেন লেখকবৃন্দ, মুদ্রক ও শুভানুধ্যায়ীরা। উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যমণি আচার্য রমেশচন্দ্রের শ্রীকরে বইখানির প্রথম কপি তুলে দিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী। বিবেকানন্দ-সাহিত্যগোষ্ঠীর সঙ্গে আচার্যের কথোপকথনের অংশ আমার নিত্যসঙ্গী টেপ রেকর্ডারে ধরা পড়ে যায় এই সুবাদে

আচার্য রমেশচন্দ্রের ৯০তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে ইনস্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল স্টাডিজের উদ্যোগে তাঁদের ভবনে। আমি সেই উৎসবে উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি টেপ করেছিলাম। সেটি আমার পরম প্রাপ্তি। সেদিন গুণমুগ্ধ অন্যান্য অনুরাগীদের সঙ্গে আচার্যকে ভক্তিবিনম্র প্রণতি জানাতে পেরেছিলাম—এটিও কম প্রাপ্তি নয়!

আচার্য রমেশচন্দ্র ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর (প্রাক্‌সন্ন্যাসজীবনে সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য) অন্তরঙ্গ বন্ধু। এক সঙ্গে তাঁরা এম. এ. পড়েন, এক সঙ্গে মেসের একই ঘরে দু' বছর কাটান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ইতিহাসের অধ্যাপক শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তী কালে স্বামী কৈলাসানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ) ছিলেন তাঁর সহকর্মী।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু।

রমেশচন্দ্রের সহধর্মিণী বেলুড়ে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং প্রবাসেও কথামৃতাদি গ্রন্থ তাঁর নিত্য পাঠ্য ছিল। রমেশচন্দ্রের লেখায় এর প্রমাণ রয়েছে।

'উদ্বোধনে' প্রকাশিত রমেশচন্দ্রের রচনাগুলি আমাকে মুগ্ধ করেছে, অশেষ সাহায্য করেছে

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মাহাত্ম্য যতটুকু আমার ক্ষমতায় কুলায় অনুধাবন করতে। তাই তাঁর সেই অমূল্য রচনাবলী থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতোই আমার এই স্মৃতি-তর্পণ শেষ করছি :

"সকলের উপরে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] বড় দান এই যে আজকালকার জড়বাদের যুগে তিনি অধ্যাত্মজ্ঞানের উচ্চ আদর্শ জীবন্তভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ঐহিক সম্পদ ও বৈভবের ঊর্ধ্বে যে মানুষের চরম ও পরম কামনার জিনিষ আছে, মানুষের আত্মা যে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির প্রয়াসী এবং এই মুক্তিই যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ সাধনা এই চিরন্তন সত্যের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।…ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ, সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়, সাংসারিক জীবনের সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয় এই সমুদয় গূঢ়তত্ত্ব সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের নিকট বিবৃত করিয়া তিনি আমাদিগকে উচ্চতর এক নূতন জগতের সন্ধান দিয়াছেন।…উপনিষদ ও বেদান্তের উচ্চ আদর্শ কিরূপে সহজ জীবনযাত্রার পথে অনুসরণ করা যায় তিনি আমাদিগকে তাহা শিখাইয়াছেন।" ('যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংস', উদ্বোধন, ৩৮।২৭৭-৭৮)

"স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জগতে যে-সমুদয় জাতি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম। এই বিশেষত্বকে বাদ দিলে জাতি বাঁচিবে না—বাঁচিয়াও কোন লাভ নাই। সুতরাং এই ধর্মের যাহা মূলতত্ত্ব, সেই অধ্যাত্মবাদের উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব—অন্য কোন ভিত্তির উপর সম্ভব নয়. আজিকার দিনে স্বামীজীর এই উক্তিটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে হইবে।" ('স্বামীজীর সমন্বয়-চিন্তা', উদ্বোধন, বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক সংখ্যা, পৃঃ ৫৩-৫৪)।

"স্বামী বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন—সেই অভাব না ঘোচাতে পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব ঘোচাতে হলে প্রথমেই আমাদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার ও পরিবর্তন আবশ্যক বলে আমি মনে করি।… আমার বক্তব্য কেবল এই যে, আমরা যেন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি—আমরা যে প্রতিদিন স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছি তার ফলেই আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা। এই কথাটি মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খুঁজতে হবে। তা ছাড়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার অন্য সরাসরি বা সোজা কোন রাজপথ নেই।" ('বর্তমান সমস্যা', উদ্বোধন, ৭২।৪৮৪)।

"আমেরিকার অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে, ভারতবাসী মাত্রেই স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। তাই এই শ্রেণীর আমেরিকানরা ভারতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই এ সম্বন্ধে তাঁদের কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে চান। কিন্তু অধিকাংশ আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়—শতকরা ৯৯ জন বললেও অত্যুক্তি হবে না—এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; কিছুই বলতে পারেন না।…এ বিষয়টি ভারত সরকারের কয়েকজনকে বলেছি এবং এ প্রস্তাবও করেছি যে, সরকার যে শত শত ভারতীয় যুবককে বৃত্তি দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা করবার জন্য আমেরিকায় পাঠান তাদের সাধারণ-ভাবে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভের যেন ব্যবস্থা করেন। কোন ভাল লোককে দিয়ে দশ-বারোটি বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করলে এবং ২।৪ খানা সহজবোধ্য বই

পড়বার নির্দেশ দিলেই এ কাজটি হতে পারে।" ('আমেরিকায় বিবেকানন্দ-স্মৃতি', উদ্বোধন, ৭০।৪৮০)।

কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাতষট্টিতম অধিবেশন গত পয়লা ফেব্রুয়ারি (৯৮০) হইতে পাঁচুই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এবারের অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ছিলেন পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীঅজিত কুমার সাহা। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভারতের শক্তিনীতি'।

পয়লা ফেব্রুয়ারি বেলা এগারটায় বেদগান ও রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। প্রায় দুই হাজার ভারতীয় বিজ্ঞানী ব্যতীত বাংলাদেশ, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জারমানি, হাঙ্গেরি, জাপান, কোরিয়া, পোলাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন ও গ্রেট ব্রিটেন থেকেও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যোগদান করেন এই অধিবেশনে। তাঁদের সকলকে স্বাগত জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে উপাচার্য ডঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী।

সাধারণ সভাপতি অধ্যাপক সাহা তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে রাজনীতিবিদ্দের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, জ্বালানী শক্তির ব্যাপারে যথোচিত গুরুত্ব না দিলে রাজনীতিকরা জনগণের বিশ্বাস হারাবেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে শক্তি ও তার ব্যবহার সম্পর্কে সৌরশক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় দেখান হয়।

ছউই ফেব্রুআরি দেশের ও বিদেশের বিজ্ঞান প্রতিনিধিদের বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, বৌদ্ধ বিহার, নাখোদা মসজিদ, জৈন মন্দির, বসুবিজ্ঞান মন্দির, এশিয়াটিক সোসাইটি, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখান হয়।

উৎসব

পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, উষা-কীর্তন ও ভজন-গান হয়। পরে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী-পাঠ, ভোগ ও আরতির পর মধ্যাহ্নে দুই হাজার ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যারতির পরও ভজন-গান ও শ্রীশ্রীমায়ের লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী স্বানুভবানন্দ। ১১ই ডিসেম্বরও শ্রীশ্রীমায়ের গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন স্বামী স্মরণানন্দ।

গত ২৪শে ডিসেম্বর ভগবান যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী স্বানুভবানন্দ যীশুখৃষ্টের ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন গায়ক ভজনকীর্তন করেন।

আজিমগঞ্জ বড়নগরে শ্রীশ্রীপঞ্চমুখ বিবেকানন্দ মন্দিরে ১০.১২.৭৯ তারিখে প্রভাতফেরি, বেদপাঠ, পূজা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। ১৬ই ডিসেম্বর রবিবারের সভায় শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অনাময়ানন্দ। ৯.১.৮০ তারিখে অনুরূপভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি পালিত হয়। ১৩ই জানুআরি রবিবারের সভায় শ্রীফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীদেবব্রত কবিরাজ ঠাকুর ভাষণ দেন।

জিয়াগঞ্জ স্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ফুলতলা শাখার উদ্যোগে ১লা জানুআরি, ১৯৮০ স্থানীয় 'কমলে কামিনী' মন্দিরে কল্পতরু-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বেলুড় মঠ এবং সারদা মঠের অনুরাগীদের দ্বারা সঙ্গীতাদি পরিবেশিত হয়। স্বামী অনাময়ানন্দ ভক্তিমূলক আলোচনা করেন। সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন ব্রহ্মচারী দীনেশ।

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৪তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির-প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব এক শুচিশুভ্র পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২০০ জন ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন-সংগীত পরিবেশন করেন রামকৃষ্ণ-সারদা সংঘের সদস্যাবৃন্দ। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী নির্লিপ্তানন্দ। প্রধান অতিথি শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সমাপ্তি-সংগীত পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্র বিভাগের সদস্যবৃন্দ। সভান্তে পরিষদ-সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র চন্দ্র মালাকার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কন্যাকুমারী বিবেকানন্দপুরমে বিবেকানন্দ কেন্দ্র কর্তৃক গত ১২ই জানুআরি, ১৯৮০ বিবেকানন্দজয়ন্তী পালিত হয়। অধ্যাপক শ্রী টি. এন. মহালিঙ্গম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। গুরুকুল-আশ্রমিকগণ উদ্বোধনী ভজনসংগীত পরিবেশন করেন। সভায় প্রচুর জনসমাগম হয়। নিবেদিতা বালওয়াড়ি শিশুগণ কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক যোগব্যায়াম প্রদর্শন বিশেষ উপভোগ্য হয়। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে বিবেকানন্দ কেন্দ্রের সংযোগাধিকারিক শ্রী এস. বেঙ্কটরমণ খেয়াঘাটে পলিপড়ার দরুণ পারাপারের অসুবিধার উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন রাখেন।

আসানসোল মহীশিলা কলোনীর সারদাসঙ্ঘ ৯ই ফেব্রুআরি, ১৯৮০ হইতে ১১ই ফেব্রুআরি পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সংঘের পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ও সভানেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিশুদের বেদগানের মধ্য দিয়া শুরু হয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠান। এই দিনের অনুষ্ঠানে ছিল বালিকাদের ভক্তিমূলক নৃত্য, বিতর্ক প্রতিযোগিতা (মা, ঠাকুর ও স্বামীজীর জীবন অবলম্বনে) এবং সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাত্রী-বিরচিত 'সারদা পুণ্যগীতি' পরিবেশনা। ১০ই প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, মা-ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনী ও বাণীপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা, অখণ্ড নামসঙ্কীর্তন ইত্যাদি। বেলা ১২টায় আকৃষ্ট করে সঙ্ঘের মায়েদের দ্বারা নিবেদিত নাট্যধর্মী লীলাগীতি 'জগজ্জননী মা সারদা'—মূল কাহিনী ও নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীমতী নীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যরূপ ও প্রযোজনায় শ্রীবিকাশকুমার চক্রবর্তী। সারাদিন স্থানীয় প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্তমণ্ডলীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে আয়োজিত সঙ্ঘের বাৎসরিক সাধারণ সভায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন সঙ্ঘের সভানেত্রী। সঙ্ঘের সম্পাদিকা শ্রীমতী আভা চক্রবর্তী বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠকালে কৃতজ্ঞতা জানান সমাগত

সকল সম্প্রদায়ের মায়েদের কাছে যাঁহারা এ পর্যন্ত তাঁহাদের অর্থ, সামর্থ্য ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্ঘের কার্যকলাপ-প্রসঙ্গে তিনি জানান, সঙ্ঘমন্দিরে নিত্য পূজা-পাঠ, জলসত্র, অন্ন ও ফলমূলাদি দান, সারদা সেলাই স্কুল, ফার্স্ট এড্ ও হোম নার্সিং সেণ্টার, গানের স্কুল, এডাণ্ট ক্লাস (মায়েদের), সারদা পাঠাগার, দুঃস্থজনে যথাসাধ্য অর্থদান প্রভৃতি নিয়মিত কাজগুলি যথাযথ অব্যাহত আছে। আসানসোলের বিভিন্ন কেন্দ্র ব্যতীত তমলুক, সীতারামপুর, রায়না, রানিগঞ্জ, বার্নপুর, দুর্গাপুর, কুলটি, বর্ধমান, কলিকাতা, মহিষাদল ইত্যাদি অন্যান্য স্থানেও সারদাসঙ্ঘের যে সকল বিভিন্ন অধিবেশন হইয়াছে সেগুলিরও তিনি উল্লেখ করেন। কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্তা তাঁহার কোষসম্পর্কিত বিবৃতিতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সন্ধ্যারতির পর আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল জয়দেবের কিশোর বাউল শিল্পী-গোষ্ঠীর বাউল গান। সমাপ্তি দিবসে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী মণিমালা ভট্টাচার্য ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন। কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই সঙ্ঘের সকল কাজই মহিলাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়।

খিদিরপুর সুরবিতান কর্তৃক গত ৫ই ফাল্গুন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বসুর পরিচালনায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা' শীর্ষক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং শ্রীবসু প্রেমময় ঠাকুরের ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে ভাষণ দেন।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আলোচনা চক্র কর্তৃক ১৮.২.৮০ তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম শুভ আবির্ভাবতিথি-উৎসব ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয়।

মঙ্গলারতি, প্রভাতীসঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, চণ্ডী, গীতা, কথামৃতাদি পাঠ, হোম ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। বৈকালে শ্রীঅমরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর শ্রীশঙ্করলাল সেনগুপ্ত গীতা ও কথামৃত হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা ঠাকুরের জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে শ্রীপুলক সেনগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তি খাঁ প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ ধর্মমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দ্বিপ্রহরে বহু ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর ও ৯ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি উৎসবও অনুরূপভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

ভাংগড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তসংঘ কর্তৃক গত ২৪শে মাঘ ১৩৮৬ সংঘের তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে ভাংগড় থানার সম্মুখস্থ ময়দানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পঞ্চবটীবেদীমূলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যুষে গীতা ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ঊষাকীর্তনসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া নগর পরিক্রমা করা হয়। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা, পাঠ, সংকীর্তন, হোম, অঞ্জলিদান ও প্রসাদ-বিতরণ হয়। দ্বিপ্রহরে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও বোদরা 'রামকৃষ্ণসারদাপর্ষদ' এর ভক্তগণ ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী সেবানন্দ, স্বামী সর্বাত্মানন্দ ও সভাপতি স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ। প্রায় দুই সহস্র ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

৫ই ফাল্গুন ১৩৮৬ সংঘগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। ঊষাকীর্তন, বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, অঞ্জলিদান, প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তিমূলক সংগীত হয়।

Statement about ownership and other particulars of

UDBODHAN

FORM IV

According to Rule 8 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules 1956

(1) Place of Publication .. 1, Udbodhan Lane, Baghbazar Calcutta-700003.

(2) Periodicity of its Publication . Monthly.

(3) Printer's Name .. Swami Hiranmayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(4) Publisher's Name .. Swami Hiranmayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(5) Editor's Name .. Swami Hiranmayananda
Nationality .. Indian
Address .. 1, Udbodhan Lane, Calcutta-700003.

(6) Name & Address of individuals who own the Newspaper .. Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah, West Bengal.

	Name	Office	
1.	Swami Vireswarananda	*President*	-do-
2.	Swami Nirvanananda	*Vice-President*	-do-
3.	Swami Bhuteshananda	,,	-do-
4.	Swami Gambhirananda	,,	-do-
5.	Swami Vandanananda	*General Secretary*	do-
6.	Swami Gahanananda	*Asst. Secretary*	-do-
7.	Swami Atmasthananda	,,	-do-
8.	Swami Gitananda	*Treasurer*	-do-
9.	Swami Abhayananda		-do-
10.	Swami Dayananda		-do-
11.	Swami Ranganathananda		-do-
12.	Swami Tapasyananda		-do-
13.	Swami Adidevananda		-do-
14.	Swami Hiranmayananda		-do-

I, Swami Hiranmayananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI HIRANMAYANANDA
Signature of Publisher.

Date : 15. 3. 1980.

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। মূল্য ৩·৫০

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। পৃঃ ৩১০, মূল্য ৪·০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৯, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০ ; ২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ২·৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫ মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ০·৮০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩·০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭১, মূল্য ২·০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২·৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২·৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩·৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫·০০

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা— শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০·৭২

Udbodhan—Phone : 55-2447 MARCH 1980 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

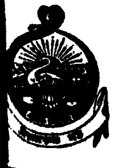
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

বৈশাখ ১৩৮৭

৮২তম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে, তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনের (১৯২৬) বিবরণগ্রন্থ

শীঘ্রই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। সমস্ত পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের সাধু এবং ভক্তজনের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দিবেন। ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে প্রথম মহাসম্মেলনের ইংরেজী বিবরণগ্রন্থ (THE RAMAKRISHNA MATH & MISSION CONVENTION—1926) পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। ইহা একটি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ, যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অপূর্ব ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে। যাহারা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভক্ত ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান তাঁহাদের সকলেরই ইহা অবশ্যপাঠ্য। স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। শীঘ্রই সংগ্রহ করুন।

মূল্য ২৫.০০ টাকা

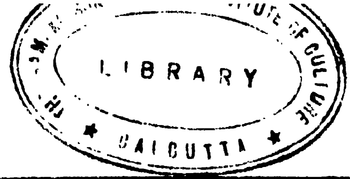
প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা-৭০০০০৩

আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে।
তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধন, বৈশাখ, ১৩৮৭

সূচীপত্র





৮২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি—
আমার শেখানো তত্ত্ব না বুঝে, সকলই করিলে মাটি !
আমি তো কখনো বলিনি কাকেও—
'সব ভগবান'—অর্থবিহীন অদ্ভুত কথাটি !

এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও
ঈশ্বরই 'সৎ', বাকী যা 'অসৎ'—একেবারে কিছু নয়।
পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য ব'লে তা মনেতে হয় !

একটি মাত্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান
যথার্থ 'আমি'—তিনি ছাড়া কিছু নয় !
পরিণামশীল এ জড়জগৎ আমি নয়, আমি নয়।
তোমরা সকলে জানিও আমার ভালবাসা অফুরান।

বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৩৩]

কথাপ্রসঙ্গে

মায়াবাদ : শংকর ও বিবেকানন্দ

সভাসমিতিতে বিশিষ্ট বক্তাদের বক্তৃতায় আমরা প্রায়ই শুনি এবং গ্রন্থেও বিদ্বজ্জনের রচনায় পড়ি যে, মায়া সম্বন্ধে শংকরাচার্যের ও স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত এক নহে। যাঁহারা এইরূপ বলেন বা লেখেন, তাঁহারা লণ্ডনে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'মায়া' শীর্ষক বক্তৃতায় উল্লেখিত—'মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার নিমিত্ত একটি মতবাদ নহে; সংসারের ঘটনা যেভাবে চলিতেছে, মায়া তাহারই বর্ণনামাত্র', 'মায়া কোন মতবাদ নহে; আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র'—এই সকল বাক্যকে উপজীব্য করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁহারা বলেন, শংকরাচার্যের 'মায়াবাদ' একটি অতি প্রসিদ্ধ মতবাদ। পক্ষান্তরে স্বামীজী যখন বলিতেছেন যে, 'মায়া কোন মতবাদ নহে', তখন মায়া সম্বন্ধে শংকরের ও স্বামীজীর ধারণায় যে প্রভেদ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে, 'মায়া কোন মতবাদ নহে'—এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যায় স্বামীজী উক্ত বক্তৃতায় বহু উদাহরণ দিয়াছেন, কিন্তু শংকরাচার্যের প্রদত্ত উদাহরণসমূহ হইতে সেগুলি ভিন্ন প্রকারের; সুতরাং যদিও স্বামীজী বলিয়াছেন, 'মায়াবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়', তথাপি মায়া সম্বন্ধে স্বামীজী যে শংকরাচার্য হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিতেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, অর্থাৎ শংকরের মায়াবাদ ও বিবেকানন্দের মায়াবাদ এক নহে।

বিষয়টি বিতর্কমূলক। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই উপস্থাপিত করিতেছি। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশ করিবার পূর্বে এবং আলোচনাকালেও সর্বদাই একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের মনে রাখিতে হইবে। উহা হইল এই যে, যদিও আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি 'শংকরাচার্যের মায়াবাদ', প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় 'মায়া' নহে। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইল এক, অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম—এককথায় নির্বিশেষ-ব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতব্রহ্মবাদ। আমরা যখন বলি—কণাদের পরমাণুবাদ, কপিলের প্রকৃতি-পুরুষবাদ, তখন সেই একই সুরে আমরা কি বলিতে পারি শংকরাচার্যের মায়াবাদ? কখনই নহে। ঐরূপ বলিলেই উহা বেসুরো শুনায়। কিন্তু যদি বলি—কণাদের পরমাণুবাদ, কপিলের প্রকৃতি-পুরুষবাদ, শংকরাচার্যের নির্বিশেষব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতব্রহ্মবাদ, তাহা হইলেই সুরের ঐকতান বজায় থাকে। শংকরাচার্য 'মায়া'র অবতারণা করিয়াছেন নির্বিশেষব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিতেই। যদি নির্বিশেষব্রহ্মবাদ বা অদ্বৈতব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার অন্য কোন উপায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা সানন্দে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু অন্য উপায় তিনি পান নাই। সেইজন্যই 'অনির্বচনীয়' মায়ার অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু শংকরোত্তর-কালে জগৎ-সত্যত্ববাদী বৈদান্তিকগণ লক্ষ্য করিলেন যে, শংকরাচার্য কর্তৃক উপস্থাপিত মায়া তাঁহার মতবাদের যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনই মায়াসম্পর্কিত তাঁহার বিচার-শৃঙ্খলের দুর্বলতম আংটা। সেইজন্য ঐ দুর্বলতম আংটার উপর প্রাণপণ

আঘাত হানিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ মত স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন এবং শংকরাচার্যকে 'মায়াবাদী', 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' ইত্যাদি বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। শত শত বৎসর ধরিয়া এইভাবে শংকরাচার্যকে মায়াবাদী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহার ফলে 'শংকরাচার্যের মায়াবাদ' একটি সুপ্রচলিত কথা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্তমান নিবন্ধে আমরা যখন 'শংকরাচার্যের মায়াবাদ'-এর উল্লেখ করিব, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখা প্রয়োজন। 'বিবেকানন্দের মায়াবাদ' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বিবেকানন্দও এক-অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-বাদী। মায়াবাদ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। ইহাও বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

এখন আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করিতেছি। আমাদের মনে হয় না যে, মায়া সম্বন্ধে শংকরাচার্য ও স্বামীজীর অভিমতে কোনও প্রভেদ আছে। যদি কোন মতবাদকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে মতবাদ, 'থিয়োরী' বা তত্ত্ব বলা যায় না। এ বিষয়ে আশা করি কোনও দ্বিমত নাই। এখন দেখিতে হইবে, মায়াকে কোনও যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা। ব্রহ্মসূত্রের শাংকরভাষ্যের উপক্রমণিকা—যাহা 'অধ্যাসভাষ্য' নামে সুপ্রসিদ্ধ, তাহাতে শংকরাচার্য স্বীকার করিয়াছেন যে, অধ্যাস যুক্তিসিদ্ধ নহে। অধ্যাস যুক্তিসিদ্ধ নহে—ইহার স্পষ্টীকরণের পূর্বে শংকরাচার্যের মতে অধ্যাসের লক্ষণ কী, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অধ্যাসভাষ্যে শংকরাচার্য অধ্যাসের লক্ষণ হিসাবে লিখিয়াছেন : (১) স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ। এবং (২) অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ। আমরা শেষোক্ত লক্ষণটিই প্রথমে ব্যাখ্যা করিতেছি, কারণ তাহাতে প্রথমোক্ত লক্ষণটির অর্থ সহজেই বুঝা যাইবে। 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ' (যেটি যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি)—অর্থাৎ যে বস্তুটি যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তুরূপে বুঝা। যেমন, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি। রজ্জুটি সর্প নহে, তথাপি রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ সর্পবুদ্ধি হয়। অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস বা ধর্ম আরোপ হয়। প্রথম লক্ষণটিতে বলা হইয়াছে, 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ'—অর্থাৎ অধ্যাস হইতেছে, পরত্র (অপর কোন অধিকরণে) পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতিরূপ অবভাস। পূর্বে সর্প দেখা হইয়াছে, সেই পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিরূপ প্রতীতি হইতেছে পরত্র, অর্থাৎ সেই সর্পে নহে, অন্য কোন অধিষ্ঠানে—রজ্জুতে।[১]

এই ধরনের অধ্যাসের বহু দৃষ্টান্ত আছে। যথা—শুক্তিকাতে রজতভ্রম, মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম, জলে কাচভ্রম ইত্যাদি। শংকরাচার্যের মতে এই সমস্ত ক্ষেত্রেই অধ্যাস কেন হয়, তাহার কোনও যুক্তি নাই—এইজন্য অধ্যাসমাত্রেই 'অনির্বচনীয়'।

সাধারণতঃ একটি বস্তুকে যখন আরেকটি বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়, তখন ঐ দুইটি বস্তুর মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকে।[২] স্বল্পান্ধকারে দড়িটা সাপ বলিয়া ভুল হয়। এক্ষেত্রে দড়ি ও সাপের মধ্যে আকারগত সাদৃশ্য আছে। ঝিনুককে রূপা বলিয়া বোধ হয়। এক্ষেত্রে ঝিনুক ও রূপার

---

১ 'ভাষ্যরত্নপ্রভা'কার গোবিন্দানন্দের মতে 'পরত্র অবভাসঃ'—ইহাই অধ্যাসের লক্ষণ, 'স্মৃতিরূপঃ' এবং 'পূর্বদৃষ্টঃ' পদদ্বয় উক্ত লক্ষণ উপপাদনের জন্য প্রয়োগ করা হইয়াছে মাত্র। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে কেবলমাত্র 'অবভাসঃ' পদটির দ্বারাই অধ্যাসের লক্ষণ সিদ্ধ হইয়া যায়—অন্যান্য পদগুলি বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার জন্য প্রযুক্ত।

২ যেখানে ধর্মীর অধ্যাস না হইয়া কেবলমাত্র ধর্মের অধ্যাস হয়, সেখানে সাদৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। জবাপুষ্প ও স্ফটিকের মধ্যে সাদৃশ্য নাই, তথাপি জবাপুষ্পের রক্তিমতা স্বচ্ছ স্ফটিকে

মধ্যে বর্ণগত সাদৃশ্য আছে। অন্যান্য জড়পদার্থের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাদৃশ্য না থাকিলেও (পাদটীকা ২ দ্রষ্টব্য), জড়ত্বরূপ সাদৃশ্য অবশ্যই আছে। কিন্তু—শংকরাচার্য বলিতেছেন—আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধস্বভাব আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যে একেবারেই কোন সাদৃশ্য নাই। কারণ, আত্মা চেতন; দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি জড়। সুতরাং চিৎস্বরূপ আত্মার ধর্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অথবা দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আত্মাতে ভুল করিয়া আরোপিত হইবে কী করিয়া? রজ্জুতে সর্পভ্রমই যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে এক্ষেত্রে তো যুক্তির 'বালাই' একেবারেই নাই! সুতরাং অধ্যাসকে একটি 'থিয়োরী' বা মতবাদ বলা যায় না।

প্রশ্ন হইবে—আলোচ্য প্রসঙ্গটি ছিল 'মায়া'র; অকস্মাৎ 'অধ্যাস' লইয়া এত কথার অবতারণা কেন? ইহার উত্তর এই যে, 'অধ্যাস', 'অজ্ঞান', 'অবিদ্যা', 'মায়া'—এ সবই সমানার্থক শব্দ। অধ্যাসভাষ্যেই শংকরাচার্য লিখিয়াছেন, 'অধ্যাসং পণ্ডিতাঃ অবিদ্যা ইতি মন্যন্তে'—পণ্ডিতগণ অধ্যাসকেই অবিদ্যা মনে করেন। যদিও স্থলবিশেষে অবিদ্যা ও মায়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য করা হয়, তথাপি আমাদের বর্তমান আলোচ্যক্ষেত্রে অবিদ্যা ও মায়া একই; সুতরাং মায়ার প্রসঙ্গে অধ্যাসের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। অধ্যাসের আলোচনার অর্থই মায়ার আলোচনা। অতএব মায়া যখন অনির্বচনীয় অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ নহে, তখন মায়াকে একটি তথাকথিত মতবাদ বলা যায় না, যদিও 'মায়াবাদ' কথাটি সুপ্রচলিত। এবং এই কারণেই দেখা যায়, স্বামী বিবেকানন্দও পূর্বোক্ত বক্তৃতায় এবং অন্যত্র বহু স্থলেই 'the theory of Maya'—কথা ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং মায়া সম্বন্ধে স্বামীজীর ও শংকরাচার্যের কথায় পার্থক্য কিছুই নাই।

এখন উভয় আচার্য প্রদত্ত উদাহরণগুলির কথা। শংকরাচার্য যে উদাহরণগুলি অধ্যাসভাষ্যে দিয়াছেন,[৩] সেইগুলিই আমরা স্বামীজীর বক্তৃতা-শৈলীতে উপস্থাপিত করিতেছি :

(১) আছে ঝিনুক, দেখিতেছি রূপা—ইহাই মায়া।

(২) এক চন্দ্রকে দুইটি দেখিতেছি—ইহাই মায়া।

(৩) আকাশের আকৃতি নাই, বর্ণ নাই, তথাপি আকাশ কড়াই-এর তলদেশের ন্যায় ও নীলবর্ণ প্রতীত হয়—ইহাই মায়া।

অধ্যস্ত হয়। বস্তুতঃ অধ্যাসের বিষয়টি এতই জটিল এবং শংকরাচার্য অধ্যাস-প্রসঙ্গ অল্পকথায় সারিলেও শংকরোত্তর-কালে এ বিষয়ে টীকাকারগণ ও গ্রন্থকারগণ এত বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন যে, সেগুলি সংকলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধে বিষয়টিকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৩ শংকরাচার্যের অন্যান্য রচনায় অধ্যাসের আরও অনেক উদাহরণ আছে। যথা—মেঘসমূহের সঞ্চরণ চন্দ্রে আরোপ করা (আত্মবোধ, শ্লোক ১৮), জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রে, বায়ু-তাড়িত জলের চঞ্চলতা আরোপ করা (ঐ, শ্লোক ২১), শুষ্ক বৃক্ষের শাখাবিহীন কাণ্ডকে স্বল্পান্ধকারে পুরুষ বলিয়া মনে করা (ঐ, শ্লোক ৪৫), দিগ্‌ভ্রম (ঐ, শ্লোক ৪৬), মরীচিকাভ্রম (গীতা, ১৩।২, ৪।১৮ ভাষ্য ; ব্রহ্মসূত্র, ২।১।১৪ ভাষ্য), নৌকারূঢ় ব্যক্তি, নৌকা চলিতে থাকিলে তটস্থিত গতিহীন বৃক্ষসমূহে বিপরীতগতি এবং অতিদূরস্থ বস্তুসমূহে গতি থাকিলেও, তাহাদের গতিহীন দেখে (গীতা, ৪।১৮ ভাষ্য) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, শংকরাচার্য অধ্যাসের এই সকল উদাহরণ দিয়াছেন, আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদির পারস্পরিক অধ্যাস বুঝাইতেই—যাহাতে আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি।

(৪) যদিও পুত্র, ভার্যা প্রভৃতি স্বদেহ হইতে প্রত্যক্ষতঃ ভিন্ন বলিয়া বাহ্য, তথাপি বাহ্যধর্ম অর্থাৎ পুত্র-ভার্যাদির দেহধর্ম (হীনাঙ্গতা, পূর্ণাঙ্গতা, ইত্যাদি) মানুষ নিজ আত্মাতে আরোপ করিয়া নিজেকেই হীনাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ ইত্যাদি, মনে করে—ইহাই মায়া।

(৫) আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইয়াও আত্মায় জড় দেহের ধর্ম আরোপ করিয়া বলিতেছি, 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি গৌরবর্ণ'. 'আমি উপবিষ্ট আছি', 'আমি গমন করিতেছি', 'আমি লঙ্ঘন করিতেছি', ইত্যাদি—ইহাই মায়া

(৬) আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইয়াও আত্মায় জড় ইন্দ্রিয়সমূহের ধর্ম আরোপ করিয়া বলিতেছি, 'আমি মূক', 'আমি একচক্ষু', 'আমি ক্লীব', 'আমি বধির', 'আমি অন্ধ', ইত্যাদি—ইহাই মায়া।

(৭) আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইয়াও আত্মাতে অন্তঃকরণের ধর্ম আরোপ করিয়া বলিতেছি, 'আমি কামনা করিতেছি', 'আমি সঙ্কল্প করিতেছি', 'আমি সন্দেহ করিতেছি'. আমি নিশ্চয় করিতেছি', ইত্যাদি—ইহাই মায়া।

শংকরাচার্য বলিতেছেন. এই মায়া যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও ইহা অনুভবসিদ্ধ; অনাদিকাল হইতে এই নৈসর্গিক লোকব্যবহার চলিয়া আসিতেছে—ইহা 'সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ'। শংকরাচার্যের এই কথা আর স্বামীজীর কথা—'যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব. কেমন করিয়া তাঁহার সেই স্বভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয়? হিন্দুগণ এ সম্বন্ধে সরল ও সত্যবাদী। তাঁহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাঁহারা সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং উত্তরে বলেন, 'জানি না, কেমন করিয়া পূর্ণ আত্মা নিজেকে অপূর্ণ এবং জড়ের সঙ্গে যুক্ত ও জড়ের নিয়মাধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য। প্রত্যেকেই তো নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করে।' (চিকাগো ধর্মমহাসভায় পঠিত 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ)—এই দুই কথার মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য খুঁজিয়া পাই না।

পূর্বে উল্লেখিত 'মায়া' বক্তৃতায় স্বামীজী যে উদাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে: 'আমি বাড়ি যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি। ইহাই মায়া।' এই উদাহরণটি আর শংকরাচার্যের দেওয়া (৬) সংখ্যক উদাহরণগুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাগিন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত করিয়াই মানুষ নিজেকে বক্তা মনে করে।[৪]

স্বামীজীর দেওয়া অন্যান্য উদাহরণগুলিতে

৪ বলা বাহুল্য, স্বামীজী শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার জন্যই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন মাত্র। তিনি স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ। তিনি জানেন, তিনি নিষ্ক্রিয় আত্মা। তথাপি উল্লেখ্য যে, অধ্যাস ব্যতীত কোনও ব্যবহারই সিদ্ধ হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বাধিত অধ্যাসের অনুবৃত্তির দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয়। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির যাবতীয় ব্যবহার অধ্যাসপূর্বকই হইয়া থাকে—তাহার অধ্যাস বাধিতের অনুবৃত্তি নহে। বেদান্তদর্শনের 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' সূত্রে (১।১।৪) শংকরাচার্য একটি শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি নিজেকে বস্তুতঃ অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্, অমনা, অপ্রাণ জানিলেও বাধিত-চক্ষুরাদির অনুবৃত্তিবশতঃ সচক্ষু, সকর্ণ, সবাক্ ইত্যাদি হন।

পরস্পর-বিরোধী বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—'ইহসংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্বে বিচরণ করিতেছে; অথচ আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব।···ইহাই মায়া।'; 'আমরা সকলেই কল্পিত স্বর্ণলোমের (Golden Fleece) অন্বেষণে ছুটিয়া চলিয়াছি, প্রত্যেকের মনে হয় আমি ইহা পাইব; জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই স্বর্ণলোম-লাভের সম্ভাবনা তাঁহার হয়তো বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি প্রত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন। ইহাই মায়া।' ইত্যাদি।

স্বামীজীর দেওয়া এই সকল দৃষ্টান্তে এবং শংকরাচার্যের দেওয়া দৃষ্টান্তগুলিতে প্রকারগত ভেদ থাকিলেও তত্ত্বগত কোনও ভেদ নাই। শংকরাচার্য বলিয়াছেন যে, আমাদের যাবতীয় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার 'অধ্যাসপূর্বকই হইয়া থাকে—অর্থাৎ, সবই মায়া

মায়াবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য একটিমাত্র বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ নহে। বহু বক্তৃতায়, কথোপকথনে ও ক্লাসে তিনি মায়াবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন। সেগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পড়িলে মনে হয় তিনি যেন শংকরাচার্যের কথাগুলিই যুগোপযোগী করিয়া নিজস্ব ভঙ্গীতে বলিতেছেন। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে—

(১) লণ্ডনে প্রদত্ত 'আত্মার মুক্তস্বভাব' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "সেই 'এক তত্ত্ব' কেন 'বহু' হইল? আর উহার উত্তর শ্রেষ্ঠ উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর - মায়াবাদ; বাস্তবিক সেই এক তত্ত্ব বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্গুণ।" (বাণী ও রচনা, ৩য় সং, ২।২০৬)।[৫]

(২) হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত 'বেদান্ত-দর্শন' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন: "যাহাকে 'অবিদ্যা' বা মায়া বলা হয়, উহাই এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কারণ, উহারই প্রভাবে চরম সত্যকে—অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অভাবমাত্র নহে। সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে—এ-কথাও বলা চলে না, আবার নাই—এ-কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে 'সৎ' বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু মায়া অসৎ—এ-কথা বলা যায় না; কারণ তাহা যদি হইত, ইহা কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সৎ বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্ত-দর্শনে ইহাকে 'অনির্বচনীয়' অর্থাৎ বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্য বলা হইয়াছে।" (ঐ, ২।৪৪৭)।

(৩) 'এই-সব সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্যান্য যাহা কিছু,

---

৫ 'How is it that this One Principle becomes manifold? And the answer, as we have seen, the best answer that India has produced is the theory of Maya which says that It really has not become manifold, that It really has not lost any of its real nature. Manifoldness is only apparent. Man is only apparently a person, but in reality he is the Impersonal Being'. (The Freedom of the Soul: C. W., 1963, II. 192)

সবই মায়ার—এই আপাতপ্রতীয়মান প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে উহাদের অস্তিত্ব নাই। তবে আমরা যতদিন মায়াবদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে এই সকল দৃশ্য দেখিতে হয়।' (ঐ, ২।৪৫২)

এই ধরনের বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, আমাদের আলোচনার পক্ষে উল্লিখিত তিনটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। এইগুলিতে মায়াবাদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত শংকরাচার্য-প্রবেদিত মায়াবাদের কোনই পার্থক্য নাই।

যদি পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করা হয় যে, উল্লিখিত তিনটি উদ্ধৃতিতে স্বামীজী মায়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নিছক শংকরাচার্যেরই মত প্রতিফলিত—শ্রোতৃমণ্ডলীকে শংকরমতের সহিত পরিচিত করাইতেই স্বামীজী নিরপেক্ষভাবে উহার বিবৃতি দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তিনি নিজে মায়াসম্বন্ধীয় ঐ মতের সমর্থক নহেন, তাহা হইলে ঐ আপত্তি যে ভিত্তিহীন, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিতে পারা যায়:

পূর্বে উল্লিখিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ফিলজফিক্যাল সোসাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার শেষে স্বামীজী মরীচিকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। শংকরাচার্যের ভাষ্যেও মায়ার প্রসঙ্গে এই মরীচিকার দৃষ্টান্ত আছে। (পাদটীকা ৩ দ্রষ্টব্য)। নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ' বক্তৃতায় স্বামীজী নিজ জীবনের একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। ঐ ঘটনাতে ভারত-মহাসাগরের উপকূলে পশ্চিম-ভারতের মরুখণ্ডে ভ্রমণকালে মরীচিকা-দর্শনের উল্লেখ আছে। বিবৃতিটি পড়িলে কে বলিবে যে, স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতাবলীতে মায়া সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাংকরমতের বিবৃতি মাত্র—তিনি স্বয়ং উহার সমর্থক নহেন?

অধিকন্তু স্বামীজী যখন মায়াবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করিতেছেন—'The best answer that India has produced is the theory of Maya' (পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য), তখন কে বলিবে যে, তিনি শংকরাচার্যের মায়াবাদকে সমর্থন করিতেছেন না?

আরও কথা এই যে, ৬ই জুলাই ১৮৯৫, আমেরিকায় থাউজাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে স্বামীজী তাঁহার শিষ্য-শিষ্যাদের শংকরাচার্যের অধ্যাসভাষ্য পড়াইয়াছিলেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ঐ ব্যাখ্যায় শংকর কর্তৃক উপস্থাপিত অধ্যাস সম্পর্কে স্বামীজী কোনও বিরূপ সমালোচনা তো করেনেই নাই, বরং শংকরের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিয়াছেন, "প্রথমে 'আমি দেহ' এই ভ্রম দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা হবে।"

শুধু ঐদিনের অধ্যাসভাষ্যের আলোচনায় কেন, স্বামীজী কোনও বক্তৃতায়, কোনও কথোপকথনে, কোনও রচনায় শংকরাচার্যের মায়াবাদের খণ্ডন বা বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।[৬]

মায়াবাদ একাধিক নহে—একটিই। শংকর ও বিবেকানন্দ উভয়েই সেই একই মায়াবাদের উপস্থাপক—তাঁহাদের মূল প্রতিপাদ্য অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে।

---

৬ 'কথামৃতে' (৪।৩২।১) আমরা অবশ্য দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন—'মায়াবাদ শুকনো' এবং 'কি বললাম বল দেখি' বলিয়া নরেন্দ্রনাথকে দিয়া বলাইতেছেন 'শুকনো'। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বা বিবেকানন্দ কোথাও বলেন নাই যে মায়াবাদ ভুল। অদ্বৈতবেদান্তের অধিকারী বিরল। জগতের অধিকাংশ সাধকই ভক্তিপথের পথিক এবং মায়াবাদ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের নিকট নীরস। নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈতবেদান্তের উত্তম অধিকারী হইলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে দিয়া মায়াবাদ 'শুকনো' কেন বলাইতেছেন, তাহা 'কথামৃতে'র প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদটির (৪।৩২।১) অবশিষ্টাংশ পড়িলেই বুঝা যাইতে পারে। স্থানাভাববশতঃ পাদটীকায় বিশদ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যায়, নরেন্দ্রনাথ যে ঈশ্বরকোটি আচার্য, জীবকোটি বা জীবন্মুক্ত শ্রেণীর নহেন—এই সূত্রটিতেই নরেন্দ্রনাথকে দিয়া ঐরূপ বলানোর তাৎপর্য নিহিত।



বাউলের গান

শ্রীমাখন গুপ্ত

ও মন তুই কেন তার খোঁজ রাখিস না ?
হৃদয়ে সদাই বসি
কান্নাহাসির
বাজায় বাঁশি যে একজনা।
যে-পথে প্রেমের বাঁশি
বেড়ায় ভাসি
সেই পথে তার আনাগোনা।

এ-খেলা সাঙ্গ হলে
যেতে হয় সকল ফেলে—
পড়ে রয় কোঠাবাড়ি রঙবাহারী
তবিলদারি সোনাদানা।
যে-জন সেবার লাগি সর্বত্যাগী
সে পায় পথের ঠিকঠিকানা।

সোজা সে, নয় তো বাঁকা
আছে তার অনেক শাখা
সাথে যার জ্ঞানের বাতি দিবারাতি
সে পায় পথের ঠিকঠিকানা।

'শুভ' শুক্রবার'

শ্রীশান্তশীল দাশ

রক্ত ঝরছে তোমার কোমল অঙ্গ হ'তে,
তবুও তোমার ললাট হয়নি কুঞ্চিত ;
প্রশান্ত ওই মুখখানি কী যে দীপ্তিময় !
ক্ষমাসুন্দর চোখ দু'টি প্রেমে সিঞ্চিত !

'ক্ষমা কর পিতা, ওদের গভীর অজ্ঞতা,
ওদের কর্ম-ফল ওরা কিছু বোঝে না যে' ;
মমতায় ভরা অন্তরে জাগে ব্যাকুলতা,
ওদের পাপ যে তোমার কোমল বুকে বাজে।

কত দিন গেল রক্ত ঝরাতো থামলো না,
ও অঙ্গ হতে আজো তো তেমনি শোণিত বয় ;
তোমার বেদনা মোছাবার মত কেউ তো নই,
যুগযুগান্তে হবে নাক' বুঝি পাপের ক্ষয় !

তবুও তোমার কণ্ঠে জাগবে সে মধুস্বর :
'ক্ষমা কর পিতা, ও অভাগাদের ক্ষমা করো';
আকাশ-বাতাস মুখরিত হবে সে বেদনায়,
দিনে দিনে সেই রক্তকমল হবে জড়ো

প্রণমি তোমার পায়

ডাঃ ব্রজদুলাল দে

রামকৃষ্ণের পরমানন্দ
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
শ্রীমাতার তুমি নয়নানন্দ
প্রণমি তোমার পায়।

যুগের স্রষ্টা হে মহাতাপস
অন্যায়-সনে করোনি আপস
ছড়ালে ধরায় ভারতের যশ
প্রণমি তোমার পায়।

প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ*

আজ একটি বিশেষ দিন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের আজ জন্মতিথি।

আমি তাঁর সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব। আজ স্বামী বাগীশানন্দ বললেন যে, ৬৫ বছর আগে ১৯১৪ সালে প্রেমানন্দ মহারাজ মালদা শহরে এসে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে আজ একটি স্মৃতিফলক লাগানো হল।

স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে আপনারা অনেকে কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থে পড়েছেন। আমি শুধু, তাঁকে যে রকম দেখেছি, সেই সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব। আমি যখন বাড়ি থেকে ১৯১৬ সালে প্রথম বেলুড় মঠে আসি, তখন তিনি মঠেই ছিলেন। ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল উনি যেন বেলুড় মঠের guardian angel। মঠের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে উনি ছিলেন জড়িত।

সকালে জপ-ধ্যান সেরে একবার বাগানের দিকে যেতেন, বাগান ঘুরে দেখতেন যে, ঠাকুরের ভোগে কি কি জিনিস লাগবে এবং সেই সমস্ত নিয়ে আসতেন। তারপর তরকারি কোটা হত। সবাই মিলে এক সঙ্গে তরকারি কুটত এবং তিনি নিজেও কুটতেন। তারপর স্নান করে পূজার ঘরে যেতেন। পূজা করে ভোগ দিতেন। বিকালে ঠিক ৪টার সময় ঠাকুর তুলতেন এবং বৈকালিক ভোগ দিতেন। পরে আরতি করতে যেতেন।

সমস্ত দিন প্রায় সব সময় ঠাকুরের কথা হত। দুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পরে যখন পশ্চিম দিকের বেঞ্চিতে বসে থাকতেন তখন, এবং সন্ধ্যার আগেও তাই। কখনও স্বামীজীর মন্দিরের সামনে বেলগাছের তলায় বসে ঠাকুরের কথা বলতেন, আমরা সব দাঁড়িয়ে শুনতুম। সমস্ত দিন এত কথা বলতেন যে, রাতে তাঁর ঘুম হত না। উনি আর মহাপুরুষ মহারাজ এক সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন। মঠবাড়িতে দোতলায় পশ্চিমের ঘরে—পুব দিকের দুটি দরজার মাঝে দেওয়ালের কাছে মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন আর উল্টোদিকে বাবুরাম মহারাজ থাকতেন। মহাপুরুষ মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে বলতেন, 'তুমি ঘুমুবে কি! সমস্ত দিন বকো—বায়ু চড়ে যায়, ঘুম হবে কি করে! একটু কম বকো।' বাবুরাম মহারাজ কিন্তু এই কথাটা রাখতে পারতেন না।

সমস্ত দিন তিনি ভক্তদের জন্য ব্যস্ত থাকতেন, বিশেষ করে তাঁদের প্রসাদ খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হতেন।

একদিন দুপুরে তিনি গঙ্গার ধারে এসে দেখলেন যে, কয়েকজন ভক্ত নৌকায় এসে ঘাটে নামছেন। তিনি তাঁদের receive করলেন ও বললেন, 'আগে স্নান-টান করো, তারপর প্রসাদ পাবে।' এই বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন এবং আগুন জ্বালিয়ে রান্না বসালেন। ঐ দেখে আমরা যারা ছিলাম সবাই ওঁর হাত থেকে নিয়ে রান্নাদি করলাম এবং ভক্তদের খাইয়ে দিলাম। এই রকম প্রায়ই হত। একদিন দু'জন ভদ্রলোক আসলেন বেলা প্রায় দুটোর সময়। বাবুরাম মহারাজের সামনে আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের খাওয়া হয়েছে কি?' তাঁরা বললেন, 'না'। 'আচ্ছা চলো প্রসাদ পাবে।'

তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, সকলের খাওয়া হয়ে গিয়েছে—কিছুই প্রায় নেই। হাঁড়িতে

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ।

সামান্য ভাত, একটু ডাল আর শাক-ভাজা ছিল। তা-ই দিয়েই তাঁদের খাওয়াতে বসালেন। আর বললেন, 'দেখো, এই অল্পই একটু প্রসাদ পাও।' সেটা খেয়ে তাঁরা খুবই তৃপ্ত হলেন। তারপর কয়েক বছর বাদে তাঁরা দু'জনে আবার এলেন। এসে বাবুরাম মহারাজের খোঁজ করলেন। তখন বাবুরাম মহারাজের শরীর গেছে। তাঁরা বললেন, 'আমরা এসেছিলাম কয়েক বছর আগে একদিন খুব দেরিতে—তখন আমাদের সামান্য একটু শাক-ভাজা আর ডাল-ভাত দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া আমরা জীবনে আর কখনও খাইনি।' জিনিস অল্পই ছিল। তবু তাঁরা যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, তার কারণ হ'ল সেই অল্প-পরিমাণ জিনিসের পিছনে ছিল বাবুরাম মহারাজের প্রেম-ভালবাসা। এটা তাঁরা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। এরকম অনেক ঘটনা তাঁর জীবনে দেখতে পাওয়া যায়।

আরও দু'একটি কথা বলছি। তিনি খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। জামা-কাপড় বেশি পরতেন না। শীতকালে একটা ফতুয়া গায়ে দিতেন। আর সব সময় একটা চাদর তাঁর গায়ে থাকত। একবার একজন ভক্ত তাঁকে দু'চারটে ফতুয়া তৈরি করে দেয়। সেটা উনি রেখে দিলেন। সেই রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, ঠাকুর এসে একটা জামা দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'এই ত আমার জন্য রেখেছিস (জামাটা উইয়ে খাওয়া), আর তোর নিজের জন্য ভাল জামা।' পরদিন বাবুরাম মহারাজ সকালবেলা উঠেই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের জামাগুলো দেখলেন। দেখলেন যে, একটা জামা উইয়ে খেয়ে একেবারে ঝরঝরে করে ফেলেছে।

একবার পূর্ববঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করতে উপরে গেলেন। পূর্ববঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে ভক্তরা সব এসেছেন। সব তৈরি। এমন কি নৌকো পর্যন্ত ঘাটে বাঁধা হয়ে গেছে—নিয়ে যাবে কোলকাতায়। ঠাকুরঘর থেকে নীচে নেমে এসে তিনি বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না।' যে ব্যক্তি সেই সময় ঠাকুরঘরে ছিল, সে দেখল যে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলছেন আর শেষে বললেন, 'তা হলে আমি যাব না?' সে ব্যক্তি বাবুরাম মহারাজের কথাই শুধু শুনতে পেয়েছিল। ঠাকুর কি বললেন, শুনতে পায়নি। বাবুরাম মহারাজ নীচে এসে যখন বললেন, 'না, আর যাওয়া হবে না', তখন অনুমান করে বোঝা গেল যে, ঠাকুর যেতে নিষেধ করে-ছিলেন সবাই অবাক্ হয়ে গেলেন। সব ব্যবস্থা তৈরি, অথচ তিনি বলছেন যাবেন না। অগত্যা সে দিন যাওয়া হল না। পরে শুনা গেল যে, যে স্টীমারে তাঁর গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাবার কথা ছিল সেই স্টীমারটা ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়ে-ছিল। তা হলে দেখা গেল যে, ওঁকে রক্ষা করার জন্যেই ঠাকুর ওঁকে নিষেধ করেছিলেন।

উনি আগে স্বামীজীর খুব ভক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু স্বামীজীর প্রবর্তিত কাজকর্মে ততটা interested ছিলেন না, ঠাকুরপুজো-টুজো নিয়েই থাকতেন। ১৯১২-১৩ সালে যখন কাশীতে যান, তখন স্বামীজীর বই পড়ে খুব inspired হয়ে যান। তারপর থেকে স্বামীজীর কর্মযোগের কথা খুব বলতেন এবং মঠে এসেও স্বামীজীর বাণী প্রচার করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সেই সময় অনেক যুবক, যারা university, college ইত্যাদিতে পড়তো, তারা তাঁর সংস্পর্শে এসে সাধু হয়ে যায়। আর তখন বাবুরাম মহারাজ কাজে-কর্মে তাদের খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন—বন্যা. দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি হলে, তাদের উৎসাহ দিয়ে রিলিফের কাজে পাঠাতেন—বলতেন, 'যাও গিয়ে রিলিফ করো।'

১৯১৪ সালে যখন তিনি এখানে এসেছিলেন

তখন এই বাড়িতে ছিলেন। তখন এর পিছন দিকে একটা মাঠ ছিল (এখন সেখানে ঘর-বাড়ি হয়ে গেছে, আজ আমি সে মাঠটা দেখতে পেলাম না)। সেই মাঠে উৎসব হয়েছিল এবং উনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই যুগধর্ম। আমরা মন্দিরে বিগ্রহপূজা করি এবং তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। মানুষের ভিতরেও ভগবান প্রকাশিত হয়ে আছেন, অতএব আমরা যদি মানুষের ভিতরে তাঁকে পূজা করি, তা হলে আমাদের আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এই দৃষ্টি থেকেই তিনি বলেছিলেন জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই এই যুগের ধর্ম। বাস্তবিক স্বামীজীও এই চেয়েছিলেন। এই যুগে এটাই দরকার। কারণ ভারতবর্ষের সবদিক দিয়ে যে পতন হয়েছে, সেটা এখনও দেশবাসী কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি আমরা কোথায় আছি।

স্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন, তখন দক্ষিণদেশীয় কয়েকজন তাঁকে বলেছিলেন, 'স্বামীজী, আপনি Politics-এ নামুন, আর দেশকে স্বাধীন করুন, তারপর সব হবে।' তখন স্বামীজী ওঁদের বলেছিলেন, 'দেশকে স্বাধীন করা তো সোজা। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করলে তোমরা কি স্বাধীনতা রাখতে পারবে? তোমাদের মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ তৈরি করলে তোমাদের স্বাধীনতাও হবে এবং স্বাধীনতা রাখতেও পারবে। কিন্তু মানুষ তৈরি না হলে কিছু হবে না।' বাস্তবিক স্বামীজী দেশের যে অবস্থার কথা বলেছিলেন ৮০ বছরেরও আগে, আজকেও আমরা সেই অবস্থাই দেখছি—দেশে মানুষ নেই। সেই জন্যই যত গণ্ডগোল, অরাজকতা ইত্যাদি। আমরা এখন সত্যিই একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছি। এর পরে আমাদের কি হবে বলা মুশকিল। কেন?—এইজন্য যে, আমাদের দেশে মানুষ নেই। আমাদের school, college, university-তে মানুষ তৈরির কোন ব্যবস্থা নেই। আজ ছাত্ররাও রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে। তাদের শিক্ষাটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষ তৈরি হবে কি করে? মানুষ তৈরি করতে হবে ধর্মভাব দিয়ে। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, 'First deluge the land with spiritual ideas.'—আগে দেশকে ধর্মভাব দিয়ে প্লাবিত করে দাও। বলেছিলেন, 'আত্মার কথাই শোনাও, ভগবানের কথাই শোনাও।' তা থেকে যে অনুপ্রেরণা আসবে, তার ফলে দেশবাসীরা ধর্মজীবন যাপন করবে এবং তখনই ঠিক ঠিক মানুষ তৈরি হবে—তখনই ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতি হবে। শুধু পার্ল্যামেণ্টে এ্যাক্ট পাশ করলেই মানুষ তৈরি হয় না, মানুষ তৈরি হয় ধর্মের দ্বারা। বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর এই সব কথাই বলতেন। বলতেন এই যুগে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই হল মহান ব্রত।

দেশকে যদি আবার বড় করতে হয়, তাহলে সব দিক দিয়েই করতে হবে। আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই গরিব লোক—কোন রকমে শুধু এক বেলা খেতে পায়। তাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষাদান করতে হবে। আজ আমরা দুনিয়াতে চারদিকে দেখতে পাই বিক্ষোভ—অশান্তি। এর কারণ—ধর্মের অভাব। সেইজন্য যদি আমরা ধর্মপ্রচার না করি এবং ধর্মমূলক শিক্ষা না দিই, তাহলে দেশের আরও অধঃপতন হবে। বিশেষতঃ সাধুদের লক্ষ্য করে বাবুরাম মহারাজ বলতেন, 'তোমরা স্বামীজীর আদিষ্ট এ কাজ করবে। তাহলে তোমাদের দেখাদেখি সব ভক্তরাও এ কাজ আরম্ভ করবে।' কিন্তু স্বামীজী জানতেন, এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আমেরিকা ও ইউরোপের লোকেদের মতো

শুধু সমাজসেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভগবানলাভ ভুলে যেতে পারি। সেইজন্য তিনি বললেন যে, আমরা যদি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারি, তা হলে ভারতবর্ষকে আবার উন্নত করতে পারবো।

একদিন ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন, "তিনটি বিষয় পালন করতে নিরন্তর যত্নবান থাকতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সর্বজীবে দয়া' বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় বলতে লাগলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।" ঠাকুরের ঐ কথা শুনে স্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম!...ভগবান যদি কখন দিন দেন তো আজ যা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করবো—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে মোহিত করবো।' অন্যান্য লোকেরা এমনকি স্বামীজীর গুরুভাইরাও ঠাকুরের কথায় কত গভীর অর্থ আছে, তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজী পরে 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' এই আদর্শটি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনকে দিয়েছিলেন। সেবার কাজ কিভাবে করবে?—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে। তাতে এই হবে যে, আমরা আমাদের জীবনের যে উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা সেটা ভুলবো না। কাজের ভিতরেও আমরা ভগবানকে পাবো। যে ভগবানকে মন্দিরে বসে, গুহা-পর্বতে বসে ধ্যান করি, সেই ভগবানকেই বিরাটের মধ্যে বিরাজমান দেখে সেবা করবো। ঠাকুর বলতেন, 'ওহি রাম দশরথকা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘটমে' লেটা।' ঘটে ঘটে—প্রতি জীবেই আছেন সেই রাম। এই দৃষ্টি থেকে আমরা যদি সেবা করি, তা হলে আমরা ভগবানকে ভুলে যাব না, আমাদের উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যাবে না, আমাদের কাজটা উপাসনা হয়ে যাবে। আগে যারা ভগবানলাভ করতে চাইত, তাদের কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে হত। সন্ন্যাসীরা কোন কর্ম করতেন না। তাঁরা ভগবানলাভ করবার জন্য ধ্যান-ভজন নিয়ে থাকতেন, শাস্ত্র পড়তেন, আর বড় জোর শাস্ত্রের উপদেশ লোককে দিতেন—এ ছাড়া অন্য কোন Social Work-এ নিজেদের জড়াতেন না। কেন? না—এইজন্য যে, ভগবানকে লাভ করতে গেলে মনটা স্থির করতে হবে, কোন রকম বিজাতীয় চিত্তবৃত্তি থাকবে না। কি রকম হবে? না—তৈলধারাবৎ। একটা পাত্র থেকে আর একটা পাত্রে তেল ঢাললে যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে তেল পড়ে, ভগবানের স্মরণ সেই রকম অবিচ্ছিন্নভাবে হবে। কিংবা যেখানে বাতাস নেই সেখানে দীপশিখা যেমন নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, ঠিক সেইভাবে মন একেবারে স্থির থাকবে ভগবানেতে। তখন ভগবদ্‌-দর্শন হবে। তাই যদি হয়, তাহলে কর্ম করা চলে না। কেন-না কর্ম আমাদের বহির্মুখী করে দেয়। আর বহির্মুখী করলে ধ্যানটা ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব কর্ম করা উচিত নয়, কর্মটা ত্যাগ করো, বলতেন তাঁরা। কিন্তু স্বামীজী এসে বললেন, 'না, না একি কথা! কর্মত্যাগ করতে হবে কেন? কর্ম করো, কিন্তু এই দৃষ্টি থেকে করো যে, ভগবান প্রত্যেক লোকের ভিতর আছেন; তুমি সেই শিবকে দেখে সেবা করবে। তা হলে তুমি ভগবানকে ভুলবে না। যে ভগবানের চিন্তা তুমি ধ্যানেতে করো, সেই ভগবানকেই তুমি সেবার ভিতর পাবে। তুমি শিবজ্ঞানে জীবসেবা করছো। অতএব ভগবানের চিন্তা সব সময় তুমি করছো এবং

সেইজন্য তোমার কর্ম উপাসনা হবে। তোমার আদর্শ ঠিকই থাকবে—তোমার ধ্যানটাও ঠিক থাকবে, আর জগতেরও কল্যাণ হবে।' এই দৃষ্টি থেকে সেবা করলে কোন রকম অসুবিধা হবে না —ধর্মজীবনেও কোন ব্যাঘাত হবে না। এ যেন দু'মুখো ছুরি—দু'দিকেই কাটছে। এক দিকে নিজের কর্মবন্ধন কাটছে আর অন্য দিকে লোক-কল্যাণও হচ্ছে। এইভাবে কাজকর্ম করলে ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি হবে। যারা অশিক্ষিত তাদের আমরা শিক্ষা দিতে পারি; যাদের পর্যাপ্ত আহার জোটে না, তাদের একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি; যারা রুগ্ন, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি; যারা ধর্মবিষয়ে অজ্ঞ, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে পারি।

মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভগবানলাভ করা। কিভাবে? না—মূর্তিপূজার বদলে মানুষের ভিতরে যে দেবতা আছেন তাঁর পূজা করা। মন্দিরে ফুল-চন্দন, নানারকম ভোগরাগ দিয়ে দেবতার পূজা করা হয়। মূর্তির ভিতরে ভগবানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আরাধনা করা হয়, সেবা করা হয়। কিন্তু এখানে তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েই আছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তোমায় সেবা করতে হবে। এ পূজাতে তোমার ফুল-চন্দন লাগবে না। এ পূজার উপচার—যারা খাওয়া-দাওয়া পায় না, তাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, যারা রোগী, তাদের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা; যারা অজ্ঞান, তাদের অধ্যাত্ম-উপদেশ দেওয়া। এই হল এ পূজার পদ্ধতি। আমাদের উদ্দেশ্য Social Service নয়, উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। ভগবানলাভ করার এটা নতুন সাধনা, যা স্বামীজী আমাদের বলে গেছেন

এই নতুন সাধনা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, সমগ্র জগতের জন্যই দরকার। তাই স্বামীজী বলেছিলেন,—'এই একটা নতুন আদর্শ দিয়ে গেলুম।' এই কথাই বাবুরাম মহারাজ এখানে যখন এসেছিলেন ১৯১৪ সালে এই মাঠেতেই বলেছিলেন। বলেছিলেন, 'এই হল যুগধর্ম—স্বামীজী যা বলে গেছেন—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করা।' তখন সেখানে যে সব শ্রোতা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 'মশায়, আমরা আপনার কাছে প্রেমভক্তির কথা শুনতে চাই। আমরা সেবাধর্মের কথা শুনতে আসিনি। প্রেমভক্তির কথা শুনতে চাই।' প্রথমে বাবুরাম মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। কয়েকবার ঐ কথা বলায় বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'প্রেমভক্তি শোনার অধিকারী কেউ আছে এখানে? কেউ নেই।' তখন সেই ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'কি, এত বড় audience-এ একজনও নেই?' তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন, "তাহলে শোন—একটি জায়গায় একজন পসারী একদিন 'প্রেম চাই?' 'প্রেম চাই?' বলে চিৎকার করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বাড়িতে যারা ছিল, প্রেম বিক্রি হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে আর বলছে, 'হ্যাঁ, নেব, কি দাম?' পসারী বললে, 'এর দাম হচ্ছে মাথা—কেউ পারবেন মাথা দিতে?' এ কথা শুনে সবাই আস্তে আস্তে সরে পড়ল।" গল্পটি বলে বাবুরাম মহারাজ বললেন, "মাথা দেওয়া মানে সমস্ত অহংকার-অভিমান বিসর্জন দেওয়া। তোমার দেহাভিমান থাকবে না। 'আমি-আমার' জ্ঞান থাকবে না। তখনই তুমি প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী হবে। তা না হলে রাধাকৃষ্ণের যে লীলা, গোপীদের যে লীলা তা শোনার অধিকার তোমাদের নেই।"

তাই বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, সেখানে সে রকম অধিকারী কেউ ছিল না। এই দু'টি কথা সেদিন বলেছিলেন; একটি—যুগধর্ম—

স্বামীজীর কথা। দ্বিতীয়টি—এই প্রেমের কথা। বাস্তবিকই আমরা কেউ নিঃস্বার্থ প্রেমভক্তির কোন রকম ধারণা করতে পারি না। রাধার যে প্রেমভক্তি সেটা আমরা ভাবতেই পারি না, সেইজন্য বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন যে, যতক্ষণ আমাদের দেহজ্ঞান আছে ততক্ষণ রাধাপ্রেমের কথা শোনবার ও বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। বাবুরাম মহারাজ সেদিন যে দু'টি কথা বলেছিলেন, তাই বলে আজকের মত শেষ করছি।

এই সেবাধর্ম যাতে আমরা অনুশীলন করতে পারি তার জন্য তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন—এইটুকুই তাঁর কাছে প্রার্থনা।*

* ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে মালদহে প্রদত্ত ভাষণ

অখণ্ডানন্দজীর কথা

স্বামী অন্নদানন্দ

২০শে এপ্রিল ১৯৩০; ৭ই বৈশাখ ১৩৩৭, রবিবার।

সান্ধ্য ভজনের পর বাবা যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"ঠাকুরের কাছে এক ভক্ত একসময়ে বলে, 'আমি ও সব জানি।' তার উত্তরে তিনি বলেন,—'বলিস কি রে, আমি যে পাঁচ বছরের ছেলের কাছেও অনেক শিখি। সখি, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি।' 'জানি'—এ অহঙ্কার করা খারাপ। দত্তাত্রেয় (অবধূত) চিল প্রভৃতিকে গুরু করেছিলেন, সকলের কাছেই কিছু কিছু শিখেছিলেন। কোন বিষয়ে শিক্ষা করতে হলে মনে হয় না যে ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট, ওর কাছে কি শিখব? স্বামীজীর মত পণ্ডিত, তিনিও খেতড়িতে নারায়ণ দাসের নিকট পাণিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। খেতড়িতে তাঁর চেয়ে সম্মানের যোগ্য কে ছিল? রাজার গুরু বলেও বটে, আবার নিজের ত্যাগ, তপস্যা পাণ্ডিত্যেও বটে। তিনি আমায় বলেছিলেন, 'নারায়ণ দাসের কাছে ছাত্রের মত পড়া শুরু করেছিলাম।'"

২৭শে এপ্রিল ১৯৩০; ১৪ই বৈশাখ ১৩৩৭, রবিবার।

আজ প্রাতে লালবাগ হইতে ফিরিয়া বাবাকে প্রণাম করিলে পর বাবা বলিলেন,—"কেমন, আমি বলেছিলাম—সামিয়ানা অন্যের দ্বারা আনা হবে না, আর তুমি নিজে গিয়েও আনতে পারলে না। এখন থেকে বেশ ভাল করে মনে রাখবে যে, যা বলব তা implicitly obey করতে হবে। তোমাদের অতদূর চিন্তা করবার শক্তি এখনও হয় নি।"

দুপুরবেলা বাবাকে বাতাস করিতে গেলে পর বাবা বলিলেন,—"দেখ, রাগ এখনও কমল না? আমি জোর করে বলতে পারি—সংসারী লোকেদের সহ্য করবার শক্তি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। সাধু হতে এসেছ—রাগ থাকলে চলবে কেন? এখানে আমার কাছে থেকে তা হলে কি শিখলে? ভয়ানক রাগ হবার কথা, কিন্তু চুপ করে থাকবে। মনের সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে বিকার হয়। কামের উদ্রেক বা ক্রোধের উদ্রেক হলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয়। আর কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি।

"অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে হবে। যে তোমার ওপর ভয়ানক রেগে গেছে, তুমি তার সামনে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখাবে। তা হলে ক্রোধের উৎপত্তিই হবে না। আমি এই আশ্রমে কত সহ্য করেছি। কলেজের কয়েকজন ছাত্র এসে বলে,—'অমুককে তাড়িয়ে দিন।' আমি তাড়াইনি, বলেছিলাম,—'দেখা যাক, তার কতদূর স্পর্ধা হয়!' আমি কাজকে এত বড় দেখি যে, নিজের personality পর্যন্ত একেবারে ভুলে যাই। কথায় কথায় temper lose করাটা বড় অন্যায়।"

১লা মে ১৯৩০; ১৮ই বৈশাখ ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার।

বাবা আমাকে বলিলেন,—"ওহে আজকাল কি গুরুভক্তি আছে? গুরু মরতে বললে মরার জন্য প্রস্তুত হওয়া, আগুনে ঝাঁপ দিতে বললে ঝাঁপিয়ে পড়া, এ সব কি আছে? আজকাল গুরুই শিষ্যের অনুগত।

"তোমরা আমার মনের ভাব বুঝতে পার না, ফস্ করে মুখে যা আসে বলে ফেল। এত দেখছ, শুনছ, তবুও বুঝছ না,—এই আমার দুঃখ। গুরুজন কিছু বললে উত্তর দিতে নেই—মনে রাখবে। আমি শিষ্য-চেলা করি না, তোমরা আমার কাছে আছ,—আমি একাধারে বাপ-মা দুইই আমার মতন দরদ আর কে করবে?

"আমি ইচ্ছে করে তোমাদের irritate করে দেখি—তোমাদের 'temperature' কতদূর ওঠে! গুরুবাক্যে সে শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস কই? গুরুর প্রতি আন্তরিকতা ভালবাসা কি হল?"

৮ই মে ১৯৩০ ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৭, বৃহস্পতিবার

বাবা আজ সকালে আমাদিগকে বলিলেন,—"নিজের তিলপানা দোষকে তালপানা দেখবে, আর অন্যের তালপানা দোষকে তিলপানা দেখবে। magnifying glass-এ যেমন ছোট জিনিসকে বড় দেখায়, তেমনি নিজের দোষটাকে বড় করে দেখবে। যদি নিজেকে defend করতে যাও, তাহলে দোষ শুধরাবে না। This is not the way of forming character."

বাবা আমাকে বলিলেন,—"দেখ—আমি বলেছিলাম, লালবাগ থেকে কোন volunteer আসবে না, তুমি বলেছিলে—বিকেলে আসবে। দেখ, তোমাদের এখনও সে অন্তর্দৃষ্টি হয়নি। ঠাকুরের দয়ায় আমরা সব বুঝতে পারি, তবে চেষ্টা করি না। ঠাকুরের নিষেধ ছিল।

"স্বামীজী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Buddhistic Period পড়ছেন, এমন সময় দেখলেন—ঠাকুরের গাড়ি বলরামবাবুর বাড়ির নিকট এল। স্বামীজী বই বন্ধ করে ছুটে গিয়ে দেখেন সত্যিই ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছেন। তিনি ঠাকুরকে এই সব কথা বলাতে ঠাকুর বললেন,—'ওসব জানতে চেষ্টা করবি না।' স্বামীজী বললেন,—'আমি ত চেষ্টা করিনি।' তখন ঠাকুর বললেন,—'ওদিকে মন দিস না।'

"আমারও এমন হয়েছিল। ৫০০ টাকা মণি অর্ডার করতে পাঠিয়েছি; অনেকক্ষণ ফিরে আসছে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি, এদিকে আবার ঝড় উঠেছে। তখন দেখলাম—'অমুক' ব্রহ্মচারী কামারবাড়িতে বসে হারিকেন আলো টাঙ্গাবার শিক তৈরী করাচ্ছে। ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করি,—'কোথা ছিলি? কি করছিলি?' সে বললে,—'কামারবাড়ি শিক গড়াচ্ছিলাম।' এমন যে কতবার হয়েছে তা গণনা করা যায় না।

"স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এই কথা বলি। তার কয়েক বৎসর পর তিনি বলেন,—'তুমি আর ওসব দেখ?' আমি বলি,—'আজকাল বড় একটা

দেখি না।' তিনি বললেন,—'ঠাকুর psychic power ঘৃণা করতেন, ওতে সাধুর পতন হয়, বলতেন আমরা ঠাকুরের সন্তান, আমাদের ওতে মন থাকবে কেন ?

"আমি জ্যোতিষ ভাল জানি, হাত দেখতেও জানি। তবে ঠাকুরের মানা আছে। তা না হলে তোর হাত দেখে সব বলে দিতে পারি।"

[সমাপ্ত]

জন্মান্তরবাদ ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের আমন্ত্রণে বেণী পালের সিঁথির উদ্যানবাটীতে এসেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে এসেছেন—শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করছেন। সহজ সরলভাবে উপমা দিয়ে পরমতত্ত্বটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অধিকারী-ভেদে কার কি রকম দরকার সেটি বুঝে তাঁদের উপদেশ দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁদের ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণা সেইটাই শেষ কথা নয়। বার বার তাঁদের বলছেন, কলিযুগে ভক্তিপথই সহজ পথ। সগুণ ঈশ্বরের যে উপাসনা তাঁরা করেন, সে বেশ ভাল। সঙ্গে সঙ্গে বেদের সপ্তভূমির প্রসঙ্গ তুলে সপ্তম ভূমিতে নির্বিকল্প সমাধির কথা—নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতির কথা বলছেন। লোকগুরু, যাঁরা জগতের মানুষের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, তাঁদের কথা বলেছেন। সে-কাজ যে সাধারণ গুরু বা আচার্যের পক্ষে অসম্ভব একথাও তাঁদের শুনিয়েছেন। আবার তাঁদের প্রার্থনাপদ্ধতির প্রসঙ্গে বলেছেন—তাঁরা কেন অত ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের কথা বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বধর্ম-সমন্বয়াবতার। সমন্বয়ের জন্যই মর্তধামে তাঁর অবতরণ। তিনি যখন আবির্ভূত হলেন, তখন খৃষ্টধর্মের প্রভাব সমাজের উপর আপতিত হয়েছে এবং তার পূর্ব থেকে আরও কয়েকশ বছর ধরে ইসলামধর্ম ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্ম আরও বিভক্ত হওয়ার মুখে এসে পড়েছিল। তার অস্তিত্ব সম্পর্কেই কারও কারও মনে সংশয় জেগেছিল। ঠিক তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে ধর্মে ধর্মে যে বিবাদ-বিসংবাদ—আমার ধর্ম বড়, তোমার ধর্ম ছোট এই যে দ্বেষ-কলহ—এই মনোভাবটিকে দূর করতে চাইলেন। তিনি তাঁর জীবন ও সাধনা দিয়ে দেখালেন যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সত্য নিহিত রয়েছে। সমস্ত ধর্মপথ দিয়েই একই সত্যে যাওয়া যায়। কিন্তু নিজেকে সেই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠ হতে হবে—বিশ্বাসী হতে হবে, অনুরাগসম্পন্ন হতে হবে, তবেই এই সমন্বয়ভাবটি সকলে গ্রহণ করবে। এইজন্য ঠাকুর হিন্দুধর্মের মধ্যে ও তার বাইরে বিবদমান যে সব ধর্মসম্প্রদায় ছিল, তাদের মিলিয়ে দেওয়ার একটা পথ দেখিয়েছিলেন তাঁর নিজের জীবন দিয়ে। সেই কারণেই তিনি সকলের সঙ্গে মিশতেন। আর যাঁদের তিনি বলতেন 'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী' তাঁদের সঙ্গেও ঠিক এই কারণেই তিনি মিশতেন। তাঁদের তিনি বলতেন, সরল-বিশ্বাসী ও অনুরাগী। তাই তাঁদের কাছে যেতেন, কিন্তু তাঁদের কোন ত্রুটি চোখে পড়লে সেটির সংশোধনের জন্যও নিঃসংকোচে বলতেন। এইভাবেই তাঁদের প্রার্থনাসভায় গিয়ে যে দোষটি তাঁর চোখে পড়েছে—ভগবানের ঐশ্বর্যের মহিমা বর্ণনা ক'রে প্রার্থনা—সে বিষয়ে বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি বলছেন

—তাঁকে আপনার করে নাও, নিজের করে নাও, ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়ে লাভ কি? তাঁর প্রতি অনুরাগের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। উপমা দিয়ে এ সব বুঝিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের মাধুর্যের প্রতি তিনি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে। বাউল কুবীরের একটি গান গাইছেন তাঁদের সামনে—'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' ডুবে যেতে হবে। ব্রাহ্মভক্তদের যে-ভাব, সেটি উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাব। তাই ঠাকুর তাঁদের বলতেন, 'উপর উপর ভাসলে কি জলের নীচের রত্ন পাওয়া যায়?'; 'আগে ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ।'; 'ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল। কিন্তু ডুব দিতে হয়। শুধু উপাসনা, লেকচারে হয় না।' এইভাবে মনকে অন্তর্নিবিষ্ট করতে হবে। বুঝিয়ে বলা হয়—কথায় বলা হয় কতভাবে, তবু মন তাঁতে যায় না। ধ্যানজপ সব ভাসা ভাসা হয়, মন তাঁতে বসে না। এতে কিছুই হয় না। সেইজন্যই বলছেন মনের গভীরে ডুবে যেতে, তবেই প্রেমধন—ভগবদ্ভক্তি লাভ হবে।

শিবনাথ শাস্ত্রীকে ঠাকুর বলছেন, 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করে।' বলছেন, 'শুদ্ধাত্মাদের পূর্বজন্মের বন্ধু ব'লে বোধ হয়।'

পূর্বজন্মের কথার এই সূত্র ধরে একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'মহাশয়! আপনি জন্মান্তর মানেন?'

এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন, হিন্দুধর্মের কয়েকটি সাধারণ ভিত্তিভূমি রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বেদে বিশ্বাস। বেদ অর্থে শুধু গ্রন্থই নয়—গ্রন্থের ভিতর যে অনাদি অনন্ত শাশ্বত জ্ঞানরাশি রয়েছে, তা-ই। এই জ্ঞানরাশিই বেদের প্রতিপাদ্য। সমস্ত হিন্দুজাতি বেদে বিশ্বাস করে। কোন হিন্দুকে নাস্তিক বলা হয় না, যতক্ষণ সে বেদে বিশ্বাসী।

হিন্দুধর্মে সাংখ্যদর্শন, পূর্বমীমাংসাদর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়। বৈশেষিকদর্শনের প্রথম দিক্কার যুগের মত পাতঞ্জল যোগদর্শনেও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ঈশ্বরের কথা নেই। হিন্দুধর্মের যে ষড়্দর্শন, তার মধ্যে পাঁচটিতে ঈশ্বরের কথা প্রায় নেই বললেই চলে; কেবলমাত্র উত্তরমীমাংসাতে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে আছে; বেদান্তদর্শনের আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। শংকরপন্থী যাঁরা, তাঁরা বলছেন ঈশ্বর হলেন মায়ার অন্তর্গত। মায়ার উর্ধ্বে উঠলে আমরা যাঁকে পাচ্ছি, তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরম্।' কিন্তু বেদান্তের অন্যান্য মতাবলম্বীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মায়িক বলেন না। সে যাই হোক এইসব মতবাদই কিন্তু আস্তিক-দর্শন, তা সগুণ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাক বা না থাক। কেন? না—এইসব মতবাদ বেদাশ্রিত, বেদনির্ভর।

তেমনি হিন্দুধর্মের আর একটি বিশ্বাসের ভূমি হচ্ছে আত্মার অমরত্ব। আত্মা হচ্ছেন অমর। দেহের বিনাশ হয়। কিন্তু দেহী যিনি, তিনি প্রয়োজনে আবার দেহধারণ করেন। এই যে পুনর্জন্মবাদ—মৃত্যুর পরে আবার নতুন দেহ ধারণ করা—এই শরীরপরিগ্রহ করাটা জীবের কর্মফল অনুসারে হয়। নানান শরীরে জন্ম হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলানুসারে। সুকৃতির ফলে, উপাসনার ফলে, ভগবৎ-তত্ত্বের অনুশীলনের ফলে কেউ কেউ সূর্যলোক দিয়ে জ্যোতির্মার্গে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। অবশ্য পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলে অনেককেই সেখান থেকেও ফিরে এসে আবার এই পৃথিবীতে শরীরধারণ করতে হয়। কেউ কেউ আবার ব্রহ্মলোক থেকেই মুক্তি পান। অনেকে আবার উপাসনাদি না করে সকামভাবে

যাগযজ্ঞ, দানাদি পুণ্য কাজ করেন। তার ফলে তাঁরা চন্দ্রলোকে যান। এ চন্দ্রলোক কিন্তু আমাদের চন্দ্র একেবারেই নয়—এ হচ্ছে দেবতাদের আবাসভূমি। এই সব সকামকর্মীরা সকলেই পুণ্যক্ষয়ে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। আবার এমন কেউ কেউ আছে কুৎসিত কর্মের ফলে যাদের ক্ষুদ্র কীটাদি শরীরেও জন্মগ্রহণ করতে হয়। এদেরই বলা হয় 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব'-এর দল। অর্থাৎ তারা শুধু জন্মায় আর মরে। আত্মার এই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণের কথা বেদ-উপনিষদ্-পুরাণাদিতে রয়েছে। এই জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন পূর্বোক্ত ব্রাহ্মভক্ত।

প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সোজাভাবে দিলেন না। কেন দিলেন না, সেটি মাষ্টারমশায় স্পষ্টভাবে বলেন নি। আমরা একটু অনুমান করতে পারি। ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।' তিনি বলতে পারতেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি জন্মান্তর আছে।' এখন, 'জানি' না-বলে 'শুনেছি' কেন বললেন? 'জানি' বললে হয়তো ব্রাহ্মভক্তরা নানারকম প্রশ্ন তুলতে পারতেন—'কি করে জানলেন?', 'আপনার পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে কিনা?' এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি সম্ভবতঃ ব্রাহ্মভক্ত বা সাধারণ লোকের সামনে ইচ্ছুক ছিলেন না। এবং সে উত্তর হয়তো তাদের পক্ষে কল্যাণকর নাও হতে পারতো। ঠাকুর যদি বলতেন 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।' তাহলে ব্রাহ্মভক্তদের ভাব নষ্ট হয়ে যেতো। আর ঠাকুর বার বার বলেছেন যে, কারোর ভাব নষ্ট করতে নেই। স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত 'My Master' বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জন্ম থেকেই জানতেন তিনি কে এবং কি উদ্দেশ্যে শরীরধারণ করেছেন। এটি অবতারতত্ত্বের কথা। অবতাররা কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। তাঁরা তাঁদের স্বরূপে সদাই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তাঁর পূর্ব পূর্ব শরীরধারণের বৃত্তান্ত। তবু পূর্বোক্ত কারণে তিনি বললেন না, 'আমি জানি জন্মান্তর আছে।' স্বামীজীকেও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, স্বামীজী নিজের পূর্বজন্মের কথা জানতে পারেন কিনা। স্বামীজী বলেছিলেন, 'জানতে পারি—জানি-ও, কিন্তু details বলবো না।' বলেই সেই প্রসঙ্গ শেষ করেছিলেন।

ঠাকুর বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি জন্মান্তর আছে।' এই 'শুনেছি' কথাটার মধ্যে একটু ভাবনার অবকাশ আছে। তিনি পড়েন নি, লোকে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে নানা সময়ে, 'এতো কথা আপনি কি করে জানলেন? এতো শাস্ত্রের কথা আপনি বলেন, অথচ শাস্ত্রাদি তো আপনি পড়েন নি?' তাতে ঠাকুর বলেছেন 'ওগো আমি শুনেছি কতো।' শ্রীক্ষেত্র ও গঙ্গাসাগরযাত্রী এবং সেখানকার ফেরত বহু সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে, পদ্মলোচন, বৈষ্ণবচরণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে তিনি বহু শাস্ত্রকথা শুনেছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা জানতেন। বাংলা লিখতে পড়তেও পারতেন। তাঁর লেখা পুঁথি এখনও আছে। সংস্কৃত কেউ বললে বা তাঁর কাছে কেউ পড়লে, তিনি তার মানে বুঝতে পারতেন। তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। একবার যা শুনতেন সেটা তাঁর স্মরণে থেকে যেত। এইভাবেই শাস্ত্রের কথা, গীতা উপনিষদাদিতে পুনর্জন্মের কথাও নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। সাধুমুখেও জন্মান্তরবাদের কথা শুনেছিলেন। তাই বলছেন, 'আমি শুনেছি।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, জোঁক যেমন একটা ঘাসের শিসে উঠে সেখান থেকে অন্য ঘাস আশ্রয় করে, তেমনি আত্মা এক

শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহে চলে যান। গীতাতেও আছে, যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, ঠিক সেই রকমই দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। পুরাণাদিতেও কতো উপাখ্যানে জন্মান্তরের কথা আছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে এর প্রচুর উদাহরণ আছে। পুণ্যফলে স্বর্গবাসের কথা আছে : 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।' —স্বর্গকামনা করে যাঁরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাঁরা স্বর্গে গিয়ে সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করেন, কিন্তু তাঁদের পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলেই, তাঁরা পুনরায় মর্তে ফিরে এসে শরীরধারণ করেন। এই মর্তলোকে আসতে হয় কেন? স্বামীজী বলছেন—এই মানব-শরীর ধারণ করলে তবেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ এটি কর্মদেহ; কর্মের দ্বারা—নিষ্কাম কর্ম, উপাসনা প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে মুক্তিলাভ হয়। পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীর দেহ ভোগদেহ। তেমনি পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য লোকে জীবের দেহ ভোগদেহ—কর্মদেহ নয়। তাই সেই সব লোকে মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্মলোক থেকে অবশ্য কেউ কেউ মুক্ত হয়ে যান। সেইজন্যই আচার্য শংকর বলছেন—'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দেবানুগ্রহহেতুকম্, মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।' পৃথিবীতে তিনটি জিনিস দুর্লভ। একটি হচ্ছে মনুষ্যজীবন লাভ করা, তবে মনুষ্যজীবন লাভ করলেও মানুষ পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে পারে—ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। সেইজন্য দ্বিতীয়টির কথা বলছেন: মুমুক্ষুত্ব—মুক্তিলাভের ইচ্ছা। সংসারের এই জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে নিস্তার পাওয়ার ইচ্ছা। কে বলতে পারে—তার মনে কোন ক্ষোভ নেই? কোন দুঃখকষ্ট নেই? সম্পূর্ণরূপে সে সুখী? খুব কম লোকই আছে, যারা এরকম বলতে পারে। কেননা কোন-না-কোন রকম দুঃখকষ্ট মানুষের আছেই। তাই মানুষকে এইসব সুখদুঃখের বন্ধন কাটিয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এইভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি চান, তাঁরাই মুমুক্ষু। এই মুমুক্ষুতাই মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, যা পশুদের থেকে তাকে পৃথক্ করে রেখেছে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে মহাপুরুষের সঙ্গলাভ। এটিও মহাভাগ্যের কথা। অবশ্য মহাপুরুষের কৃপালাভ করেও দেখা যায় জীবনে নানা অসংগতি। মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁরা অহেতুককৃপাসিন্ধু। তাঁদের কৃপা অমোঘ। তবে যাঁরা সে কৃপা পান তাঁরা সবসময়ে তার সদুপযোগ করেন না। ফলে কৃপার ফল ফলতে দেরী হয়ে যায়। যাই হোক, ঈশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধ এই তিনটি দুর্লভ বস্তুর সমাবেশ হলে তবেই মুক্তিলাভ হবে। শাস্ত্রের এই ধরনের অনেক কথাই ঠাকুর শুনেছেন। সেইজন্যই বলছেন—'শুনেছি'। 'আমি জানি'—বললেন না, কারণ প্রশ্নকর্তা তার অধিকারী নন।

ঠাকুর তাই জন্মান্তর সম্বন্ধে নিজের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানের কথা না বলে বলছেন—'ঈশ্বরের কার্য আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবো?' ভগবানের কাজ—জন্ম, মৃত্যু আমরা বুঝি না; কি তাঁর উদ্দেশ্য—কেন এই জন্ম, জরা, ব্যাধি—কেন এতো লোকক্ষয় এক একটা মহামারীতে—এ সব কিছুই আমরা বুঝতে পারি না। ভগবানের ভুবনমোহিনী মায়ার কাজ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে সেটি বোঝা যায় না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বলছেন কেন 'শুনেছি'? তার উত্তরে বলছেন—'অনেকে বলে গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না।' অর্থাৎ শাস্ত্রকাররা, সাধুমহাপুরুষরা বলে গেছেন, তাই বিশ্বাস করি। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হচ্ছে ব্রাহ্মভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গের গভীরে যেতে চাইলেন না বলেই যেন সাধারণভাবে এই

উত্তরটা দিলেন, বিশেষভাবে দিলেন না। জন্মান্তরের কথা যে তিনি অন্তরঙ্গদের বলেন নি তা নয়। বহুবার বলেছেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই এবারে এদেহে রামকৃষ্ণ।' এতো জন্মান্তরেরই কথা! আবার ভাবে দেখেছেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর সংকীর্তনের দল চলেছে। সেখানে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতকে দেখেছেন, আবার ঐ দলের আরও দুজনকে দেখেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে পরে বলেছেন যে, তাঁরা মাষ্টারমশায় ও বলরামবাবু। আবার শরৎ (পরবর্তী কালে স্বামী সারদানন্দ) ও শশী (পরবর্তী কালে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাঁরা 'খ্রিকৃষ্ণে'র (যীশু খ্রীস্টের) দলে ছিলেন। তাঁর মানসপুত্র সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি ব্রজের রাখাল।

কিন্তু ব্রাহ্মভক্তদের ও-সব কথা বললেন না শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে ঈশ্বরের কার্য যে মানববুদ্ধির অগম্য তাই বলতে লাগলেন। শরশয্যায় শুয়ে অমন যে প্রবল-পরাক্রমশালী মহাপবিত্র ভীষ্ম তিনিও কাঁদছেন—কিন্তু কেন? ভীষ্ম বলছেন যে, তিনি দেহের মায়াতে কাঁদছেন না। কাঁদছেন এই ভেবে যে, ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষে—সব সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছেন, তবুও তাদের দুঃখকষ্টের শেষ নেই! কেন এমন হচ্ছে—এই কথা ভেবেই, ভগবানের কাজের থেই না পেয়েই তিনি কাঁদছেন।

ঈশ্বরের মায়া ভেদ করা অসম্ভব। অভিমন্যু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাগ্নে, মহাবীর অর্জুনের পুত্র, তবু তাঁর মৃত্যু হ'ল চক্রব্যূহমধ্যে।—'মাতুলো-যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ। সোঽভিমন্যু-রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥' নিয়তির কি অসীম প্রভাব! তাকে কে প্রতিরোধ করতে পারে? ভগবানের এই মায়িক জগতে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন—জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এগুলি দেহের ধর্ম—প্রকৃতির নিয়মেই এগুলি আসে যায়, আত্মজ্ঞান হলেই এদের জয় করা যায় জ্ঞানী ব্যক্তি দেহের সুখদুঃখে অবিচলিত থাকেন। আমরা বহুবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এ কথা শুনেছি। তিনি রোগজীর্ণ শয্যাশায়ী অবস্থাতেও বলতেন,—'বাবা শরীরটা বৃদ্ধ হয়েছে, ভাল নেই, আমি কিন্তু খুব ভাল আছি।' তিনি 'নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ' অচল অটল—মায়িক শরীরের জরাব্যাধি তাঁকে স্পর্শ করে না। দেহ আর আত্মা যে একান্ত ভিন্ন, তা জানতে হবে। খোসা থেকে শাঁসটুকু আলাদা করে নিতে হবে, খোসাটা চলে যাবে, শাঁসটি ঠিক থাকবে। কেউ শরীরটাকে ধরে রাখতে পারবে না। এই কথাই বুদ্ধদেব তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে তাঁর ভাই আনন্দ যখন কাঁদছেন, তখন তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখ আনন্দ, কেঁদো না, শরীর কতকগুলি জিনিসের সমবায়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, অন্তে সেগুলি অবশ্যই বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। এক আত্মাই কোন কিছুর সংশ্লেষে গঠিত নন। তাই তিনি কখনও বিশ্লিষ্ট হন না

ব্রাহ্মভক্তদের সান্ধ্য উপাসনার পর সংকীর্তন শুরু হয়েছে। শ্রিরামকৃষ্ণ হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য করছেন। এখানে তাঁর নৃত্যের বর্ণনায় মনে হচ্ছে গিরিশবাবুর একটি কথা। তিনি নৃত্য-প্রসঙ্গে মেয়েদের নাচ, পুরুষদের নাচ, ছোট ছেলেদের নাচের উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের নাচের মধ্যে কলাকৌশল আছে, নানান অঙ্গ-ভঙ্গীর মধ্যে লালিত্য আছে, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্য অনবদ্য, অতুলনীয়। সেটি না দেখলে

বিশ্বাস করা যায় না যে, পুরুষমানুষের নাচ এতো সুন্দর হতে পারে। চৈতন্যদেবের নাচের কথায় বলা হত 'নদে টলমল টলমল করে, গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে।' এমনি ছিল তাঁর নৃত্যছন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যভঙ্গীও ছিল তেমনি নয়নাভিরাম, হৃদয়স্পর্শী। গিরিশবাবু বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের তালে তালে মনে হত যেন সমস্ত জগৎ নৃত্য করছে। সেই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে যেন সমস্ত জগতের মধ্যে নৃত্যের স্পন্দন হিল্লোলিত হত। সে একটি অপূর্ব দৃশ্য! সেটি মানুষকে অন্য লোকে নিয়ে যেতো—আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিতো। গিরিশচন্দ্রের মতো একজন যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের নৃত্যের এই অতুলনীয় সুষমা ধরা পড়েছিল।

নৃত্য-কীর্তনান্তে ঠাকুর প্রণাম করছেন—বলছেন, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।' এই প্রণাম দিয়েই ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে প্রথমে পরাজিত করেছিলেন। সে প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র পরে বলেছিলেন, এবারে প্রণাম-অস্ত্রে জগৎ জয় করতে এসেছেন। এখানে সেই প্রণাম করছেন—সকলকে। কেন? না—সকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখছেন।*

* ২৪শে জুন ১৯৭৯, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের 'সারদানন্দ হলে' কথামৃত (১।৩।৭) পাঠ ও ব্যাখ্যাবসরে] জন্মান্তরবাদ ও প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা। স্বামী অচ্যুতানন্দ কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

'সগুণবাদ' ও 'নির্গুণবাদ'

সগুণবাদ ও নির্গুণবাদ সমগ্র বেদান্তদর্শনে কম আলোড়ন তোলেনি যুগে যুগে। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে ব্রহ্ম আছেন অতি নিশ্চয়ই—শাশ্বত সত্তা, চিরন্তন অস্তিত্ব, অনন্ত অসীম স্থিতি অতি নিশ্চয়ই—এ বিষয়ে আপত্তি করবেন কে—মূর্খ নাস্তিক ব্যতীত আর কে? এই পর্যন্ত, পৃথিবীর সকল আস্তিকই একমত সানন্দে। কিন্তু তার পরেই আরম্ভ হ'ল যত গণ্ডগোল, যত মতবিরোধ, যত তর্কাতর্কি; এবং সেই সকল সুদীর্ঘ সুদৃঢ় সুচিন্তিত বাদানুবাদে বেদান্তদর্শন হয়ে উঠল ভারাক্রান্ত। তখন প্রশ্ন হ'ল—ব্রহ্মের আছে কেবল সত্তা—কেবল স্বরূপ, কেবল স্বভাব—আর কিছুই নয়? হ্যাঁ—আর কিছুই নয়—বললেন শঙ্করাদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, এবং আর কিছুর প্রয়োজনই বা কি? সত্তা, স্বরূপ, স্বভাবই ত সব; সত্তা, স্বভাব, স্বরূপই ত বস্তু বা দ্রব্য। তার আবার গুণশক্তির প্রয়োজন কি? তাদের কার্য কি,

প্রয়োজন কি, সার্থকতা কি ? তারা যদি স্বরূপের সঙ্গে এক হয়, তাহলে তাদের প্রয়োজনটা কি—তাহলে তারা কি হবে না কেবলমাত্র নিরর্থক পুনরাবৃত্তিই (duplication) মাত্র ? নিশ্চয়ই। আর, তারা যদি স্বরূপ থেকে ভিন্নই হয়—যা প্রকৃতকল্পে অসম্ভব—তাহলেও স্বরূপের মধ্যে তার বিরুদ্ধ কোনো কিছু থাকেই বা কিরূপে ? তাহলে ত হয়ে গেল উভয়সঙ্কট (dilemma) :

যদি গুণশক্তি স্বরূপের সঙ্গে এক হয়, তাহলে তারা নিষ্প্রয়োজন ; এবং যদি গুণশক্তি স্বরূপ থেকে ভিন্ন হয়, তাহলে তারা অসম্ভব।

(Major Premise)

হয় গুণশক্তি স্বরূপের সঙ্গে এক ; নয় গুণশক্তি স্বরূপ থেকে ভিন্ন। (Minor Premise)

সুতরাং, হয় গুণশক্তি নিষ্প্রয়োজন, নয় গুণশক্তি অসম্ভব। (Conclusion)

সেজন্য অত সব ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই—যা না রাখলেই নয়, তা-ই কেবল রাখ—অর্থাৎ সত্তাকে, স্বরূপকে রাখ—এবং যা অর্থাৎ গুণশক্তিকে বাদ দিলে ক্ষতি নেই, বরং রাখলেই যত গণ্ডগোল, তা বাদই দিয়ে দাও একেবারে। সেজন্য, ব্রহ্মকে বল 'নির্গুণ' নিঃসংশয়ে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদী ব্যতীত অন্যান্য সকল বৈদান্তিকই এতে হলেন অসম্মত। তাঁরা বললেন—গুণশক্তিকে বাদ দিলে ক্ষতি নেই—এ কথা কে বলতে পারেন ? ক্ষতি আছে, অত্যন্ত অধিক ক্ষতিই আছে, যেহেতু, একটি বস্তুর অস্তিত্ব (existence) থাকলেই তার প্রকাশও (manifestation) আছে এবং গুণশক্তি সেই 'প্রকাশ'। অদ্বৈতবাদীরা এক্ষেত্রে বলবেন যে, যে কোনো বস্তুর 'অস্তিত্ব'ই ত তার 'প্রকাশ'—আলাদা ক'রে আবার গুণশক্তির মাধ্যমে তার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা কোথায় ? দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা কিন্তু বলছেন—প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা পরিপূর্ণভাবেই আছে। উদাহরণ নেওয়া যাক—সূর্য ত আছেই, তাকে ত তৎক্ষণাৎ জানছিই সেইভাবে, সূর্য বলেই—তার আবার ঔজ্জ্বল্য, তাপ প্রমুখ গুণাদিতে প্রকাশের প্রশ্নই বা উঠে কিরূপে ? এরূপ বলেন অদ্বৈতবাদিগণ। কিন্তু সূর্য থাকলেও তাকে জানতে গেলেই জানতে হবে তার বিশেষ গুণ—ঔজ্জ্বল্য, তাপ প্রভৃতির মাধ্যমেই, যে বিশেষ গুণ অন্য কোনো দ্রব্যেই নেই ঠিক সেইভাবেই। সুতরাং দ্রব্য ও গুণশক্তির সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্পর্ক—কেবল ভেদের নয়, কেবল অভেদেরও নয়—যা উপরের উভয়সঙ্কটে (dilemma) উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গুণশক্তি স্বরূপতঃ দ্রব্যের সঙ্গে অভিন্ন, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে দ্রব্য থেকে ভিন্ন। এরূপে দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ শেষ পর্যন্ত শাশ্বত ব্যক্তিত্ববাদী ও বৈশিষ্ট্যবাদী (Individualists) না হলে ত ত্রিতত্ত্ববাদই রক্ষা হয় না কোনো ক্রমেই। কারণ এই মতানুসারে, জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও শেষ পর্যন্ত ত ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীব জীবই, জগৎ জগৎই—প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন, নয়ত ত্রিতত্ত্ব আর রইল কোথায় ? সেজন্যই বলা হয়েছে যে, ত্রিতত্ত্ববাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, জগৎ-সত্যত্ববাদী বৈদান্তিকগণ শেষপর্যন্ত 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী' বা 'ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যবাদী'—যা অদ্বৈতবাদিগণ একেবারেই নন।

বস্তুতঃ, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ, এই ক্ষেত্রেও সেরূপ, শঙ্করাদি ও রামানুজাদির মধ্যে রয়েছে স্তরগত প্রভেদই মাত্র। অর্থাৎ, শঙ্করাদিতে যা ব্যাবহারিকই মাত্র, রামানুজাদিতে তা-ই ত হ'ল পারমার্থিক—এর অপেক্ষা উচ্চতর স্তর আর নেই—তার প্রয়োজনও নেই, সার্থকতাও নেই—এখানেই ত্রিতত্ত্ববাদীরা দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা জগৎ-সত্যত্ববাদীরা থেমেছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ আরেকটি উচ্চতর স্তরে উঠেছেন—অন্ততঃ এই হ'ল তাঁদের

শাশ্বত দাবী।

সগুণ-নির্গুণবাদের ক্ষেত্রেও ঘটছে সেই একই ব্যাপার। বস্তুতঃ, বহু উচ্চে উঠে গেলে, দেখা যায় কেবল সত্তাটিকেই, আর কিছুই নয়। যেমন, বহু উচ্চে উঠে গেলে, কেবল সমুদ্রটিকেই দেখা যায়, দেখা যায় তার সত্তাটিকেই কেবল— একটি অতি-বিস্তৃত জলরাশিরূপেই কেবল— আর কিছুই নয়। কিন্তু একটু নীচে নেমে এলে, সেই সঙ্গে দেখা যায় তার বিশেষ বিশেষ গুণশক্তিকেও সমভাবে একই সঙ্গে— দেখা যায় তার উত্তাল তরঙ্গ, তার নীল জল, তার বেলাভূমির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে শাশ্বত লুকোচুরি খেলা; শোনা যায় তার ভীম গর্জন; আস্বাদন করা যায় তার লবণাক্ত জল, স্পর্শ করা যায় তার শীতল জল, ইত্যাদি। ক্ষতি ত কিছুই নেই—জানাটাই ত হ'ল আসল কথা— যেভাবেই জানছ, জানছ ত শেষ পর্যন্ত সেই একই বস্তুটিকে, সেই একই সমুদ্রটিকে, যেভাবেই হোক না কেন, যেভাবেই জাননা কেন, শেষ পর্যন্ত জানছ ত সেই একই বস্তুটিকে সর্বদাই। সেজন্য, যে যেস্তরে আছ, যে যেভাবে পার, যে যেভাবে তৃপ্তি পাও—জেনে ত যাও, জেনে ত নাও সেই একই বস্তুটিকেই—স্ব স্ব স্তর-অধিকার-শক্তি-প্রবৃত্তি-তৃপ্তি-পূর্তি অনুসারে। সেইটিই ত হ'ল আসল কথা— কি ভাবে জানছ, তা নয়। সেজন্য, প্রকৃত-কল্পে একতত্ত্ববাদ ও দ্বিতত্ত্ববাদে বিরোধের কোনো অবকাশই নেই। উচ্চে ওঠ—দেখবে সব একই, একই সত্তা; নিম্নে নাম, দেখবে সেই একেরই, সেই একই সত্তারই বিবিধ-বিচিত্র প্রকাশ— বিরোধ কোথায়? একই সূর্যের একই স্বর্ণাভ আলোক দেখ—আবার দেখ বিশেষভাবে নির্মিত কাঁচের (prism) মধ্যে বিভক্ত সেই একই স্বর্ণাভ আলোকের সাতটি বিভিন্ন রঙে মনোহর প্রকাশ—প্রভেদ কোথায়? বস্তুটি ত সেই একই, তার কেবল সত্তাকেই ধর, বা সেই সঙ্গে ধর তার সত্তার বিভিন্ন গুণশক্তিতে প্রকাশকেও— সমভাবে। কিছুতেই ত সেই সত্তাবান স্থিতিশীল বস্তুটি 'নাকচ' হয়ে যাবে না, অলীক হয়ে যাবে না, অসত্য হয়ে যাবে না কোনো ক্রমেই। সে থাকবেই সর্বদা, তাকে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, যেভাবেই জানা হোক না কেন, যে-দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই গ্রহণ করা হোক না কেন।

একই ভাবে ব্রহ্মও ছিলেন, আছেন, থাকবেন চিরকাল—নানা জনে নানা ভাবে তাঁকে দেখবেন, জানবেন, সেবা করবেন, পূজা করবেন—তাতে তাঁরও কিছু ক্ষতি হবে না, আমাদেরও নয়। কারণ, 'মিছরির রুটি যেভাবেই খাওনা কেন, সিধে করেই খাও, বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগবেই লাগবে।' (শ্রীরামকৃষ্ণ)

সকল আপাতদৃষ্ট বিরোধ-বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেও বিশ্ববন্দ্য বেদান্ত-দর্শনের এই ত অমৃত-রসঘন সাম্য-ঐক্য-সামঞ্জস্য-সমন্বয়ের বাণী।

[ক্রমশঃ]

কোটি চন্দ্র—কোটি তপন
লভিয়ে সেই সাগরে জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশ দিক জ্যোতিমগন॥

তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য, তারি কিরণ; যেই সূর্য, সেই
কিরণ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাষ্টারমশাই শ্যামপুকুরে মেট্রোপলিটন ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি স্কুলের কাজ সেরে বেলা ১২-২৫ মিনিটে বেরিয়ে পড়েন। টালা ঘুরে তিনি উপস্থিত হন কাশীপুরে।

সেদিন শনিবার, ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী।

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রোগশয্যায় শায়িত। ভগবদ্‌রসাপ্লুত তাঁর যাবতীয় ধ্যানধারণা। তাঁর প্রতি মাষ্টারমশায়ের ভক্তি-ভালবাসা যেমন ব্যাপক তেমনি নিবিড়। কাশীপুর বাগানবাড়ীর দোতলার হলঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হন মাষ্টারমশাই। কিছু সময়ের মধ্যে অন্যান্য সেবকেরা চলে গেলে মাষ্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে একা থাকেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষা সাধ্যমত করতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন তাঁর পেটে তেল মালিশ করতে। মাষ্টারমশাই দৌড়ে যান নীচে, ডেকে আনেন সেবক বুড়ো গোপালকে।

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের কাশি ও রক্তক্ষরণ সেবকদের সচকিত করে তোলে। মাষ্টারমশাই ঠাকুরের মাথায় জল ঢেলে দেন।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল, মাষ্টারমশাই বাগানে গাছের ডালে উপবিষ্ট। তিনি একান্তভাবে ব্যাকুল প্রার্থনা করেন, তিনি যেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করার সুযোগ পান। একবার তাঁর মনে হয়, 'ঠাকুরের জন্য আমার প্রাণ দিতেও স্বীকার, যদি প্রয়োজন হয়।' আবার তাঁর মনে হয় যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবার সুযোগ না পেলেই বা ক্ষতি কি, ঠাকুরের সেবকদের সেবা করলেই তো হ'ল।

গোপীদাসের মুখে মাষ্টারমশাই শোনেন কামারপুকুরের ভৌগোলিক সংস্থানের তথ্যাদি। তিনি জানতে পারেন বর্ধমান হয়ে দামোদর ও আমোদর নদ পার হয়ে যেতে হবে। সুলতানগঞ্জের পর কামারপুকুর। কামারপুকুর থেকে একটি খাল অতিক্রম করে শিহড় গ্রাম। আবার এদিকে ঘাটালের পথে খিরপাই, রাধানগর, রামজীবনপুর অতিক্রম করে কামারপুকুর।

পরবর্তী দৃশ্য। ভক্ত মনোমোহন বলেন গত রাত্রের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যন্ত ভগবন্মুখী জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা করে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুপম।

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র বলেন : আমি ও বিষয়ে দশ volume (খণ্ড) বই লিখতে পারি।

সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ মাষ্টারমশাই বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে বাবুরাম। পথে ঠাকুর বংশের জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তাকে গাড়ীতে তুলে নেন।[১] মাষ্টারমশাই পরদিন সকালেই কামারপুকুরে যাবেন।

[১] মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৮০৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ করুণাঘন নিষ্কম্প প্রতিমূর্তি, লোকসংগ্রহের কাজে সদা ব্যস্ত। তিনি মধুরভাষী, কিন্তু আপসহীন তাঁর লোকসংগ্রহ-কর্মের গতি ও লক্ষ্য। দেহের উৎকট রোগযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে তিনি নিরবচ্ছিন্ন লোককল্যাণচিন্তায় নিরত।

১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

লোকোত্তরপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি কাগজ ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নিবিষ্টমনে লেখেন: জয় রাধে! প্রেমময়ী! নরেন শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে-বাইরে হাঁক দিবে। জয় রাধে!

[তাঁর স্বহস্তে লেখার বয়ানটি ছিল :

জয় রাধে প্রেমমোহি—নরেন সিক্ষে দিবে
জখন ঘরে বাহিরে
হাঁক দিবে
জয় রাধে]

জগৎপতি তাঁর স্থনির্বাচিত পুরুষশ্রেষ্ঠকে লোকশিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি। সহজ ভাবাবেগে তিনি তাঁর লেখার নীচে আঁকেন একটি তাৎক্ষণিক চিত্র, একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র। ভাবব্যঞ্জনাপূর্ণ একটি মনোরম রেখাচিত্র। চিত্রপটে একটি আবক্ষ মূর্তি। তার আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি স্থির। তার পিছনে ধাবমান দীর্ঘপুচ্ছ একটি ময়ূর।[২] নবনির্বাচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে চলেছেন চাপরাসদাতা জগৎপতি। নরেন্দ্রনাথের পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠান, তাঁর হাতে তুলে দেন হুকুমনামা। নরেন্দ্র বিদ্রোহ করেন, বলেন: আমি ওসব পারব না।

বলেন: তোর হাড় করবে।[৩]

রামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের নিজস্ব সংবাদদাতা মাষ্টারমশাই সেইক্ষণে কাশীপুরে অনুপস্থিত। তিনি গিয়েছিলেন কামারপুকুর তীর্থদর্শনে। তীর্থমধু সঞ্চয় করে সেদিন রাত্রেই কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ফিরেছিলেন।

মাষ্টারমশাই শোনেন লীলাধিপতির বিচিত্র কীর্তি। দেখেন তাঁর লেখা হুকুমনামা ও আঁকা চিত্রপট। বিস্মিত শিহরিতপ্রাণ মাষ্টারমশাই তাঁর ডায়েরীতে শ্রীরামকৃষ্ণের লেখা ও ছবির অবিকল নকল করে রাখেন। সে-সঙ্গে তিনি মন্তব্য লেখেন: P's হাতের লেখা ও ছবি (কাগজে)

I take [it] without leave as something to valuable to be lost.

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। শ্রীমা নীচের তলার ছোট ঘরটিতে শুয়ে ভাবছিলেন নানান কথা। তিনি শুনেছিলেন মাষ্টার (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছেন। বেচারা কত কষ্টে পথে চলেছে একথা তিনি ভাবছিলেন, এমন সময় সেবক লাটু এসে বলেন: মা, দোর খুলুন, মাষ্টারমশাই কামারপুকুর থেকে ফিরেছেন।[৪]

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে মাষ্টারমশাই গিয়েছিলেন কামারপুকুর তীর্থদর্শনে। রবিবার ৭ই ফেব্রুয়ারী ভোর পাঁচটায় কলকাতা হতে যাত্রা করেছিলেন, ফিরেছিলেন বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী রাতে। শ্রীরামপুর হয়ে ফিরেছিলেন।

প্রত্যাবৃত্ত মাষ্টারমশাই শোনেন যে ঠাকুরের গলকষ্ট বেড়েছে। গলস্ফোটক বাইরে মুখ ফুঁড়ে

২ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরীর পুরানো ও নূতন ক্রমসংখ্যা যথাক্রমে পৃঃ ৬৬৫ ও পৃঃ ১১৫।

৩ স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, দ্বিতীয় সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য শ্রীরামকৃষ্ণের দুটো উক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'মা তাকে তাঁর কার্য করিবার জন্য সংসারে টানিয়া আনিয়াছেন।' 'আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায়?'

৪ নিকুঞ্জদেবীকে শ্রীমার উক্তি—মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৬৭।

বেরিয়েছে।[৫] এত দেহযন্ত্রণার মধ্যেও মাধুর্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ আত্যন্ত কৃপামুখর। যেন আনন্দময় পাঁচবছরের বালক। সেবক লাটু বর্ণনা করেছেন : "যখন কথা বলতে পারতেন না তখনও দেখেছি যে, তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন। এমন আশ্চর্য ব্যেপার হোতো যে কি বলবো! বাইরের লোক এসে বলতো তাঁর কত কষ্টই না হচ্ছে, আর সেইসময় হামাদের কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝাতেন, তাঁর কোন কুছু কষ্ট নেই।"[৬]

মাষ্টারমশাই দোতলার হলঘরে প্রবেশ করে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণবন্দনা করেন। ঘরে উপস্থিত লাটু, যোগীন্দ্র প্রভৃতি সেবকবৃন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসন্নোজ্জ্বল মুখমণ্ডল। তিনি প্রশ্নাদি করে কামারপুকুর অঞ্চলের খবরাদি নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন : **তুমি রঞ্জিত রায়ের দীঘি দেখ নি ?**

তুমি কি [সব পথটা] **হেঁটে গেলে ?**

সেবক লাটু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলেন : মাষ্টার-মশাই খুব [ভাগ্যবান]। বা! [কেমন সব দেখে এলেন]

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখকমল ঈষৎ হাস্যে প্রফুল্লতর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন : **কামারপুকুরের লোক কেমন ?** [ওখানকার] **হাট দেখেছ ?**

মাষ্টার : মেহেরবানপুরের গুরুদাস গোস্বামী আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : [তাকে] **নমস্কার।**

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করেন : **তারা আমার ব্যারামের কথা জানে ?**

মাষ্টার গড় মান্দারণ,[৭] রাস্তার ধারে বড় দীঘি ও কুমীর দেখেছেন। সেকথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : **রাখালেরা পুজা করে কোথায়** [দেখেছ] **?**

মাষ্টার : হাঁ, বিশালাক্ষীর[৮] মন্দিরে।

মাষ্টার ফুলুই শ্যামবাজারে গিয়েছিলেন। শিহড়ের অনতিদূরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নিকটবর্তী বেলটে গ্রামের নটবর গোস্বামীর নিমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামবাসীকে সংকীর্তনানন্দে মাতিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি-চারণ করে বলেছিলেন : 'এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত্ত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন

৫ 'মধ্যে মধ্যে এই অন্তর্ক্ষত শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিত···যতদিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত ততদিন আর কিছুতে শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না।···কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক বহির্দিকে ফাটিয়া পুঁজ হইয়া বাহির হইত। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না।' (রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪৪—৫)। এসময়কার ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন : এক একদিন নাক দিয়ে, গলা দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়ত—অসহ্য কষ্ট হত। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ৬ষ্ঠ সং, ২য় ভাগ—পৃঃ ১০৫)।

৬ শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা, ২য় সং, পৃঃ ২৪৩।

৭ কামারপুকুরের দক্ষিণ পূর্ব দিকে গড় মান্দারণ দুর্গ ছিল। আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্তিত করে গড়ের পরিখা তৈরী হয়েছিল। তার পাশেই বর্ধমানের রাস্তা। রাস্তার দুধারে বড় বড় দীঘি।

৮ কামারপুকুর হতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে আনুড়গ্রাম। সেখানে বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী জাগ্রতা দেবী। গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী।

আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক!…রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে!…আকর্ষণ কাকে বলে, ঐ খানেই (শ্যামবাজারে) বুঝলাম।' (কথামৃত ৪।২০।২)। ঐ অঞ্চলের বিশিষ্ট ভক্তগণ স্বভাবতই শ্রীরামকৃষ্ণের খোঁজখবর করেন। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: [উদ্ধব মথুরা হতে বৃন্দাবন এলে শ্রীকৃষ্ণের সখাসখীগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন] **তিনি কি আমাদের মনে করেন?**

শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ প্রসঙ্গে আরও বলেন: **আমায় আবার মাঝে মাঝে ঈশান মল্লিক[৯] প্রভু বলে** [ডাকত]।

গতকাল মাষ্টার গিয়েছিলেন গুয়েদের বাড়ী। সেখানে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের অনেক কীর্তন হল, আখর পড়ল।

মাষ্টার: বকুলতলা[১০] দেখেছি।

Yes.

বলেন যে, বেলটে গ্রামের নটবর গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

মাষ্টার: হাজরা মশায়ের বাড়ী গিছলুম।

রামকৃষ্ণ-লীলাবিলাসের জটিলা-কুটিলা প্রতাপ হাজরার বাড়ী মারগাও।

মাষ্টার গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্মৃতি-পূত বিভিন্ন স্থানে। তিনি গিয়েছিলেন ভিক্ষা-মায়ের[১১] বাড়ী ও শ্রীনিবাস শাঁখারির বাড়ী[১২]। সেখানে মাষ্টারের মনে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'শ্যামা পুরুষ না প্রকৃতি? একজন ভক্ত পূজা করেছিল। একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় পৈতে! সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে পরিয়ে রেখেছ? ভক্তটি বললে, ভাই, তুমিই মাকে চিনেছ! আমি এখনও চিনতে পারি নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে পরিয়েছি।' (কথামৃত, ১।৬।৩)

মাষ্টার হালদার পুকুর দেখেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাস্তুভিটার উত্তর পাশে অবস্থিত। তিনি রাখাল বালকদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের মধুর কাহিনী শুনেছেন।

মাষ্টার ৺রঘুবীরের প্রসাদী ফুল ও মিষ্টি এনেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সে-প্রসাদ গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ঘ্রাণ নেন, পরে বুকে ও মাথায় স্পর্শ করেন।

মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটা হতে মাটি তুলে এনেছিলেন। সেবক লাটু ভাবের উচ্ছ্বাসে ঐ

৯ ফুলুই শ্যামবাজার গ্রামের ঈশানচন্দ্র মল্লিক কীর্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজগৃহে এনে সেবাযত্ন করেছিলেন।

১০ কামারপুকুরে গোস্বামীদের বাড়ীর সম্মুখে ছিল একটি বড় বকুল গাছ। সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পর নানা দৈব উৎপাত শুরু হয়। লোকের বিশ্বাস হয়, ঐ বকুল গাছে তাঁর প্রেত বাস করে। বিভিন্ন দিব্যদর্শন লাভ করে চন্দ্রাদেবী বলেছিলেন: সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে গোঁসাইয়ে পেয়েছে। [লীলাপ্রসঙ্গ ১।পৃঃ ৭১]

১১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্বে কিছু দূরে অবস্থিত। আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও গদাধর তাঁর পৈতের সময় ধাত্রীমাতা ধনী কামারনীর নিকট প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভিক্ষা-মাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১২ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাড়ীর কিছু পূর্বে অবস্থিত। সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস বা চিনু শাঁখারির সঙ্গে বালক গদাধরের ছিল ভক্ত-ভগবানের মধুর সম্পর্ক।

মাটি প্রসাদজ্ঞানে খেতে উদ্যত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর হাত চেপে ধরেন, বলেন: **আগে প্রসাদ খা।** কিন্তু লাটু ভাবে বিভোর। ঠাকুরের কথা তাঁর কানে ঢোকে না।

মাষ্টার লাহাদের পাঠশালা দেখেছিলেন লাহাবাবুদের বাড়ীর সামনের বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপে পাঠশালা বসত। শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা গঙ্গা-বিষ্ণুর[১৩] সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁকে নিয়ে মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃগৃহের দোতলার ঘরটি দেখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মাষ্টার লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রামবাসীরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন। প্রবীণেরা বলেছিলেন: তিনি আমাদের খুব ভক্তি করেন।

মাষ্টারমশায়ের তীর্থসেবা উপস্থিত সেবকদের মুগ্ধ করে। সেবক যোগীন্দ্র বলেন: মাষ্টারমশাই ভিতর থেকে কি করেন কেউ জানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

যোগীন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি): আপনি ভাল হলে [আমরাও] যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ: **আর কি ভাল হবে?**

তিনি কপালে হাত দেন। মাষ্টারকে হাতটা দেখিয়ে বলেন: **দেখ না, হাতটা [কত] রোগা** [হয়ে গেছে]।

৯ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ছিল শুক্লা পঞ্চমী। সেদিন মাষ্টার মোগলমারীতে[১৪] গুপের দোকানে গিয়েছিলেন এবং বাজারে সরস্বতী পূজা দেখেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ নীরবে শোনেন।[১৫]

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পর্ব লীলাবিলাসের মাধুর্য বিস্ফুরণে মধুময়। ২রা জানুয়ারী থেকে নূতন ধারায় প্রবাহিত ঘটনা-স্রোতের একটি সার্থক পরিণতি ঘটেছিল ১১ই ফেব্রুয়ারীতে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আরব্ধ লোকসংগ্রহের দায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্পণ করেছিলেন।

ধর্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-উক্তি হতে জানা যায় যে, তাঁর মধ্যে দুটি সত্তা সতত-ক্রিয়াশীল ছিল। একটি ভগবানের, অপরটি ভক্তের। ভক্ত-সত্তারই রোগ-ভোগ সেবা-শুশ্রূষা। বিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'শরীরটা যেন বাঁখারিসাজানো কাপড়-মোড়া, সেইটে নড়ছে। যেন কুমড়ো—শাঁসবীচি-ফেলা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার।' অপাপবিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ব্যাধিযন্ত্রণা সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য জানা যায়। প্রথমতঃ ঠাকুরের বড় ভাই বিকারের ঘোরে জল খেতে চেয়েছিলেন, ঠাকুর বারণ করেছিলেন। বড় ভাই তাঁকে অভিশাপ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: এই তাঁর শাপে গলার ঘা। দ্বিতীয়তঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাপ গ্রহণ করেই শ্রীরামকৃষ্ণ-দেহে ব্যাধির সঞ্চার হয়েছিল। তৃতীয়তঃ যাবতীয় পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ করে গেলুম।' এখানে ভক্ত-সত্তার ভিতর হতে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে তাঁর ভগবৎ-সত্তা।

১৩ কামারপুকুরের জমিদার ধর্মদাস লাহার সহোদর নিধিরাম লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র। বাল্যকালে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর প্রীতির সম্পর্ক। ধর্মদাস লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র গয়াবিষ্ণু ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'সাঙাৎ'।

১৪ মোগলমারী ঐ অঞ্চলে পাঠান-আমলের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র (লীলাপ্রসঙ্গ)।

১৫ এ-লেখার অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৫৮-৫৯।

আবার ভগবৎ-সত্তা-প্রধান শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় কার্যকলাপ লোকসংগ্রহ-অভিমুখীন। শ্রীরামকৃষ্ণ লোকসংগ্রহের কার্যে ব্যাপক প্রস্তুতি করেন। কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এই প্রস্তুতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লোকসংগ্রহের কাজে নেতৃত্বের দায়িত্ব দান করেন পুরুষশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথকে। শুদ্ধসত্ত্বজ্ঞানী নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন, সপ্তর্ষির একজন। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নরেন্দ্র 'যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে-কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না।···নরেন্দ্র হেসে-খেলে সব কাজ করে,···সাধে কি নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি?' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।১১৪-৫) সেই নরেন্দ্রকে উপযুক্ত লোকশিক্ষকরূপে গড়ে তোলা ছিল কাশীপুর-উদ্যোগ-পর্বের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: 'কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় আসিয়াছিলেন; সেইরূপ ওর (নরেন্দ্রর) জন্যই তো সব গো।' কাশীপুরের সাধনক্ষেত্র অসাধারণ ক্ষমতাবান নরেন্দ্রনাথের ত্যাগ-তপস্যায় সমুজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথ গুরুনির্দিষ্ট সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন দেখে জগৎপতি শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে লোক-শিক্ষক বলে ঘোষণা করেন, লোকশিক্ষকের চাপরাস নিজ হাতে তুলে দেন। নির্বাচিত লোকশিক্ষককে সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন করবার জন্য এরপর চলতে থাকে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থির ধীর দৃঢ় প্রচেষ্টা।

আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বেই ডাঃ সরকার সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ-ব্যাধির নিরাময় অসাধ্য। এই কালেই ভক্তগোষ্ঠী অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যে ত্যাগী তাপসবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হতে গেরুয়াবস্ত্র লাভ করেছিলেন। একালেই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের ভবিষ্যতের রূপরেখা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত নূতন ভাবধারা ও তার প্রভাবের অনিবার্যতা উজ্জ্বল-ভাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'য় শ্রীরামকৃষ্ণবাণী

সঙ্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

৪৯। মা বললেন, "ঠাকুর বলতেন, 'এই দেহটি গয়া হতে এসেছে।' তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে বললেন, 'তুমি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে এস।' আমি বললুম, 'পুত্র বর্তমান; আমি দেব, সেকি হয়?' ঠাকুর বললেন, 'তা হবে গো, আমার কি ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরবো?' আমি বললুম, 'তবে গিয়ে কাজ নেই।'" ১।১৫৪

৫০। সাধুর রাগদ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার। হৃদয়কে ঠাকুর বলতেন 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করবো, তবে হবে; তা না হলে খাজাঞ্চীকে ডাকতে হবে।' ১।৩২৪-২৫

৫১। সরযূবালার বাড়ীতে ঠাকুরের ছবিতে রোদ পড়ায় ঠাকুর বিন্দু বিন্দু ঘেমেছিলেন, এইরকম বোধ হওয়ার কথা মাকে বলায় মা বললেন,

"হ্যাঁ, মা, তা অমন দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, 'ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।'" ১।১৪৮

৫২। 'কথামৃত' পড়া শুনতে শুনতে মা বলছেন, "ঐ যে রাখালের কথায় তার বাপকে বললেন, 'যেমন ওল তেমন তো হবে।' সত্যই তিনি অমনি করে রাখালের বাবার মন খুশী রাখতেন। তিনি এলেই যত্ন করে এটি ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা বলতেন—মনে ভয় পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎমা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, 'ওরে, ওঁকে ভাল করে দেখাশুনা, যত্ন কর, তা হলে জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে।'"

১।১৩৬

৫৩। মা দাঁতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট পাইতেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'যার দাঁতের বেদনা হয় নাই, সে দাঁতের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না।'" ১।১৯২

৫৪। এ জগতে কি আর আছে? কোন্ জিনিসটা ভাল, বল না? তাই ঠাকুর শজনে খাড়া (ডাঁটা), পলতা শাক, এই সব ছাড়া আর কিছু খেলেন না; মুখে সন্দেশ দিতে যেতুম, বলতেন, 'ওতে কি আর আছে? সন্দেশও যা, মাটিও তা।' ২।৩০-৩১

৫৫। ঠাকুর বলতেন—তখন কাশীপুরে ব্যারাম—"যারা লাভের আশায় এসেছিল, তারা সব চলে গেল, বললে, 'উনি অবতার, ওঁর আবার ব্যারাম কি? ও সব মায়া!' কিন্তু যারা আমার আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে।" ২।৪১

৫৬। কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা ছেলেরা সব করত। তিনি তাদের নানা কথায় আনন্দে রাখতেন। বলতেন, 'একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন করে পারবে।' তিনি সব্বায়ের মন বুঝে চলতেন সেবার তেমন দরকার হত না। ২।৬৪

৫৭। গৌরমা উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন, 'ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে।'

মা—হাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার হুঁকো-কলকে হাতে থাকবে।' ভাঙ্গা একটু পাথরের বাসন ঠাকুরের হাতে থাকবে। হয়তো ভাঙ্গা কড়ায় রান্না হবে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। "লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসছি না।' তিনি হেসে বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবে কোথায়? প্রাণ টিকবে না। কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'"

২।৮৭-৮৮

৫৮। ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কূলকিনারা নেই।' ২।৯৫

৫৯। ঠাকুর বলতেন, 'তারা [অন্তরঙ্গরা] কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকূপ থেকে, কেউ হাত-পা থেকে বেরিয়েছে। তারা সব সঙ্গের সঙ্গী।' যেমন যখন রাজা কোথাও যায়, সব সঙ্গের লোকজন তথায় যায়। আমি যদি জয়রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের যারা তারা সব যাবে না? তেমনি যারা আপনার, তারা সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তারা ব্যথার ব্যথী।' এই সব ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।' ২।৯৬-৯৭

[ক্রমশঃ]

পয়ারের পদসঞ্চার : ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠ

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী*

[উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৬ সংখ্যায় (পৃঃ ২৪৮) লেখকের 'তবু' (দ্বাদশাক্ষর-দ্বাদশচরণ), 'সঙ্গম' (দশাক্ষর-দশচরণ), 'পঙ্ক ও পদ্ম' (অষ্টাক্ষর-অষ্টচরণ), এবং 'বীজমন্ত্র' (ষড়ক্ষর-ষট্‌চরণ)—এই কবিতাচতুষ্টয় 'চতুরঙ্গ' শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং উহার পাদটীকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের শেষ বাক্যে লেখা হইয়াছিল : 'এই ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি-কৃত এক প্রবন্ধ এই পত্রিকার পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিতব্য।' বর্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ।—সম্পাদক]

॥ প্রথম ভাগ ॥

॥ ১ ॥

পয়ার চৌদ্দমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং বাংলা কাব্যলোকের সুপ্রাচীন ভাষাবাহন রূপে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত, কিন্তু পয়ার যে তার পদসঞ্চারে দ্বিপদী ছন্দ—আট ও ছয় অক্ষরমাত্রিক দ্বিপদ-চারণায় অগ্রসর সে কথাটা প্রাচীন বাংলার কবিদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হয়।[১] অষ্টাক্ষরের পরে যতিচ্ছেদের প্রয়োজন বোধ না থাকায় চৌদ্দ-অক্ষরবিশিষ্ট একটি পদ অখণ্ড বা অভঙ্গ মর্যাদা পেত।[২] বস্তুত, পয়ার ছন্দের দ্বিপদী প্রকৃতিটি আবিষ্কৃত হয় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে,[২] অথচ রামায়ণ মহাভারত থেকে অন্নদামঙ্গল বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পর্যন্তও পয়ারকে কেউ দ্বি-পদী ছন্দ-রূপে পরিচিত করেননি, এবং অষ্টাক্ষর পদ ও ষড়ক্ষর পদে বিভক্ত করেননি, মধ্যে যতি স্থাপনার প্রয়োজনও বোধ করেননি ; সুর করে গানে প্রকাশ করাই ছিল বাংলার প্রাচীন ছন্দ-পরিবেশন রীতি, ছন্দ-পাঠ প্রচলিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যের আধুনিক অঙ্গনে। মনে হয় এই ছন্দ-পাঠের প্রয়োজনেই একপদী পয়ার হয়ে পড়ে সুস্পষ্ট বিভাগে ও সুস্পষ্ট যতি-বিন্যাসের প্রয়োগে দ্বিপদী পয়ার, এবং পয়ার বলতে একমাত্র ঐ দ্বিপদী পয়ারকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করার জন্য দ্বিপদী বিশেষণটি অপ্রয়োজনে স্খলিত হয়ে অপরিবর্তনীয় নাম হয় 'পয়ার'।

পয়ার নববিন্যাসে হল স্পষ্টতই দ্বি-পার্বিক—অর্থাৎ দ্বি-পদকেই বলা হল দ্বি-পর্ব। সম্পূর্ণ একটি চরণই (চরণ শব্দের অর্থও যদিও পদ, তবুও) একাধিক পদে তথা পর্বে অর্থাৎ ৮ + ৬ = ১৪ অক্ষরে সজ্জিত হয়ে পয়ার ছন্দের পদসঞ্চার সুরু হল—শ্বাসযতি ও পর্বযতির অনুরোধে (অর্থযতির নয়) মধ্যভাগে থেমে। 'পয়ারের যতিহীন অখণ্ড পদ'[৪] দেখা দিল মধ্যবর্তী অর্ধযতি-যুক্ত দ্বি-পদী প্রকৃতির আবিষ্কারে—ঈশ্বর গুপ্তেরও পরে[২], এবং তা মধুসূদনের হাতেই কি ?

বস্তুত, পয়ারের ত্রি-রূপ বাংলা প্রাচীন কাব্যলোকে পরিস্ফুট : এক ॥ খর্ব পয়ার ; দুই ॥ মধ্য পয়ার ; তিন ॥ দীর্ঘ পয়ার।[৩] পরবর্তীকালে পয়ার তার 'খর্ব' বিশেষণ বর্জন করে হল কেবল-মাত্র পয়ার ; মধ্য পয়ার হল লঘু ত্রিপদী, এবং দীর্ঘ পয়ার হল দীর্ঘ ত্রিপদী (বা কেবলমাত্র ত্রিপদী), এবং এর সঙ্গেই দ্রষ্টব্য পয়ার-চৌপদী বা কেবলমাত্র চৌপদী। অর্থাৎ পয়ারের পদসঞ্চার তথা পদ-চারণা-ক্ষেত্রে ছন্দবৈচিত্র্য হল : ১ ॥ পয়ার দ্বিপদী তথা পয়ার ; ২ ॥ পয়ার ত্রিপদী তথা ত্রিপদী [ক ॥ লঘু ত্রিপদী, খ ॥ দীর্ঘ ত্রিপদী (বা কেবলমাত্র ত্রিপদী)] ; ৩ ॥ পয়ার-চৌপদী তথা চৌপদী এবং এর পরেও উল্লেখ করা যায় : ৪ ॥ পয়ার একাবলী।

* কলিকাতা সিটি কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক—বহুমুখী সাহিত্যব্রতী, অনুবাদক ও রবীন্দ্র-গবেষক ; সাম্প্রতিক গ্রন্থ : 'আকাশ যেখানে মাটির কাছে', 'সেক্‌সপিয়ার কিশোর ওম্‌নিবাস', 'বিশ্বসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-গল্প সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড)।

এবারে একে একে দেখা যাবে এক পয়ার থেকেই দেখা দিয়েছে কত বিচিত্র ছন্দরূপ, প্রাচীন এবং আরো বিশেষত আধুনিক কালে।

॥ ২ ॥

অষ্টাক্ষর পর্বই পয়ারের মূলভিত্তি।[৪] একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই অষ্টাক্ষর পর্বই যোগ-বিয়োগে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এবারে সেই রূপবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাক :

এক ॥ পয়ার : মূলপর্ব অষ্টাক্ষর (আটমাত্রিক)

(অ) ● চ্যবন ঋষির পুত্র | নাম রত্নাকর। ৮।৬
দস্যুবৃত্তি করে সদা | বনের ভিতর ॥ —রামায়ণ ৮।৬

(আ) ● হোথায় ত্রিলোকনাথ | বলদে চড়িয়া। ৮।৬
হা অন্ন হা অন্ন করি | বেড়ান ফিরিয়া ॥ —অন্নদামঙ্গল ৮।৬

(ই) ● চেতরে চেতরে চেত | ডাকে চিদানন্দ। ৮।৬
চেতনা যাহার চিত্তে | সেই চিদানন্দ ॥ —ঐ ৮।৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রত্যেকটি শব্দেরই স্বরান্ত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল প্রাচীন পয়ারের প্রাচীন পাঠরীতিতে। তাই অষ্টাক্ষরই আটমাত্রার মূল্য পেত। তাই পয়ারের মূল পর্বকে অষ্টাক্ষর পর্ব বলা হল। পরবর্তী কালে শব্দান্তের স্বরান্ত উচ্চারণের স্থলে যেখানে হলন্ত উচ্চারণ যখন বাংলা উচ্চারণে রীতিসম্মত হল, তখন ঐ হলন্ত এক অক্ষরই হল দ্বিমাত্রিক এবং যথা-রূপে পূর্বের অষ্টাক্ষর হল আটমাত্রিক, ষড়ক্ষর হল ছয়মাত্রিক, চতুরক্ষর চারমাত্রিক।

উল্লিখিত পয়ারের কয়েকটি ছন্দ-বৈশিষ্ট্য :

এক ॥ অষ্টাক্ষর+ষড়ক্ষর=চৌদ্দ-অক্ষর প্রতিটি চরণে স্থিত, অষ্টাক্ষরের পরে যতি—শ্বাস-যতি তথা বাক্যাংশবোধক যতি।

দুই ॥ যুগ্মচরণের প্রথম চৌদ্দ-অক্ষর চরণের শেষে এক দাঁড়ির অর্ধচ্ছেদ, দ্বিতীয় ঐরূপ চরণের শেষে দুই দাঁড়ির পূর্ণচ্ছেদ।

তিন ॥ উল্লিখিত (অ) ও (ই) উদাহরণে একদাঁড়ি অর্ধচ্ছেদবোধক, বর্তমানকালের ছেদ-চিহ্ন ব্যবহারে সেমিকোলনবৎ (বা এমন কি কমাবৎও) বলা চলে। যাই হোক, এই ছেদবোধ অর্থ-যতি ও শ্বাসযতির প্রয়োজনে একান্তই অনিবার্য।

চার ॥ উল্লিখিত (আ) উদাহরণে একটু নববৈশিষ্ট্য বা ব্যতিক্রম দ্রষ্টব্য। এখানে প্রথম চরণান্তের একদাঁড়ি বাক্যের অর্থাৎ বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে অর্ধচ্ছেদবোধক একেবারেই নয়, [এবং (অ) ও (ই) উদাহরণের প্রথম চরণান্তিক দাঁড়িতুল্যও নয়]; বস্তুত, প্রথম চরণান্তে এসেও বাক্য পরবর্তী চরণে প্রবাহিত। বহিরঙ্গ বিচারে এখানে অষ্টাক্ষর+ষড়ক্ষর=চৌদ্দ-অক্ষরে চরণ গঠিত হলেও চরণান্তরে গিয়ে বাক্য পূর্ণচ্ছেদ তথা বিরাম লাভ করেছে। এই প্রথম চরণান্তিক দাঁড়ি এখানে প্রায় অর্থহীন ও অসঙ্গত,—কেবলমাত্র এটা অন্ধ প্রথানুসরণেই প্রতিষ্ঠিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদন তাঁর বাল্যকালে সর্বপ্রথম এই একদাঁড়ি ও দুইদাঁড়ি ব্যবহারের অর্থহীনতা লঙ্ঘন করেন, এবং প্রথম চরণান্তে শ্বাসযতি

ও অর্থযতির স্বাভাবিক অনুরোধে 'কমা' ব্যবহার করেছেন, দ্বিতীয় চরণান্তে একদাঁড়ি। উদাহরণ,

গভীর গর্জন সদা | করে জলধর, ৮।৬
উথলিল নদনদী | ধরণী উপর।[৫] ৮।৬

[এখানে উল্লেখ করা যায়, মধুসূদনই কাব্যলোকে সর্বপ্রথম বিভিন্ন অর্থবোধক বিচিত্র ছেদচিহ্ন ব্যবহার করেছেন—গদ্যলোকের ঈশ্বরচন্দ্রের পাশাপাশি। যেমন স্বল্পছেদ , অর্ধছেদ ; প্রশ্নচিহ্ন ? বিস্ময়চিহ্ন ! উদ্ধৃতি-চিহ্ন ' ' চলৎ-চিহ্ন— যোগচিহ্ন + বন্ধনীচিহ্ন ( )। মধুসূদন পয়ার ছন্দের পদসঞ্চারে দুইদাঁড়ির অযথা ব্যবহার তুলে দিয়ে এবং একদাঁড়িরও অযথা ব্যবহারের বদলে নতুন ছেদচিহ্ন প্রয়োগ করেছেন।]

বলাই বাহুল্য, পয়ারের সুনির্দিষ্ট রীতি-অনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণান্তিক মিল থাকাটা অনিবার্য—পয়ারের প্রাচীন পর্বের সমস্ত উদাহরণেই এটা গৃহীত রীতি। শিল্পসাধনায় পয়ারের কত অভিনব রূপই না সৃজন করা সম্ভব—সেটা যথাস্থানে পরে আমরা দেখতে পাব।

দুই ॥ ত্রিপদী (দীর্ঘ ত্রিপদী) : আটমাত্রিক মূলপর্ব, বিশেষ-পর্ব দশমাত্রিক :

● শিশুগণ সঙ্গে ফিরে   তাড়ায়্যা শশারু ধরে   ৮+৮+
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে।   ১০(=৮+২)
বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে   লতায় জড়ায়্যা বান্ধে   ৮+৮+
কান্ধে ভার বীর আস্তে ঘরে ॥ —মুকুন্দরাম   ১০(=৮+২)

—দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রচলিত পর্ববিন্যাসের অক্ষর-সজ্জা হল ৮+৮+১০, অর্থাৎ তৃতীয় ও ষষ্ঠপদের অক্ষর-সংখ্যা হল ৮+২=১০ ; মূলপর্ব অষ্টাক্ষর, কিন্তু বিশেষ-পর্ব অষ্টাক্ষর+দ্বি-অক্ষর=দশাক্ষর। যেমন লঘু ত্রিপদীতে মূলপর্ব ষড়ক্ষর, বিশেষ-পর্ব ষড়ক্ষর + দ্বি-অক্ষর=অষ্টাক্ষর।

ত্রিপদী (লঘু ত্রিপদী) : মূলপর্ব ছয়মাত্রিক, বিশেষ-পর্ব আটমাত্রিক :

● কলঙ্কী বলিয়া   ডাকে সর্বলোকে   ৬+৬+
তাহাতে নাহিক দুখ।   ৮(৬+২)
তোমার লাগিয়া   কলঙ্কের হার   ৬+৬+
গলায় পরিতে সুখ ॥ —চণ্ডীদাস   ৮(=৬+২)

● সভাজন শুন   জামাতার গুণ   ৬+৬+
বয়সে বাপের বড়।   ৮(=৬+২)
কোনো গুণ নাই   যেথা সেথা ঠাঁই   ৬+৬+
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ —ভারতচন্দ্র   ৮(=৬+২)

● পঙ্ক হতে উঠে | যথা পঙ্কজিনী, | ভুঁইচাঁপা ছাড়ি ভুঁই,   ৬+৬+৮(=৬+২)
আমার হৃদয়ে | মূলটুকু রাখি | তেমনি উঠিলি তুই,   ৬+৬+৮(=৬+২)
তোর সাথে মোর | জীবনের যোগ, | তবু এক নহি—দুই।   ৬+৬+৮(=৬+২)
—কামিনী রায়

—এটা তো লঘু ত্রিপদীই, বৈচিত্র্য কেবল পর্ব সাজাবার কায়দায়।

এখানে দীর্ঘ ত্রিপদীর ও লঘু ত্রিপদীর পদসঞ্চারে ৩য় ও ৬ষ্ঠ পদ সম্পর্কে দেখবার বিষয়, ওটি একপর্ব হলেও ওখানে মূলপর্বের সঙ্গে দ্বি-অক্ষর যোগেই বিশেষ-পর্ব গঠিত হয়েছে ; যেমন দীর্ঘ ত্রিপদীতে ৮+২=দশাক্ষর, লঘু ত্রিপদীতে ৬+২=অষ্টাক্ষর : পর্ববিন্যাসে দ্বি-অক্ষরকে একপর্বের অন্তর্গত দেখানো হয়, নইলে ত্রিপদী ত্রি-পদ ছাড়িয়ে বাঁধা-নিয়ম মতো চৌপদীর আকার ধারণ করে। অথচ সম-ত্রিপদে বিন্যস্ত করলে তা হয় এইরূপ (কিছু পূর্বে লিখিত দুই ॥ উদাহরণ অনুসরণে) :

দীর্ঘ ত্রিপদী : দূরে গেলে ছুবায় কু | -কুরে। : ৩য় পদ
কান্ধে ভার বীর আস্তে | ঘরে ॥ : ৬ষ্ঠ পদ

লঘু ত্রিপদী : তাহাতে নাহিক | দুখ। : ৩য় পদ
গলায় পরিতে | সুখ ॥ : ৬ষ্ঠ পদ

সঙ্কুচিত দীর্ঘ ত্রিপদী : মূলপর্ব আটমাত্রিক, বিশেষ-পর্ব ছয়মাত্রিক :

● আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়, ৮+৮
তাই ভাবি মনে। ৮—২=৬
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়, ৮+৮
ফিরাব কেমনে ? —মধুসূদন ৮—২=৬

● লাভক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ ৮+১০
কলহ সংশয়। ৮—২=৬
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি ৮+১০
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়। —রবীন্দ্রনাথ ৮—২=৬

—উল্লিখিত দ্বিতীয় উদাহরণের বৈশিষ্ট্য হল, দ্বিতীয় পদ প্রথম পদতুল্য অষ্টাক্ষর নয়, দশাক্ষর ; ১ম, ২য় ও ৩য়, বা ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পদ অসম-অক্ষরবিশিষ্ট। কিন্তু দুটি উদাহরণেই ৩য় ও ৬ষ্ঠ পদ সঙ্কুচিত—১ম ও ২য় বা ৪র্থ ও ৫ম পদের চেয়ে সঙ্কুচিত অর্থাৎ হ্রস্ব বলেই নাম সঙ্কুচিত ত্রিপদী।

দীর্ঘ চৌপদী : মূলপর্ব আটমাত্রিক, বিশেষ-পর্ব ছয়মাত্রিক :

● পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম তুচ্ছ তারা সূর্য সোম ৮+৮
ব্রহ্মাণ্ড নখাগ্রে যেন | গণিবারে পারে, ৮+৬
সম্মুখে সাগরাম্বরা ছড়ায়ে রয়েছে ধরা ৮+৮
কটাক্ষে কখন যেন | দেখিছে উহারে। —বিহারীলাল ৮+৬

—দীর্ঘ চৌপদীর সঞ্চরণ দীর্ঘ চার-পদে তথা দীর্ঘ চার-পর্বে : ৮+৮+৮+৬(=৮—২), মূলপর্ব অষ্টাক্ষর, বিশেষ-পর্ব ষড়ক্ষর।

লঘু চৌপদী : মূলপর্ব ছয়মাত্রিক, বিশেষ-পর্ব পাঁচমাত্রিক :

● বিধুমুখে তোর | আধ আধ বাণী | অমৃত বরষে | শ্রবণে মোর। ৬+৬+৬+৫
আপনা আপনি | হরিষ পরাণী | হরষ নাচনী | দেখিলে তোর ॥ ৬+৬+৬+৫

—যদি তিনটি মূলপর্ব ষড়ক্ষর হয় ও ৪র্থ পর্ব হয় পঞ্চাক্ষর তবে তাকে বলা হয় লঘু চৌপদী।

একাবলী : মূলপর্ব ছয়মাত্রিক : (৮—২=৬), বিশেষ-পর্ব পাঁচমাত্রিক :

● এতদিন পরে | বঁধুয়া এলে। ৬+৫
দেখা না হইত | পরাণ গেলে ॥ ৬+৫
দুখিনীর দিন | দুখেতে গেল। ৬+৫
মথুরাপুরীতে | ছিলে তো ভালো। —চণ্ডীদাস ৬+৫

মহাপয়ার : মূলপর্ব আটমাত্রিক, বিশেষ-পর্ব দশমাত্রিক :

● যথা শেফালিকা ফুল | বিতরিয়া গন্ধ মনোহর। ৮+১০=১৮
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে | ঝরি পড়ে ধরণী উপর ॥ ৮+১০=১৮
সেইরূপ অরিসিংহ | যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বলহত। ৮+১০=১৮
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে | অবশেষে জীবন-বিগত ॥ —রঙ্গলাল ৮+১০=১৮

অষ্টাক্ষর+দশাক্ষর, বা দশাক্ষর+অষ্টাক্ষর—এইরূপ দুইপদের সঞ্চরণে যখন চরণ গঠিত হয়, তখন সেই ছন্দকে বলে মহাপয়ার। এই উদাহরণটিতে পদের দ্বি-পর্বের গঠন হল ৮+১০ অক্ষরে; এখানে দেখবার বিষয়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-পূর্ব এই মহাপয়ার স্বপ্রকৃতিতে প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও চরণান্তিক একদাঁড়ি ও দুইদাঁড়ির প্রাচীন পয়ার-শৃঙ্খলে আড়ষ্ট। এটি সমিল মহাপয়ার।

মহাপয়ার : আঠারোমাত্রিক, অন্ত্যমিলযুক্ত এবং প্রবহমান : পর্ববিভাগ অসমরূপে বৈচিত্র্যময় :

● আগুন লেগেছে কোথা ? | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি ৮+১০=১৮
জাগাতে জগৎ-জনে ? | কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে ৮+১০=১৮
শূন্যতল ? | কোন্ অন্ধকার মাঝে | জর্জর-বন্ধনে ৪+৮+৬=১৮
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? | স্ফীতকায় অপমান ১০+৮=১৮
অক্ষমের বক্ষ হতে | রক্ত শুষি করিতেছে পান ৮+১০=১৮
লক্ষ মুখ দিয়া।······ —রবীন্দ্রনাথ ৬+······

—এখানে ১০+৮ বা ৮+১০=১৮ অক্ষরের দ্বিপর্ব-চরণ যেমন বর্তমান, তেমনি ত্রিপর্ব-চরণও, যেমন ৪+৮+৬=১৮। এই মহাপয়ার প্রবহমান এবং অন্ত্যমিলযুক্ত।

হ্রস্ব-মহাপয়ার বা দীর্ঘপয়ার : আটমাত্রিক+আটমাত্রিক=ষোলমাত্রিক :

● সহসা নিদ্রার মাঝে | একি জাগরণ মম ! ৮+৮=১৬
এই ছিলে—আর নাই, | চলে গেছ স্বপ্ন সম ! „
চেয়ে আছি চেয়ে আছি, | হৃদয়ে পড়িছে ছেদ— „
পশ্চাতে আলোক ছায়া, | স্বর্গে মর্তে অবিভেদ।[৬] —অক্ষয়কুমার বড়াল „

—পয়ার ও পয়ার-ভিত্তিক ছন্দ-বৈচিত্র্য ও তার পদ-সঞ্চার তথা পর্ব-গঠনের বহুবিধ রীতি-পদ্ধতির প্রথম পরিচিতি এখানেই সম্পূর্ণ।

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

এবারে দেখা যাক, পয়ার-ছন্দকে ভিত্তি করেই তার অভিনব কত অ-পূর্ব রূপ-বৈচিত্র্য (মহাপয়ার পূর্বেই আলোচিত) দেখা দিয়েছে বাংলা কাব্যলোকে, এবং সেটা সর্বপ্রথমে কেমন করে সম্ভব হয়েছে মহাকবি-মহাছান্দসিক শ্রীমধুসূদনেরই হাতে।

এক ॥ মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার তথা অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ-সঞ্চার :

ক ॥ অ ॥ চৌদ্দমাত্রিক চরণে দ্বিপর্ব-বৈচিত্র্য : ৮+৬=১৪ ; ৬+৮=১৪ ; ৪+১০=১৪ ; ১০+৪=১৪

- অস্তে গেলা দিনমণি ; | আইলা গোধূলি,— ৮+৬=১৪
  একটি রতন ভালে। | ফুটিলা কুমুদী ; ৮+৬=১৪

আ ॥ আটমাত্রিক পর্বের অভিনব সংগঠন ও সঞ্চরণ ৩+৩+২=৮

- আইলা সুচারু-তারা | শশী সহ হাসি,
  শর্বরী ; সুগন্ধবহ | বহিল চৌদিকে,··· ৩+৩+২=৮+৬=১৪
- চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
  লিখন। না থাকে যদি | পাপ এ শরীরে·· ৩+৩+২=৮+৬=১৪
- সম্মুখ সমরে পড়ি | বীরচূড়ামণি
  বীরবাহু, | চলি যবে গেলা | যমপুরে
  অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি, ৩+৩+২=৮+৬=১৪

খ ॥ ত্রি-পর্ব বৈচিত্র্য : ৪+৬+৪=১৪ ; ৪+৪+৬=১৪

- বীরবাহু, | চলি যবে গেলা | যমপুরে ৪+৬+৪=১৪
- একটি রতন মোরে | দিয়াছিল বিধি
  কৃপাময় ; | দীন আমি | থুয়েছিনু তারে, ৪+৪+৬=১৪
  রক্ষাহেতু তব কাছে, | রক্ষকুলমণি,

গ ॥ ত্রি-পর্ব সঞ্চরণে বিস্ময়কর অভিনবত্ব : ২+৮+৪=১৪ ; ৪+৪+৬=১৪ ; ২+৮+৪=১৪

- বন্দি চরণারবিন্দ, | অতি মন্দমতি
  আমি, | ডাকি আবার তোমায় | শ্বেতভুজে ২+৮+৪=১৪
- বিবিধ ভূষণে আজি | কি হেতু সাজিছে ৮+৬=১৪
  কোন্ রঙ্গে ? | অকালে কি | আরম্ভিলা প্রভু ৪+৪+৬=১৪
  যজ্ঞ ? | কি মঙ্গলোৎসব আজি | তব পুরে ? ২+৮+৪=১৪
- কুসুমরতনহীন | বনসুশোভিনী
  লতা ! | অশ্রুময় আঁখি | নিশার শিশির ২+৬+৬=১৪
  পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন।



দীন আমি | থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে, | রক্ষকুলমণি,
তরুর কোটরে রাখে | শাবকে যেমতি
পাখী। | কহ, কোথা তুমি | রেখেছ তাহারে ২+৬+৬=১৪

—বিশেষভাবে অনুধাবনীয়, মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারের তথা অমিত্রাক্ষর ছন্দের পর্ববিন্যাসে অ-পূর্ব রীতি-বৈচিত্র্য, এবং সেখানে কেবলমাত্র পয়ারের অষ্টাক্ষর-ষড়ক্ষরযুক্ত দ্বিপর্ব বন্ধনের অনিবার্যতা থেকেই মুক্তি ঘটেনি,—নব নব পদস্থাপনার স্বচ্ছন্দ গতি-সৌন্দর্যই ছন্দকে আনন্দিত রূপ দান করেছে,—এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীন সাবলীল স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। উল্লিখিত উদাহরণগুলি ও তার পর্ববিন্যাস-পদ্ধতি লক্ষ্য করলে বহুবৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। এখানে ছন্দবিন্যাস তাই কেবল দ্বি-পর্বেই নয়, ত্রি-পর্বের সঞ্চরণ আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ—অর্থ-যতিই সেখানে পর্ববিন্যাস-রীতিকে প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করেছে। ছন্দের অর্থ-নিরপেক্ষতা কৃত্রিমতা-যান্ত্রিকতা হল ধ্বনিবিজ্ঞানমাত্র। ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সেখানে অর্থময়তার সহজ উপস্থিতিই ছান্দসিক কবির সাধনার বিষয়; ছন্দপাঠ ও কাব্যপাঠ সেখানে হরিহর আত্মা। বাংলার কাব্যলোকে মধুসূদনই সর্বপ্রথম শিল্পী-কবি—যিনি এই মিলন-মহিমা উপলব্ধি করেছেন ও যোগ্য যতি-স্থাপনার দ্বারা অভিনব পর্ববিন্যাস বৈচিত্র্যে তাকে রূপায়িত করেছেন,—রচনা করেছেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ। তাই ভাব-ভাষার সংযোগে দ্বৈত-দাবীতে তিনি দ্বিপর্ব পয়ারের মূল পর্ববিন্যাস পদ্ধতি (অর্থাৎ অষ্টাক্ষর+ষড়ক্ষর মিলে যেমন এক চরণে চৌদ্দমাত্রা) বজায় রেখেছেন, তেমনি ষড়ক্ষর+অষ্টাক্ষরের দ্বিপর্ব-বিন্যাসও; এবং দ্বিপর্বের বিন্যাস-বৈচিত্র্য কখনো একই চরণকে করে তুলেছে চতুরক্ষর+দশাক্ষর (৪+১০)=চতুর্দশাক্ষর, বা দশাক্ষর+চতুরক্ষর (১০+৪)=চতুর্দশাক্ষর; কখনো বা একান্তই অপ্রত্যাশিত ধ্বনি-যোজনায় তথা পর্বাঙ্গ-বিন্যাসে অষ্টাক্ষরকে সজ্জিত করেছেন (৩+৩+২=৮) পর্ববিন্যাসের অপূর্ব রীতিতে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখ্য দ্বিপর্ব-বিন্যাসই নয়, ত্রিপর্ব-বিন্যাসে পয়ারের পদ-সঞ্চরণ, এবং এটাই মনে হয় প্রবহমান পয়ারের ক্ষেত্রে দ্বিপদী পয়ার-বন্ধন থেকে মহত্তম মুক্তির স্বরূপ। চতুর্দশাক্ষর চরণ এখানে বিন্যস্ত হয়েছে এইরূপে: ২+৮+৪=১৪। (দ্র. গ॥)

—পর্ব-সঞ্চরণের এইসব পদ্ধতি প্রবহমান পয়ারকে ছন্দপাঠ ও ভাষাপাঠের (তথা কাব্য-পাঠের) ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমই ঘটায়নি, পরবর্তী কালের প্রবহমান পয়ারের অভিসারে ও অভিযানে নবনব রূপবৈচিত্র্য সৃজনেও প্রভাব এবং প্রেরণা বিস্তার করেছে।

দুই॥ গৈরিশ ছন্দ ও পর্ববিন্যাস:

গিরিশচন্দ্র-প্রবর্তিত ছন্দ তথা 'গৈরিশ ছন্দ' প্রকৃতিগত দিক থেকে একান্ত অভিনব কিছু নয়, একে বলা যায় 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর' ছন্দ—অর্থাৎ মধু-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারকেই অনেকটা যেন ভেঙ্গে সাজানো। তার অর্থ, পর্ব-স্থাপনার সুস্পষ্ট পদ্ধতিতেই এর যা কিছু অভিনবত্ব। কিন্তু তবুও মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই কেবলমাত্র অভিনব রূপে সাজিয়ে দেখানটাও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নয়। গৈরিশ ছন্দে কথোপকথনের নাটকীয় প্রয়োজনে দীর্ঘপর্ব প্রায়শই বর্জিত; তবে আবেগ উত্তেজনা, কি বীরত্বের প্রকাশে দীর্ঘপর্বও স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত।

চরণগুলি প্রায়ই এক-পর্ব বা দ্বি-পর্ব,—দীর্ঘতম দশাক্ষর, হ্রস্বতম চতুরক্ষর, মধ্যাকার যে ষড়ক্ষর পর্ব বলাই বাহুল্য। প্রায়শই চরণান্তিক মিলের সাপেক্ষতা বর্জিত হওয়ায় ভাষা ভাবানুসরণে স্বচ্ছন্দ-গতি এবং কথোপকথনযোগ্য রূপে স্বাভাবিক। কিছু নমুনায় পর্ব-সঞ্চরণ লক্ষ্য করা যাক :

● রাখো রাখো | যোগীর মিনতি,	৪+৬=১০
বসুমতী	৪
কলুষিত | করো না, ভূপাল !	৪+৬=১০
ধর্মহেতু করো না হে | কোটিপ্রাণী বধ।	৮+৬=১৪
কোথায় ঘাতক, | রাজকার্যে বধো মোরে।	৬+৮=১৪
● অসম্ভব | সম্ভব যদ্যপি হয়,	৪+৮=১২
মক্ষিকায় | চালে মেরু,	৪+৪=৮
রণ ভঙ্গ তব | যদি হয় সংঘটন,	৬+৮=১৪
যুদ্ধভয় | উদয় হৃদয়ে তব,	৪+৮=১২
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন, | হে বীর কেশরি !	৮+৬=১৪
রক্ষিতে আশ্রিতে | নাহি ডরিব কেশবে।	৬+৮=১৪

—স্পষ্টতই গৈরিশ ছন্দের অসম-পর্ববিন্যাস এখানে চমৎকার পরিস্ফুট।

নাটকের দূর শ্রোতাদের কাছে ভাষাধ্বনি পৌঁছে দেবার প্রয়োজনে (বিশেষত সেকালে বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক-যান্ত্রিক সুব্যবস্থার অভাবে) সুদীর্ঘ পর্বের দ্বিখণ্ডিত (বা বিশ্লিষ্ট) পর্বই সঙ্গত ছিল, মনে হয়; যেমন,—'রাখো রাখো | যোগীর মিনতি : ৪+৬ ; 'কলুষিত | করো না ভূপাল' : ৪+৬ ; বা এমন-কি অষ্টাক্ষর পর্বের বিভাজনও যুক্তিসঙ্গত ও স্বাভাবিক বোধসাপেক্ষ হতে পারে, যেমন,—'ধর্মহেতু | কোরো না হে | কোটিপ্রাণী বধ' : ৪+৪+৬, বা 'মক্ষিকায় | চালে মেরু' : ৪+৪। গৈরিশ ছন্দে পর্ব-বিভাগের ক্ষেত্রে ক্রম-হ্রস্বতার দিকে যেমন দৃষ্টি ও ঝোঁক, তেমনি ভাষার সহজবোধ সঞ্চারের দিকে ; কিন্তু সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মধুসূদনের প্রবহমান পয়ারের আবেগময় ও বেগবাহী ভাষাস্রোতের বাহন দীর্ঘবাক্যকে বর্জন, এবং সেস্থলে সহজবোধগ্রাহ্য বাক্যবিন্যাস। তাতে কাব্য-সৌন্দর্যের বিস্ময়কর রূপবৈচিত্র্য অনুপস্থিত থাকলেও নাটকের কথোপকথন পরিবেশন ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা (অস্বাভাবিকতা অর্থে, এবং অতি-মার্জিত সাধু ভাষায় প্রয়োগ অর্থে) থেকে সহজ-স্বচ্ছতায় মুক্তি ঘটেছে। এবং এক্ষেত্রে পর্ববিন্যাস ও চরণস্থাপনার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে নিশ্চয়ই। তাই গৈরিশ ছন্দ কেবলমাত্র 'ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর'-ই নয়। তবে, ভাষাকে সহজ করার ঝোঁকে গৈরিশ ছন্দে অসম-অক্ষরবিন্যাসের ত্রুটিজনিত ছন্দভঙ্গও ঘটেছে।

তিন ॥ মিত্রাক্ষর প্রবহমান পয়ার : বলাকার ছন্দ ও পদসঞ্চার :

'বলাকার ছন্দ'-এ রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘতম পর্ব-স্থাপনা করেছেন দশাক্ষর, হ্রস্বতম চতুরক্ষর, মধ্য-পরিমাপের পর্ব ষড়ক্ষর ও অষ্টাক্ষর। এখানেও অষ্টাক্ষরকে পয়ার-ভিত্তিক মনে করলে দেখা যায় : দশাক্ষর=অষ্টাক্ষর+দ্বিঅক্ষর ; ষড়ক্ষর=অষ্টাক্ষর—দ্বিঅক্ষর ; এবং চতুরক্ষর=সমদ্বিখণ্ডিত অষ্টাক্ষর (অর্থাৎ চতুরক্ষর পর্বাঙ্গকেই পূর্ণপর্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা)। অবশ্য আমরা আগেই দেখেছি এই

চতুরক্ষর পর্ব মধুসূদন ও গিরিশচন্দ্রের হাতে খেলা করেছে বহুরকম যোগসাজসে। গৈরিশ ছন্দ-সুলভ চরণস্থাপনায় বলাকার ছন্দেও কখনো একপার্বিক চরণ, কখনো-বা দ্বিপার্বিক চরণ, এমনকি ত্রিপার্বিক চরণও সঞ্চারিত হয়েছে,—এতে অভিনব বা অ-পূর্ব কিছু ঘটেছে বলা যায় না। তবে, এই ছন্দে দীর্ঘপর্বের অর্থাৎ দশাক্ষর-পর্বের যেমন সংখ্যাধিক্য, তেমনি দশাক্ষর+দশাক্ষর=বিশাক্ষর চরণও দেখা যায়। এবং তার ফলে ছন্দে বেগ ও আবেগ, শক্তি ও সৌন্দর্য সহজেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দিকের উত্তরাধিকার-সূত্রে বলাকার ছন্দের সঙ্গে গৈরিশ ছন্দের চেয়ে বরং পূর্বগামী অমিত্রাক্ষর ছন্দের তথা মধু-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ারের সহধর্মিতা-সহমর্মিতা অনেক বেশী,—সু-সম ধ্বনি-তরঙ্গ সুমার্জিত ভাষা ও শক্তিমান ছন্দ-প্রবাহ সৃজনের দিক থেকে এবং কিছুটা ভাষাশৈলীর দিক থেকেও। তবে, পর্ববিন্যাসক্ষেত্রে দ্বি-অক্ষর পর্ব এখানে নাই। যেমন নাই গৈরিশ ছন্দেও; তেমনি নাই মধুসূদন-সুলভ অষ্টাক্ষর পর্বের প্রথমেই ত্রি-অক্ষর পর্বাঙ্গ ও তার শেষে যতি-প্রয়োগ; যেমন—'অকালে, কহ, হে দেবি, অমৃতভাষিণি…'। দীর্ঘবাক্য গঠনের মাধ্যমে ভাবপ্রবাহ-সঞ্চার মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক দ্রষ্টব্য সাদৃশ্য রচনা করেছে। এবারে বলাকার ছন্দ ও তার পদ-সঞ্চরণের উল্লিখিত বৈচিত্র্য উদাহরণে লক্ষ্য করা যাক :

একথা জানিতে তুমি । ভারত-ঈশ্বর সাজাহান,	৮+১০
কালস্রোতে ভেসে যায় । জীবনযৌবন ধনমান	৮+১০
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা	১০
যেন শূন্য দিগন্তের । ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা	৮+১০
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,	১০=(৪+৬)
শুধু থাক	৪
একবিন্দু নয়নের জল	১০
কালের কপোল-তলে । শুভ্র সমুজ্জল	৮+৬
এ তাজমহল।	৬

—প্রবহমান পয়ারের এই স্বরূপে তথা বলাকার ছন্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহধর্মিতা স্বতই প্রকাশমান, তবে এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমিত্র চরণান্তিক বৈশিষ্ট্যকে তথা ভাষা-প্রবাহের অমিল-স্বাভাবিকতা ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন চরণান্তিক স্বর্ণমঞ্জীর—স্থাপনা করেছেন পয়ারের প্রাচীন মিত্রাক্ষর-রীতি। এমনকি যুগ্মমিলই নয়, ত্রয়ী মিলও (দ্র. উপরের উদাহরণের শেষাংশ); আবার মিলহীন পঙ্‌ক্তিও দুর্লভ নয় (দ্র. সপ্তম ছত্র, 'বলাকা' কবিতা : 'মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে')।

চার। অমিত্রাক্ষর প্রবহমান পয়ার : মুক্তকছন্দ ও পর্ববিন্যাস :

বলাকার ছন্দের স্বর্ণমঞ্জীর বর্জনের ফলে মুক্তকছন্দে এলো স্বচ্ছন্দ-সহজ গতি—আড়ম্বরহীন ভাব-প্রকাশরীতি। এবং এখানে পর্ববিন্যাসে দেখা দিল দীর্ঘদশাক্ষর পর্বের চেয়ে চতুরক্ষর ও ষড়ক্ষর পর্বের দিকেই বেশী ঝোঁক, এবং তা ভাবানুসারী প্রকাশরীতির প্রয়োজনেই। এখানে চরণ-স্থাপনার ক্ষেত্রে একপর্বের প্রাধান্য বলাকার ছন্দের চেয়ে বেশী, এবং প্রবহমানতা বলাকার ছন্দবৎ না হয়ে বরং গৈরিশছন্দের সমধর্মী—দীর্ঘবাক্যের প্রবাহ হ্রস্ববাক্যের দিকে ক্রম-সংহৃত, এবং ভাষাবিন্যাস

গৈরিশছন্দাশ্রিত ভাষার মতো 'খাড়া', এবং শ্রোতাজনের কাছে সহজবোধ্য করার প্রয়োজনে বা নাটকীয় কথোপকথনের স্বাভাবিকতার অনুরোধে 'সাদামাটা' না হয়ে কাব্যালঙ্কৃত অথচ সহজপথী। বস্তুত, বলাকার ছন্দের পর্ববিন্যাস ও চরণবিন্যাস অনেকটাই যেমন মধু-অনুসারী, তেমনি মুক্তকছন্দের তা কিছুটা বরং গৈরিশছন্দেরই দূরসম্পর্কীয়—বংশে এক হয়েও প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র।

মুক্তকছন্দের দ্বিপাদিক বা একপাদিক চরণে হ্রস্বতারই প্রাধান্য, এবং বলাকার ছন্দে গঠিত কবিতার মতো মুক্তকছন্দের কবিতা প্রায়শই দীর্ঘাকার নয় মোটেই। কখনো কখনো বরং মুক্তকছন্দে গ্রথিত কবিতা ও তার পর্ববিন্যাস বিস্ময়কররূপেই সংহত সহজ অথচ গভীর অর্থবহ। এবারে কিছু উদাহরণে চরণ ও পদ-সঞ্চার দেখা যাক :

● প্রথম দিনের সূর্য	৮
প্রশ্ন করেছিল	৬
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—	১০
কে তুমি।*	৪
মেলেনি উত্তর।	৬
বৎসর বৎসর | চলে গেল,	৮+৪
দিবসের শেষ সূর্য	৮
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল | পশ্চিম-সাগর তীরে	৮+৮
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—	৬
কে তুমি।*	৪
পেল না উত্তর।	৬

—* চিহ্নিত 'কে তুমি' অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মসম্মত সাধারণ বিচারে কে=১+তুমি=২ : 'কে তুমি' তিন-অক্ষর তিনমাত্রা, কিন্তু এখানে 'কে' উচ্চারণ-যোগ্যতায় 'কে-এ', অর্থাৎ দ্বি-অক্ষরযোগ্য এবং দ্বিমাত্রিক। কাজেই 'কে তুমি' হল ২+২=চতুরক্ষর। মনে হয়, **মধু-প্রবর্তিত দ্বি-অক্ষর পর্ববিন্যাস বাংলা ছন্দে অনুসৃত হয়নি বড় একটা, অথবা ঐ দ্বি-অক্ষর পর্ব-বিন্যাসের অভিনবত্ব ও অর্থানুগ প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূতই হয়নি। অথচ, ঐ অক্ষরবৃত্ত দ্বিমাত্রিক পর্ববিন্যাস স্থানবিশেষে একান্তই অনিবার্য মনে হয় ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠের সমন্বয় সাধনে—ভাষা ও ভাবের রাখীবন্ধনে।** যেমন, 'তবু, মনে রেখো' (*গান, রবীন্দ্রনাথ*)—এই হ্রস্ববাক্যের 'তবু'-কে স্বতন্ত্র পর্বের স্থান দিলে ভাবযতি-অর্থযতি ও শ্বাসযতির ঐক্যস্থাপনে তাৎপর্যময় হয়; (*পর্ববিন্যাস : তবু | মনে রেখো : ২+৪=৬*)

আমরা এপর্যন্ত লক্ষ্য করলাম : পয়ারে অষ্টাক্ষর পর্বই মূলপর্ব ; এই মূলপর্ব দ্বি-অক্ষর যোগে দশাক্ষর পর্ব, দ্বি-অক্ষর বিয়োগে ষড়ক্ষর পর্ব ; এবং হ্রস্বতম পর্বরূপে চতুরক্ষর। অষ্টাক্ষর পর্বের চতুরক্ষর+চতুরক্ষর আগে ছিল দুইটি পর্বাঙ্গ, কালক্রমে তা দুইটি পূর্ণপর্বের মর্যাদায় স্বতন্ত্র স্থান গ্রহণ করেছে। পয়ার ও পয়ারাশ্রয়ী সবরকম ছন্দ-বৈচিত্র্যেই ওই দশ থেকে চার অক্ষরবিশিষ্ট পর্ব স্বীকৃতি পেয়ে গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে চতুরক্ষর প্রথমে ছিল পয়ারের পর্বাঙ্গ, সেটাই হয়ে

উঠল পূর্ণপর্ব, তবে কি দ্বি-অক্ষরও বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয়োজনে পূর্ণপর্বের স্বতন্ত্র স্বীকৃতি পাবে না?—চতুরক্ষরই কি হ্রস্বতম পর্ব? মনে হয় এক্ষেত্রে নতুন বোধ ও বিচার প্রয়োজন। এইদিকেই যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার ছন্দের বিচিত্র পর্ববিন্যাসে দ্বি-অক্ষর পর্বের যথাস্থান আগেই নজির হিসাবে তুলে ধরেছি।

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

আমরা দেখেছি, পয়ারের প্রবহমান-ধর্ম সহজেই স্ফীত থেকে স্ফীততর কলেবর ধারণ করতে পারে—প্রবহমানতা ভাবানুসারে স্বতই প্রশস্ত ও দীর্ঘ স্রোতে দীর্ঘ পর্বেরই অবলম্বন চায়, এবং তাই তো মহাপয়ারের সৃষ্টি। এখানে কলেবর-স্ফীতি ও ভাবস্ফীতির যুগ্ম-দাবীতে চতুর্দশাক্ষর চরণই অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে অষ্টাদশ-অক্ষর, বিংশাক্ষর, দ্বাবিংশ কি চতুর্বিংশ, এমনকি ষড়্‌বিংশাক্ষর। কিন্তু সেখানে থাকে পর্ববিন্যাসে অষ্টাক্ষর কি দশাক্ষরেরই প্রাধান্য, এবং চতুরক্ষর এখানে হয় পর্বাঙ্গ, পর্ব নয়। তবে, এতে অভিনবত্ব যেটুকু তা তো বহিঃসজ্জার বা যোগসাজসের। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের খেলায় বহু পাকা-হাতের কারবার করলেও অষ্টাদশ-অক্ষর মহাপয়ারের উপরে আর ওঠেন নি। রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে'[৮] কিংবা 'ভাষা ও ছন্দ'[৯] কিংবা 'সমুদ্রের প্রতি'[১০]—এই তিনটি মহাপয়ার কবিতা শক্তি, সমৃদ্ধি ও রূপবৈচিত্র্যে তুলনাহীন, এর চেয়ে বেশী পয়ার-প্রবহমানতা আর কেউ কি দেখাতে পেরেছেন চব্বিশ কি ছাব্বিশ অক্ষর-মাত্রিক চরণ স্থাপনার দ্বারা? এর পাশাপাশি যতীন্দ্রমোহনের 'শবরীর প্রতীক্ষা'[১১] অবশ্যই স্মরণীয় উদাহরণ। কিন্তু মহাপয়ারকে কেবলি স্ফীতকায় করে তোলায় এমন কি কৃতিত্ব! কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ধরুন, পয়ারের পদ-সঞ্চারের অভিনবত্ব যদি স্ফীতি থেকে সংহতির দিকে ফেরে—ক্রম-দৈর্ঘ্য থেকে ক্রম-হ্রস্বতার দিকে গতি পরিবর্তন করে, তবে তো পয়ার-ছন্দেরই নব-শ্রুতি ঘটতে পারে, সঞ্চারিত হতে পারে নব-রূপ নব-অর্থময়তা। মনে করুন, একদিকে ক্রম-স্ফীত পর্ব-পাল তুলে সবেগে ছুটে চলেছে মহাপয়ারের ক্রম-দীর্ঘ বজরাগুলি, অন্যদিকে একের পর এক ক্রম-হ্রস্ব পাল তুলে তুলে মন্থর পায়ে বারংবার থেমে থেমে—এগিয়ে চলেছে ক্রম-হ্রস্ব পয়ার-তরণী। একদিকে স্ফীতি, অন্যদিকে সংহতি; একদিকে আবেগোচ্ছ্বাস, অন্যদিকে সংযম; একদিকে দীর্ঘ বাক্যবিন্যাস, অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভাষা-প্রকাশ। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পয়ারের অঙ্গ-গঠন তথা পর্ব-গঠন একটু অভিনব ও অপরিচিত ধরনের হবে বৈকি! ভাব ভাষা ও ছন্দের ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকেই এই ক্রম-হ্রস্ব পয়ার প্রবহমান। বলাই বাহুল্য এখানে প্রবহমান পয়ারের স্বরূপটি হবে ক্রম-সংহত, এবং ক্রম-সংযত,—বাণীরূপ সারভূত সৌন্দর্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মর্মর-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ। এটা না হলে এই হ্রস্বপয়ার তার প্রাণশক্তি খুঁজে পাবে না, কারণ এখানে তো মহাপয়ারের হৃদয়গ্রাহী আবেগোচ্ছলতার সহজ আকর্ষণ অনুপস্থিত। আর, চতুর্দশপদীর রূপ-সংযম ও ভাব-সংহতি যদি অন্ত্যমিলবন্ধনমুক্ত হয়ে চরণের সংখ্যা ও চরণের অক্ষর-সংখ্যার মধ্যে সাম্যবিধান করে, তবে এই আলোচ্য ক্রম-হ্রস্ব প্রবহমান পয়ার অ-পূর্ব এক নিটোল রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কিছু উদাহরণ-যোগে এই ক্রম-হ্রস্ব প্রবহমান পয়ারের অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ করা যাক:

ক ॥ দ্বাদশমাত্রিক দ্বাদশচরণ প্রবহমান ক্রম-হ্রস্ব পয়ার :

হ্রস্ব-দীর্ঘ বহু বৃত্তে | ঘুরেছ তো	দ্বিপর্ব : ৮+৪
অসম্বৃত এতকাল, | এইবার	„ ৮+৪
স্থির দৃষ্টি— | খোঁজো তার কেন্দ্রবিন্দু	„ ৪+৮
চলো, | দৃঢ় হাতে যোগদণ্ড ধরো।	„ ২+১০
বহুরূপে | কত খেলা খেলেছ তো	„ ৪+৮
রজ্জুবদ্ধ জীব | সর্বাত্মবিস্মৃত ;	„ ৬+৬
এখন চৈতন্য-কেন্দ্রে | লগ্ন হও ;	„ ৮+৪
তারপর | কর্মচক্র এঁকে চলো	„ ৪+৮
জীব ও জীবনে যোগসেতু। | দেখো,	„ ১০+২
শিশিরেই মহাসিন্ধু | —মূর্তিমান	„ ৮+৪
মহাসৃষ্টি-লীলা। | বিন্দু থেকে বৃত্তে	„ ৬+৬
ওঠো নামো, | দণ্ড হাতে ইচ্ছাখুশি।[১২]	„ ৪+৮

—এখানে শ্রুত্যর্থেই স্পষ্ট যে, কবিতাটির ছন্দ হল পয়ার এবং তার পদসঞ্চারে তথা পর্ব-বিন্যাসে যে প্রবহমানতা বর্তমান তা মধুসূদন-প্রবর্তিত প্রবহমান পয়ার তথা অমিত্রাক্ষর ছন্দবৎ। তবে চরণ-সংখ্যা এখানে দ্বাদশ এবং এক-চরণের অক্ষর-সংখ্যাও দ্বাদশ ; পদসঞ্চারে পর্ববিন্যাস-বৈচিত্র্য হল ৮+৪, ৪+৮, ৬+৬, এবং এমনকি ২+১০ ও ১০+২। লক্ষ করবার মতো, পর্ব স্থাপনায় যতি-ছেদের ব্যবহার যুগপৎ শ্বাসযতি ও অর্থযতি ও ভাবযতির সামঞ্জস্যবিধায়ক। দ্বিমাত্রিক তথা দ্বি-অক্ষর পর্ব নিশ্চয়ই এখানে পর্বাঙ্গ নয় ; ‘চলো’ এবং আরো সার্থক প্রয়োগে ‘দেখো’ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দ্বি-অক্ষর-বিশিষ্ট শব্দ দুইটিকে অন্য পর্বের সঙ্গে একাকার করা চলে না—ছন্দবোধ ও অর্থবোধের যুগ্ম দাবীতেই। উল্লিখিত কবিতাটিকে অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট চতুর্দশপদী পয়ারে কিংবা মহাপয়ারে বিন্যস্ত করা চলে না, কারণ ঐ বারোটি চরণ ও বারো অক্ষরের এক-এক চরণে প্রবাহিত কবিতাটি তো কেবল ভেঙ্গে সাজানোর ব্যাপার নয়,—ভেঙ্গে সাজিয়ে দেখতে গেলেই ভেঙ্গে পড়বে ওর ছন্দ-সংহতি, রূপ-সংহতি এবং সেই সঙ্গে ভাব-সংযমের মিলিত সৌন্দর্য। প্রসঙ্গসূত্রে দেখা যেতে পারে আর একটি কবিতা।[১৩]

খ ॥ দশমাত্রিক দশচরণ প্রবহমান হ্রস্বতর পয়ার :

এই দেহ | বড়ো অসহায় :	দ্বিপর্ব : ৪+৬
রূপরসগন্ধ-স্পর্শাতুর—	একপর্ব : ১০
বিরুদ্ধের চাপেতে ভঙ্গুর।	„ : ১০
অস্থির ইন্দ্রিয় | এলোমেলো	দ্বিপর্ব : ৬+৪
গাঁথে অনুভব, | স্থায়ী জমা	„ : ৬+৪
ধারণায় কিছু। | বহুস্তর	„ : ৬+৪
যন্ত্র যেন | এক জীবদেহে—	„ : ৪+৬
শেষ ধাপে | উদ্ভূত চেতনা।	„ : ৪+৬

আত্মা খোঁজে । ধ্যানযোগ-সেতু	দ্বিপর্ব	: ৪+৬
দেহ আর দেহাতীত মাঝে।[১৪]	একপর্ব	: ১০

—স্পষ্টতই এখানে অর্থযতির প্রাধান্যে ও নিয়ন্ত্রণেই শ্বাসযতি স্থাপিত, এবং পর্ববিন্যাসও সেই নির্দেশ মতো। অর্থবোধ-সহায়করূপে বাক্যগঠন ও ছন্দগঠন প্রবহমান পয়ার-সম্মতভাবেই অসম-অক্ষর পর্বে বৈচিত্র্যময় : কখনও তা দ্বিপার্বিক, কখনো বা একপার্বিক (পর্ববিভাগ দ্র.), এবং দশাক্ষর চরণবিশিষ্ট। লক্ষ্য করবার, শ্বাসযতির প্রয়োজন ও প্রাধান্য হ্রস্বাকার প্রবহমান-পয়ারে গৌণ হয়ে পড়ে,—অর্থযতি-ভাবযতির প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, কিংবা বলা যায় ভাবপ্রকাশের একমাত্র প্রেরণায়ই (প্রয়োজনেও বটে) ছন্দ এখানে বিশেষ সংযত বেগে প্রবাহিত ও এক বা দ্বিপর্বে বিন্যস্ত হয়ে মন্দ্র-মন্থর। ভাবে ও রূপে এই স্বরূপ যে অনিবার্য তা বুঝবার জন্যে চরণগুলিকে অন্যভাবে বিন্যস্ত করলে অর্থাৎ পর্বগুলিকে অন্যভাবে সাজালে এই নিটোল কবিতাটির ভাবগাঢ় ও রূপঘন মূর্তিটিই ভেঙ্গে যেত। প্রাসঙ্গিক ছন্দ-বৈশিষ্ট্যের জন্য পাশাপাশি দেখা যেতে পারে 'সঙ্গম' কবিতা, উদ্বোধন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬।

গ ॥ অষ্টমাত্রিক অষ্টচরণ প্রবহমান হ্রস্বতর পয়ার :

পঙ্কাধারে আমি বীজ	একপর্ব	৮
অঙ্কুরিত, । পাতা মেলি	দ্বিপর্ব	৪+৪
কী সন্ধানে, । প্রবৃত্তির	„	৪+৪
শতদলে ফুটে উঠি	একপর্ব	৮
সূর্যমুখী, । নিবেদনে	দ্বিপর্ব	৪+৪
হই সুরভিত। । আমি	„	৬+২
পঙ্কজিৎ, । পঙ্কমাঝে	„	৪+৪
রেখে যাই পদ্মবীজ।[১৫]	একপর্ব	৮

—পূর্বোল্লিখিত দ্বাদশপদী দ্বাদশাক্ষর, দশপদী দশাক্ষর, ও এই অষ্টপদী অষ্টাক্ষর প্রবহমান পয়ারের ক্রম-হ্রস্ব রূপ ও ক্রম-সংহত ভাবমূর্তি আমরা নমুনা হিসাবে দেখলাম। লক্ষ্য করবার, মহাপয়ারের স্ফীতরূপে অষ্টাক্ষরই যেখানে হ্রস্বতম পদ, সেখানে অর্থবোধের জন্য হ্রস্বতর পর্ব-পাঠের বড়-একটা প্রয়োজনই হয় না, কিন্তু এই বিশেষ হ্রস্ব-পয়ারে পর্বগুলিও একান্তই হ্রস্বরূপ ধারণ করে এবং তার অর্থবোধের প্রয়োজনেই যতি-প্রয়োগ ও পর্ববিভাগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুত, এই কবিতাটির এবং পূর্বোল্লিখিত কবিতা দুইটির পর্ববিভাগকে প্রচলিত পয়ার ও মহাপয়ার-সম্মত টানা রূপ দিলে ছন্দই এখানে ব্যর্থপ্রায়, রূপসংহতি আক্রান্ত, ভাবসংযমও ব্যাহত হয়।

ঘ ॥ ষট্-মাত্রিক ষট্চরণ প্রবহমান পয়ার :

ষড়ক্ষর-বিশিষ্ট এক-এক চরণ, এবং এমন ছয় চরণে সম্পূর্ণ প্রবহমান পয়ারই মনে হয় হ্রস্বতম পয়ার। একটি উদাহরণ উল্লেখ করে এর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে :

প্রশংসায় স্ফীতি	একপর্ব	: ৬
নিন্দায় সঙ্কোচ—	„	: ৬

ব্যাধি। ! আত্মা স্থির	দ্বিপর্ব : ২+৪
নিরুপাধি ; | সত্তা	„ : ৪+২
মুক্ত যোগসেতু	একপর্ব : ৬
অন্তরে, বাহিরে।[১৬]	„ : ৬

—লক্ষ্য করবার, পয়ারের হ্রস্বতম ঘনিষ্ঠতম রূপ এখানে মন্ত্রবৎ হয়েও প্রবহমান—বেগ বিশেষ-ভাবেই সংযত-সংহত গাঢ়ঘন। ষড়ক্ষর এক-এক চরণ, এবং ঐরূপ মাত্র ছয়টি চরণে কবিতাটি সম্পূর্ণ, গাঢ়ভাবের প্রবহমানতা-অনুসারে চরণ কখনো ষড়ক্ষর একপর্ব, কখনো ২+৪=৬ অক্ষরে বা ৪+২=৬ অক্ষরে দ্বিপর্ব। এখানে 'ব্যাধি' ও 'সত্তা' এই কারণেই এক-একটি পূর্ণপর্বের গুরুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হয়েছে কিনা ছান্দসিক গুণীজনের মুক্তদৃষ্টিতে বিচার্য বিষয়। যাঁরা গ্রহণীয় মনে করবেন না, তাঁরা প্রচলিত পয়ার বা মহাপয়ারে সাজিয়ে দেখবেন : পর্ববিভাগের বহিরঙ্গ ব্যাকরণ বাঁচলেও অন্তরঙ্গ দাবী আক্রান্ত ও ভূলুণ্ঠিত হবে—প্রথানুসরণের রক্ষণশীলতায়। অষ্টাক্ষর পর্ব ছিল পয়ারের পূর্ণপর্ব তথা মূলপর্ব এবং চতুরক্ষরই পর্বাঙ্গ ; পরে মধুসূদন-গিরিশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের হাতে চতুরক্ষরই সর্বস্বীকৃত স্বতন্ত্র-স্থান পেল হ্রস্বতম পূর্ণপর্ব রূপে। কিন্তু ক্রমহ্রস্ব প্রবহমান পয়ারে ঐ চতুরক্ষর পর্বই কি হ্রস্বতম পর্ব, না দ্বি-অক্ষর পর্ব ?[১৭]

উদ্ধৃতি-সূত্র ও বিষয়প্রসঙ্গ

এক ॥ ১ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত সাম্প্রতিক ছন্দগ্রন্থ 'বাংলা ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ', পৃ. ৮১ ; ২ ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৮৮ ; ৩ ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৮৭ ; ৪ শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য লিখিত 'ছন্দ-তত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন', পৃ. ২২৪ ; ৫ মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য-সংসদ ; বাল্য-রচনা, নাম 'বর্ষাকাল', পৃ. ১৮৫ ; ৬ অষ্টাদশাক্ষর মহাপয়ারের চেয়ে হ্রস্ব, অথচ চতুর্দশাক্ষর পয়ারের চেয়ে দীর্ঘ এই ষোড়শাক্ষর পয়ারের নামকরণ করা যায় 'হ্রস্ব-মহাপয়ার' বা 'দীর্ঘপয়ার'। ৭ ৪-সংখ্যক উদ্ধৃতি-সূত্র, পৃ. ৪৫০ ; ৮ দ্র. রবীন্দ্রনাথের চিত্রাকাব্য ; ৯ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পরিশিষ্ট (শতবার্ষিক সং) ; ১০ ঐ, ১ম খণ্ড, 'সোনার তরী' ; ১১ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা কবিতা ; ১২ প্রবন্ধকারের লেখা কবিতা, 'বিন্দু হও বৃত্ত হও', কথাসাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া ১৩৮৩, পৃ. ২৪৯ ; ১৩ ঐ, 'অন্য কোনো', কথাসাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৭৭ ; কবিতাটির মধ্য-অন্ত্য-আদিতে যদৃচ্ছা মিল-স্থাপনা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মনে হতে পারে ; ১৪ ঐ, 'সপ্ততীর্থ', কথাসাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৮৩, পৃ. ২৪৯ ; ১৫ 'পঙ্ক ও পদ্ম', উদ্বোধন পত্রিক , জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৬ ; ১৬ 'বীজমন্ত্র', উদ্বোধন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৬। ১৭ এখানে প্রযুক্ত দ্বি-অক্ষর, চতুরক্ষর, ষড়ক্ষর, অষ্টাক্ষর ও দশাক্ষর শব্দগুলি পয়ারের প্রাচীন পাঠরীতি-সম্মত। কিন্তু আধুনিক কালের পাঠরীতিতে ঐ শব্দগুলি হবে দ্বি-মাত্রিক, চতুর্মাত্রিক, ষট্-মাত্রিক, অষ্টমাত্রিক ও দশমাত্রিক।

দুই ॥ বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধ কেবলমাত্র পয়ার ও পয়ারভিত্তিক ছন্দ-বৈচিত্র্যে পদ-সঞ্চার তথা পর্ব-সঞ্চার প্রাসঙ্গিক। সর্বত্রই দ্বি-অক্ষর, চতুরক্ষর, ষড়ক্ষর বা দশাক্ষর—এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে ; মাত্রা-পরিচয় এক অক্ষর=এক মাত্রা, কিন্তু শব্দান্তের হলন্ত অক্ষর=২ মাত্রা।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী (স্বামি-রামকৃষ্ণানন্দ-বিরচিত-শ্রীরামকৃষ্ণোপদেশাবলিসমেতা) [বঙ্গানুবাদসহ]। গ্রন্থকার: অধ্যাপক ভণ্ডারকার উপনামক শ্রীত্র্যম্বক শর্মা। সম্পাদক: আচার্য শ্রীআনন্দ ঝা। অনুবাদক: পণ্ডিতপ্রবর শ্রীগোপাল-চন্দ্র চক্রবর্তী, বেদান্তশাস্ত্রী, বারাণসী। প্রকাশক: রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসাত, জেলা—২৪ পরগণা। (১৯৭৭), পৃষ্ঠা: ২৯৪+২, মূল্য: ৯ টাকা (সাধারণ) ও ১০ টাকা (বোর্ড)।

স্বামী অপূর্বানন্দজীর উপস্থাপনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত কয়েকটি অর্ঘ্যের অন্যতম এই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশ-সাহস্রী' ভারতের চিরন্তন অধ্যাত্মসাধনার বাণীকে সর্বভারতীয় প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমরা সর্বাগ্রে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশে সংস্কৃতের ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজীর কথাই স্মরণ করবো—"সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। ...শিক্ষা মজ্জাগত হইয়া কৃষ্টিতে পরিণত হইলে ভাববিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করিতে পারে, শুধু বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দিয়া যাইতে পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না; ঐ জ্ঞান মজ্জাগত হইয়া সংস্কারে পরিণত হওয়া চাই।"—মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় স্বামীজী শিক্ষার সংস্কারে পরিণত হওয়ার পদ্ধতি হিসাবে ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে সংস্কৃতের অনন্য ভূমিকার কথা বলেছেন।

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার একান্ত পক্ষপাতী স্বামীজী এ-বক্তৃতায় অন্য এক দিক থেকে সংস্কৃত ভাষার—"গৌরব"বোধের স্পর্শসমুজ্জল না হওয়া পর্যন্ত এ দেশে কোনো জ্ঞানের কথা বা অনুভবের সম্পদই যে চিরন্তনতা লাভ করতে পারে না, সে কথাটি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মের মহাযানীশাখা একদা সংস্কৃতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তার ফলে 'পালির' মতো জাতীয় সাহিত্যের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এই মতবাদের একাধিক লেখকের খ্যাতি সর্বভারতীয় হ'তে পেরেছে। চৈতন্য-অনুপ্রাণিত বাংলা সাহিত্য কী পরিমাণে সংস্কৃত-প্রভাবিত হয়েছে, এক 'চৈতন্যচরিতামৃতে' তার অজস্র উদাহরণ। বৈষ্ণব গোস্বামীদের সংস্কৃত রচনাপটুতা তাঁদের রচনাবলীকে সর্বভারতীয় মনীষী-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর সংস্কৃতরূপায়ণের পথিকৃৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরাম-কৃষ্ণোপদেশাবলিঃ' ১৮৯৬-৯৭ সালে সংস্কৃত মাসিক 'বিদ্যোদয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে তা সংকলিত হয়েছে। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে এই শ্লোক-রাশি সংগ্রহ করে অধ্যাপক শ্রীশৌটীরকিশোর চট্টোপাধ্যায় আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রথমে রামকৃষ্ণগতপ্রাণ রামকৃষ্ণানন্দ-অনূদিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী পাঠকদের কাছে উপ-স্থাপিত করি—

"একং জলং যথা ভিন্ননামভির্রুবতে জনাঃ।
'ওয়াটরি'তি বা কেচিদ্ 'আকোয়া' ইতি
বা পরে॥
'পানী'তি বা বদন্ত্যেকে ত্বভিন্নং সলিলং ভুবি।
তথৈবং সচ্চিদানন্দং নামভির্বহুভিঃ পৃথক্।
বদন্তি ভিন্নপুরুষা 'আল্লা' 'গড্' 'জিহো-
বে'তি বা॥" (পৃঃ ২৮২)

—একটু লক্ষ্য করলেই এই শ্লোকটির মূল বাংলারূপ অধিগত হবে। সংস্কৃত-রূপান্তরে মূল বক্তব্য কতো স্বচ্ছন্দে ধরা দিয়েছে, সেইটিই লক্ষণীয়।

সুপণ্ডিত ও সুকবি অধ্যাপক ভণ্ডারকার এদিক থেকে আপন অগোচরেই রামকৃষ্ণানন্দ-সাধনার উত্তরসূরী। শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সহস্রটি উদাহরণকে তিনি সংস্কৃতরূপান্তরে ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা ও মর্মজ্ঞতার দিক থেকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে ভারতীয়মানসে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করেছেন। পরলোকগত এই সুধী কবি আমাদের প্রণম্য। তাঁর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করবে মনে করে আমরা কিছু উদাহরণ দিই—গীতাপাঠের ফল (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে)—

দশবারান্ মুখেন ত্বং 'গীতা' গীতেতি চেদ্বদেঃ।
"ত্যাগী ত্যাগী" শ্রুতিঃ শ্রোত্রে গীতাপাঠস্য
তৎফলম্॥ (পৃঃ ৩৪)

কাকের মতো সেয়ানাদের সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য—

মা ভবেঃ কুশলংমন্যঃ কাকো বিষ্ঠারুচিঃ পটুঃ
পরপ্রতারণাসক্তঃ স্বয়মেব প্রতার্যতে॥
(পৃঃ ২১৭)

মধুপানমত্ত ভ্রমর ও ব্রহ্মানন্দবিভোর চিত্তের তুলনা—

আনন্দানুভবে জাতে বিচারোঽপি সমাপ্যতে।
মধুপানরসাসক্তো ভৃঙ্গঃ কলকলং ত্যজেৎ॥
(পৃঃ ২২৬)

বাংলা ভাষা শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যকথনে দ্বিজত্বলাভ করেছে অনেকদিন। সেই দ্বিজত্ব যে কতো সত্য তা পণ্ডিত ভণ্ডারকারের সংস্কৃত অনুবাদ আবার প্রমাণ করেছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলির মূল বাংলা বাণী কথামৃতের পাতায় পাতায় ছড়ানো। তাই আর এ গ্রন্থের 'বঙ্গানুবাদ' থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিলাম না। 'বঙ্গানুবাদ' না দিয়ে বা লা মূল দিলেই এ বইয়ের পক্ষে ভালো হতো।

গ্রন্থ-সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর আনন্দ ঝা মহোদয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য সব-শেষে উদ্ধৃত করলেও আমাদের পক্ষে সবসময় স্মরণীয়—"এই গ্রন্থটি বাস্তবিক উপনিষদগুলির প্রতিবিম্বস্বরূপ। উপনিষদ যেমন প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের বাণী, পরমহংসদেবের দিব্য উপদেশগুলিও ঠিক তেমনই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোপদেশসাহস্রী' ভক্ত ও মননশীল পাঠকমাত্রেরই অতি সমাদরে শিরোধার্য গ্রন্থ। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে গ্রন্থের আদ্যোপান্ত প্রকাশকদের সযত্ন ও সশ্রদ্ধ প্রচেষ্টার পরিচায়ক।

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়)—**পুনর্বাসনকার্য :** বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে আরামবাগ মহকুমার (হুগলী জেলা) জগৎপুরে ৬০টি গৃহনির্মাণের কাজ সমাপ্তপ্রায়।

(খ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়)—**পুনর্বাসনকার্য :** মোরভির বন্যায় গৃহহীন জনগণের পুনর্বাসনের জন্য প্রস্তাবিত ৬০০টি গৃহের মধ্যে ভানালিয়া গ্রামে ১১১টি এবং মোরভি শহরে ৭৮টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন স্তরে ক্রম-অগ্রসর। লীলাপুরেও গৃহনির্মাণের কাজ শুরু করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ ও চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী

পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও প্রসাদ-বিতরণাদি হয়। স্বামী বেদান্তানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'মানুষ আর মান হুঁস' বাণীর ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার সহযোগী গাথা-সংকলক শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যার পর যথাক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি, শ্রীসারদা-লীলাগীতি এবং ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। ২২শে ও ২৩শে সন্ধ্যায় আয়োজিত জনসভায় স্বামী ভাগবতানন্দ এবং ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীর মহত্ত্ব ও যুগোপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেনও মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত জীবনাদর্শের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে অনুরাগ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এই আশ্রমে প্রতি বৎসর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিজয়ী প্রতিযোগীদের ২৪শের সভায় পুরস্কৃত করা হয়। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্বামী ভাগবতানন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন এবং যুব- সম্প্রদায়কে স্বামীজীর আদর্শানুযায়ী চরিত্রগঠন ও সমাজের কল্যাণসাধন করিতে বলেন।

চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক গত ১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি-উৎসব পালিত হয়। বেদমন্ত্র পাঠ, মঙ্গলারতি, শ্রীরামকৃষ্ণস্তব, বিশেষ পূজা ইত্যাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী গোকুলানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের খাসিয়া অনুবাদ পাঠ করেন ও ভাষণ দেন। দ্বিপ্রহরে ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় 'ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ' ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়। ২১শে সন্ধ্যায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাণ্ডবাদন এবং আশ্রমের বিভিন্ন ভাষাভাষী কর্মীবৃন্দ কর্তৃক ব্রহ্মচারী নির্গুণ-চৈতন্যের পরিচালনায় প্রহ্লাদ চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটকাভিনয় উল্লেখযোগ্য। ২২শে দূর-দুরান্ত হইতে সমাগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্ত-মণ্ডলীর সম্মুখে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাণ্ডবাদন এবং অরুণাচল প্রদেশের সরকারী সংগীত ও নৃত্য-বিভাগের শিল্পীগণ কর্তৃক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ২৩শে সাধারণ উৎসবের দিন প্রত্যুষ হইতে বেদগান, স্তবস্তুতি ও ভক্তিগীতি হয়। বেলা ১১টায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করেন। শোভাযাত্রাশেষে আশ্রমপ্রাঙ্গণে আয়োজিত সাধারণ সভায় স্বামী গোকুলানন্দ খাসিয়া ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রী ডি. এন. দত্ত, শ্রীমতী লুসি সখলেট এবং আরও কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা দেন। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলীর একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। একটি ক্ষুদ্রাকার বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রদর্শনীও হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় চার হাজার ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। খাসিয়া লোকনৃত্য-শিল্পীদের লোকনৃত্য পরিবেশন, প্রাতে ও বৈকালে ব্যাণ্ডবাদন এবং সন্ধ্যায় বিচিত্রানুষ্ঠান হয়। মেঘালয়ের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীমাহাম্ সিং উৎসবে যোগদান করিয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ১৮ই ফেব্রুআরি হইতে ২৪শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত

হয়। ১৮ই সুসজ্জিত প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, হোম ও ভজনাদি হয়। দ্বিপ্রহরে প্রায় আট হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। ১৯শে সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় সঙ্গীত-শিল্পীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২০শে শ্রীরাম-কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। ২১শে শ্রীহারাধন সাহু দাস রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন। ২২শে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণ করেন। ২৩শে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমার কথা বলেন স্বামী অজ্ঞজানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ২৪শে বিদ্যালয়-সমূহের পারিতোষিক-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজা শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র কর। সন্ধ্যারতির পর ধর্ম-সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ আশ্রমের বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন, শ্রীশচীকান্ত বেরা মহাশয় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং স্বামী অজ্ঞজানন্দ ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী 'স্বামী বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। পরে শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও শ্রীতপন সিংহ 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' পরিবেশন করেন।

সুবর্ণ জয়ন্তী

জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ৭ই মার্চ ১৯৮০ হইতে ১০ই মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত মহাসমারোহে পালিত হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত নর-নারী জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করিতে সমবেত হন। স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তারা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রীনির্মলেন্দু চৌধুরী, শিবপুর (হাওড়া) প্রফুল্ল-তীর্থের শিল্পীবৃন্দ ও রামায়ণগায়ক শ্রীসুধীর চৌধুরী। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ কবিগান ও লোক-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৯ই মার্চ মঙ্গলারতির পর এক বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া পুলিশব্যাণ্ড সহ শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উহাতে বহু ভক্ত নরনারী সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহরে হাজার হাজার ভক্ত এবং নরনারায়ণকে হাতে-হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

আবির্ভাব-তিথি ও পূজা-তিথির সূচী

বাংলা ১৩৮৭ সাল, ইংরাজী ১৯৮০-৮১ খ্রীঃ

আবির্ভাব-তিথি

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	৬ বৈশাখ	শনিবার	১৯ এপ্রিল ১৯৮০
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখী পূর্ণিমা	১৭ বৈশাখ	বুধবার	৩০ এপ্রিল "
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	২৩ শ্রাবণ	শুক্রবার	৮ আগষ্ট "
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণী পূর্ণিমা	১০ ভাদ্র	মঙ্গলবার	২৬ আগষ্ট "
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	১৬ ভাদ্র	সোমবার	১ সেপ্টেম্বর "
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৩ ভাদ্র	সোমবার	৮ সেপ্টেম্বর "
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	১৬ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	২ অক্টোবর "
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	২৩ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	৯ অক্টোবর "

স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	৩ অগ্রহায়ণ	বুধবার	১৯ নভেম্বর ১৯৮০
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	৫ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	২১ নভেম্বর „
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	১ পৌষ	মঙ্গলবার	১৬ ডিসেম্বর „
		৯ পৌষ	বুধবার	২৪ ডিসেম্বর „
শ্রীশ্রীমা	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ পৌষ	রবিবার	২৮ ডিসেম্বর „
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	১৭ পৌষ	বৃহস্পতিবার	১ জানুয়ারী ১৯৮১
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	২৭ পৌষ	রবিবার	১১ জানুয়ারী „
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	৫ মাঘ	সোমবার	১৯ জানুয়ারী „
	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	১৩ মাঘ	মঙ্গলবার	২৭ জানুয়ারী „
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	২৩ মাঘ	শুক্রবার	৬ ফেব্রুয়ারী „
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	২৫ মাঘ	রবিবার	৮ ফেব্রুয়ারী „
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘী পূর্ণিমা	৬ ফাল্গুন	বুধবার	১৮ ফেব্রুয়ারী „
শ্রীশ্রীঠাকুর	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২৪ ফাল্গুন	রবিবার	৮ মার্চ „
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব-মহোৎসব)		১ চৈত্র	রবিবার	১৫ মার্চ „
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	৬ চৈত্র	শুক্রবার	২০ মার্চ „
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১০ চৈত্র	মঙ্গলবার	২৪ মার্চ „

পূজা-তিথি

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৩০ বৈশাখ	মঙ্গলবার	১৩ মে ১৯৮০
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	১৪ আষাঢ়	শনিবার	২৮ জুন „
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	৩০ আশ্বিন	বৃহস্পতিবার	১৬ অক্টোবর „
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২১ কার্তিক	শুক্রবার	৭ নভেম্বর „
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	২৬ মাঘ	সোমবার	৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২০ ফাল্গুন	বুধবার	৪ মার্চ „

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ২৮শে ডিসেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

জাহাজ চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার স্রোত জাহ্নবীর স্রোতের মত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এইভাবে আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে (১।২।৭) আসছি, যার শুরুতে পূজনীয় মাষ্টারমশাই গীতা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, এখানে তিনি দেখাবেন শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সকলের যাতে কল্যাণ হয় সেই চিন্তায় সর্বদা বিভোর। শ্লোকটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, ইষ্টানিষ্ট-

প্রাপ্তিতে যাঁরা সর্বদা সমবুদ্ধি, যাঁরা সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।'

জাহাজ পুরানো হাওড়া ব্রীজের তলা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত দিব্যবাণীর মধুর প্রভাবে অনেকেই বাহ্য-পরিবেশ ভুলে গিয়েছেন। জাহাজ কতটা এগিয়ে এসেছে বুঝতে পারছেন না। তারপরে তাঁরা একটু জলযোগের আয়োজন যখন করছেন, তখন ঠাকুর লক্ষ্য করলেন বিজয়কৃষ্ণ যিনি ঠাকুরের সঙ্গেই দক্ষিণেশ্বরে জাহাজে উঠেছিলেন, তিনি ও কেশবচন্দ্র দুজনেই যেন একটু সংকোচ বোধ করছেন। মাষ্টারমশাই এখানে বলছেন, ঠাকুর যেন দুটি অবোধ বালকের মনান্তর ঘুচিয়ে দেবেন। তাই মাষ্টারমশাই এখানে গীতার অনুসরণে লিখেছেন—'সর্বভূতহিতে রত'।

কেশবের এই সংকোচের কারণ আমরা জানি। তিনি নিজেই ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম না মেনে অল্পবয়স্কা নিজের মেয়ের কুচবিহার রাজবাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এই বিয়ে বৃটিশরাজের ইচ্ছা ও কেশবের আগ্রহেই হয়েছিল, তবু ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই, বিশেষ করে, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি নেতারা এই বাল্যবিবাহ অনুমোদন করেননি, যার ফলে ব্রাহ্মসমাজ আবার বিভক্ত হয়ে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা কেশবের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ত্যাগ করে যে নতুন ব্রাহ্মসমাজ গড়েন, তার নাম রাখেন 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'। ঠাকুরের সামনে এখন এসে পড়েছেন দুই বিরোধী গোষ্ঠীর দুই নেতা। ঠাকুর সব বিরোধের সমন্বয় করতে এসেছেন—মানুষের মনের যে অমিল, যে ভেদবুদ্ধি তা দূর করতেই তাঁর আবির্ভাব। সদাকল্যাণচিকীর্ষু তিনি। সকলের প্রতি সমান কৃপাদৃষ্টি তাঁর। এখানে দুই ধর্মনেতার মনের ভাবটি ধরে নিয়ে রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর তাঁদের একটু স্বাভাবিক করে দেবার জন্য, মাষ্টারমশায়ের ভাষায় 'দুইজন অবোধ ছেলেকে ভাব করিয়ে' দেবার জন্য—হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে হালকা করে দিতে চাচ্ছেন। পুরাণের একটি উপমা দিচ্ছেন। হয়তো কোন জায়গায় তিনি এই কাহিনীটি শুনেছিলেন যে, রামচন্দ্র যিনি শিবকে তাঁর উপাস্য দেবতা বলে মানতেন, রামেশ্বর শিব যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি একবার কোন কারণে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁদের সেই যুদ্ধ মিটে গেলেও, মনের অমিল ঘুচে গেলেও তাঁদের অনুচর ভূত আর বানরদের ঝগড়া আর মিটতে চায় না। কেশবের দিকে তাকিয়ে এই কাহিনীটি বলে ঠাকুর বলতে চাইছেন বিজয়-কেশবের মনোমালিন্য মিটে যেতে পারে কিন্তু তাঁদের অনুগামীদের মতবিরোধ আর মিটছে না।

ঠাকুর আরও বলছেন, 'আপনার লোক! তা এরূপ হ'য়ে থাকে।' ঘনিষ্ঠতা থাকলে এমন মনোমালিন্য মাঝে মাঝে হয়ই। কিন্তু তাকে জিইয়ে রাখতে নেই। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। লব আর কুশ তাঁদের বাবা রামচন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছিলেন। আবার মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে। ছেলেমানুষী ব্যাপার! কারণ মার মঙ্গলে মেয়ের মঙ্গল, মেয়ের মঙ্গলে মায়ের মঙ্গল। তেমনি কেশবের এক সমাজ, আবার বিজয়ের আরেকটি সমাজ। মিলে-মিশে থাকতে না পারায় এই আলাদা আলাদা সমাজ গড়া।—এই কথা বলেই ঠাকুর আবার উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, এরও দরকার আছে। শ্রীকৃষ্ণ-

লীলায় শ্রীমতী রাধিকার শাশুড়ী জটিলা আর ননদিনী কুটিলা সব সময়ই তাঁর চরিত্রে সন্দিগ্ধা। তাই নালিশ করছে তাঁর স্বামী আয়ান ঘোষের কাছে। কত অপমান করছে তারা রাধাকে, যার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে কালীরূপে দাঁড়াতে হয়েছে রাধাকে রক্ষা করতে আয়ান ঘোষের ক্রোধ থেকে। আয়ান ঘোষ শ্রীমতীকে অবিশ্বাস করতে পারেননি বরং তাঁর ইষ্টদেবী মা-কালীর প্রতি রাধার অনুরাগ দেখে খুশিই হয়েছেন। এখন শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার জীবনে জটিলা-কুটিলার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন—লীলার পুষ্টি-সাধন। শ্রীমতীর যে ব্যাকুলতা, যে তীব্র আর্তি সেটি ঠিক ফুটে উঠতো না, যদি জটিলা-কুটিলার বাধাগুলো না থাকতো। কাজেই লীলার পুষ্টির জন্য এই দুটি চরিত্রের দরকার ছিল। শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার জীবননাট্যে সার্থক রসসৃষ্টির জন্যই এদের অবতারণা।

কেশব আর বিজয়ের সমতুল দ্বন্দ্ব আমরা আরও একটি মহৎ জীবনে দেখতে পাই। সেটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা আচার্য রামানুজের জীবন। রামানুজ তাঁর প্রথমজীবনে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী আচার্য যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিছুদিন তাঁর কাছে পাঠ নেওয়ার পর একদিন একটি বিষয়ে গুরুর মত গ্রহণ করতে না পেরে রামানুজ আপত্তি তোলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে পরমাত্মার সাকার রূপের বর্ণনায় আছে, 'তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকম্ এবম্ অক্ষিণী।' শংকরাচার্য এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তাঁর (পরমাত্মার) চোখ দুটি, লাল পদ্মের মতো। কি রকম লাল? না—কপি তার শরীরের যে অংশের দ্বারা উপবেশন করে, সেই অংশের মতো লাল। শংকরাচার্য লিখেছেন. 'উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা।' তাৎপর্য এই যে, শ্রুতি পরমাত্মার চোখ দুটিকে সরাসরি বানরের রক্তিম পৃষ্ঠান্তভাগের সঙ্গে তুলনা করেননি। প্রথমে বানরের রক্তিম পৃষ্ঠান্তভাগের সঙ্গে পদ্মেরই তুলনা করেছেন, তারপর সেই পদ্মের সঙ্গে পরমাত্মার চোখ দুটির তুলনা করেছেন; তাই উপমাটি হীন উপমা নয়। যাদবপ্রকাশ শংকরাচার্যকে অনুসরণ করে শ্রুতিটির ব্যাখ্যা করায় রামানুজ মর্মাহত হয়ে কাঁদতে থাকেন। তিনি গুরুকে বলেন, এখানে 'কপি' শব্দের অর্থ 'সূর্য' (কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ)। 'আস' শব্দের অর্থ 'বিকসিত'। সুতরাং শ্রুতিটির অর্থ এই যে, পরমাত্মার চোখ দুটি সূর্যবিকসিত পদ্মের মতো। এই নিয়ে গুরু-শিষ্যে বাদবিতণ্ডা হয়। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে বলছেন, গুরুশিষ্যে এমন বিবাদ কিছু নতুন নয়। ও হয়েই থাকে। কিন্তু তা বলে মনোমালিন্য চিরকাল থাকবে কেন? আপনার লোকের মিল আবার হয়। এই বলে দুজনকে মিলিয়ে দিতে চাইলেন। (১।২।৭)

গীতা—

আমরা শ্রীভগবানের অবতারতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছিলাম। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম স্বেচ্ছায় নিজের মায়ার দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নররূপ ধারণ করে। কিন্তু তিনি কি যখন-তখন, যে কোন সময়েই, বিনা প্রয়োজনেই অবতরণ করেন? এই সম্ভাব্য প্রশ্নটি মনে রেখে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন—না, একটি বিশেষ যুগপ্রয়োজন-সংসিদ্ধির জন্যই তাঁকে আসতে হয়।

কী সে প্রয়োজন? আচার্য শংকর বলছেন, 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানিঃ হানিঃ বর্ণাশ্রমাদি-লক্ষণস্য প্রাণিনাম্ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসাধনস্য ভবতি, ভারত, অভ্যুত্থানম্ উদ্ভবঃ অধর্মস্য, তদা তদা আত্মানং সৃজামি অহং মায়য়া।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'হে অর্জুন! ধর্ম হচ্ছে মানুষের অভ্যুদয় আর মুক্তির সাধন; সেই ধর্মের পরিচয় আমরা পাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের সদাচারে। ধর্মের যখন হানি হয়—শুধু

ধর্মের হানি নয়, অধর্মেরও যখন উদ্ভব হয় অর্থাৎ মানুষ যখন অধর্মে প্রবৃত্ত হতে থাকে—তখনই আমি মায়াসহায়ে জন্মপরিগ্রহ করি।' (৪।৭)

আর কী প্রয়োজন? না— যাঁরা পবিত্র-জীবনযাপনেচ্ছু, ধর্মপথ অনুসরণ করে যাঁরা চলেন, সেই সব সাধুমহাত্মাদের পরিত্রাণের জন্য এবং তদ্বিপরীত-পথাবলম্বী দুরাচারীদের দমন করবার জন্য ;– প্রকৃতধর্ম কী সেটি সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্য নিজের জীবনে সেই ধর্মাদর্শকে প্রকাশিত করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য নররূপী হয়ে শ্রীভগবান আসেন। (৪।৮)

এর পর শ্রীভগবান বলছেন, "হে অর্জুন! আমার এই ঐশ্বরিক জন্ম আর কর্ম যিনি ঠিক-ঠিক জানেন, যিনি ঠিক বুঝেছেন যে, পরমাত্মা পরব্রহ্মই 'লোকানুগ্রহার্থং' মায়াকে বশীভূত করে শরীরধারণ করেন এবং সাধুসজ্জনের রক্ষা, দুষ্ট-দমন এবং ধর্মসংস্থাপনরূপ যুগপ্রয়োজন সংসাধন করেন, তাঁকে আর সংসারবন্ধনে পড়তে হয় না। দেহত্যাগান্তে তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।" (৪।৯)

কিন্তু ভগবানের দিব্য জন্ম আর কর্মের এই যে প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি, এটি সাধনসাপেক্ষ। সেই কথাই ভগবান বলছেন—যাঁদের মন থেকে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ একেবারে চলে যাওয়ার ফলে মন সম্পূর্ণ বিক্ষেপরহিত অবস্থায় এসেছে, যাঁরা মনকে পরিপূর্ণভাবে পরমাত্মাতে একাগ্র করেছেন, যাঁদের মনে আত্মচিন্তা ভিন্ন আর অন্য কোন চিন্তা নেই, ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানরূপ তপস্যা অবলম্বন করে যাঁরা সাধন করেছেন নিষ্ঠাসহকারে—এই রকম বহু লোক পরম পবিত্র হয়ে মুক্তিলাভ করেছেন। (৪।১০)

কিন্তু এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, সেই আশঙ্কা করে ভগবান নিজেই বলছেন, কেউ যদি তাঁর স্বরূপ বা অবতাররূপটি ধরতে না পারে, 'বীতরাগভয়ক্রোধ' হতে না পারে, কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারে, 'মন্ময়' হতে না পারে, যদি অন্য দেবতার উপাসনা করে, যদি কামনা-বাসনার জন্যই উপাসনা করে—তাহলে তার কী হবে?

এই ধরনের সাধকদের জন্যও শ্রীভগবান অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন। বললেন, মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে, অধিকারীভেদ আছে। কিন্তু সব ভাবেই মানুষ তাঁরই দিকে যাচ্ছে। যারা যে যে ফল আকাঙ্ক্ষা করে আমার শরণ নেয়, আমি তাদের সেই সেই ফলই দিয়ে থাকি। যারা আর্ত, আমি তাদের আর্তিহরণ করি, যারা ধনাদি কামনা করে আমি তাদের তা-ই দিই, যারা জিজ্ঞাসু, আমি তাদের জ্ঞান দিই, যারা মুমুক্ষু আমি তাদের মুক্তি দিই। মানুষের চাওয়ার ওপর সবটা নির্ভর করছে। যে যেমন চায়, তাকে আমি তেমনই দিই। সব চাওয়া-পাওয়ার ভেতর দিয়ে সব মানুষ আমারই পথে এগিয়ে চলেছে—শেষে আমাকেই তারা পাবে। (৪।১১)

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

গত ৫ই ও ৬ই এপ্রিল (১৯৮০) শনি ও রবিবার উদ্বোধনের 'সারদানন্দ হলে' প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শনিবার সকাল নয়টায়। পুষ্পমাল্যশোভিত শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিকৃতির নীচে শ্বেতবস্ত্রাবৃত বেদিকার উপর স্থাপিত একটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া তিনি অনুষ্ঠানের শুভ-সূচনা করেন। শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী

হিরণ্ময়ানন্দের স্বাগত-ভাষণের পর পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দ মহারাজ উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয় সকাল সাড়ে নয়টায়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী। 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের বাণী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ।

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও উদ্বোধন পত্রিকার আদি-পর্বের লেখকত্রয়ী' সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। তাঁহার বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন এবং ডঃ চিত্রা দেব।

মধ্যাহ্নে কিছুক্ষণ বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় বেলা ২টার সময়। পূর্বার্ধে সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, উত্তরার্ধে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'ভারতীয় শিল্পকলার ধারা ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ'। ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এই বিষয়ে ভাষণ দেন এবং তাঁহার লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করেন। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল ও চিত্রশিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়েই লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ভাষণপুরঃসর পাঠ করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বিষয় ছিল 'ভারতীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব'। আলোচনা করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত ও ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ।

বৈকাল পাঁচটায় একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা-ধারা'। স্বামী মুমুক্ষানন্দ ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ভাষণ দেন।

সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়, শ্রীঅরুণকৃষ্ণ ঘোষ এবং শ্রীঔদার্যময় মিত্র।

দ্বিতীয় দিন ৬ই এপ্রিল রবিবার সকাল সাড়ে নয়টায় তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয় শ্রীগোপালচন্দ্র দত্তের উদ্বোধনী সংগীতের দ্বারা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী। এই অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধটির বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় সাহিত্য-সৌন্দর্য'। ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন।

'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধটি পাঠ করেন ডঃ জলধিকুমার সরকার। আলোচনা করেন ডঃ দেবিদাস বসু, ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমিয়বিকাশ চৌধুরী এবং ডঃ ধ্রুব মাজিত।

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যে ইতিহাস' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন। 'বিবেকানন্দ-সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব' সম্বন্ধে অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য রাখেন।

'বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা' সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধটি পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আলো-

চনায় ছিলেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত, ডঃ অরুণ মিত্র, এবং ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত।

বৈকালীন সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য'। ভাষণ দেন ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইন্দিরা শিল্পীগোষ্ঠি শ্রীসুভাষ চৌধুরীর পরিচালনায় স্বামীজীর-গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দুইদিনব্যাপী এই সাহিত্য-সম্মেলন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-অনুরাগী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে।

বিবিধ সংবাদ

রাউরকেলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রাউরকেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে রাউরকেলায় নব-নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উৎসর্গী-করণ-উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় গত ৪ঠা হইতে ৯ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত। এই উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ মহারাজ ও মঠের অন্যান্য সাধুগণ শুভাগমন করেন।

৪ঠা সন্ধ্যা হইতে ৯ই দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মন্দির-প্রাঙ্গণে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে ভক্তি-মূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসবিতাব্রত দত্ত ও শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিমূলক ছায়াছবি 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ৪ঠা ও ৫ই সন্ধ্যায় জনসাধারণকে দেখানো হয়। সকালে ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা হয়।

৬ই প্রাতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রসহ একটি শোভযাত্রা মন্দির পরিক্রমা করে। মঠের সাধুগণ শ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি বহন করেন এবং ভক্তগণ সঙ্গীতসহ তাঁহাদের অনুগমন করেন। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরে প্রবেশপূর্বক সিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি স্থাপন করেন এবং পূজা ও আরতি করিয়া প্রণাম করেন।

৭ই ও ৮ই জনসভা হয়। ৭ই-এর সভায় ডাঃ এস. এন. দাতার পৌরোহিত্য করেন। পূজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ ঐ সভায় তাঁহার আশীর্বাদী ভাষণ দেন। ৮ই-এর সভায় শ্রী এন. সি. নায়ক পৌরোহিত্য করেন এবং স্বামী আত্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ ভাষণ দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মজয়ন্তী

হলদিয়া 'রামকৃষ্ণ সংস্কৃতিকেন্দ্রে'র তত্ত্বাবধানে বিগত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ ১৯৮০, হলদিয়া টাউনশিপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূত আবির্ভাবোৎসব ত্রিসহস্রাধিক ভক্তবৃন্দের সমাবেশে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও উদ্বোধকের পদ অলংকৃত করেন স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী শ্রীধরানন্দ, ডক্টর রমা চৌধুরী প্রভৃতি। বক্তাগণ সকলেই একবাক্যে বর্তমান যুগকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে'র যুগরূপে অভিনন্দিত করেন এবং মানবসেবার শুভব্রত গ্রহণের জন্য তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে আহ্বান জানান। শ্রীমা সারদাদেবীর বিশ্বজননীত্ব সম্বন্ধে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ডক্টর রমা চৌধুরী তাঁহাকে বিশ্বনারীর পুণ্যতম ধন্যতম অনন্যতম মহাদর্শরূপে পূজা নিবেদন করেন।

সভান্তে দুইদিন ডক্টর রমা চৌধুরী বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'যুগজীবনম্' এবং ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত শ্রীমীরাবাঈয়ের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 'অমর-মীরম্' ত্রিসহস্রাধিক ভক্তের সম্মুখে 'প্রাচ্যবাণী' কর্তৃক অভিনীত হইয়া সকলেরই মনোহরণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, 'যুগজীবনম্' সংস্কৃত নাটকটির শুভ উদ্বোধন করেন ২০-৬-৬৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ; এবং তাহার পর ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইহা পঞ্চশতাধিক বার অভিনীত হইয়া সকলকে বিশেষ-ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। হলদিয়া টাউনশিপেও প্রথম অভিনীত সংস্কৃত নাটকরূপে ইহা সহস্র সহস্র ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করে।

কলিকাতা রবীন্দ্রকানন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্রকাননে ১৮ই হইতে ২৪শে ফেব্রুআরি, ১৯৮০ পর্যন্ত বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে বিশেষ পূজা, হোম, শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও যাত্রাভিনয় হয় এবং ধর্মসভায় স্বামী শিবানন্দ গিরি ও স্বামী অচ্যুতানন্দ ধর্মপ্রসঙ্গ করেন।

দমদম সুভাষনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৪ই হইতে ১৬ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, শোভাযাত্রা, ভাগবতপাঠ ইত্যাদি হয়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদালীলা' কথকতা করেন। ধর্ম-সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন।

হাওড়া শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে কদমতলায় ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই মার্চ, ১৯৮০ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গপাঠ এবং কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলেন স্বামী পুরুষানন্দ ও স্বামী যোগস্থানন্দ। দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে বলেন স্বামী অচ্যুতানন্দ। তৃতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের কথা আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। ২২শে মার্চের বিশেষ অনুষ্ঠানে স্বামীজীর কথা বলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই হইতে ২৫শে ফেব্রুআরি ১৯৮০ পর্যন্ত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, পূজাপাঠ, হোম, ভোগ, প্রসাদবিতরণ, লীলাপ্রসঙ্গপাঠ ও সন্ধ্যারতির পর ভজন-সঙ্গীত হয়। ১৯শে হইতে ২৩শে পর্যন্ত রামায়ণ-গান, ২৪শে অষ্টপ্রহর নাম-কীর্তন। ২৫শে নরনারায়ণসেবা হয় ও সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতি ছিলেন স্বামী বিকাশানন্দ।

পিরোজপুর (বরিশাল) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক ২৭শে হইতে ২৯শে ফেব্রুআরি, ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত হয়। স্বামী পরদেবানন্দ, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভাবুক, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ হাওলাদার রামকৃষ্ণ ও মানবধর্ম, সারদাদেবী ও মাতৃজাতি এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমণিলাল সাহা ও সুশীলকুমার দাস। পদাবলী-কীর্তন, রামযাত্রা, এবং দরিদ্রনারায়ণগণের মধ্যে প্রসাদবিতরণ হয়।

হোটর শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ আশ্রম কর্তৃক গত ২৯।২।৮০ হইতে ২।৩।৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়।

এই উপলক্ষে গীতা ও শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ নগর-পরিক্রমা, পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গীত, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল-গান, কীর্তন ও চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এক সভায় স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উক্ত তিনদিন স্থানীয় জনসাধারণ বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বঙ্গাইগাঁ রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৮ই ও ৯ই মার্চ, ১৯৮০ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। স্বামী তত্ত্বাবোধানন্দ উভয় দিন শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

বোদরা (২৪ পরগণা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পর্ষৎ কর্তৃক গত ১২ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী শর্মানন্দ, স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী ভাবাতীতানন্দ ও স্বামী সর্বাত্মানন্দ।

গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৬ই মার্চ, ১৯৮০ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব, মঙ্গলারতি, গীতাপাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-পাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে পালিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে আশ্রমস্থ 'বিবেকানন্দ বালক সংঘ' রামনাম-সংকীর্তন করে এবং 'বিবেকানন্দ বালক সংঘে'র ছেলেদের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী অঘোরানন্দ। পরে ধর্মসভায় ভাষণ দেন শ্রীপ্রাণকুমার মজুমদার, শ্রীধনঞ্জয় দাশ, শ্রীজয়দেব সাহা, শ্রীহৃদয়চন্দ্র দাশ এবং সভাপতি স্বামী অঘোরানন্দ। সন্ধ্যারতির পর শ্রীকালিপদ দেবনাথ ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ-গান হয়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য খ্যাতনামা সমাজসেবী ও চিকিৎসক ডাঃ **দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত** গত ১৪ই পৌষ রবিবার, রাত্রি ২টা-২৫ মিনিটে তাঁহার দমদম জংসনস্থিত বাসাবাটীতে সজ্ঞানে পরলোক-গমন করেন।

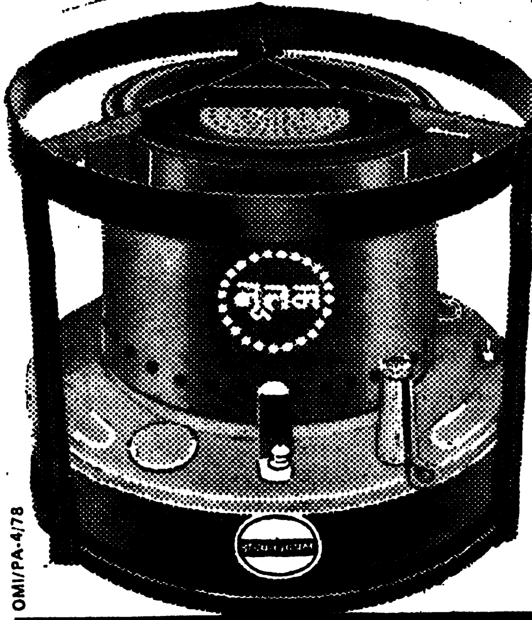
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত সেন-হাটি গ্রামে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের তিনি ছিলেন দৌহিত্র। মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শ্রীমা সারদাদেবীর নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। চিকিৎসক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন খুলনা শহরে। সেখানে বহু জনকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। দেশবিভাগের পর দ্বিজেন্দ্রলাল দমদম জংসনে চিকিৎসা-ব্যবসা শুরু করেন এবং আপন প্রতিভা ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে সর্বসাধারণের মন জয় করিতে সমর্থ হন।

গত ২৯শে জানুআরি ১৯৮০, **কল্পনা বসু** কিছুকাল রোগভোগের পর দিল্লীতে সজ্ঞানে ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করেন।

ভক্ত পরিবারে তাঁহার জন্ম। পিতা ৺অমূল্য কৃষ্ণ ঘোষ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং জননী শ্রীমতী শতদল ঘোষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা।

শৈশবেই তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ও স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং বেলুড় মঠের বহু সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা ছিলেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ছিলেন এবং বেলুড় মঠ ও মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সারদা মঠ ও উহার দিল্লী শাখাকেন্দ্রের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন।



উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮'০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২'৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫'২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭'৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮'২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯'৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। পৃঃ ৬৪০, মূল্য ২৬'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩'৫০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩'৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২১০, সাধারণ ••, রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১'২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৪'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২'২০, বাঁধাই ২'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'০০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬'০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬'০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'২৫

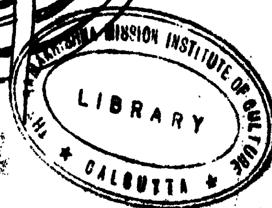
Udbodhan—Phone : 55-2447 APRIL 1980 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭
৮২তম বর্ষ
৫ম সংখ্যা





নিবেদন

বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির অভূতপূর্ব অবনতি ঘটায়, গত কয়েক মাস যাবৎ পত্রিকা বহু বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যা ডাকে দেওয়া হয় ২৮শে ফাল্গুন; চৈত্র সংখ্যা ৩রা বৈশাখ; বৈশাখ সংখ্যা ৭ই জ্যৈষ্ঠ। ক্রমবর্ধমান এই বিলম্বের মূল কারণ হইল, বিদ্যুৎ-সরবরাহে নিদারুণ ঘাটতির জন্য প্রেসের কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হওয়ায় প্রেস নির্দিষ্ট দিনের বহু পরে ছাপার কাজ শেষ করিতেছে।

পত্রিকা বিলম্বে পাওয়ার জন্য গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা প্রতিদিনই অভিযোগপত্র পাই। তাঁহাদের, লেখকদের তথা পাঠকদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কটে আমরা নিরুপায়।

বিদ্যুৎ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান বিলম্বের কোনই প্রতিকার নাই।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সম্পাদক

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭



উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



৮২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

যত অধিক সংখ্যায় প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যত বেশী শাস্ত্র থাকিবে, যত বেশী মন্ত্রদ্রষ্টা থাকিবেন, যত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, জনসাধারণের পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের সুযোগ হয়, ভাবজগতে এবং ধর্মজগতেও সেরূপ হইয়া থাকে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের কী বহুবিধ সুযোগ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে নানা সামগ্রী আয়ত্তের মধ্যে পাইলে মানুষের পক্ষে কত বেশী সুবিধা হয়! ধর্মজগতেও সেইরূপ। ইহা ভগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে বহু ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে। প্রার্থনা করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অনুযায়ী স্বতন্ত্র ধর্মমতের অনুবর্তী হইবার সুযোগ লাভ করুক।

···যে-কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও —তাহাতে কিছু আসে যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিও সাধনপথটি যেন তোমার সংস্কার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলেই তোমার উন্নতি নিশ্চিত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩।২৮৫-৬]

কথাপ্রসঙ্গে

'তাও বটে, আবার তাও বটে'

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের 'সাধকভাব' খণ্ডে গ্রন্থকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং এই কারণে উহারা পরস্পর-বিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থা-সাপেক্ষ। 'যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।'

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিনটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) 'অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।'

(২) 'মনবুদ্ধিসহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!'

(৩) 'বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সংকীর্তনাদি প্রশস্ত।'

এই তিনটি উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটি সবিশেষ লক্ষণীয়।—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, (ক) অদ্বৈতভাব শেষ কথা এবং (খ) উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

'অদ্বৈতভাব শেষ কথা' বলিয়া উহার অধিকারীও বিরল। এবং এই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ দিতেন—ইহা আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে বারংবার লক্ষ্য করি। কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ইহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়াপটীর বাটীতে ব্রাহ্ম-সমাজের বাৎসরিক উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেছেন—'দেখ, ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙ্‌মনসোগোচর বেদে বলেছে; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর।' (কথামৃত, ৫।৩।১)।

'অবাঙ্‌মনসোগোচর'-এর শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃত এই যে ব্যাখ্যা—ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যগণের ব্যাখ্যা। আচার্য রামানুজ উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্য লিখেন নাই, কিন্তু রামানুজীয় সম্প্রদায়ের আচার্য রঙ্গরামানুজ প্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্য বা টীকা লিখিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২।৪) 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন' (যে ব্রহ্ম হইতে মনের সহিত বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে অর্থাৎ যে ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত, তাঁহার আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না) —এই বাক্যের ব্যাখ্যায় রঙ্গরামানুজাচার্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ মনের দ্বারা ব্রহ্মকে জানিয়া মানুষ কখনও ভীত হয় না; ব্রহ্ম যে একেবারেই বাক্যমনের অতীত এই উপনিষদ্‌বাক্যে তাহা বলা হয় নাই; বরং ইহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মানন্দ শুদ্ধমনের গোচর—সুতরাং উহা মনেরই বিষয়।[১]

আচার্য রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যের

---

১ 'শুদ্ধেন মনসা জ্ঞাত্বা কদাপি ন বিভেতি ইতি অর্থঃ। অত্র ব্রহ্মানন্দস্য শুদ্ধমনো-গোচরত্ব-প্রতিপাদকত্বাৎ অস্য মনোবিষয়ত্বম্ অস্তি ইতি দ্রষ্টব্যম্।'

উপক্রমণিকায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঐ একই বাক্যের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই যে, ব্রহ্ম অনন্ত ও অপরিমিত গুণসম্পন্ন হওয়ায় বাক্য ও মন ব্রহ্মের ইতি করিতে পারে না; সুতরাং যাহারা ব্রহ্মের অসীম গুণরাজির সীমা-নির্দেশ করে, তাহারা ব্রহ্মকে জানে না; আর যাঁহারা ঐভাবে ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করেন না, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানেন; সুতরাং ব্রহ্মকে যে মনের দ্বারা জানা যায় না, তাহা নহে। রামানুজ আরও বলিতেছেন যে, এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে 'যস্য অমতং তস্য মতং···বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্' (ব্রহ্ম যাঁহার নিকট অবিদিত, তাঁহারই নিকট বিদিত[২]···যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন না, তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানেন[২] বলিয়া কেনোপনিষদে (২।৩) যে-কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়।[৩]

স্পষ্টই বুঝা যায়, রামানুজ বলিতেছেন যাহাদের মন অশুদ্ধ, তাহারা অনন্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মের গুণরাজির ইয়ত্তা করে বলিয়া তাহাদের নিকট ব্রহ্ম মনের অগোচর থাকিয়া যান; পক্ষান্তরে যাঁহাদের মন শুদ্ধ, তাঁহারা অনন্তগুণসম্পন্ন ব্রহ্মের গুণরাজির যে ইয়ত্তা করা যায় না, ইহা উপলব্ধি করেন এবং এইরূপ উপলব্ধি করার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম শুদ্ধ মনের গোচর।

ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসোগোচর—এই কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপক্ষ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা আমরা দেখিলাম। আমাদের প্রতিশ্রুত আরও দু-একটি উদাহরণের উল্লেখ করিতেছি। কোন্নগরের জনৈক সাধক দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রশ্ন করেন, 'তাঁকে (ঈশ্বরকে) কি দর্শন করা যায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর।··· কিন্তু শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর—যে মনে, যে বুদ্ধিতে আসক্তির লেশমাত্র নাই···।

সাধক: কিন্তু শাস্ত্রে বলছে,—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ',—তিনি বাক্যমনের অগোচর।

শ্রীরামকৃষ্ণ: ও থাক থাক! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।··· (কথামৃত, ৪।১৯।২)।

এই সাধকটি সম্বন্ধে 'শ্রীম' লিখিয়াছেন যে, তাঁহার 'বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ হয়, ভিতরে খুব পাণ্ডিত্যাভিমান আছে।' 'কথামৃতে' দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত ভবনাথও সাধকটি সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'খুব শ্লোক বলতে পারে।' 'শ্রীম' ও ভবনাথের মন্তব্য হইতে অনুমান করা যায় যে, সাধকটি 'অবাঙ্‌মনসোগোচর'-এর অদ্বৈতপর ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যে সেই ব্যাখ্যার অধিকারী ছিলেন না, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'ও থাক থাক! সাধন না করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না'—এই কথা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। অদ্বৈতপর ব্যাখ্যার অধিকারী হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে কখনই ঐভাবে বাধা দিতেন না এবং বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যাও করিতেন না।

---

২ রামানুজের বক্তব্য এই যে কেনোপনিষদ্ তো স্পষ্ট বলিতেছেন—ব্রহ্ম 'মতম্' (বিদিত), 'বিজ্ঞাতম্' (বিজ্ঞাত) অর্থাৎ ব্রহ্ম মনের অগোচর নহেন। সুতরাং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঐ বাক্যটিও এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, কেনোপনিষদের বাক্যটির সহিত কোন বিরোধ না হয়।

৩ "'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' ইতি ব্রহ্মণঃ অনন্তস্য অপরিমিতগুণস্য বাঙ্‌মনসয়োঃ এতাবৎ ইতি পরিচ্ছেদাযোগ্যত্ব-শ্রবণেন ব্রহ্ম 'এতাবৎ' ইতি ব্রহ্মপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং ব্রহ্ম 'অবিজ্ঞাতম্' 'অমতম্' ইতি উক্তম্, অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ ব্রহ্মণঃ। অন্যথা, 'যস্য অমতং তস্য মতং··· বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্' ইতি ব্রহ্মণঃ মতত্ব-বিজ্ঞাতত্ব-বচনং তত্র এব বিরুধ্যতে।"

আরেকটি উদাহরণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্র ঘোষের গৃহে আগমন করিয়াছেন। 'শ্রীম' লিখিয়াছেন, 'ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত;— শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিয়া। নরেন্দ্র, গিরিশ, রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার—অনেকে আছেন।' নরেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরম্।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: না; তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর।

(কথামৃত, ১।১৪।৭)

এখন প্রশ্ন হইবে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে কেন এই কথা বলিলেন? নরেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং তাঁহাকে ঐরূপ বলার কারণ কি? ইহার উত্তর উপরি-উদ্ধৃত 'শ্রীম'র কথাতেই নিহিত।—বহু ভক্তের উপস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথকে তিনি ঐকথা বলিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ উপলক্ষ্য মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাগত ভক্তবৃন্দকেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ শিখাইতেছিলেন। 'কথামৃতে'র ঐ পরিচ্ছেদেই (১।১৪।৭) আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন, 'বিচার আর কি করবো! দেখছি—তিনিই সব। তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়।'

'তাও বটে, আবার তাও বটে'—কথাটির অর্থ কি? অর্থ এই যে, দুইটি পক্ষই তিনি স্বীকার করিতেছেন—(১) 'তিনিই সব হয়েছেন' অর্থাৎ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের পক্ষ এবং (২) 'এক অবস্থায় অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে' যাওয়া অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীদের পক্ষ। কারণ, একটু পরেই তিনি বলিতেছেন, 'বেদান্ত—শংকর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।' নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিতেছেন, 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি?' শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেলের উদাহরণ দিয়া রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইভাবেই পরিচ্ছেদটি শেষ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের এত কথা 'শ্রীম'-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের জন্য। নরেন্দ্রনাথ প্রশ্নটি করিলেও এইরূপ মনে করা ভুল যে, তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই অধিকারী—অদ্বৈতবাদের অধিকারী নহেন। 'নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তিই নরেন্দ্রনাথের অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে একটি প্রমাণ। আরও বহু প্রমাণ 'কথামৃতে' ও 'লীলাপ্রসঙ্গে' পাওয়া যায়।

'তাও বটে, আবার তাও বটে'র অর্থ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাতেই আমরা পাইলাম: 'বেদান্ত—শংকর যা বুঝিয়েছে, তাও আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।' 'অবাঙ্‌-মনসোগোচরম্'-এর বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু কথা এবং রামানুজ ও রঙ্গ-রামানুজের শাস্ত্রব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছি। উহার অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা ঐভাবে উপস্থাপিত করা হয় নাই, যদিও সদ্য-উদ্ধৃত 'অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হওয়া' এবং প্রবন্ধারম্ভে উদ্ধৃত 'অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দুই উক্তির মধ্যেই অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাটি নিহিত। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাটি স্বামী বিবেকানন্দের কথায় উপস্থাপিত করা অসমীচীন হইবে না। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী নিজ 'অবাঙ্‌-মনসোগোচরম্'-এর অনুভূতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন: "[কাশীপুরের বাগানে] সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খুঁজে পেলুম না। *দেহটা একেবারেই নেই মনে হয়েছিল।* চন্দ্র সূর্য দেশ কাল আকাশ—সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির প্রায় অভাব হয়েছিল, প্রায় লীন হয়ে গিছলুম আর

কি! একটু 'অহং' ছিল, তাই সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরূপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্রহ্মে'র ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন মহ সমুদ্র—জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌' কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্রহ্ম' এ-কথা সাধক যখন ভাবছে বা বলছে, তখনও 'আমি' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—দ্বৈতভান থাকে।" (বাণী ও রচনা, ৯।৯৯)

উল্লেখ্য যে, দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী প্রমুখ বৈদান্তিকগণ মনের অতীত কোন তত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের কেবলমাত্র সবিকল্প সমাধি হয়, যে-সমাধিতে উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা—এই ত্রিবিধ ভেদ বর্তমান থাকে। কিন্তু অদ্বৈতবাদীদের নির্বিকল্প সমাধিতে উপাস্য-উপাসক-উপাসনা, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা-জ্ঞান, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত[৪] ইত্যাদি যাবতীয় ভেদ বিলুপ্ত হয়—নির্ভেদ ব্রহ্ম মাত্রই প্রকাশিত থাকেন। নির্ভেদ ব্রহ্মেরই অপর নাম নির্বিশেষ ব্রহ্ম। এই নির্বিশেষ-ব্রহ্মতত্ত্বকে অদ্বৈতবাদী ভিন্ন অন্য কোনও বৈদান্তিকই স্বীকার করেন না। সুতরাং রামানুজ-প্রমুখ আচার্য যখন বলেন যে, ব্রহ্ম শুদ্ধ মনের গোচর, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্ম বলিতে সবিশেষ অর্থাৎ ভেদযুক্ত ব্রহ্মই স্বীকার করেন।

পক্ষান্তরে অদ্বৈতজ্ঞানের সাধক যখন সম্যক্ শুদ্ধচিত্ত অধিকারী হইয়া বেদান্ত ও গুরুমুখে 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) শ্রবণ করেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম)-বৃত্তির উদয় হয়। এই ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করে এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন।[৫] অবশ্য নির্বিকল্প সমাধিতে বৃত্তি থাকে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। আনন্দগিরির মতে বৃত্তি থাকে, কিন্তু উহা অজ্ঞায়মান থাকে।[৬] বিদ্যারণ্যমুনি[৭] ও

৪ একটি বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফলাদির যে ভেদ—উহা স্বগত ভেদ। বৃক্ষের সহিত প্রস্তরের যে ভেদ—উহা বিজাতীয় ভেদ এবং একটি বৃক্ষের সহিত অপর কোন বৃক্ষের যে ভেদ—উহা সজাতীয় ভেদ। পঞ্চদশীতে একটি শ্লোকে (২।১৫) এই ত্রিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে—

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥

৫ যদিও 'প্রকাশিত হন' লেখা হইল, মনে রাখিতে হইবে ব্রহ্ম সর্বদাই প্রকাশিত আছেন। ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত সাধক ব্রহ্মের এই নিত্যপ্রকাশরূপত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

৬ গীতার ৬।২০ শ্লোকের শাংকরভাষ্যের উপর আনন্দগিরির টীকায় আছে—'দ্বিবিধঃ সমাধিঃ সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞাতশ্চ, ধ্যেয়ৈকাকারসত্ত্ববৃত্তিভেদেন কথঞ্চিৎ জ্ঞায়মানা সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ, কথমপি পৃথগজ্ঞায়মানা সা এব সত্ত্ববৃত্তিঃ অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।' অর্থাৎ, সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাতভেদে সমাধি দ্বিবিধ। ধ্যেয় পদার্থের সহিত একাকার যে সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তি তাহা কোন প্রকারে জ্ঞায়মান থাকিলে সেই সমাধিকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে। আর ঐ সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তি অজ্ঞায়মান থাকিলে সেই সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

৭ বিদ্যারণ্যমুনি-কৃত পঞ্চদশীতে আছে (১।৫৬)—

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ॥

অর্থাৎ, নির্বিকল্প সমাধিতে আত্মবিষয়ক বৃত্তি থাকিলেও, উহা অজ্ঞাত থাকে। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত ব্যক্তির স্মৃতি হইতে বৃত্তির অস্তিত্ব অনুমিত হয়।

সদানন্দ-যোগীন্দ্রের[৮] মতও অনুরূপ। কিন্তু মধুসূদন সরস্বতীর মতে নির্বিকল্প সমাধিতে কোনও বৃত্তি থাকে না।[৯]

নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মাকারা অজ্ঞায়মান বৃত্তি থাকে, এই মতই সমীচীন মনে হয়। কারণ, বৃত্তি না থাকিলে ঐ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত ব্যক্তির সমাধির স্মৃতি থাকিতে পারে না। পঞ্চদশীকারও এই যুক্তিই উপস্থাপিত করিয়াছেন। (পাদটীকা ৭ দ্রষ্টব্য)

এখন প্রশ্ন হইতেছে—নির্বিকল্প সমাধিতে যদি অন্তঃকরণের বৃত্তিই থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে মনের অগোচর বলা যায় কিভাবে? উল্লেখ্য যে, শংকরাচার্য নিজেই বলিয়াছেন—অদ্বৈতজ্ঞানও মনোবৃত্তিমাত্র।[১০]

এই সমস্যার সমাধান অদ্বৈতবাদিগণ এইভাবে করেন:

> ঘট, পট প্রভৃতি যেভাবে আমাদের মনের গোচর হয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ঠিক সেইভাবে আমাদের মনের গোচর হন না। যখন কেহ একটি ঘট দেখে, তখন অন্তঃকরণের ঘটাকারা বৃত্তি ঘটের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করে, কিন্তু ঘট জড় বস্তু বলিয়া নিজেকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটাকারা বৃত্তির দ্বারা ঘটের আবরক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে অন্তঃকরণের বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাস, যাহার পারিভাষিক নাম 'ফল' বা 'ফলচৈতন্য', তাহার দ্বারা ঘটটি প্রকাশিত হয়। এইজন্য ঘটাদি যাবতীয় জড় বস্তুকে বলা হয় 'বৃত্তিব্যাপ্য' ও 'ফলব্যাপ্য'।[১১] কিন্তু যখন নির্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন—যে-কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে—অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করে এবং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হন—চিদাভাস অর্থাৎ 'ফলে'র দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে প্রকাশ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে না। যিনি স্বপ্রকাশ—যাঁহার প্রকাশে সব কিছু প্রকাশিত, তাঁহাকে কে প্রকাশ করিবে! এইজন্য অদ্বৈতবাদীরা বলেন—ব্রহ্ম বৃত্তি-ব্যাপ্য, ফলব্যাপ্য নহেন।[১১]

উপনিষদে আমরা দুই ধরনের আপাতবিরোধী কথা পাই—

---

৮ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদান্তসারে আছে—'নির্বিকল্পকঃ তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি-বিকল্পলয়াপেক্ষয়া অদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাম্ একীভাবেন অবস্থানম্।' অর্থাৎ, জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই সকল বিকল্প লয় হইলে ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর সহিত অত্যন্ত একীভূত হইয়া যে অবস্থান, তাহাই নির্বিকল্প সমাধি।

৯ মধুসূদন সরস্বতী গীতার ৬।২৫ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'নিরোধসমাধিনা নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন…বৃত্তিং বিনা এব নির্বিঘ্নম্ আত্মা অনুভূয়তে।' অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়—বৃত্তি ব্যতিরেকেই নির্বিঘ্নে আত্মা অনুভূত হন।

১০ 'যথা অদ্বৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অন্যানি অপি উপাসনানি মনোবৃত্তিরূপাণি ইতি অস্তি হি সামান্যম্।' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌, ভাষ্যভূমিকা)—অদ্বৈতজ্ঞান যেরূপ মনোবৃত্তি-মাত্র, উপাসনাগুলিও সেইরূপ মনোবৃত্তিমাত্র; সুতরাং অদ্বৈতজ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে এই 'সামান্য' অর্থাৎ সমান ধর্ম অবশ্যই আছে।

ইহার পর শংকরাচার্য আত্মজ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আত্মজ্ঞান হইলে আত্মাতে আরোপিত কর্তৃত্বাদিধর্ম রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় চিরতরে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু উপাসনার ক্ষেত্রে তাহা হয় না।

১১ পঞ্চদশীতে আছে: 'বুদ্ধি-তৎস্থ-চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং

(১) মনের দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না। যথা—'যন্মনসা ন মনুতে' (কেন উপ. ১।৬) অর্থাৎ যাঁহাকে (যে ব্রহ্মকে) লোকে মনের দ্বারা চিন্তা করিতে পারে না; 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয় উপ. ২।৯) অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে—তাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া—মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়; ইত্যাদি।

(২) মনের দ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। যথা —'মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্' (কঠ উপ. ২।১।১১) অর্থাৎ এই ব্রহ্ম মনের দ্বারাই লভ্য; 'মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্' (বৃহ. উপ. ৪।৪।১৯) অর্থাৎ ব্রহ্ম মনের দ্বারাই অনুদ্রষ্টব্য (আচার্যের উপদেশ অনুসারে দ্রষ্টব্য); 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' (কঠ উপ. ১।৩।১২) অর্থাৎ একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণের দ্বারা [ব্রহ্ম] দৃষ্ট হন; ইত্যাদি।

অদ্বৈতবাদিগণ আপাতবিরোধী এই উপনিষদ্-বাক্যগুলির সামঞ্জস্য এইভাবে করেন যে, প্রথম পক্ষে বলা হইতেছে ব্রহ্ম ফলব্যাপ্য নহেন এবং দ্বিতীয় পক্ষে বলা হইতেছে ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য। রামানুজ-প্রমুখ আচার্যগণের সামঞ্জস্যবিধান এইরূপ জটিল নহে। তাঁহাদের মতে প্রথম পক্ষে অশুদ্ধ মনের কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পক্ষে শুদ্ধ মনের কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ সাধকের পক্ষে রামানুজ-প্রমুখ আচার্যগণের ব্যাখ্যাই সহজবোধ্য এবং সাধনার উপযোগী। এবং এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধারণতঃ ঐ ব্যাখ্যাই করিতেন। তথাপি, জটিল হইলেও অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা তাঁহার অমনোনীত নহে। 'তাও বটে, আবার তাও বটে'—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অপূর্ব সমন্বয়বাণী যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই।

ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥' (৭।৯০); 'ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা। স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে॥' (৭।৯১) অর্থাৎ বুদ্ধি এবং তাহাতে স্থিত চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপ্ত করে; ঘটের [আবরক] অজ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং চিদাভাসের দ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়। (৭।৯০); ব্রহ্মের আবরক অজ্ঞাননাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তিই অপেক্ষিত, ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চিদাভাসের উপযোগিতা নাই। (৭।৯১)

নানা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ধীরেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় গৃহী শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :

'শ্রীরামকৃষ্ণদেব আপনার জীবন আদর্শস্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাতে সকল ভাবেরই পূর্ণ পূর্তি দেখা যায়। তিনি এক অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ রূপে, অদ্বিতীয় রামকৃষ্ণ আকারে বৈদান্তিক অদ্বৈতজ্ঞানের আকরবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত বৈদান্তিকেরা তাঁহাকে পরমহংস বলিতেন।

'তিনি লীলারসের অদ্বিতীয় পক্ষপাতী এবং প্রেমভক্তির প্রস্রবণবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার বলেন।

'তিনি তন্ত্রসাধনার অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। তন্ত্রাদি বিশেষতঃ উর্ধ্বমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ সাধনাদি যাহা অসাধ্য, তাহাও তিনি নিজে ব্রাহ্মণীর সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া তান্ত্রিক সাধকদিগের দ্বারা পরিকীর্তিত হইয়াছেন।

'রামকৃষ্ণ নবরসের ঘনীভূত দেবতা বলিয়া নবরসিক সম্প্রদায় তাঁহাকে রসিকচূড়ামণি বলিয়াছেন।

'তিনি বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবের গোঁসাই, কর্তাভজার আলেখ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

'শিখেরা নানক, মুসলমানেরা পয়গম্বর, খ্রীষ্টানেরা যীশু, ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া তাঁহাকে বুঝিতেন।

'তিনি এক অদ্বিতীয় এবং সমুদয় ধর্মভাব তাঁহাতে বিকশিত হইয়া তাঁহাতেই পর্যবসিত রহিয়াছে।'

(শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫০২)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্তভাবময়। তাঁহার জীবনে সর্বভাবের পরিপুষ্টি দেখা যায়। সর্ব মতবাদই তাঁহার অনুভূতির আলোকে সমুজ্জ্বল। নিজ জীবনে সর্বধর্মের সাধন করিয়া উহাদের প্রামাণিকতা ও অধিকারীবিশেষে উহাদের অনুশীলনের সার্থকতাও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। জগতের ধর্মেতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর নাই। যুগপ্রয়োজনেই শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরাবলম্বনে ভগবদিচ্ছায় এই অপূর্ব সাধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। ঠাকুরের বাণী হইতেই আমরা তাঁহার বিভিন্ন ধর্মমতের স্বীকৃতি ও তাহাদের সামঞ্জস্যের মূল সূত্র খুঁজিয়া পাই। এই সূত্রের মূলও তাঁহার স্বকীয় দিব্য অনুভূতি।

ঠাকুর অধিকারী বিচার না করিয়া কাহাকেও উপদেশ দিতেন না। শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদ একমাত্র যোগ্য অধিকারী স্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি শিখাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে স্বামীজীর নিজের বাণীই প্রমাণ—

'Generally he used to teach Dualism. As a rule he never taught Adwaita. But he taught it to me.' (C. W. VII. p. 400)

স্বামীজীকেই ঠাকুর 'অষ্টাবক্রসংহিতা' আদি গ্রন্থ পড়িতে বলিতেন এবং আর কেহ শুনিতে না পায় সে বিষয়ে ঘরের চারিদিকে সতর্ক রাখিতেন।

হাজরা একদিন ত্যাগী বালক-ভক্তদের অদ্বৈতভাবের কথা বলায় ঠাকুর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন—'এ সব ছোকরাদের কত ক'রে ভাব ভক্তি একটু হচ্ছে, তুমি ওদের এসব কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথায় ?'

ঠাকুর কত যত্নে বালক-শিষ্যদের ভাব রক্ষা করিবার প্রযত্ন করিতেন, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য বোধ হয়।

হাজরাকে ঠাকুর আবার বলিলেন—'ওরা (লাটু প্রভৃতি) অমনি আছে। এখনও অত উচ্চ অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিয়ে আছে। আর ওদের (সোঽহং ইত্যাদি) কিছু বলো না।'

ঠাকুর—'নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কষ্টে একটু ভক্তি হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভক্তির হানি হয়।'

প্রসঙ্গান্তরে ঠাকুর বলিতেছেন : 'এ যা বললুম —সব বিচারের কথা। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ! বড় কঠিন পথ। এ পথে লীলা স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 'আমিটা'ও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না, বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা ভক্তদের বেশী শুনতে নাই।'

তাই অধিকারীবিশেষে ঠাকুর বলিতেছেন—'জগৎ মিথ্যা কেন হবে ? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীবজগৎ হয়েছেন।'

'কথামৃত' প্রথম ভাগে শ্রীম স্বগতোক্তি করিতেছেন—"ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নবৎ বলছেন না। বলেন, 'তাহলে ওজনে কম পড়ে।' মায়াবাদ নয়

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। কেননা, জীবজগৎ অলীক বলছেন না, মনের ভুল বলছেন না। ঈশ্বর সত্য, আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। বীচি খোলা বাদ দিলে সব বেলটা পাওয়া যায় না।"

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল কথা বার বার বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীম-র স্বগতোক্তি স্বাভাবিক। শ্রীম ঠাকুরের মত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বুঝিয়াছেন।

কিন্তু, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—এ সিদ্ধান্তও ঠাকুরের অননুমোদিত নহে। পুনঃ 'কথামৃত' গ্রন্থে ঠাকুর বলিতেছেন :

"বেদান্তবিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের আমি অভিমান ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।"

"যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।···জ্ঞানী যেমন বেদান্তবাদী—কেবল 'নেতি নেতি' বিচার করে। বিচার ক'রে বোধ হয় যে, 'আমি' মিথ্যা জগৎও মিথ্যা। স্বপ্নবৎ।"

"আমি জানি বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মা বল্লেন—বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা আমি আলাদা কিছু নই—আমি সেই ব্রহ্ম।"

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—'শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বপ্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানব-জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই।' নিরন্তর ছয় মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানকালে ঠাকুরের ঐ কালের প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—"ঐ অবস্থায় পৌছিয়া ঠাকুর অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ং ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী। আর দেখিলেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নির্গুণ ও সগুণভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত—ইহাকে শাস্ত্রে স্বগত-ভেদ বলিয়াছে···। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয়ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পরে ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক'··· ।"

(গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ১১০।১১১)

নির্বিকল্প সমাধিতে সগুণ-নির্গুণ উভয়ভাব-জড়িত স্বগতভেদবিশিষ্ট জগদম্বার যে দর্শন ঠাকুরের হইয়াছিল উহাই কি অদ্বৈত-বেদান্তোক্ত ব্রহ্মদর্শন ? —এই বিষয় লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অদ্বৈতবেদান্তমতে নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাত্রাদি-ত্রিপুটীলয়পূর্বক অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির কেবল অদ্বিতীয় চিদানন্দবস্তুমাত্ররূপে অবস্থান হইয়া থাকে। তৎকালে ঐ চিত্তবৃত্তিরও প্রতীতি থাকে না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরই কেবলমাত্র প্রকাশ বা ভান থাকে। এ মতে এই নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্বগতাদি কোন প্রকার ভেদই স্বীকৃত নহে। সগুণ, ঔপাধিক রূপ, তাত্ত্বিক নহে, উহা মিথ্যা। নির্গুণ নিরুপাধিক রূপই সত্য, এইরূপ স্বীকৃত হইয়া থাকে।

লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত নির্বিকল্প সমাধিতে ঠাকুরের যে স্বগতভেদবিশিষ্ট সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপে বিভক্ত এক অদ্বিতীয় জগদম্বার দর্শন হইয়াছিল উহা অদ্বৈতবেদান্তের মত নহে, কারণ এই মতে শুদ্ধ ব্রহ্মে স্বগতাদি কোনই ভেদ নাই।

তবে ঠাকুরের ঐ অনুভূতিটি তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী মূল তত্ত্বের অনুভূতি বলা যায়, কারণ তন্ত্রই বলিয়া থাকেন যে, চরম তত্ত্ব বা জগদম্বা একই কালে সগুণ

ও নির্গুণ উভয়রূপিণী হইয়াও অদ্বিতীয়া। ঐ উভয়রূপই তুল্যরূপে সত্য। শাংকর বেদান্তমতে একই কালে শিবের বা জগদম্বার সগুণ বা সক্রিয়রূপ এবং নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়রূপ স্বীকৃত হয় না এবং জগদম্বার সক্রিয়রূপ সংসারকেও সত্য বলিয়া মানা হয় না। তন্ত্রের ব্রহ্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। বেদান্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রহ্ম তন্ত্রমতে নাই। সুতরাং লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে ঠাকুর শক্তি-বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদী বা শাক্তাদ্বৈতবাদী। অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে তিনি ঐ ভাবেই বুঝিয়াছেন।*

প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনিয়াছি যে, স্বামী প্রেমানন্দ বলিতেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী।' শুনিয়াছি স্বামী অভেদানন্দও কোন জিজ্ঞাসু ভক্তকে বলিয়াছিলেন—'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।' কথামৃতকার শ্রীম-ও যে এই মতই পোষণ করিতেন তাহাও পূর্বেই দেখান হইয়াছে।

স্বামীজী নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদই শিক্ষা দিয়াছেন। শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদেই সর্বধর্ম, সর্বমতবাদ সমন্বিত ইহাই স্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিমত এবং উহাই তিনি সর্বজগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন।

লীলাপ্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যে, শ্রীমৎ তোতাপুরী শক্তি মানিতেন না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সাধনায় বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও তাঁহার জ্ঞান অপূর্ণ ছিল এবং রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি গঙ্গায় দেহ-বিসর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের পর শক্তিতে বিশ্বাসী হন ও শক্তির সত্যত্ব মানেন এবং তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত হইলে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, ইত্যাদি।

কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে, শ্রীমৎ তোতা নির্বিকল্প সমাধিতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি তাহা হইলে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলব্ধ জ্ঞান হইতে ভিন্ন? শক্তির সত্যত্ব মানার পর তোতার জ্ঞানের পূর্ণতা স্বীকার করিলে অবশ্যই বলিতে হয় তাঁহার নির্বিকল্প সমাধিতে পূর্ণজ্ঞান লাভ পূর্বে হয় নাই।

নির্বিকল্প সমাধিতে তোতার হইয়াছিল সর্ব-ভেদবিরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ঠাকুরের হইল অদ্বিতীয় এক জগদম্বা বা ব্রহ্মের স্বগত ভেদ-বিশিষ্ট সগুণ ও নির্গুণ উভয়রূপী ব্রহ্মজ্ঞান। এই দুই অনুভবের পার্থক্য কেন?

জগদম্বার নির্গুণ ভাবটাকেই শংকরোক্ত ব্রহ্মবাদ বলিয়া ঐ গ্রন্থে বলা হইয়াছে এবং জগদম্বার জ্ঞানকেই চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া তোতার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে।

উত্তরে বলা যায় যে, তন্ত্রের সিদ্ধান্ত শাক্তাদ্বৈত-বাদের পরিপ্রেক্ষিতেই এই শঙ্কার সমাধান হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রমতে তোতার পূর্বে পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই; কারণ তিনি শক্তিও সত্য বলিয়া জানিতেন না। বেদান্তমতের ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা—ইহাই তিনি জানিতেন। অদ্বৈতমতে শক্তিও মিথ্যা—ইহা ঠাকুরও বলিয়াছেন। ধ্যানে চিরাভ্যস্ত কালীমূর্তি, জ্ঞান-অসিদ্বারা খণ্ডন করিয়া ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধিস্থ হইয়াছিলেন—ইহাও

* 'লীলাপ্রসঙ্গে' স্বামী সারদানন্দ বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'অদ্বৈতভাব শেষ কথা', 'সেখানে সব শিয়ালের এক রা', 'অদ্বৈতবিজ্ঞান চরম' ইত্যাদি। অধিকন্তু, 'অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ়' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উপলব্ধির কথা স্বামী সারদানন্দ এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: 'তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য।' সুতরাং স্বামী সারদানন্দের মতে 'শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্তাদ্বৈতবাদী'—এই সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় না।—সম্পাদক

শক্তির মিথ্যাত্বই প্রমাণ করিয়া থাকে। সুতরাং শাক্তাদ্বৈতবাদকেই চরম সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তোতার বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গে ঐরূপ বলা হইয়াছে বলিলে বোধ হয় কোন দোষ হইবে না। কারণ অনন্ত-ভাবময় ঠাকুরকে স্ব স্ব ভাবানুসারে এক একজন এক একরূপ বুঝিয়াছেন। লীলাপ্রসঙ্গকার ঠাকুরকে শাক্তাদ্বৈতবাদীরূপেই জানিয়াছেন। তন্ত্রকেই প্রধান বলিয়া মানিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা ছাড়া আর কোন উপায়েই সমন্বয় দেখান যায় না।

শাক্তাদ্বৈতবাদই যদি অদ্বৈতবিষয়ে ঠাকুরের একমাত্র মতবাদ হইত তবে উহা স্বামীজীকে শিখাইবার জন্য ঠাকুরের অত সতর্ক হইবার প্রয়োজন ছিল না। অন্য কেহ আশেপাশে আছে কিনা তাহা দেখিয়া তারপর ঠাকুর উহা স্বামীজীকে শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন না। শাক্তাদ্বৈতবাদ তিনি সর্বজনসমক্ষেই প্রচার করিয়াছেন। কারণ ঐ বিষয়ক কথা কথামৃত-গ্রন্থে অজস্র রহিয়াছে, যাহা তিনি গৃহস্থদের সম্মুখেও নির্বিচারে অকাতরে পরিবেশন করিয়াছেন। সকলের জন্যই উহা বলিয়াছেন। কারণ ঐমতে জগৎকে মিথ্যা বলিতে হয় না। জগৎমিথ্যাত্বের কথা উঠিলে, কথামৃতে দেখিতে পাই, ঠাকুর উহা বেদান্তবাদীদের কথা, দূরের কথা, বলিয়া চাপা দিয়া অন্য কথা তুলিয়াছেন। কারণ গৃহস্থ ও সাধারণ অধিকারীদের নিকট ঠাকুর উহা বলিতে চাহেন নাই। এই জন্যই অতি সংগোপনে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'— এই তত্ত্ব একমাত্র স্বামীজীকেই শিখাইয়াছেন।

"এক ব্যক্তি তাঁকে (ঠাকুরকে) বলেছিলেন, 'আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।' তিনি বল্লেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এইটি ধারণা কর; ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।"

সুতরাং কেবল শাক্তাদ্বৈতবাদই ঠাকুরের মত নহে। জগন্মিথ্যাত্ব ও ব্রহ্মসত্যত্বের কথাও ঠাকুর বলিয়াছেন ও উহাও তাঁহারই অনুমোদিত এবং অনুভূত তত্ত্ব বলিয়াই উহা তিনি স্বামীজীকে শিখাইয়াছেন, কারণ স্বামীজীর কণ্ঠে বসিয়াই ঐ সত্য তিনি জগতে প্রচার করিবেন এবং বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদেই যে পরংপরাক্রমে সর্বধর্ম ও সর্বমতবাদ সমন্বিত বা পর্যবসিত, এই অভিনব তত্ত্ব জগৎ-কল্যাণার্থ প্রকট করিবেন। স্বামীজীও ইহা স্বীকার করিয়াছেন—'বাণী তুমি, বীণাপাণি কণ্ঠে মোর। তরঙ্গে তোমার ভেসে যায় নরনারী॥'

পুনঃ অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বলা যায়, শ্রীমৎ তোতার বেদান্তোক্ত পূর্ণ জ্ঞানই নির্বিকল্প সমাধিতে লাভ হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার শক্তি সত্য মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অসুস্থ হইয়া দেহত্যাগ করিতে চাহিলেও বা দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার জ্ঞানের কিছু কমতি ছিল না বা হইত না। কারণ অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তমতে—

'যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি।
যোগিনস্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিবাম্বরে॥
তীর্থে চান্ত্যজগেহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্।
সমকালে তনুং মুক্তঃ কৈবল্যপ্রাপকো ভবেৎ॥'

(অবঃ গীতা, ১।৬৮, ৬৯)

'তীর্থে বান্ত্যজগেহে বা যত্র কুত্র মৃতোঽপি বা।
ন যোগী পশ্যতি গর্ভং পরে ব্রহ্মণি লীয়তে॥'

(ঐ ২।২৯)

আরও বলা যাইতে পারে যে, তিনি দেহত্যাগ স্বেচ্ছায় করিতে না পারিয়া বুঝিলেন যে, এসব মিথ্যা মায়ার খেলা। জলে স্থলে সর্বত্র এক মায়িক রচনা। গঙ্গায় চড়া পড়াতে বেশী জল না পাইয়া অন্ধকারে ভাবিলেন যে, গঙ্গায় পর্যাপ্ত জলও নাই, এও মায়ারই এক লীলা। 'মায়ায়াং সর্বসম্ভবঃ।' তিনি মায়াকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা সাধন করিলেন— এ সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া বেদান্তবাদীরা মনে করিতে পারেন।

পুনঃ অদ্বৈতবেদান্তমতে শ্রীমৎ তোতার দেহ-ত্যাগ-সংকল্প এবং তজ্জন্য গঙ্গায় যাওয়া ও ফিরিয়া আসা—এ সব কিছুই দোষাবহ নহে। কারণ এ সবই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মিথ্যা দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার। আত্মার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াতীত, অদ্বিতীয়, স্বগতাদি সর্বভেদরহিত শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ—এই বোধই বেদান্তোক্ত নির্বিকল্প সমাধিতে হইয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর সাধনার পর তোতাপুরীর ঐ সমাধি হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে তোতার বেদান্তোক্ত পূর্ণ জ্ঞানই হইয়াছিল, বলিতে হইবে। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে তাঁহার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না; একমাত্র শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শাক্তাদ্বৈতবাদ মতেই তাহা অসম্পূর্ণ বলা যায়। কারণ ঐ মতে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ভাব মিলিত এক অদ্বৈত স্বীকার করা হয়। তোতাপুরীর নির্গুণ-ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল কিন্তু তুল্যরূপে জগদম্বার সগুণভাবটিও সত্য ইহা তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। কারণ অদ্বৈতবেদান্তমতে সগুণভাব ঔপাধিক, মিথ্যা। এ জন্যই তন্ত্রমতানুসারে তোতার ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে এবং যখন ঠাকুরের সঙ্গগুণে বা ঈশ্বরেচ্ছায় তোতা জগদম্বার সগুণভাবকে সত্য বলিয়া মানিলেন বা অনুভব করিলেন তখন তাঁহার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল, এরূপ বলা হইল।

এইরূপে দেখা যায় লীলাপ্রসঙ্গে শাক্তাদ্বৈত-বাদই অদ্বৈতবিষয়ে ঠাকুরের মত বলিয়া প্রতি-পাদিত হইয়াছে। ইহা দোষাবহ নহে। কারণ অনন্তভাবময় ঠাকুরকে লীলাপ্রসঙ্গকার ঐ ভাবেই দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। তিনিও ঠাকুরের ভাবের কোন ইতি করেন নাই।

শাক্তাদ্বৈতবাদের কথাই ঠাকুর সকলকে বিশেষ করিয়া অধিকাংশ সময় বলিয়াছেন; তাহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, ঠাকুর জানিয়াছিলেন যে, জগৎকারণকে মাতৃভাবে উপাসনাই আধুনিক যুগের বিকৃত কামকলুষিতচিত্ত জনসাধারণের মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বা পন্থা।

ঠাকুর স্বামীজীকে অষ্টাবক্রসংহিতার যে অদ্বৈতবাদ শিখাইয়াছেন তাহা তন্ত্রোক্ত স্বগত-ভেদবিশিষ্ট সগুণ-নির্গুণ উভয়াত্মক এক অদ্বিতীয় জগদম্বার তত্ত্ব নহে। অষ্টাবক্রসংহিতায় বেদান্তের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। স্বামীজীও উহাই শিখিয়া ও অনুভব করিয়া উহাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষণা ও প্রচার করিয়াছেন এবং সোপানারোহণন্যায়-ক্রমে সর্বধর্মমতের উহাই সর্বশেষ পরিণতি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাক্তাদ্বৈতবাদও সর্বগ্রাসী শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদে বিলীন হইবার পথে শেষ ধাপ বা সোপানমাত্র।

তোতাপুরীর ব্যাধি, অসহনীয় দেহযন্ত্রণা ও তাঁহার দেহত্যাগের সংকল্প—এসব তাঁহার জ্ঞানের অপূর্ণতার জ্ঞাপক নহে। হৃদয়রামের ব্যবহারে ঠাকুরও ব্যাকুল হইয়া গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করিতে গিয়াছিলেন। উহা কি ঠাকুরের জ্ঞানের অপূর্ণতার বোধক? ঠাকুর বলিয়াছিলেন—'মা গেল, বাপ গেল, ভাই গেল, শেষটায় কিনা মা হৃদয়ের হাতে এত যন্ত্রণা দিচ্ছিস?' সে যন্ত্রণা তোতাপুরীর পেটের যন্ত্রণার মতই ঠাকুরের অসহনীয় বোধ হইয়াছিল।

তত্ত্বজ্ঞানীর ব্যবহার তাঁহার প্রারব্ধদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। জ্ঞানসমকালেই তিনি মুক্ত হইয়া যান। তাঁহার দেহেন্দ্রিয় প্রারব্ধবশে বিচিত্র ব্যবহার করিতে থাকে, কিন্তু তিনি ঐ সকলে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন।

'যোগিনো ভোগিনো বাপি ত্যাগিনো
রাগিণোঽপি বা।
জ্ঞানান্মোক্ষো ন সন্দেহ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥'

—ব্যবহারে জ্ঞানী যোগী, ভোগী, ত্যাগী বা রাগী মনে হইলেও তিনি এসব কিছুই নন। তিনি

জানেন, 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ।' জ্ঞানকালেই তাঁহার মোক্ষ অবধারিত হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না।

'মুক্তস্য ব্যবহারস্তু ভ্রান্তিবাসনয়া কৃতঃ।
ভ্রান্তিনাশেঽপি সংস্কারানুবৃত্তির্দৃশ্যতে খলু॥'
(বৃহঃ বাঃ সার)

—দেহাত্মবুদ্ধিবিরহিত জীবন্মুক্তের ব্যবহার অভ্যাসবশতঃ পূর্বভ্রান্তির সংস্কার দ্বারা হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার সংস্কারের অনুবৃত্তি দেখা যায়। উহা ভর্জিত বীজের ন্যায়। উহা দ্বারা কোন ব্যসন উৎপন্ন হয় না, কেবল প্রারব্ধভোগমাত্রই সম্পাদিত হয়।

জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারও নানাপ্রকার:

'রাগী কশ্চিৎ বিরক্তোঽন্যঃ
ক্রুদ্ধোঽন্যঃ শান্তিমান্ পরঃ।
প্রারব্ধভোগনানাত্বাৎ
কথং লক্ষ্ম নিরম্যতে॥'
(বৃহঃ বাঃ সার)

—প্রারব্ধবৈচিত্র্যবশতঃ কোন জ্ঞানী রাগী, কেহ বিরক্ত, কেহ ক্রোধপরায়ণ, কেহ বা শান্তিমানরূপে প্রতীয়মান হন। জ্ঞানীর লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না।

তবে ব্রহ্মবিৎ কি প্রকার?

'ব্রহ্ম যাদৃক্ তাদৃগেব ভবেৎ বিদ্বান্নিবোধতঃ।
বোধোঽতঃ লক্ষণং,তস্য বোধশ্চ স্বাত্মসাক্ষিকঃ॥'
(বৃহঃ বাঃ সার)

— চিদ্রূপ ব্রহ্ম যে প্রকার, জ্ঞানপ্রভাবে বিদ্বানও সেই প্রকারই চিদ্রূপ হইয়া থাকেন। অতএব সম্যগ্‌জ্ঞানই অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবে সংস্থিতিই বিদ্বানের একমাত্র লক্ষণ। আর ঐ জ্ঞান সদা সাক্ষিবেদ্য অর্থাৎ স্বসংবেদ্য।

প্রারব্ধবশতঃ জ্ঞানীর রাগাদিই বা হইবে কেন, তদুত্তরে আচার্য বলিতেছেন:

'ব্রহ্মাত্মবোধমাত্রেণ শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তিতঃ।
রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতে॥'
(বৃহঃ বাঃ সার)

—ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধদ্বারাই জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে। তাহাতেই জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ, এই শাস্ত্রার্থও সার্থক হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানানন্তর জ্ঞানীর প্রারব্ধবশতঃ আভাসরূপ (অর্থাৎ বাধিত) রাগাদির অনুবৃত্তি যদি হয় তো হউক, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না, অর্থাৎ উহা জ্ঞানের বাধক নহে।

জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও কোন নিয়ম নাই:

'নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্ণো বা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্বথা॥'
(পঞ্চদশী)

—ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, মূর্চ্ছাবস্থায়, নীরোগ শরীরে, আসনে উপবিষ্ট হইয়া বা ভূলুণ্ঠিত হইয়া, যে ভাবেই তত্ত্বজ্ঞানীর মৃত্যু হউক না কেন, তাঁহার আত্মজ্ঞানের অভাব হয় না বা মুক্তির কোন বাধা হয় না, কারণ তৎকালেও তাঁহার 'আমি ব্রহ্ম'— এই জ্ঞানটি অন্তরে সুপ্তরূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে থাকে। এইজন্য তখনও তিনি মুক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সর্বভাবের মূর্তবিগ্রহস্বরূপ। সর্বভাব ও সর্বধর্ম নিজ জীবনে সাধন করিয়া, সর্বপথই অন্তিমে এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুভূতিতেই পর্যবসিত হয়—ইহাই তিনি স্বামীজীর কণ্ঠে বসিয়া সকলকে শুনাইয়াছেন। অতএব শুদ্ধব্রহ্মাদ্বৈতবাদ বিষয়ে তাঁহার অনুভূতি ও মত জানিতে হইলে তাহা আমাদের স্বামীজীর মুখে শুনিতে হইবে। শাক্তাদ্বৈতবাদ বিষয়ে ঠাকুরের বাণী ও অনুভূতি তদীয় প্রিয় শিষ্য স্বামী সারদানন্দের লেখনীমুখে 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। অপরাপর সকলেও আপন আপন ভাবনা ও সংস্কারানুযায়ী ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিপূর্ণ বিগ্রহ রূপেই দর্শন করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। সর্বত্রই 'The Master as I saw Him'—প্রভুকে যিনি যেমন

দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপেই তাঁহাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

এইজন্যই ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন—

বৈদান্তিকদের পরমহংস, ভক্তদের অবতার, তান্ত্রিকদের কৌলশ্রেষ্ঠ, নবরসিকদের রসিকচূড়ামণি, বাউলের সাঁই, বৈষ্ণবদের গোঁসাই, কর্তাভজাদের আলেখ, শিখদের গুরু নানক, মুসলমানদের পয়গম্বর, খ্রীষ্টানদের যীশু ও ব্রাহ্মদের ব্রহ্মজ্ঞানী।*

* উদ্বোধন ১৩৬৯, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় বর্তমান লেখকের 'স্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ'-শীর্ষক প্রবন্ধটির পরিপূরক এই বর্তমান প্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে 'শাক্তাদ্বৈতবাদ' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উহা পাঠ করিবার পর এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে পাঠকবর্গের সুবিধা হইবে।—লেখক

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মের সপ্তবিধ গুণ

আমরা পূর্বে দেখেছি (উদ্বোধন, চৈত্র ১৩৮৬, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য) যে, বলদেবের মতে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ হ'ল এই যে, তিনি নিঃসীম নিরতিশয় উৎকৃষ্টতম গুণাবলীর একটি অপূর্ব মনোরম সমাহার। অর্থাৎ, qualitatively এবং quantitatively, উভয় দিক থেকেই তিনি সমান অনতিক্রমণীয়—যেহেতু, পরিমাণের (quantity-র) দিক থেকে তাঁর অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক গুণ আর কারোই নেই; এবং সমভাবে, প্রকৃতির (quality-র) দিক থেকেও তাঁর অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর গুণও আরো কারোই নেই (গোবিন্দ-১।১।২)।

কিন্তু সীমিত আমাদের বোধশক্তি—স্বভাবগত-ভাবেই আমরা পার্থিব জীবেরা সর্বদিক থেকেই সঙ্কীর্ণ সসীম গণ্ডিবদ্ধ। দেহের দিক থেকে আমাদের সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয় অতি ক্ষুদ্র-শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর। মনের দিক থেকেও একই ভাবে আমাদের সাহায্য নিতে হয় তুলনায় ব্যাপকতর হলেও, প্রকৃতকল্পে তুল্য সীমাবদ্ধ বুদ্ধি-বৃত্তির। সেজন্য, সর্বদিক থেকেই সসীম আমরা কোনো দিক থেকেই কোনো ক্রমেই অসীমের ধারণা মাত্র করতে পারি না ব'লে আমাদের কল্যাণকামী জ্ঞানিগুণিজন, দার্শনিক ধর্মগুরুগণ সকল ক্ষেত্রেই সেই ভূমা মহান অসীম জনকে যে কোনো উপায়ে আমাদের সসীম দৃষ্টির সম্মুখে, কিছুটা সসীমভাবে, সঙ্কুচিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন, যাতে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে অন্ততঃ কিছুটা ধারণা করতে পারি, তাঁর সম্বন্ধে অন্ততঃ কিছুটা জানতে পারি।

বলদেবও এই শুভ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে ব্রহ্মের অসংখ্য কল্যাণগুণের মধ্য থেকে মাত্র সাতটিকে নির্বাচিত করে নিয়ে তাদেরই ব্রহ্মের প্রধান গুণ ব'লে আমাদের নিকট নির্দেশ করেছেন। (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৭-৯৯এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

সেগুলি হ'ল এই :

সর্বজ্ঞত্ব, আনন্দময়ত্ব, প্রভুত্ব, সৌহার্দ্য, জ্ঞান-দাতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ও সৌন্দর্য।

(প্রমেয়-রত্নাবলী পৃঃ ৩২-৩৬)।

এই গুণাবলীর সঙ্গে আমরা সাধারণ জনেরাও অল্পবিস্তর পরিচিত। যদিও সেই অনন্ত ভূমা মহানের দিক থেকে এদের আমরা কোনো দিনও চিন্তা করিনি স্বভাবতঃই, তাহলেও সাধারণ দিক থেকে হলেও, এগুলি সত্যই অনন্ত-অসীম পরব্রহ্মের সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমাদের মনে অনিবার্যভাবেই জন্মিয়ে দেয়। যথা—

(১) সর্বজ্ঞত্ব—এটি একটি অসাধারণ, অপার্থিব, অনুপম গুণ, যার দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা এ জগতে একেবারেই পাই না। কারণ, আমরা অবশ্য অনেক জ্ঞানিগুণিকেই তাঁদের জ্ঞানের জন্য, গুণের জন্য শ্রদ্ধা-সম্মান করি যথেষ্ট—কিন্তু তা সত্ত্বেও কাউকেই ত সর্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সর্বগুণসম্পন্ন ব'লে আমরা ভাবতেই পারি না। তাহলেও, এটিকে আমরা কোনোক্রমেই বাদও ত দিতেই পারি না, যতই না অবোধ্য হোক এটি। কারণ, যতই যাই বলা হোক না কেন, যতই অন্যান্য গুণ —যথা আনন্দময়ত্ব, রসস্বরূপত্ব, মাধুর্যমণ্ডিতত্ব, সৌন্দর্যবিলসিতত্ব নিয়ে আমরা উচ্ছ্বাস করি না কেন—প্রারম্ভেই 'জ্ঞান'কে ত দিতেই হবে তার যোগ্য মর্যাদা ; যেহেতু, জ্ঞানহীন মূর্খের আনন্দই বা কোথায়, আর রসই বা কোথায় !—সৌন্দর্যই বা কিরূপে, আর মাধুর্যই বা কিরূপে! সেজন্য জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলদেবও প্রধানতঃ ভক্তিবাদী হলেও আরম্ভ করেছেন এই 'জ্ঞান' দিয়েই অতি ন্যায্যভাবে।

'সর্বজ্ঞত্বে'র অর্থ হ'ল এই যে, পরব্রহ্ম একাধারে জ্ঞান ও জ্ঞাতা—অর্থাৎ জ্ঞান হ'ল তাঁর একাধারে স্বরূপ ও গুণ। নূতন কথা কিছুই নয়— যেহেতু রামানুজ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় প্রত্যেক ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকই এই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধদোষদুষ্ট তত্ত্বটিকে সাদরে গ্রহণ এবং সজোরে প্রচার করেছেন সর্বমনপ্রাণ দিয়ে। কেন তাঁরা তা করেছেন, সে বিষয়ে পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে ব'লে তার পুনরাবৃত্তি এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

বলদেবও একই সুরতানলয়ে এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা রূপে সর্বদাই নিজেকে নিজেই জানছেন পরিপূর্ণভাবে ; এবং বলাই বাহুল্য যে, তিনি স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী ব'লে তিনি যে মুহূর্তে নিজেকে জানছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি সকলকেই সব কিছুকেই সমভাবেই জানছেন। সেজন্য, তাঁর 'আত্মজ্ঞান'ই তাঁর 'সর্বজ্ঞান'।

আপত্তি

কি সুন্দর কথা, কি গৌরবের কথা, কি আনন্দের কথা ! অনন্ত-অচিন্ত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞানের মধ্যে আমরাও রয়েছি কেন্দ্রীভূত প্রধান স্থান অধিকার ক'রে ; তিনি নিজেকে যেমন জানছেন, ঠিক তেমনি করেই, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধা ও আনন্দ-সহকারেই আমাদেরও জানছেন একই সঙ্গে, জ্ঞানিগুণিমুখ থেকে এ কথা জেনে আমরাও হলাম পরম চমৎকৃত, পরম পুলকিত, পরম গৌরবান্বিত। খুব ভাল কথা! কিন্তু হায়, দর্শনের শাণিত যুক্তির ঝলকে, খুব ভালোও ত হয়ে যায় খুব মুশকিলের! এস্থলেও কি ঠিক তা-ই হয়ে দাঁড়াল না ? নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী-ভাবেই। কারণ, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর যদি এইভাবে সব কিছুই জেনে রাখেন আদ্যন্তকাল, তাহলে তোমার দশা হ'ল কি ? তুমি ত হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই একটি স্বাধীনেচ্ছাবিহীন জড়যন্ত্রই মাত্র অনিবার্যভাবেই। কারণ, তোমার জীবনের প্রত্যেকটি জিনিসই ত সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর জেনে নিয়েছেন, জেনে রেখে দিয়েছেন প্রথম থেকেই—

তার ত আর কোনোরূপ পরিবর্তন সম্ভবপরই নয়। সেজন্য, শ্রীভগবান যা অনাদি-অনন্তকাল থেকে স্থির ক'রে রেখেছেন তোমার জন্য, তোমাকে ত সারাজীবন ধরে সেই পূর্বনির্দিষ্ট পথে চলতেই হবে; সেই পূর্বনির্ধারিত ধরা-বাঁধা ছকে ঘুরে বেড়াতেই হবে। তাহলে কোথায় রইল তোমার, জ্ঞানবুদ্ধি-চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জনের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্মের গর্ব ও গৌরব? তাহলে ত তুমি হয়ে দাঁড়ালে পুতুলনাচের সুতোয় বাঁধা, সেই সুতোর বিভিন্ন সঞ্চালনের দ্বারা লম্ফঝম্পকারী একটি নগণ্য পুতুলই মাত্র—অবশ্যম্ভাবীভাবেই।

বস্তুতঃ, এ হ'ল দর্শন-ধর্ম-শাস্ত্রের একটি অতি কঠিন, এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসমাধেয় সমস্যা—যাকে পাশ্চাত্য দর্শনে বলা হয়—Doctrine of Free will and Determinism or Prescience; অর্থাৎ, সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান পরব্রহ্ম যদি আদ্যন্তকাল সব কিছুই জেনে রেখেছেন, সব কিছুই স্থির ক'রে রেখেছেন, তাহলে নিরুপায়, পরচালিত ক্ষুদ্র জীবের আর রইল কি অবশিষ্ট জীবনে? রইল না তার জ্ঞান, রইল না তার কর্ম, এককথায়, রইল না তার কণামাত্রও স্বাধীনতা কোনো বিষয়েই। তাহলে? তাহলে ত জীবের যে স্বাতন্ত্র্য, যে বৈশিষ্ট্য, যে ব্যক্তিত্ব (Individuality) নিয়ে অদ্বৈতবৈদান্তিকদের সঙ্গে এরূপ বিবাদ-বিসংবাদ—দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকদের, তা ত সবই হয়ে গেল মিথ্যা মায়াই মাত্র; এবং অদ্বৈতবাদই হয়ে গেল সুপ্রতিষ্ঠিত, হরেদরে।

আমাদের মনে হয় যে, এই সকল ত্রিতত্ত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্বই দেননি, যেমন দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্য ধর্ম-দর্শনে। তাঁরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনাও করেননি, বিপক্ষ-পক্ষকে পরাজিত করবার জন্য বিবিধ বিচিত্র যুক্তিজালও প্রসারিত করেননি—অতি কষ্টে অদ্বৈতবেদান্ত-সম্মত 'সাক্ষীচৈতন্যে'র কথা সামান্য মাত্র ব'লেই অধিকাংশ স্থলেই ছেড়ে দিয়েছেন অকাতরে বেচারা জীবকে ব্রহ্মের সেই সুবিস্তৃত, কঠিন-ভাবে নিয়ন্ত্রিত, কঠোর হস্তে পরিচালিত 'তাসের দেশে'র মধ্যে, বন্দীশালার মধ্যে, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে, যেখানে সেই নির্মম শাসক সম্পূর্ণ পরাধীন জীবকে 'তাসের দেশে'র প্রাণহীন তাসের মত, বন্দীশালার শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসের মত, প্রেক্ষাগৃহের নির্জীব পুতুলের মত নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন শিশুর হাতের ক্রীড়নকের মত, বঁড়শীতে বদ্ধ মৎস্যের মত। কিন্তু হায়—তাহলে কোথায় বা তার সাধন-ভজন, কোথায় বা তার মুক্তির প্রচেষ্টা, কোথায় বা তার 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' (গীতা ৬।৫) 'নিজেই নিজেকে উদ্ধার কর'—স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত এই আশ্বাসবাণীর সার্থকতা জীবনে?

পাশ্চাত্য-দর্শনে জীবের স্বাধীনেচ্ছা এবং পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বের মধ্যে আপাত-দৃষ্ট বিরোধ অতি কষ্টে মেটাবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে 'Indeterminism' এবং 'Pre-determinism'-এর মধ্যে 'Golden Mean'রূপে অর্থাৎ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরম মতবাদের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী নরম পন্থা-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে 'Self-determinism'-কে অনেক কৌশল ক'রে, অনেক মাথা ঘামিয়ে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে। একদিকে একেবারেই নিয়মবিহীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্দামতা। অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপেই নিয়মাবলীর নাগপাশবদ্ধ পরাধীন জীবের বৃথা 'গণ্ডূষজল-মাত্রেণ সফরী ফর্‌ফরায়তে'—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সফরী (পুঁটী) মাছটির মতই অতি স্বল্প জলে ফর্‌ফর

ক'রে বেড়ান। এই দুটি চরম মতবাদের মধ্যে স্থাপিত হ'ল মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়মূলক সুবর্ণ মতবাদ—'আত্মনিয়ন্ত্রণ'। শ্রীভগবান বাইরে থেকে জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন না, করেন কেবল ভেতর থেকেই জীবের অন্তরস্থ 'আত্মা' রূপে। কিন্তু আমরা বলব—তাতেই বা কি? সেই অন্তরস্থ আত্মা ত জীবের নিজস্ব স্বাধীন আত্মা একেবারেই নয়; তা শ্রীভগবানেরই আত্মা। তাহলে আর শেষরক্ষা হ'ল কিরূপে? তথাকথিত 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' হয়ে দাঁড়াল 'ঈশ্বরনিয়ন্ত্রণ' শেষ পর্যন্ত।

পুনরায় যদি বলা হয় যে, পরমলীলাময় শ্রীভগবান তাঁর লীলাসঙ্গী জীবকে 'যেন' স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে লীলা বা খেলা করবার ইচ্ছায়, কারণ জড় পুতুলের সঙ্গে ত খেলা হয় না, তাহলেও সেক্ষেত্রেও 'যেন' কথাটিকে রাখতেই হয়; 'যেন' স্বাধীনতা দিয়েছেন—এই ব'লে। বস্তুতঃ 'প্রকৃত' স্বাধীনতা জীবকে দিতে স্বয়ং ঈশ্বরও ত পারেন না—যেহেতু তিনিও ত স্বয়ং স্বীয় স্বরূপের বিরুদ্ধে যেতে পারেন না মুহূর্তের জন্যও, যতই সর্বশক্তিমান তিনি হোন না কেন। সুতরাং তাঁর স্বীয় শাশ্বত স্বরূপই যখন সর্বব্যাপিত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্ব—তখন আর উপায় কি? কারণ, তিনি চান বা না'ই চান, তাঁকে পূর্ব থেকেই প্রত্যেক জীবের তথাকথিত ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেক কর্মের কথাই জানতে হবেই হবে; এবং তা হবে সম্পূর্ণরূপেই জীবের পরাধীনত্ববাদ—তার সাধের 'কর্মবাদ', 'জন্ম-জন্মান্তরবাদ', 'মোক্ষবাদ' প্রায় সবই ত গেল চলে এই একটিমাত্র আঘাতেই। ত্রিতত্ত্ববাদী, ভেদাভেদবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বৈদান্তিকদের এই দুর্গতির উদয় হয় প্রারম্ভেই; এবং যা তাঁদের সর্বত্রই রক্ষা করেছে এতদিন, তা-ই ত হয়ে যায় দুর্বল অনিবার্যভাবেই, অর্থাৎ তাঁদের সেই প্রখ্যাত 'Doctrine of Individualism' বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ'। অতি সুন্দর তত্ত্ব এটি কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপেই অর্থহীন, অবাস্তব, অসম্ভব। [ক্রমশঃ]

বেথানীর ভক্তপরিবার

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

[এক]

বৃহদারণ্যক-উপনিষদের প্রায় সর্বত্রই আখ্যায়িকার অবতারণা করে আলোচনার সূত্রে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ এর এক সুপরিচিত কাহিনী। উপনিষদে এটি দুবার কথিত হয়েছে—দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ আর চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ দুটিই মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত। দুটি ব্রাহ্মণের বিষয়বস্তু একই, অল্প কিছু পার্থক্যের কথা বাদ দিলে ভাষাও প্রায় অভিন্ন।

কাহিনী এই—যাজ্ঞবল্ক্য-মুনির দুই ভার্যা—মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নী। 'তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়নী' (৪।৫।১)—তাঁদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী আর কাত্যায়নী 'নারীজনোচিত সাংসারিক মতিসম্পন্না'।—আত্মস্বরূপতার দিক থেকে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ না থাকলেও শ্রুতি এখানে লোকায়ত ভাবনারই পরিচয় দিয়েছেন।

সন্ন্যাস ব্রহ্মবিদ্যার বিশিষ্ট অঙ্গ—আচার্য শংকর

প্রমুখ অনেকেই সন্ন্যাসকে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পক্ষে অপরিহার্য বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য গার্হস্থ্য আশ্রমের শেষে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করতে সংকল্প করে মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, 'অয়ি মৈত্রেয়ী! আমি এই আশ্রম থেকে পরিব্রজ্যা করে উচ্চতর আশ্রমে যেতে উদ্যত। তোমার অনুমতি চাই। তুমি সম্মত হলে (তোমাদের মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করে দিয়ে) এই কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধের অবসান করে দেব।'

বিবাহিত পুরুষের পক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণের আগে পত্নীর অনুমতি নেওয়াই বিধেয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের প্রস্তাব শুনে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন, 'ভগবন্! এই বিত্তপরিপূরিত সমগ্র বসুন্ধরা যদি আমারই বা হয়, তাহলে কি আমি অমৃতা হব?'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না। যাদের ভোগের অনেক উপকরণ আছে তাদের যেমন জীবন, তোমার জীবনও তেমনই হবে। বিত্ত দিয়ে অমৃতত্বের আশা নেই।'

মৈত্রেয়ী তখন বললেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্—যা দিয়ে আমি অমৃতা হব না তা দিয়ে আমি কী করব! প্রভু, আপনি (অমৃতত্বের সাধন) যা জানেন, তাই-ই কেবল আমাকে বলুন।'

যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'অয়ি! তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে। প্রিয় কথাই বলছ। এসো, বসো, তোমার কাছে (অমৃতত্বের সাধন) ব্যাখ্যা করব। যখন আমি ব্যাখ্যা করব তখন কিন্তু তুমি (তার তাৎপর্য) নিদিধ্যাসন করবে।'

এর পর দুটি অধ্যায়ের দুটি ব্রাহ্মণেই সহজ সরল ভাষায় দুরবগাহ ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন।

কাত্যায়নী-মৈত্রেয়ীর প্রসঙ্গে মনে আসে মার্থা-মেরী দুই সহোদরার কথা—যীশুর একান্ত অনুরাগী এক ভক্তপরিবারের মেয়ে তাঁরা। জেরুজালেম থেকে মাইল দুই দূরে বেথানী গ্রামে তাঁদের নিবাস। তাঁদের বাবার নাম সাইমন—কুষ্ঠী সাইমন বলে মার্ক যাঁর উল্লেখ করেছেন [১৪।৩]। যীশু কি করুণা করে দিব্য বিভূতি প্রয়োগ করে তাঁকে নিরাময় করেছিলেন, অথচ তাঁর 'কুষ্ঠী' বিশেষণটি থেকে গেছে? কৃপার এই লোকাতীত নিদর্শন কি যীশুর প্রতি তাঁর পরিবারের ভক্তির কারণ! অবশ্য সন্ত-চতুষ্টয়-বর্ণিত দিব্যকথায় এই পরিবারের যে বর্ণনা আছে তাতে, নিছক কৃতজ্ঞতার নিদর্শন নয়, একান্ত নির্ভর আর অকুণ্ঠ অনুরাগের পরিচয় সেখানে ফুটে উঠেছে। যীশু-কথায় সাইমনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় না, পুত্র ল্যাজারাস আর দুই দুহিতারই বার কয়েক দেখা পাই।

পরিবারের আর কারও উল্লেখ নেই। সাইমন কি বিপত্নীক? বড়ো মেয়ে মার্থাই গৃহস্থালি দেখেন—তিনি বয়স্থা কুমারী হতে পারেন, তবে তাঁকে পিতৃগৃহবাসিনী বিধবা বলেই মনে হয়, মেরী কৈশোরোত্তীর্ণা—মনে হয় কুমারী। ল্যাজারাস বিবাহিত কি না জানা যায় না।

সেণ্ট লুক বর্ণিত দিব্যকথায় মার্থা-মেরীর প্রসঙ্গটি [১০।৩৮-৪২] ছোট্ট, কিন্তু উপাদেয়। ত্যাগমূর্তি প্রেমময় যীশু গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভজনালয়ে বা ভক্তগৃহে ভাগবতী কথা শোনাতেন। অনুরাগী ভক্তের গৃহে গেলে সেখানে তো বিশেষ উৎসব—শ্রীরামকৃষ্ণসমাগমে ভক্তগৃহে যেভাবে আনন্দের জোয়ার আসত ঠিক সেইভাবেই। মার্থাকেই সব সামলাতে হয়—সংসারের ভার তিনিই যে নিয়েছেন। অনুজা মেরীর কিন্তু কাজের দিকে মন নেই, তিনি প্রভুর পদপ্রান্তে বসে আছেন, একমুখে শুনছেন শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃত-কথা। গৃহস্থালির দায়দায়িত্বের কথা মনেই নেই।

কেন জানি না, এই সঙ্গে মনে পড়ে যায় গোলাপ-মার কথা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে যাঁকে

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে [৩।১৯।১]। শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দ বসুর অট্টালিকা থেকে তাঁর বাড়িতে এসেছেন। বিত্তহীনা বিধবা দুই সহোদরার সামান্য নিবাস—শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে ছাদে বসেছেন। তিনি যেখানে সেখানেই তো 'আনন্দের হাটবাজার' বসে যায়। শোকাতুরা ব্রাহ্মণী আনন্দে অধীর। বলছেন, 'ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো!—তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে করে—আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল,—তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি গো!—ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই!…যাই,—সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!—যাই,—যোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!'

শোকাতুরা ব্রাহ্মণী আনন্দে বিভোরা। কিন্তু ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা তো করতে হবে। ছাদের উপরে তিনি ভক্তযোগে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গ করছেন, এমন সময় তাঁর সহোদরা এসে বলছেন, 'দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়ায়ে থাক্‌লে কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি!'

ভক্তসেবার ব্যবস্থাপনায় ব্যতিব্যস্ত মার্থা কিন্তু মেরীকে কিছু বলেন নি। যীশু যে তাঁরও আপনার। তাঁর কাছেই আদুরে খুকীর মতো অনুযোগ করেছেন, 'তোমার এতটুকু হুঁস নেই ঠাকুর, আমার বোনটা আমাকে কাজে কর্মে একা ফেলে রেখে চলে এসেছে। তুমি বলে দাও না, খাবারদাবার দেওয়াথোওয়ায় আমার সঙ্গে হাত লাগাক!'

যীশু কিন্তু বললেন, 'মার্থা! মার্থা! তুমি অনেক কিছু নিয়ে ভেবে মরছ আর ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ। কিন্তু একটি জিনিসই সব কিছুর চেয়ে দরকারি। মেরী সেই সেরা জিনিসটিই বেছে নিয়েছে। সেটি তো আর তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না।'

যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ আর যীশু-কথার মূল ভাব একই। বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেও শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুপরিচিত উক্তি স্মরণ করলে কাহিনীদুটির তাৎপর্য অনুভব করা যাবে—'ঈশ্বরই বস্তু—আর সব অবস্তু' [১।১০।৬]।

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—বেদান্তকথিত এই তত্ত্বসার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নানা আকারে-প্রকারে স্বীকৃত; অবশ্য জীবই ব্রহ্ম কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর আছে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সব কিছুই ভাগবত প্রকাশ একথা বলা হলেও কোনো অধ্যাত্মসাধকই সংসারকে সার বলে গ্রহণ করবেন না। সংসারের সব কাজই মিছে কাজ—মায়ার খেলা বলে সংসার ত্যাগ করে লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়া সংগত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও অধ্যাত্ম-জীবনের তুলনায় সংসারের স্থান যে অনেক নিচে এ কথায় কট্টর বস্তুবাদী ছাড়া সবাই সায় দেবেন।

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে। ভাগবত জীবন যে শ্রেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যবহারিক জীবন কি নিন্দনীয় বা একেবারে মূল্যহীন? যে জীবনকে অবলম্বন করে মানুষের সমাজ, জাতি বা সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে মানবসত্যকেই অস্বীকার করা হয় না কি? তা ছাড়া ভাগবতী সাধনার জীবনেও বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য গার্হস্থ্য-নির্ভর সমাজজীবনের বিশিষ্ট ভূমিকা নেই কি? যীশু যে মার্থাকে সংসারের নানা কাজের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকার জন্য তিরস্কার করলেন, কিন্তু সব মার্থাই যদি মেরীর মতো চরম এককেই বেছে নেয়, তাহলে?

অবশ্য তা হয় না। 'স্ত্রীপ্রজ্ঞা' বলে কথা নয়—স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে একরকম সকলেই উপকরণে সমৃদ্ধ জীবন চায়। মেরী, মৈত্রেয়ী বা যাজ্ঞবল্ক্যের মতো সত্তা কোটিকে গোটিক মিলে। যাঁরা ভাগবত পুরুষ তাঁরা চরম সত্যের ইশারা দিতে আসেন। এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষ্ণদাস পালের [২।১৯।২] অথবা শম্ভু মল্লিকের [১।২।৯] লোকহিতের বাসনাকে তুচ্ছ বলেছিলেন। সব কিছুরই স্বগত মূল্য আছে, কিন্তু যাঁকে লাভ করলে অন্য লাভকে আর তার চেয়ে বেশি বলে মনে হয় না তাঁকে পাওয়াই তো চরম কথা। তাঁকে ভুলে আর সব চাওয়া তো সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া।

কাত্যায়নী কাহিনীর নেপথ্যেই থেকে গেছেন, তাঁর সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ বোধ আমাদের হয় না। কিন্তু মেরীর মতোই মার্থাও যে কৃপাধন্য তা বুঝতে আমাদের এতটুকু দেরি হয় না। তিনি প্রাণপ্রিয় প্রভুর সেবার জন্যই আয়োজন করছিলেন। মেরীকে তো সেই কাজে সহায়তা করতে বলার জন্যই প্রভুর কাছে অভিমানভরা মিনতি করেছেন। তিনি তো কর্তৃত্ব ফলিয়ে নিজেই মেরীকে ডেকে নেন নি! যীশুর কথাকটিও আদরে ভরা, আবেগে উচ্ছল—সোহাগীর নির্ভরে প্রাণময় সাড়া। তত্ত্বকথা নয়, উপদেশ নয়, নির্দেশ নয়—অনুযোগের জবাবে অনুযোগ, যেন অনন্য শরণের সঙ্গে অপার করুণার সেতুবন্ধ।

[দুই]

যীশু কুষ্ঠী সাইমনকে নিরাময় করেছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে বেথানীর ঐ ভক্ত-পরিবারকে কেন্দ্র করেই তাঁর দিব্য বিভূতি প্রকাশিত হয়েছে, যীশু-শিষ্য জনই কেবল তার পরিচয় দিয়েছেন [১১]।

ল্যাজারাস নিতান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মার্থা-মেরী দুই বোন ত্রস্ত হয়ে সম্পদে বিপদে চিরনির্ভর যীশুকে খবর দিয়েছেন ; বলে পাঠিয়েছেন, 'দেখ প্রভু, তুমি যাকে ভালবাস সে পীড়িত।'

যীশু কিন্তু তখনই এলেন না। বললেন, 'মৃত্যু এ অসুস্থতার পরিণাম নয়। ভাগবত মহিমা প্রকাশের জন্য এ অসুস্থতা—যাতে ঈশতনুজ মহিমান্বিত হন।' তিনি সেখানেই আরো দুদিন রয়ে গেলেন।

পরে কিন্তু তিনি বললেন, 'চলো, আবার জুডিয়ায় যাই।'

শিষ্যরা আপত্তি করলেন। জুডিয়ায় যে ইহুদীরা তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মারতে চাইছে! সেখানে যাওয়া সংগত হবে কি?

রহস্যময় এক সংকেতবাণীর অন্তে তিনি বললেন, 'আমাদের বন্ধু ল্যাজারাস ঘুমে ঢলে পড়েছে। আমি কিন্তু যাব, যাতে আমি তাকে জাগিয়ে তুলতে পারি।'

'প্রভু, সে যদি ঘুমিয়েই পড়ে থাকে, তাহলে তো সেরে উঠবে।'—রোগীর পক্ষে ঘুমোনোই ভালো, এই সাধারণ জ্ঞান থেকে শিষ্যরা বলেন। যীশু যে চিরনিদ্রার কথা বলছেন, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি

যীশু তখন খোলাখুলি বললেন, 'ল্যাজারাস মারা গেছে। আমি যে সেখানে ছিলাম না, তোমাদের মুখ চেয়ে এতে আমি খুশিই, কেননা, এর ফলে তোমরা বিশ্বাস অর্জন করবে। যাই হোক, চলো আমরা যাই সেখানে।'

যখন তিনি বেথানীতে এলেন, দেখলেন, ল্যাজারাসকে চারদিন হল সমাধি দেওয়া হয়েছে। পাড়াপড়শী-স্বজনবন্ধুদের অনেকেই এসেছেন মার্থা আর মেরীকে শোকের দিনে সান্ত্বনা দিতে।

মার্থা যখন শুনলেন, যীশু আসছেন, তিনি বেরিয়ে পড়ে তাঁর কাছে ছুটে গেলেন। মেরী তখনও বাড়িতে বসে রইলেন—তিনিও কেন যে

বার হলেন না তার ইঙ্গিত জন দেন নি। মার্থার তুলনায় ছেলেমানুষ বলেই কি তিনি শোকে এত কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে মার্থার মতো এগিয়ে গিয়ে যীশুর সঙ্গে মিলতে পারেন নি? অথবা তিনি তখনও শোনেন নি, যীশু এসেছেন?

মার্থা যীশুকে বললেন, 'প্রভু, তুমি যদি এখানে থাকতে, তাহলে ভাইটি আমার চলে যেত না। তবু জানি, ভগবানের কাছে তুমি যা চাইবে, তিনি তোমাকে তাই দেবেন।'

যীশু তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাই আবার উঠে পড়বে।'

'আমি জানি, শেষের দিনে পুনরুত্থানে সে আবার উঠবে।'

যীশু বললেন তাঁকে, 'আমিই পুনরুত্থান, জীবত্তাও। আমাতে যার বিশ্বাস তার মৃত্যু হলেও সে জীবন্তই থাকবে। যে আমাতে জীবন্ত থাকবে আমাতে বিশ্বাস রাখবে, সে মরবে না কোনোদিনই! বিশ্বাস কর একথা?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ প্রভু, হ্যাঁ! আমি বিশ্বাস করেছি তুমিই খ্রীষ্ট—সেই ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর সেই সত্তাই এই ভূলোকে যার অবতরণ হয়।'

এই বলে তিনি ফিরে গিয়ে মেরী বোনটিকে চুপি চুপি বললেন, 'প্রভু এসেছেন, ডাকছেন তোমাকে।'

শোনামাত্র মেরী উঠে পড়ে তাঁর কাছে ছুটে চললেন।

যীশু তখনও গ্রামে এসে পৌছন নি, যেখানে তাঁর সঙ্গে মার্থার দেখা হয়েছে সেইখানেই থেকে গেছেন।

যে সব প্রতিবেশি-পরিজন ইহুদী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, তারা যখন দেখল মেরী ত্বরায় উঠে পড়ে বেরিয়ে গেলেন, তারাও তাঁর পিছু পিছু গেল। তারা মনে করল, মেরী ল্যাজারাসের সমাধির কাছে গিয়ে কাঁদবার জন্য চলেছেন।

যীশুর কাছে এসে মেরী আকুল হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, 'প্রভু, তুমি যদি এখানে থাকতে তাহলে ভাইটি আমার চলে যেত না।'

মার্থা আর মেরীর আচরণে সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যীশু থাকলে যে ল্যাজারাস মারা যেত না বিশ্বাসিনী দুজনেই তা বলেছেন। মার্থা সেই সঙ্গে যেটুকু সংযোজন করেছেন তাতে প্রত্যাশার ছাপ আছে। যীশু ল্যাজারাসকে বাঁচিয়ে তুলুন—এই চাওয়াটি তাঁর কথায় উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু মেরী কিছুই চান নি, শুধু প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে আকুলতাটুকু নিবেদন করেছেন।

মেরী কাঁদছেন, সমব্যথী ইহুদীরাও চোখের জল ফেলছে। দেখে যীশুর বুকে যেন মোচড় দিয়ে উঠল। বললেন, 'তোমরা ওকে কোথায় রেখেছ?'

তাঁরা বললেন, 'প্রভু, আসুন দেখুন।'

যীশুও কাঁদছেন দেখে ইহুদীরা বলল, 'দেখো, ল্যাজারাসকে ইনি কত ভালোবাসতেন।'

ইহুদীদের কজন কিছু বলাবলি করতে লাগল, 'এই লোকটা তো একটা অন্ধের চোখ খুলে দিয়েছিল। এ কি এমন কিছু করতে পারত না যাতে ও মরত না।'

অবিশ্বাসীদের জল্পনায় যীশু মনে মনে গুমরে উঠলেন। সমাধির কাছে এসে বললেন, 'পাথরটা সরিয়ে দাও।'

একটা গুহায় ল্যাজারাসকে সমাহিত করে একটা পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

মার্থা বললেন, 'প্রভু, এতদিনে ও পচে গেছে। ও মারা গেছে সে তো চারদিন হয়ে গেল।'

যীশু বললেন তাঁকে, 'আমি কি বলি নি তোমায়, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, পরমেশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ করবে!'

তখন তাঁরা পাথরটা সরিয়ে নিলেন।

যীশু চোখ দুটি উপরের দিকে তুলে বললেন, 'পিতঃ! তুমি যে আমার কথা শুনছ এতে আমার কৃতার্থতা নিবেদন করি। আমি জানি, তুমি সব-সময় আমার ডাকে সাড়া দাও। তবু, এই যে জনসমষ্টি আমাকে ঘিরে রয়েছে তাদের জন্যই আমাকে এভাবে বলতে হল, যাতে তারা বিশ্বাস করতে পারে যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।'

তারপর তিনি হাঁক দিলেন, 'ল্যাজারাস, চলে এসো।'

যে মারা গিয়েছিল সে-ই চলে এল। হাত-পা তার সমাধিবস্ত্র দিয়ে বাঁধা, মুখটা একটুকরো কাপড় বেঁধে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সমবেত ইহুদীদের উদ্দেশ্য করে যীশু বললেন, 'বাঁধন খুলে দাও, ওকে চলে যেতে দাও।'

মেরীর সঙ্গে যেসব ইহুদী এসেছিল তাদের অনেকেই এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। কেউ কেউ আবার ফ্যারিসীদের কাছে ফলাও করে সব বলল, যাতে তারা এইসব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডের প্রতিবিধান করতে পারে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

যীশুর অলৌকিক শক্তির নিদর্শন দেওয়ার জন্য এ কাহিনীর অবতারণা নয়। অবতারপুরুষদের কথা বাদ দিলেও অনেক শক্তিমান সাধকের যোগ-বিভূতি প্রয়োগের অনেক কাহিনীই নানা সূত্রে জানা যায়। অবশ্য সাধনজীবনে যোগবিভূতি অর্জন অসামান্য নয়, চরম সিদ্ধি তো নয়ই, বরং পরমা প্রাপ্তির দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অষ্টসিদ্ধির একটি থাকলেও ভগবানকে পাওয়া যায় না। যীশু ঐশী শক্তি বা যোগবিভূতি যাই প্রয়োগ করুন না কেন, নিজের জন্য কখনো এতটুকু কিছু করেন নি; করলে ক্রসে তাঁকে প্রাণ উৎসর্জন করতে হত না। তিনি করুণায় বিগলিত হয়ে পরার্থে—পরার্থে এবং পরার্থেই লোকাতীত শক্তির বিনিয়োগ করেছেন।

একান্তভাবে শরণাগত ভক্তপরিবার ভাগবতী করুণাধারায় কীভাবে নিস্নাত হয় ল্যাজারাসের পুনরুত্থানের বৃত্তান্ত তারই পরিচয়। এই সঙ্গে দুএকটি প্রশ্ন মনে আসে। মার্থা-মেরী-ল্যাজারাসের পিতা কুষ্ঠী সাইমন সম্ভবতঃ যীশুর কৃপায় রোগমুক্ত হয়েছিলেন; সুতরাং তাঁরা যীশুর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে উপরন্ত ভক্তিডোরে আবদ্ধ ছিলেন। এই অভূতপূর্ব ঘটনায় তাঁরা যীশুর কাছে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করলেন না কি? মার্থা আর মেরীর প্রকৃতির কিছুটা পার্থক্য থাকলেও যীশুর উপর যে তাঁদের একান্ত নির্ভর তা অনুভব করা যায়। কিন্তু ল্যাজারাস? সাধন-সমাধি থেকে ব্যুত্থিত সাধক শাশ্বতী চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হন; মরণসমাধি থেকে উত্থিত সত্তা কি ভাস্বতী চেতনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে না! নচিকেতার মতো তমসার ওপার থেকে ফিরে এসে ল্যাজারাস কি আগের মতোই সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবেন!

আমেরিকার প্রখ্যাত নাট্যকার ইউজীন ওনীল সমাধি থেকে পুনরুত্থিত ল্যাজারাসের জীবনের শেষ পর্যায় নিয়ে একটি নাটক লিখেছেন; সবটাই ক্রসবেধে যীশুর লীলাবসানের পরবর্তী কালের কাল্পনিক কাহিনী। নাটকটির নাম 'Lazarus Laughed'। ঐ নাটকে দেখানো হয়েছে যে পুনরুত্থিত ল্যাজারাস বিমল হাস্যের মধ্য দিয়ে জীবনের গভীর রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। ল্যাজারাস হাস্য দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন, উচ্ছল হাস্য তাঁকে দিনে দিনে তরুণতর করে তুলেছে, পরিশেষে অর্ধোন্মাদ সীজার ক্যালিগুলার নির্দেশে যখন তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করা হল তখনও অকুণ্ঠ হাস্যে তিনি সজীবতার পরিচয় দিয়েছেন।

নাট্যকার কী সংকেত করতে চেয়েছিলেন তা

জানা নেই। তবে ভারতীয় দৃষ্টিতে এই অমল হাস্য ব্রহ্মানন্দেরই অভিব্যক্তি। ব্রহ্মের আনন্দকে জানলে আর ভয় থাকে না—কখনও নয়, কোনো কিছু থেকে নয়; কেননা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই তো নেই যে তা থেকে ভয় হতে পারে। ব্রহ্মের আনন্দ—'রাহুর শির'-এর মতো সম্বন্ধ-পদে স্বগত পরিচয়। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনিই আনন্দস্বরূপ হয়েছেন। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।' যীশু কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মৃত ল্যাজারাসকে পুনর্জীবিত করেন নি, তিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে গেছেন।

ল্যাজারাসের পুনর্জীবনের বৃত্তান্তে কোনো গূঢ় সংকেত অভিপ্রেত ছিল কিনা জানা যায় না। ওনীল যে ঔপনিষদ সত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এমনও নয়। তবে করুণামৃতসিঞ্চনে নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত ভক্তের অনুরূপ চেতনান্তরই প্রত্যাশিত নয় কি?

[তিন]

এরই কদিন পরের ঘটনা [ম্যাথিউ ২৬, মার্ক ১৪, জন ১২]।

পাসোভার উৎসব হতে আর দিন কতক বাকি আছে। মোজেস অলৌকিক শক্তিবলে মিশরে প্রবাসী ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন; পিতৃভূমিতে তাঁদের প্রত্যাগমনের স্মরণোৎসব এই পাসোভার। যীশু যথারীতি কদিন ভক্তগৃহে বা জনসমাজে ভাগবতী কথা বিতরণ করে বেথানীর ঐ গৃহটিতে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে শিষ্যরাও আছেন। মনে হয় কৌতূহলী অনেক দর্শকই ভিড় জমিয়েছিল—ভাগবত পুরুষ যীশুর জন্য নয়, সমাধি থেকে পুনরুত্থিত ল্যাজারাসকে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করার উদ্দেশ্যে।

তিন ভাইবোনে সেদিন যীশুকে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের আর্থিক সংগতি সম্পর্কে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় তাঁদের অবস্থা নিতান্ত অস্বচ্ছল ছিল না; আবার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যও ছিল না, কেননা মার্থা-মেরীকেই গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে হত।

ল্যাজারাস যীশুর সঙ্গেই খেতে বসেছিলেন। মার্থা পরিবেশন করছিলেন। মেরীর যে ঘরের কাজে মন ছিল না তা আমরা আগেই দেখেছি। তাঁর আপ্যায়নের ধরনই আলাদা। তিনি বহু-মূল্য সুগন্ধি নির্যাসভরা একটি মর্মর-পাত্র নিয়ে এসে যীশুর মাথার উপর উজাড় করে দিলেন, দু পায়ে মাখিয়ে চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। মহার্ঘ নির্যাসের সুরভিতে সারা ঘর আমোদিত হয়ে উঠল।

অন্যের কথা দূরে থাক, যীশুর শিষ্যদের সবাই এ অপব্যয়ী আপ্যায়ন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। জুডাস ইস্কারিয়ট তো রুষ্ট হয়ে বলেই ফেললেন, 'কিসের জন্য আতরটা এভাবে নষ্ট করা হল? এই আতর বিক্রি করলে তিনশো মুদ্রা পাওয়া যেত। সে টাকা গরীবদের দান করা যেত।'

অপর দুচারজনও বুঝি ফিস ফিস করে তাঁর কথায় সায় দিয়ে মেরীকে গঞ্জনা দিতে চাইলেন।

যীশু কিন্তু বললেন, 'ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, ছেড়ে দাও ওকে। ও তো আমার জন্য ভালো কাজ করেছে। গরীবদের তোমরা তো সব সময়ই পাবে, তাদের ভালো করতে পারবে। কিন্তু আমাকে তো আর তোমরা সব সময় পাবে না। ও যা পারে তাই করেছে। আমার গায়ে ও যে আতর ঢেলে দিল, এতে আগে থেকেই আমার সমাধির পূর্বসংস্কার করা হল। তোমাদের আমি নিশ্চয়ই করে বলছি, সারা জগতে যেখানেই এই দিব্য কথা প্রচারিত হবে, এই নারী যা করেছে তার জন্য সেখানেই তাকে সাদরে স্মরণ করবে।'

মেরী যীশুর দেহ সুরভিসিক্ত করে মরণোত্তর কৃত্যের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করলেন বলেই তিনি

স্মরণীয় হবেন—যীশুর উক্তির এ তাৎপর্য নয়। মেরীর আচরণে যে সর্বাতিশায়ী প্রেম স্ফূর্ত হয়ে উঠেছে যীশু তার কথাই বলেছেন। যথার্থ ভালোবাসা হিসাব করে না, অকৃপণ হয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েই তা সার্থক হয়ে উঠতে চায়। সুরভিসারের মূল্য কত, ঐ নির্যাসের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যেত তা দিয়ে দরিদ্রদের সাহায্য করা যেত কিনা বা অন্য কোনোভাবে তার সদুপযোগ করাই সমীচীন হত কিনা তা নিয়ে কোনোরকম হিসেবনিকেশ মেরী করেন নি।—'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্!' —তাঁর যা একান্ত প্রিয় বস্তু তাই দিয়ে তিনি তাঁকে অর্চনা করেছেন যিনি প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মীয়।

ভাগবতী আবির্ভূতির আধার যিনি—তা তিনি অবতারপুরুষই হোন বা মহাসাধকই হোন—তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে একান্ত ভক্তের হৃদয়টি প্রস্ফুট কমলের মতো সুরভিময় হয়ে ওঠে। বিপরীত-ক্রমে বলা যায় হৃদয়ের একান্ত প্রেম দিয়েই প্রেমের যিনি তাঁকে স্পর্শ করা যায়।

হৃদয়ের অনন্ত প্রসার ছাড়া জীবনের বৃহৎ স্ফূর্তি হয় না—কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে নয়, তার বিচিত্র প্রকাশের যে কোনো ক্ষেত্রেও। হৃদয়ই বৃহৎ প্রেরণার উৎস, প্রেমই মানুষকে সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে 'যো বৈ ভূমা' তার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। এই প্রেম মানুষের আত্মারই বিচ্ছুরণ অথবা আত্মস্বরূপই। যিনি পরম তত্ত্ব তাঁকে যেমন সৎ চিৎ আনন্দ বলা হয়েছে তেমনি রসস্বরূপ বলেও ঘোষণা করা হয়েছে।

*

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

তৃতীয় পর্ব

ভবেশ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এখন দ্রুত ধাবমান। কারুর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ রোগযন্ত্রণায় কাতর, আবার অপরের দৃষ্টিতে তিনি রোগাতীত, আনন্দের সাগর বৈ ত নয়! যুবক ভক্ত হরিনাথ একদিন রোগাক্রান্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে সরাসরি বলেন মনের কথা: আমি দেখছি, আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র। শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন: শালা, ধরে ফেলেছে রে।[১] এরূপ ঘটনার অভিব্যক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ-ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ভক্তসেবকদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সুরেলা কণ্ঠস্বর কণ্ঠরোগে কুণ্ঠিত। তিনি তাঁর বক্তব্য কখনও আকার-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেন, কখনও মিতকথনের ভঙ্গীতে প্রকাশ করেন। তাঁর স্বভাবমধুর বাচনভঙ্গী ও অন্যান্য ভাবপ্রকাশ-পদ্ধতি আকৃষ্ট করে মানুষকে।

লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমস্মৃতি-বিজড়িত ভাবপুঞ্জের মমতামেদুর উন্মোচন কাশীপুরের প্রতিটি দিনকে করে তোলে মাধুর্যমণ্ডিত। লীলাবিলাসের বিভিন্ন বিচিত্র চিত্র অভূতপূর্ব বর্ণময়তা দিয়ে ভক্তচিত্তকে করে প্রলুব্ধ, তার বিশ্বাসের শিকড়কে প্রসারিত করে ব্যাপক ও গভীরে।

---

১ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ৩য় সং, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৭২।

*

শুক্রবার, ১লা ফাল্গুন, ১২৯২ সাল। ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মাষ্টারমশায়ের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে দ্বিজ।[২] যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ঢোকেন, তখন সেখানে উপস্থিত শ্রীমা ও কিশোরীর[৩] স্ত্রী।

সরল বিশ্বাসের প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোরীর স্ত্রীকে বলেন: **ও ভক্তের ছেলে, ওকে টাকা দিতে ভয় নাই।** (পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলে আঠারো টাকা)।

নিকুঞ্জদেবী: ইনিও (মাষ্টার) একজনকে বশিষ্ঠাশ্রমের কথা বলতে শুনে দশ টাকা ধার দিয়েছিলেন।

মাষ্টার কামারপুকুর দর্শন করে ফিরেছেন। নিকুঞ্জদেবীর দুঃখ, তিনি মাষ্টারের সঙ্গে যেতে পারেন নি। শ্রীশ্রীমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন: "বৌমা, তোমায় দেশে নিয়ে যাব।

"মাষ্টার শ্রীক্ষেত্রে গেছেন শুনে রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম—এতক্ষণ তিনি কষ্ট করে যাচ্ছেন—এমন সময় লাটু এসে বললে, 'দোর খোলো, মাষ্টারমশাই এসেছেন কামারপুকুর থেকে।'

"মাষ্টার ওদেশে গেছেন শুনে লজ্জা হ'ল, পাছে···মাঠে হাগতে মুততে দেখে থাকেন।"

শ্রীশ্রীমা নিকুঞ্জদেবীকে [রঘুবীরের] প্রসাদী ফুল ইত্যাদি দেন, প্রবোধ দিয়ে বলেন: 'বৌমা, তুমি আমার সঙ্গে যেও।'

ইতিমধ্যে সেবক বুড়োগোপাল গাঁদা পাতার বাটা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মাঠাকুরানী [বাইরে] একপাশে সরে দাঁড়ান এবং [পরে] ভিতরে আসেন।

এ সব ঘটনা মাষ্টারমশাই নিকুঞ্জদেবীর কাছে শুনে লিখে রাখেন।

সম্ভবতঃ এই দিনের একটি ঘটনা স্বামী সারদানন্দ লিখেছিলেন।[৪] বনহুগলির কিশোরী-মোহন রায় বলেছিলেন: স্ত্রীর সঙ্গে কথা ছিল, দুজনে একসঙ্গে এক জায়গায় মন্ত্র নিব। তারপর একদিন অফিসে বসে আছি, স্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি এল। তাতে লিখেছে টাকা পাঠাতে, কারণ সে তার মার সঙ্গে মন্ত্র নেবে স্থির করেছে। পড়েই ত একেবারে চটে গেলুম—একেবারে মহাবৈরাগ্য, আর কাজটাজ করবো না। অফিস থেকে তখনি চলে কাশীপুরে এলুম। সেদিন জনৈক দারোয়ান হয়ে রয়েছে, কাকেও উপরে যেতে দিচ্ছে না। আমি তা জানি না, যেমন সিঁড়ির কাছে গিয়েছি, অমনি লাঠি নিয়ে তেড়ে এসে, যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি। মন বড় খারাপ হ'ল, চোখ দিয়ে জল পড়ল। চলে যাচ্ছি, স্বামীজী (নরেন) এসে ধরলে। বললে—তুই আজ অমন হয়েছিস কেন রে? সব বললুম। স্বামীজী—আজ একটা গোলমাল হয়েছে বটে। উনি (ঠাকুর) এখনও খান নাই (বেলা তখন ৩টা)। কোন ভক্তের বাড়ী থেকে যত মেয়েছেলে এসে, না বলে কয়ে, উপরে উঠে ঠাকুরকে নাকি খুব বিরক্ত করেছে, তাই।

২ দ্বিজ মাষ্টারমশায়ের বিদ্যালয়ের ছাত্র। অল্পবয়সে মাতৃহারা। পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। দ্বিজ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-বিসিঞ্চিত।

৩ কিশোরীমোহন রায় কৃষ্ণনগরনিবাসী। তিনি বনহুগলিতে বাস করতেন। দীর্ঘশ্মশ্রু কিশোরীকে নরেন্দ্রনাথ ডাকতেন আবদুল। আন্দাজ ১৯১০ খ্রীঃ তিনি কিছুদিন উদ্বোধন কার্যালয়ে কাজ করেছিলেন।

৪ স্বামী সারদানন্দ: ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, উদ্বোধন, ১৩৫২, পৃঃ ১৫-১৬।

তা আমাদের ওটি তো হোঁত্‌কা, তোকে বুঝিয়ে বললেই হ'ত। যাক্—চ, উপরে যাবি? হয়ত তোকে দেখে, ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুর তোর হাতে খেতে চাইবেন। তোদের সব ভালবাসেন কিনা। আমি তো যাব না। স্বামীজী ধরে এনে, দারোয়ানকে বকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িতে উঠিয়ে দিলেন। কাজেই সিঁড়ি উঠে দোরের গোড়া থেকে উঁকি মেরে ঠাকুরকে দেখে প্রণাম করে চলে আসছি—ঠাকুর ইশারা করে ডাকলেন। আমি বললুম—না মশাই, দারোয়ান গাল দেবে। ঠাকুর কলা দেখিয়ে বললেন, 'আয়।' তারপর গলা দেখালেন। আমি বললুম—আজ বড় শুকিয়ে গেছেন, বোধ হয় খাওয়া হয় নি। কিছু খাবার এনে দেবো? তিনি ঘরের ভেতরেই সুজি তৈয়ার করা ছিল—দেখিয়ে—গরম করে দিতে বললেন। খাওয়া হলে ঠাকুর বললেন—আমলকি পাওয়া যায়—আনতে পারিস? বলেই শীলেদের বাগানে গোপালদাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমলকি আনতে পাঠালেন।

"আর যাবার সময় গোপালদাকে বললেন, 'ওকে সুরেশ মিত্তিরের স্ত্রীর মন্ত্র নেওয়ার কথাটা বলিস তো।' আমি তো শুনে অবাক্—কেমনতর একরকম হয়ে গেলুম। গোপালদাকে জিজ্ঞাসা করায় বললে—'জানিস নি, সুরেশবাবুর স্ত্রী অন্যত্র মন্ত্র নেবে ঠিক করেছিল। সুরেশবাবু নিতে দেয় নি। তাতে বাড়ীতে খুব গোল হয়। সেকথা ঠাকুরের কানে ওঠে। তাইতে ঠাকুর সুরেশবাবুকে বলেন—সুরেশ, তোর স্ত্রী যদি দুশ্চরিত্রা হয়, তাহলে তুই কিছু করতে পারিস? সুরেশ—তা কেমন করে পারব? ঠাকুর: তবে সে মন্ত্র নেবে, সৎ কাজ করবে, তাতে বাধা দিস কেন?"

*

গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন মাষ্টারমশাই ও নিত্যগোপাল। মাষ্টারমশাই তাঁর কামারপুকুর তীর্থদর্শনের কিছু কাহিনী উপহার দেন। তিনি নীরব হলে শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র বলেন: পরমহংসদেব বললেন, **বলরামের বাড়ী তোর উঠতি বসতি। ও পাঁচ চাল ভেবে হচ্ছে হাল।**

নিত্যগোপাল: তিনি কোন ঘটনাদি বল্লেন কি?···হৃদয় মুখুজ্যের ব্যাপার কি?···খুব জানি।

এর পরেই দেখা যায় মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানবাড়ীতে হাজির হয়েছেন। সিঁড়ির সামনে রামলালদাদার সঙ্গে দেখা হয়। দুজনে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান, দেখেন তিনি নিদ্রিত।

বাবুরাম এসে বলেন মাষ্টারমশাইকে: একটা টাকা আছে? ঠাকুরের জন্য একজন তুলসী দেবে বলেছে।

মাষ্টারমশাই নিরঞ্জনকে বলেন একটা টাকা ধার দিতে।···

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাই সেবক লাটুর স্মৃতিভাণ্ডারে। তিনি বলেন: দক্ষিণেশ্বরে একদিন রামলাল বিষ্ণুঘরের পুরোহিতকে ঠাকুরের জন্য তুলসী দিতে বললে। সেই তুলসী আর চন্নামেত্ত্যর দক্ষিণেশ্বর থেকে রোজ তিনি পাঠিয়ে দিতেন। এমন পনেরো-ষোল দিন পাঠানোর পর ঠাকুর বললেন—"ওরে! রামলালকে আমার দেহের জন্য তুলসী দিতে মানা করে আয়। ঠাকুরের কাছে ওরকম মানত নিয়ে তুলসী দেওয়া ভালো নয়, বলে আয়।"[৫]

পরের দিন শনিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩ই

---

[৫] চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়: শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ২৫৮

ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বিকাল সাড়ে চারটা। মাষ্টারমশাই বাগানে গাছের ডালে বসে আছেন। সেবক সারদাপ্রসন্ন ফিরে এসেছেন।

সারদার পিতামাতা পুত্রকে উদ্বাহ-বন্ধনে বাঁধবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সারদা আত্মরক্ষার জন্য বাড়ী হতে পালিয়ে যান। কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ গ্রহণ করে পুরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেদিন ছিল ৩রা জানুয়ারী। সম্বল ছিল সেবক তারকের দেওয়া পাঁচটি টাকা। বৈরাগ্যবান সারদা সকল দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ্য করেন, একটি পয়সাও খরচ করেন না। পথের বিপদ-আপদের মধ্যে করুণানিধান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা উপলব্ধি করে কৃতকৃতার্থ বোধ করেন। কিছুদিনের মধ্যে পিতামাতা পুরীতে হাজির হন। সারদা তাঁদের সঙ্গে করে মন্দিরাদি দর্শন করেন। সকলে একত্রে ফিরে আসেন কলকাতায়।[৬]

সারদা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখে খুশী হন, বলেন: **কিরে [ঘুরে ফিরে সব দেখে এলি ত] ?**[৭]

সেদিনই শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জননী, স্ত্রী ও দুই পুত্র। এ সংবাদ পরিবেশন করে 'ধর্মতত্ত্ব' ১৮০৮ শকের ১লা আশ্বিন (অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ খ্রীঃ)। পত্রিকার সংবাদ: "আচার্যমাতা ও আচার্যপত্নী এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান করুণাচন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্মলচন্দ্র একদিন পীড়িতাবস্থায় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহাদের প্রতি অনেক আদরযত্ন প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্দ্র ও নির্মলচন্দ্রকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক স্নেহমাখা কথা বলিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেছিলেন ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী। শোকসন্তপ্ত তাঁর বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী ও পুত্রেরা শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে দেখা করতে গিয়েছিলেন ১৮৮৪ খ্রীঃ ১৫ই জুন (কথামৃত ১।১০।৮)। প্রায় দুবছর পরে তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য এসেছেন কাশীপুরে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তখন উপস্থিত সেবক শশী। শ্রীরামকৃষ্ণ নির্মলকে ও করুণাকে আলিঙ্গন করেন এবং কাঁদতে থাকেন। একটু শান্ত হবার পর বলেন: **তোরা মাইরি বলছি আমার অন্তরঙ্গ।**

কেশব-গৃহিণী জগন্মোহিনী দেবী বলেন: আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।[৮]

করুণাচন্দ্র বলেন: আপনার দেহের কষ্ট পরের উদ্ধারের জন্য। আমি এইজন্য দু'বছর আপনার সঙ্গে দেখা করি নি।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। এতক্ষণ বুড়োগোপাল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছিলেন, সেবা

৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ৪র্থ সং, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪-৬।

৭ নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া হতে প্রত্যাবর্তন করলে শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে বলেছিলেন: "এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাওনা কেন কোথাও কিছু পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা।" (স্বামী গম্ভীরানন্দ: যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫)।

৮ ১৮৮৩ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ শেষবারের মত পীড়িত কেশবচন্দ্রকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেদিনও করুণাচন্দ্রকে আশীর্বাদ করার প্রশ্ন উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন: "আমার আশীর্বাদ করতে নাই।" তিনি করুণাচন্দ্রের গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। (কথামৃত ২।১০।৬)।

করছিলেন। তিনি নীচে নেমে গেলে মাষ্টারমশাই একাকী ঠাকুরের কাছে থাকেন। মাষ্টারমশাই পাখা দিয়ে হাওয়া করতে থাকেন। একসময়ে ক্লান্ত মাষ্টারমশায়ের চোখে ঘুম নেমে আসে। তবুও তাঁর হাতপাখা যন্ত্রবৎ চালু থাকে হঠাৎ 'মা গেলুম' শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন পাখার হাওয়া করতে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে থামতে বলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকারের কাছে যাবার বিষয়ে আলোচনা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ: **আচ্ছা।**

শ্রীরামকৃষ্ণ বালকবৎ। প্রশ্ন করেন: **গাঁদার পুলটিস** (Poultice) **কতদিন দিতে হবে?**

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **গলার বাইরে ভিতরে একটু একটু টন টন করছে।**

প্রদীপ আনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করে নমস্কার করেন।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই নীচে নেমে আসেন, 'দানাদের' ঘরে উপস্থিত হন। সেবক লাটু একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা বিবৃত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্র মজুমদার ও সেবক লাটু। শ্রীরামকৃষ্ণের হাবভাব পাঁচ বছরের বালকের মত। তিনি কেঁদে কেঁদে বলেন: **কারুর** [কাছে] **কিছু তো অপরাধ করি নি—এই মুখে কত লবঙ্গ এলাচ ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি —বাবার আদরের ছেলে ছিলুম—রামকৃষ্ণবাবু বলতো—তারপর কত ঈশ্বরীয় নাম হলো** [এই মুখে]**—তারপর পুঁযরক্ত আর এই যন্ত্রণা।**

উপস্থিত সকলে অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন।

সন্ধ্যা সাতটায় মাষ্টারমশাই নীচের হলঘরে দেখতে পান ভক্তদের মজলিশ বসেছে। সেখানে উপস্থিত গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন।

গিরিশচন্দ্র মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনার highest ambition কি?

মাষ্টারমশাই: 'যদি যাব গো বাপের বাড়ী তো ভাতারকে সঙ্গে করি।'

গিরিশচন্দ্র: ওর মানে বুঝলুম না—আমার ambition হচ্ছে to be the soldier of God—যখন ডাকবেন তখন ready। আড়াইশো টাকা দরকার, অমনি বাড়ী বাঁধা দেব—তা পারি কৈ? —থিয়েটার, ছেলে, স্ত্রী···

মাষ্টারমশাই: ঠাকুর যদু মল্লিকের মাকে[১] বলেছেন—'তুমি ও তোমার' এই বোধই জ্ঞান।

গিরিশচন্দ্র: তা হয় কৈ? পরের ছেলেদের বেলায় তো 'তোমার' এই বোধ হয় না।

মাষ্টারমশাই: শক্তিবিশেষ [মানতে হয়], দাসভাবে [থাকতে হয়], তিনি যা ভার দিয়েছেন তাই করবো।

গিরিশচন্দ্র: তা হয় কৈ?

মাষ্টারমশাই প্রার্থনা করতে হয়—তিনি কল্পতরু।

গিরিশচন্দ্র: আপনার কি [আপনি বেশ আছেন]!

মাষ্টারমশাই: একটা কীর্তন আছে--

মাষ্টারমশাই মিষ্ট কণ্ঠস্বরে গাইতে থাকেন, 'আর কিছু চাই না কেবল তোমার সঙ্গে রব।' ইত্যাদি

গোপীভাবের কীর্তনটি শুনে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেন: আমি অত সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করিনে। (অত) সঙ্গে থেকে কি করবেন?

গিরিশচন্দ্র কি অবতারপুরুষের সঙ্গকেও একটা বন্ধন মনে করছেন?

[১] যদু মল্লিকের মায়ের নাম রাধারাণী।

দেবেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে দেখিয়ে বলেন: আমি এঁকে চিনেছি—[ইনিই চৈতন্যলীলায় ছিলেন] কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

সেবক লাটু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর হতে ঘুরে এসেছেন। লাটু বলেন: পরমহংসদেবকে সব বললুম—তা বললেন, **'তবে স্থরেন্দর সব ভাড়া দিচ্ছে কেন?'** মাষ্টারমশায়ের কথাও বললুম। তিনি (পরমহংসদেব) বললেন, **'কেবল কাছে থাকতে চায়।'**

গিরিশচন্দ্র: কেন একথা বললেন?

মাষ্টারমশাই: বালকস্বভাব।

গিরিশচন্দ্র: লজ্জা করছে ভাই।

* * *

তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। মাষ্টারমশাই বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাগানের পথের ধারে গাছতলায় দেখতে পান গিরিশচন্দ্র ও নরেন্দ্রনাথকে।

রসিক নরেন্দ্রনাথ আগুয়ান মাষ্টারমশাইকে দেখে বলেন: কে? টানতে পারলে তবে এখানে আসবে—তা না হলে চক্র ভেঙ্গে যাবে। যাও বাবা।

মাষ্টারমশাই বাড়ীতে ফিরে যান।

আজ রবিবার, ৩রা ফাল্গুন; শুক্লা দশমী, মৃগশিরা নক্ষত্র; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বেলা এগারটা নাগাদ মাষ্টারমশাই উপস্থিত হন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ীতে। মাষ্টারমশাই ক্যান্সার-রোগী শ্রীরামকৃষ্ণের সংবাদ নিবেদন করেন।

ডাঃ সরকার বলেন: তোমরাই অবতার অবতার করে—মহাপাপে মগ্ন করিয়ে—ওর simplicity ঘুচিয়ে মেরে ফেললে! ওর morals খারাপ করলে…।

মাষ্টারমশাই: যা বললেন ঠিক—ওঁর এই atmosphere-এ থাকার অভ্যাস নাই—কিসে কি হয় বলা যায় না।

ডাঃ সরকার: অবতার-বুদ্ধি আনলে আর রক্ষা আছে?

মাষ্টারমশাই: Another point of him. যেমন ছদ্মবেশী রাজাকে হাটবাজারের মাঝে 'রাজা' 'রাজা' করলে তিনি ছদ্মবেশ ছেড়ে পালিয়ে যান।

ডাক্তার ও অপর এক সমালোচক নিশ্চুপ হন। ডাক্তার মানুষের মৃত্যুর পর কি ঘটে সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকেন।

ডাঃ সরকার: দেখেছ, কি economy of nature! বুঝা ভার কোথায় সব যাচ্ছে মরে!

মাষ্টারমশাই: 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে', যেমন fountain [—ঝরনার জল ঘুরে ফিরে আসে]।

ডাঃ সরকার: [এটা] হতো যদি একটা unconsciousness থাকতো তবে fountain-এর।

মাষ্টারমশাই: অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলে উপমা একদেশী। যেমন, বাঘের মত ভয়ানক। বুঝতে হবে এখানে resemblance, not identity।

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলেন: Individual consciousness বুঝতে পারলুম না।

মাষ্টারমশাই: ওসব বুঝিয়ে ওঠা শক্ত। যেমন পরমহংসদেব বলেন, 'হালদারপুকুরের জল—উপর উপর নাও একরকম, আবার ঘেঁটে নিলে আরেক রকম।' [প্রশ্ন করা যেতে পারে,] তাহ'লে ঈশ্বরের বাপ কে? পিতামহ কে?

দুজনেই উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হন।

ডাঃ সরকার বলেন: তবে যেমন বালি সরিয়েও শোয়া যায়—বিচার চাই।

মাষ্টারমশাই: ঈশ্বরতত্ত্বটি ছাড়া।

ডাক্তার সরকার প্রসঙ্গান্তরে যান। তিনি বলেন: রামবাবু বলছিল, [ডাক্তারদের মধ্যে] যারা টাকা নিচ্ছে, তারাই গেছে। I laugh.

This is uncharitable, unworthy of a disciple of পরমহংসদেব।

—তবে আমারও [টাকা] নিলে হ'ত, আর এ যন্ত্রণা কেন ?

মাষ্টারমশাই বিষয়ান্তরে যেতে চান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন : আচ্ছা, involuntary motion of the limbs during sleep হয় কেন ?

ডাঃ সরকার : [মাংসপেশীগুলি] unhinged —nervous control কম।

অতঃপর বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বাসের কথা ওঠে। মাষ্টারমশাই বলেন : যীশু তাঁর শিষ্যকে বলেছিলেন, যারা না দেখেও বিশ্বাস করে তারাই ধন্য।

ডাঃ সরকার : Impression তো চাই—বিশ্বাস করা যায় কৈ ? [চারদিকে] কত প্রবঞ্চনা···।

মাষ্টারমশাই : যেমন নাকি দই ও বানরের কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে বিশ্বাস-অপরাধ।

ডাঃ সরকার : fatality [মানতেই হচ্ছে]। Nux Vomica, Acetic acid [দিয়ে দেখা গেছে]। মরতে হচ্ছেই, তবে question of time. আমাদের এ চোখের ঠিক বিশ্বাস যে death [অবধারিত]—তবে তোমরা ভাবছ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। নিশ্চিত cancer দাঁড়াচ্ছে—This I could understand on the very day you took me there.

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ডাক্তারের মারাত্মক সিদ্ধান্ত মাষ্টারমশাই নীরবে শোনেন। আবার ডাক্তার বলেন : Who bears the expenses ?

মাষ্টারমশাই : Gladly they bear.

ডাঃ সরকার : তা বুঝেছি।

মাষ্টারমশাই : গিরিশ ঘোষ তো বলেছেন যে হঠাৎ যদি আড়াইশো টাকারও দরকার হয় তিনি বাড়ী বন্ধক দেবেন। তিনি আরও বলেছেন, 'দরকার হয় তো প্রাণ দেবো at any moment's notice.'

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যের ত্যাগের মানসিকতা বর্ণনা করে মাষ্টারমশাই থিয়েটারের মঞ্চশিল্পীদের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপক ও গভীর প্রভাব আলোচনা করেন। তিনি কয়েকটি মধুর কাহিনী উপহার দেন।

ডাঃ সরকার : I wish I were there to see.

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের খাতির ও যত্নের উল্লেখ করেন। প্রথম বারে পান পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় বারে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেওয়া পানটি দেখে গিরিশচন্দ্রের অপছন্দ হয় তিনি তিনচারটা পান নিয়ে আসেন।

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করেছিলেন ষ্টার থিয়েটারে। সেখানে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাখা দিয়ে হাওয়া করেন। মহিলা শিল্পীদের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবও প্রশংসনীয়। তাঁরা সমাজে ধিক্‌ত হলেও ভদ্রমহিলাদের মত হাতজোড় করে[১০] অভ্যর্থনা করেন।

ডাঃ সরকার : I wish I were there.

মাষ্টারমশাই : You have no idea.

বেলা সাড়ে বারোটায় ডাক্তার সরকারের বাড়ী হতে বেরিয়ে মাষ্টারমশাই কাশীপুরে যান। বাগানবাড়ীতে দানাদের ঘরে ঢুকে দেখেন নরেন্দ্রনাথ পাঠরত। গীতার কর্মযোগ পড়ছেন। নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে বলেন : পরমহংস

১০ শ্রীরামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে গিয়েছিলেন 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে। সেদিন ছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর। অভিনয়ান্তে নটীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। কেউ কেউ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ করুণামাখা কণ্ঠে বলেন : মা, থাক থাক ; মা, থাক থাক।

অবস্থা না হলে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না।

মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান। তখন সেখানে উপস্থিত রামলাল, বুড়োগোপাল প্রভৃতি।

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের রোগ-নিরাময়ের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন: **কাপড়, সন্দেশ আর ন টাকা** [দিয়ে অমনি অমনি বিদায়!] **ব্রাহ্মণ-ভোজন নেই**…!

ঈশ্বরাবতারের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বিধান শুনে মাষ্টার বিস্মিত হন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের সংস্কার আর প্রচলিত বিশ্বাস মান্য করে চলতেন। আলোচ্য প্রায়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের স্মৃতিকথাতে উল্লেখ পাই। শ্রীমা বলেছেন: কাশীপুরে তাঁর অসুখের সময় তিনি বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী লোকে কেউ কিছু বলবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে না।' ও রামলাল তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।[১১]

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন: **ওখানে** [ডাঃ সরকারের কাছে] **গিছলে**?

মাষ্টার: হ্যাঁ, বললেন বুধবার নাগাদ আসবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিতে): **কি বললে**?

প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে মাষ্টার বলেন: বুধবার নাগাদ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় জানতে চান ব্যাধি সম্বন্ধে ডাক্তারের অভিমত। রূঢ় নির্মম সত্য বলতে মাষ্টারের মন সায় দেয় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তিনি সত্যকে ঢেকে বলেন: ভাল হবে বললেন। তবে [অসুখ] খুব শক্ত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন রামলালকে: **দেখলি**?

মাষ্টার: তবে ঘায়ের মুখ নীচে হয়ে ভালই হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ: পেট খারাপ হয়েছে।

তিনি বাহ্যে যাবেন। সানকির জন্য মাষ্টারকে ইঙ্গিত করেন। মাষ্টার দৌড়ে নীচে যান, সেবক কালীপ্রসাদকে ডেকে আনেন।

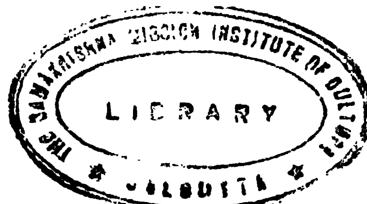
রাত্রে মাষ্টারমশাই কাশীপুরে থেকে যান। প্রত্যূষে রামলালদা বলেন পুরানো কাহিনী—গর্ভধারিণী চন্দ্রমণি দেবীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের চণ্ডীতলার পথ দিয়ে বরাবর যাতায়াতের কথা আর চানকের শ্রীরাম মল্লিকের কথা।[১২]

১১ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ষষ্ঠ সং, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭০।

১২ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৬০-৬৬৬

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ ১৩৮৭ সংখ্যার পৃষ্ঠা ২০৪, উত্তরার্ধের ৮ম ও ৯ম পঙ্‌ক্তিতে 'স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ' স্থলে 'স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ' হইবে।



দীক্ষা

শ্রীমতী বিভা সরকার

বুকের মধ্যে শ্বেত কমলের পাপড়ি খুলে গেছে—
ইষ্ট সেথায় আসীন আছেন আপন মহিমাতে।
মন-ভ্রমরা আত্মহারা গন্ধে পাগল তারি
ব্যাকুল হৃদয় দিশেহারা কিসের অন্বেষণে?
স্পর্শে যাঁহার চিত্তকমল প্রস্ফুটিত হল
হৃদয় যাচে পলে পলে চরণ-পরশ তাঁরি।
আলোকেরি ঝর্না নামে মনের গুহা ভাঙি
উথলপাথল কী আনন্দ হৃদয়-মাঝে আজি!

কি চেয়েছি কি পাইনি জানি না তার মানে
হৃদয়কুম্ভ পূর্ণ হল এ কোন্ সুধারসে?
বেশ তো ছিল আড়াল রচি মায়ার পরদাখানি
কেটেছে দিন অন্যমনা হেথায় পরবাসে!
কে জ্বালাল পরম কৃপায় আজকে জ্ঞানের বাতি
ভ্রান্তি চোখের এমন করে কে দিয়ে যায় খুলে?
কিসের নেশায় এ কোন ঘুমে মন ঘুমিয়ে ছিল
হঠাৎ আজি সে মন আমার উঠলো কেন দুলে!

অথৈ অতল সাগর-বুকে মনের মানিক খোঁজা—
ডুব-সাঁতারি ডুবুরিও হারিয়ে ফেলে দিশা,
নয়ত সোজা মুক্তা খোঁজা অতল গহন তলে;
অগাধ জলে ঘনিয়ে আসে আপনি অমানিশা।
কার পরশে মনকমলের পাপড়ি গেছে খুলে,
স্পর্শমণির পরশ পেয়ে সব হয়েছে সোনা!
ঘরে আমার হল শুরু আলোর আনাগোনা,
কে বোলালো রাতুল চরণ আমার হৃদয়-মাঝে!

গোপীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মের মহিমা প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য একান্তভাবে নিরুপায় ও বেপরোয়া হয়েই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। মূর্তিপূজা বা পৌত্তলিক অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি বর্জন করার জন্য তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এসম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের জন্য আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করতে পারি। প্রভাতবাবু রবীন্দ্র-জীবনীতে (পৃঃ ১০) বলছেন: হিন্দুসমাজের পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তিনি (মহর্ষি) তাঁদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা রহিত করিয়া দিলেন। অবশেষে বিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে উদ্যত হইলে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী (গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথের জননী) উহার সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্য-কথা' থেকে আমরা জানতে পারি যে, গিরীন্দ্র-নাথের বিধবা পত্নী গৃহদেবতাকে নিয়ে ভদ্রাসন ত্যাগ করেন এবং দ্বারকানাথের বৈঠকখানা-বাড়িতে দুই ছেলে ও দুই বৌ, দুই মেয়ে ও জামাই সহ উঠে যান (পৃঃ ৩৭-৩৮)।

এখানেই শেষ নয়। প্রভাতবাবুর কথায় আমরা আরও জানতে পারি: গৃহদেবতার পূজা বন্ধ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাটিতে সমবেত ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন।

চণ্ডীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি নির্মিত হইল।...(দেবেন্দ্রনাথের) দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারীর বিবাহ হইল। ... সুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিলেন; পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তুলসীপত্র-বিল্বপত্র কুশ-শালগ্রামশিলা গঙ্গাজল ও হোমাগ্নি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি সংকলন করিলেন ও তদনুযায়ী কন্যার বিবাহ দিলেন।...নিজগৃহে পূজাপার্বণ বন্ধ হওয়ায় ও অন্যের গৃহে পূজাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুর পরিবারের বিচ্ছেদটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল (পৃঃ ১১)।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এতই অপৌত্তলিক হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ঠাকুরবাড়ি থেকে গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনকে বিদায় করতেও দ্বিধা করেননি। সেই সঙ্গে প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি বানাতেও কুণ্ঠিত হননি। এই যখন একদিকের ব্রাহ্ম-নায়ক দেবেন্দ্রনাথের ছবি, অন্যদিকে তখন দেখি, মহর্ষির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং মহর্ষির নির্দেশেই ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পুত্র রবীন্দ্রনাথ কত সহজে এবং কত আন্তরিক অনুরাগে শিলাইদহে গোপীনাথের সেবা করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ভক্তিভরে গোপীনাথের বিগ্রহকে প্রণাম করছেন—এ প্রমাণও আমরা পাই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে। মহর্ষি স্বীয় কন্যার বিয়ে দেন 'অপৌত্তলিক মতে', আর মহর্ষিরই পুত্র রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বড় দাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক সম্পন্ন করেন গোপীনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। লক্ষ্মী-জনার্দন আর গোপীনাথ—এতো একই দেবতার দুই নাম।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়: রবীন্দ্রনাথ কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং শিলাইদহে দুই ভিন্ন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত? "শিলাইদহ ও

রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩৫০-৫১) এখানে একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই এবং এই চিত্রটা থেকেই সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ আমরা বুঝতে সক্ষম হব। গ্রন্থকার শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলছেন : রবীন্দ্রনাথ যখন নিজ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে (আমেরিকা থেকে ফেরার পরে) জমিদারির কাজ শিক্ষার জন্য শিলাইদহে নিয়ে যান, তখন যুবক সুরেন্দ্রনাথকেও (বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র এবং রথীন্দ্রনাথের চেয়ে ১৬ বছরের বড়) শিলাইদহে নিয়ে যান ঐ উদ্দেশ্যে।…দুই ভাই শিলাইদহেই থাকেন; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নানা কাজে প্রায়ই কলিকাতা ছুটাছুটি করতেন, অথচ রথীন্দ্রনাথ সর্বদাই আপিস কাছারি নিয়ে ব্যস্ত। প্রজাসাধারণের মনে কেমন একটা সন্দেহ হল যে, সুরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা লোকদেখান কৌশল মাত্র। মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ভাবটা টের পেলেন

…হঠাৎ একদিন কুঠিবাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজনের মত মনে হল। ব্যাপারটা ম্যানেজার-বাবু ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারলেন না। ষোল বেহারার বড় পালকিটা বের হল, কুষ্টিয়া থেকে ব্যাক-পাইপের দল আনা হল, সদর কাছারি সাজাবার হুকুম হল। খুব ভোরে সুরেনবাবু স্নান করে গরদের ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরে ফুলের মালা গলায় দিয়ে সুসজ্জিত পালকিতে চেপে বসলেন। বিশ-ত্রিশ জন বরকন্দাজ ও বাদ্যভাণ্ডসহ সুরেন-বাবুকে নিয়ে পালকি চলল গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেব-বিগ্রহ গোপীনাথের মন্দিরে। তিনি গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে গোপীনাথ মন্দির, গ্রামময় হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্যাপার কি? শেষ পর্যন্ত বোঝা গেল সুরেনবাবুর অভিষেক।

এইখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা আবশ্যক। শিলাইদহ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিষ্ঠাতা দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজীর সেবাপূজা পরিচালনা করতেন ঠাকুর-জমিদার, সেবাইতসূত্রে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনী নির্ধন সকল গৃহস্থের এই সুপ্রাচীন প্রথা ছিল যে, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন (বিজয়া দশমীর দিনও বটে) উপলক্ষে বর-কনে এবং শিশুপুত্র বা কন্যা গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরে শোভাযাত্রা করে গিয়ে দেবতার নির্মাল্য আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিবাহ-যাত্রা করবে বা অন্ন মুখে দেবে। সে প্রথা এখনও চলছে। ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও গ্রামীণ ঐ প্রাচীন প্রচলিত ঐতিহ্য সংস্কার বা প্রথা মান্য করতেন প্রজাদের মতই। রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেন জুতো বাইরে রেখে, খালি পায়ে। এলম্‌হার্স্ট সাহেব জুতো ছেড়ে গোপীনাথ মন্দিরের কাজ দেখতেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন, এ ঘটনা আমরা দেখেছি। প্রণামী ছিল এক টাকা বা আট আনা, আশীর্বাদী ছিল চরণামৃত গ্রহণ ও 'লালচি' (হিন্দুদের পূজায় লাগে শিবের জোড়) মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা।…

সুরেন্দ্রনাথ পালকি চেপে শোভাযাত্রায় সারা গ্রাম সচকিত করে সদর কাছারিতে এলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আগে থেকেই তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। ম্যানেজারবাবু মাল্যদান ও প্রণাম করে অন্যান্য আমলাগণ সহ সুরেন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালেন, রবীন্দ্রনাথ ভাইপোকে কপালে চন্দন ও ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। দেবেন্দ্রনাথ বেলপাতা আর কুশ বর্জন করেন, রবীন্দ্রনাথ ধানদূর্বা ও চন্দন গ্রহণ করেন।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেই গোপী-নাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা তিনি নিশ্চিতভাবেই পিতার অনুমোদনে করেছিলেন। সেই আশীর্বাদ ছিল 'চরণামৃত' গ্রহণ ও 'লালচি'

মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা—যা রথীন্দ্রনাথ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যার বিয়েতে গঙ্গাজল আর শালগ্রাম শিলা বর্জন করেন, আর মহর্ষির পৌত্র নববধূকে নিয়ে চরণামৃত গ্রহণ করেন। এটা কি স্ববিরোধিতা, অথবা বাইরের রূপ আর ভিতরের রূপের পরস্পর বিরোধিতা? কলকাতায় তাঁরা এক আচরণ করতেন, ভিন্ন আচরণ করতেন দূরে, শিলাইদহে।

গোপীনাথের প্রসাদ গ্রহণ করাটাও যে শিলাইদহের ঠাকুরবাবুদের সংসারে প্রচলিত ছিল, সেটাও ঘটনা। শিল্পী নন্দলাল বসু শিলাইদহে গিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ছিলেন। সে সময়কার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৫৪): সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রত্যহ গোপীনাথ মন্দির থেকে শীতলী প্রসাদ আসতো। নন্দলাল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং আপনজন। সেইজন্যই ঠাকুরের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থাটা তিনিও লক্ষ্য করেছেন।

এই যে গোপীনাথ মন্দির—যার সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল অবিচ্ছেদ্য—সেই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে, আছে একটা কাহিনী। এই প্রসঙ্গে সেটাও স্মরণ করা সঙ্গত।

গোপীনাথ মন্দির

শিলাইদহের গোপীনাথ মন্দির সম্পর্কে আমরা শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বিবরণ (পৃঃ ৭) অনায়াসেই অনুসরণ করতে পারি। তিনি বলেছেন: শিলাইদহের ভদ্রপল্লী রবীন্দ্রনাথের আমলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুমার, কর্মকার, সূত্রধর, গোপ, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি জাতির দ্বারা পূর্ণ ছিল।···গ্রামের বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ ছিল গোপীনাথের মন্দির ও খোরসেদ ফকিরের দরগা।·· গোপীনাথদেবের রথ ছিল প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী।···গোপীনাথ-বাড়ির সংস্কার করে, ঐ দেবমন্দিরের (তিনি) অতিথিশালা, কাছারি ও সিংদরজা তৈরী করে গ্রামের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করেন।···তাঁর সময়ে কাছারিতে পুণ্যাহ ও গোপীনাথদেবের পালা-পার্বণে, জানিপুরের বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন, লালন ফকিরের বাউলগান ও যাত্রা থিয়েটারের অনুষ্ঠানে নিরানন্দ পল্লী সঞ্জীবিত হয়ে উঠত।

শিলাইদহের গোপীনাথদেবের সেবাপূজায়, যেখানে ঠাকুরবাবুরা বহু সহস্র মুদ্রা খরচ করতেন, অতিথিসেবা করতেন, সেই পল্লীবিগ্রহ আজ নৈবেদ্যের চালে তুষ্ট হয়ে মন্দিরে বসে কাঁদছেন (শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২)। একসময় ছিল, যখন গোপীনাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহের স্নানযাত্রার মেলার জন্য এই পল্লীটি (ছিল) সুবিখ্যাত (ঐ: পৃঃ ৬৪)।

রবীন্দ্রনাথ "দুই বিঘা জমি" কবিতায় বর্ণনা দিয়েছেন: রাখি হাটখোলা নন্দীর গোলা, মন্দির করি পাছে / তৃষাতুর শেষে পঁহুছিনু এসে আমার বাড়ির কাছে। এই বর্ণনায় হাটখোলা, নন্দীর গোলা আর মন্দির সেই শিলাইদহেরই। শিলাই-দহ গ্রামে প্রবেশ করতে হলে সকল পথিককেই এই তিনটি স্থান অতিক্রম করতে হবে। প্রথমেই ছিল শিলাইদহের কুঠির হাট বা হাটখোলা—যা এখন পদ্মাগর্ভে বিলীন, চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নেই। তারপরেই ছিল লালনচন্দ্র নন্দীর গোলা। গোলা ছাড়িয়ে আরেকটু গ্রামের দিকে এগুলেই মন্দির, গোপীনাথদেবের মন্দির। সেকালে অনেক দূর থেকেই গোপীনাথের মন্দির দু'টি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

মন্দিরের ইতিকথা

এই গোপীনাথদেবের মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার পেছনে কিছু ইতিবৃত্ত নির্বাক হয়ে আত্মপ্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে সেই দূর অতীতের প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই কিছুটা উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, রাজা

সীতারাম রায়ের আমলে নদীয়া জেলার উত্তর সীমানায় কীর্তিনাশা নদীর তীরে পাশাপাশি দু'টি গ্রাম কল্যাণপুর এবং শিলাইদহের সন্ধান পাই, যদিও আদিতে শিলাইদহ নামে কোন গ্রাম ছিল না। ছিল খোরসেদপুর গ্রাম। খোরসেদ ছিলেন এক বিখ্যাত মুসলমান ফকির। পরে কীর্তিনাশা পদ্মার কোন একটি অংশ বা দহের (নদীর খাদ) নাম অনুসারেই নাম হয় শিলাইদহ। শিলাইদহ কেন ? সেখানে এক নীলকর সাহেব ছিলেন, ছিল তাঁর কুঠি, নাম ছিল যাঁর শেলী। এই কুঠির বর্ণনা আমরা রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও পাই। পরে শেলী সাহেবের নাম থেকে হয় শেলীদহ এবং অবশেষে শিলাইদহ।

এখন সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত সেই কল্যাণপুরের জমিদার ছিলেন কল্যাণ রায়—যিনি জাতিতে ছিলেন তাঁতি এবং বিপুল বিত্তের অধিকারী। তাঁর বিশাল প্রাসাদ এবং কীর্তি এখন কীর্তিনাশার গর্ভে। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। সস্ত্রীক তিনি দেবতার আরাধনা করলেন একটি পুত্র কামনায়—কিন্তু সব বিফলে গেল। শেষটায় শান্তির আশায় নদীপথে তিনি গেলেন কাশীধামে—তীর্থ করতে।

কাশীতে গিয়ে তাঁরা যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করলেন, তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর, পাথরের মূর্তি গড়েন, প্রতিমা গড়েন। একদিন রাত্রে একই সঙ্গে কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখলেন, দেখলেন তাঁদের সামনে সুন্দর এক কৃষ্ণমূর্তি। হাতে বাঁশি, মাথায় চূড়া, গলায় মালা, পায়ে নূপুর। সেই বৃন্দাবনের গোপাল। পরদিন সকালে তাঁরা গৃহস্বামী সেই ভাস্করকে স্বপ্নে দেখা মূর্তির কথা বললেন, বললেন, "গোপবেশে বংশীধারী" কৃষ্ণ এবং রাধার মূর্তি তৈরি করে দিতে। ভাস্কর রাজি হলেন তাঁরা তীর্থ পরিক্রমায় কাশী থেকে চললেন পুরী। কল্যাণপুরে ফেরার পথে মূর্তি নিয়ে যাবেন।

এদিকে সেই ভাস্কর যখন মূর্তি গড়ার কাজ শেষ করেছেন, গড়েছেন এক অপরূপ যুগল-মূর্তি, ঠিক তখনই কাশীর কোন একজন রাজা সেই মূর্তি দু'টি দাবি করলেন! সেই রাজা কৃষ্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন—কিন্তু হাতে সময় নেই, তৈরি করার মত সময় দিতে রাজি নন। তাই এই যুগলমূর্তি তাঁর চাই-ই, যত দাম লাগে, যত বল প্রয়োগ করতে হয়। ভাস্কর প্রথমে অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত কল্যাণ রায়ের জন্য তৈরি করা সেই বিগ্রহ ওই রাজার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হল।

পুরী দর্শন শেষ করে কথামত নির্দিষ্ট সময়ে কল্যাণ রায় এলেন কাশীতে। উপস্থিত হলেন সেই ভাস্করের বাড়িতে। ইতিমধ্যে ভাস্কর কল্যাণ রায়ের জন্য আরেকটি যুগলমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন। অবশ্য তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় মূর্তিটি আগের মূর্তির চেয়ে কিছুটা ছোট করে ফেলেন। কল্যাণ রায় ছোট মূর্তি দেখে একটু দুঃখিত হলেন ঠিকই, তবে এটা যে দ্বিতীয় মূর্তি, তা আদৌ বুঝতে পারেননি। তিনি রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে কল্যাণপুরে ফিরে এলেন। মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাসমারোহে পূজা-অর্চনা চলতে থাকে।

এদিকে কাশীর সেই রাজা স্বপ্নে দেখেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, আমার পরম ভক্ত কল্যাণ রায়ের মূর্তি তুই এনেছিস কেন ? এখনই ফিরিয়ে দিয়ে আয়। শেষটায় সেই রাজা কল্যাণপুরে এসে কল্যাণ রায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যান প্রথমে গড়া সেই যুগলমূর্তি।

পরম বৈষ্ণব কল্যাণ রায় প্রথমে গড়া মূর্তি পেয়ে দারুণ খুশী—কারণ এই মূর্তিই যেন তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন। এই যুগলমূর্তির নাম রাখলেন গোপীনাথ ও গোপীরাণী। আর ছোট মূর্তির নাম

রাখলেন রাধানাথ ও রাধারাণী। কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী এই দুইজোড়া দেবতাকে পেয়ে ভুলেই গেলেন সন্তানহীনতার দুঃখ-বেদনা।

তারপর একদিন কীর্তিনাশা পদ্মা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কল্যাণ রায়ের প্রাসাদ, মন্দির এবং সম্পদের ওপর। কল্যাণ রায় ও তাঁর স্ত্রী সবকিছু ছেড়ে, সবকিছু ফেলে শুধু প্রাণের ঠাকুরকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। কিন্তু কোথায় তাঁরা আশ্রয় পাবেন, কে তাঁদের আশ্রয় দেবে? এসে আশ্রয় নিলেন খোরসেদপুর গ্রামে এক বিশাল বটের ছায়ায়। সেখানেই তাঁরা ঘর তুললেন, বানালেন গোপীনাথ আর রাধানাথের আশ্রয়। খড়ের ঘরে তাঁরা সংসার পাতলেন, মন্দির গড়লেন।

একদিন রাজা সীতারাম রায় নিজের জমিদারি পরিদর্শন করতে ওই গ্রামে এসে হাজির হলেন। দেখলেন: খড়ের ঘরে দেবতা-ভক্তের সোনার সংসার। রাজা মুগ্ধ হলেন মূর্তি দেখে, বিস্মিত হলেন ভক্তপ্রাণ কল্যাণ রায়কে দেখে।

সীতারাম রায় ওই বটগাছের সামনেই দীঘি কাটিয়ে দিলেন, গড়ে দিলেন দু'টি মন্দির, রান্নাঘর, অতিথিনিবাস এবং পুরোহিত ও সেবকদের ঘর। এই দীঘিটিই আজ শিলাইদহে গোপীনাথের দীঘি নামে বিখ্যাত। রাজা সীতারাম রায় দেব-সেবার জন্য বছরে এক হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দিলেন, আর তৈরি করলেন একটি সুন্দর রথ। ওই রথ আর নেই—তবে রথের অবশিষ্ট হিসেবে কয়েকটি কাঠের পুতুল এখনও আছে।

মহাকালের নিয়মে কল্যাণ রায় বৃদ্ধ হলেন। আর গোপীনাথের সম্পত্তি ও এই পরগণা নাটোরের রানী ভবানীর এক্তিয়ারে চলে গেল। রানী ভবানীই একটি সুন্দর মন্দির তৈরি করে এক মন্দিরে দুইজোড়া বিগ্রহকে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই শ্রীমন্দির রূপময় হয়ে উঠল, আর রাজা সীতারামের গড়া মন্দির দু'টি নিঃসঙ্গ ও শূন্য হয়েই পড়ে রইল। কল্যাণ রায়ের মৃত্যুর পর রানী ভবানীর পুত্র রাজা রামজীবন গোপীনাথের সেবা ও পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এর পরের ইতিহাসে আমরা দেখি, রাজা রামজীবনের জমিদারি নীলামে উঠল। সেই জমিদারি, বিরাহিমপুর পরগণা এবং গোপীনাথের সম্পত্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নেন। কল্যাণ রায়ের ঠাকুর এবার থেকে ঠাকুরপরিবারের ঠাকুরে পরিণত হল এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই এই গোপীনাথ ও রাধানাথের সেবাপূজার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, "নিরাকারবাদী" রবীন্দ্রনাথই এই কিংবদন্তীখচিত এবং বিখ্যাত মন্দিরের সংস্কার এবং সন্নিহিত ভবনগুলির মেরামতি করান।

একদা খোরসেদপুরের বিখ্যাত গোপীনাথই কালক্রমে শিলাইদহের গোপীনাথ হয়ে যান। গোপীনাথের স্নানযাত্রার দিনে এখানে অসংখ্য মানুষ আসেন। কল্যাণ রায়ের গোপীনাথ রবীন্দ্রনাথের সেবায় সমহিমায় বেঁচে রইলেন, হারিয়ে গেলেন কল্যাণ রায়। এটাই ইতিহাসের পরিহাস।

এই ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তবে এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বর্ণনা থেকে আমরা আরও জানতে পারি: ঠাকুরবাবুরা ব্রাহ্মসমাজের হলেও ঐ বাবদ (ঠাকুরসেবা) বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতেন···। ঠাকুর-বাড়ির সিংদরজা নির্মাণ করার সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথের মন্দির থেকে কারুকার্যময় ইট আনিয়ে সেই ইট সিংদরজায় বসিয়েছিলেন।··· ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও ঠাকুরবাবুরা স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের অধিষ্ঠাতা দেবতার সেবাপূজা অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন (পৃঃ ৩৭৫)।

শিলাইদহে নিবেদিতা

শিলাইদহে ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু

প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও গেছেন। গোপীনাথের মন্দিরে প্রণাম করেছেন। "রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ" গ্রন্থের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি (পৃঃ ১৭৯): ১৩০৯ কি ১৩১০ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পল্লীজীবনের উন্নতির নানা চিন্তায় ও কাজে লিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁর আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও একজন আমেরিকান মহিলা (তাঁর নাম জানতে পারিনি) শিলাইদহে গিয়েছিলেন এবং প্রায় ১৫।২০ দিন শিলাইদহে ছিলেন। বর্ণনায় দেখি:

…কাছারির জনৈক আমলা দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীর ডাক পড়ল রবীন্দ্রনাথের বোটে। দক্ষিণাবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে বললেন, কাল থেকে এঁরা দু'জনে গ্রাম দেখতে আরম্ভ করবেন…। জান তো, ইনি হলেন ভগিনী নিবেদিতা—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের শিষ্যা।

একদিন সকালে ভগিনী নিবেদিতা গেলেন শিলাইদহের সেই বিখ্যাত গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির ও দেব-দর্শন করতে। আগেভাগেই খবর দেওয়া ছিল বলে বিগ্রহের পূজকেরা মন্দিরের বারান্দায় বিগ্রহদম্পতিকে একটা কাঠের সিংহাসনে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দুই বিদেশিনীই বাইরে জুতো খুলে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন মাটিতে নুয়ে। দুই হাত পেতে বিগ্রহের চরণামৃত পান করলেন।

গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির দু'টি রাজা সীতারাম রায়ের তৈরি, নূতন মন্দিরটি রানী ভবানীর তৈরি। মন্দির ক'টিই ভগিনী তন্ন তন্ন করে দেখলেন। সেকালের নানা শিল্পকলার নিদর্শন রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা ইটগুলিতে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, নিবেদিতার মন্দিরে যাওয়ার এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি ছিল।

কাত্যায়নী মেলা

শুধু মাত্র গোপীনাথ নয়, হিন্দু দেব-দেবীর নাম ও প্রতিমার প্রতি কবির যে একটু বিশেষ প্রীতি ছিল, সেটা এই ঘটনাতেই প্রমাণিত। শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন: কবি-জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। পাঁজিপুঁথি শাস্ত্রপুরাণ ঘেঁটে কিছু হল না দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। ভেবে চিন্তে ঠিক হল "কাত্যায়নীর" মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতই প্রতিমা তৈরি হল কাত্যায়নীর। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব!

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে "খোলাচে" প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা তৈরি হল। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে গ্যাসের আলো জালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলে-বুড়ো সবাই খাটছেন। আহার-নিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চলবার জন্যে কেউ বললেন, মেলার নাম হোক 'করোনেশন মেলা' (১৯০২ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের 'করোনেশন' উৎসব স্মরণ করে)। রবীন্দ্রনাথের তাতে ঘোর আপত্তিতে নাম হল "কাত্যায়নী মেলা." এইভাবে বিরাট মেলা হল পর পর তিন বছর।

তারপর 'কাত্যায়নী মেলা' গেল উঠে; রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে ঐ স্বদেশী মেলার নানা কল্পনা তখনও জাল বুনছে। দু' তিন বছর যেতেই আবার তাঁর প্রস্তাব, আবার অন্যখানে অন্য মেলা হবে; এবার হল রাজরাজেশ্বরীর মেলা। তখন ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাই একশো। দশমহাবিদ্যার "ষোড়শী" মূর্তি হল। নূতন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল।

মেলা হল পনেরদিনব্যাপী। কাত্যায়নীর

মেলা ও রাজরাজেশ্বরীর মেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন ; এঁরা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসেছিলেন; কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া থেকেও হোমরা-চোমরা হাকিমরা এসেছিলেন।

গোপীনাথদেবের প্রতি বিশেষ অনুরাগ রবীন্দ্র-নাথের আসল রূপটাকেই স্পষ্টতর করে তোলে এবং বাইরে ব্রাহ্ম ও ভিতরে সনাতন হিন্দুর আত্মবিরোধটাকে করে তোলে নগ্ন। তাই তথাকথিত অপৌত্তলিক হয়েও তিনি মূর্তি গড়িয়ে মেলা করেন কাত্যায়নীর নামে, রাজরাজেশ্বরীর নামে—বাতিল করেন 'করোনেশন' মেলার প্রস্তাব। এসবই কি তাঁর অপৌত্তলিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না? মনে-প্রাণে কট্টর ব্রাহ্মণ এবং সনাতন হিন্দু আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ শুধু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রাহ্ম সেজেছিলেন—যেটা তাঁর নিতান্তই সাজ।

বার্ধক্যের সমস্যা

ডক্টর জলধিকুমার সরকার*

আজকাল বহুদেশে বার্ধক্য একটা সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রেও এটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। সামাজিক সমস্যা হিসাবে এই সমস্যা আগেও কমবেশী ছিল, কিন্তু নানা কারণে এর গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। অবশ্য সবদেশে সমস্যাটি সমানভাবে প্রকট নয় অথবা এটিকে জরুরী বলে ধরা হয় না, কারণ অনেক জায়গায় অন্যান্য জরুরী সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে এটি পিছনে পড়ে গেছে। প্রাচ্য-দেশগুলির বেশীর ভাগই এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, বার্ধক্য যখন মনুষ্য-জীবনের একটি সাধারণ পরিণতি এবং সৃষ্টির আদি-কাল হতে একে অবশ্যম্ভাবী বলে জানা আছে, তখন হঠাৎ এটি সমস্যা হিসাবে গণ্য হোল কেন? এর কারণ হিসাবে অনেক কিছু বলা যেতে পারে, তবে প্রধান কারণ মনে হয়, আধুনিক কালে বৃদ্ধদের সংখ্যাধিক্য এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে এদের অভূতপূর্ব অবস্থা। এবিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

প্রথমতঃ, বৃদ্ধ কাদের বলা যাবে? এবিষয়ে দেশে দেশে ও বিভিন্ন কালে সামান্য মতভেদ থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার সুবিধার জন্য যাঁরা ষাটের উর্ধ্বে, তাঁদের বৃদ্ধের শ্রেণীতে ফেলা হবে। এখন এঁদের সংখ্যা বেশী হয়েছে, কারণ (১) জীবনের শেষার্ধে মৃত্যুর হার কমে গেছে, (২) জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান, এবং (৩) জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে আপেক্ষিকভাবে বয়স্কদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তা ছাড়া কোন কোন দেশে বহু যুবকের কর্মোপলক্ষে অন্য দেশে চলে যাওয়ার ফলে সেই দেশগুলিতে বৃদ্ধদের অনুপাত বেশি হয়ে পড়েছে। ১৯৭০ সালের একটি পরিসংখ্যানে[১] দেখা গেছে যে, তখন পৃথিবীতে ষাটের উর্ধ্ব ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮·৪ ভাগ (প্রায় ৩০ কোটি), যেটি ২০০০ সালে দাঁড়াবে শতকরা ৯·৩ ভাগ (প্রায় ৫৮ কোটি)। এই ৩০ বৎসরে জন-সংখ্যা বাড়বে শতকরা ৭৩ ভাগ, কিন্তু ষাটের উর্ধ্বরা বাড়বেন শতকরা ৯২ ভাগ, এবং আশির

* কলিকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ভাইরলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ইমেরিটাস গ্যেরেন্টিস্ট। এফ. এন এ.।

ঊর্ধ্বরা বাড়বেন শতকরা ১১৯ ভাগ। অধিক বয়স্কদের এই আপেক্ষিক বৃদ্ধি লক্ষণীয়। ওই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর ৩৬০ কোটি লোকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশে বাস করে, কিন্তু যাঁরা ষাট পেরিয়েছেন তাঁদের প্রায় অর্ধেক বাস করেন সেই সব দেশে। ১৯৭০ সালে সমগ্র পৃথিবীতে অশীতি-উর্ধ্বদের সংখ্যা ছিল আড়াই কোটি, কিন্তু ২০০০ সালে ওই সম-সংখ্যার অশীতি-উর্ধ্বরা থাকবেন অনুন্নত দেশগুলিতে। আবার ষাটের উর্ধ্বদের মধ্যে অশীতি-উর্ধ্বদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কাজেকাজেই এখন চিন্তা করার সময় এসেছে যে, বৃদ্ধরা সমাজ-জীবনে কিছু কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন কিনা। এইখানে একটি কথা বলা দরকার। সেটি হচ্ছে এই যে, বৃদ্ধরা সংখ্যায় বেড়ে চললেও ব্যক্তি-গতভাবে তাদের আয়ুষ্কাল সেই অনুপাতে বাড়ছে না। অর্থা আগেও যেমন ১১০।১১৫ বৎসরের লোক মাত্র কয়েকটি দেখা যেত, এখনও তাই।

এবার এঁদের অসুখবিসুখে আসা যাক। প্রায়ই শোনা যায় যে, বৃদ্ধরা অনবরত অসুখে ভুগেন। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, বার্ধক্য বা জরার লক্ষণকে অনেক সময় 'অসুখ' বলে ভুল করা হয়। সত্য কথা বলতে কি, এদুটির মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে আলাদা করে দেখার প্রচেষ্টা পূর্বে হয়নি, এবং করাও সহজসাধ্য নয়। এটি সত্য যে, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাঠনিক (anatomical) ও শারীরবৃত্তিক (physiological) পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই সব পরিবর্তন যে পদ্ধতিতে আগে লক্ষ্য করা হয়েছিল, সেগুলি ত্রুটিশূন্য ছিল না। যেমন ধরুন শিখবার ক্ষমতা বা সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তরুণদের সঙ্গে বৃদ্ধদের তুলনা করা হলে ভাবা উচিত যে, বৃদ্ধরা তাঁদের তরুণ বয়সে যে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় কাটিয়েছেন, সেটার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ এই ব্যাপারে বৃদ্ধ ও তরুণদের মধ্যে যে তফাতটা পাওয়া যাবে তার অনেকটা দুটি যুগের সামাজিক আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যাই হোক সাম্প্রতিক কালে সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরে সত্তর-ঊর্ধ্ব বয়সের ৫২১ জন পুরুষ ও ৬২৭ জন স্ত্রীলোককে পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি পাওয়া গেছে[২]: পুরুষরা গড়পড়তা ৭৩ বৎসর এবং স্ত্রীলোকরা ৭৭ বৎসর বাঁচে; স্ত্রীলোকদের প্রস্রাবের গোলমাল ও বাতরোগ এবং পুরুষদের ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের অসুখ, ক্যান্সার ও যকৃতের অসুখ বেশী; বুদ্ধিবৃত্তি কমে না, তবে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই স্নায়ুর কাজ কিছুটা মন্থর হয়ে যায় এবং তাঁদের অর্ধেক ব্যক্তি-দের বিগত একবৎসরে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হয়নি। জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক থেকে পাওয়া তথ্যগুলিও খানিকটা এরূপ। দেখা গেছে যে, সারা পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদেরই চিকিৎসকদের সাহায্য নিতে হয় বেশী। এঁদের যে পুরুষদের চেয়ে অসুখ বেশী হয় তা নয়। এঁদের কর্মহীনতা ও নিঃসঙ্গতা অনেক সময় এঁদের মধ্যে অসুস্থ হওয়ার মনোভাব আনে।[১]

বার্ধক্য অসুখের পর্যায়ে পড়ে না। তবে এটা ঠিক যে, বার্ধক্যের সঙ্গে অসুখ সম্পৃক্ত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী অসুখ দেখা দিতে আরম্ভ করে। এই পর্যায়ে পড়ে যক্ষ্মা বাদে অন্যান্য ফুসফুসের অসুখ, বাত এবং নানারকমের মানসিক অসুখ। বৃদ্ধদের একসঙ্গে একাধিক অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, যার ফলে বার্ধক্যের লক্ষণ তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। দীর্ঘমেয়াদী অসুখগুলি সাধারণতঃ মৃত্যুর কারণ হয় না, কিন্তু তারা রোগীকে পঙ্গু করে ফেলে। বিশ্ব-স্বাস্থ্যসংস্থার দ্বারা ২৯টি দেশের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, শিল্পসমৃদ্ধ দেশে হৃৎপিণ্ড ও রক্ত-নালীর অসুখই মৃত্যুর প্রধান কারণ; তারপর স্থান

নেয় ক্যান্সারজাতীয় অসুখ।*

স্বাভাবিক নিয়মে বার্ধক্যে যেসব পরিবর্তন হয়, তাদের অনেকগুলির উল্লেখ না করলেও চলে, যেমন লোলচর্ম, মাথায় টাক পড়া, দাঁত পড়া, অনিদ্রা, কম শুনা, প্রভৃতি। এইসবের জন্য এবং শরীরে প্রাণরাসায়নিক (biochemical) পরিবর্তনের কারণে শরীরের কর্মক্ষমতা সাধারণভাবে হ্রাস পায়। ফলে, বৃদ্ধদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানর ক্ষমতা কমে যায়। বয়স সত্তর বৎসর হবার আগেই অনেকের রক্তনালীর দেওয়াল পুরু হওয়ার (atherosclerosis) ফলে রক্তচলাচল ব্যাহত হয়, যার জন্য মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির রক্তসরবরাহ কমে যায়। ফুসফুসের একটি উপাদান—'ইলাসটিক ফাইবার' (elastic fibre) কমে যাওয়ায় এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধরা ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হন; অস্থি-র (bone-এর) খনিজপদার্থ কমে যাওয়ার ফলে এর ভঙ্গপ্রবণতা বাড়ে; জীবাণু (bacteria) বা জীবপরমাণু (virus) ঘটিত অসুখের প্রতিরোধ-ক্ষমতা (Immune response) ব্যাহত হয়, যার ফলে অসুখ সারতে দেরী হয়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে বা রক্তনালীতে পরিবর্তনের ফলে হার্টব্লক বা করোনারি অসুখ (Coronary thrombosis)-এর সম্ভাবনা বাড়ে। মানুষের জন্মাবার পরে মস্তিষ্কের জীবকোষের (neurons) সংখ্যা আর বাড়ে না, বরং কমতে থাকে; বার্ধক্যে এই কম হওয়ার প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি প্রথমে ভুল হতে থাকে। স্নায়ুর কার্যক্ষমতা মন্থর হওয়ার ফলে মাংসপেশীগুলি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না, যার জন্য অনেক সময় অপঘাত এড়ান যায় না। বৃদ্ধরা পূর্ণমাত্রার ওষুধ সহ্য করতে পারেন না, যার জন্য ওষুধের ব্যাপারে চিকিৎসককে সাবধান হতে হয়। বৃদ্ধদের উপর সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবও কম নয়। কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার ফলে তাঁদের মানসিক অবনতি হয়; আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু নিয়ে আসে বিরাট নিঃসঙ্গতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ভীতি জন্মানর ফলে তাঁদের মনোবলও ভেঙে পড়ে।

পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে যে সব সাম্প্রতিক অনুসন্ধান হয়েছে, তাতে সেখানকার বৃদ্ধদের মোটামুটি স্বাস্থ্যবান বলা যেতে পারে। তবে তাঁদের সামাজিক, আর্থিক ও নিষ্কর্মা হওয়ার সমস্যা আছে। সামাজিক সমস্যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তাঁদের নিঃসঙ্গতা, সমাজজীবন হতে আলাদা হয়ে যাওয়ার মনোভাব। পাশ্চাত্যে পুত্রকন্যাদের আলাদাভাবে বাস করার প্রথা থাকায় সমস্যাটি খুবই প্রবল, এবং সন্তান বা নাতি-নাতনীরা মাঝে মাঝে এসে সঙ্গদান করলেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তাতে মন ভরে না। আর্থিক সংকটও একটা বড় সমস্যা। নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও ৬৫ বৎসরের পরে কোন দেশেই বৃদ্ধদের কর্মে নিযুক্ত রাখে না। সমাজের প্রয়োজনীয়দের মধ্যে থাকতে থাকতে হঠাৎ অপ্রয়োজনীয়দের পর্যায়ে পড়ে যাওয়ায় অবসরপ্রাপ্তরা (যাঁদের অনেকেই কর্মঠ থাকেন বা নিজেদের ঐরূপ মনে করেন) নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না। পরিবারে বা তার বাইরে, তাঁদের চেয়ে অল্পবয়স্করা তাদের ব্যবহারে বৃদ্ধদের মনে এই অপ্রয়োজনীয়তাবোধ জাগিয়ে রাখে। নিঃসঙ্গভাব, আর্থিক অনটন, সামাজিক অবহেলা প্রভৃতি বৃদ্ধদের মধ্যে অনেক সময় ডাক্তারি সমস্যা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে[৯], যদিও সত্যিকারের অসুখ হয়ত তাঁদের নাই। এটা অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর প্রায় সব বাণিজ্যপ্রধান দেশে বা শহরে যৌবনমুখী কৃষ্টি গড়ে উঠছে, যেখানে জোর দেওয়া হচ্ছে ছোটদের উপর, যারা ভবিষ্যতের অবলম্বন। বৃদ্ধরা সেখানে কেবল অতীতের প্রতীক মাত্র, কারণ তাঁরা জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধিকরণে কোন কাজে লাগেন না। প্রাচ্য

দেশগুলিতে অবস্থা ঠিক এরূপ নয়। সেখানে বৃদ্ধরা পরিবারের মধ্যে থাকার জন্য অতটা অবহেলিত হন না বা নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন না। কিন্তু বর্তমানে সেখানেও পাশ্চাত্যের ঢেউ এসে ক্রমাগত আঘাত হানছে। তাছাড়া সেখানেও যুবকরা বৃদ্ধদের গ্রামে রেখে সপুত্র-পরিবারে কর্মস্থল শহরের দিকে ধাবমান। সেজন্য বৃদ্ধরা সেখানেও চিন্তাকুল।

বার্ধক্য-সমস্যা অন্যভাবে কিছু দেশে দেখা দিচ্ছে। ছোট দেশ জাপানে পুরুষরা গড়পড়তা ৭৩ বৎসর ও মেয়েরা ৭৮ বৎসর বাঁচে। বর্তমান নিয়ম অনুসারে আগামী পাঁচ বৎসরে সেখানকার জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী পেনশনপ্রাপ্তদের পর্যায়ে পড়বে, যার ফলে সরকারের পক্ষে কর্মসংস্থান ও ব্যয়-সঙ্কুলান মুশকিল হবে। জাপানে বার্ধক্য-পেনশনপ্রাপ্তির বয়স ৬০ বৎসর। প্রতি বৎসর কর্মরতদের কাছ হতে সরকার যে পেনশনের টাকা পান, পেনশন বাবদ খরচ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। জাপান সরকার এই সমস্যার সমাধানকল্পে বার্ধক্যভাতার বয়স ৬০ হতে ৬৫ বৎসর করার কথা চিন্তা করছেন[৬], কিন্তু তাতে সরকারকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

জীবনে বার্ধক্য কেন আসে, সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল, কারণ হিপোক্রেটিস-এর সময় হতে আজ পর্যন্ত, অর্থাৎ গত দু হাজার বছরে প্রায় ২০০ অভিমত গড়ে উঠেছে এবং প্রায় সমসংখ্যার প্রতিরোধ-পদ্ধতিরও চেষ্টা হয়েছে।[৭] শারীরিক বার্ধক্য অনেক ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না। ঠিক কোন্ সময়ে বার্ধক্য আরম্ভ হয়, তাও বলা কঠিন, কারণ ব্যাপারটি শুরু হয় নিঃশব্দে। ইটালির ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জেরণ্টলজি ও •জিরিয়াট্রিক্স ইন্‌সটিট্যুটের ডাইরেকটর, প্রফেসার এ্যনতনিনিকে, বার্ধক্য কখন আরম্ভ হয়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'জীববিদ্যার দিক হতে (biologically speaking), বলা যেতে পারে যে, এটা শুরু হয় জন্মের শুরু হতেই। তবে মানুষ যখন একটি জীবকোষ দিয়ে তৈরী নয়, বরং জীবকোষের সমষ্টি, তখন বলা যেতে পারে যে, শরীরের বাড়ন্ত অবস্থার শেষে বার্ধক্য শুরু হয়।'[৩] আমাদের শরীর এবং এর বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষ (cell) দিয়ে তৈরী, যেমন ইঁট দিয়ে বাড়ী তৈরী হয়। জীবকোষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হচ্ছে এবং নূতন জীবকোষগুলি পুরাতন জীর্ণ জীবকোষগুলির স্থান পূরণ করছে। তবে এই বিভক্তিক্ষমতা চিরকাল সমান থাকে না। শরীরাংশের জীবকোষকে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবে চাষ (tissue culture) করে দেখা গেছে যে, ৩০।৪০ বার বিভক্ত হওয়ার পরে তাদের বিভক্তিক্ষমতা কমে যায়।[৮] শরীরাংশবিশেষের জীবকোষগুলির অনিয়মিত (random) মৃত্যুই বার্ধক্যের কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯] বার্ধক্যে জীবকোষে এবং যে সব সামগ্রী দিয়ে জীবকোষগুলি সংযুক্ত (connective tissue), উভয়েতেই পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতেই পরিবর্তন বেশী।[৩] পরীক্ষা করে দেখান হয়েছে যে, যদি যুবকদের দৃষ্টি ও শ্রবণ-শক্তিকে কোন কৃত্রিম উপায়ে কমিয়ে দিয়ে তাদের অন্য কোন লোকের সংস্পর্শে না আসতে দেওয়া হয় এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়।[১০] বার্ধক্যের কারণ অনুসন্ধানে এই সব তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক।

১৯১৭ সালের বিদ্রোহের আগে রাশিয়ায় জনগণের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ছিল ৩৫ বৎসর, বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৭০-৭২ বৎসর। ওই দেশে এখন ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষ সহজে ৯০-১১০ বৎসর বাঁচতে পারে। সেখানে জন্তুর উপর পরীক্ষা করে দেখান হয়েছে যে, আয়ুর ২৫ থেকে

৪০ শতাংশ চেষ্টা করে বাড়ান যেতে পারে। ওই দেশে (বিশেষতঃ ককেসাস পর্বত, আবখাজিয়ান ও আজেরবাইজান অঞ্চলে, যেখানকার লোক বেশী দীর্ঘজীবী হয়) ৪০,০০০ দীর্ঘজীবীদের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘজীবীরা সাধারণতঃ 'প্রকৃতির সন্তান' (children of nature), বেশীর ভাগ গ্রামবাসী, সারাজীবন একই রকম কর্মে নিযুক্ত, শতকরা ৫০ ভাগ ধূমপান করে না. বা অত্যধিক মদ্যপান করে না. এদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ খুব কম এবং মাত্র আট শতাংশ নিরামিষভোজী। অনেকের ধারণা—নিরামিষ ভোজনে দীর্ঘজীবী হয়, এটা সত্য নয়—অন্ততঃ শীতপ্রধান দেশে।

উপরি-উক্ত আলোচনা হতে বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, বার্ধক্যজনিত সমস্যাটি জটিল এবং এর সমাধানও সহজসাধ্য নয়। তবে এটাও ঠিক যে, বার্ধক্য ব্যাধি নয়, বরং এটিকে একটি জন্মগত অধিকার বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অনেক বার্ধক্যবিশেষজ্ঞই মনে করেন, সক্রিয়তা অনেকাংশে জরাকে প্রতিরোধ করতে পারে।[৩] অবশ্য এটা ঠিক যে, বার্ধক্য সম্বন্ধে অনেক কিছুই এখনও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্যে বৃদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস (Home) অথবা স্বতন্ত্র পল্লী (settlement), বার্ধক্যভাতা, তাঁদের উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ প্রভৃতির প্রচেষ্টা চলছে। এর দ্বারা অর্থ-নৈতিক সুরাহা নিশ্চয় হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের পীড়া-দায়ক নিঃসঙ্গতা এবং নিকট আত্মীয়দের কাছে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মিটছে না। সেজন্য পশ্চিম লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রাচ্যের যুক্ত পরিবারের দিকে, যেখানে এখনও বৃদ্ধরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির সেবা ও সম্মান পান, নাতি-নাতনীর উষ্ণ সংস্পর্শ পান। কিন্তু প্রাচ্যের এ ব্যবস্থাও ভঙ্গুর হয়ে আসছে; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের পক্ষে এই আদর্শকে নূতন করে গ্রহণ করা বাস্তব ও সম্ভব নয়। সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য রাষ্ট্র-সংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে ঠিক করেন যে, ১৯৮২ সালে তাঁরা বয়স্কদের জন্য বিশ্ব-পরিষদ (World Assembly) ডাকবেন, যেখানে বৃদ্ধদের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে। সদ্য-অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের (International Year of the Child) ন্যায় আন্তর্জাতিক বৃদ্ধবর্ষ পালন করার বিষয়ও বিবেচনা করা হচ্ছে।[১০] এই প্রসঙ্গে বোধ হয় আরও একটি বিষয় বিবেচ্য হওয়া দরকার। শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ধারণা জাগান দরকার যে, তারা সকলেই শুধু যে বার্ধক্যপথের যাত্রী তা নয়, প্রত্যেকের জীবনের কাম্যই হচ্ছে বার্ধক্যে পৌছান। এর ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা।

এই সব প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও প্রয়োজনীয়, তবে ভারতবর্ষকে সেই সঙ্গে, তার নৈতিক, সামাজিক ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যকে মনে রেখে অন্য ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। অপরিহার্য মৃত্যুর মত বার্ধক্যের জন্যও মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে। ঘর-সংসারের কর্তৃত্বের মোহ ত্যাগ করে সন্তান-সন্ততিদের উপর সানন্দে সে-ভার ছেড়ে দিতে হবে। যুগের পরিবর্তনকে হাসিমুখে মেনে নিতে হবে, 'পুরান সব ভাল, বর্তমান খারাপ', এ মনোভাবও বদলাতে হবে। প্রাচীন ভারতে সন্ন্যাস অবলম্বনে সমাজ হতে বিদায় নিয়ে স্বীয় মুক্তি ও ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করা হত। এটা ছিল চরম ঘটনা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতিবিশেষ।[১১] প্রাচীন কালের মত এখন বয়োবৃদ্ধদের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব না হলেও মনকে ভোগ হতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকে, প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনকে কমিয়ে আনতে হবে। মনকে ভগবদভিমুখী করতে হবে,

যার ফলে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং সংসারের প্রতি আসক্তি কমে।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥[১২]

(যিনি আত্মাতেই সুখ অনুভব করেন—বাহ্যবিষয়ে নয়, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মাই যাঁহার জ্যোতি, তিনি ইহজীবনেই ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন)। এটি শুধু গীতার বাণী নয়, বাস্তব সত্য;—শুধু পৌরাণিক যুগে নয়, এই পারমাণবিক যুগেও। এরূপ আত্মরতি হওয়া নিশ্চয় সহজসাধ্য নয়, তবে এই প্রচেষ্টায় আংশিক সাফল্যও মনে শান্তি আনবে।

আকর-নির্দেশিকা

১ World Health, April 1979, pp. 1—7
২ ,, ,, ,, ,, pp. 16—19
৩ ,, ,, ,, 1972 pp. 3—30
৪ ,, ,, ,, ,, pp. 24—26
৫ Davidson's Principles & Practice of Medicine, 12th Edition, 1979, pp. 124, 190, 794
৬ Statesman, Calcutta, dated 4.3.80
৭ World Health, April 1979, p. 8
৮ Diagnostic Procedure for Viral and Rickettsial Infection 4th Edition, 1969, p. 104
৯ Price's Text Book of the Practice of Medicine, 11th Edition, 1973, p 388
১০ World Health, April 1979, p. 20
১১ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১৬২
১২ গীতা, ৫।২৪

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

[চৈত্র, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

শিক্ষার বিস্তার, ধীরে ধীরে সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ, ভারতীয় সংবাদপত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সংগঠন ও চরিত্রের পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বদেশচেতনার বিকাশ ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের জাতি-প্রাধান্য এবং নিরাপত্তাবোধের ভিত ক্রমশই দুর্বল করে তুলছিল। শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি রহিত করার জন্য সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বহুক্ষেত্রে সুশাসনব্যবস্থার স্বার্থে ভারত সরকারও শ্বেতাঙ্গদের অধিকারগুলি খর্ব করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর ফলে শ্বেতাঙ্গরা আরও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের বিশেষ অধিকারগুলি রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। ভারতীয় আইন-আদালতে তারা যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল, সেগুলি যাতে হরণ করা না হয়, তার জন্য তারা সর্বাপেক্ষা বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। কোনমতেই তারা ভারতীয় বিচারপতিদের এখতিয়ার অধীন হতে সম্মত ছিল না। তারা

সকলেই যে সত্যিই আশঙ্কা করত যে ভারতীয় বিচারপতিদের আদালতে তারা ন্যায়বিচার পাবে না তা নয়। কিন্তু বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি অক্ষুন্ন রাখা তাদের কাছে মর্যাদার লড়াই-এ পরিণত হয়। 'ইংলিশম্যান' এই কথাটি প্রকাশ্যে স্বীকার করে লেখে যে ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধের যতই অগ্রগতি হবে এবং দুই জাতির মধ্যে সমতা যত বেশী প্রতিষ্ঠিত হবে, ইংরাজদের পক্ষে কৃত্রিম মর্যাদা (artificial prestige) রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তত বেশী অনুভূত হবে।

ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাদের তথাকথিত মর্যাদা এবং প্রাধান্যবোধ রক্ষার জন্য যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হচ্ছিল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয়রা ততোধিক পরিমাণে ঐ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার অবসানে বদ্ধপরিকর ছিল। জন্ম ও বর্ণজাত কোনও প্রকার বৈষম্য তারা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। বর্ণবৈষম্যের অবসান দাবী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শ্বেতাঙ্গদের দুর্ব্যবহার এবং ভারতীয়বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিরলস আক্রমণ করতে থাকে। দেশীয় সংবাদপত্র-পত্রিকায় আক্রমণের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে শেষ পর্যন্ত সরকার কুখ্যাত দেশীয় সংবাদপত্র আইন (১৮৭৮) বলবৎ করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করে।

ভারত সরকার সেক্রেটারি অফ্ স্টেট্ হ্যারিংটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) যে বর্তমান আইন অনুযায়ী কভেনেনটেড্ ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টদেরও প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে শ্বেতাঙ্গদের ওপর ফৌজদারী এখতিয়ার নেই, শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভেন্টদের এই এখতিয়ার আছে। ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৮২ সালে লেখা এক পত্রে বি. এল. গুপ্ত প্রথম বাংলা সরকারের দৃষ্টি এই বৈষম্যের প্রতি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সময় Code of Criminal Procedure সংশোধনের জন্য আইন-সভার বিবেচনাধীন ছিল। স্যার অ্যাসলে ইডেন অভিমত প্রকাশ করেন যে এত বিলম্বে ঐ বিষয়ে নতুন করে কিছু করা ঠিক হবে না। কিন্তু ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের Act X পাস হবার পর তিনি সমস্যাটি ভারত সরকারের দৃষ্টিগোচর করেন (২০শে মার্চ, ১৮৮২)। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে এখন যখন ভারতীয় সিভিল সার্ভেন্টরা জেলাশাসক, সেসন জজ নিযুক্ত হতে চলেছে তাদের সর্বশ্রেণীর মানুষের ওপর সমান ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সুষ্ঠু শাসনকার্যের জন্যও প্রচলিত বৈষম্যের অবসান প্রয়োজন। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যখন একজন ভারতীয় জেলাশাসক বা সেসন জজ অভিযুক্ত শ্বেতাঙ্গের বিচার করবার অধিকারী হবেন না, কিন্তু তাঁর অধীনস্থ শ্বেতাঙ্গ জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ঐ অধিকার থাকবে।

তাছাড়া প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের যখন শ্বেতাঙ্গদের ওপর ফৌজদারী এখতিয়ার আছে তখন ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসন জজদের ঐ একই রকম ক্ষমতা না থাকার কোনও অর্থ হয় না। বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী, প্রাদেশিক সরকার ইত্যাদিকে পরামর্শ করার পর রিপন প্রস্তাবিত ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকেই কার্যকরী করতে সিদ্ধান্ত নেন। ঐদিন থেকে নতুন সংশোধিত Criminal Procedure Code বলবৎ হওয়া স্থির ছিল। ভারত সরকার ভারত-সচিবকে জানান যে শ্বেতাঙ্গদের ওপর ফৌজদারী এখতিয়ারের

প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কিন্তু কোনও স্থায়ী বা সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব হবে না যদি না এখনি এবং সম্পূর্ণভাবে বিচারব্যবস্থা থেকে জাতিবৈষম্য এবং বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাধান্য ও সুযোগ-সুবিধা লুপ্ত করা না হয়। বিচারকদের ক্ষমা ও অধিকারের ক্ষেত্রে কোনও রকম জাতিবৈষম্য থাকা উচিত নয়। একমাত্র পার্থক্য থাকবে বিচারকদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ভারত-সচিব তাঁর সম্মতি জানান। রিপন যত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছিলেন তা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী আইন-সচিব সি. পি. ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভায় সংশোধনী বিলটি পেশ করেন। তিনি বলেন 'ফলপ্রদ ও নিরপেক্ষ' বিচার সুনিশ্চিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। বিলটির প্রবল বিরোধিতা করে জি. এইচ. পি. ইভান্স বলেন যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার চেয়ে ইংরাজদের কাছে অধিকতর প্রিয় আর কিছু নেই এবং সেই স্বাধীনতা হরণকারী কোনও ব্যবস্থাকেই তারা মেনে নেবে না। তিনি দাবী জানান যে বে-সরকারী জনমত জানার জন্য সময় দিতে হবে। ভাইসরয় রিপন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে তাড়াহুড়ো করে বিলটি পাস করার কোন উদ্দেশ্য সরকারের নেই এবং পরবর্তী অধিবেশনে বিলটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে এবং সকলের মতামত গ্রহণের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রিপনকে ঐ বিল প্রস্তাবের জন্য অভিনন্দন জানান। কিন্তু রিপনের বক্তৃতার মধ্যেই তাঁর দৃঢ়তার অভাব ও বিরোধীদের তুষ্ট করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল।

ব্যবস্থাপক সভার ৯ই মার্চের অধিবেশনে পুনরায় বিলটি নিয়ে বিতর্ক হয়। ইলবার্ট বিরোধীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, বিলটি পাস করার জন্য সরকার অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করছে না। ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচিত না হয়ে তিনি বিলটি প্রস্তাব করেছেন, এই অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেন যে, বিলটির স্রষ্টা তিনি নন, স্যার অ্যাসলে ইডেন এবং ভারত সরকার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী নন। সভার সদস্যদের মধ্যে ইলবার্ট বিলের সমর্থক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, দুর্গাচরণ লাহা ও সৈয়দ আহমদ খান। কৃষ্ণদাস পাল এই ন্যায্য প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন যে, এই কাজটির জন্য ইংলণ্ড গর্ববোধ করতে পারে এবং সমগ্র ইংরাজজাতি আনন্দবোধ করতে পারে। প্রস্তাবিত আইনটি এত ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক যে, ভারতীয়রা এই বিষয়টিতে গভীরভাবে আগ্রহী। সৈয়দ আহমদ খান তাঁর ভাষণে এদেশীয় শ্বেতাঙ্গরা বিলটির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে জাতিবৈষম্য এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে বৈষম্য দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। রাজা শিবপ্রসাদ বিলটির জন্য ভারত সরকারের প্রশংসা করলেও ব্যক্তিগতভাবে বিলটির বিরোধিতা করেন, কেননা তাঁর মতে এর থেকেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যথা অস্ত্র আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অধিকতর আগ্রহী। তিনি বলেন যে, এই অভিমত প্রকাশের জন্য তাঁকে খুব সম্ভব 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হবে, কিন্তু ইলবার্ট যখন 'ইংরাজসিংহ' সম্বন্ধে ভীত নন তখন কয়েকজন 'ভারতীয় ভেড়ার ডাকে' তাঁর ভয় পাবার কি আছে? শ্বেতাঙ্গদের শুভেচ্ছালাভ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করে তিনি সগর্বে স্মরণ করিয়ে দেন যে,

নিজের জীবন দান করে ক্লাইভকে মুর্শিদাবাদে আহ্বান করে বাংলায় বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন তাঁরই এক পূর্বপুরুষ জগৎশেঠ। রাজা শিবপ্রসাদের এই নির্লজ্জ ইংরাজস্তুতি ও রাজভক্তির প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভারতীয়দের সভা-সমিতিতে তিনি ধিকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছিল।

ব্যবস্থাপক সভার ইংরাজ সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ইলবার্ট বিল সমর্থন এবং শ্বেতাঙ্গদের বিক্ষোভ ও আন্দোলনের নিন্দা করেন। রেনল্ড তাঁর ভাষণে বলেন যে, রমেশচন্দ্র দত্তের মত একজন মানুষ তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা আইনগত বাধার জন্য প্রয়োগ করতে পারবেন না এ ভাবা যায় না। এই ধরনের বৈষম্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং বিচারব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। বিলটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে হাণ্টার বলেন যে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের যে ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে তা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। অভিযুক্ত ভারতীয়দের যে পরিমাণ শাস্তি দেবার ক্ষমতা ভারতীয় সিভিলিয়ান ও রাজকর্মচারীদের আছে তার তুলনায় তাদের শ্বেতাঙ্গদের শাস্তিদানের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বেইলি বলেন যে, তাদের বিক্ষোভ ও উত্তেজনার আসল কারণ বিলে প্রস্তাবিত সংশোধন-গুলি নয়, শ্বেতাঙ্গদের মূল আশঙ্কা হল যে এই বিল পাস হলে শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয়দের সঙ্গে সমানভাবে একই আইন-আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে

ইলবার্ট বিলের প্রবল বিরোধিতা করে অন্যতম সদস্য মিলার অভিযোগ করেন যে শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও এই বিলটি প্রবর্তনের পূর্বে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়নি। 'সর্বনাশা প্রস্তাব'টি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে জনমত, সংবাদপত্র এবং আইনজীবীর পরামর্শ প্রভৃতি রক্ষাকবচ রয়েছে। কিন্তু মফঃস্বলে একজন বিচারক ও একটি কারাগার ছাড়া অন্য কিছুই নেই। মিলার বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা অর্থলগ্নী করেছে বলে ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ হয়েছে, কিন্তু তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নিলে শ্বেতাঙ্গরা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ইভান্স সুস্পষ্টভাবে জানান যে শ্বেতাঙ্গরা তাদের স্বজাতীয়দের যতখানি বিশ্বাস করে ভারতীয়দের ততখানি করে না, কিছু কিছু সৎ ও সম্ভ্রান্ত ভারতীয়ও আছেন; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গরা মনে করে যে ভারতীয়রা নিকৃষ্ট পৌত্তলিকতা এবং জন্মাবধি সত্য, সাহস, সম্মান এবং অন্যান্য সমস্ত গুণের পরিপন্থী পরিবেশের মধ্যে বড় হয়।

ভাইসরয় রিপন তাঁর ভাষণে প্রস্তাবিত বিলের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পুনরায় বিক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গদের আশ্বাস দেন যে, দ্রুততার সঙ্গে কিছু করা হবে না এবং তাদের সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা হরণের কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই। তিনি বলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতার মূল কারণই হল তারা কভেনেনটেড সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দানের নীতি পছন্দ করছে না।

ইলবার্ট বিল সরকারীভাবে প্রকাশিত হবার পূর্বেই ভারতে বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তারা আশঙ্কা করেছিল যে ভারত সরকারের এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে এদেশে তাদের সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অবসান হবে এবং আইনের দৃষ্টিতে তারা ভারতীয়দের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হবে। অন্ধ জাতিবিদ্বেষ ও জাতিপ্রাধান্যের দ্বারা পরিচালিত

শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে ভারতীয়দের সঙ্গে একাসন ও সমমর্যাদা মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে ১৮৫৭র পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, এদের মধ্যে অগ্রণী ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬)। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব গৌরব ও প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস পেলেও ঐ সংস্থার সদস্যদের অনেকেরই ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি কম ছিল না। ইংরাজী এবং দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এই সব পত্র-পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, ভারতীয় জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে সংবাদপত্রের গুরুত্ব কম ছিল না। শুধু বড় বড় শহরগুলিতেই নয় গ্রামাঞ্চলেও নির্ভীক সংবাদপত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের আলোচনা-প্রসঙ্গে সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয় জনমত সোচ্চার হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল। রাজনৈতিকচেতনা-সম্পন্ন ভারতীয়রাও সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিলা করতে অগ্রসর হয়। এর ফলে ইলবার্ট বিল বিতর্ককে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন আলোড়িত হতে থাকে। [ক্রমশঃ]

সমালোচনা

সন্তানের চরিত্রগঠন : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। **প্রকাশক :** শতরূপা প্রকাশনী, ১৪৪ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ (১৩৮৬), পৃঃ ৭৪, মূল্য : পাঁচ টাকা।

সাধারণতঃ দেখা যায় পিতামাতা সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে সবসময়ই চিন্তারত, হয়তো দ্বিধাগ্রস্ত, এবং অতিমাত্রায় ব্যাকুল। বস্তুতঃ ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পিতামাতার এতটা ব্যস্ততা বছর কুড়ি আগেও চোখে পড়তো না। দেশে জনসংখ্যা বেড়েছে, স্কুলের সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান বিশেষ চোখে পড়ছে না। ভালো স্কুল, ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকা বেশির ভাগ মানুষের করায়ত্ত নয়। যে কিছু ভাগ্যবান অভিভাবক চড়া দরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কিনতে পারেন, তাঁরাও ঘোরতর প্রতিযোগিতার যুগে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। তার উপর পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নৈরাজ্য তো আছেই। পরীক্ষার ফল বেরুনো, সেই ফল যথাযথ হওয়া, পরীক্ষকের খাতা দেখা, পরীক্ষক-নির্বাচনে বিভিন্ন প্রভাব—এ সব কিছুই আজ ভাগ্যের খেলায় পরিণত। তারও পরে আছে বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিস্তৃত কর্মজীবন। সব মিলিয়ে দেখলে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে কার চরিত্রগঠন—সন্তানের না পিতামাতার না অভিভাবকের? শিক্ষা-সংক্রান্ত এমনি বহুবিধ সমস্যার আলোড়নে আজ যখন দেশবাসী অনেকটাই দিশাহারা, তখন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর 'সন্তানের চরিত্রগঠন' বইখানি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে পুনর্মুদ্রিত হয়ে এ যুগের পিতামাতাকে পথ দেখাতে বিশেষ সহায়তা করবে। বলা বাহুল্য, ১৩১৯ সালে প্রথম প্রকাশিত এ বই ১৩৮৬তে আমাদের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সব ক্ষেত্রেই সমান গ্রহণযোগ্য হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম চিন্তাধারা-প্রভাবিত ঐতিহ্যে গড়ে-

ওঠা এ গ্রন্থ সমকালীন শিক্ষাচিন্তার দলিল হিসাবেই অধিকতর গ্রাহ্য। কিন্তু মানুষ-গড়ার মূল সমস্যাগুলি যেহেতু আজও অনেকটা এক, সেইহেতু এ বইয়ের চাহিদা আজ সন্তানের মঙ্গলকামী প্রত্যেক পিতামাতার পক্ষেই স্বাভাবিক।

ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হলে যে যোগ্যতা পিতামাতার থাকা দরকার--খুব কম পিতামাতাই সে যোগ্যতা দাবী করতে পারেন। অথচ অভিভাবক হবার অধিকার ছাড়তে কেউ রাজী ন'ন। সেক্ষেত্রে রোজকার আচারে আচরণে, স্নেহে শাসনে, ভর্ৎসনায় ও (প্রয়োজনস্থলে) প্রহারে, ইতিমূলক চিন্তাধারা গঠনে এবং নেতিমূলক অনুশাসনে কেমন ক'রে সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হয়, সে সম্বন্ধে প্রতি পদে আমাদের জানবার, বুঝবার ও শিখবার অনেক বাস্তব পদ্ধতি আমরা এই ছোট্ট অথচ সুচিন্তিত বইখানিতে লাভ করবো।

এ বই লেখার সময় লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষাচিন্তার নায়ক—রুশো, স্পেন্সার, ফ্রোবেল, লক প্রভৃতির দ্বারাই বেশী প্রভাবিত। স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ বয়সে হার্বার্ট স্পেন্সারের 'এডুকেশন' বইটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'শিক্ষা' নামে। ভগিনী নিবেদিতাও তাঁর শিক্ষাচিন্তায় পাশ্চাত্যের নানা মনীষীর চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এঁরা সেইসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন। আলোচ্য লেখকও কিছু পরিমাণে উপনিষদ্, তপোবন, রামমোহন রায় প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা তাঁর লেখায় খুবই কম আলোকপাত করেছে।

তবু আন্তরিক শ্রদ্ধা, নিরপেক্ষ বিচারবোধ, সরস লেখনভঙ্গীতে মিলে তাঁর এই পুস্তিকাখানি এ যুগের শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে বিশেষ মূল্যবান প্রবন্ধরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের প্রশংসাধন্য এ পুস্তিকা আজকের দিনের মনীষী ও সত্যানুসন্ধানীদের পক্ষেও সমান শ্রদ্ধেয়।

শুভ গুপ্ত

শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তবমালা : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। **প্রকাশক :** শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সারদায়ন, ২৬৮, এস. কে. দেব রোড, পাতিপুকুর, কলিকাতা-৪৮। (১৩৮৪), পৃঃ ১০৬, **মূল্য :** দুই টাকা।

পুস্তকখানিতে মূল চণ্ডী হইতে গৃহীত চারিটি স্তব—(১) ব্রহ্মা-কৃত দেবীস্তব ; (২) শক্রাদি-কৃত দেবীস্তব, (৩) দেবগণ-কৃত দেবীস্তব এবং (৪) নারায়ণীস্তুতি সংকলিত হইয়াছে। সময়াভাব ইত্যাদি কারণে যাঁহারা মূল চণ্ডী পাঠে অপারগ তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। প্রারম্ভে 'শ্রীশ্রীচণ্ডী-পরিচিতি' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধ পাঠে পাঠকেরা শ্রীশ্রীচণ্ডীর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিকা জানিতে পারিবেন। স্তবগুলির পূর্বে অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবীকবচ এবং পরে দেবীসূক্ত, শ্রীশ্রীদুর্গাস্তবরাজ, ক্ষমাভিক্ষাস্তুতি প্রভৃতি সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখকের ভাষায়—"দেবী মহামায়া স্বয়ং বলেছেন, কেবল শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'স্তবমালা' (স্তবচতুষ্টয়) পাঠ ক'রে তাঁর আরাধনা-বন্দনা করলেও ভক্তের সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়।" (পৃঃ ৭)। পরিশেষে 'মহাশক্তি মহামায়া' নিবন্ধটি বড়ই সুখপাঠ্য ও হিতকর। সুতরাং এই পুস্তকটির বহুল প্রচার আমাদের সকলেরই কাম্য।

ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়)—পুনর্বাসন-কার্য : বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে জগৎপুরে (আরামবাগ মহকুমা, হুগলী জেলা) ৬০টি গৃহনির্মাণের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। 'নিশ্চিন্ত নীড়'-সংলগ্ন ১·৩ একর অন্য জমিতে গৃহনির্মাণকার্য শীঘ্রই শুরু হইবে।

(খ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়)—পুনর্বাসন-কার্য : মোরভির বন্যায় গৃহহীন জনগণের পুনর্বাসন-কল্পে ভানালিয়া, মোরভি শহর এবং লীলাপুরে গৃহনির্মাণকার্য প্রাগ্রসর। বন্যাপীড়িত ১০৬টি পরিবারকে স্ব স্ব গৃহনির্মাণের জন্য পরিবার-পিছু তিন হাজার টাকা আংশিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ-খরাত্রাণ : পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ কর্তৃক পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে খরাত্রাণকার্য পরিচালিত হইতেছে। একটি বৃহৎ পুষ্করিণী পুনরায় খনন করা হইয়াছে। ইহাতে বিশ হাজার 'ম্যান-ডে' লাগিয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি জলসেচ-জলাশয়ের খননকার্য সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং আরেকটির খননকার্য শীঘ্রই শুরু করা হইবে। বহু জলসেচ-কূপ এবং কয়েকটি গভীর নলকূপ খনিত হইয়াছে। বোঙ্গাবাড়িতে কয়েকটি ছোট বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। অধিকন্তু সংলগ্ন ব্লকসমূহের বেকার যুবকগণের জন্য উৎপাদনশীল কাজকর্মের প্রবর্তন করা হইতেছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ ও চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

উৎসব

আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৪ঠা এপ্রিল হইতে ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা প্রাতে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। পরে বিশেষ পূজা, হোম ও ভজন হয়। সান্ধ্য জনসভায় স্বামী শ্রীধরানন্দ, স্বামী রমানন্দ ও শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। পরে স্থানীয় পাঁচগাছিয়ার শ্রীদীনেশ উপাধ্যায় এবং তাঁহার দল রামলীলা কীর্তন করেন। ৫ই সন্ধ্যায় প্রথমোক্ত বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণীর উপর আলোকপাত করেন। পরে বর্ধমানের শ্রীঅরুণ বিশ্বাস রামায়ণ-গান করেন। ৬ই সন্ধ্যার জনসভায় স্বামী শ্রীধরানন্দ, স্বামী রমানন্দ এবং ডক্টর গোবিন্দ-গোপাল মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর জীবন ও বাণীর উপর ভাষণ দেন। পরে পুরুলিয়া জিলার মানাড়ার 'সঞ্চয়িতা ক্লাব' প্রায় ৫ হাজার দর্শককে রামায়ণের ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে ছৌ-নৃত্য দ্বারা মুগ্ধ করেন।

৭ই স্থানীয় এস. ডি. ও. শ্রী এস. রায়ের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরিত হয়। পরে স্কুলের ছাত্ররা সঙ্গীত, মূকাভিনয় এবং একাঙ্ক নাটক 'অবাক্ জলপান' অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে ভগবানগোলা ও তেতুঁলিয়া গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভগবানগোলায় ৫ই ও ৬ই এপ্রিলের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী পরেশানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য-চরণ গুহ এবং সভাপতি স্বামী অনাময়ানন্দ। বেতারশিল্পী শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন।

তেতুঁলিয়ায় ৯ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সমবেত আট-শত শ্রোতার উপস্থিতিতে ধর্মসভায় ভাষণ দেন

স্বামী ভৈরবানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ এবং সভাপতি শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকরুণাসিন্ধু মণ্ডল ও সম্প্রদায়। উভয়স্থানেই পূজা, হোম ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা ছিল।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব পূজা, পাঠ, শোভাযাত্রা, যাত্রাভিনয়, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে আশ্রমপ্রাঙ্গণে ১১ ও ১২ এপ্রিল এবং সুন্দরবনের অন্যান্য স্থানে ১৪ এপ্রিল হইতে ২০ এপ্রিল উদ্‌যাপিত হয়। ১১ এপ্রিল প্রভাতফেরি ও গৈরিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসব আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণে আশ্রম বিদ্যালয়গুলির পারিতোষিক বিতরণী সভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দ। সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, ক্রীড়াকৌশল ও আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে বক্তৃতা করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সভার পরে পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি মহারাজ। রাত্রে ছাত্রগণ 'কেদার রায়' নাটক মঞ্চস্থ করে। ১২ এপ্রিল পূর্বাহ্ণে ঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগ এবং হরিসংকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভা হয়। সভার পূর্বে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া এক শোভাযাত্রা ষোলটি খোলযুক্ত একটি কীর্তনদলসহ গ্রাম পরিক্রমা করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং বক্তৃতা করেন স্বামী স্মরণানন্দ। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। সভান্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক 'কুরুক্ষেত্রের কান্না' যাত্রাভিনয় হয়। ১৪ এপ্রিল বামনখালি সাগর 'প্রগতি সঙ্ঘে'র উদ্যোগে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভার পূর্বে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা বাহির হয়। ১৫ এপ্রিল কাকদ্বীপ সুন্দরবন রামকৃষ্ণ আশ্রমের সহযোগিতায় উৎসব পালিত হয়। পূর্বাহ্ণে 'কিশোর সঙ্ঘ' মঞ্চে ঠাকুরের পূজা ও হোম হয়। কাকদ্বীপের ছেলেমেয়েরা ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ শহর পরিক্রমা করে। ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমলানন্দ এবং বক্তৃতা করেন স্বামী ভৈরবানন্দ ও শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভান্তে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কর্মীরা চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ১৭ এপ্রিল সুরেন্দ্রগঞ্জ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে, ১৮ এপ্রিল ব্রজবল্লভপুর হাইস্কুলে এবং ১৯ এপ্রিল বরদাপুর হাইস্কুলে ঠাকুরের পূজা, হোম, শোভাযাত্রা এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ব্রজবল্লভপুরে রাত্রে সভান্তে 'নিমাই সন্ন্যাস' যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হয়। ১৯ এপ্রিল সকালে ছোট রাক্ষসখালিতে এবং ২০ এপ্রিল পাথরপ্রতিমা হাইস্কুলে ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। এই সব ধর্মসভাতে বক্তৃতা করেন স্বামী চেতসানন্দ, স্বামী সুরেন্দ্রানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি।

দেহত্যাগ

স্বামী ধীরাত্মানন্দ (দ্বিজেন মহারাজ) ১৮ই চৈত্র ১৩৮৬, রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ইউরিমিয়া-রোগে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে ১৯২৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ময়মনসিং, জামসেদপুর, এলাহাবাদ ও কানপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি ঢাকা ও অদ্বৈত আশ্রমের (মায়াবতী ও কলিকাতা) বিভিন্ন পদে কাজ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর কাল বারাণসী সেবাশ্রমে তিনি অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। অনাড়ম্বর ও কৃচ্ছ্র সাধুজীবনের

জন্য তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন।

স্বামী অজ্ঞেয়ানন্দ (দেবু মহারাজ) ৬ই বৈশাখ ১৩৮৭, বৈকাল ৪-৪০ মিনিটে ৬১ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হওয়ার ফলে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় দেহত্যাগ করেন।

তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৫২ সালে সংঘের পাটনা কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পাটনা আশ্রম ব্যতীত তিনি রেঙ্গুন সেবাশ্রম, কলিকাতাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ সেন্টেনারী অফিস ও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে শেষোক্ত কেন্দ্র হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। সহজ সরল অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৪ঠা জানুআরি (১৯৭৯) গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদে (১।২।৭)। অষ্টম পরিচ্ছেদের আরম্ভে আমরা দেখছি মাষ্টারমশাই গীতা থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন—ঠাকুরকেই লক্ষ্য করে। শ্লোকটি এই :

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ (১১।৪৩)

—অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, হে অতুলশক্তি, আপনি এই চরাচর জগতের পিতা (স্রষ্টা), আপনি পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু। ত্রিভুবনে আপনার সমানই কেউ নেই, সুতরাং আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে থাকতে পারে !

এই পরিচ্ছেদে গুরুতত্ত্ব আলোচিত হবে, তা ই পূর্বাভাস সূচিত হচ্ছে এই শ্লোকটির মধ্যে দিয়ে। একমাত্র সচ্চিদানন্দই গুরু ; সকলের পূজ্য, সকল গুরুর গুরু। গুরুভাব যে কত কঠিন সেটিই এখন আলোচিত হবে।

ঠাকুর কেশবকে বলছেন যে, কেশবের উচিত প্রকৃতি দেখে শিষ্য করা। তিনি তা করেন না বলে তাঁর শিষ্যেরা দল ভেঙে চলে যায়। যে আসছে, কোন রকম বিচার না করে দীক্ষা দিলে এই অবস্থা হয়। সেইজন্য বলা হয়, গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। প্রকৃত গুরু যেমন পাওয়া কঠিন, প্রকৃত শিষ্যও তেমনি মেলা ভার। আমরা আজকাল এমন বহু দেখি যে, মঠে দীক্ষা নিয়েও অমুক বাবা বা তমুক মায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। ঘরে ঠাকুরের আসনের ওপরেই হয়তো সেই বাবার বা সেই মায়ের ছবি টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে। এমনও দেখেছি, হয়তো দীক্ষা-প্রার্থীকে ঠাকুরদের বই আগে পড়তে বলা হয়েছে, সেইরকম একজন এসে আমায় বলছেন, 'আচ্ছা মহারাজ, দীক্ষা নেওয়ার জন্য বই পড়ার কি

দরকার ?' বুঝুন ব্যাপার! বই পড়তে বলার কারণ ঠাকুর, স্বামীজীর যে ভাব, সেটা অন্ততঃ জানা তো দরকার। তাঁদের বিশেষত্ব, তাঁদের দিব্যজীবন, তাঁদের মহিমা—এ সব না জেনে শুধু যন্ত্রের মত নাম জপ করে বিশেষ কি লাভ ? সেই-জন্যই বইগুলি পড়তে বলা হয়। অত হাঙ্গামা করতে না চাইলে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই তো হয়। আজকাল যেন একটা ফ্যাসান দাঁড়িয়ে গিয়েছে মঠে দীক্ষা নেওয়া। সেইটি যাতে না হয়, সেইজন্যই একটু ব্যবস্থা এই সব বই-টই পড়ার ও প্রাথমিক দেখাশোনার। এতে গুরু-শিষ্যের জানা-শোনা হওয়ার অবকাশ হয়, যা বিশেষ দরকার। সেই কথাই ঠাকুর বলছেন, প্রকৃতি বিচার করে, ধাত বুঝে শিষ্য করতে হয়। মনে পড়ে পুরানো দিনের একটি কথা। একদিন পূজনীয় ওঁকারানন্দজী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে একজন যুবককে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, এ ছেলেটি বেশ ভাল, এ দীক্ষা নিতে চায়।' তিনি তখন সেই যুবকটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ; তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, হবে বাবা, হবে।' আবার এও দেখেছি আর একজন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষার জন্য আসনে বসেছে, এমন সময় পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ হঠাৎ তাঁর সেবককে ডেকে বললেন, 'এ কাকে এনেছিস, এ তো পাগল, এর দীক্ষা হবে না।' এই বলে তাকে তুলে দিলেন—যা উনি সাধারণতঃ করতেন না। তার দীক্ষা হ'ল না। পরে অবশ্য তার কাতর প্রার্থনাতে আর একজন মহারাজ তাকে দীক্ষা দেন। সে সংঘে যোগদান করে। কিন্তু কিছুদিন সংঘে থেকে বৃন্দাবনে চলে গিয়ে বৈষ্ণব হয়। তারপর বিয়ে করে সংসারে ফিরে যায়। যাই হোক, মহাপুরুষরা মানুষের ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। তাঁরা বুঝতে পারতেন, কার কিরকম সংস্কার। আবার পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ যারা তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে আসতো তাদের খুব ঘোরাতেন, আগ্রহ পরীক্ষা করবার জন্য। ঠাকুর নিজেও তাঁর শিষ্যদের অত্যন্ত বেছে বেছে, পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। ঠাকুর একটি অনবদ্য উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, বাইরে থেকে মানুষগুলি দেখতে একরকম হলেও সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণভেদে তাদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন পুলিগুলি দেখতে একরকম হলেও কোনটাতে ক্ষীরের পোর—অত্যন্ত সুস্বাদু ; কোনটাতে নারকেলের পোর—খেতে মন্দ নয়, আবার কোনটাতে কলাইডালের পোর—অত্যন্ত সাধারণ স্বাদের।

কেশবের তখন দল হয়েছে। তিনি সেই দলের নেতা—আচার্য। তাঁর মনে নেতৃত্বের ভাব এসেছে। সেই কথা মনে রেখে ঠাকুর বলছেন, 'আমার কি ভাব জানো ? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে। গুরু, কর্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তানভাব। মানুষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায় ?' অহংকারের লেশমাত্র তাঁতে ছিল না। যা কিছু তিনি করতেন সবই জগন্মাতার হাতের পুতুল হয়ে। তাই তিনি বলতেন, 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু'—'মা আমি কিছু নই, তুমিই এ যন্ত্রটার মধ্য দিয়ে সব কিছু করাচ্ছো।' এই ছিল তাঁর ভাব। সেইজন্য কেউ গুরু, কর্তা বা বাবা বললে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। 'আমি গুরু' এই ভাব তাঁর একদম ছিল না। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যেও আমরা এই ভাব দেখেছি। তাঁরাও কখনও বলতেন না, তাঁরা গুরু। তাঁরা বলতেন, ঠাকুরই গুরু, তিনিই সব।

কেশবের গুরুভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর আরও বলছেন, ঈশ্বর যদি আদেশ দেন, তবেই লোক-শিক্ষা হতে পারে। বলছেন, 'নারদ, শুকদেবাদির

আদেশ হয়েছিল। শংকরের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে?' যিনি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন, তাঁর কাছে যথার্থ জিজ্ঞাসুরা এসে উপস্থিত হন—ফুল ফুটলে মৌমাছিরা যেমন আসে। আর যারা আদেশ পায়নি, তাদের কাছে হুজুগে লোক এসে জোটে। তাই ঠাকুর কেশবকে বলছেন: কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়ো খুঁড়ছে।—বলে জল চাই। সেখানে পাথর হল তো ছেড়ে দিলে! আবার আর এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি পেলে তো ছেড়ে দিলে। অর্থাৎ তাদের নিষ্ঠা নেই—তারা ধর্মলাভের যথার্থ অধিকারী নয়।

আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর লোকশিক্ষা—এই ভাবটি ঠাকুর কেশবের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, 'মনে মনে আদেশ হ'লে হয় না। তিনি সত্যসত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হ'তে পারে। সে কথার জোর কত! পর্বত টলে যায়।' এই বলে হালদারপুকুরের সেই সুপরিচিত দৃষ্টান্তটি দিয়ে কেশবকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, লোকশিক্ষা দিতে গেলে চাপরাস চাই, তা না হ'লে হিতে বিপরীত হয়। আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহংকার হয়। ঈশ্বরই কর্তা—এটা ভুল হয়ে যায়। 'আমি কর্তা'—এই বোধ থেকেই নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। ঈশ্বরই কর্তা—তিনিই সব করছেন, এই বোধ যাঁর হয়েছে তিনি জীবন্মুক্ত। (১।২।৮)

গীতা—

আগের দিন [গীতার ৪।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে] আমরা উল্লেখ করেছি যে, যদি কোন কোন সাধক শ্রীভগবানের অবতারলীলা ধরতে না পারে, 'বীতরাগ ভয়ক্রোধ' হতে না পারে, যদি তাঁর ভাবে সম্পূর্ণ ভাবিত হতে না পারে, যদি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে অন্য দেবতার উপাসনা করে সকামভাবে, তাহলেও পরমকরুণাময় শ্রীভগবান তাদের জন্যও অভয়বাণী উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, সব পথ দিয়ে মানুষ তাঁরই দিকে যাচ্ছে এবং শেষে তারা তাঁকেই পাবে।

এখন শ্রীভগবান বলছেন, এমন মানুষই বেশী যারা এই জগতে মান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি চায় আর সেই বাসনায় তারা নানা দেবতার প্রসন্নতা লাভের জন্য যাগযজ্ঞ, পূজা, ব্রত ইত্যাদি করে। কেউ কোন দেবমন্দিরে হত্যা দিচ্ছে, মানত করছে, শীতলা-ষষ্ঠী-মনসা-পূজা করছে উদ্দেশ্যপূর্তির জন্য। তারা যদি সত্যিসত্যিই ভক্তিপূর্বক আন্তরিক হয়ে এই সব পূজাদি করে তাহলে শীঘ্র ফল পায়। এজগতে কাম্য কর্মের ফল শীঘ্র লাভ হয়। তাই মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করে। জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তির জন্য খুব কম লোকই ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁরই উপাসনা করে—এই কথাই শ্রীভগবান এখানে বলছেন। (৪।১২)

এরপর শ্রীভগবান বলছেন, মানুষের সমস্ত কর্মের পেছনে প্রেরণা তিনিই দিচ্ছেন। কিভাবে? না—তিনি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এখানে জন্মগত জাতির কথা বলা হচ্ছে না। অর্থাৎ যে যে-বংশে জন্মগ্রহণ করবে, সে সেই জাতিত্বই লাভ করবে—এমন কোন কথা নেই। সম্ভবতঃ মহাভারতের যুগে জন্মগত বর্ণের ব্যবস্থা ছিল না। কেউ যদি ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হন, তবে তিনি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ব্রাহ্মণই হবেন। আবার যদি কেউ ব্রাহ্মণকুলে জন্মেও ক্ষাত্রবৃত্তির অধিকারী হন, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বলেই গণ্য হবেন। শুধু তাই নয়, এখনও কোষ্ঠীর বিচারকালে জাতকের বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রবর্ণ নিরূপিত হয়। এই কোষ্ঠী-গণনার মধ্য

দিয়ে যথার্থ গুণকর্ম বোঝানোর চেষ্টা হয় এখনও। এবং এইটিই ঠিক, স্বামীজী বলেছেন। তাছাড়া তারও ওপরে গিয়ে সব মানুষকেই ব্রাহ্মণত্বে—ব্রাহ্মণের যে গুণ ও কর্ম তাতে উন্নীত করতে হবে, একথাও স্বামীজী বলেছেন। তাহলে শূদ্রের কাজ কে করবে? স্বামীজী বলেছেন—যন্ত্রে। আমরা আজ এতদিন পরে স্বামীজীর সে কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে দেখছি। দেখছি যন্ত্র কিভাবে মানুষের কত কাজ করছে। ভগবান বলছেন, এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি গুণকর্মানুযায়ী তিনি করলেও এই কর্মের দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট নন। তিনি অসংস্পৃষ্ট, 'অকর্তা'। এই কর্মজন্য তাঁর কোন শক্তিক্ষয় হয় না। তাই তিনি 'অব্যয়'। (৪।১৩)

তিনি মায়ামনুষ্য—'গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'—নর-রূপধারী ভগবান। এই তাঁর স্বরূপ। সেইজন্য কোন কর্মই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কোন কর্মফলের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা আকর্ষণ নেই। ভগবান বলছেন, তাঁর এই অনাসক্ত ও পরমাত্মস্বরূপটি যে জানে, তাকে কর্মবন্ধনে পড়তে হয় না। তিনি এই স্বরূপতত্ত্বটি বোঝাবার জন্যই অর্জুনকে উৎসাহিত করছেন, যাতে 'আত্মা অকর্তা, অভোক্তা'—এটি জেনে কর্ম করে অর্জুনও কর্মবন্ধনে বাঁধা না পড়েন। (৪।১৪)

আমি কর্তা নই এবং কর্মফলে আমার স্পৃহাও নেই এটি জেনে প্রাচীনকালে অনেক মুমুক্ষু কর্ম করে গেছেন। সমস্ত কর্ম করেও আমি যে নির্লিপ্ত, এটি জানার ফলে তাঁদেরও অহংকার—আমি কর্তা, এই বোধ—শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং এইভাবে কর্মযোগের দ্বারাই তাঁরা মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং হে অর্জুন, তুমিও ঐ-ভাবে কর্ম করো—যেমন তাঁরা করেছিলেন। শংকরাচার্য বলছেন, 'ন তুষ্ণীম্ আসনং, ন অপি সন্ন্যাসঃ কর্তব্যঃ'। অর্থাৎ অর্জুনের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কোনটাই উচিত নয়। অর্জুন কর্মেরই অধিকারী। তাই তাঁকে কর্মযোগ অবলম্বন করতে হবে—কর্তৃত্বের অহংকার এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে জনকাদি রাজর্ষিদের মতোই কর্ম করে যেতে হবে। (৪।১৫)

বিবিধ সংবাদ

রানাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব রানাঘাটের সন্নিহিত কলাই-ঘাটায় পদার্পণ করিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র মহাব্রত উদ্‌যাপন করেন। চূর্ণীনদীর তীরে কলাইঘাটার বুকে সেই মহাব্রতের সাক্ষী অক্ষয় বট আজও দণ্ডায়মান, আর সেই বটের ছায়ায় সেই দিনটির স্মরণে 'রানাঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ-পদার্পণ স্মারক সমিতি' ১৩ই এপ্রিল ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসবের আয়োজন করেন। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকার্তিক মোদকের উৎসাহ-উদ্যম এই উৎসবকে সাফল্য-মণ্ডিত করে। স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীশিবচন্দ্র পাল এই উপলক্ষে কলাইঘাটায় একটি নলকূপ স্থাপন করেন। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নরনারী দূরদূরান্ত হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের পক্ষ হইতে স্থানীয় শিশুদের খাদ্য ও দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র পদার্পণকে স্মরণ করিবার জন্য কলাইঘাটায় একটি স্মারক ফলক বসানো হয়। এই স্মারক ফলকের আবরণ উন্মোচন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। বৈকালে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী প্রভানন্দ, শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় এবং স্বামী জিতাত্মানন্দ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান-আয়োজনে শ্রীকালিকা বসুর উদ্যম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

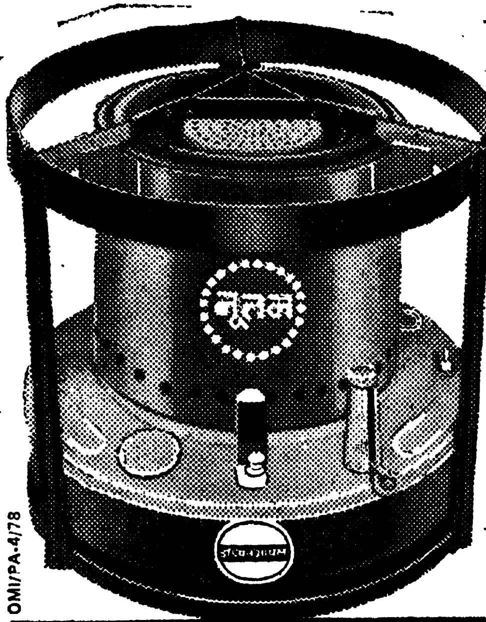
পাণ্ডু (গৌহাটী) বিবেকানন্দ পাঠচক্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহে ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ই ও ৭ই দুদিন রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন। ৭ই স্বামী মহানন্দ ও স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশাদি আলোচনা করেন। ৮ই ডঃ প্রবীণ-চন্দ্র শর্মা এবং স্বামী মহানন্দ দেশগঠনে স্বামীজীর অবদান সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ৯ই মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও ভোগরাগাদি হয়। স্থানীয় ভক্তগণ নামকীর্তন ও পালাকীর্তন পরিবেশন করেন। প্রায় ৭০০০ ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর স্বামী মহানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাবলী ভক্তবৃন্দের নিকট ব্যাখ্যা করেন

কোতরং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রমে গত ৯ই চৈত্র ১৩৮৬, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জয়ন্তী এবং আশ্রমের বার্ষিক উৎসব মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাত-ফেরি, বিশেষ পূজা, হোম, কথামৃতপাঠ ও হাতিবাগান 'দীনসঙ্ঘ' কর্তৃক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় এবং মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী আরতি সাহা ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। স্থানীয় কিশোর স্বেচ্ছাসেবকদের অনলস সেবা উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

দিনহাটা (কুচবিহার) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালনায় গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ ১৯৮০, দিনহাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ, 'শ্রীরাম-কৃষ্ণ সংগীতসমাজ' এবং ছায়াচিত্রপ্রদর্শক ও বক্তা শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস।

কসবা দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, স্থানীয় চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মতিথি স্মরণে সারাদিনব্যাপী উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কথামৃতপাঠ ও আরতির পর মধ্যাহ্নে দেড় হাজার ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং ভাষণ দেন স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ দমদম সাতপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাকীর্তন পরিবেশন করেন শ্রীশ্যামাপদ বসু রায়। রামায়ণ-গান পরিবেশিত হয় শ্রীদ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক। এই উপলক্ষে ৪ঠা এপ্রিল ১৯৮ একটি প্রভাতফেরি কসবা অঞ্চল পরিক্রমা করে।

ভাগলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক গত ৫ই ফাল্গুন ১৩৮৬, (১৮।২।৮০) শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাবতিথি-উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। এতদুপলক্ষে বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ হয়। সন্ধ্যায় বক্তৃতাদির শেষে সংগীতানুষ্ঠান হইয়াছিল। পরে প্রসাদ-বিতরণ হয়। ২৪।২।৮০ (রবিবার) শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করানো হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, দরিদ্রনারায়ণসেবা, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।


নূতন
OMI/PA-4/78

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৩·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫·০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০ ; ২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ২·৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫ মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব—পৃঃ ৩১, মূল্য ০·৮০

পুণ্যস্মৃতি—স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩·০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "স্কুলপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭২, মূল্য ২·০০

শঙ্কর-চরিত — শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২·৫০

দশাবতার-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ২·৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫·৯০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩·৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫·০০

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা — শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০·৭২

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447   MAY 1980   Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

আষাঢ় ১৩৮৭

৮২তম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা



"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৯৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্ত ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

নিবেদন

বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির অভূতপূর্ব অবনতি ঘটায়, গত কয়েক মাস যাবৎ পত্রিকা বহু বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যা ডাকে দেওয়া হয় ২৮শে ফাল্গুন; চৈত্র সংখ্যা ৩রা বৈশাখ; বৈশাখ সংখ্যা ৭ই জ্যৈষ্ঠ; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ৭ই আষাঢ়। ক্রমবর্ধমান এই বিলম্বের মূল কারণ হইল, বিদ্যুৎ-সরবরাহে নিদারুণ ঘাটতির জন্য প্রেসের কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হওয়ায় প্রেস নির্দিষ্ট দিনের বহু পরে ছাপার কাজ শেষ করিতেছে।

পত্রিকা বিলম্বে পাওয়ার জন্য গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা প্রতিদিনই অভিযোগপত্র পাই। তাঁহাদের, লেখকদের তথা পাঠকদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কটে আমরা নিরুপায়।

বিদ্যুৎ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই ক্রমবর্ধমান বিলম্বের কোনই প্রতিকার নাই।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

২৩শে আষাঢ়, ১৩৮৭ সম্পাদক

উদ্বোধন, আষাঢ়, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

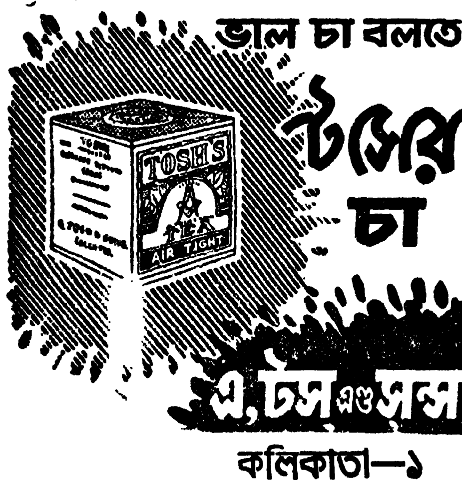
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়


ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ, টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১



৮২তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ়, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ় হইয়া আমাদের কর্ম করিতে হইবে। এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র 'অহং'-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম করিলে 'আমি ইহা করিতেছি—উহা করিতেছি' এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্যের লোকেরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বলে যে, যদি এই 'অহং' বোধ না থাকে, যদি ইহা বিলুপ্ত হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ম করিতে পারে? কিন্তু আমিত্ব-বোধ ত্যাগ করিয়া যোগযুক্ত চিত্তে কর্ম করিলে উহা অনন্তগুণ উৎকৃষ্টতর হইবে এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহা অনুভব করিয়া থাকিবে। আমরা খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে করি; অন্যান্য অনেক কর্ম জ্ঞাতসারে, আবার অনেক কর্ম ক্ষুদ্র আমিত্বের লোপে যেন সমাধিমগ্ন হইয়া করি। চিত্রকর যদি অহং-বোধ ভুলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রসমূহ আঁকিতে পারিবে। উত্তম পাচক যে-সকল খাদ্যবস্তু লইয়া কাজ করে, তাহাতেই সে সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অন্যান্য বোধসকল তিরোহিত হয়। এইরূপেই তাহারা তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। গীতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমস্ত কর্মই এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত হইয়া সমস্ত কর্ম করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেষণ করেন না; এইরূপ কর্মসম্পাদন দ্বারাই জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাঁহারা এইভাবে কর্ম করেন, তাঁহারা নিজের জন্য কখনও কিছু করেন না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১।১৬৭-৬৮]

কথাপ্রসঙ্গে

নিষ্কাম কর্ম

অনেক পরহিতব্রতী ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে নিঃস্বার্থভাবে দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাঁহারা 'নিষ্কাম কর্ম' করিতেছেন। 'নিষ্কাম কর্ম' - এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ এতই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও স্বীকৃত যে, ঐরূপ প্রয়োগে আপত্তিকর কিছু না থাকিলেও, যেহেতু যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান বা পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্ভব, সেইহেতু পূর্বোক্ত তথাকথিত নিষ্কাম কর্মীদের মধ্যে খুব কম লোকই পাওয়া যাইবে, যাঁহারা তাত্ত্বিক বিচারে নিষ্কাম কর্ম করিতেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে উপজীব্য করিয়া বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলিতেছেন: 'নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন। মনে করছি, নিষ্কাম কর্ম করছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না। আগে যদি সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ নিষ্কাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর-দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়।' (১।৮।৩)

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন: 'অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না ক'রে কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বরলাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জান না, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।' (ঐ, ১।১১।৪)

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন গলরোগে আক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন (১৪ই ফেব্রুআরি, ১৮৮৬) মধ্যাহ্নে সেবক নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে বিশ্ব-বিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ) গীতার 'কর্মযোগ' পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (পরবর্তী কালে কথামৃতকার 'শ্রীম') সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলেন—'পরমহংস অবস্থা না হলে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না।' (উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭, পৃঃ ২৪২-৪৩)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উপদেশেও আছে: 'গীতায় কর্মের কথা আছে—এই কর্ম দ্বারাই লোক মুক্ত হবে, নির্বাণলাভ করবে। কর্ম বড় কঠিন। Cool brain (ঠাণ্ডা মাথা), ত্যাগ-বৈরাগ্য খুব দরকার। তা না হলে ওতে ডুবতে হয়। সিদ্ধিলাভের পর প্রকৃতপক্ষে কর্মের অধিকারী হয়।' (ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ৮ম সং, পৃঃ ১৫৫)

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন: 'মহারাজ, সংসারে কি রকমে থাকতে হবে? নিষ্কামভাবে থাকাই তো উচিত?' উত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজ বলেন: "কি জান, নিষ্কাম-টিষ্কাম, ও খুব উঁচু কথা। সংসারে থেকে ওসব হয় না। লোকে যতই কেন ভাবুক না যে, আমি নিষ্কাম-ভাবে কাজ করছি, কিন্তু বাস্তবিক খতিয়ে দেখা যায় যে, কোন না কোন কামনার তাড়নায় কাজ করছি। তা হলেই হলো যে, নিষ্কাম কর্ম হয় না। তবে সংসারের কাজ করতে করতে তাঁর নিকট প্রার্থনা করতে হয়-'প্রভু, আমার কাজ কমিয়ে দাও।'" (ঐ, পৃঃ ৩৩)

এ পর্যন্ত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দের যে-সকল উক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 'ঈশ্বরলাভ না করলে ঠিক

অনাসক্ত হওয়া যায় না', 'ঈশ্বরদর্শনের পর অনায়াসে নিষ্কাম কর্ম করা যায়', 'পরমহংস অবস্থা না হলে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না', 'সিদ্ধিলাভের পর প্রকৃত-পক্ষে কর্মের অধিকারী হয়'—এই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এত স্পষ্টভাবে উক্ত না হইলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিতে এই একই প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

> 'খুঁটিটিকে বেশ শক্ত করে ধরে যত ইচ্ছা পাক খাও না কেন, কোন ভয় নেই। সেই রকম আগে তাঁকে জানতে হবে, তাঁকে জেনে খুঁটি জোর করে ধরে নিতে হবে। খুঁটি জোর করে ধরে নিয়ে যা করবে, সব ঠিক ঠিক হবে, কখনও বেচাল হবে না। তখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রভৃতির যে কোন রাস্তাতেই চল না কেন, নিজের ও দশের কল্যাণের স্বরূপ হবে, মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।' (ঐ, পৃঃ ৪৬—৭)
>
> "অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করব। আমার মনে হয় এ ভাবটি ইংরেজী শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম, কথাবার্তা, চালচলন, দেশের ও দশের মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বলতেন, 'বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, আগে খুঁটি পাকড়াও।' অর্থাৎ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ করা। আগে তাঁকে জানতে হবে, তাঁর পদে বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় করতে হবে, তারপর অন্য যে কোন কাজ করতে হয় কর। তাঁকে জেনে কর্ম করলে নিজের প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, অপরকেও শান্তি দেওয়া যায়।"
>
> (ঐ, পৃঃ ১১৭)

'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্টে 'শ্রীম' কর্মযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে-সকল বিস্তারিত মন্তব্য করিয়াছেন, সেগুলিতেও ঐ একই বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাসঙ্গিক দু-একটি উদ্ধৃতি—

> 'স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। ...তিনি যেন বলিলেন, হে জগদ্বাসীগণ, আগে বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, কিছুতেই দোষ নাই; স্বদেশের সেবা কর; ইচ্ছা হয় কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দোষ নাই; কেন না, তুমি তখন বুঝিতেছ যে সর্বভূতে তিনি আছেন—তিনি ছাড়া কিছুই নাই—সংসার, স্বদেশ তিনি ছাড়া নহে। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে তিনিই পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছেন।' (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)
>
> 'স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। তিনি নির্জনে গুরুর উপদেশে অনেকদিন সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ কর্মযোগের অধিকারী।' (অষ্টম পরিচ্ছেদ)

পরিশিষ্টের উল্লিখিত চতুর্থ ও অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীম সবিস্তারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁহাকে যে-কথা বলিয়াছিলেন—'পরমহংস অবস্থা না হলে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না'—তাহারই ভাষ্যস্থানীয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশে শ্রীম লিখিয়াছেন: 'এই নিষ্কাম ধর্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার (স্বামীজীর) পদানুসরণ করিতে পারি। কিন্তু এটি কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদ্মলাভ

করিতে হইবে। তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে। তবে এই অধিকার হইতে পারে।' অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যটি হইল: 'সিদ্ধপুরুষ অথবা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অবতার-পুরুষ না হইলে এই স্থিরতা[১] (Calmness) হয় না।'

এ পর্যন্ত যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির একবাক্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিপাদিত হইলেও, 'পরমহংস অবস্থা না হলে নিষ্কাম কর্ম করা যায় না'—নরেন্দ্রনাথের এই উক্তিটি স্পষ্টতম বলিয়া সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী মনে হয়। সে যাহাই হউক, পরমহংস অবস্থা না হইলে নিষ্কাম কর্ম কেন করা যায় না, এই বিষয়টি সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সাধারণ মানুষের কর্মের মূলে আছে (১) 'আমি কর্তা', এই অহংকার ও (২) ফলাকাঙ্ক্ষা। ইহারই ফলে আসে (৩) কর্মের প্রতি আসক্তি। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন এবং এই কারণে তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, তাঁহারা 'নিষ্কাম কর্ম' করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদেরও 'আমি কর্তা', এই অহংকার থাকে। আর এই অহংকার থাকার ফলেই তাঁহাদের ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মের প্রতি আসক্তি কখনো-কখনো আসিয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ অহংকারই মূল ব্যাধি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মাসক্তি ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। মূল ব্যাধিটি যদি দূর করা যায়, উপসর্গ দুইটিও আপনাআপনি চলিয়া যায়। এই অহংকার-প্রসঙ্গে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি:

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ (৩।২৭)

এই শ্লোকটির উপর শংকরাচার্য যে-ভাষ্য লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির অর্থ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। শ্লোকস্থ 'গুণ' শব্দটির অর্থ বিকার (পরিণাম)। প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহ। এই দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারাই যাবতীয় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে। তথাপি 'অহংকার-বিমূঢ়াত্মা' ব্যক্তি (যাহার 'আত্মা' অর্থাৎ অন্তঃকরণ অহংকারের দ্বারা নানাভাবে মোহগ্রস্ত) অবিদ্যাবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপ করিয়া নিজেকেই সমস্ত কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে।

কিন্তু যিনি পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অহংকার সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। মূল ব্যাধি দূর হওয়ায় ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মের প্রতি আসক্তি, এই দুই উপসর্গও দূরীভূত হইয়াছে। এবং এই কারণেই তাঁহার পক্ষেই নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব। এইরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি:

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ (৫।৮-৯)

তাৎপর্য এই যে, চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ-অপান প্রভৃতি বায়ু-সমূহ এবং মন-বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ-চতুষ্টয়ের দ্বারা যাবতীয় কর্ম করিয়াও সমাহিতচিত্ত, তত্ত্বজ্ঞ

১ ১৮৯৬ সালের ১০ই নভেম্বর, লণ্ডনে Practical Vedanta সম্বন্ধে স্বামীজী যে-বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে গীতার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, কর্মের রহস্য হইল প্রচণ্ড কর্মের মধ্যেও অনন্ত স্থিরতা। শ্রীম সেই বক্তৃতা হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়া উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'এই স্থিরতা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যক্তির এই দৃঢ় ধারণা থাকে যে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ঐ সকল কর্ম করে এবং তিনি মনে করেন[২]—'আমি কিছুই করি না।'

গীতার এই শ্লোক দুইটি পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার গল্পটি মনে পড়ে। ব্যাসদেব যমুনা পার হইবেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তাঁহারাও পার হইবেন, কিন্তু খেয়া নাই। গোপীদের চিন্তিত দেখিয়া ব্যাসদেব বলিলেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত। গোপীরা তাঁহাকে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াইলেন। তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তাহলে তোমার জল দু ভাগ হয়ে যাবে আর মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।' ঠিক তাহাই হইল। যমুনার জল দুই ধারে সরিয়া গেল এবং ব্যাসদেব ও গোপীরা মাঝপথ দিয়া ওপারে গেলেন। (কথামৃত, ২।৮।২, ৩।১২।২)

গল্পটি বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব মন্তব্য করিতেছেন : "'আমি খাই নাই' তার মানে এই যে, আমি সেই শুদ্ধাত্মা; শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত; প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই। জন্ম, মৃত্যু নাই।—অজর অমর সুমেরুবৎ। যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মুক্ত। সে ঠিক বুঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না।"

(ঐ, ৩।১২।২)

জ্ঞানী ব্যক্তির 'আমি কর্তা', এই অহংকার না থাকায়, তাঁহার পক্ষেই নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব। আমি যদি কর্তা না হই, অর্থাৎ সহস্র কর্ম করিয়াও যদি কর্মেরই সহিত আমার কোন সংস্রব না থাকে, তাহা হইলে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা বা কর্মে আসক্তি আমার কী করিয়া থাকিবে?

জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তেরও এই পরমহংস অবস্থা লাভ হয়। অর্থাৎ, তাঁহারও 'আমি কর্তা', এই অহংকার থাকে না। 'কথামৃতে' আমরা দেখি, জীবন্মুক্ত ভক্তের ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বারংবার বলিতেছেন : 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু—আমি কর্তা নই, তুমি কর্তা', 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী : আমি গাড়ী, তুমি ইনজিনীয়ার—যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি' ইত্যাদি। বস্তুতঃ পরা ভক্তি লাভ করায় যাঁহার অহংকার এইভাবে নির্মূল হইয়াছে, তাঁহার পক্ষেই 'নিষ্কাম কর্ম' করা সম্ভব—সাধারণ ভক্তের পক্ষে নহে।

এখন প্রশ্ন এই যে, কেবলমাত্র সিদ্ধব্যক্তির দ্বারাই যখন নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব—সাধারণের পক্ষে যখন উহা সম্ভবই নহে, তখন আর 'নিষ্কাম কর্ম' করার প্রহসন কেন? ইহার উত্তর এই যে, সিদ্ধব্যক্তি যে-আচরণ করেন, সাধকদেরও তাহাই অনুসরণীয়। এবং ঐরূপ করার ফলে কালে সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করেন। এইজন্যই গীতায় নিষ্কাম কর্মের উপদেশ করা হইয়াছে এবং স্বামীজীর তো কথাই নাই, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণও নিষ্কাম কর্মকে ভগবৎ-প্রাপ্তির একটি উপায় বলিয়াছেন।

গীতাভাষ্যে শংকরাচার্য একাধিকবার লিখিয়াছেন যে, কর্মযোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি 'আমি কর্তা, কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি'—এই বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন। (গীতা, ৩।৩০,

---

২ মূলে 'মন্যেত' আছে। উহার আক্ষরিক অর্থ : 'মনে করিবেন'। শংকরাচার্যও ঐরূপই অর্থ করিয়াছেন : 'চিন্তয়েৎ'—'চিন্তা করিবেন'। আমরা শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকা অনুযায়ী 'মনে করেন' (মন্যতে) অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বস্তুতঃ ছন্দের প্রয়োজনেই 'মন্যতে'র স্থলে 'মন্যেত' প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৫।১০, ,১ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। এইভাবে কর্ম করিতে করিতে পরিশেষে 'আমি কর্তা', এই অহংকার দূর হইয়া যায় এবং শ্রীভগবানই কর্তা ও কারয়িতা, এই বোধ উৎপন্ন হয়। এইরূপ শরণাগত ভক্তের পক্ষে তখন ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয়।

যাঁহারা জ্ঞানপথের পথিক, তাঁহারা অন্যভাবে অহংকারকে দূর করেন। 'প্রকৃতির পরিণাম, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই যাবতীয় কর্ম কৃত হইতেছে, আমি অকর্তা আত্মা'—এই বুদ্ধি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন।[৩] এই বুদ্ধি পরিপক্ব হইলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ হয় এবং তখনই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম করা সম্ভব হয়। ভক্তিমার্গী ও জ্ঞানমার্গী উভয়বিধ সাধককেই গীতোক্ত (১৮।২৬) 'সাত্ত্বিক কর্তা' হইতে চেষ্টা করিতে হয়, 'অনহংবাদী' হইতে হয়, অর্থাৎ 'আমি করছি', 'আমি করেছি', এই ধরনের কথা তাঁহাদের মুখে শোভা পায় না।

আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করিব। নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গে আমরা ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মের প্রতি আসক্তির কথা একাধিকবার বলিয়াছি। গীতায় ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের কথা সুবিদিত। কিন্তু কর্মের প্রতি আসক্তির কথা কোথায় বলা হইয়াছে ?—এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়, গীতার শেষ অধ্যায় (অষ্টাদশ) পরিশিষ্টস্থানীয়। অন্যান্য অধ্যায়ে অনুক্ত অনেক কথা ঐ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ (১৮।৬)

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এবং ঐ সকল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া করণীয়—ইহাই শ্রীভগবানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত

সাত্ত্বিক ত্যাগের প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিতেছেন :

কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ (১৮।৯)

অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম অবশ্যকরণীয়-বোধে কৃত হইলেই 'সাত্ত্বিক ত্যাগ' হয়।

অব্যবহিত পরবর্তী শ্লোকেও (১৮।১০) ফলাসক্তি ও কর্মাসক্তির কথা আছে।

'ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ' (১৮।৪)—এই শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় শংকরপ্রমুখ আচার্যগণ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কথিত তামস (১৮।৭), রাজস (১৮।৮) ও সাত্ত্বিক (১৮।৯), এই ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য রামানুজ উল্লিখিত শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় (১) কর্মে ফলবিষয়ক ত্যাগ, (২) কর্মবিষয়ক ত্যাগ অর্থাৎ কর্মে আসক্তি বা মমতা ত্যাগ এবং (৩) পরমেশ্বরে কর্তৃত্বানুসন্ধানের দ্বারা নিজের কর্তৃত্বত্যাগ—এই ত্রিবিধ ত্যাগের উল্লেখ করিয়াছেন। রামানুজের মতে গীতার 'কর্মযোগ' অধ্যায়েও (তৃতীয় অধ্যায়) 'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য' ইত্যাদি শ্লোকটিতে (৩।৩০) এইপ্রকার ত্রিবিধ ত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে।

কর্মে আসক্তি ত্যাগের তাৎপর্য হইল—অনেক সময়ে কর্ম করিতে করিতে আমরা উহাতে আসক্ত হইয়া পড়ি, আমরা সেই কর্ম ছাড়িতে চাই না। কিন্তু সাধকদের পক্ষে এইভাবে কর্মে জড়াইয়া পড়া উচিত নহে—কর্মের প্রতি মমতা তাঁহাদের একান্ত পরিত্যাজ্য।

৩ অবশ্য শংকরাচার্যের মতে সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানমার্গী সাধক এবং ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ ব্যতীত তাঁহাদের কোনও লৌকিক বা শাস্ত্রীয় (শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে) কর্ম নাই।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

স্বাগত-ভাষণ—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

৫ই এবং ৬ই এপ্রিল (১৯৮০) প্রায় সারাদিন ধ'রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যাঁরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ বিশাল বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এত বিভিন্ন দিকে এঁদের চিন্তাধারা প্রবাহিত যে, এঁদের চিন্তাগুলি নিয়ে পুস্তকের পর পুস্তক রচিত হতে পারে, ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা এখানে এই দু'দিন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করবো।

যাঁরা ভগিনী নিবেদিতার 'স্বামীজিকে যেরূপ দেখিয়াছি', এই গ্রন্থখানি পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন যে, বুদ্ধির কী গভীরতা এবং ব্যাপকতা নিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের তথা বিশ্বের ধর্মজীবনে একটা বিপুল পরিবর্তন সাধন করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁরা একটা নতুন ধর্মীয় চিন্তার প্লাবন নিয়ে এসেছিলেন, যে মহাপ্লাবনের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেটা সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছ্বসিত ক'রে মুক্তিমুখে নিয়ে যাবে।

কেবলমাত্র 'হরিনাম করো' বা 'কৃষ্ণনাম করো'—এইটুকু ব'লে তাঁরা শেষ ক'রে দেননি, কেননা তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল স্বাধীনচিন্তার যুগে। আমরা জানি, যে 'নবজাগরণ' ইটালিতে চতুর্দশ শতাব্দীতে সূচিত হয়েছিল এবং তারপরে যে 'সংস্কার'-যুগে এসেছিল তাতে ইউরোপের ধর্ম একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। স্বাধীনচিন্তার অবকাশ ইউরোপে ছিল না। যা চার্চ বলবে, সেইটাকে মেনে নিতে হবে—এই ছিল কথা। চার্চ বলছে—পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে, সেটাই মানতে হবে, নইলে গ্যালিলিওর মতো জেলখানায় যেতে হবে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই যুগে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল। তারপর অষ্টাদশ শতাব্দীকে অতিক্রম ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর যে-যুগে আমরা এলাম সেটা ছিল স্বাধীনচিন্তার যুগ।

কাজেই সে-যুগে যদি আমরা ধর্মকে কতগুলি মতবাদ হিসাবে, dogma হিসাবে প্রচার করতাম, তাহলে সে-ধর্ম গ্রাহ্য হতো না। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দ তা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদের তাঁর কাছে ডেকেছিলেন, তাঁরা খৃষ্ট যুগের মতো জেলেমালো ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। শিক্ষালাভের পরে তাঁরা এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। বিশেষ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ—তখনকার নরেন্দ্রনাথ—তিনি ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর, প্রখর বুদ্ধিশালী। তিনি সমস্ত জিনিসকে যাচাই ক'রে নিতে চাইতেন এবং সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণকেও পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং তাঁকে দেখাতে হয়েছিল যে, বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ধর্মের তত্ত্ব যাচাই করে নিয়ে এবং অপরোক্ষ অনুভূতি ক'রে প্রদীপ্ত বুদ্ধিশিখা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সারা পৃথিবীতে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবধারা প্রচার করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এবং স্বামী বিবেকানন্দের—বিশেষ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের—লেখমালার সঙ্গে পরিচয়লাভ করলে আমরা দেখতে পাবো যে, এমন চিন্তার বিষয় নেই, এমন কোন বিষয়বস্তু নেই, যা নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বিজ্ঞান নিয়ে স্বামীজী আলোচনা করেছেন। লোকে বলে, স্বামী বিবেকানন্দ যে-

বিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন, সে-বিজ্ঞান এ-যুগের বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু স্বামীজীও সেই কথাই বলে গেছেন—বিজ্ঞানের যে সব থিয়োরী, সেগুলি পরিবর্তনশীল, সেগুলির পরিবর্তন হবে —যেটা Whitehead বলেছেন, 'Science is more changeable than theology.' কিন্তু বিজ্ঞানেও একটি বস্তু আছে, যার পরিবর্তন হয় না। সেই বস্তুটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক প্রয়োগপদ্ধতি। সেই নিয়ে আলোচনা হবে। এইভাবে বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তত্ত্ব, এবং politics যেটাকে স্বামীজী সমাজনীতি বলতেন—এই সমস্ত তত্ত্ব নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ আলোচনা করেছেন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি,—এমন কোন বিষয় নেই, যেটা স্বামীজী আলোচনা করেননি এবং যার উপর নতুন আলোকসম্পাত করেননি—যে আলোকসম্পাত এখন পর্যন্ত কার্যকরী। এখনও সেই আলোকসম্পাতকে নিয়েই আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। এবং আরও যতই আমরা এগিয়ে যাবো, দেখবো যে স্বামীজী যেগুলি বলেছেন, সেই-গুলিই ঠিক; কেননা স্বামীজী তাঁর অনুভূতির উপরে, সর্বজ্ঞত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সেইজন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন করবার আমরা আয়োজন করেছি। এ বিষয় আমার সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল, কেননা আমাদের জায়গা অপরিসর; এখানে বহু লোককে ডেকে, বহু লোককে আহ্বান করে আমরা জায়গা দিতে পারবো না। সেইজন্য আমরা এটার ব্যাপক প্রচার করিনি। এই আয়োজন সম্ভব হয়েছে ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ জলধিকুমার সরকার এঁদের উৎসাহে এবং উদ্যমে আর আমাদের সন্ন্যাসী যাঁরা আছেন—স্বামী ধ্যানানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ প্রভৃতি তাঁরাও এর জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এঁদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছে। দেখা যাবে এর পরে আবার কিছু করা যায় কিনা। আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা যে-যুগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা একটি তমিস্রাময় যুগ। এই তমিস্রাময় যুগকে অতিক্রম করতে হবে। এবং তা করতে হলে ভারতেতর দেশের মতবাদ, জীবন-ধারা, জীবনচর্যার ভেতর দিয়ে গেলে হবে না, ভারতীয় জীবনের যে ভিত্তিভূমি তাকে অবলম্বন করতে হবে। ধর্মবিষয়েই হোক বা অন্য কোন বিষয়েই হোক, সেই ভিত্তিভূমি আমরা পাবো রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে। সেই নিয়ে আলোচনা হবে।

প্রথমে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের বাণী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করবেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেম-বল্লভ সেন। তার আগে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ যিনি আজ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন, তিনি দু-চারটে কথা বলবেন। তাঁর আশীর্বাণীর পর প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা শুরু হবে।

সমাগত সুধীবৃন্দকে আমি সাদর স্বাগত-অভিনন্দন জানাচ্ছি।*

---

* ৫ই এপ্রিল ১৯৮০ প্রাতে, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন

উদ্বোধনী ভাষণ—স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের রসিক সুধীবৃন্দ! আজকের এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে আপনাদের জানিয়েছেন।

'সাহিত্য' ব্যাপক শব্দ। এর বিষয়, এর পরিধি বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য হতে পারে। আমাদের এই সম্মেলনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা হবে। যাঁরা প্রবন্ধ পড়বেন এবং যাঁরা আলোচনা করবেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য থেকে অনেক বিষয় জানতে পারবো।

কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে চিন্তাজগতে যেন একটা নবযুগের সৃষ্টি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাবে হয়েছে। একথা এখন হয়তো আমাদের ভাল ক'রে উপলব্ধ হয়নি। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত, স্বামীজীর অনুরাগী কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারার মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, বুদ্ধিসহায়ে সেগুলি বোঝবার চেষ্টা আমরা অনেকেই এখনো হয়তো ভাল ক'রে করিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা। একজন বলছেন, 'আমি শুধু ভক্তি চাই, জ্ঞান চাই না।' তার উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'যাকে ভক্তি করবি তাকে না জানলে কি ক'রে ভক্তি করবি?' 'জানা' অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা। এটি দরকার। এবং এই বুদ্ধিসাহায্যে বোঝা যখন কাগজে-কলমে বের হয়, তখন তাকে বলি সাহিত্য। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য বলতে আমরা হয়তো বুঝবো আধ্যাত্মিক সাহিত্য মাত্র। কিন্তু ঠিক তা নয়। এই সাহিত্য থেকে কোন বিষয় বাদ পড়েনি—যে-কথা স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী একটু আগেই বলছিলেন। স্বামীজীর যে বিশাল কৃতি রয়েছে, তার ভেতরে এমন বহু জিনিস রয়েছে যা আমরা এখনও ভাল ক'রে বোঝবার, আলোচনা করবার অবসর পাইনি; এবং যতই সেগুলির গভীর অনুশীলন হবে, ততই দিনে দিনে তাদের মর্ম আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে একদিন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, 'ঠাকুরের এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যেতে পারে।' বন্ধুটি বললেন, 'আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না—তাঁর কোন একটা কথা ঐভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?' তখন স্বামীজী ঠাকুরের 'হাতি-নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ'-এর গল্পটি ব্যাখ্যা করলেন তিন দিন ধ'রে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেই তিন দিনের ব্যাখ্যা সংগৃহীত হয়নি। টেপ রেকর্ডিং তখন ছিল না—অন্যভাবেও তাঁর অনেক কথাই সংগ্রহ করা হয়নি, কিন্তু যেটুকু সংগৃহীত হয়েছে তা-ও কম উল্লেখযোগ্য সম্পদ নয় আমাদের।

'রামকৃষ্ণ' 'বিবেকানন্দ'—এই দুটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। স্বামীজীর বাণী শ্রীরামকৃষ্ণেরই বাণী। স্বামীজী বলেছিলেন, তাঁর কথার ভেতর যা কিছু জগতের কল্যাণকর, সে-সবই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, আর যদি কিছু দোষযুক্ত থাকে, তা তাঁর নিজেরই। স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কথার ভাষ্য করে গেছেন, একথা আমরা অনেকেই ভাল ক'রে বুঝতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি আধুনিক দৃষ্টিতে প্রায়-নিরক্ষর, তাঁর কথার ভেতর এত দার্শনিকতা, এত তত্ত্ব, এত গভীরতা থাকতে পারে, তা হয়তো আমরা ভাল ক'রে ভাবিনি। আমরা ভক্তি করেছি, ফুল দিয়ে পূজা করেছি, অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করেছি, কিন্তু তাঁর কথার মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে আমাদের বুদ্ধিকে তত কাজে লাগাইনি। আমাদের বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রত্যেকটি কথার যথার্থ মর্ম অনুধাবন করতে হবে—এই কথাটি বিশেষ ক'রে ভেবেই হয়তো এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এই সম্মেলনে যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করবেন, যাঁরা আলোচনা করবেন, তাঁরা কৃতী ও খ্যাতিমান লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক। তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শুনতে পাবো। সেগুলি শোনা ও অনুশীলন করা—মনে মনে ভাল ক'রে আলোচনা করা, যাকে মনন বলে, তা করতে হবে। সেগুলি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। এ-সব বিষয়ে এই হচ্ছে নিয়ম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাগুলি যেন উপনিষদের কথা। একদিন শ্রীম—মাষ্টারমশাই—বসে আছেন অনেকগুলি ভক্ত-পরিবৃত হয়ে। অনেকগুলি শ্রোতা সেখানে—ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলছে। একজন ভক্ত বললেন, 'একটু উপনিষদের কথা বলুন।' মাষ্টারমশাই সুন্দরভাবে উপনিষদের কথা বলতেন। তাই বোধ হয় ভক্তটি ঐ কথা বললেন। মাষ্টারমশাই তার উত্তরে বললেন, 'এই তো উপনিষদেরই কথা হচ্ছে গো!'—'উপনিষদং ভো ব্রূহি ইতি; উক্তা তে উপনিষদ্; ব্রাহ্মীং বাব তে উপনিষদম্ অব্রূম ইতি' শিষ্য বলছেন, 'হে আচার্য, আমাকে উপনিষদ্ বলুন।' ঋষি, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার কথাই বলছিলেন, বললেন, 'তোমাকে উপনিষদ্ বলেছি; ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্‌ই তোমাকে বলেছি।'

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বেদেরই কথা। তাঁর জীবনই বেদ। তিনি বেদস্বরূপ। আর স্বামীজী হচ্ছেন সেই বেদের ভাষ্যকার। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আমাদের বুদ্ধিগম্য করেছেন। সে-বাণী যাতে আমরা বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করতে পারি, এমনভাবে তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন।

স্বামীজী তাঁর সমস্ত জীবন এইভাবে ব্যয়িত করলেন! তাঁর জীবন আপাতদৃষ্টিতে খুব সীমিত—চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। এই অল্পকালের মধ্যে তিনি যে-আদর্শ, যে-চিন্তাধারা, যে-সূত্রগুলি দিয়ে গিয়েছেন, তা বুঝতে এবং কাজে পরিণত করতে দীর্ঘকাল লাগবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝতে হ'লে স্বামী বিবেকানন্দকে বোঝা দরকার। স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে হ'লে তাঁর বাণীর মূল উৎস শ্রীরামকৃষ্ণকে না বুঝলে হবে না। পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ এই দুজনের নাম একসঙ্গে ক'রে তাঁদের সাহিত্যের যে-অনুশীলন এখানে হবে, তা আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হবে। যাঁরা এই বিষয়ে আলোচনা করবেন, তাঁদের আমি আগে থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাঁরা এখানে উপস্থিত থাকবেন, তাঁদের আমি অনুরোধ করছি তাঁরা কথাগুলি শুধু শুনে যাবেন না—সেগুলি মনন করবেন এবং ধ্যান করবেন।

এই সম্মেলনে যে-সাহিত্যকথা হবে, তা যেন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে এবং জীবনকে যেন নতুনভাবে পরিবর্তিত করে। আমরা আমাদের জীবনকে যেন সার্থক করতে পারি এবং চিন্তার জগতে যেন একটা নবযুগের আবির্ভাব হয়

অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের

মধ্যে হয়তো বা এক বিশাল মহীরূহের বীজ নিহিত রয়েছে। আমরা আশা করবো, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের কৃপায় সেই বীজ একদিন ফুলে ফলে সুশোভিত মহীরুহরূপে শুধু আমাদের এই ভারতেরই নয়, সমগ্র জগতের কল্যাণ করবে।*

* ৫ই এপ্রিল ১৯৮০ প্রাতে, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত।

শ্রীসারদাষ্টকম্

ব্রহ্মচারিনির্ভয়চৈতন্যবিরচিতম্

আব্রহ্মকীটবিলসজ্জগদেকমাতা
স্নেহপ্রসন্ননয়নোজ্জ্বলচন্দ্রবক্ত্রা।
আবির্বভূব খলু যা জয়রামবাট্যাং
তাং সারদাং হিতকরীং শরণং প্রপদ্যে ॥১

বাল্যাদ্‌গুণৈঃ সকলচিত্তবিনোদিনী যা
দীনার্তসংকটবিমোচনতৎপরাভূৎ।
সেবাং গুরৌ বিদধতীং বিমলৈকচিত্তাং
তাং সারদাং হিতকরীং শরণং প্রপদ্যে ॥২

শ্রীরামকৃষ্ণদয়িতা পরমপ্রসন্না
নিত্যং বিশুদ্ধমনসা বিহিতং দধানা।
পিত্রালয়ে স্থিতবপুঃ পতিলগ্নচিত্তা
শ্রীসারদা শুভময়ী শরণং মমাস্তু ॥৩

লব্ধ্বাথ ভর্তৃভবনং পতিপূতসঙ্গা
কর্তব্যপালনবিধৌ পরিশিক্ষিতা যা।
সেবাক্ষমাধৃতিতপোনিপুণাং বরেণ্যাং
তাং সারদাং ব্রতপরাং শরণং প্রপদ্যে ॥৪

শ্রীষোড়শী বহুমতোঽমযোগগম্যা
শক্তিঃ পরেতি চ ধিয়া দৃঢ়সাধকেন।
ভর্ত্রার্চিতা জগতি যা বিগতস্পৃহেণ
তাং সারদাং শুভকরীং শরণং প্রপদ্যে ॥৫

ভর্তুশ্চ যা প্রিয়করী গিরিজেব শম্ভোঃ
সেবাপরেব কমলা সুখদা চ বিষ্ণোঃ।
সাধ্বীং শচীমিব হি গৌরবমাবহন্তীং
তাং সারদাং বহুগুণাং শরণং প্রপদ্যে ॥৬

মর্ত্যং বপুস্ত্যজতি ভর্তরি কালযোগাৎ
সন্ন্যাসিবৃন্দপরমার্চিতপাদপদ্মা।
সঙ্ঘস্থসর্বজননী বিদিতা জনৈর্যা
তাং সারদাং সকলমঙ্গলদাং প্রপদ্যে ॥৭

জ্বালাময়ে জগতি যাঽমৃতদা বচোভিঃ
দুঃখাত্যয়ং বিদধতী নিয়তং জনানাম্।
কারুণ্যসিন্ধুজবিশালতরঙ্গকল্পা
সা সারদা ভগবতী শরণং মমাস্তু ॥৮

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের বাণী

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

আজ এই সুধীজন-সম্মেলনে যে দুরূহ কর্তব্য-ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা যেমন আমাকে বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত করিয়াছে তেমনি আমাকে একটি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের কোন্ বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সুগভীর চিন্তাশীলতার প্রয়োজন। প্রথমেই যদি অকপটে এই স্বীকারোক্তি করি যে, আমার সে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা নাই, তবে তাহা নিতান্ত বিনয়প্রকাশের জন্য করিতেছি না। তৎসত্ত্বেও যে এই অত্যন্ত কঠোর দায়িত্ব বহন করিবার জন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি তাহার কারণ এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমার প্রবল অনুরাগ। সত্যের অনুসন্ধানে ও তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মেধার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অনুরাগের অচঞ্চল আলোকও বোধহয় সম্পূর্ণ বর্জনীয় নহে। অনুরাগের অবিচলিত দীপশিখা সম্ভবতঃ সত্যের বিশাল ব্যাপ্তির কোন কোন ক্ষেত্রকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে, যাহা হয়তো অনুরাগহীনতার ব্যস্ত অনুসন্ধানে উপেক্ষিত হইতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে স্মরণ করিয়াই আমি এই পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য আলোচনাকালে আমি কেবল সেই সাহিত্যকেই বিষয়রূপে গ্রহণ করিব, যাহা শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মুখনিঃসৃত অথবা লেখনীনিঃসৃত। সাহিত্য বলিতে আমরা সাধারণতঃ লিখিত গ্রন্থই বুঝিয়া থাকি। সেদিক হইতে দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সাহিত্য রচনা করেন নাই। কারণ তাঁহার লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু কেবল লিখিত গ্রন্থই কি সাহিত্য? বেদ ও উপনিষদের ন্যায় বিরাট সাহিত্য কি প্রথম হইতেই লিখিত রূপ গ্রহণ করিয়াছিল? কবিগানের কবির দল আসরে আসিয়া মুখে মুখে যে কবিতা রচনা করিতেন, মুখে রচিত বলিয়াই কি তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবে না? বাস্তব ক্ষেত্রে বেদ, উপনিষৎ ও কবিগান মুখে মুখে রচিত হইলেও সাহিত্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ যদি সাহিত্য-গুণান্বিত হয়, তবে তাহাকেও সাহিত্য বলিতে হইবে। সে বিচারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রীরামকৃষ্ণ-রচিত সাহিত্যের অনুপম নিদর্শন। বিবেকানন্দের সাহিত্য লইয়া এ-জাতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই। কারণ তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও পত্রাবলী এবং বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য সর্বজনস্বীকৃত।

এইবার উপরি-উক্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগসৃষ্টির প্রেরণারূপিণী কোন্ কোন্ বাণী প্রচারিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে ও পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগসন্ধির কাল। এই যুগে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগের ফলে এক দেশ হইতে অপর দেশের স্থানগত দূরত্বের বাধা বহুলাংশে অপসৃত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের মানুষ এইজন্য পরস্পরের নিকটবর্তী হইতেছিল এবং একজাতির সহিত অপর জাতির ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু স্থানগতভাবে

মানুষ যদিও মানুষের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেছিল, তবু মানুষে মানুষে হৃদয়ের দূরত্ব দূর হয় নাই। বরঞ্চ একদেশের মানুষ অপর দেশে উপস্থিত হইয়া অস্ত্রবলে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল এবং সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া মানুষের উপর নির্যাতন ও শোষণের কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনা করিতেছিল। মানুষে মানুষে এই সংঘাত কেবল সাংসারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ভাবের জগতেও ঘৃণা ও বিদ্বেষের অভিযান মসীলিপ্ত অধ্যায় রচনা করিতেছিল। কিন্তু মানুষের ইতিহাস যেমন কেবলমাত্র প্রেম ও সহযোগিতার ইতিহাস নহে, সেইরূপ তাহা কেবলই সংগ্রাম ও সংহারের ইতিবৃত্তও নহে। একদিকে সংগ্রাম ও অপরদিকে সহযোগিতা, একদিকে প্রেম ও অপরদিকে হিংস্রতা মানুষের ইতিহাসে চিরন্তন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মানুষে মানুষে নৈকট্যের বিস্তার মানুষে মানুষে শত্রুতাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়াই মানুষের শুভবুদ্ধি মানুষের সম্প্রীতির প্রসারকে একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ এমন আদর্শের সন্ধান করিতেছিল, যাহার বাস্তব রূপায়ণ মানুষের পরস্পরকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তিকে সংযত করিবে। মানুষ এমন বাণীর সন্ধান করিতেছিল, যাহা তাহাকে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে অনুপ্রাণিত করিবে।

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম এইরূপ ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও ইসলামধর্ম বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ধর্মের ইতিহাসেও সশস্ত্র সংগ্রাম ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। বিধর্মীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য খৃষ্টান জগতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টের মধ্যে ত্রিশ বৎসর সংগ্রাম চলিয়াছিল। এক হাতে তরবারি ও অপর হাতে কোরান লইয়া ইসলামের অভিযানে ইরাণ প্রভৃতি দেশে পূর্ববর্তী ধর্মকে (জরথুস্ত্রের ধর্ম) রক্তস্রোতে বিলুপ্ত করিয়া ইসলামের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। খৃষ্টানে মুসলমানে ধর্মযুদ্ধ বা crusade দীর্ঘকালব্যাপী রক্তপাতের ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীতে এ-জাতীয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ধর্মে ধর্মে না ঘটিলেও ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষের অভাব ছিল না এবং এক ধর্মের বেদী হইতে অপর ধর্মের উপর অজস্র কটূক্তি ও অভিশাপ বর্ষিত হইত। অখৃষ্টানকে খৃষ্টান করিবার ও অমুসলমানকে মুসলমান করিবার উৎসাহ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তবুও উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের ক্ষেত্রে মিত্রতাস্থাপনের প্রচেষ্টারও সূত্রপাত হইয়াছিল। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে ম্যাক্সমূলার প্রমুখ পণ্ডিতগণ ধর্মে ধর্মে সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন।* ধর্ম যে-দেশের জাতীয়-জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সেই ভারতবর্ষেও একাধিক মনীষীর চিন্তা ও কর্ম এই প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করিয়াছিল।

রামমোহন একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির নিরাকার উপাসনাকে আশ্রয় করিয়া খৃষ্টান, মুসলমান ও তাঁহার উদ্ভাবিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মকে মিত্রভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিতান্ত অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যে এ ভাবের চর্চা হইয়াছিল।

---

* তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পথিকৃৎ এই মহামনীষী ধর্মের ইতিহাসে রামকৃষ্ণের স্থান সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন—'…the real presence of the Divine in nature and in the human soul was nowhere felt so strongly and so universally as in India, and…the fervent love of God, nay the sense of complete absorption in the Godhead, has nowhere found a stronger and more eloquent expression than in the utterances of Ramakrishna…' —সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ২০১

অপরপক্ষে সাকারোপাসনার প্রতি রামমোহন খড়্গহস্ত ছিলেন। প্রথমে নিম্নাধিকারীর পক্ষে সাকারোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও পরবর্তী কালে হিন্দু সাকারোপাসনাকে তিনি ধর্মজগতের সর্বাপেক্ষা গর্হিত পাপ বলিয়া প্রচার করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী এই হিন্দু সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে অবিমিশ্র ঘৃণা-প্রকাশকে তাঁহাদের ধর্মসাধনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, তুলসীদাস প্রমুখ সিদ্ধ সাধকসাধিকাগণের অনুসৃত ভক্তিধর্মের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। ধর্মক্ষেত্রে উদারতা, গ্রহণশীলতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের নবযুগসৃষ্টির যে-প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত মনীষীগণের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজিয়া পাইল না। এই আংশিক সহানুভূতি ও খণ্ডিত দৃষ্টি সকল ধর্মমত ও সকল ধর্মসম্প্রদায়কে সমমর্যাদাদানে প্রস্তুত ছিল না বলিয়া ধর্মে ধর্মে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের অবসান ঘটাইতে ইঁহারা ব্যর্থ হইয়াছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গ-কথামৃতে বহুল-প্রচারিত শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মন্ত্র এ কার্যসাধনে যথার্থ পথপ্রদর্শন করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁহাকে লাভ করিবার পথও তেমন অনন্ত। কোন একটি বা দুইটি ধর্মের মাধ্যমেই যে তাঁহাকে পাওয়া যায়, ঈশ্বরকে এত ক্ষুদ্র করিয়া তিনি দেখেন নাই। যাহারা কেবল একটি-মাত্র ধর্মকে সত্য বলে ও অপর সকল ধর্মকে মিথ্যা বলে, তাহাদের বুদ্ধিকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' আখ্যা দিয়াছিলেন এবং তাহা যে ধর্মজীবনে সত্যলাভের পরিপন্থী একথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্র যে বিভিন্ন ধর্ম হইতে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া একটি ধর্মসঞ্চয়নের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও ধর্মক্ষেত্রে ঐক্যস্থাপনের আদর্শকে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিবার উপযোগী ছিল না। কোন ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন ধর্ম হইতে যে সকল অংশ চয়ন করা হয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইলেও সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'The Paramahansa would experience each cult and religion in its totality or as one whole experience. ···Ramakrishna held that selective extracts would kill the vital element in each religion. ···What we want is not merely universal religion in its quintessence, as Rammohun sought it in his earlier days, not merely an eclectic religion by compounding the distinctive essences, theoretical as well as practical of the different religions as Keshabchandra sought it, but experience as a whole as it has unfolded itself in the history of man. And this can be realised by us, as Ramakrishna taught, by the syncretic practice of religion by being a Hindu with the Hindu, a Moslem with the Moslem and a Christian with the Christian as preparatory to the ultimate realisation of God in Man and Man in God.'

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মকে একই কালে একই সঙ্গে অনুসরণ করিতেন না। তাহার কারণও

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—'But he would not practise different religions, disciplines or hold different creeds at one and the same time. The observances, practices and rituals of each religion are organic to it.'

এক একটি ধর্মের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বীজ হইতে ফুল বা ফলে উপনীত হইবার বিভিন্ন পদক্ষেপের ন্যায়। তাহার একটি হইতে অপরটিতে যাইতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বিবেকানন্দ বিশ্ব-ধর্মমহাসভায় ধর্মদ্বন্দ্বের যে চিরন্তন সমাধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' মহামন্ত্রেরই তাৎপর্য-ব্যাখ্যা। চিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দের এই অমর উক্তি একই সত্য ঘোষণা করিতেছে—'The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of others and yet preserve its own individuality and grow according to its own law of growth.'

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এবং সমগ্র বিশ্বে একটি সাংস্কৃতিক সঙ্কটও দেখা দিয়াছিল। একদিকে রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধিকারী ইউরোপীয় জাতিগুলির অনুসৃত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং অপরদিকে এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত প্রাচ্য সংস্কৃতি—যাহার মধ্যমণি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি। এই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে কোন্‌টি বিরাজ করিবে এবং কোন্‌টি বিলুপ্ত হইবে? অথবা ইহাদের উভয়ের সমন্বয়ে কি ভবিষ্যৎ মানব-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাভূমি নির্মিত হইবে? যেহেতু ইউরোপীয় জাতিগুলি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল, সেহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং ভাবিতেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাঁচে ভারত ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

রামমোহন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে এত সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি ভারতে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রবল প্রচারে রত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য ছিল এই যে, কেবল ইংরাজের সহিত নিয়ত বসবাস করিয়া আমরা মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিব। ভারতের তরুণ শিক্ষাব্রতীদের তিনি কেবল পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণ করিতে বলিতেন। স্বয়ং বেদান্তের বাংলা অনুবাদ রচনা করিলেও ভারতীয় ছাত্রদের যে বেদান্ত হইতে কিছুই শিখিবার নাই একথা অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে নিশ্চিত মত পোষণ করিতেন যে সাংখ্য ও বেদান্ত যে মিথ্যাময় দর্শনশাস্ত্র একথা বলিতে কোন তর্কের প্রয়োজন হয় না। দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজে দুইটি প্রতিপক্ষের সন্ধান পাইয়াছিলেন—একটি খৃষ্টধর্ম ও অপরটি বেদান্ত। কেশবচন্দ্রের একটি বিখ্যাত বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Farewell to Vedanta'। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরে তাঁহাকে আর একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল, যাহার বিষয়বস্তু ছিল 'Our return to Vedanta'। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' ইহার অর্থ বেদান্তের চরম তত্ত্বকে বুদ্ধিগত করিয়া উহাকে কর্মে প্রয়োগ করা—সে-কথা স্বামী বিবেকানন্দ লণ্ডনে প্রদত্ত 'কর্মজীবনে বেদান্ত' শীর্ষক বক্তৃতা-চতুষ্টয়ে বলিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ বেদান্তের সত্যের মধ্যেই ভবিষ্যতের মানুষের সকল বিরোধের মীমাংসা

খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। যে-যুগে ভারতবাসী বিশ্বাস করিত যে, আমাদের যাহা কিছু শিক্ষণীয় তাহা পাশ্চাত্য দেশেই আছে এবং পাশ্চাত্যের নিকট হইতে আমাদের কেবল গ্রহণ করিতেই হইবে, আমাদের দিবার কিছুই নাই, সে-যুগে বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—'In the lowest worm, as well as in the highest human being, the same divine nature is present. The worm form is the lower form in which the divinity has been more overshadowed by Maya; that is the highest form in which it has been least overshadowed. Behind everything the same divinity is existing, and out of this comes the basis of morality. Do not injure another. Love every one as your own self, because the whole universe is one.'

এই বক্তৃতা যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল তখন তাহার ভূমিকায় Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত C. C. Everett মহোদয় এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন—'We Occidentals busy ourselves with the manifold. We can, however, have no understanding of the manifold, if we have no sense of the One in which the manifold exists. The reality of the One is the truth which the East may well teach us; and we owe a debt of gratitude to Vivekananda that he has taught this lesson so effectively.'

পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দই যে প্রথম ভারতীয় সংস্কৃতির অবিনশ্বর মহিমার প্রচারক ইহা বিপিনচন্দ্র তাঁহার 'Character Sketches' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত প্রবন্ধটিতে সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ধারা অনুসরণ করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে ভারতীয় সংস্কৃতির মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন; রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের ধারা অনুসারে নয়। কারণ বিপিন-চন্দ্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, রামমোহন অথবা কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সাংস্কৃতিক মহিমা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। বিবেকানন্দই সে-মহিমার প্রথম প্রবক্তা।

ভবিষ্যৎ মানব-সংস্কৃতি যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শের সমন্বয়ে গঠিত হইবে ইহা বিবেকানন্দ বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন—"আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটা বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন—'কারুর ভাব নষ্ট করিস্‌নি।' আদর্শের প্রচারে মানুষ এমন একদেশদর্শী হইয়া পড়ে যে, পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি মাত্র আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করিবার জন্য সে সকল বিচারকে বর্জন করে। কোন একটিমাত্র আদর্শ, কোন একটি-মাত্র ধর্ম, কোন একটিমাত্র ভাব যদি সকল মানুষের একমাত্র অবলম্বন হইত, তাহা হইলে মানব-

সংস্কৃতি তাহার বিপুল বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইত। এই পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন ধর্ম থাকিবে তেমনি বিভিন্ন মানসিক গঠনের অধিকারী মানুষও থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে কবি, কেহ হইবে দার্শনিক; কেহ হইবে কর্মী, কেহ হইবে ভক্ত। কেবল একটিমাত্র প্রকৃতি লইয়া সকল মানুষ গড়িয়া উঠিবে, ইহা সম্ভবও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই মহাবাণী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও ধ্বনিত হইল— **'Each soul is potentially Divine. The goal is to manifest this Divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, or worship, or psychic control, or philosophy—by one, or more, or all of these—and be free. This is the whole of religion.'**

মানব-ঐক্যের আর একটি তত্ত্ব আধুনিক যুগের প্রাক্কালে পাশ্চাত্য জগতে জন্মলাভ করিয়া দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছিল। সে তত্ত্ব utilitarianism বা হিতবাদের তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূল কথা ছিল অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন সমাজ-জীবনের লক্ষ্য। এই মতবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রভুত্বকে অবাধ প্রাধান্য দান করিয়াছে। সংখ্যালঘু জনের দুঃখকে ইহা বিবেচ্য বলিয়া গণ্য করে না। অতএব সকল মানুষের সুখদুঃখকে ইহা সমমর্যাদা দান করে না। সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি এই ঔদাসীন্যের মধ্যে যে বিরোধের বীজ গুপ্ত থাকে তাহা শেষ পর্যন্ত মানব-ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

আরও সাম্প্রতিক কালে আর একটি মতবাদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন ও শ্রমিক-শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপনের মধ্যে মানবসমাজে ঐক্য স্থাপনের আদর্শকে প্রচার করিতেছে। সাম্যবাদের এই তত্ত্ব রুশদেশ ও চীনদেশের ন্যায় বিশাল রাষ্ট্রে ও পূর্ব ইউরোপের একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। বণ্টনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সাধন এবং শ্রমিক-শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া যে সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহা মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের মনোভাবকে দূর করিতে পারে নাই। অসাম্যবাদী রাষ্ট্রের সহিত এই সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরোধের দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য। কিন্তু সাম্যবাদী রুশ দেশের সহিত সাম্যবাদী চীনদেশের তীব্র শত্রুতার সম্পর্ক আধুনিক কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান ঘটনা। সুতরাং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রভুত্ব রুশ ও চীনের ন্যায় দুইটি দেশে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও যখন তাহাদের মধ্যে মিত্রতার পরিবর্তে কঠোর শত্রুতার সৃষ্টি করিতেছে, তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, সাম্যবাদের মধ্যে মানব-মিলনের সম্ভাবনা নাই। দুইটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতারই সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মানব-ঐক্য এ পথে অবশ্যই স্থাপিত হইতে পারে না।

মানব-ঐক্যের যে পুণ্যমন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করিয়াছিলেন সে-মন্ত্র 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। নির্যাতিত, আর্ত মানুষের সেবা যে ঈশ্বর-আরাধনার একটি নূতন পথ ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ঘোষিত, নবযুগের নবমন্ত্র। এই সেবাধর্মের অনুশীলন ধ্যান, জপ, যোগসাধনার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বরলাভে সাফল্য দান করে। সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শনের ইহা সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মানবিকতামণ্ডিত পথ। যে সেবা পায় কেবল সেই ধন্য হয় না, যে সেবা করে সেও ধন্য হয়। কারণ এই সেবার মাধ্যমে তাহার অহমিকা দূর হয়, তাহার স্বার্থপরতার অবসান হয়। সে বুঝিতে পারে, সে যাহার সেবা করিতেছে

সে জীব নহে, সে শিব। মানুষের দুঃখ দূর করিতে যাইয়া মানুষ কাঁচা আমিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভূতির পথে হৃদয়ের ক্রমবিস্তারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে এই সেবাব্রতের মাধ্যমে যে-প্রেম, যে-সহানুভূতি, যে-সহযোগিতার সৃষ্টি হয়, মানব-ঐক্যের বাস্তব রূপায়ণে তাহাই ত সর্বাপেক্ষা সাফল্যের সম্ভাবনাময় শক্তির সার্থক প্রয়োগ। এই নবমন্ত্রের সার্থক প্রয়োগ বিবেকানন্দের কণ্ঠে পরম প্রার্থনারূপে উচ্চারিত হইয়াছে—'May I be born again and again, and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls—and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship.'

এই প্রার্থনাই বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আধুনিক যুগের মানবাত্মাকে গভীরতম আহ্বান জানাইয়াছিল। তাই নারীসমাজ ও নিম্নবর্গের মানুষ—যাহারা দীর্ঘকাল পূর্ণ অধিকার লাভ করিতে পারে নাই, তাহাদের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের কর্মীদের উপর বিশেষ দায়রূপে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। সেই কর্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের মাধ্যমে ইতিহাসের নবযুগ তাহার প্রার্থিত সার্থকতালাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।*

* ৫ই এপ্রিল ১৯৮০ প্রাতে, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রথম প্রবন্ধ।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

[ব্রহ্মের সপ্তবিধ গুণ]

(২) **আনন্দময়ত্ব**—এর পরেই বলদেব এনে ফেললেন পরমেশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটিকে—অর্থাৎ, তাঁর আনন্দময়ত্বকে। আমরা জানি যে, সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে 'সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব'ই পরব্রহ্মের স্বল্প কথায় শ্রেষ্ঠ বর্ণনা—তিনি 'সৎ' বা শাশ্বত, তিনি 'চিৎ' বা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি 'আনন্দ' বা নিত্যতৃপ্ত। কিন্তু এস্থলে, শ্রীভগবানের প্রধান সাতটি গুণের মধ্যে বলদেব 'সৎ'কে হঠাৎ বাদ দিয়ে একেবারে 'চিৎ'কে নিয়েই আরম্ভ করলেন কেন? কারণ অবশ্য তিনি নিজে কিছুই দেননি। তবে আমরা হয়ত তা এইভাবে অনুমান করে নিতে পারি।

বস্তুতঃ, একদিক থেকে 'সত্তা'ই হ'ল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সার্বজনীনতম তত্ত্ব—জীবে জড়ে, বৃক্ষে লতায়, পর্বতে গুহায়, কীটে পতঙ্গে, ব্রাহ্মণে শূদ্রে, নরে নারীতে, উচ্চে নীচে, পণ্ডিতে মূর্খে, ধনবানে দরিদ্রে—একমাত্র যে জিনিসটি একেবারে সমানভাবে রয়েছে সর্বদাই, তা ত হ'ল এই 'সত্তা'। এক্ষেত্রে

কোনো ভেদাভেদ নেই একেবারেই, এমন কি কোনো পরিমাণগত ভেদও নেই বিন্দুমাত্রও। অর্থাৎ, সত্তা অধিক পরিমাণে রয়েছে জীবে, অল্প পরিমাণে জগতে—এ কথা ত হাস্যকর; সত্তা অধিক পরিমাণে রয়েছে পণ্ডিতে, অল্প পরিমাণে মূর্খে—একথাও ত ঠিক তাই। বরং তুমি যাই হও না কেন, যেই হও না কেন—তোমার সত্তা ও পরব্রহ্মের সত্তা ত ঠিক সেই একই। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবশ্য পরস্পর প্রভেদ ত আছেই আছে। যথা—জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আনন্দের ক্ষেত্রে। যেমন—জীবে ও জড়ে জ্ঞান ও আনন্দের দিক থেকে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে; কারণ, জীবে জ্ঞানও আছে, আনন্দও আছে; জড়ে জ্ঞানও নেই, আনন্দও নেই। পুনরায়, পণ্ডিতে জ্ঞান ও আনন্দ আছে অধিক পরিমাণে, মূর্খে অনেক অল্প পরিমাণে—এইভাবে আর কি!

সুতরাং বলদেব ঠিকই করেছেন 'সৎ'কে বাদ দিয়ে এস্থলে। কারণ, যা সর্বগত, তাকে ব্রহ্মের বিশেষ প্রধান গুণের মধ্যে ধরে দেবার ত কোনো প্রয়োজন নেই—তাঁর সত্তা ত অবশ্যই জন্মমরণহীন শাশ্বত সত্তা। সেরূপ সত্তা জীবেরও ত আছে; এমন কি, জড়েরও; কারণ, ব্রহ্মের অচিৎ-শক্তিরূপে জড়-জগৎও আপাতদৃষ্টিতে না হ'লেও, প্রকৃতকল্পে শাশ্বতই নিশ্চয়।

কিন্তু 'জ্ঞান' বা 'আনন্দ' এই পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ, জড়ে 'জ্ঞান' নেই একেবারেই; জীবে আছে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা নেই। পুনরায়, জড়ে 'আনন্দ' নেই একেবারেই; জীবে আছে, কিন্তু নিত্যতৃপ্ততা, পূর্ণতৃপ্ততা নেই। সেজন্য, এগুলিই হ'ল ব্রহ্মের বিশেষ প্রধান উল্লেখনীয় গুণ, সুনিশ্চিত। এই কারণেই, পরমপ্রাজ্ঞ বলদেব 'জ্ঞান' থেকে আরম্ভ ক'রে চলে এসেছেন 'আনন্দে'। কারণ, 'জ্ঞানে'র অপেক্ষা 'আনন্দ'ই উচ্চতর, পূর্ণতর, সুন্দরতর; এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসারে একমাত্র 'আনন্দ'ই সেই পরমরসঘন, পরমামৃত-স্বরূপ, পরমালোকোজ্জ্বল পরমা দেবতার স্বরূপ, 'সৎ' এবং 'চিৎ' নয়। 'সৎ' এবং 'চিৎ' 'আনন্দে'র বিশেষণই মাত্র—নিজেরা স্বতন্ত্র বিশেষ্য নয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ+চিৎ+আনন্দ নন—তিনটি স্বরূপ তাঁর কিরূপে হবে? বরং তাঁর স্বরূপ একটিই; অর্থাৎ, কেবলই 'আনন্দ'; এবং তিনি 'সৎ আনন্দ' ও 'চিৎ আনন্দ'। অর্থাৎ, তিনি শাশ্বত আনন্দ ও জ্ঞানময় আনন্দ।

এরূপ আনন্দের ছয়টি রূপ—ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ, নিত্যানন্দ, পূর্ণানন্দ, ভূমানন্দ ও মোক্ষানন্দ। এগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কেবল এইটুকুই বললে যথেষ্ট হবে যে, ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ এবং মোক্ষানন্দকে প্রথমে একত্রে নিতে হবে। কারণ, মোক্ষকালেই আমরা উপলব্ধি করি যে, ব্রহ্ম ও আত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন—এবং সেজন্য, মোক্ষের আনন্দই হ'ল একাধারে ব্রহ্মের আনন্দ এবং আত্মার আনন্দ।

আনন্দতত্ত্ব

আমাদের পক্ষে এটি কত আশার কথা, কত অনুপ্রেরণার কথা, কত গৌরবের কথা যে, সুবিশাল এবং বহু বিবিধ-বিচিত্র-মতবাদসঙ্কুল বেদান্তদর্শনেও কিন্তু একেবারে সার্বজনীন তিনটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে সর্বত্রই সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সগৌরবে। সেই তত্ত্বত্রয় হ'ল (১) ব্রহ্ম (২) আনন্দ (৩) ব্রহ্ম ও আনন্দের একত্ব ও অভিন্নত্ব।

'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে বহু আলোচনা-প্রপঞ্চনা সর্বদাই করা হচ্ছে প্রত্যেক বেদান্ত-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনাকালে; এবং সেই সকল মতবাদ স্বভাবতঃই পরস্পরভিন্ন এবং পরস্পরবিরুদ্ধ। কিন্তু এ কথা 'আনন্দ' সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। অবশ্য 'আনন্দ' ব্রহ্মের কেবলই 'স্বরূপ', অথবা 'স্বরূপ' ও 'গুণ' উভয়ই একত্রে—এ বিষয়ে অদ্বৈতবাদী ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

যেমন, অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, 'আনন্দ' ব্রহ্মের কেবলই স্বরূপ, গুণ নয় ; অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম আনন্দ' এরূপ বলতে হবে ; 'ব্রহ্ম আনন্দময়' বলা যাবে না। কিন্তু রামানুজাদি অন্যান্য সকলেই প্রায় সমস্বরেই ব'লে উঠেছেন এক্ষেত্রে—"না, ব্রহ্মের ক্ষেত্রে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ অবশ্য সম্ভবপরই নয় ; কিন্তু স্বগত ভেদ ত তাঁর আছেই আছে। সেজন্য ব্রহ্ম একাধারে 'আনন্দ' ও 'আনন্দময়'—'আনন্দ' নিশ্চয়ই তাঁর 'স্বরূপ' ও 'গুণ' উভয়ই একাধারে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।১।১২-১৯, আনন্দময়াধিকরণ)

সে যা হোক, 'আনন্দ' ব্রহ্মের কেবল স্বরূপই হোক বা একাধারে 'স্বরূপ' ও 'গুণ' দুই-ই হোক —প্রশ্ন থেকেই গেল যে, এরূপ 'আনন্দে'র নিজের স্বরূপ বা স্বভাব কি ?

প্রথমতঃ পরিমাণের বা quantitative দিক থেকে, স্বয়ং উপনিষদ্ই আমাদের এ সম্বন্ধে একটু সামান্যমাত্র আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন, 'আনন্দোপনিষদ্' নামে খ্যাত সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন তৈত্তিরীয়োপনিষদে এইভাবে—

'সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।' (২।৮।১)

—'সেই ব্রহ্মের আনন্দের বিচার করা হচ্ছে।' মনে করুন, যেন একজন বেদজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্মা, দৃঢ়তম এবং বলিষ্ঠ যুবক আছেন ; এবং এই বিত্তপূর্ণ সমগ্র পৃথিবী তাঁর। এরূপ যুবকের আনন্দ এক পূর্ণমাত্রা 'মানবীয়' আনন্দ। এর শতগুণ 'মনুষ্য-গন্ধর্বে'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। (বিশেষ কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানবশতঃ গন্ধর্বত্ব-প্রাপ্ত মনুষ্যকে 'মনুষ্য-গন্ধর্ব' বলা হয়)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় অথবা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ 'দেব-গন্ধর্বে'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। ('দেব-গন্ধর্ব'গণ জাতিতেই গন্ধর্ব ব'লে মনুষ্য-গন্ধর্বগণের অপেক্ষা উচ্চতর, এবং তাঁদের সাধনাদিও ঠিক তাই)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় অথবা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ 'চিরলোকবাসী পিতৃগণে'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ ('চিরলোকবাসী পিতৃগণে'র লোক বা বাসস্থান চিরস্থায়ী, অথবা দীর্ঘকাল-স্থায়ী)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় অথবা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ 'আজানজ দেবতা'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। (বিশেষ স্মৃতিবিহিত কর্মবশতঃ আজানে বা দেব-লোকে জাত দেবতাগণকে 'আজানজ দেবতা' বলে)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ 'কর্মদেবতা-গণে'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। (যাঁরা শ্রুতিবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মদ্বারা দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন, তাঁদের 'কর্মদেবতা' বলা হয়)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ দেবগণের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। (অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ জন বৈদিক দেবতা। এস্থলে অবশ্য ইন্দ্র ও প্রজাপতির কথা স্বতন্ত্রভাবে বলা হয়েছে এইজন্য যে, তাঁরা অন্যান্য দেবগণের অপেক্ষা উচ্চতর—ইন্দ্র দেবরাজ, প্রজাপতি সৃষ্টি-কর্তা)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ দেবরাজ ইন্দ্রের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ দেবগুরু বৃহস্পতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতির আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ ব্রহ্মের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ।

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্—২।৮।১-৪)

এরূপে, ব্রহ্মের পূর্ণ একমাত্রা আনন্দকে মানবের পূর্ণ একমাত্রা আনন্দের শতগুণের দশম

'ঘাত' বা 'শক্তি' (১০০১০) বলা হয়েছে। প্রকৃত পরিমাণের দিক থেকে ত এ কিছুই না। তথাপি, ব্রহ্মানন্দ কিরূপে মানবানন্দ থেকে পরিমাণে বহু বহু অধিক—তার সামান্য মাত্র হ'লেও কিছু ছায়া বা ধারণা এস্থলে পাওয়া যায়।

প্রাচীনতর এবং প্রসিদ্ধতর বৃহদারণ্যকোপনিষদেও (৪।৩।৩৩) এই তত্ত্বটি পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্রতর আকারে। অর্থাৎ, এস্থলে দশটি বস্তুর স্থলে সাতটি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে—প্রত্যেকক্ষেত্রেই পরবর্তী তথ্যটি পূর্ববর্তী তথ্যের শতগুণ, আনন্দের দিক থেকে :—

মানব, জিতলোক-পিতৃগণ, গন্ধর্বলোক, কর্মদেবগণ, আজান-দেবগণ, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক—সর্বসমেত সাতটি বিভিন্ন বস্তু বা তথ্য।

এস্থলেও যে বলা হয়েছে, 'বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, কামনামুক্ত পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ', তা কিন্তু তৈত্তিরীয়োপনিষদের ন্যায় প্রথম থেকেই বলা হয়নি—আজান-দেবগণের ক্ষেত্র থেকেই কেবল বলা হয়েছে।

সে যা হোক—বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, নিষ্কাম পুরুষদের কত যে সম্মান সেই সময়ে ছিল, তা এই দুই উপনিষদ্, বিশেষ ক'রে, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ থেকে স্পষ্ট জানা যায়—যেহেতু সেক্ষেত্রে তাঁদের স্বয়ং ব্রহ্মের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দেরও পূর্ণ অধিকারী ব'লে সগৌরবে ঘোষণা করা হয়েছে।

এইভাবে পরিপূর্ণ না হ'লেও অন্ততঃ কিছু জানা গেল পরিমাণ বা quantity-র দিক থেকে ব্রহ্মের আনন্দের বিশালত্ব বিরাটত্ব সম্বন্ধে।

কিন্তু স্বরূপ বা quality-র দিক থেকে ব্রহ্মের আনন্দ কি?

এক্ষেত্রে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উপনিষদে ব্রহ্মকে 'আনন্দ'রূপে বর্ণনা খুব বেশী নেই, যতটা এই মূলীভূত তত্ত্বের ক্ষেত্রে আশা করা যায়। তদুপরি, 'আনন্দে'র পরিপূর্ণ শাশ্বত স্বরূপ কি?—সে বিষয়ে ত একবারও সাক্ষাৎভাবে, স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তার কারণ হয়তো এই যে, 'আনন্দ' এরূপ একটি মূলীভূত তত্ত্ব—যাকে ইংরেজীতে বলে 'Axiomatic Truth'—যার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না সাধারণভাবে—যাকে বরং মেনে নিতে হয় নির্বিচারে, এবং সাক্ষাৎভাবে অনুভব করতে হয়। সে যা হোক, যে সকল মন্ত্র আমরা উপনিষদের মধ্যে পেয়েছি 'আনন্দে'র সম্বন্ধে, তাদের থেকে কিছু পাওয়া হয়তো যাবে 'আনন্দে'র প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে।

প্রথমতঃ, আমরা দেখেছি যে, 'বিজ্ঞান' ও 'আনন্দ'কে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।' (বৃহ. উপ. ৩।৯।২৮)
—'ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ।'

কিন্তু পুনরায় দেখলাম যে, 'আনন্দ' 'বিজ্ঞান'কেও ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে যাচ্ছে।—আনন্দোপনিষদ্ তৈত্তিরীয়োপনিষদে এই ভাবটিই প্রবল। তৈত্তিরীয়োপনিষদের সেই সুবিখ্যাত 'পঞ্চকোষতত্ত্বে' যে সুন্দর যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ক্রমোচ্চ স্তরের কথা বলা হয়েছে, তাতে উচ্চতম স্তর 'আনন্দে' উপনীত হ'তে হ'লে ঠিক তার আগের নীচের স্তর 'বিজ্ঞান'কেও অতিক্রম ক'রে যেতে হবে—যে সে উপায়ে নয়, কেবল তপস্যার দ্বারা।—

'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।'

'তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ।'

'তস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ।'

'তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।'

'তস্মাদ্বা এতস্মাদ্‌বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ব্রহ্মানন্দবল্লী, ১-৫)

'এই পুরুষ অন্নরসময়।'

'এই অন্নরসময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি আভ্যন্তর আত্মা আছে—তা হ'ল প্রাণময়।'

'এই প্রাণময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি আভ্যন্তর আত্মা আছে—তা হ'ল মনোময়।'

'এই মনোময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি আভ্যন্তর আত্মা আছে—তা হ'ল বিজ্ঞানময়।'

'এই বিজ্ঞানময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি আভ্যন্তর আত্মা আছে—তা হ'ল আনন্দময়।'

'স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।'

'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।'

'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
মনো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।'

'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।'

'তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।
স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা—
আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ভৃগুবল্লী, ১-৬)

'তিনি তপস্যা করলেন। তিনি তপস্যা ক'রে জানতে পারলেন যে—অন্নই ব্রহ্ম।'

'তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা ক'রে জানতে পারলেন যে—প্রাণই ব্রহ্ম।'

'তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা ক'রে জানতে পারলেন যে—মনই ব্রহ্ম।'

'তপস্যা দ্বারাই ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা ক'রে জানতে পারলেন যে—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।'

'তপস্যার দ্বারাই ব্রহ্মকে জানতে ইচ্ছা কর। তপস্যাই ব্রহ্ম। তিনি তপস্যা ক'রে জানতে পারলেন যে—আনন্দই ব্রহ্ম।'

তাহলে ব্রহ্মকে 'আনন্দ'রূপে বলাই হ'ল বেদান্তদর্শনের চরমা ও পরমা কথা।

সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও 'বিজ্ঞান'কে বাদ দিয়ে কেবল 'আনন্দে'র কথাও বলা হয়েছে—

'এষোঽস্য পরম আনন্দঃ' (৪।৩।৩২)

'এষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ' (৪।৩।৩৩)

'ইহাই জীবের পরম আনন্দ।'

'ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মলোক।'

[ক্রমশঃ]

'তপস্' শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়তো উদয়াস্ত জপ করা—সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওঙ্কার-জপ। এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে তোমার ইচ্ছামতো আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক—যে-কোন রূপে পরিণত করতে পার। এই তপস্যার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও জগৎসৃষ্টি করবার জন্য তপস্যা করতে হয়েছিল। এটা একটা মানসিক উপকরণ, যা দিয়ে সব কিছু করা যায়। 'ত্রিভুবনে এমন কিছু নেই, যা তপস্যার দ্বারা পাওয়া যায় না।' —স্বামী বিবেকানন্দ

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে

স্বামী গীতানন্দ

যুগ যুগ ধ'রে ভক্তের প্রাণ জগন্নাথদেবকে দর্শনের জন্য আকুল হয়েছে এবং তাঁকে দর্শন করবার জন্য বহু কষ্ট ক'রে তাঁরা পুরীধামে এসেছেন। পাঁচ শ বছরেরও আগে থেকে বাংলা-দেশের ভক্তরা দস্যু-সংকুল হাঁটা-পথে এবং নৌকায় প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে জগন্নাথদেবের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখনকার চলার পথের দুঃখ-কষ্ট এবং বিভীষিকা বোধ হয় ভক্তহৃদয়ে জগন্নাথ-দেবের আকর্ষণকে তীব্রতর ক'রে তুলত। বর্তমান সময়ে যাতায়াতের খুবই সুবিধা হয়েছে, রাস্তায় ভয়েরও কিছু নেই। ফলে জগন্নাথদেবের দর্শন সহজলভ্য হয়ে গেছে। বাধা যতই কঠিন, আকর্ষণও ততই তীব্র বলে মনে হয়। তাই বোধ হয় দুর্গম তীর্থযাত্রাতেই ভক্তরা মেতে ওঠেন।

বর্তমান সময়ে যখন অনেকের কাছে ঈশ্বরকে না-মানা একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনও দেখি দলে দলে লোক পুরীতে এসে জগন্নাথদেবকে দর্শন করছেন। ভাবি, কেন এমন হয়? এত লোক কেন পুরীতে আসেন? একি কেবল পুরীর সমুদ্র-সৈকতের হাতছানি? মন্দির-দর্শন একটা শখ মেটান মাত্র? পুরীর মন্দিরে কয়েক মিনিট থাকলেই মনে হবে, পুরীর সমুদ্র, মন্দিরের স্থাপত্য —'এহ বাহ্য'। জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রায় সময়েই দর্শনার্থীর ভিড় লেগে থাকে। মন্দিরে ঢুকেই লোকের ঠেলাঠেলি, পাণ্ডাদের চিৎকার, খোল-করতাল-সমন্বিত কীর্তনের শব্দের মধ্যে দর্শনার্থীরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন। মনকে একাগ্র করবার প্রতিকূল পরিবেশ সব সময়েই সেখানে তৈরী। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও দেখতে পাই প্রত্যেকটি লোকই যেন নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে রয়েছে। কেউ অপলক নয়নে দেবতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, কেউ মুক্তকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করছেন, আবার কেউ বা আপনহারা হয়ে আনন্দের আতিশয্যে অশ্রুবিসর্জন করছেন। দেখে নিতান্ত বাস্তববাদীর মনেও একটা শিহরণ জাগে, একটা অজানা আনন্দের স্পর্শ লাগে।

পুরীর মন্দিরের আচার-বিধি আমাদের ধর্মে এবং সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। আমরা বেদবেদান্তের কথা মুখে বলি: 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবই ব্রহ্মময়, সকলের মধ্যে সেই একই ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান। কিন্তু কাজের বেলায় সেই সমদৃষ্টির কথা ভুলে জাতিভেদের বেড়াজালে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখি। এই ভেদদৃষ্টির বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্র বহু কথা বলেছে। যুগে যুগে মহাপুরুষরা সমাজের এই রোগকে দূর করবার বহু চেষ্টাও করেছেন। তবু এই জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা-বোধ সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর করা সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু পুরীর মন্দিরে দেখতে পাই, রথের সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে রথে আনার পর, পুরীর রাজাকেও রথের রাস্তা ঝাড়ু দিতে হয়, কারণ তিনিও জগন্নাথদেবের একজন সেবক মাত্র। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেবতার দৃষ্টিতে সব মানুষই সমান; তাঁর কাছে রাজা আর ঝাড়ুদারের মধ্যে কোন তফাত নেই। মানুষ সাধ্যানুসারে কাজ ক'রে সমাজের সেবা করবে। কোন কাজই ছোট নয়; কোন কাজই মনুষ্যত্ব-বিকাশের পরিপন্থী নয়। সমাজের উঁচু জাতের লোকেরা তথাকথিত নীচু জাতের লোকেদের ছোঁয়া জিনিস খায় না। কিন্তু পুরীর মন্দিরে এই নিয়মের

ব্যতিক্রম দেখা যায়। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র একই পাত্র থেকে বিনা দ্বিধায় খেতে পারে, মনে কোন রকম বিকার আসে না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন ক'রে সাম্যবাদ স্থাপনের চেষ্টা অনেক দেশেই হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মনের পরিবর্তন হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বুঝতে পারছে যে, কোন একটা বিষয়ে সব মানুষই এক, ততক্ষণ পর্যন্ত যথার্থ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না। মানুষে মানুষে গুণগত, শক্তিগত পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু এই পার্থক্যের মধ্যেও যখন মানুষ বুঝতে পারবে 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়', তখনই মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সাম্যবাদকে যথাযথ রূপে প্রয়োগ করতে পারবে। জগন্নাথদেবকে কেন্দ্র ক'রে এই সামাজিক সাম্য, যা বর্তমান যুগেও স্বপ্ন বলে মনে হবে, বহু বছর ধ'রে পুরীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। দেবতাকে ভালবেসে, ভক্তদের মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা-ই মানুষকে যথার্থ সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'ভক্তের জাত নেই।'

পুরীর মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি—পা নেই, হাতের অবস্থাও তথৈব চ, 'চক্র-নয়ন'যুক্ত মুখ—আর যাই হোক, আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে খুব সুন্দর বলা যায় না। তবে যে ভক্তরা অপলক নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে? না তাকিয়ে থেকে যে উপায় নেই! জগন্নাথদেব হচ্ছেন প্রেমের মূর্তি। একদিন একটি গ্রাম্য মহিলা মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে না পেরে, চৈতন্যদেবের কাঁধে পা রেখে গরুড় স্তম্ভে উঠে জগন্নাথদেবকে দর্শন করেছিলেন। জগন্নাথ-দর্শনের এই আর্তি দেখে চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'এঁর দেহ-মন-প্রাণ সবই জগন্নাথের পাদপদ্মে আবিষ্ট; তাই অপরের কাঁধে যে পা রেখেছেন, সেই জ্ঞানও এঁর নেই। ইনি পরম ভাগ্যবতী।' ভক্তের এই আর্তি কি 'চক্র-নয়ন' দেখবার জন্য? ভক্তের কাছে জগন্নাথ পরম প্রেমাস্পদ; তাই প্রেমের আকর্ষণেই ভক্ত-নয়ন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পা নেই—চলতে পারেন না; হাত নেই—কর্মক্ষমতাও নেই। ভক্তকে তিনি যেন বলছেন, 'আমাকে ভালবাস; কিন্তু ভালবাসার মধ্যে যেন ব্যবসা এনো না, আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ো না। তুমি না বুঝে চাইলেও আমি কিন্তু তোমার ভালবাসাকে কলুষিত হতে দেবো না—দেখছ না, আমার হাত-পা নেই! কেমন ক'রে তোমায় দেব? সুতরাং আমায় কেবল ভালবেসেই সুখ পেতে হবে—এই আমার দান।'

ছোট শিশু চলতে পারে না, কিছু করতে পারে না। কিন্তু সেই শিশুকে তো সবাই ভালবাসে। শিশুর কাছে কিছু পাবার আশা নেই, তাকে ভালবেসেই সুখ। যারা শিশুকে ভালবাসে, শিশুও তাদের কাছে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে থাকে। হাত-বাড়ান শিশুর আকর্ষণ অতি প্রবল। জগন্নাথদেবও ভক্তকে আলিঙ্গন করবার জন্য যেন দু হাত বাড়িয়ে আছেন। এই মূর্তিতেই আমরা তাঁকে দেখতে পাই। ভক্তও যদি একবার দু হাত বাড়িয়ে তাঁকে ডাকেন, তবেই না ভক্তের কাছে জগন্নাথদেবের হাত-বাড়ান মূর্তি সার্থক হয়ে উঠবে! দেবতা নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাই তো জগন্নাথদেবের আকর্ষণ এত তীব্র! তাই সেখানে এত ভিড়!

জগন্নাথদেবের মূর্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দৈবাদেশ পেয়েছিলেন যে, পুরীর সমুদ্র থেকে কাঠ এনে, সেই কাঠ থেকে ভগবান বিষ্ণুর দারুমূর্তি তৈরী করতে হবে। দৈবাদেশ অনুযায়ী সমুদ্র থেকে ভেসে আসা কাঠ তো পাওয়া গেল। কিন্তু বিষ্ণুমূর্তি তৈরী করবার ভার কার ওপর দেওয়া

যাবে ? এমন কাউকেই পাওয়া গেল না যে বলতে পারে, সে স্বচক্ষে ভগবানকে দেখেছে এই যখন অবস্থা, তখন বিষ্ণু, রাজার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নিজেই বৃদ্ধ ছুতোরের বেশে রাজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন ; বৃদ্ধ ছুতোরের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে রাজার মনে হ'ল যে, বিষ্ণুমূর্তি তৈরী করতে ইনিই একমাত্র উপযুক্ত লোক। বৃদ্ধ ছুতোর রাজাকে বললেন যে, তাঁকে খুব নিরিবিলিতে একুশ দিন ধ'রে একমনে বিষ্ণুমূর্তি তৈরীর কাজ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণেই যেন কেউ সেখানে গিয়ে তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি না করে। এদিকে কাজ আরম্ভ করবার পর পনের দিন কেটে গেছে ; রাজ্যের সবাই পরম আগ্রহে মূর্তি তৈরীর জন্য অপেক্ষা করছে। পরম ভক্তিমতী রাণী গুণ্ডিচা রাজাকে বললেন যে, ভেতর থেকে কোন শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না ; সম্ভবতঃ বৃদ্ধটি ঐ বদ্ধ ঘরে মরেই গেছে। রাজার আদেশে যখন দরজা খোলা হল, তখন দেখা গেল সেখানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনটি অসম্পূর্ণ মূর্তি রয়েছে ; কিন্তু বৃদ্ধ ছুতোরকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন মূর্তি তিনটি প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করতে লাগলেন। সেই অর্ধসমাপ্ত মূর্তির অনুরূপ দারুমূর্তি আজও পুরীতে পূজা করা হচ্ছে। সাধারণতঃ কমবেশী বারো বছর পর পর 'নবকলেবর' উৎসবে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার নতুন অনুরূপ দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আমরা বলে থাকি, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে। পুরীর মন্দিরে এই যে অর্ধসমাপ্ত মূর্তির পূজা আট শ বছর ধ'রে চলে আসছে, এর পেছনেও কি কোন দৈব নির্দেশ আছে ? জগন্নাথদেবকে প্রেমের মূর্তি বলা হয়েছে। মহাভাবে, মহাপ্রেমে অবতারকল্প মহাপুরুষদের শরীরে নানা সাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হবার কথা শোনা যায়। চৈতন্যদেব পুরীতে থাকবার সময় এক রাত্রিতে সকলের অলক্ষিতে মহাভাবে জগন্নাথদেবের মন্দিরের ফটকের কাছে এসে পড়েছিলেন ভক্তরা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এসে দেখেন যে, তাঁর হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, তিনি কূর্মাকৃতি মাংসপিণ্ডের মত পড়ে আছেন। বহুক্ষণ নাম শোনাবার পর তাঁর শরীর আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। দ্বারকাতে একদিন শ্রীকৃষ্ণের পুরবাসিনীরা মা-দেবকীকে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। মা-দেবকী যখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনা করছিলেন, সেই সময় হঠাৎ সেখানে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা এসে সেই বৃন্দাবন-লীলার কথা শুনে মহাভাবে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। সেই সময় তাঁদের শরীরে যে পরিবর্তন হয়েছিল, সেই মহাভাবময় মূর্তিই পুরীধামে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা রূপে পূজিত হচ্ছেন।

স্নানযাত্রার পর জগন্নাথদেব লক্ষ্মীদেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, একান্তভাবে কেবল তাঁরই সেবা গ্রহণ করবার জন্য, অসুখের ভান করে বিশ্রাম করেন। তখন থেকে রথযাত্রার আগের দিন পর্যন্ত ভক্তরা তাঁর দর্শন পান না। এদিকে জগন্নাথদেবের অদর্শনে ভক্তের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যদেব তো এই ভগবদ্‌বিরহ সহ্য করতে না পেরে পুরী ছেড়ে আলালনাথে চলে যেতেন। ভক্তের আকর্ষণে জগন্নাথদেব চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি লক্ষ্মীদেবীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মাত্র কয়েক দিনের জন্য মন্দিরের বাইরে এসে রথে আরোহণ করেন।

রথের সময় জগন্নাথদেব ভক্তদের কৃতকৃতার্থ করবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। অন্যান্য দেবতাদের বেলায় দেখি যে, উৎসবের সময় মূল বিগ্রহকে বের না ক'রে উৎসববিগ্রহ বের করা হয়। কিন্তু জগন্নাথদেব রথের সময় স্বমূর্তিতেই ভক্তদের কাছে আসেন।

রথের এই কয়দিনই মাত্র ভক্তরা পরম প্রেমাস্পদের মতো জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন ক'রে থাকে। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্তদের আনন্দের সীমা থাকে না—আনন্দের হাটবাজার বসে যায়। এদিকে লক্ষ্মীদেবী মন্দিরে জগন্নাথদেবের দর্শন পাচ্ছেন না, তাঁর সেবা করতে পারছেন না। ভগবদ্‌বিরহে তিনি ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। লক্ষ্মীদেবী, যিনি ভক্তিতে জগন্নাথদেবকে সম্পূর্ণ বশীভূত করেছেন, তিনিও তাঁর কয়েক দিনের অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এও কি সম্ভব? দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে সারাক্ষণ ভজন, কীর্তন, ভগবৎ-প্রসঙ্গ চলত; সব সময় সেখানে ভক্তদের ভিড় লেগে থাকত। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী দিনান্তেও একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শন পেতেন না। এইভাবে কত দিন কেটেছে। সেই সময় শ্রীশ্রীমা ভাবতেন, 'আমি যদি ঠাকুরের ভক্ত হতাম, তবে আমিও তাঁর কাছে যেতে পারতাম, তাঁর সেবা করতে পারতাম।' একই ব্যাকুলতা!

প্রশ্ন করা যেতে পারে, রথের সময় যদি জগন্নাথদেব, লক্ষ্মীদেবীকেও সঙ্গে নিয়ে যান, তবে একই সঙ্গে তো তিনি লক্ষ্মীদেবী এবং ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু না, তা হবার নয়। কারণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত লক্ষ্মীদেবীর ভাব এবং সাধারণ ভক্তের ভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে; পানিহাটির উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক ভক্তদের নিয়ে যাবেন। সারদাদেবী জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে, তিনিও তাঁদের সঙ্গে যাবেন কিনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, 'ওর যদি ইচ্ছা হয় তো চলুক।' শ্রীমা বুঝলেন যে, ঠাকুর প্রাণ খুলে অনুমতি দিচ্ছেন না। সুতরাং শ্রীমার আর যাওয়া হ'ল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাণ খুলে অনুমতি দেননি এই কারণে যে পানিহাটির লোকেরা বলবে—'হংস-হংসী এসেছে।' তাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবী যে অভিন্ন—এ তত্ত্ব তাদের বুদ্ধিগম্য নয়। জগন্নাথদেব ও লক্ষ্মীদেবী সম্বন্ধেও একই কথা। যাই হোক, রথযাত্রার তিন দিন* পরেই লক্ষ্মীদেবী ভগবদ্‌বিরহ আর সহ্য করতে না পেরে, ছদ্মবেশে গুণ্ডিচাবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। লক্ষ্মীদেবীর পরিচারিকারা জগন্নাথদেবের অনুচরদের বেঁধে লক্ষ্মীদেবীর কাছে নিয়ে যায়। তাঁরা লক্ষ্মীদেবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, চার-পাঁচদিনের মধ্যেই তাঁরা জগন্নাথদেবকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যথাসময়ে রথ জগন্নাথদেবকে নিয়ে ফিরে আসে। এদিকে ভগবদ্‌বিরহে লক্ষ্মীদেবীর অভিমান ক্রমে রাগে পরিণত হয়। অনুরাগই রাগরূপে প্রকাশিত হয়। খুবই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ তো ভগবানের কাছে জাগতিক জিনিসই প্রার্থনা করে থাকে, এবং তাদের সেই প্রার্থনা পূরণ না হ'লে অনেক সময় ভগবানের ওপর রাগও করে থাকে। সাধারণ মানুষেরই যদি এই অবস্থা, তবে ভগবানের যাঁরা একান্ত ভক্ত, তাঁরা তাঁকে না পেয়ে রাগ, অভিমান করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? যাই হোক, লক্ষ্মীদেবী রাগের চোটে জগন্নাথদেবকে দু'দিন মন্দিরেই ঢুকতে দেন না। ভক্তদেরই লাভ। তাঁরা এই দু'দিন মন্দিরের সামনে জগন্নাথদেবকে নিয়ে আনন্দ করেন। তাঁকে রাজবেশ পরিয়ে তাঁর অপরূপ রূপ প্রাণভরে দর্শন করেন। কিন্তু ভগবানের ওপর রাগ ক'রে ভক্তও কষ্ট পান। লক্ষ্মীদেবীও এই দু'দিন ছটফট ক'রে কাটান; বারবার মন্দিরের ওপর থেকে জগন্নাথদেবকে দর্শন করেন। ভক্ত, ভগবানের ওপর রাগ করতে পারেন; ভগবানের কিন্তু কারুর ওপর রাগ করা

*তিথি অনুযায়ী দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে

চলে না—তাঁকে যে সকলকে নিয়ে থাকতে হবে, সকলকে আনন্দ দিতে হবে। তাই তিনি নির্বিকার। ভক্তদের আনন্দ দিয়েই তাঁর সুখ; তাদের আব্দার তাঁকে হাসিমুখেই সহ্য করতে হয়—তবেই না তিনি জগন্নাথ। দু'দিন পরে জগন্নাথদেব আবার তাঁর মন্দিরে ফিরে গিয়ে স্বমহিমায় ভক্তদের দর্শন দিতে থাকেন। এমন যে জগন্নাথ, তিনি কি হস্তপদহীন দারুমূর্তি মাত্র? যাঁর চোখ আছে, তিনিই তাঁর স্বরূপকে দেখতে পান।

বহু সাধক জগন্নাথদেবের সেই অনন্তমহিমান্বিত রূপ দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছেন, যা 'অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির গ্রাহ্য'। এখনও কোন কোন ভাগ্যবান তাঁর দর্শন পান। সে-অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত নিজের নিজের সমস্যা মিটবে না। তাই তো ভগবানের কাছে ভক্তের আকুল প্রার্থনা—

'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।'

পারমাণবিক অস্ত্রের প্রগতি

ডক্টর ধ্রুব মার্জিত*

১৯৭৭ সালে দুনিয়াকে দেওয়া সেরা মার্কিন উপহারটি হল নিউট্রন বোমা। মানুষ মারার বিচিত্র তালিকায় সদ্য-সংযোজিত একেবারে নবীনতম আকর্ষণ—চুপচাপ মানুষ মারার এক অভিনব আয়োজন! আমরা এই পারমাণবিক আয়ুধ-শিশু সম্পর্কেই আলোচনা করবো। নিউট্রন বোমা ফাটবে 'চুপচাপ'—বলতে গেলে প্রায় 'নিঃশব্দে' অথচ প্রাণীকুল হবে নিশ্চিহ্ন। পরমাণু বোমা যদি হয় বাঘ, হাইড্রোজেন বোমা যদি হয় সিংহ, তবে নিউট্রন বোমা এক বিষধর সাপ। হিশ্ হিশ্ শব্দে—প্রায় নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়াবে মানুষের পাশে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ নিয়ে।

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। আনুষ্ঠানিকভাবে এদিন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় পৃথিবীর সর্বকালের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের। অর্থাৎ এদিনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। দু'দুটো পরমাণু বোমার বিষাক্ত কটু ধোঁয়া তখনও জাপানের বুকে কুণ্ডলী পাকিয়ে গুমরে গুমরে উঠছে। পরমাণু বোমার পিতাদের গবেষণার সদর দপ্তরে পরমাণু বোমার সূতিকাগারে বিজ্ঞানীরা তাঁদের নিজের নিজের হাত দুটোর দিকে অসহায় ভাবে তাকাচ্ছেন—এই সেই তাঁদের কুশলী হাতদুটো আর এই সেই সৃজনকুশলী আঙুলগুলো যা দিয়ে তাঁরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন সর্বকালের সেরা মারণাস্ত্রটিকে—না আর ভাবা যায় না! পদার্থবিজ্ঞানের অনবদ্য গবেষণা হতে অনেকখানি দূরে সরে এসে যশ, সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তির প্রলোভনে তাঁরা আজ মাত্র ক'জনে মিলে গোটা দুনিয়াটাকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন নরকের দরজায়। অণু-পরমাণুর কাব্যময় রঙিন পরিবেশকে এতখানি দূষিত করার জন্য এবং মানব-সমাজের প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানের এই মর্মান্তিক বেইমানির জন্য ভবিষ্যতের নাগরিক কোনদিনই হয়ত তাঁদের ক্ষমা করতে পারবেন না। এইসব হতাশাজনক ভাবনা-চিন্তার বিষাদে সেই সব বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের অন্তর ধিক্‌ৃত হয়েছিল প্রতিমুহূর্তে—হায় হায়, তাঁরা একি করে ফেললেন! কিন্তু ইতিহাসে যা একবার ঘটে যায়, তাকে তো আর মুছে ফেলে দেওয়া যায় না কোনক্রমেই!

---

* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএচ্. ডি.। স্পেকট্রোস্কপি সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর গবেষণা দেশে বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ফরেনসিক সায়েন্স পরীক্ষাগারে' পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত।

ইউরেনিয়ম-২৩৫ আর প্লুটোনিয়ম পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করে এমন এক নতুন আলো আর তাপ-কে তাঁরা মুক্ত করে আনলেন, যে-আলো 'সহস্র সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল' আর যে-তাপ হাজার হাজার বছর ধরে মনোরম এক উষ্ণতার স্পর্শ দিয়ে জড়িয়ে রাখতে সক্ষম মানুষকে। কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক ভাঙ্গার সময় প্রথম যেদিন তাঁরা এই অফুরন্ত আলো ও তাপ-কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেদিন সেই আলো আর তাপ দেখে তাঁদের বিস্ফারিত চোখ-দুটিতে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, তাতে কোন্‌টা ছিল বেশী? উল্লাস না আতঙ্ক? সদ্য-সৃষ্ট এই আলো ও তাপ মানুষকে স্নিগ্ধ আলো আর সুখপ্রদ মনোরম উষ্ণতা না দিয়ে তাকে শুধুই পোড়ালো কেন? কেন আধুনিক বিজ্ঞান প্রথমে মানব-সমাজকে উপহার দিল পরমাণু বোমাটিকে—পরমাণু-চালিত বিদ্যুৎ চুল্লীটিকে নয়? চরম দুঃখ আর হতাশার মধ্য দিয়ে একদিন ম্যানহাটন প্রকল্পের সমাপ্তি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করার মধ্য দিয়ে যে বিয়োগান্ত নাট্যের সূচনা তাঁরা করে গিয়েছিলেন, সেই নাটক আজও 'হাউস ফুল' হয়ে চলছে সমগ্র বিশ্বজুড়ে। আমরা জানি প্রথম পরমাণু বোমার আঘাতে জাপানে একদমকে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরও কয়েক লক্ষ এবং সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের এক অভাবনীয় তথা অত্যাশ্চর্য প্রগতির ইতিহাস।[১] কি করে একদমকে দশ লক্ষ, কুড়ি লক্ষ, পঞ্চাশ লক্ষ, এক কোটি মানুষকে মারতে পারা যায় এ হল সেই প্রগতি। বিজ্ঞান যুগের তালে তাল মিলিয়ে সযত্নে রেশমি কাপড়ে মুড়ে পেণ্টাগন ও ক্রেমলিনের পরমাণু যুদ্ধ-কাপালিকদের হাতে পরম বিশ্বাসভরে এক এক করে তুলে দিয়েছিল লক্ষ হাজার মেগাটনের পরমাণু বোমা। এই সুযোগে প্রগতিটাকে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে—২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ রাশিয়া কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ; ১৫ই মার্চ, ১৯৫৭ গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ ফ্রান্স কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪ চীন কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ এবং অবশেষে ১৮ই মে, ১৯৭৪ সালে ভারত কর্তৃক পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো। এছাড়া ১৯৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বিশ্বের প্রথম হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এটির শক্তি ছিল ত্রিশ লক্ষ টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের (T. N. T.) সমান এবং সর্বশেষ যে হাইড্রোজেন বোমাটি ফাটানো হয়েছে তার শক্তি এক কোটি টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের সমান। সংখ্যাটির বিশালত্বটা ভাবতে পারেন? বিজ্ঞানের এই প্রগতির প্রতিযোগিতা দেখে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, বিজ্ঞান দুনিয়াটাকে কোন্ নরকের দরজায় দিনে দিনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এটা ভাবা যেতে পারে হিরোসিমা কিংবা নাগাসাকির পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কান-বধির-হওয়া শব্দ এবং তীব্র আলোর ঝলকানি সেদিন মার্কিন বিজ্ঞানীদের ছায়া-সুনিবিড় শান্ত

১ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট এবং ৯ই আগস্ট যথাক্রমে হিরোসিমা এবং নাগাসাকি বন্দরে পরমাণু বোমার সার্থক প্রয়োগ তথা মানুষ-হত্যার ব্যাপারে বিশ্বের মধ্যে প্রথম পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কৃতিত্ব অর্জন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হিরোসিমায় ফাটানো বোমাটির শক্তি ছিল কুড়ি হাজার টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের (T. N. T.) সমান এবং এটি ছিল একটি ইউরেনিয়ম বোমা। অপরদিকে নাগাসাকির বোমার শক্তি ছিল পনেরো হাজার টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের সমান এবং সেটি ছিল একটি প্লুটোনিয়ম বোমা।

গবেষণাগারের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে কোনরকম চঞ্চলতা তোলেনি। আমেরিকার নিরাপদ আকাশ হতে কোন তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশি ঝরে পড়ে তাঁদের মাথার সুবিন্যস্ত কেশের ক'গাছিকে পুড়িয়েও দেয়নি। তবু সেদিন সেইসব বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীরা কিছুতেই পারেননি নিজেদের এই 'মহান' সৃষ্টির উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ফেটে পড়তে। বরং বলা চলে সেই সব বিমর্ষহৃদয় বিজ্ঞানীরা তাঁদের এই 'মহান' সৃষ্টির পুরস্কার হিসাবে অনেক দুঃখ, অনেক অপমান, অনেক অবিচার পেয়েছিলেন সেদিনকার সমাজের কাছ হতে। অবশ্য তখনও তাঁরা জানতেন না যে, সেরা দুঃখ অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্য অন্য এক জায়গায়—তা হল কাণ্ড-জ্ঞান-বিসর্জন-দেওয়া তথাকথিত বিশ্বের 'দার্শনিককুল'। পরমাণু বোমার তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করে তাবৎ বিশ্বের একশ্রেণীর দার্শনিককুল, লেখক-সম্প্রদায়, সংবাদপত্রসেবীর বিরাট দল এ ব্যাপারে পেন্টাগনের মার্কিন পরমাণু-যুদ্ধবিদ্‌দের কোনরকম নিন্দা না করে দোষ ধরলেন কিনা বিজ্ঞানেরই! কিন্তু সত্যই কি এর জন্য দায়ী কেবলমাত্র বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীরা? প্রকৃতপক্ষে পরমাণুর যে কাহিনী, সে কাহিনী তো মহান সব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভরা; শুধুমাত্র শুভ উদ্দেশ্যপোষণই নয়, সত্যি করেই মানুষের কল্যাণ, তার জীবন উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন এই সব দেশত্যাগী, যুদ্ধবিরোধী, নিরভিমান বিজ্ঞানীকুল। বস্তুত এই একটি মাত্র কারণের জন্যও বিজ্ঞানের এই অধ্যায়টি এতখানি করুণ; ব্যাপারটা এতখানি ট্রাজিক্।

হিরোসিমার বোমা হতে গজিয়ে উঠা 'ব্যাঙের ছাতা'র কুণ্ডলী আজ অদৃশ্য হয়েছে এবং সেই সঙ্গে আমরাও হয়ত ভুলতে বসেছি তার ধ্বংসের তাণ্ডবের কথাটাও। নতুন করে তাই আবার ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেছে পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও মর্মান্তিক কোন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের—যার ফলশ্রুতি হল নিউট্রন বোমা নামের এই নবজাতকটি।

পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে যা হয় সেটা হল—ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসকে একটি ধীরগতি (বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাপীয় বা থার্মাল নিউট্রন-রূপে যা সমধিক পরিচিত) নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয়। তার ফলে ধনাত্মক প্রোটন-কণিকা ও তড়িৎ-বিহীন নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত ঐ নিউক্লিয়াসটি ভেঙ্গে গিয়ে মাঝারি আকারের অপর দুটি পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়, যে পরমাণু দুটির নাম হল ক্রেপ্টন ও বেরিয়াম। বিজ্ঞানের পরিভাষায় সামগ্রিকভাবে পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভাঙ্গার ঘটনাকে 'ফিশন প্রক্রিয়া' বলা হয়। ভরের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী কোন পদার্থকে ভেঙ্গে অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত করলে শুরু এবং শেষের ভর সর্বদা সমান থাকে। কিন্তু ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রক বিভাজনের সময় দেখা গেল একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। দেখা গেল ইউরেনিয়ম-২৩৫-এর ভর সদ্য-সৃষ্ট পরমাণু দুটির অর্থাৎ ক্রেপ্টন ও বেরিয়াম পরমাণুর সম্মিলিত ভরের চেয়েও কিছুটা বেশী। এটা কেমন করে হল? হিসাব মত এটা কোনমতেই ঘটতে পারে না। এতদিনের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণা সব কিছুতেই আঘাত হানলো এই তথ্য। অথচ অবিশ্বাস করার কোনই উপায় নেই। ব্যাপারটি যে একেবারে জলজ্যান্ত সত্য। অনেক রকম হিসাব-নিকাশের পর হতবাক্-করা এই সমস্যাটির সমাধান মিলল বিজ্ঞানীকুল-প্রদীপ মহান আইনস্টাইন প্রণীত ভর-শক্তি সমীকরণ হতে। ধন্যবাদ আইনস্টাইনকে—বিচিত্র একটি পরিস্থিতি হতে তিনি মুক্তি দিলেন বিজ্ঞানকে। তাঁর সেই সুবিদিত সমীকরণে তিনি বলেছেন—পদার্থের ভরের

সঙ্গে আলোকের গতির মানের বর্গ গুণ করলে যে মানটি পাওয়া যায় তাই হল পদার্থটির নিহিত শক্তি। $E=mc^2$; যেখানে E=শক্তি, m= পদার্থের ভর এবং c=আলোকের বেগ (এটি হল একটি ধ্রুবক সংখ্যা এবং এর মান 3×10^{10} সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে)। এই সমীকরণটি নিছক কোন গাণিতিক সূত্র নয়; এ যেন সৃষ্টির 'বীজমন্ত্র'। এ মন্ত্রে ঋষি আইনস্টাইন যেন বলছেন—"পদার্থের 'ভর' এবং 'শক্তি' এ রাশি দু'টি কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। তাদের মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে। পদার্থ জন্ম দিতে পারে শক্তির আবার পদার্থ জন্ম নেবে শক্তির বিলোপে।"

যাইহোক আমরা আবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই —ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণু ভেঙ্গে ক্রেপ্টন ও বেরিয়াম পরমাণু জন্ম নেবার সময় ভরের হিসাবে যে গরমিল হচ্ছিল সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল আইনস্টাইনের ঐ ভর-শক্তি সমীকরণটি হতে। বুঝতে পারা গেল—আসলে ব্যাপারটি কি হচ্ছিল এতদিন। যে ভরটুকুর হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না, সেটা আসলে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই শক্তি বা তেজ কোন একটি পরমাণু হতে ছাড়া পাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের সময় যে তাপশক্তি, আলোকশক্তি এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে, তারই উৎস হল ভর থেকে রূপান্তরিত শক্তি। কিন্তু একসঙ্গে এত শক্তি কোথা হতে আসে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে কৃত্রিমভাবে ঘটানো প্রথম পর্যায়ের ফিশন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিক্রিয়ার ফলে আরও কতকগুলি নিউট্রন-কণিকা নির্গত হয়, সেগুলি আবার অবশিষ্ট ইউরেনিয়ম পরমাণুর উপর আঘাত হেনে তাদের নিউক্লিয়াসগুলিকে বিদীর্ণ করে দেয়। এর ফলে আবার আরও কতকগুলি নিউট্রন-কণিকা নির্গত হয় এবং সেগুলি আবার ইউরেনিয়ম পরমাণুকে বিদীর্ণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকা পারমাণবিক ক্রিয়াটিকে বলা হয় শৃঙ্খল-বিক্রিয়া বা 'চেন রিয়াকশন'। একবার এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরু হলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর থামবে না এবং ব্যাপারটি এতই দ্রুততার সঙ্গে সমাধা হয় যে, মুহূর্তের মধ্যে সবকটি পরমাণু হতে নিঃসৃত তেজ বা শক্তি একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে একটা ভয়াবহ আকার নেয়, যার ফলশ্রুতি হল এ্যাটম বোমা বা ফিশন বোমা। এ ধরনের বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে শক্তি নিঃসৃত হয়, তার শতকরা পঁচাশি ভাগই হল প্রচণ্ড উত্তাপ, তীব্র আলোক, কান-বধির-হওয়া শব্দ এবং প্রবল ঝঞ্ঝা। বাকি পনের ভাগের মধ্যে সাত ভাগ হল বিভিন্ন প্রকার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-জনিত শক্তি এবং গামা রশ্মি ও নিউট্রন-কণিকা স্রোতের ভাগ হল শতকরা চার ভাগ করে। বস্তুত পরমাণু বোমা হতে নিঃসৃত এই পনেরো শতাংশ ভাগ শক্তি বা তেজ-ই জীবজগতে দীর্ঘমেয়াদী তেজস্ক্রিয় প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী।

অপরদিকে হাইড্রোজেন বোমার বিধ্বংসী শক্তির মূলে আছে আরেক ধরনের পারমাণবিক বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার নাম ফিউশান বা সংযোজন-ক্রিয়া। সেজন্য বিজ্ঞানের পরিভাষায় হাইড্রোজেন বোমাকে বলা যেতে পারে ফিউশান বোমা। ফিউশান-প্রক্রিয়াটি হল দুটি হালকা জাতের পরমাণুর পারস্পরিক সংযোজন। এক্ষেত্রে হালকা জাতের পরমাণুরা হল প্রধানত হাইড্রোজেন এবং তার অন্যান্য আইসোটোপ। এজন্যই এই মহা-আয়ুধটির নামকরণ করা হয়েছে—নিরীহ ঐ একরত্তি হাইড্রোজেন পরমাণুর নামানুসারে। প্রচণ্ড তাপের ফলে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত হয়ে তৈরী হয় একটি হিলিয়াম পরমাণু। এক্ষেত্রে দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট ভর সদ্য-সৃষ্ট হিলিয়াম পরমাণুটির ভরের চেয়ে কিছুটা বেশী এবং

ঐ অতিরিক্ত ভরটুকু নিউট্রন-কণিকা ত্যাগের মাধ্যমে এবং শক্তি আকারে নিঃসৃত হয়। কিন্তু কোন দু'টি পরমাণুর মধ্যে সংযোজন বা ফিউশান ঘটাতে গেলে যেটা একান্তই প্রয়োজন তা হল প্রচণ্ড এক তাপমাত্রার সৃষ্টি করা—বিক্রিয়া শুরু করার জন্য যে প্রাথমিক তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় তার মান হল এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এই অকল্পনীয় তাপমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য হাইড্রোজেন বোমার 'সলতে'-তে একটি পরমাণু বোমা জুড়ে দেওয়া হয় এবং ঐ পরমাণু বোমাটি ফাটার সঙ্গে সঙ্গে এক কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রার সৃষ্টি হয় আর তার ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুদের মধ্যে ফিউশান-ক্রিয়া চালু হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সময় একই সঙ্গে যুগপৎ ফিশন (অর্থাৎ এ্যাটম বোমা) ও ফিউশান (অর্থাৎ হাইড্রোজেন বোমা) প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তাই স্বভাবতই পরমাণু বোমার তুলনায় এর প্রলয়ংকরী ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী। কোথায় কুড়ি হাজার টন টি. এন. টি. শক্তি আর কোথায় এক কোটি টন টি. এন. টি. শক্তি!

এবার শুরু করা যাক নিউট্রন বোমা প্রসঙ্গ। পর্যবেক্ষক মহলের মতে দীর্ঘস্থায়ী কু-ফলের দিক হতে নিউট্রন বোমা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত যে কোন পারমাণবিক অস্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এ বোমা তৈরীর যাবতীয় কলা-কৌশল খুব সঙ্গত কারণেই এখন পর্যন্ত সামরিক গুহ্যতথ্য। নিউট্রন বোমার কারিগরী কৌশল এখনও সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় মার্কিন পরমাণু-বিজ্ঞানী ও পেণ্টাগনের যুদ্ধ-বিশারদদের করায়ত্ত। তবে এটা ঠিকই যে, এ বোমা তৈরীর মূল নীতি হল হাইড্রোজেন বোমারই অনুরূপ। নিউট্রন বোমার ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তাপ, বাতাসের প্রবাহ ইত্যাদি অনেক কিছুই হবে খুব নিয়ন্ত্রিত মাত্রায়। তার বদলে অনিয়ন্ত্রিত হারে যেটা হবে তা হল এক বিপুল পরিমাণে সৃষ্ট দ্রুতগতি নিউট্রন-কণিকার স্রোত। পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝা, উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সৃষ্টি হয়ে থাকে; নিউট্রন বোমা বিস্ফোরণের সময় কিন্তু এ ধরনের কোন প্রলয়কাণ্ড ঘটবে না। এ বোমা ফাটার ফলে সামান্যই উত্তাপ ও মৃদু ঝড়ের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে ভয়ঙ্কর এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যা খুব পুরু ধাতব পাতের আবরণকেও ভেদ করে যেতে পারবে, ফলে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, পার্ক-উদ্যান অথবা ব্যক্তিগত ধন-দৌলত যেমন ছিল তেমনি থাকবে। দিগন্ত-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র আর বন্ধ্যা হয়ে পড়বে না যেমনটা কিনা হত পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের পর। তবে হ্যাঁ, তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব ধীরে ধীরে চলতে থাকবে যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বিস্তীর্ণ এক এলাকা জুড়ে সব রকমের প্রাণের বেহিসাবী মৃত্যু। ভাবুন একবার সুসজ্জিত একটি নগরীর সব কিছুই রইল প্রায় অটুট অথচ সেখানে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। পরিত্যক্ত এক সর্বগ্রাসী মৃত্যুপুরীর সামনে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। নিউট্রন বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রধান উৎস হল দ্রুতগামী নিউট্রন-কণিকার স্রোত। বস্তুত এই বোমা সহস্র ধারায় নিউট্রন-বিকিরণকারী বলেই বোমাটির নাম হয়েছে—নিউট্রন বোমা। নিউট্রন বোমা ফাটানোর ফলে বেরিয়ে আসা মোট শক্তি বা তেজের শতকরা পঁচাশি ভাগই হল নিউট্রন-কণিকার স্রোত। বাকি পনেরো শতাংশ শক্তি ব্যয় হয় তাপ ও ঝড় সৃষ্টির জন্য। আগেই বলেছি দ্রুতগামী নিউট্রন-কণিকার ভেদ করার ক্ষমতা অকল্পনীয়—জীববিজ্ঞানীদের মতে এই কণিকা জীবদেহের কোষের মধ্যে প্রবেশ করে কোষের প্রোটোপ্লাজমকে আয়নিত বা চার্জড করে তুলবে, যার ফলে জীবদেহের 'জিন' বা বংশগত-নিয়ামকগুলি পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যার

ফল মৃত্যু অথবা ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গুজীবন। হাইড্রোজেন বোমার সলতে হিসাবে যেমন পরমাণু বোমার ব্যবহার হয়, নিউট্রন বোমার সলতে হিসাবে তেমনি ব্যবহার করা হচ্ছে 'অতি কম্পনশীল প্লাজমা'কে। অতি কম্পনশীল প্লাজমাকে নিউট্রন বোমার সলতে হিসাবে ব্যবহার করা ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রয়োগের দিক হতে নিঃসন্দেহে খুব গৌরবময়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত নিউট্রন বোমাকে উত্তেজিত করার মহান দায়িত্ব বর্তেছে এই প্লাজমার[২] উপরে। প্লাজমার প্রচণ্ড উত্তাপের সাহায্যে ফিউশান-প্রক্রিয়া চালু করা হয়।

নিউট্রন বোমার আরেক বিশেষত্ব হল—পরমাণু বোমা অথবা হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হলে তাপ, ঝড়, ভূ-কম্পন, শব্দ ও তীব্র আলোর ঝলকানি ইত্যাদি সব কিছুই খুব বেশী করে হয়; ফলে ফাটানোর খবর সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে; কিন্তু নিউট্রন বোমা ফাটানো হলে তার হদিস এ ধরনের কোন যন্ত্রে ধরাই পড়বে না। রাষ্ট্রনায়কগণ ঘোষণা না করলে বুঝতেই পারা যাবে না যে, কোন পারমাণবিক বোমা ফাটলো—তবে হ্যাঁ, বুঝতে খুব দেরীও হবে না। এ বোমার তেজস্ক্রিয়তাই জানিয়ে দেবে মৃত্যুর স্পর্শ কতখানি শীতল, কতখানি নির্মম। মাটি হতে যদি একুশ ফুট উঁচুতে নিউট্রন বোমা ফাটানো হয় তবে এর দরুন যে তাপ ও ঝড়ের উদ্ভব হবে, তা এক হাজার ফুট ব্যাসের মধ্যে সীমিত থাকবে। অর্থাৎ দশ হাজার টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন শক্তিসম্পন্ন (নিতান্তই খুদে একটি এ্যাটম বোমা) একটি পরমাণু বোমা ফাটালে যে ধরনের তাণ্ডবের সৃষ্টি হওয়ার কথা—এটা তারই অনুরূপ। এত কম বিস্তারে নিউট্রন বোমার দাপাদাপি সীমাবদ্ধ থাকে বলেই ভূ-কম্পন বা সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে তা ধরা পড়ে না।

নিউট্রন বোমা ফাটানোর ফলে যে প্রচণ্ড নিউট্রন-কণিকার স্রোত নির্গত হয়, তার একটি প্রয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন—তা হল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুদের ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপে[৩] রূপান্তর। যেমন ইউরেনিয়াম-২৩৮ হতে ইউরেনিয়ম-২৩৯-এ রূপান্তর অথবা থোরিয়াম পরমাণুর ইউরেনিয়ম-২৩৫-তে রূপান্তর। এ ধরনের রূপান্তরগুলি এতদিন কৃত্রিম উপায়ে করা হতো, কিন্তু ব্যাপারগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, শ্রমসাধ্য।

এখন হতে হয়তো কাজটা আর অত শক্ত থাকবে না। জানি না নিউট্রন বোমার পিতারা নিজেদের সৃজনকুশলী আঙ্গুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কি ভাবছেন। পরস্পরের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কতখানি আত্ম-প্রসাদ পাচ্ছেন। ঠিক এ মুহূর্তে তাঁরা আনন্দে

২ প্লাজমা হল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। অতি উত্তপ্ত—এক তুরীয় অবস্থাও বলা চলে। আমরা জানি কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করা হলে তা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তাকে আরও তাপ দিলে সেটি রূপান্তরিত হয় বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থে। এখন যদি সেই গ্যাসীয় পদার্থটিতে আরও অনেক তাপ প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি রূপান্তরিত হয় প্লাজমায়। সূর্য সহ বিভিন্ন নক্ষত্রে পদার্থের এই তুরীয় অবস্থা বিদ্যমান—কারণ সেখানকার অকল্পনীয় তাপমাত্রা। প্রচণ্ড তাপমাত্রার ফলে প্লাজমা অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে পরমাণুগুলি ধনাত্মক আয়নে রূপান্তরিত হয়, তখন ঐ ধনাত্মক পরমাণু এবং ইলেকট্রনগুলি মিলেমিশে বিচিত্র এক ধরনের গ্যাসের সৃষ্টি করে। এই গ্যাসীয় মিশ্রণের নামই হল প্লাজমা।

৩ কোন পরমাণুর ইলেকট্রন-সংখ্যা একই থাকা সত্ত্বেও যখন তার নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য ঘটে অর্থাৎ পরমাণুটির ভরের পরিবর্তন হয়, তখন সে ধরনের পরমাণু-গুলিকে ঐ মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ বলে।

কতখানি আত্মহারা হচ্ছেন। এ্যাটম বোমাকে নিতান্তই এক করুণ মানবিক পরিবেশের মধ্যে ফাটিয়ে কয়েক মুহূর্তে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পর যেমন তাঁরা নিদারুণ এক অবসাদ আর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং বিশ্বের এই অনুতপ্ত বিজ্ঞানীকুল যেমন তাঁদের অগ্নিময় মেধা দিয়ে নতুন করে আবার একবার ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পরমাণুর উপর—তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত সকল সাধনার ফসল নিয়ে—কি করে পরমাণুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় তার চিন্তা নিয়ে এবং এক সময় পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করে তার সকল শক্তিকে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন মানুষের দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শিল্প-উন্নয়নসমস্যা ইত্যাদির মোকাবিলার জন্য, তেমনি নিউট্রন বোমার পিতারাও এগিয়ে আসুন নিউট্রনের শক্তিকে মানুষের পায়ে অর্ঘ্য-উপচারে সুসজ্জিত করার শুভ ইচ্ছা আর সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে। মানব-সমাজ তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে এই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে, যাঁরা এত ধীমান, যাঁরা এত মহান, যাঁরা এত উদার সেই বেহিসাবী, আত্মভোলা, নিরভিমান মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানীকুল এবার নিশ্চয়ই আর পেণ্টাগনের যুদ্ধবাজদের হাতে নিউট্রন বোমাটিকে তুলে দিয়ে মানুষ মারার প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে যাবেন না, তাঁরা বরং হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীকে চিরকাল শান্তির স্নিগ্ধ আলোক আর সমৃদ্ধির সুখকর মৃদু উষ্ণতায় ঘিরে রাখতে সচেষ্ট হবেন।*

* প্রবন্ধটি ছাপার পর এ. এফ. পি.-র সংবাদ: ২৬শে জুন ১৯৮০, ফ্রান্স তার প্রথম নিউট্রন বোমার সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।—লেখক

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

তৃতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

কাশীপুরের বাগানবাড়ী। নীচের হলঘরে গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন রসের মজলিস বসিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের রসবোধ প্রবল। সে-সঙ্গে তীক্ষ্ণধার যুক্তি ও অসাধারণ মনীষিতা। গিরিশচন্দ্র রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করছিলেন দুর্গাপূজার নক্সা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পীড়িত, ওপরে দোতলার ঘরে আছেন। ভক্তেরা প্রাণপাত করে তাঁর সেবা করছেন।

আজ সোমবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বিকাল সাড়ে চারটা। মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এসেছেন। গিরিশচন্দ্র মাষ্টারকে দেখে অভ্যর্থনা জানান, 'St. Paul আইছন্তি।' হাসির রোল ওঠে। তিনি রাজনীতি ও নসে সম্বন্ধে বলেন। ধর্মবিটকেল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর প্রতিবেশী···ঘোষকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি গম্ভীর স্বরে তুলে ধরেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সিদ্ধান্তটি: সর্বত্যাগ না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন: সে কিনা বলে যে Jesus ও চৈতন্য এক![1]

গিরিশচন্দ্র: মহাপ্রভু বলেছেন, 'কলিতে নামমাহাত্ম্য।' তিনি এই বলে কেঁদেছেন,

১ সুরেন্দ্রনাথ সর্বধর্মসমন্বয়ের যে ছবিটি আঁকিয়েছিলেন সেখানে শ্রীযীশু ও শ্রীচৈতন্য পরস্পরের হাত ধরে নৃত্য করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছবিটির তারিফ করেছিলেন।

'আমার অনুরাগ তো হল না।' ভক্তদের কথাবার্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। মাষ্টারমশায়ের দেখা হয় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ বলেন: আমি ডাক্তার সরকারের বাড়ীতে সামনের বুধবার যাব না…।

নরেন্দ্রনাথ এখন সাধনভজনে প্রমত্ত, তাঁর তীব্র বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: 'যার তীব্র বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। সংসারকে পাতকুয়া দেখে; তার মনে হয়, বুঝি ডুবে গেলাম। আত্মীয়দের কালসাপ দেখে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়; আর পালায়ও।' (কথামৃত ১।৪।৩)

সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা একবার দহে পড়লে আর রক্ষা নাই। সংসার গোলকধাঁধা, একবার ঢুকলে বেরোন মুশকিল। এ-সংসারচিত্র সাধকপ্রবর নরেন্দ্রনাথের চিত্তক্ষেত্রে যে বৈরাগ্যের কাল-বৈশা তুলেছে, তা দেখে সকলে মুগ্ধ হয়।

বাগানের সেই দোতলার ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। মাষ্টার সেখানে প্রবেশ করেন। দেখেন সেখানে উপস্থিত ভবনাথ, ছোট নরেন, যোগীন প্রভৃতি। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নীরব গম্ভীর। তিনি মুখ কুলকুচি করেন, তাঁর গলার ঘায়ে ঘি লাগান হয়।

ছোট নরেন বলেন: গাঁদা পাতা দেওয়া ভাল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, কোন কথা বলেন না।

নিরঞ্জন মাষ্টারমশাইকে লক্ষ্য করে বলেন: চলুন সবাই নীচে যাই।

যোগীন নীচে নেমে নিরঞ্জনকে একপাশে ডেকে বিরক্তিসহকারে বলেন: কেন তুমি উপরে উঠতে দাও, যদি উনি (ঠাকুর) বেজার হন?

মাষ্টারমশাই সঙ্কুচিত বোধ করেন, অকস্মাৎ হতাশার ঝাপ্‌টায় আক্রান্ত হন, বিভ্রান্ত বোধ করেন।

মাষ্টারমশাই সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যান। পথে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর জীবনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাহিনী। বলতে গেলে তিনি এক অলৌকিক উপায়ে ধর্মপথে পরিচালিত হয়েছিলেন। বিচিত্র সে-কাহিনী। সংসার-বিরক্ত সুরেন্দ্রনাথ যখন আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছিলেন, সে-সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে শরণাগতির উপদেশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "লোকে বাঁদর-ছানা হইতে চায় কেন? বিড়াল-ছানা হইলেই তো ভাল হয়, বাঁদরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরিলে তবে সে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে। কিন্তু বিড়াল-ছানার স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়া দেয়, সেই স্থানে পড়িয়াই 'ম্যাও ম্যাও' করিতে থাকে।"[২] জগন্মাতার উপর শরণাগতির উপদেশ সুরেন্দ্রের জীবনে এনেছিল আমূল পরিবর্তন। বর্তমানে এ-কাহিনী সুরেন্দ্রনাথের মুখে শুনে মাষ্টারমশায়ের ধারণা হয়, এই মহৎ উপদেশ তাঁর জন্যও প্রযোজ্য। তাঁর হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। তিনি শরণাগতির এই ভাবনা নিয়ে অন্তরের গভীরে ডুব দেন। সুরেন্দ্রনাথ আরও বলেন: 'ঠাকুর যে আমাকে মদ ছাড়তে বলেছেন তা নয়।' ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের প্রত্যেককে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র, বিচিত্র এবং অনেক সময়ে অপরের পক্ষে দুর্বোধ্য।

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট হতে বিদায় নিয়ে

[২] স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সং, পৃঃ ২৭৮-৯

মাষ্টারমশাই যান ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী, ১১নং মধু রায় লেনে। তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। মাষ্টারমশাই যান রামবাবুর শয়নঘরে। রামচন্দ্রের ধ্যানধারণায় পরমহংসদেব-আধার গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের সমষ্টি। একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রবক্তা রামচন্দ্র। মাষ্টারমশাই গিয়ে দেখেন রামবাবু অভিনিবেশসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশমালা[৩] লিখছেন। তিনি গুণগ্রাহী শ্রোতা মাষ্টারকে পেয়ে বলতে থাকেন: শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বের যুক্তিগুলি সুস্পষ্ট। দেখা যায়, অবতারপুরুষ অপরকেও পরমহংসত্ব দান করেন। তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য জীবন-পাত করেন। তিনি পাপীতাপীদের পরিত্রাণ করেন।[৪] এ-সকল যুক্তির সঙ্গে তিনি আরও জুড়ে দেন: তাছাড়া তাঁর ঐশ্বর্যে আমরা ঐশ্বর্যবান।

রামচন্দ্র দত্ত প্রসঙ্গান্তরে যান। তিনি বলেন: হরমোহন (মিত্র) বলে, আপনার নাকি inspiration হয়।

মাষ্টারমশাই সবিনয়ে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। তিনি ভক্ত রামচন্দ্রের নিকট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কঠিন ব্যাধির বিষয় উত্থাপন করেন। অভিমানী রামচন্দ্র[৫] বেশ কিছুদিন কাশীপুর বাগানে যাননি।

মাষ্টারমশাই বলেন: উনার বড় কষ্ট। যদি একবার যান তো ভাল হয়। তাঁর এই অসহনীয় যন্ত্রণা স্মরণ করিয়ে দেয় যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে প্রাণদান।

আমরা এ-প্রসঙ্গের আলোচনা হতে শুনেছি ২২শে এপ্রিল তারিখে। আলোচনা হয়েছিল মাষ্টারমশাই ও উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মভক্ত হীরানন্দ সৌখিরামের মধ্যে। কঠিন দেহযন্ত্রণার মধ্যেও ঈশ্বরপ্রাণিত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অটুট ঈশ্বরাভিনিবেশ লক্ষ্য করে হীরানন্দ বলেছিলেন: হাঁ, যেমন Christ-এর Crucifixion। তবে এই mystery যে এঁকে (ঠাকুরকে) কেন যন্ত্রণা? "মাষ্টারমশাই উত্তরে বলেছিলেন: ঠাকুর যেমন বলেন, 'মার ইচ্ছা'। এখানে তাঁর এইরূপই খেলা।"[৬] (কথামৃত ২।২৭।৪)

এক্ষণে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র বলেন একটি চমকপ্রদ কথা। তিনি বলেন: সব সহ্য হবে।

মাষ্টারমশাই স্বরূপ দামোদর ও গদাধর প্রভৃতির উল্লেখ করেন। মহাপ্রভু যমুনা-ভ্রমে চন্দ্রকান্তি-উচ্ছলিত সমুদ্রতরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে-

---

৩ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশমালা বা 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০শে জুন, ১৮৮৬ বা ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৮ শক।

৪ কলকাতায় ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত 'রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা' ভাষণে রামচন্দ্র দত্ত অবতারত্বের নয়টি লক্ষণ দেখিয়েছিলেন: (১) জীবে দয়া (২) পতিতদের উদ্ধার (৩) সর্বভূতে সমজ্ঞান (৪) ধর্মের সামঞ্জস্যভাব (৫) পরম বৈরাগ্য (৬) জৈবধর্মবর্জিত ভাব (৭) অলৌকিক শক্তিমত্তা (৮) আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব ও (৯) সেবকদিগের কর্মনাশ। শ্রীরামকৃষ্ণে এ-সকল ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫ ঠাকুর বলতেন, 'রাম একটু অভিমানী।' (স্বামী নিত্যাত্মানন্দ: শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৬১)

৬ এ-বিষয়ে মাষ্টারমশায়ের আরেকটি ব্যাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন: 'হরিণ-ভ্রমে হঠাৎ ব্যাধের তীরে (শ্রীকৃষ্ণের) পা বিদ্ধ হলো। তাতেই দেহ গেল। ক্রাইস্টের Crucifixion হ'ল। অবতারগণ এসে দেখিয়ে গেছেন এসব থাকবেই। Don't murmur; ··· এতে কি লোকের কম লাভ হচ্ছে? চৈতন্য করিয়ে দিচ্ছে। কত বড় উপকার। এতে seeking for the Eternal Life-এর সন্ধান দিচ্ছে। অমৃতত্বে নিয়ে যাচ্ছে।' (শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৩৩৯)

ছিলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনে স্বরূপ দামোদর ও গদাধর আকুলিবিকুলি করতে থাকেন। চৈতন্য-চরিতামৃত-কার লিখেছেন : প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ। অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥ (সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, পৃঃ ৫৭৪) নরলীলা-অবসানে তাঁরা রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করেন : নৃত্যগোপাল (ঠাকুর সম্বন্ধে) কি বলে ?

রামচন্দ্র : বলে, 'আমি বুঝতে পারি না।'

মাষ্টারমশাই বাড়ীতে ফিরেন। কাশীপুরের ঘটনা স্মরণ করে তাঁর চিত্ত ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ণ। তিনি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত বিড়ালশাবকের শরণাগতিই একমাত্র অবলম্বনীয় ভেবে তিনি সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করেন। তাঁর সারা রাত কাটে দুর্ভাবনায়।

পরদিন মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বাদশী, পুনর্বসু নক্ষত্র। ৫ই ফাল্গুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

পথে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা হয় অমৃত-বাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের। শিশির-বাবু তিনখানি ছবি নিয়ে চলেছিলেন। একটি ছবিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নটবর বেশ, দ্বিতীয়টিতে চপল গোপাল ও তৃতীয়টিতে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর তাঁরা চলে যান। মাষ্টারমশাই এদিন কাশীপুরে যাননি, তিনি অপরের কাছে এদিনের বৃত্তান্ত শোনেন।

কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চি ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষ ভক্তি করতেন। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন তাঁকে মাঝে মাঝে মহাভারত পাঠ করে শোনাতেন। তিনি ঠাকুরের সংবাদ নিতে এসে-ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সেবককে বলেন : **ওকে [ভোলানাথকে] ভাল করে খাওয়াস।**

ভোলানাথ চলে যাবার পর কৌতূহলী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবককে জিজ্ঞাসা করেন : **গিরিশ, সুরেন্দর, রাম এরা ফিরে এসেছে ? কি বললে ?**

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পারেন যে, মহিমা চক্রবর্তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। বাগানবাড়ীর নিকটেই ৩০নং কাশীপুর রোডে তাঁর বাড়ী।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : **'ও যেন যার তার বাড়ীতে না খায়।'**

এদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নির্লিপ্তভাবে বাগানে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ একান্তে কথা বলছিলেন সুবোধচন্দ্রের সঙ্গে। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দোনাতে করে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন।

এই দিনটির একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, তাপস তারকনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ[৭] করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। তিনি ১৮৮২ হতে প্রায় চার বছর রামবাবুর বাড়ীতে থেকে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন, ১৮৮৬ সালে কাশীপুর বাগানে একেবারে[৮] চলে আসেন।

কাশীপুর বাগানে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-বিলাস করছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে কঠিন ক্যান্সার-রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অবর্ণনীয় দেহযন্ত্রণায়

---

৭ স্বামী শিবানন্দজীর একটি দীর্ঘ চিঠি অবলম্বনে প্রবুদ্ধ ভারত, ১৯৩০ খ্রীঃ মার্চ সংখ্যায় 'Sri Ramakrishna' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে শিবানন্দজী লেখেন : 'I myself had the privilege to attain that high spiritual consciousness (samadhi) thrice by his (Sri Ramakrishna's) touch and wish during his life-time. I am still living to bear direct testimony to his great spiritual powers.' (পৃঃ ১১০)

৮ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ : শ্রীম-দর্শন, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৩০৩

কষ্ট পাচ্ছিলেন। কাশীপুরের বাগান ঘাস, গাছ, ফুলে সাজানো। নয়নস্নিগ্ধকর শোভা। বাগান-বাড়ীর দোতলায় রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ। যাবতীয় চিকিৎসা ব্যর্থতায় প্রায় পর্যবসিত। সেবকদের তনু-মন-প্রাণ-সমর্পিত সেবায় তৃপ্ত হয়ে রোগী কখনও কখনও কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করেন। কিন্তু ভক্তদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে রোগীর প্রকৃত অবস্থা যুক্তি-প্রমাণের ব্যাখ্যাতীত, সত্যই দুর্বোধ্য। সামনে দেখেন আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি, চতুর্দিকে এক ধ্যানসুন্দর ভাবমণ্ডল।

আজ বুধবার, শুক্লা চতুর্দশী, পুষ্যা নক্ষত্র। ৬ই ফাল্গুন, ১২৯২ সাল। ইংরাজী ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

বিকাল সাড়ে চারটায় মাষ্টারমশাই এসেছেন বাগানবাড়ীতে। তিনি একতলায় 'দানা'দের ঘরে উপস্থিত হয়ে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন: পরমহংসদেব কেমন আছেন?

নরেন্দ্র বিরক্ত হয়ে কিছু মন্তব্য করেন।

মাষ্টারমশাই বলেন: রেগেছেন, কেননা আমরা মাগের কাছে শুই।

নরেন্দ্রনাথ: সে-সব ভেবে বলিনি—তবে গিরিশ ঘোষ যেমন বলেন, কোথাও বাঁধুনি নেই—স্রোতে চলছে।

মাষ্টারমশাই শোনেন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সেদিন পীড়িত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। বাগানে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ কথা বলছিলেন। গিরিশচন্দ্রের গম্ভীর ভাব। তিনি ডাঃ সরকারকে বলেন: স্রোতে চলছি। মানুষের সাধ্য নাই [এই স্রোত রুখে বা ধারা পরিবর্তন করে]।

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখেন মাটিতে জল পড়েছে। তিনি ঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন: জল যে ফেলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

মাষ্টারমশাই সেবক কালীপ্রসাদের কাছে শোনেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজও জিজ্ঞাসা করেছিলেন: **গিরিশ ঘোষ এখন কিছু বলে?**

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগাক্রান্ত দেহ অনিবার্যতার দিকে দ্রুত গমনোদ্যত। এদিকে তাঁর আজন্ম ভগবন্মুখী জীবন তাঁর সেবক-সাধকদের ভগবদানন্দ-লোকের গভীরে পরিচালিত করছিল। অত্যন্ত ক্ষমতাবান আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ এক অসাধারণ নিজস্ব ধারায় প্রত্যেক সাধককে নিজ নিজ প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী উপদেশ-নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তার অব্যবহিত ফলশ্রুতিস্বরূপ বিভিন্ন সাধকের মধ্যে বিচিত্র ভাবৈশ্বর্যের বিকাশ ঘটেছিল।

সেবক সুবোধ ঘোষ 'খোকা' নামেই পরিচিত। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-নির্দেশ মাষ্টারমশায়ের কাছ থেকেও লাভের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। সেই সুবোধ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে সাধনসাগরে সন্তরণ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন। মাষ্টারমশাই সুবোধের সঙ্গে কথা বলে চমৎকৃত হন।

সুবোধ বলেন: 'নির্বিকল্প সমাধিই উদ্দেশ্য। রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি সব মায়া। মাটিতে গড় হয়ে [প্রণাম করা এসব মনের ভুল। অখণ্ড সচ্চিদানন্দই সত্য।]'

'উনি (পরমহংসদেব) যে বারো বৎসর অখণ্ডে ছিলেন।'

নরেন্দ্র নীরব থাকেন। মাষ্টারমশাই লক্ষ্য করেন যে, গিরিশচন্দ্র ব্যতীত সকল গৃহীভক্তদের প্রতি নরেন্দ্রনাথের মনোভাব কঠোর।

সম্ভবতঃ সেদিন রাত্রেই মাষ্টারমশায়ের এক অভূতপূর্ব স্বপ্নদর্শন ঘটে। তিনি দর্শন করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন: 'গুরু ও তিনি এক—আমিই তিনি।'

মাষ্টারমশায়ের অন্তঃকরণ সর্বপ্রসন্ন-উজ্জ্বলতায় ভরে ওঠে।

কাশীপুরের উত্তর ঝিলের পূর্বে সম্মুখস্থ বাগান-বাড়ী। বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের। ঠাকুরের চিকিৎসার্থ বাগানভাড়া নেওয়া হয়েছে। প্রথমে ভাড়া ছিল ৬০-৬৫ টাকা, পরে ধার্য হয় মাসিক ৮০ টাকা।

আজ শনিবার, কৃষ্ণাদ্বিতীয়া তিথি, পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র। ৯ই ফাল্গুন। ইংরাজী ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। উপরের হলঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আছেন হাজরা, মাষ্টার, নিরঞ্জন ও বুড়ো-গোপাল। তখন বেলা চারটা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে বলেন: **ইনি [মাষ্টার] তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন।**

হাজরা: আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি। শিবুর চিঠিতে জেনেছি যে, তিনি সব স্থানে নমস্কার করেছিলেন—এখান থেকে শক্তিসঞ্চার হয়ে যাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের প্রশংসা করে বলেন **[না] কেউ [যেতে] বলে নি।**

হাজরা: আমাদেরই যেতে ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ: [আবার] **মাটি এনেছে।** এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মেড়গা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সে-গ্রামের মাটি হতে খোল তৈরি হয় শুনে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন।[৯]

তিনি আবার উদাহরণ দিয়ে বলেন বিভীষণ ও নরের কাহিনী।[১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সহজেই ভাব-তরঙ্গ ওঠে, তিনি ভগবদ্ভাবের উদ্দীপনায় আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন।

অধিক কথাবার্তায় রোগ বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় সেবক বুড়োগোপাল বলেন: আর কথা কয়ে কাজ নেই—অনেক হয়েছে।

বাগানের পূর্বধারে পুষ্করিণী-ঘাট। ঘাটে বসে আছেন হাজরামশাই ও মাষ্টারমশাই।

প্রতাপচন্দ্র হাজরার বয়স প্রায় ৪৭।৪৮ বৎসর। ঠাকুরের জন্মভূমির কাছেই মড়াগোড় গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা। বাড়ীতে জমিজমা আছে, তাতেই পরিবারের ভরণপোষণ হয়। প্রায় এক হাজার টাকা দেনা হওয়ায় তিনি খুব চিন্তিত থাকতেন। ঠাকুরের নিকটে দীর্ঘকাল বাস করেও প্রথমদিকে হাজরা ঠাকুরের মূল্যায়ন করতে অপারগ হয়েছিলেন। তবুও হাজরা নানাভাবে ঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন। মাষ্টারমশায়ের অনুরোধে হাজরা স্মৃতিচয়ন করে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম দর্শনের কাহিনী বলেন। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, মানুষ জপতপ করেও এগুতে পারে না ; তার কারণ বাসনা-প্রবৃত্তি অন্তঃকরণে বাসা বেঁধে থাকে। মাঠের চারদিকে আল দেওয়া থাকে পাছে জল বেরিয়ে যায়।

৯ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছিলেন: 'এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি (চৈতন্যদেব) শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্তনের সময় যে খোল বাজে, লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন—এই মাটিতে খোল হয়!—বলেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১২৮)

১০ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছিলেন: "একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে লঙ্কার কূলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তাঁর কাছে লয়ে গেল। 'আহা! এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি, সেই নররূপ,'—এই বলে বিভীষণ আনন্দে বিভোর হলেন। আর ঐ লোকটিকে বসনভূষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন।" (কথামৃত ৪।১২।১)

আলের মাঝে মাঝে থাকে ঘোগ। চাষী পরিশ্রম করে জমিতে জল আনছে, কিন্তু ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসনা হচ্ছে ঘোগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছিলেন যে, গুরু চাই-ই। গুরু সেখো। ইষ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নিত্যসিদ্ধের গুরু চাই না। যেমন মন্দিরশুদ্ধ শিব।

মাষ্টারমশাই কামারপুকুর অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। ঐ অঞ্চলের মানেশ্বরী, কৃষ্ণরায়ের দিঘি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হয়।[১১]

লীলাপ্রসঙ্গকার সত্যসন্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি হৃদয়গ্রাহী কাহিনী উপহার দিয়েছেন। সকল দিক বিবেচনা করে ঘটনাটির সন্নিবেশ এ স্থানেই যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, নিমন্ত্রণবাড়ীতে যেমন পালোদেওয়া ক্ষীর পাওয়া যায়, সেইরূপ ক্ষীর তিনি খাবেন। সেবক যোগীন কলকাতা হতে ক্ষীর কিনে আনার জন্য আদিষ্ট হন। তিনি পরদিন ভোরে কলকাতায় যান। 'বাজারের ক্ষীরে পালো ছাড়া কত কি ভেজাল মেশানো থাকে, খেলে ঠাকুরের অসুখ বাড়বে না ত?'—এই রকম সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তিনি বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে ভক্তেরা সযত্নে পালো দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে দেন। সেবক যোগীন সেই ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হন। তখন বিকাল প্রায় চারটা।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ দুপুরেই ক্ষীরপালো খাবেন বলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে শেষে নিত্যকার পথ্য গ্রহণ করেন। যোগীন এসে পৌঁছলে সব বৃত্তান্ত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ বিরক্ত হয়ে বলেন: 'তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হল; বাজারের ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ী গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এইরূপে ক্ষীর নিয়ে এলি? তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক, ও-কি খাওয়া চলবে —ও আমি খাব না।' শ্রীরামকৃষ্ণ যোগীনের আনীত ক্ষীর স্পর্শও করলেন না। সেদিন 'কামারহাটির বামনী' অর্থাৎ গোপালের মা বা অঘোরমণি দেবী কাশীপুর বাগানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে ঐ ক্ষীর গোপালের মাকে খাওয়াতে বলে ঠাকুর বললেন, 'ভক্তের দেওয়া জিনিস, ওর ভেতর গোপাল আছে, ও খেলেই আমার খাওয়া হবে।[১২]

অঘোরমণি দেবী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে গোপাল-জ্ঞানে সেবা করতেন, যত্ন করতেন। আজকেই এই দিনে ঠাকুর স্বমুখে প্রকাশ করেন যে 'কামার-হাটির বামনী'র মুখ দিয়ে গোপাল খেয়ে থাকেন। অন্ত্যলীলাবিলাসে ভাবৈশ্বর্যের অনন্ত ফুলঝুরি। তার আনন্দোজ্জ্বল উপলব্ধিতে ভক্তগণ বিমোহিত হন। সে-সঙ্গে কাশীপুর বাগান হয়ে উঠেছিল আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র। লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ কঠিন অনুশাসনের মধ্য দিয়ে তাঁর ত্যাগী সন্তানদের গড়ে তুলছিলেন। এঁরাই তো তাঁর ভাবী লোক-সংগ্রহের নিজস্ব কর্মী, সেকারণে এঁদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য লোকশিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল তীক্ষ্ণ নজর!

[ক্রমশঃ]

১১ এই নিবন্ধের মূল আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৬৭-৬৭১

১২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৫-৭।

তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

দর্পণে জগৎ ফোটে—হাসি, কান্না, জীবন, মরণ
ছায়ার মিছিল
যেন স্বচ্ছ কাচে দৃশ্য সরে যায়।
আত্মা স্থির শুদ্ধ মুক্ত।
নির্লিপ্ত সাক্ষীর দৃষ্টিতে ত্রিকাল মগ্ন—'কাল বদ্ধ বর্তমানে'।
অনিমেষ মহাকাশতলে স্তব্ধ মৌন ছায়াতরু প্রশান্ত পরম
অস্তিত্ব উপমাহীন।

আমি একা মুগ্ধ নতজানু
তোমাকে প্রণাম করি।
ব্যক্ত প্রতিমার অব্যক্ত আভাসে মগ্ন,
আত্মহারা অতলান্ত বোধে
চেয়ে থাকি তারি দীপ্তাননে,
যে হিরণ্য জ্যোতির্ময় ছায়া ফেলে
সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির জ্যোতিতে।

তুরীয় সত্তার শান্ত অকম্পিত বুকে ইচ্ছার তরঙ্গ জাগে।
শব্দের অনাদি পদ্ম থরথর কাঁপে।
স্পন্দনে প্রাণের বেগে সৃষ্টি হয় কোটি জগতের—
আকাশে প্রাণের খেলা—হিমাদ্রিতে রবিকর সম!
সুষুপ্তির, স্বপ্ন-জাগ্রতের মায়া-বিজড়িত
স্থাবর জঙ্গম গিরিদরী, পশুপাখি, নারীনর—
সংখ্যাহীন যুগকল্প।
ফুল ফুটে ফুল ঝরে পড়া!

কালের প্রবাহ চলে অনুভূতিহীন
অনিবার্য ছন্দে তালে—
তারও উর্ধ্বে আদি-অন্ত-হীন
তোমার দাক্ষিণ্যময় সৎ-চিৎ-আনন্দ-ধারার
প্লাবন-প্রসাদ নামে
হৃদয়ের কমলের ঘরে—

তোমাকে প্রণাম করি—'ওঁ নমঃ প্রণবার্থায়'
শুদ্ধ-জ্ঞানঘনমূর্তি, বরাভয়, নির্মল, নিবিড় করুণায় স্নিগ্ধ,
স্মিত প্রসন্ন, নির্মেঘ
আকাশের উজ্জ্বলতা—
নিরন্তর তোমাকে প্রণাম।

কবি মিনতি নাথ

শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত

ইণ্ডিয়া হাউস, লণ্ডন থেকে ১-৫-৫৬ তারিখে হুমায়ুন কবির স্বহস্তে লিখছেন :

কল্যাণীয়াসু

তোমার ১৯-৪-৫৬ তারিখের চিঠি দেশ ছাড়বার ঠিক আগে পাই—তাই এখান থেকেই উত্তর দিচ্ছি। আশা করি যে, তোমার জীবনে নববর্ষ নতুন আশা ও সিদ্ধি নিয়ে আসবে।

তোমার দুখানি বই-ই আমি পড়েছি। "মেঘে ঢাকা চাঁদ" আমার বেশী ভাল লেগেছে। তোমার মধ্যে কবিতার একটা সহজ প্রবাহ রয়েছে এবং তার প্রকাশ মনকে আকর্ষণ করে। নিজের স্বভাবের বৈচিত্র্য ও সারল্যকে চিরদিন যেন সহজভাবে প্রকাশ করতে পার, এই কামনা করি। যেখানেই প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, তার মূল্য আছে, কাজেই তোমার কাব্যসাধনারও একটা বিশেষ মূল্য থাকবে।

তোমার জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হোক এই কামনা করি। ইতি

হুমায়ুন কবির

এই সুন্দর চিঠিখানি যাঁকে লেখা হয়েছিল, তিনি কবি মিনতি নাথ এবং এই চিঠি লেখার প্রায় দু বছর পরে কৈশোরেই তিনি এই ধরণীর মায়া ত্যাগ ক'রে অমরধামে প্রয়াণ করেন।

শুধু হুমায়ুন কবিরের নন, বাল্যেই মিনতি নাথ বহু খ্যাতনামা কবি, ঔপন্যাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের পরম স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ চলতো গদ্যে ও পদ্যে।

২৪শে মার্চ ১৯৫৪, নতুন দিল্লী থেকে মন্ত্রী

বাবু জগজীবন রাম মিনতিকে নিজের হাতে বাংলায় চিঠি লিখছেন :

প্রিয় মিনতী।

শুভ আশীর্ব্বাদ।

অনেক দিন পরে আজ তোমার কাছে পত্র লিখতে বসেচি। তোমরাও কোন চিঠ্ঠী লিখ না কেন। কি আর আমি মনে থাকি না কিংবা তোমরা রাগ করে বসেচ। কল্যাণীতে তোমরা (তোমাদের) অনেক কষ্ট হল সে আমি জানি। তবে তোমার জে ভালবাসা সেই মনে করে আমি ভাবতে পারি না জে তুমি রাগ করিবে।

আমি অত ব্যস্ত ছিলাম জে অত দিন চিঠ্ঠী লিখতে পারি না। মনে করিও না। তোমার শরীর কি রকম। মাঁ কি রকম আচেন। জবাব শীঘ্র দিও দেরী করো না। কল্যাণী[তে] জে ক-এক মুহূর্ত তোমাকে ভালবাসবার সুযোগ পেয়েছিলাম সে কি কোনদিন ভুলিতে পারবে জবাব শীঘ্র দিবে।

তোমারই

কাকামণি।

[চিঠিটিতে যে-শব্দের যে-বানান আছে—হিন্দী ভাষার যে স্পর্শ আছে, তা অবিকৃত রাখা হয়েছে মিনতি বাবু জগজীবন রামকে 'কাকামনি' বলে ডাকতেন। চিঠিতে 'কল্যাণীতে' যে কষ্টের উল্লেখ আছে, সে-সম্বন্ধে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে কল্যাণীতে যখন এ. আই. সি. সি.-র মিটিং হয়, তখন বাবু জগজীবন রাম মিনতি ও তাঁর সহোদরাদের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য ওঁদের কল্যাণীতে যেতে বলেন। ওঁরা যান। ফেরার পথে গাড়ী না পেয়ে ওঁরা 'কাকামণি'র কোয়ার্টারে যান। জগজীবন রামজী ক্লান্ত বলে তাঁর পি. এ. ওঁদের দেখা করতে দেন না, তবে গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন। দেখা না হওয়ায় জগজীবনজী ক্ষুব্ধ হন।]

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই ধরনের অনেক চিঠি মিনতি নাথের সহোদরাদের কাছে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। সেগুলি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

১৯৫৮ সালে মিনতি নাথের মৃত্যুর পর যদিও প্রতি বছরই তাঁর জন্মতিথি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পৌরোহিত্যে ও উপস্থিতিতে পালিত হয়ে আসছে, তবু মনে হয় অনেকেরই কাছে এই কিশোরী কবি এখনও অপরিচিতা। তাই এই নিবন্ধে তাঁর কিছু পরিচয় দিয়ে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই। তাঁর সহোদরারা যে-সব চিঠিপত্র আমাকে দেখিয়েছেন এবং মিনতি নাথের লেখা 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' ও 'যে দীপ দিল না আলো' যে বই দুটি আমাকে পড়তে দিয়েছেন, সেগুলির উপর ভিত্তি করেই আমার এই রচনা।

১৯৫১ সালে (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮) মিনতি নাথের প্রথম এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "শ্রীমতী মিনতি নাথ বাংলার নবতমা এবং সর্বকনিষ্ঠা কবি 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' তাহার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে লেখিকা born poet বা জাতকবি। প্রাক্তন জন্ম-বিদ্যা না থাকিলে কেহই শ্রীমতীর ন্যায় এত অল্প বয়সে…কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা ও সাহায্য ব্যতিরেকে এমন সাবলীল কবিতা রচনা করিতে পারেন না। যে কারুণ্য ও প্রীতি বঙ্গবালার হৃদয়ের সনাতন সুর, তাহাই এই কবিতাগুচ্ছে নানা মীড় ও ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়াছে।"

যে-সব প্রথিতযশা ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা-বাণী গ্রন্থটিতে মুদ্রিত রয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন

কবিশেখর কালিদাস রায়, ডঃ কালিদাস নাগ, সজনীকান্ত দাস, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন প্রভৃতি। এঁদের শুভেচ্ছা-বাণী থেকে আংশিক উদ্ধৃতি : 'শ্রীমতী মিনতি নাথ কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশার্থিনী। মিনতির কবিতাগুলিতে আন্তরিকতা আছে। কতকগুলিতে এমন একটা মিনতির সুর আছে, যে সুর লেখিকাকে অন্বর্থনাম্নী করিয়াছে।'—কালিদাস রায়। "ছোট মেয়ে তার প্রথম কবিতার বইয়ের প্রথম রচনাতেই আপন মনে লিখে গিয়েছে—

'জনমের কথা লিখেছিল বিধি
শ্রাবণের এক রাতে,
তাইতো আমার জীবন কাঁদিল
শ্রাবণ-ধারার সাথে।'*

…কাগজ ভরাবার জন্য তার কবিতা নয়, জীবনের মূলে রয়েছে যে 'অশ্রুভরা বেদনা' তারই ইঙ্গিত যেন ভরে রয়েছে লেখিকার সব রচনায়। তরুণ জীবনের দুঃখ তার শাশ্বত জীবনের চরম আশীর্বাদ হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি"—কালিদাস নাগ। "কল্যাণীয়া শ্রীমতী মিনতি নাথের কবিতাসংগ্রহ 'মেঘে ঢাকা চাঁদ'-এর পাণ্ডুলিপি পড়ে বাংলার কবিসমাজে আমি তাঁকে সাদর সংবর্ধনা জানাচ্ছি। তাঁর অনুভূতির তীব্রতা স্বভাবতই অসাধারণ, এই কারণে—অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সেই তিনি একটু বেশী দুঃখবাদী হয়ে পড়েছেন।"—সজনীকান্ত দাস।

যে-দুঃখবাদের উল্লেখ করেছেন ডঃ কালিদাস নাগ ও সজনীকান্ত দাস, তারই নমুনা হিসাবে 'মেঘে ঢাকা চাঁদ'-এর 'ছুটি' কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

'ইচ্ছা হয় মাগো এবার
নিই গো আমি ছুটি,
নূতন ভুবন মাঝে আবার
নূতন হয়ে ফুটি।
নূতন হেসে নূতন বেশে
নূতন জীবন পাই,
আর কোন সাধ নেই মা মনে
এবার ছুটি চাই।

*

ছায়ার সম লীন হয়ে মা
নূতন আলোয় ফুটি,
যাক মা এবার জীবন আমার
কুসুম সম টুটি।
পুষ্পলতার সম আমার
ঘুমাক বিধুর প্রাণ ;
শান্তি লয়ে জীবন এবার
পাক গো পরিত্রাণ।'

'মেঘে ঢাকা চাঁদ' প্রকাশিত হবার পর Amrita Bazar Patrika, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বইটির হৃদ্য সমালোচনা প্রকাশিত হয়। Amrita Bazar Patrika (July 6, 1952) লেখে : 'The surprising fact about the collection of the simple and beautiful poems contained in the volume under review is that they come from the pen of a child poet with natural gift for genuine poetry. … The charming freshness of her poetry is significant,—here is poetic art artistically and artfully mixed and there lies her chief test and glory. … In short here is a poet whose talent seems to be a rare phenomenon in our recent poetry.'

আনন্দবাজার পত্রিকা (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) লেখে : '…ভোরের ফুল হইলেও সবগুলি

* 'শ্রাবণ রাতে' শীর্ষক এই কবিতাটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে Chicago-র 'Poetry' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাই পারুল চাঁপার মত বৃন্তে দোদুল নয়, কারণ ব্যথাহতা ও ভূলুণ্ঠিতা শেফালীর চোখে যে অশ্রুসজল কারুণ্যের পরশ পাই, তাহারই সন্ধান পাইলাম কয়েকটি কবিতার মধ্যে; যাহার কণ্ঠে কেবলমাত্র ভোরের পাখীর কূজন কাকলী শুনিবার কথা, কণ্ঠে তাহার ধূসর গোধূলির পূরবী রাগিণী ধ্বনিয়া উঠিল কোথা হইতে এই কথা ভাবিয়া শুধু যে বিস্মিত হইতে হয় তাহা নয়, ব্যথিত না হইয়াও পারা যায় না।…'

গ্রন্থটি পড়ে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য ২২শে চৈত্র, ১৩৫৮ তারিখে এবং ভারতের যোগাযোগমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ৩১।৫।৫২ তারিখে পত্রে মিনতিকে সাধুবাদ জানান

এর অনেক বছর পরে পুনা হরিকৃষ্ণ মন্দির থেকে ১০।৬।৭১ তারিখে দিলীপকুমার রায় মিনতির জ্যেষ্ঠা ভগিনীদের একটি পত্রে লেখেন: "মিনতির 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' আজ পেয়েই প'ড়ে শেষ করেছি প'ড়ে দুঃখ হয় বৈকি যে সে অকালে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেল। বিধাতার বিধানে কত কী-ই ঘটে যার নিহিতার্থ আমরা বুঝতে পারি না। কেবল এইটুকু মানি—যেকথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় ঘোষণায়—

জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা॥

তাই মিনতির সুন্দর হৃদয়টি পরপারেও বিকাশ লাভ করবে যতদিন না সে আবার আমাদের মাটির ধরায় ফিরে এসে মাঝপথে-ফেলে-যাওয়া সুরটি পুরোপুরি ফুটিয়ে না তোলে

"মিনতির লেখা প'ড়ে ভালো লেগেছে—স্থানে স্থানে মন আর্দ্র হয়েছে। তার নির্মল কুমারী হৃদয়ের বেদনার আনন্দের কথা ভেবে। তার আত্মা ওপারে যেন শান্তি পায় ঠাকুরের চরণে ও ঠাকুর যদি চান যেন ফিরে আসে বাংলা মায়ের মাটিতে। তার উদ্দেশে এই আশীর্বাদটুকু পাঠাচ্ছি—

যাঁর করুণায় তোমার কণ্ঠে
ফুটেছিল মধুছন্দ,
তাঁর আশিসেরি বরে পাও যেন
অঝোর পরমানন্দ।
যাঁর কথা বলো, হৃদয়ে তোমার
কুমারী কলির মত অনিবার
বিছানো তোমার শুভ্র জীবনে
অসীমার মহানন্দ,
জনমে জনমে যেন গাও তুমি
তাঁরি গান অফুরন্ত।"

১৯৫৫ সালে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২) 'যে দীপ দিল না আলো' নামে মিনতি নাথের একটি ছোট উপন্যাস প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লেখেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; ভূমিকা লেখেন ডঃ কালিদাস নাগ। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, শান্তা দেবী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুদ্রিত শুভেচ্ছা-বাণী সহ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মুখবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন: "কুমারী মিনতি নাথ প্রধানতঃ কবি। ইতিপূর্বে তাঁর 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নানা পত্রপত্রিকায়ও তাঁর রচনা স্থান পায়। 'যে দীপ দিল না আলো' তাঁর উপন্যাস। দুটি তরুণ তরুণীর প্রেম ও ব্যর্থতাই উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। লেখিকার বয়স অল্প, তাঁর বিষয়বস্তু রোম্যান্টিক এবং কথাসাহিত্য রচনায় এইটাই তাঁর প্রথম প্রয়াস। আশা করি, এই কথাকয়টী স্মরণ রেখেই পাঠকেরা লেখাটির মূল্য বিচার করবেন। লেখিকার সাহিত্যপ্রীতি আছে, নিষ্ঠাও আছে। তিনি নিরলসভাবে লেখনীচর্চা

করেন.

ভূমিকায় ডঃ কালিদাস নাগ লিখেছেন: কুমারী তরু দত্ত প্রধানতঃ কবি হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করে অকালে চলে গেছেন, অথচ জীবন-দীপ নির্বাণের পূর্বে তিনি কেন ফরাসী ভাষায় এক নিষ্ঠুর প্রেমের কাহিনী লিখেছিলেন জানা নাই, কবিদেরও জীবন নিয়ে গল্প রচনা করার সাধ স্বাভাবিক।...অবাক হলাম যখন 'মেঘে ঢাকা চাঁদ'-এর কবি শ্রীমতী মিনতি নাথ একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দেখা করলেন। যে কাহিনীটি পঞ্চদশ অধ্যায়ে রূপায়িত হয়েছে, তার মধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনের ক্ষণভঙ্গুর সুখ ও আজীবনের দুঃখবেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লেখিকার আছে তা পাঠকপাঠিকারা স্বীকার করবেন; এবং তরুণ জীবনের তারে বেদনারাগিণীর আলাপ হয়ত অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করবে। দরদী মন নিয়ে তাঁরা লেখিকার প্রথম উপন্যাসখানি পড়ুন এই অনুরোধ।

"আমি যখন পড়া শেষ করি তখন সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথের একটী গানের কলি বেজে উঠেছিল—

যতবার আলো জ্বালাইতে চাই
নিভে যায় বারে বারে,
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।"

যে-কথা ডঃ কালিদাস নাগ কুমারী তরু দত্ত সম্বন্ধে লিখেছেন, কুমারী মিনতি নাথের সম্বন্ধেও তা বিস্ময়কর ভাবে সত্য হয়েছে। 'যে দীপ দিল না আলো' প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে ১৩৬৫ সালের ১৩ই ভাদ্র মিনতির জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ঐ বছরই 'হিন্দু' পত্রিকার পূজাসংখ্যায় তাঁর শেষ কবিতা 'বেঁধো না যাবার বেলায়' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পড়লেই মনে হয় মিনতি নাথ স্বজ্ঞায় জানতে পেরেছিলেন যে, তিনি এ ধরায় আর বেশী দিন থাকবেন না।

মিনতি নাথের দেহান্তের পর থেকে তাঁর জন্মদিন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে প্রতি বছর—তাঁর জ্যেষ্ঠা সহোদরাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। বহু খ্যাতনামা অধ্যাপক, কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ দিয়েছেন বা তাঁদের শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছেন। সেই সব সাহিত্যরস-সমৃদ্ধ শুভেচ্ছা-বাণীতে মিনতি নাথের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাই সেগুলির কয়েকটি থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

১১।৮।৬৩ তারিখে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'মিনতি নাথের অকালমৃত্যু বাংলার কাব্যজগতে একটা দুর্ঘটনা। অতি অল্পবয়সে সে যে সমস্ত কবিতা লিখে গেছে তাদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিমেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা তার কবিতার মধ্যে সাবলীল অজস্র ধারায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। এর সঙ্গে জীবনের পরিপক্ব অভিজ্ঞতা ও পরিণত মননের যোগ হলে এমন কবিতা লেখা হতে পারত যা বাংলা কাব্যের চিরন্তন গৌরববৃদ্ধির হেতু হত। এক হিসাবে প্রতিভা অমর; তার মৃত্যুদিন নাই, জন্মদিনই আছে। মিনতির জন্মতিথি উৎসবে তার কবিতার নূতন আস্বাদন ও মূল্যায়নের সুযোগ হবে। তার অচরিতার্থ কবি-সম্ভাবনা আমাদের মনে যে খেদ জাগাবে তাই তার কাব্যমূল্যের যথার্থ পরিসাধক। তরুণ কবিপ্রাণের সুকুমার ভাবরাজি আমাদের তরুণতরুণীর জীবন-স্বপ্নের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে আরও সুন্দর করে তুলুক, আজ এই উৎসব উপলক্ষে এই অভিলাষই জানাই।'

৯ই আগস্ট, ১৯৬২ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হুমায়ুন কবির নতুন দিল্লী থেকে লিখেছেন: 'আগামী দশই আগস্ট স্বর্গীয়া মিনতি

নাথের জন্মদিন উদ্‌যাপিত হবে জেনে খুসী হলাম। মিনতি নাথ অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেও তার মধুর স্বভাব ও কবিশক্তির গুণে সকলের প্রীতি অর্জন করেছিল। আশা করি শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সাফল্য-মণ্ডিত হবে।'

২১।৮।৬৭ তারিখে কবি নরেন্দ্র দেব লেখেন: "স্বর্গগতা কল্যাণীয়া মিনতি নাথ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে 'ফুলটি না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে!' আমরা তাঁকে তাঁর কৈশোর বেলাতেই হারিয়েছি। তবে, দেখে আনন্দ হচ্ছে যে, তাঁর সহৃদয়া সোদরারা তাঁর স্মৃতিটুকু অক্ষয় করে রাখবার সাধু প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। আমি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলি—

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে, জানি তাও হয় নি হারা।'"

১৫।৮।৬৭ তারিখে প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন: 'মুকুলে ঝরে গেলেও নিজের একটি মধুর স্বাক্ষর যে বন্ধু ও প্রিয়জনদের মনে রেখে গেছে সেই কিশোরী কবি মিনতিকে তার জন্মদিবসে স্নেহভরে স্মরণ করি।'

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৪ তারিখে রাধারাণী দেবী লেখেন: 'একটি পরিবারে কবিতার সৌরভ এনে দিয়েছিলেন কিশোরী কবি মিনতি নাথ। ছোট্ট মেয়ে মিনতি ঘরে লেখাপড়া শিখে নিজের চেষ্টায় কবিতালক্ষ্মীর আরাধনা করতে বসেছিলেন। সে-আরাধনা পরিণতিলাভের আগেই—সেই সুন্দর জীবনকুসুমটি অকালে ঝরে পড়েছে। সেই পরিবারটি আজ স্বর্গীয়া মিনতির পূজার ফুলের পাপড়িগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর স্মৃতিপূজা করে চলেছেন। এই আয়োজনে আমাদের করুণ সমবেদনা নিবেদন করি।'

১০।৮।৭৩ তারিখে 'গুণমুগ্ধা' অমলাশঙ্কর লেখেন: "আমাদের পরম আদরের মিনতির জন্মদিনে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তারই পুষ্প-গাথা দিয়ে তাকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানাই—

'আঁধারের মাঝে নামিয়া আসিয়া
দেখালে আলোর রূপ;
আঁধারে নাশিতে আলোক জ্বালিতে
জ্বালিলে লেখনীধূপ।'"

১০।৮।৭৩ তারিখে 'বনফুল' লেখেন: "স্বর্গীয়া মিনতি নাথ একজন প্রকৃতি-শিল্পী ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে আমরা একটি রত্ন হারালাম। আজ তাঁর জন্মতিথি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

'যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে
হারাল ধারা,
জানি হে, জানি তাও
হয় নি হারা॥'"

১০।৮।৭৫ তারিখে ডক্টর রমা চৌধুরী লেখেন: "আমাদের অশেষ স্নেহভাজন, গৌরবপাত্রী ৺মিনতি নাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। অপূর্ব প্রতিভাশালিনী 'মেঘে ঢাকা চাঁদ' ও 'যে দীপ দিল না আলো'-র লেখিকা মিনতির অকালপ্রয়াণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তাঁর ধন্য অনন্য আদর্শ সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করুক—এই প্রার্থনা।

"পরমানন্দময়ী পরমা জননীর অতুল কৃপায় সকলের মঙ্গল হোক।"

৯।৮।৭৮ তারিখে অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন: 'কবি মিনতি নাথের জন্মদিনে আমার যোগদানের কথা ছিল। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হবে বলে উপস্থিত থাকতে পারছি না। এজন্য আন্তরিক দুঃখ জানাই।

মিনতি নাথ অকালে চলে গেছেন, রেখে গেছেন কিছু লেখা, সেইগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন। অবশ্য তার কিছু কিছু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা স্মৃতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট তাঁরা এদিকে অবহিত হলে ভালো হয়। অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করুক, এই প্রার্থনা জানাই।'

উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর (১৯৭৯) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্রীঅরবিন্দ বসুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা মিউনিসিপাল মিউজিয়াম হলে মিনতি নাথের জন্মদিবস সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক শুভেচ্ছা-বাণী প্রেরণ করেন—ফ্রান্স থেকেও শুভেচ্ছা-বাণী আসে। সেগুলি সভায় পঠিত হয়।

কবি মিনতি নাথের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখবার নির্দেশ পেয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও নিবন্ধটি একটু বড় হয়ে গেল, অথচ দেখছি অনেক কথাই অনুক্ত রয়ে গিয়েছে। যাই হোক, মিনতি নাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'উদ্বোধনে'র পাঠকবর্গকে উপহার দিয়ে এই রচনায় ইতি টানছি—

মিথ্যামোহ

আলোর মাঝে অন্ধ হয়ে
থাকবো কত কাল!
আর কতকাল রাখবি মাগো
দিয়ে মায়ার জাল।

মিথ্যা আশার প্রলোভনে
ছুটবো কত আর।
ঘুচবে আমার চোখের ঠুলি
খুলবে আলোর দ্বার।

বন্ধ হবে আনাগোনা
মিথ্যা প্রলোভনে
আলো বলি ছুটবো না আর
আলোর সন্ধানে।

কাটবে আমার ঘুমের নেশা
ভাঙ্গবে স্বপন মোর
টুটবে মাগো আঁখি হতে
সকল তিমির ঘোর।

ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম?

স্বামী আত্মস্থানন্দ

শাস্ত্র ও গুরুমুখে শুনেছি দৈবী ও আসুরিক সম্পদের সংমিশ্রণে মানুষ। উপনিষৎ বারবার গেয়েছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ নূতন করে জগতের মানুষকে তার সংবিৎ ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন: 'তুমি মহান, তুমি দিব্য, তুমি দেবতা, তুমি ভগবান—উঠ, জাগ'—এ মহামন্ত্র উচ্চারণে। আজ আধুনিক বিজ্ঞানও মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করেছে তার মহাশক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে: যদি দৈবী শক্তির বিকাশ না হয়—আসুরিক শক্তি মানবমনে প্রকাশ পায়, তাহলে মানব যে জড়শক্তি আহরণ করেছে, তাতে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে। কিন্তু হায়! ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম—গত জুন মাসের তিনটি দিনে? দেখে এলাম আসুরী তাণ্ডবলীলা।

ত্রিপুরার মান্দাইবাজার, মহারানী, উদয়পুর, অমরপুর, নেপছড়া, জামপুইজলা প্রভৃতি অঞ্চলে দেখে এলাম, দূর-দূরান্তে শ্যামল সুন্দর গ্রামে-গঞ্জে নিষ্ঠুর, পৈশাচিক মানুষের হাতে-গড়া ধ্বংস-স্তূপ। কবির কথাই মনে হল: What man has made of man!—মানুষ মানুষের কি করেছে! জানি না, কে বা কারা, কেন এই নৃশংস সর্বনাশের চিন্তা ও কাজ করেছে। তবে এটা ঠিক, যারা এই কাজের পুরোহিত ও হোতা, তাদের ভিতরে সাধারণ মানববৃত্তি লোপ পেয়েছিল। যে হিংস্রতা

ত্রিপুরায় দেখে এসেছি—তা একমাত্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বুভুক্ষু, হিংস্র পশুর পক্ষে সম্ভব। সদ্যোজাত শিশু, শিশু, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেউই নিস্তার পায়নি। স্নিগ্ধতায় ভরা গ্রামের শান্ত পরিবেশকে অত্যাচারীরা হঠাৎ একটা শ্মশানে পরিণত করেছে। ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম ও শহরতলীর বহু জায়গা ঘুরে দেখেছি—একটি ঘরও নেই—আছে শুধুমাত্র কয়েক মুঠো ছাই। ফলন্ত কাঁঠাল গাছের পাতা পুড়ে গেছে। পোড়া কাঁঠাল সাক্ষী দিচ্ছে বর্বরতার। ক্ষেত-ভরা ধান—ফসল কাটবার লোক নেই। গৃহপালিত গরু-ছাগল মালিকবিহীন অবস্থায় ইতস্ততঃ ধানক্ষেতে যথেচ্ছ আহার সংগ্রহ করছে। সন্ধ্যায় নীরবে কত দুঃখে ঘরের গরু, ছাগল, মুরগী পোড়া ভিটের উপর এসে খুঁজছে তাদের পরিচিত মালিক-মালিকানীকে! আবার কোথাও কোথাও গ্রামে প্রবেশ কষ্টকর। কোথাও কোথাও গলিত শবের পূতিগন্ধে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের ব্যবস্থায় আনুমানিক দেড় শতাধিক আশ্রয়-শিবিরে সর্বহারা, অসহায়, জাতি-উপজাতির নরনারী এক মর্মন্তুদ হাহাকারময় জীবন যাপন করছে। তাদের ঘর ছিল, পরিবার ছিল; ছিল জমি, গরু ইত্যাদি। তারা এবারও এখন ফসল কাটবার জন্য প্রস্তুত ছিল। জাতি-উপজাতি মিলেমিশে সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিল। তারা নির্দোষ। তারা তাদের সামান্যতেই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতে আজ তারা কেউ জঙ্গলে, কেউ আশ্রয়-শিবিরে, কেউ নিরুদ্দেশ। সবাই বিভীষিকার মধ্যে কালাতিপাত করছে। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি—আশ্রয়-শিবিরে যারা আছে, তাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও বেশী। হাসপাতালে গিয়ে দেখেছি—মানুষ পশু হলে কি হয়—তার নিদর্শন!

ত্রিপুরার জনজীবনের এই মহাবিপদকালে সমস্ত দেশবাসীর একবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত—সেখানকার মানুষের আশু পুনর্বাসনের ব্যবস্থার জন্য। ত্রিপুরা ভারতের একটি সীমান্ত। সীমান্তের মানুষ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, সমগ্র দেশই দুর্বল হয়ে পড়বে।

ত্রিপুরায় যা ঘটে গেল, তা কেবল ত্রিপুরার সমস্যা নয়। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে এর করাল ছায়া এগিয়ে আসছে। সরকার তাঁদের কর্তব্য করবেন। কিন্তু প্রত্যেক শুভবুদ্ধির মানুষকে সকলকে সচেতন করতে হবে, যাতে আসুরী শক্তি অবদমিত হয়; এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হ'ল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এগিয়ে আসা, যাতে ত্রিপুরার দুর্গতজন সমস্ত দেশের সহানুভূতি এবং দুঃখ-মোচনের সহায়তা পায়।

ত্রিপুরা হাঙ্গামা ত্রাণ

রামকৃষ্ণ মিশনের আবেদন

বর্তমানে দেশ ত্রিপুরাতে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পীড়াদায়ক অবস্থার সম্মুখীন। সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহা মানবতার বীভৎস অবমাননা। এই পরিস্থিতির মোকা-বিলা করিতে দেশের সমস্ত কল্যাণকামীদের সমগ্রভাবে অগ্রসর হইতে হইবে এবং হাঙ্গামাপূর্ণ অঞ্চলগুলিতে শান্তি ও সাধারণ জীবনযাত্রা পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে। সামান্য দ্রব্যসামগ্রী ও সীমিত জন-শক্তি লইয়া রামকৃষ্ণ মিশন মান্দাইবাজার, মহারানী, অমরপুর, জামপুইজলা প্রভৃতি অঞ্চলে জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডে



মহারানীবাজার



মহারানী অঞ্চলের অগ্নিদগ্ধ কাঁঠাল বৃক্ষ



মান্দাইবাজারের কালীমন্দির



মান্দাইবাজার

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন ও অসহায়। পুনর্জীবন গঠনের জন্য তাহাদিগের এখনই বস্ত্র, কম্বল, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় গৃহোপকরণ ও ঔষধপত্রের আবশ্যক। এই জিনিসগুলির ন্যূনতম সরবরাহের জন্য প্রতি পরিবার পিছু কমপক্ষে দুইশত টাকা খরচা হইবে। রামকৃষ্ণ মিশন ইতিমধ্যে ১৫০০ পরিবারের জন্য জিনিসপত্র পাঠাইয়াছে।

আমাদের ত্রাণকার্যের বিস্তার ও সাফল্য অনেক পরিমাণে আপনাদের উদার সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। আমরা বিশ্বাস করি যে, এইরূপ জরুরী মানবহিতকারী সেবা অর্থাভাবে বাধা পাইবে না। আমরা আপনাদের তৎপর প্রত্যুত্তরে বিশ্বাস রাখি এবং আশা করি, আপনাদের সহানুভূতিসম্পন্ন সাহায্যে প্রায় এক মাসের মধ্যেই বহুসংখ্যক ব্যক্তির পুনর্বাসন সম্ভব হইবে। ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক স্ত্রী-পুরুষ অপরিসীম দুঃখ ও অসহনীয় সন্তাপে ভুগিতেছে। বিপর্যয়ের পূর্বে যে অঞ্চলের সমাজে ছিল অনাবিল শান্তি ও আনন্দ, সেই অঞ্চলে কি নিষ্ঠুর ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিল! মানুষের এই ব্যাপক বিপদকালে কোনও সাহায্যই বড় নহে এবং কোনও সাহায্যই ছোট নহে।

আপনাদের সহৃদয় দান নগদে বা 'একাউণ্ট পেয়ী চেকে' নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করি :—

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১২০২, হাওড়া

ফোন : ৬৬-২৩৯১। ৩৫৭৮। ৫৮৬৫

বেলুড় মঠ

৩০-৬-১৯৮০

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

সাহিত্যতীর্থ: ১৩৮৫ / রজতজয়ন্তীবর্ষ / **পঞ্চবিংশ বার্ষিকী:** রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। **প্রকাশক:** সাহিত্যতীর্থ, ৬৭, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৬। পৃঃ ২৬২, মূল্য : আট টাকা।

সুপরিচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান 'সাহিত্যতীর্থ' রজতজয়ন্তীবর্ষে অন্যবারের মতো সাধারণ বার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশ না করে একটি প্রবন্ধ-সংকলন উপস্থাপিত করেছেন। গত পঁচিশ বছরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে। বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আর মনীষীরা প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সুতরাং সংকলনটিতে চিন্তাশীলতা প্রত্যাশা করা যায়; সে প্রত্যাশা বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছে। এদিক দিয়ে সাহিত্যতীর্থের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সফল বলা যায়।

পঁয়ত্রিশটি প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনা তেরোটি, সংগীত ও শিল্প সম্পর্কে চারটি,

শিক্ষা সম্পর্কে চারটি, মহিলাসমাজ সম্পর্কে তিনটি, বাকি এগারোটি বিজ্ঞান বা অর্থনীতি-প্রমুখ মানবিক-বিদ্যাবিষয়ক। একটি নিবন্ধে দর্শন-প্রসঙ্গে কিছু কিছু উল্লেখাদির কথা বাদ দিলে ধর্ম সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কোনো আলোচনা নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান-শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে; তথাকথিত রাজনীতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা প্রকাশ না করে সম্পাদক মহাশয় সুবুদ্ধির এবং সুরুচিরও পরিচয় দিয়েছেন।

গত পঁচিশ বছরের সাহিত্য সম্পর্কে অনেকেরই আলোচনা পড়ে ধারণা হয় যে বাংলা সাহিত্য এই কালে কেবল অবক্ষয় নয়, সর্বনাশের পথে চলেছে। দু-একজন অবশ্য উলটো সুর গেয়েছেন। মনে হয়, আলোচিত কালে মূল্যবোধের পরিবর্তন আর অস্থিত জীবনচেতনার পটভূমিকায় সাহিত্যের রূপান্তরের আকৃতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করার সংগত অবকাশ ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়েছে। দু-একটি প্রবন্ধে অধ্যাপকশোভন বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বা সাধারণভাবে রসগ্রাহিতার কথা বাদ দিলে সাহিত্য-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি কালগত প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কে উৎসুক পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করে না। অনেক প্রবন্ধেরই সুলিখিত অংশে রবীন্দ্রকালে বা বড়ো জোর চল্লিশের দশকে আবির্ভূত লেখকদের পরিচয় আছে; কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমাগত লেখক সম্পর্কে আলোচকরা অনেকেই যেন নিরুৎসাহ বোধ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসাধনা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের কথা বাদ দিলে সংগীত ও শিল্প সম্পর্কে অন্য লেখাগুলি নেতিমূলক বা তুলনায় বস্তুবিরল। শিক্ষা-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলি যথার্থই মূল্যবান—একাধারে তথ্যমূলক ও চিন্তাদ্যোতক। দুই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের দুটি প্রবন্ধ তথ্যসমৃদ্ধ ও চিন্তাপূর্ণ। তবে তাঁরা অন্য প্রসঙ্গের পরিবর্তে এই সংকলনের উদ্দেশ্য অনুসারে গত পঁচিশ বছরের বাংলার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করলে পাঠকদের প্রত্যাশা পূর্ণ হত। লেখিকাত্রয়ের স্বসমাজের বিশ্লেষণ আকর্ষণীয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, মানবিক-বিদ্যা সম্পর্কে কয়েকটি তথ্যমূলক নিবন্ধ পাঠকদের কৌতূহল উদ্রেক করে।

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে সংকলনটি মূল্যবান এবং বিশিষ্টতার দাবি রাখে। প্রবন্ধগুলি আহৃত এবং সম্পাদক মহাশয়ের আবেদন বা তাড়নায় সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করতে হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে পঞ্চত্রিংশজন লেখকের প্রত্যেকেই যে যথেষ্ট অবকাশ পেয়ে থাকবেন অথবা সমানভাবে দায়িত্বসচেতন হবেন এটা সম্ভবই হয় না।

প্রচ্ছদপট, গ্রন্থান্তর্গত চিত্রদুটি প্রশংসার্হ। মুদ্রণাদি শোভন, তবে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কম হলেই সুসংগত হত।

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজীর মহাপ্রয়াণ

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ৫ই জুন ১৯৭০, বৃহস্পতিবার, বেলা একটায় স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ দক্ষিণ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহাপ্রয়াণ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বৎসর।

প্রায় এক বৎসর পূর্বে (২৮শে জুন ১৯৭৯) তিনি মৃদু সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ফলে তাঁহার দৈনন্দিন অনেক কাজ-কর্ম বন্ধ হইয়া যায় এবং শরীর ক্রমশঃ অপটু হইয়া পড়িতে থাকে। মহাপ্রয়াণের পূর্বের কয়েকদিন তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত ভালই ছিল। ৪ঠা জুন বেশ ভাল বোধ করেন। ৫ই সকাল সাড়ে পাঁচটায় স্বাভাবিকভাবেই অল্প দুধ খান। কিন্তু সকাল সাড়ে সাতটায় তাঁহার নাড়ী খুব ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত। তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে লইয়া যাওয়া হয়। সাময়িক কিছু উন্নতি দেখা যায়। বেলা ১২-৫৫ মিঃ নাগাদ তাঁহার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত দেওয়া হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ৫ মিনিট পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে শেষ কৃত্যের জন্য নীত হইবার পূর্বে তাঁহার মরদেহ উত্তর কলিকাতায় বাগবাজারে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'তে রাত্রি সওয়া নটা নাগাদ আনয়ন করা হয়। যে বাড়ীতে ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া এবং পরে শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, অন্তিমে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' মন্ত্রমুখরিত সেই পূত মাতৃগৃহে তাঁহার পার্থিব দেহ কিছুক্ষণ রাখা হয় এবং তদুপরি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী নির্মাল্যসহ বিস্তর পুষ্পমাল্যাদি পরম শ্রদ্ধাভরে অর্পিত হয়। পরদিন (৬ই জুন) বেলুড় মঠে গঙ্গাতীরে মধ্যাহ্নে তাঁহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

স্বামী দয়ানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিমলচন্দ্র বসু। নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকটবর্তী বাগআঁচড়া গ্রামে ১৮৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম। পিতা হরিপ্রসাদ বসু ও জননী বিন্দুবাসিনী ধর্মপ্রাণ দম্পতী ছিলেন। বিমলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্মল (পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ) ১৯১০ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ঐ সালেই বিমলচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এফ. এ. পড়েন। ১৯১২ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি. এসসি. পড়া শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের সংস্পর্শে আসেন এবং—যাহা পূর্বেই উল্লিখিত—শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হন।

পদার্থবিদ্যা লইয়া এম. এসসি. পড়ার সময়ে ১৯১৫ সালে তিনি বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধনে) যোগদান করেন এবং ঐ সালেই স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের পরদিন পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন। তাঁহার নাম হয় বিমলচৈতন্য। সংঘে যোগদানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৯১৫ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি তিনি পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজের সেবক হইয়া পূর্ববঙ্গে যান। স্বামী প্রেমানন্দজীর পূতসঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।

জানুআরি ১৯১৬ হইতে ডিসেম্বর ১৯১৯ এই চারি বৎসর তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২০ সালে শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর বিমলচৈতন্য সাধনভজনের জন্য কাশীধামে যান এবং মাধুকরী বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ধ্যানজপে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে স্বামীজীর জন্মতিথিতে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ কাশীতেই তাঁহাকে সন্ন্যাস দেন এবং তাঁহার নামকরণ করেন 'স্বামী দয়ানন্দ'। সন্ন্যাসের পরই স্বামী দয়ানন্দজী হরিদ্বারে যাইয়া স্বর্গাশ্রমে ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ করিয়া সাধনভজনে নিমগ্ন হন। এই বৎসরই তিনি দুর্গমতীর্থ অমরনাথ দর্শন করেন।

আনুমানিক ১৯২১ সালের শেষভাগে স্বামী দয়ানন্দজী মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী নিযুক্ত হন। এই সময়ে সেখান হইতে ইংরেজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' ছাড়াও হিন্দী 'সমন্বয়' পত্রিকা প্রকাশিত হইত। স্বামী দয়ানন্দজী হিন্দী পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করিবার জন্য ও উহার গ্রাহক-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ১৯২৩ সালের ১লা অক্টোবর মায়াবতী হইতে পদব্রজে বহু স্থান ঘুরিয়া দেড়শতাধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ডিসেম্বরে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন এবং অদ্বৈত আশ্রমের কলিকাতা শাখায় 'সমন্বয়' পত্রিকার 'সিটি এডিটরের' কার্যভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে স্বামী দয়ানন্দজী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রানসিসকোতে বেদান্তপ্রচারের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী প্রকাশানন্দের সহায়ক হিসাবে প্রেরিত হন। পর বৎসর স্বামী প্রকাশানন্দজীর দেহান্ত হইলে স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২৯ সালে স্বামী মাধবানন্দজী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামী দয়ানন্দজী এপ্রিল ১৯২৯ হইতে আগস্ট ১৯৩১ পর্যন্ত উক্ত কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করেন। প্রায় ছয় বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করিয়া ১৯৩২ সালে তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকায় থাকাকালীন সেখানকার শিশুমঙ্গল কার্য দেখিয়া দয়ানন্দজী বিশেষ প্রভাবিত হন এবং ভারতে ঐ ধরনের কার্যের প্রবর্তন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রত্যাবর্তনের পথে ইউরোপ ও রাশিয়ায় কয়েকটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

তাঁহারই উৎসাহ ও উদ্যমে ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ কলিকাতায় বকুল-বাগান রোডে অতি সামান্য কয়েকটি শয্যাবিশিষ্ট শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উহার পরিচালনার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। জার্মান সিস্টার Miss Pfeffer, আমেরিকান সিস্টার Mrs. Lillian Engstrand এবং মারাঠী সিস্টার Miss Ramabai Palekar শিশুমঙ্গলের সেবাকার্যে যোগদান করেন এবং শিক্ষার্থিনী নার্সদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। প্রথমদিকে আমেরিকার মিস্ হেলেন রুবেলের বাৎসরিক ৫০০০ টাকা দানও এই কার্যে বিশেষ সহায়ক হয়।

১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ল্যান্সডাউন রোডে নবনির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সাধারণ রোগীদেরও চিকিৎসার আওতায় আনা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির নূতন নামকরণ করা হয় 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান'। ১৯৬৩ সালে ৭১ বৎসর বয়সে স্বামী দয়ানন্দজী সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব স্বামী গহনানন্দজীর উপর অর্পণ করিয়া সেবাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম সহ-সভাপতি হন। আনুষ্ঠানিকভাবে খুঁটিনাটি পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেও আমৃত্যু সহ-সভাপতিরূপে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সর্বাত্মক কল্যাণের পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৯৩২ সালের অতি ক্ষুদ্র শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট হাসপাতাল। ইহাতে পাঁচ শতাধিক শয্যা আছে এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণা কেন্দ্র, নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষণ

বিদ্যালয় সহ বিশটি বিভাগ আছে। এই উল্লেখনীয় অগ্রগতির মূলে ছিল স্বামী দয়ানন্দজীর বহুবর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ নিরলস প্রচেষ্টা।

১৯৪৭ সালে স্বামী দয়ানন্দজী বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু দক্ষতার সহিত সংঘ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন।

গত ১৯শে জুন ১৯৮০, সকাল সাড়ে দশটা হইতে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী দয়ানন্দজীর স্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। সন্ন্যাসিগণ বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। স্বামী দয়ানন্দজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীজি. সি. দে, শ্রীকে. পি. সেন, ডাঃ (শ্রীমতী) ভারতী পিল্লাই, ডাঃ অজিতকুমার বসু, ডাঃ নীহারকুমার মুন্সী, ডাঃ তরুণ দেবমল্লিক, নার্সিং সুপারইনটেনডেন্ট কুমারী দেওধর, শ্রীজে. সি. দে, শ্রীআর. এন. সেন, স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী, স্বামী বন্দনানন্দজী, সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং স্বামী গহনানন্দজী। বক্তাগণ স্বামী দয়ানন্দজীর মধুর স্বভাব, তাঁহার কর্মকুশলতা, মহাপ্রাণতা প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণা করেন। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বামী অভয়ানন্দজী সহ বহু সন্ন্যাসী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় শ্রীসবিতাব্রত দত্ত ও সহশিল্পিবৃন্দ ভজন ও কীর্তন পরিবেশন করেন।

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) ত্রিপুরা—হাঙ্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক শুরু করা হইয়াছে। ৫০০ সেট অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্রাদি (প্রতি সেটে ১টি হাঁড়ি, ১টি কড়াই, ২টি বড় হাতা, ১টি থালা, এবং একটি বড় গেলাস); ৫০০ ধুতি, ৫০০ শাড়ি, ও ২ হাজার শিশু-পোশাক সহায়সম্বলহীন উপজাতি ও অনুপজাতিদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। তাহার পর গত ২৪শে জুন ১৯৮০, একট্রাক-বোঝাই বস্ত্রাদি, কম্বল, গুঁড়া দুধ, রোগ-প্রতিষেধক টিকা প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী সশস্ত্র প্রহরায় প্রেরিত হইয়াছে। (২৪. ৬. ১৯৮০-র সংবাদ)

(খ) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১১ই জুন ১৯৮০, বন্যাদুর্গতদের সাহায্যকল্পে নিউ জগৎপুরে (আরামবাগ মহকুমা, হুগলী জেলা) সদ্যোনির্মিত ৬০টি গৃহসমন্বিত নূতন কলোনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিসংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী।

দিঘড়ায় 'নিশ্চিন্ত নীড়' সংলগ্ন আরও ৮০টি গৃহনির্মাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে প্রাগ্রসর।

পশ্চিমবঙ্গ—ঘূর্ণিবাত্যাত্রাণ : নদীয়া জেলায় ঘূর্ণিবাত্যা ও অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক প্রাথমিক সাহায্যদান করা হইয়াছে। ৮৩টি কম্বল, ১০৬ খানি শাড়ি, ৫৭টি ধুতি, ১৬২ জোড়া শিশু-পোশাক, ৮৭টি লুঙ্গি, ৮৩ সেট অ্যালু-মিনিয়াম বাসনপত্রাদি (প্রতি সেটে—কড়াই, মগ, গেলাস, পাত্র, বড় হাতা, ও থালা); চাল,

ডাল, আলু, পেঁয়াজ, সরিষার তেল, লঙ্কা, হলুদ, লবণ এবং আম কৃষ্ণনগর ও নাকাশিপাড়ার ৮৩টি পরিবারের ৪১২ জনের মধ্যে বিতরিত হয়।

(গ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়)— পুনর্বাসন-কার্য : মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহারা জনগণের পুনর্বাসনকল্পে শহর এলাকায় ২৫০টি ও ভানালিয়া গ্রামে ১৮৩টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন স্তরে ক্রম-অগ্রসর। লালবাগেও গৃহনির্মাণকার্য প্রাগ্রসর।

(ঘ) খেতড়ি (রাজস্থান)—খরাত্রাণ : খরা-পীড়িত গৃহপালিত গবাদি পশুর জন্য ঝুনঝুনু জেলার ৫টি বিতরণ কেন্দ্রের মারফত মিশন কর্তৃক প্রতিদিন পশুখাদ্য বিতরিত হইতেছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ ও চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

বিবিধ

গত ২১শে এপ্রিল ১৯৮০, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বসিরহাট মহকুমার (২৪ পরগণা জেলা) গোবরডাঙ্গা ও মেদিয়া গ্রামে নরেন্দ্রপুর আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদ্ কর্তৃক পরিচালিত পল্লীমঙ্গল-কার্য পরিদর্শন করেন।

গত ১১ই জুন ১৯৮০, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা-নন্দজী মহারাজ দেওয়ানগঞ্জে নবনির্মিত 'মোদক ভবনে'র উদ্বোধন করেন। একদা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা সহ ঘাটাল হইতে কামারপুকুরের পথে অত্যধিক বৃষ্টিপাতহেতু শ্রীমোদকের 'নূতন আবাসে' ত্রিরাত্র বাস করিয়াছিলেন। (দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, নবম সংস্করণ, পৃঃ ২১৪-২১৭)। শ্রীমোদকের প্রপৌত্রের হাতে উক্ত বাড়ীটি সমর্পণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৩রা মে ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

নবম পরিচ্ছেদে (১।২।৯) শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব-প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তদের কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। এইজন্য পূজনীয় মাষ্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের শুরুতে গীতার 'কর্মযোগ' অধ্যায় থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন :

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥
(৩।১৯)

—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'যেহেতু তুমি কর্মেরই অধিকারী, সেইহেতু অনাসক্ত হ'য়ে সর্বদা কর্তব্য কর্ম কর। অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করলে মানুষ নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন, "তোমরা বলো 'জগতের উপকার করা'। জগৎ কি এতটুকু গা! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে?"

আমরা ভাবি জগতের উপকার করবো। এর কারণ আমাদের অহংকার আছে। স্বামীজী বলেছেন : আমরা যখন মানুষের সেবা করি, উপকার করি, তখন আমরা নিজেদেরই উপকার করি, জগতের নয়—'We help ourselves not the world.' যদি আমরা ঠিক ঠিক এই ভাব

নিয়ে কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের জাগতিক সকল বন্ধন কর্মের দ্বারাই কেটে যাবে। কাজেই আমরা যে-কর্ম করি, তার উদ্দেশ্য ভগবানলাভ। ব্রাহ্মভক্তদের এই মনোভাব ছিল না। তাঁদের অহংকার ছিল যে, তাঁরা জগতের উপকার করতে পারেন। তাই ঠাকুর তাঁদের বললেন, 'তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো। তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পারো। নচেৎ নয়।' এতে একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করেন, সব কর্ম ত্যাগ করতে হবে কিনা। ভক্তটির মনের যে-সংশয় অর্জুনেরও মনে সেই সংশয় জেগেছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন :

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ (৩।৪)

অর্থাৎ, কর্ম না করে কেউ নৈষ্কর্ম্য লাভ করতে পারে না; কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাভ হয় না।

'নৈষ্কর্ম্য'-অবস্থা লাভ করতে গেলে কর্ম আমাদের করতেই হবে। কিছু না করে বসে থাকলে তা কখনও হবে না। সাধারণ লোক যেভাবে কর্ম করে সেভাবে কর্ম করলে 'নৈষ্কর্ম্য'-অবস্থা আসে না। ঐ অবস্থা আসবে নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করতে করতে। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ব্রাহ্মভক্তটিকে বললেন, 'কর্ম ত্যাগ করবে কেন? ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণ-গান, নিত্যকর্ম, এ সব করতে হবে।'

ব্রাহ্মভক্তটি প্রশ্ন করলেন, 'সংসারের কর্ম? বিষয়-কর্ম?' ঠাকুর বললেন, 'হাঁ, তাও করবে, সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার। কিন্তু কেঁদে নির্জনে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। যাতে ঐ কর্মগুলি নিষ্কামভাবে করা যায়।'

ভগবানকে নিয়ে কর্ম করতে হবে। সাধারণ মানুষ কর্ম না করে থাকতে পারে না। তাই কর্ম যখন করতেই হবে, তখন সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই করতে হবে। কিন্তু তা-ও করতে হবে নিষ্কামভাব নিয়ে। তবে এই নিষ্কামভাব মনে নিয়ে আসা বড়ই কঠিন, কোথা থেকে অহংকার এসে যায়। আমি জগতের উপকার করছি, আরও করবো—এই ভাব এসে যায়। তাই ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে নিষ্কামভাবে কর্ম করা যায়।

এরপর ঠাকুর শম্ভু মল্লিকের কথা বলছেন। শম্ভু মল্লিকের হাসপাতাল, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি করার কথায় ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, 'ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়,—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দান করতেই লাগলো; কালীদর্শন আর হলো না!' ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি আমাদের বোঝবার অসুবিধা হয়। যেমন পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের হয়েছিল। তাঁর একটা ধারণা ছিল যে, স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্মযোগ ঠাকুরের মতানুযায়ী নয়। তাই তাঁর মধ্যে একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভাব ছিল। আর তিনি প্রকাশ্যে বলেও ছিলেন যে, এত সব কর্ম করার কথা ঠাকুর বলেননি। একবার তিনি কাশী গিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে গিয়েছিলেন। কাশী সেবাশ্রমের কাজ-কর্ম দেখে খুব খুশী হয়ে শ্রীশ্রীমা বললেন—'এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা-লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।' তারপর তাঁর দানহিসাবে দশ টাকার একটি নোট তিনি সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দেন। সেই আশীর্বাদী-নোটটি আজও সযত্নে কাশী সেবাশ্রমে রাখা আছে। স্বামীজীর প্রবর্তিত কর্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের অভিমত মাষ্টারমশাইকে বলা হলে তিনি বললেন—'আর অস্বীকার করার জো নেই।'

যুগপ্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। তাই বর্তমান যুগানুযায়ী কিভাবে কাজ করতে হবে

শ্রীশ্রীঠাকুর তা তাঁর ত্যাগী শিষ্যদের, বিশেষ করে, শিষ্যদের নেতা স্বামীজীকে বলে গিয়েছিলেন, তাই তাঁর নির্দেশানুযায়ী স্বামীজী শিবজ্ঞানে জীবসেবা-রূপ কাজ আরম্ভ করেন। আর কথামৃততে তাঁর যা উপদেশ, সেগুলি প্রধানতঃ কিছু গৃহী ভক্তদের লক্ষ্য করে। সেজন্য গৃহী ভক্তদের কোন্‌টা প্রয়োজন সেটাই আমরা সেখানে লক্ষ্য করি।—একথা আমরা আগে অনেকবার বলেছি।

গীতায় যে নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হয়েছে তা এযুগের ধর্ম। এ কর্ম—কর্মফল ত্যাগ করে করা যায়, কিংবা ভগবানে সর্বকর্মফল অর্পণ করে করা যায়। এই দুটো মতবাদ।—এদের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য কিছু নেই। সাধারণতঃ বলা হয় সর্বকর্ম-ফল শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করতে হবে। এবং এটাই হচ্ছে কর্মযোগ। কিন্তু এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর যে অর্থে কর্মযোগ বলেছেন, সেটা একটু পৃথক্‌। তিনি বলছেন—'কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন।' সে হচ্ছে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যে-কর্ম, সেই কর্ম। শাস্ত্রে নানারকম যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদির কথা বলা হয়েছে। এই সব বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি করা খুবই কঠিন। আজকাল বাংলাদেশে এর প্রচলন নেই বললেই হয়। অশ্বমেধ, গবালম্ভ প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া আজকাল করা উচিত নয়। কারণ এই সব করতে গেলে যে-সব উপকরণ লাগে সে-সব যোগাড় করা এবং যে-সব নিয়ম-কানুন আছে তা ঠিক ঠিক পালন করা যায় না। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, 'কর্মযোগ বড় কঠিন কিন্তু স্বামীজীর কর্মযোগ কঠিন নয়। প্রতিটি জীবই শিব—এই বুদ্ধিতে সেবা করা। সংসারের সব কিছু ঈশ্বরের এই জেনে কর্ম করা। স্ত্রীপুত্রপরিজন—সব তাঁর এটা জেনে তাদের জন্য কর্ম করা। এই যে মনটাকে পরিবর্তিত করে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কর্ম করা—এটা ততটা কঠিন নয়। কিন্তু ব্রাহ্মভক্তদের শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'তোমরা ভগবানে মন দাও, কাজ কমাও।' এর কারণ হচ্ছে, তাঁরা সমাজ-সংস্কারের দিকেই খুব বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন—তাঁদের মনোভাব ছিল পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন সমাজ তৈরী করা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা এবং এরকম করার উদ্দেশ্য যে ঈশ্বরলাভ—এটা তাঁরা জানতেন না।

ব্রাহ্মদের ভগবান সম্পর্কে যে ধারণা সেটি সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক। তাঁরা ভগবানে ভক্তি করার কথা বলতেন। সেই কথাটি মনে রেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।' সাধারণ মানুষের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।' সে-ভক্তি শুধুমাত্র আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়। মনের কোন পরিবর্তন আসছে না—শুধুমাত্র 'প্রভু' 'প্রভু' করছি আর কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছি। অথচ স্ত্রী,পুত্র, পরিবারের প্রতি, সংসারের প্রতি, আকর্ষণ থেকেই যাচ্ছে। এটা নারদীয় ভক্তি নয়। এটা ভক্তির ছদ্মবেশ। নারদ বলছেন, আগে বৈধী ভক্তি—সব নিয়ম অনুসরণ করে সাধন করে তারপরে আসবে রাগানুগা ভক্তি। বিধি অবলম্বন করে নাম-জপ, স্মরণ-মনন, পূজা-পাঠের মধ্য দিয়ে গিয়ে রাগানুগা ভক্তিতে পৌঁছান সম্ভব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কারো ভাব নষ্ট করতেন না। তাই ব্রাহ্মদের যাতে ভাব নষ্ট না হয়, সেইভাবে এখানে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন। যেখানে তাঁরা আছেন, সেখান থেকেই তাঁদের পথ বলে দিচ্ছেন। তিনি তাঁদের বলছেন, 'তোমরা হরিনাম কর, মায়ের নাম গুণ-গান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ।'

সংগীত হচ্ছে ভক্তি-সাধনার বড় উপায়। এতে মন সহজে ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়। তাই শ্রীভগবান নারদকে বলছেন—'মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি

নারদ।' অর্থাৎ, আমার ভক্তরা যেখানে গান করে, ভজন করে, আমি সেখানে থাকি। তাই সংগীত ভক্তি-সাধনার জন্য খুবই উপকারী।

ভক্তিযোগে বিনম্র হওয়ার কথা আছে। প্রণত হওয়ার অর্থ, 'অহং' দূর করা। এই অহংকে দূর করাই সব সাধনের সার কথা। ভক্তিযোগে ইষ্টের চিন্তায় নিজের স্বাতন্ত্র্য লীন করে দেওয়া আর কর্মযোগেও অহংতা ও মমতা দূর করে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করা—স্বামীজীর ভাষায়—সর্বত্র ভগবান আছেন জেনে সব কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরই সেবা করা। এইভাবে ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ—উভয় যোগেই একই লক্ষ্যে পৌঁছান যায়।

আমরা নবম পরিচ্ছেদ শেষ করে দশম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করছি। এ পরিচ্ছেদে একটি সুন্দর দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের গঙ্গাবক্ষে স্টীমারে করে বেড়ান শেষ হয়েছে। স্টীমার থেকে নেমে গাড়ি করে এবার তিনি কলকাতায় সুরেশ মিত্রের বাড়িতে যাবেন। কেশবচন্দ্র তাঁকে প্রণাম করে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুরেশ মিত্রের বাড়িতে এসেছেন। তিনি বাড়িতে নেই। বাড়ির লোকেরা তাঁকে দোতলার ঘরে বসালেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুরকে যে-ঘরে বসান হয়েছে, সেখানে সুরেশচন্দ্রের বিশেষ যত্নে তৈরী শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয়ের পট দেওয়ালে টাঙ্গানো রয়েছে। নরেন্দ্র এসেছেন। তাঁকে ঠাকুর সব ঘটনা পরমানন্দে বলছেন। রাত্রি বাড়ছে। ঠাকুর ফিরে চললেন দক্ষিণেশ্বরের পথে। (১ ২।১০)

গীতা—

আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন [৪।১৫ শ্লোকে]: 'সমস্ত কর্ম করেও আমি যে নির্লিপ্ত, এটা জেনে প্রাচীনকালে অনেক মুমুক্ষু কর্ম করে গেছেন। অতএব তোমাকেও কর্তৃত্বের অহংকার এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে তাঁদেরই মতো কর্ম করে যেতে হবে।'

এখানে একটা সমস্যা এসে যাচ্ছে। আমরা সকলেই কাজ করছি। আবার কখনও বলছি, না—কাজ করছি না, বিশ্রাম করছি। আমরা কর্ম করি, আবার করিও না। এখন কোন্‌টা কর্ম আর কোন্‌টা অকর্ম—এটা বুঝবো কি করে? এর পিছনে কি কোন তত্ত্ব আছে? শ্রীভগবান বলছেন, আছে—বিশেষ তত্ত্ব আছে।

আমরা দেখতে পেয়েছি শ্রীভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। আর এই চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞানযোগ'। কেন 'জ্ঞানযোগ' নামকরণ হয়েছে, তা আমরা পরে দেখতে পাব। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞান-যোগ' হলেও শ্রীভগবান এই শ্লোকগুলিতে কর্ম নিয়েই কথা বলছেন। কারণ তিনি অর্জুনকে কর্মী বলেই বুঝেছিলেন—তাঁকে কর্ম করতেই হবে। আর তাঁর নিজের অবতীর্ণ হওয়া যে-ধর্মস্থাপনের জন্য, সেই কাজে অর্জুনের একটা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকার কাজটি তাঁকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনেও আমরা দেখতে পাই, শ্রীশ্রীঠাকুর একটি কাগজে লিখে দিচ্ছেন 'নরেন শিক্ষে দিবে।' আর নরেন্দ্রনাথ বলছেন, 'আমি ওসব পারব না।' তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, 'তোর হাড় করবে।' আবার নরেন্দ্রনাথ যখন বলছেন, আমি সমাধিতে ডুবে থাকতে চাই তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলছেন, 'ছি ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস: এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা!'

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় বিবেকানন্দের যেরকম একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণলীলায়

অর্জুনেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আর সেইটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বার বার করে বোঝাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কারণ অন্য কথা না যদি বোঝান হয়, তাহলে ধর্মের যে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমিকা সে-সম্পর্কে কোন জ্ঞান হবে না। তাই সেটাও বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আর সেইজন্য জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করে ভারতের যে সামগ্রিক একটি চিন্তাধারা সেটি অর্জুনের সামনে তুলে ধরে বলছেন: 'তুমি কর্ম কর। তোমার জন্য কর্ম।' অর্জুন কর্ম থেকে মুক্তি চাইলেও শ্রীভগবান বার বার নানাভাবে তাঁকে কর্ম করার জন্য বোঝাচ্ছেন। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'কর্ম কি এবং অকর্ম কি—এ বিষয়ে পণ্ডিতরাও অভিভূত, তাঁরাও এটি ঠিক ঠিক বোঝেন না। এইজন্য যা জানলে অশুভ সংসার হতে তুমি মুক্তিলাভ করবে, সেই কর্ম আর অকর্মের রহস্যের কথা তোমায় বলবো।'

(৪।১৬)

তারপর শ্রীভগবান বলছেন: " 'কর্মে'র অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্মের, 'বিকর্মে'র অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মের এবং 'অকর্মে'র (কর্ম না-করার) তত্ত্ব জানতে হবে। কারণ কর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়।" (৪।১৭)

কর্ম ও অকর্মের তত্ত্বটি আরও ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রীভগবান আর একটি শ্লোক দিয়ে পূর্বের শ্লোকটির উপর আলোকপাত করছেন। বলছেন: 'যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে কর্ম দেখেন, তিনি মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান। তিনি যোগযুক্ত এবং সর্বকর্মের কর্তা।'

এই শ্লোকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শ্রীভগবান যেটা বলতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে—মানুষ সব কর্ম করে চলেছে, কিন্তু কর্মটা করছে কে? না—ইন্দ্রিয়াদি। মানুষের স্বরূপ হচ্ছে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত—যে-কথা ঈশোপনিষদ্ বলেছেন—'স পর্যগাদ্ শুক্রম্ অকায়ম্ অব্রণম্' ইত্যাদি—'তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভু'

তিনি 'মনসো জবীয়ঃ'—মন থেকেও দ্রুতগামী তিনি। আবার তিনি 'অনেজৎ'—স্থির কূটস্থ অচল। এই যে সদা ক্রিয়াচঞ্চল জগৎ—এটি তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি স্থির। সেইজন্য বলা হচ্ছে সমস্ত কর্মের মধ্যেও তিনি হচ্ছেন, আমরা যাকে সাধারণ ভাষায় বলি—'অকর্মা', কর্মহীন, অবশ্য নিন্দার্থে নয়। এটি যিনি বুঝেছেন, তিনি বুদ্ধিমান। সহস্র কর্ম করেও মানুষ স্বরূপতঃ যে কোন কর্ম করে না—এটি বোঝা দরকার। আবার আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি কোন কর্ম করছে না ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া চলছে। অর্থাৎ কোন কাজ না করে চুপ করে বসে থাকলেও, কর্ম থেকে তার অব্যাহতি নেই। এইটাই অকর্মে কর্ম-দর্শন। এ দুটি যিনি বুঝতে পেরেছেন—তিনি বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, তিনি সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা—এই বলে শ্রীভগবান পরমার্থদর্শীর প্রশংসা করছেন। (৪।১৮)

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কি ভাব নিয়ে কর্ম করেন, তা বলে শ্রীভগবান এখন প্রসঙ্গান্তরে আসছেন। সাধারণ লোকের মধ্যে কিভাবে ঐ ভাব আনতে হবে এবং ঐ জ্ঞান লাভ করে মানুষ কিভাবে যথার্থ জ্ঞানী হবে, সেই কথা শ্রীভগবান বলছেন: 'যিনি কামনা ও সংকল্প ছাড়াই সমস্ত কর্মের সূচনা করেন এবং যাঁর শুভাশুভ কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েছে, তাঁকে জ্ঞানিগণ প্রকৃত পণ্ডিত বলে থাকেন।'

সাধারণ লোকে যখন দুর্গাপূজাদি করে তখন নিজেদের নামে সংকল্প করে এবং সাংসারিক মঙ্গল কামনা করেই পূজা করে। কিন্তু আমরা সন্ন্যাসীরা যখন দুর্গাপূজাদি করি, নিজেদের নামে

সংকল্প করি না। আমরা সংঘজননী মা-ঠাকরুনের হয়ে পূজা করি। তাঁর নামে সংকল্প হয় আর আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রীতি কামনা করি—নিখিল জনগণের মধ্যে তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারিত হোক এবং সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভগবদ্‌ভক্তি বৃদ্ধি পাক—এই প্রার্থনা থাকে সংকল্পের মধ্যে। আমাদের ব্যক্তিগত কোন কামনা থাকে না। কেবলমাত্র লোককল্যাণের কামনা থাকে। এই-ভাবেই শুধু দুর্গাপূজা নয়—সমস্ত কাজই 'কামসংকল্পবর্জিত' হয়ে করতে হয়। তার ফলে 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মা' হলেই মানুষ যথার্থ পণ্ডিত হয়।

এখানে শংকর 'জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং'-এর ব্যাখ্যায় বলছেন—'কর্মাদৌ অকর্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্' অর্থাৎ, সত্যি-সত্যিই যেটাকে কর্ম মনে হচ্ছে সেটা কর্ম নয়—এই বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে, আমি কোন কর্মই করি না। অকর্তা, অভোক্তা আমি। তবে কর্মটা কার? কর্মটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়ের সংঘাতমাত্র। স্বরূপতঃ আমার কোন কর্ম নেই। এই বিষয়টি ভগবান শংকর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন: নৌকাতে করে আমি যাচ্ছি। নৌকাটি স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। নৌকাতে বসে আমার মনে হচ্ছে তীরের গাছপালাগুলি যেন সরে সরে যাচ্ছে। আমরা এখানে ট্রেনের উদাহরণ নিতে পারি। ট্রেনে করে আমি যাচ্ছি। দ্রুত-গামী ট্রেনের মধ্যে আমি বসে আছি। মনে হচ্ছে গাছপালাগুলি দ্রুত সরে যাচ্ছে। কিন্তু তা তো সত্যি নয়। আমিই ট্রেনে বসে আছি স্থির হয়ে, ট্রেন ছুটছে আর বাইরের গাছপালাগুলিও সব স্থির হয়েই আছে। এইটা বোঝা যে, কর্মাদি যা কিছু সবই বাইরে—আমি স্থির, অকর্তা, দ্রষ্টা, সাক্ষীমাত্র। আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই তত্ত্ব যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাই যথার্থ পণ্ডিত, যথার্থ জ্ঞানী। (৪।১৯)

বিবিধ সংবাদ

রাজশেখর বসু ও দাশরথি তা-র স্মৃতি-সংরক্ষণ

বর্ধমান রাজশেখর বসু জন্মশতবর্ষ-উৎসব-সমিতি কর্তৃক রসসাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ধমানের অনতিদূরে বামুন-পাড়া গ্রামে তাঁহার জন্মভিটায় যে 'পরশুরাম' স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, গত ১লা জুন (১৯৮০), বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও গ্রামবাসীদের এক বিশাল সমাবেশে তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁহার ভাষণে রাজশেখর বসুর রসরচনার বৈশিষ্ট্য ও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন। ঐ দিনই 'পরশুরাম' স্মৃতিস্তম্ভের অনতিদূরে পরশুরাম-স্মৃতিরক্ষার উদ্যোক্তা ও সমিতির প্রথম সভাপতি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী প্রয়াত দাশরথি তা-র স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন তাঁহার পত্নী রমা দেবী। (গত ২৭শে এপ্রিল বামুনপাড়া গ্রামে পরশুরাম-জন্ম-শতবর্ষ-উৎসব সমিতির বৈঠক চলা-কালে দাশরথি তা মহাশয় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।)

রাজশেখর বসু সম্বন্ধে আলোচনা, আবৃত্তি, কবিতাপাঠ ও তাঁহার রচনা অবলম্বনে নাটকাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐদিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত বামুনপাড়া গ্রাম ছিল মুখর। এই উপলক্ষে

সাহিত্যিকদের রচনাসমৃদ্ধ একটি স্মারকগ্রন্থও প্রকাশিত হয়। সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীতাপস কুমার সরকার, প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীতিমিরহরণ সেনগুপ্ত ও সভাপতি শ্রীসরোজকুমার আদিত্য সভায় ভাষণ দেন।

উৎসব

নববারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গত ৯ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীমা সারদাদেবীর ১২৭তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ও উষাকীর্তনের পর শ্রীশ্রীমার পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পাঠ হয়। অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠের পর ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ কর্তৃক উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের পর শ্রীশ্রীমায়ের দিব্যজীবন আলোচনা করেন সভাপতি স্বামী যোগস্থানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী জিতাত্মানন্দ। সমাপ্তি-সংগীত পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদ-সভাপতি ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ কর্তৃক ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রতিদিনই মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ভজন-গান, পূজা, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, কথামৃতপাঠ ও ছায়াচিত্র-প্রদর্শন ইত্যাদি হয়। শেষ দিন বিশেষ পূজা এবং দরিদ্রনারায়ণ ও ভক্তবৃন্দের সেবা হয়। এই উৎসবে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী কান্তিলতা দেবী, শ্রীসুধীরচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাধারমণ কীর্তন-সমাজের নাম উল্লেখযোগ্য। সারদা মঠের সন্ন্যাসিনীগণ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দও অনুষ্ঠানে যোগদান ও অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিকাও প্রকাশিত হয়।

আমতলী (ত্রিপুরা) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। ৭ই মঙ্গলারতি, ভজন, গীতাপাঠ ও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ৮ই মঙ্গলারতি, ভজন ও উপনিষদ্-পাঠ এবং সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচনার পর রামায়ণ-গান পরিবেশন করেন শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ। ৯ই মঙ্গলারতি, ভজন ও লীলাপ্রসঙ্গপাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ সংগীত-সহযোগে প্রভাতফেরিতে নগর পরিক্রমা করা হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভজনের পর প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যারতির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্রীননীরঞ্জন দত্ত এবং ডঃ পরেশচন্দ্র চৌধুরী।

দক্ষিণ দিল্লীর সরোজিনী নগর, চিত্তরঞ্জন পার্ক ও সংলগ্ন অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী লাইব্রেরীর উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে ৯ই মার্চ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা হয়। ২৯শে মার্চ ও ৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় স্বামী বুধানন্দের পৌরোহিত্যে বিনয়নগর বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল এবং চিত্তরঞ্জন পার্ক শিব-মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মসভায় প্রথম দিন স্বামী বিপাশানন্দ ও ডাঃ ইন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং দ্বিতীয় দিন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভান্তে সভাপতি মহারাজ ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। এই দুই সভায় যথাক্রমে ৩০০ ও ৭০০ ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর চিত্র-সংবলিত একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

[উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন]

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ)

রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড—১৪৲ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৩৫৲ টাকা

বোর্ড বাঁধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০৲ টাকা

প্রথম খণ্ড—	ভূমিকা : আমাদের স্বামীজী ও তাঁহার বাণী—নিবেদিতা, চিকাগো বক্তৃতা, কর্মযোগ, কর্মযোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসূত্র
দ্বিতীয় খণ্ড—	জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত
তৃতীয় খণ্ড—	ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও মনোবিজ্ঞান
চতুর্থ খণ্ড—	ভক্তিযোগ, পরাভক্তি, ভক্তিরহস্য, দেববাণী, ভক্তিপ্রসঙ্গে
পঞ্চম খণ্ড—	ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসঙ্গ
ষষ্ঠ খণ্ড—	ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী
সপ্তম খণ্ড—	পত্রাবলী, কবিতা (অনুবাদ)
অষ্টম খণ্ড—	পত্রাবলী, মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ
নবম খণ্ড—	স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, স্বামীজীর কথা, কথোপকথন
দশম খণ্ড—	আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ (সংক্ষিপ্তলিপি-অবলম্বনে), বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

কর্মযোগ—	পৃঃ ১৪১,	মূল্য ৩·৫০
ভক্তিযোগ—	পৃঃ ৯৬,	মূল্য ২·৮০
ভক্তি-রহস্য—	পৃঃ ৯৮,	মূল্য ৩·৪৫
জ্ঞানযোগ—	পৃঃ ২৯০,	মূল্য ১০·৫০
রাজযোগ—	পৃঃ ২১৪,	মূল্য ৫·৬০
সন্ন্যাসীর গীতি—	পৃঃ ২৩,	মূল্য ০·৬৫
ঈশদূত যীশুখৃষ্ট—	পৃঃ ২৯,	মূল্য ০·৮০
সরল রাজযোগ—	পৃঃ ৩৬,	মূল্য ১·২৫
পত্রাবলী—প্রথমার্ধ—	পৃঃ ৪০২,	মূল্য ১০·০০
শেষার্ধ—	পৃঃ ৪২৪,	মূল্য ১০·৫০
রেক্সিন বাঁধাই (সমগ্র পত্র একত্রে, নির্দেশিকাদি সহ)—		মূল্য ২৭·০০
ভারতীয় নারী—	পৃঃ ৯৩,	মূল্য ২·৪০
পওহারী বাবা—	পৃঃ ১৮,	মূল্য ১·২৫
স্বামীজীর আহ্বান—	পৃঃ ৮০,	মূল্য ১·২৫
ধর্ম-সমীক্ষা—	পৃঃ ১৩০,	মূল্য ২·৫০
বেদান্তের আলোকে—	পৃঃ ৮৫,	মূল্য ৫·০০
ভারতে বিবেকানন্দ—	পৃঃ ৪২৪,	মূল্য ১০·০০
দেববাণী—	পৃঃ ১৬০,	মূল্য ৬·৫০
শিক্ষাপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ২৩৮,	মূল্য ৪·০০
কথোপকথন—	পৃঃ ১৩৫,	মূল্য ১·২৫
মদীয় আচার্যদেব—	পৃঃ ৬২,	মূল্য ১·৯০
জ্ঞানযোগ-প্রসঙ্গে—	পৃঃ ১৪৩,	মূল্য ২·০০
চিকাগো বক্তৃতা—	পৃঃ ৫২,	মূল্য ১·৭৫
মহাপুরুষপ্রসঙ্গ—	পৃঃ ১৩৪,	মূল্য ৬·০০
(স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা] রচনা)		
পরিব্রাজক—	পৃঃ ১৩২,	মূল্য ৩·০০
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—	পৃঃ ১৩৬,	মূল্য ২·২৫
ভাববার কথা—	পৃঃ ৬৪,	মূল্য ২·৩০
বাণী-সঞ্চয়ন—	পৃঃ ৩১৬,	মূল্য ৭·০০
বর্তমান ভারত—	পৃঃ ৪০,	মূল্য ২·৫০
ধর্মবিজ্ঞান—	পৃঃ ১২০,	মূল্য ২·০০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

রামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮'০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২'৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫'২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭'৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮'২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯'৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। পৃঃ ৬৪০৷ মূল্য ২৬'০০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩'৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬'০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭'০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১'২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৪'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২'২০, বাঁধাই ২'৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'০০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১.০০

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'০০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০'০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬'০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭'০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৪০, মূল্য ৩'০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬'০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬'০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮'০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২'৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭'০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮'০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১'২৫

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬'৪০

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭'০০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬'০০, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ২য় অধ্যায় ১৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৪, মূল্য ১'৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ১১৬, মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৭'০০

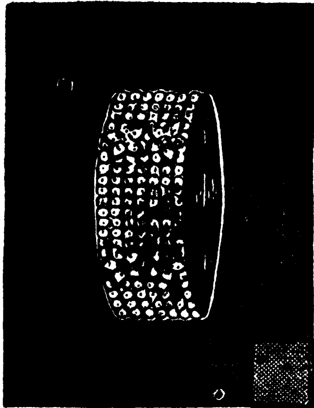
সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

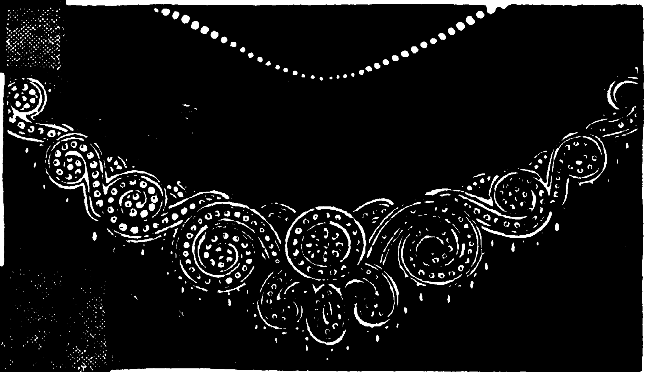
গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

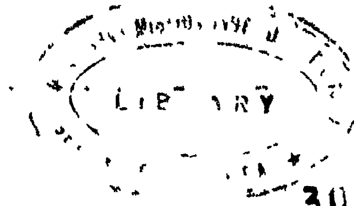
প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩







৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ



শ্রাবণ ১৩৮৭

৮২তম বর্ষ

৭ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে বার্ষিক মূল্য সডাক ১২্ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭্ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩্ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১্ টাকা। প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক। কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহকনম্বর পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক। অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

নিবেদন

বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যুৎ পরিস্থিতির অভূতপূর্ব অবনতি ঘটায় গত কয়েক মাস যাবৎ পত্রিকা বড় বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যা ডাকে দেওয়া হয় ২৮শে ফাল্গুন, চৈত্র সংখ্যা [illegible] বৈশাখ, বৈশাখ সংখ্যা [illegible] জ্যৈষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ৭ই আষাঢ়, আষাঢ় সংখ্যা [illegible] শ্রাবণ। [illegible] এই বিলম্বের মূল কারণ হইল, বিদ্যুৎ সরবরাহ [illegible] প্রেসের কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হওয়ায় প্রেস নির্দিষ্ট [illegible]

পত্রিকা বিলম্বে [illegible] নিকট হইতে আমরা প্রতিদিনই অভিযোগপত্র পাই। [illegible] অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। [illegible]

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি [illegible] বিলম্বের [illegible]

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সম্পাদক

[illegible] শ্রাবণ, ১৩৮৭

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনের (১৯২৬) বিবরণগ্রন্থ

[illegible] হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] প্রতিনিধি উহাতে যোগ দিবেন [illegible] মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে [illegible] বিবরণগ্রন্থ (THE RAMAKRISHNA MATH & MISSION CONVENTION—1926) পুনর্মুদ্রিত [illegible] ঐতিহাসিক গ্রন্থ, যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ [illegible] স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে [illegible] রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের [illegible] অবশ্যপাঠ্য। স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে [illegible]

মূল্য [illegible] টাকা

প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন
কলিকাতা ৭০০০০৩



উদ্বোধন, শ্রাবণ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



৮২তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

মনুষ্যসমাজে দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়, সে ততই তীব্রভাবে ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করে। আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ে তাহার সুখানুভূতি হইতে থাকে। এইরূপে মানুষ যখন বুদ্ধির বা মনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা ও দিব্যানুভূতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি-পরিচালন-জনিত সুখ শূন্য বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়, তখন তারাগণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আবার সূর্য উদিত হইলে চন্দ্রও নিষ্প্রভ ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অল্পোজ্জ্বল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ততায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি-জনিত সুখসমূহ স্বভাবতই নিষ্প্রভ হইয়া যায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৪।৫৪-৫৫]



কথাপ্রসঙ্গে

ভাব ও ত্যাগ

শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব-সংবাদে আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা ও পরম ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন :

বাগ্‌ গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥ (১১।১৪।২৪)

অর্থাৎ, যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ এবং চিত্ত দ্রবীভূত, যিনি বারংবার রোদন করেন, কখনও বা হাসেন, কখনও লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চকণ্ঠে গান করেন ও নৃত্য করেন—আমাতে ভক্তিযুক্ত ঐরূপ ব্যক্তি ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে এই ধরনের অনেক শ্লোক দেখা যায়। আরেকটি শ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিমি-নবযোগীন্দ্র-সংবাদে আছে, নিমি-রাজকে মহাভাগবত কবি-নামক ঋষি বলিতেছেন :

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ (১১।২।৪০)

অর্থাৎ, লজ্জা ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নামগান করিয়া সঙ্গহীনভাবে বিচরণ করাই যাঁহার ব্রত, এইরূপ ব্যক্তি নিজ প্রিয় শ্রীভগবানের নামকীর্তন-হেতু অনুরাগযুক্ত ও বিগলিতচিত্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় অবশভাবে উচ্চহাস্য, রোদন, চীৎকার, গীত ও নৃত্য করেন।

নারদভক্তিসূত্রেও আছে, 'কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীং চ।' (সূত্র ৬৮)। অর্থাৎ, ভক্তগণ যখন পরস্পর ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন, তখন তাঁহাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তাঁহারা অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকেন; তাঁহারা নিজ নিজ বংশকে এবং পৃথিবীকেও পবিত্র করেন।

গীতায় ঠিক এই ধরনের ভক্তিলক্ষণের সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ভক্তির আচার্যগণের ব্যাখ্যায় উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, 'সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥' (৯।১৪)—এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন, 'পুলকিতসর্বাঙ্গাঃ হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠাঃ শ্রীরাম-নারায়ণ-কৃষ্ণ-বাসুদেবেত্যেবমাদীনি সততং কীর্তয়ন্তঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ, রোমাঞ্চিতকলেবর, হর্ষগদ্‌গদকণ্ঠ [ভক্তগণ] শ্রীরাম, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদি নামসমূহ সর্বদা কীর্তন করিয়া [··· আমার উপাসনা করে।]।[১]

শ্রীরূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি শ্রীমদ্‌ভাগবত-নির্ভর গ্রন্থে এই সকল ভক্তিলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়।

প্রচলিত ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে উত্তম ভক্তের এই সকল লক্ষণ নিজে পড়িয়া, কথকগণের মুখে শুনিয়া অথবা ভক্তমণ্ডলীতে কাহারো কাহারো দেহে এই সকল লক্ষণের আংশিক প্রকাশ দেখিয়া অনেকের এই ধারণা হয় যে, এই লক্ষণগুলি আয়

১ 'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥' (১০।৯)—গীতার এই শ্লোকটিও অনায়াসেই অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত নারদভক্তিসূত্রের ৬৮-সংখ্যক সূত্রটি এইরূপ ব্যাখ্যার আনুকূল্য করে।

করিতে পারিলেই যথার্থ ভক্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যকে উপজীব্য করিয়া এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গগুণে এবং তাঁহার সেবা করিবার ফলে ভক্তগণের অন্তরে ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভাবের আতিশয্যে শারীরিক বিকৃতি এবং কখন কখন বাহ্যসংজ্ঞার লোপই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচায়ক। যাঁহার যত বেশী ভাববিকার উপস্থিত হয়, তিনি তত বড় ভক্ত—এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৈবশক্তিপ্রভাবে তাঁহাদের মনোরাজ্যে কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে, এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্বদা উদ্‌গ্রীব থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। ফলে ভাবভক্তিমূলক সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্র কয়েকজনের শারীরিক বিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞার আংশিক লোপ উপস্থিত হইতেছিল।

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ আরও লিখিয়াছেন যে, ভাবুকতার এইরূপ নির্বাধ প্রশ্রয়ে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা নির্দেশ করিতেন, সেই সূক্ষ্মদর্শী নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। তিনি নানা যুক্তিতর্কসহায়ে ঐ সকল ভক্তদের বুঝাইতে লাগিলেন যে, যে-ভাবোচ্ছ্বাস সাধকের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে না এবং তাহাকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করে না, তাহার প্রভাবে অশ্রু, পুলক প্রভৃতি শারীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইলেও তাহার মূল্য অতি অল্প; উহা স্নায়বিক দুর্বলতাপ্রসূত এবং মনোবলে উহা দমন করিতে না পারিলে পুষ্টিকর খাদ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

যে-কথা স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রকটলীলাকালেই ভাবপ্রবণ ভক্তগণকে বলিতেন, পরবর্তী কালেও সেই একই কথা তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাসমাধির দ্বাদশ বৎসর পরে স্বামীজী এই মত প্রকাশ করেন যে, সংকীর্তনের উৎসাহে লম্ফঝম্প করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীকে আলোড়িত করা এবং তাহার ফলে মূর্চ্ছাগ্রস্ত হওয়াই ভক্তি নহে—ঐরূপ লম্ফঝম্প করিলে বা মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইলে অথবা ভাবাবস্থায় অলৌকিক দর্শন হইলেই যে সাধকের সমাধি-অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। ভক্তির প্রবলতায় নিঃসন্দেহে যোগের উচ্চ সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু ভাবাবস্থায় ভক্তদের যে-সকল দিব্যদর্শনাদির কথা শোনা যায়, সেগুলি স্নায়ুর তাড়নায় স্বপ্নসন্দর্শন অথবা যথার্থ ভক্তির ফলে ভাবসমাধিপ্রসূত, ইহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। ভাবাবস্থা যথার্থ হইলে সাধকের প্রত্যেকটি দিব্য-দর্শনই জীবের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে এবং সেই ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ও সদাচারপূত হইয়া থাকে। কিন্তু ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন যদি স্বার্থপূর্ণ ও সদাচারবিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত বুঝিতে হইবে এবং যাহাতে সে নীরোগ হইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্যানফ্র্যানসিসকোতে একটি বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন: 'অনন্তচৈতন্য-লাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই; সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে দণ্ডায়মান।'

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন: 'Emotional side-টা ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। ঐটেই

বড় ভয়। যারা বড় emotional, তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন, তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না…।'

'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দজী জনৈক সাধুকে বলিতেছেন : 'Emotional (ভাবপ্রবণ) হতে নেই, feeling (ভাব) চেপে রাখতে হয়।' ঐ গ্রন্থেই তাঁহার আরেকটি উপদেশ : 'ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে খুব হুড়মুড় করে জপধ্যান করতে গেলে reaction (প্রতিক্রিয়া) সামলান দায়। Reaction সামলাতে না পারলে মন বড় নীচে চলে যায়। তখন ধ্যানজপ করতে আর মোটেই ইচ্ছা হয় না। সে মনকে তুলে নিয়ে আবার ধ্যানজপে বসান বড় শক্ত ব্যাপার।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজী বলিয়াছিলেন : 'ঠাকুর বলতেন—বেশী নাচুনি-কাঁদুনি ভাল নয়। ওতে ভাব নষ্ট হয়। জোর করে কি ভাব হয় রে ? ওটা সাধনের জিনিস, খুব সাধন করে লাভ করতে হয়।'

বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্যগণের যাবতীয় আধ্যাত্মিক উক্তির উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণী। এইজন্য এখন আমরা দেখিব আমাদের আলোচ্যমান বিষয় সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিস্তারিতভাবে কি বলিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে আছে, যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথম যাতায়াত করিতেছিলেন, তখন কীর্তনাদি শুনিতে শুনিতে কয়েকজন ভক্তের ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞালোপ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইত যে, তিনি ঐরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক আনন্দসম্ভোগে বঞ্চিত আছেন। একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট নিজ অতৃপ্তির কথা নিবেদন করিয়া ঐরূপ ভাবসমাধির জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'তুই এমন উতলা হচ্ছিস কেন রে ? এতে কি যায় আসে ? সায়ের দিঘিতে হাতি নামলে টের পাওয়া যায় না ; কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হয়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপছে পড়ে।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও স্পষ্ট করিয়া নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সকল ভক্তরা ক্ষুদ্র ডোবার সদৃশ—সঙ্কীর্ণ আধার ; ভগবদ্‌ভক্তির একটু আবেশ হইলেই উহাদের ঐরূপ বাহ্যবিকার উপস্থিত হয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ 'সায়ের দিঘি', এইজন্য সহজে বিহ্বল হন না।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, সংকীর্তনে এক ব্যক্তির উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শালা আমায় ভাব দেখাতে এসেছে ! ঠিক ঠিক ভাব হলে কখন এমন হয় ?—ডুবে যায় ; স্থির হয়ে যায়। ও কি ? স্থির হ, শান্ত হয়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া) এ সব ভাব কেমন জান ? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় করে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্ছে ; মনে হচ্ছে যেন কতই দুধ, এক কড়া ! তারপর নামিয়ে দেখো, একটুও নেই ; যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ার গায়েই লেগে গেছে।'

লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ আরও লিখিয়াছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি হইতেছে অথচ অনেকদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে যাতায়াত করিয়াও নিজের ঐরূপ কোন কিছু না হওয়ায় এক ব্যক্তি (শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে প্রাণের আর্তি নিবেদন করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, 'তুই ছোঁড়া তো ভারি বোকা, ভাবচিস বুঝি ঐটে হলেই সব হল ?

ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের ঢের বড় জিনিস জানবি। নরেন্দ্রের তো ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি—তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভাব অপেক্ষা ত্যাগ বড়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যগণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উহার কিছু আলোচনা আমরা করিব। তাহার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনী হইতে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেগুলি এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে লইয়া আসেন—এই উদ্দেশ্যে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যুবকটিকে দেখিয়া তাহার ভাবাবস্থা সম্বন্ধে মতামত দিবেন। হরিসংকীর্তন করিতে করিতে একদিন সহসা যুবকটির ভাবাবস্থা উপস্থিত হয়। যখন তাহাকে আনা হইল, তখনও তাহার শরীরে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক এবং নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুপাত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'এ যে দেখছি মধুর ভাবের পূর্বাভাস! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাকবে না। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।' বাস্তবিকই কিছুদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। সংকীর্তনের সাময়িক উত্তেজনায় সে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, ভাবাবসানে ততই নিম্নে নামিয়াছে!

রানী রাসমণির জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাসের এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবসমাধি হয় এবং সেজন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুকে নানা কথা বলিয়া বারংবার নিরস্ত করিলেও মথুরবাবু সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'তা কি জানি বাবু! মাকে বলবো, তিনি যা হয় করবেন।' ইহার কয়েকদিন পরেই মথুরবাবুর ভাবসমাধি হয়। ঠাকুরকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি গিয়া দেখিলেন, মথুরবাবুর চক্ষু লাল, অশ্রু ঝরিতেছে, বুক থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মথুরবাবু ঠাকুরের শ্রীচরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'বাবা, ঘাট হয়েছে। আজ তিন দিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতেই মন যায় না···তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।' মথুরবাবু আরও বলিলেন, ভাব যে ভূতের মতো ঘাড়ে চাপিবে আর তাহার গোয়ে তাঁহাকে চব্বিশ ঘণ্টা ফিরিতে হইবে, ইচ্ছা করিলেও কিছু করিতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার বুদ্ধিতে আসে নাই। তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনেন। মথুরবাবুর ভোগবাসনা যায় নাই—পশ্চাৎটান ছিল, এইজন্যই তিনি ভাবের বেগ সহ্য করিতে পারেন নাই, তাঁহার ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবক হৃদয়রামেরও অনুরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ইহাও 'লীলাপ্রসঙ্গে' সবিস্তারে বর্ণিত আছে। নিজ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া ভোগসুখে কালযাপন করাই হৃদয়রামের জীবনের আদর্শ ছিল। স্ত্রীর মৃত্যু হইলে বিষয়ী হৃদয়রামের সাময়িক বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি নিষ্ঠার সহিত ধ্যানজপে মনোনিবেশ করিলেন এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, যাহাতে ঠাকুরের ন্যায় তাঁহারও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহ হয়। ঠাকুর তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেও হৃদয়রাম শুনিলেন না। তখন ঠাকুর বলিলেন, 'মার যা ইচ্ছা তাই হোক···মার ইচ্ছা হলে তোরও হবে।'

ইহার কয়েকদিন পরে হৃদয়রামের এক অপূর্ব দিব্য দর্শন উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থূল রক্তমাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত এবং নিজেকেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর-রূপে দর্শন করিলেন। তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'ও রামকৃষ্ণ! ও রামকৃষ্ণ! আমরা তো মানুষ নই, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যা, আমিও তাই।' হৃদয়ের ঐ কথা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বারংবার চুপ করিতে বলিলেও হৃদয় যখন শুনিলেন না, তখন ঠাকুর তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'দে মা, শালাকে জড় করে দে।' ফলে হৃদয়ের দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ তৎক্ষণাৎ লুপ্ত হইল। হৃদয় কাঁদিতে লাগিলেন এবং ঐরূপ করিয়া দেওয়াতে অনুযোগ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, তিনি নিজে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখিতেছেন অথচ কিছুই বলেন না, আর হৃদয় সামান্য দর্শনলাভেই এত গোল করিলে যে, তাঁহাকে ঐরূপ করিতে হইল, ইত্যাদি।

কথায় হৃদয় নীরব হইলেও অহংকারের বশবর্তী হইয়া নিজ চেষ্টায় ঐরূপ দর্শনলাভের জন্য ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন এবং একদিন গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতে ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন তাঁহার গায়ে ঢালিয়া দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি 'মামা গো পুড়ে মরলাম, পুড়ে মরলাম!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ত্রস্তপদে আসিয়া সব কথা শুনিয়া হৃদয়ের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'যা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তুই কেন এরূপ করিস বল দেখি? তোকে বলেছি, আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।' ঠাকুরের শ্রীকরস্পর্শে হৃদয়ের সকল যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দূর হইল এবং ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিয়া তিনি আর ঐভাবে ধ্যান করিতে নিরস্ত হইলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ সম্পূর্ণ ত্যাগী না হওয়া যায়, ততক্ষণ ভাবের ভিত্তি শিথিল থাকে। ত্যাগই ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: 'শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ—উহা ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়; সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক। এই ত্যাগই ধর্মের সোপান—সমুদয় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। সংক্ষেপে বলতে গেলে ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম। যখন মানবাত্মা সংসারের সমুদয় বস্তু দূরে ফেলিয়া গভীর তত্ত্বসমূহ অনুসন্ধান করে, যখন চৈতন্যস্বরূপ মানব বুঝিতে পারে, দেহরূপ জড়ে বদ্ধ হইয়া জড় হইয়া যাইতেছি এবং ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, তখন সে জড়পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয়।'

এই 'ত্যাগে'র অর্থ যে 'বৈরাগ্য' ইহাও স্বামীজী 'ভক্তিযোগে' এবং অন্যত্রও বলিয়াছেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত তাঁহার একটি সংস্কৃত পত্রে আছে: " 'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' ইতি অত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্‌বৈরাগ্যং বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিত-মস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং তদেদম্ আপততি—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনম্ অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণং চ ঈশ্বরে বা আত্মনি।"

অর্থাৎ, 'ধন বা সন্তানের দ্বারা নহে, ত্যাগের দ্বারাই বিরল কেহ কেহ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন'—[উপনিষদের] এই উক্তিতে 'ত্যাগ'

শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য বস্তুশূন্য (অভাবাত্মক) অথবা বস্তুভূত (ভাবাত্মক) হইতে পারে। বৈরাগ্য যদি অভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহা লাভ করিতে যত্ন করিবে না। আর বৈরাগ্য যদি ভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে ইহাই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ হইতেছে অন্যবস্তু হইতে মনকে সরাইয়া আনা এবং ঈশ্বরে বা আত্মায় উহাকে কেন্দ্রীভূত করা।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় স্বামী সারদানন্দও ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—ইহা আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গে'র বিভিন্ন খণ্ডে বারংবার লক্ষ্য করি। উক্ত গ্রন্থের 'গুরুভাব-পূর্বার্ধে' তিনি লিখিয়াছেন : "বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে—উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক ? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎ-টান থাকিতে উহা পারা অসম্ভব। ঈশ্বরীয় পথের পথিককে শাস্ত্র সেইজন্যই পূর্ব হইতে নির্বাসনা হইতে বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'ত্যাগেনৈকেনা-মৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিমাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক, ইত্যাদি বাসনারাশি গজ্ গজ্ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না। আচার্য শংকর যেমন বলিয়াছেন—

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্
ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে
নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥

—বিবেকচূড়ামণি, ৭৯

অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্বক অতলজলে ডুবাইয়া দেয়।"

'লীলাপ্রসঙ্গে'র উল্লিখিত খণ্ডেই অন্যত্র স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন : 'শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদিই যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে। ভাবের গভীরতার যদি পরিমাপের আবশ্যক হয়, তবে…নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, বিষয়কামনার হ্রাস প্রভৃতি দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। ভাবসমাধিতে কত খাদ আছে তাহা কেবল ঐ কষ্টিপাথরেই পরীক্ষিত হইতে পারে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা সকল প্রকার বিষয়বাসনা-বর্জিত হইয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই কেবল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—যে কোন ভাবের যথাযথ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া সম্ভব, যাহারা কামকাঞ্চন-বাসনাবিজড়িত তাহাদের ভিতর নহে। কামান্ধ কামনার টানই বুঝে—কামগন্ধ-রহিত যে মনের আবেগ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ?'

'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে এই ধরনের আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে নিরস্ত হইলাম। তবে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জনৈক ভক্তের উচ্চ ভাবাবস্থার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বৈরাগ্যের অভাবে তাঁহার অধঃপতন ঘটে। জনৈক সন্ন্যাসী এই অধঃপতনের কথা স্বীকার করিলেও, সেই ভক্তের যে গভীর ভাবাবেশ শেষ পর্যন্ত দেখা যাইত তাহার উল্লেখ করিলে স্বামী সারদানন্দ বলেন, 'তোরা বুঝি মনে করেছিস ভাব-সমাধি হলেই একটা বড় কিছু হয়ে গেল। চরিত্রবল, ত্যাগ, তপস্যা, বিশ্বাস ও ভক্তির দৃঢ়তা যদি না থাকে, তবে সাধুর আর রইল কি ?' প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদেশানন্দ লিখিয়াছেন, ঐ কথা বলিয়াই—

'মহারাজ গম্ভীর নিস্তব্ধ স্থিরদৃষ্টি হইলেন।

উপস্থিত সকলেই স্তব্ধ; নীরব নিথর নিশীথে আমাদের অন্তরের অন্ধকার গুহায় বিদ্যুৎ ঝলসাইয়া গেল—আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক নূতন প্রকাশ!

'শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে যাঁহাদের কিছুদিনও বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে মা তাঁহার সন্তানদের জীবনগঠনের জন্য চরিত্রবল, ত্যাগ, সংযম, ভগবদ্‌ভজন এবং সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি ও নির্ভরতা শিখাইতেন। তাঁহার নিজের যেমন, তেমনই তাঁহার সন্তানগণের মধ্যেও ভাবাবেশের বা ভাবুকতার আড়ম্বর কখনও দেখা যাইত না। সকলেই ছিলেন সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির।' (উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৮৬, পৃঃ ৬৮)

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী দেবানন্দ

জীবনের প্রথমেই কম বয়সে হাতে পাই ছোট্ট একখানা ধর্মপুস্তিকা—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সংকলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ'। বইটি এত ভাল লাগে যে বারবার পড়েও আশ মিটতো না। পরে ধীরে ধীরে ঠাকুর-স্বামীজীর আরো বই পাই এবং মনপ্রাণ দিয়ে পড়ি। সর্বধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত ও জলন্ত বিগ্রহ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন যাঁকে দেখে আত্মহারা হয়েছিলেন, সেই 'ব্রজের রাখাল', ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বা রাজা মহারাজকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে, বেলুড় মঠে। তখন আমার বয়স ১৭ বৎসর। মঠে তখন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ অনেকেই রয়েছেন।

ভগবানের আরাধনা করার আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে বেলুড় মঠে এসেছি জেনে পূজ্যপাদ মহারাজরা যেন খুশী হলেন। রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি আমার দিকে সস্নেহে তাকালেন, আমি তখন নির্ভয়ে বললাম, 'মঠে আমাকে রাখতে হবে, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই।' রাজা মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই একা এলি কি করে? কে তোকে মঠের সন্ধান দিলে?' আমি বললাম, 'একা আসিনি, আপনাদের বীরেন মহারাজের কাছ থেকেই সব সন্ধান নিয়েছি। তিনি আমার পিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গেই পালিয়ে এসেছি।' শুনে রাজা মহারাজ বললেন, 'বেশ, তুই এঁদের সঙ্গে কথা বল, আমি পরে তোর সব কথা শুনবো।' এই বলে তিনি উপরে উঠে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ তখন আমার কয়েকটি কথা শুনে বললেন, 'তোকে তো ধরে নিয়ে যাবে, কি করে থাকবি এই মঠে?' তখন বীরেন মহারাজ নিকটে থাকায় তিনি বললেন, 'আমিও এই কথাই বলেছিলাম; কিন্তু ওর তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেনেই সঙ্গে এনেছি।' এরপর বীরেন মহারাজ আমার পিতৃদেব, তাঁর সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং আমার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা পূজ্যপাদ মহারাজদের বললেন। ব্যক্তিগত কথা বলে সেগুলির উল্লেখ করলাম না।

বীরেন মহারাজের সব কথা শুনে বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'বেশ ত, সাধু হবে উত্তম কথা, তবে আরও কিছুকাল শাস্ত্রাদি পড়া ভালো। তাঁকে লাভ করতে হলে জ্ঞানবুদ্ধি থাকা চাই। উত্তরে

বললাম, 'আমার শাস্ত্রবিদ্যার দরকার নেই, আপনাদের সৎসঙ্গে থেকেই প্রকৃত ধর্মজীবন লাভ করতে চাই। আমি ফিরে যাব না।' বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'আর, একটা পথ দেখাচ্ছি; মঠেই থাকবি, আর ঐ ··· পণ্ডিতের টোলে শাস্ত্র পড়বি। পরে সাধু করে নেব। তিনি পড়াতে রাজী হলে তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।' এই বলে অদূরে ঐ পণ্ডিতের কাছে যাবার পথ দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ পণ্ডিতজী, যিনি আমার পিতৃদেবকে জানতেন, আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। আমি মঠে ফিরে এসে সবই বললাম। আমার অশ্রুসিক্ত চোখ ও অন্তরের ব্যাকুলভাব দেখে বাবুরাম মহারাজ বললেন, 'বেশ মঠেই থাক, পরে দেশে গিয়ে আরও কিছুদিন পড়াশুনা করে চলে আসবি। তোর অদৃষ্ট ভালো, কেউ তোকে বেঁধে রাখতে পারবে না।'

বেলুড় মঠে কটা দিন বেশ আনন্দেই কাটলো। রাজা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজের অপার করুণা ও অসীম স্নেহের পরিচয় এবং তাঁদের অমূল্য উপদেশ পেয়ে ধন্য হলাম। তাঁদের অপার্থিব ভাল-বাসার গভীরতা ছিল অতলস্পর্শী, সেই ভালবাসায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হলাম।

একদিন রাজা মহারাজ উপরে তাঁর ঘরে আছেন জেনে আমি গিয়ে তাঁর দরজার পাশে দাঁড়াই। তিনি আমাকে দেখে কাছে ডেকে নিলেন। আমি প্রণাম করার পর কয়েকটি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে একাকী পেয়ে সরলভাবে সবই বললাম। তিনি সাগ্রহে সব শুনে বললেন, 'তোর ভাগ্য ভালো, জন্মান্তরের পুণ্যবল আছে। তোকে কেউ রাখতে পারবে না সংসারে। ভগবানকে আশ্রয় ও ভরসা করে যারা ছোট কাল হতেই থাকে, তাদের আর ভাবনা কি? আমাদেরও আশীর্বাদ নিশ্চয়ই থাকবে। এবার তুই ফিরে যা, যখন ঘরে নেবার জন্য এত ধরাধরি করছে তখন গিয়ে আর কিছুকাল পড়াশুনা কর। পরে আবার তীব্র বৈরাগ্য হলেই সব ছেড়ে বের হবি, তোর কোন ভয় নেই।'

রাজা মহারাজের শুভাশীর্বাদ ও পদধূলি মাথায় নিয়ে নিচে নেমে এলাম। মঠের নির্জন, শান্ত ও পবিত্র পরিবেশ এবং মহারাজদের দুর্লভ সঙ্গ ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মর্মাহত হলাম।

পরদিন প্রাতে পূজনীয় মহারাজদের প্রণাম করে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেশে যাত্রা করলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও। মহারাজদের নির্দেশমতো বৎসরাধিক কাল পিতৃদেবের কাছে পড়ি। সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাকী রিক্তহস্তে ১৯১৬ সালের অগস্টে কামাখ্যায় চলে যাই। পরে ১৯১৭ সালের অগস্টে হরিদ্বারে যাই। উত্তরাখণ্ডের এক প্রাচীন মহাত্মার নির্দেশে কনখল রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে উপস্থিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ মহারাজ আমার সব কথা শুনে আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। নিশ্চয়ানন্দ মহারাজও সব কথা শুনলেন। এঁরা দুজনেই স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।

একদিন কল্যাণানন্দ মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, '১৯১২ সালে এখানে রাজা মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ ও হরি মহারাজ এসেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে এই সেবাশ্রমে ৺দুর্গাপূজা করান। পূজ্যপাদ মহারাজরা উপস্থিত থাকায় ঐ সময় সর্বদা একটা আধ্যাত্মিক আবহাওয়া এবং আনন্দস্রোত চলেছিল। ঐ উপলক্ষে সাধুদের এক বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারাও হয়। পূজাপাঠ, ভজনকীর্তনে এক অভূতপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। পূজার তিন দিনই যেন আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল। মহারাজরা সর্বদাই এক দিব্যভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন। সেই ধ্যানগম্ভীর ভাবময় অবস্থা দেখে সবাই মুগ্ধ হতেন। ওঁদের ভিতর ঐশী শক্তির

বিকাশ সবাই অনুভব করতেন।'

আর একদিন কল্যাণানন্দ মহারাজ রাজা মহারাজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। সেগুলি আমরা এখন প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে পাই। তাই বাহুল্যভয়ে সেগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না।

রাজা মহারাজের সম্পর্কে এইসব অপূর্ব কথা শুনে আমার মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হলো। অন্তরে তীব্র আকাঙ্ক্ষাও হলো রাজা মহারাজকে পুনরায় দর্শন করার। আমার শুভ সংকল্প জেনে কল্যাণানন্দ মহারাজ যাবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন। বললেন, 'রাজা মহারাজ মাঝে মাঝে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরেও থাকেন। বলরাম মন্দির ঠাকুর, মা ও তাঁদের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদদের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত। ঐ বাড়ীর সবাই ঠাকুর, মা ও মহা-রাজদের পরম ভক্ত ও সেবক। রাজা মহারাজকে মঠে না পেলে বলরাম মন্দিরে গিয়ে দর্শন করবে।'

অবশেষে ইংরাজী ১৯১৯ সালের অগস্ট মাসে কনখল হতে প্রথমে ৺কাশীধামে গিয়ে পূজ্যপাদ হরি মহারাজের দর্শন ও সৎসঙ্গলাভ করি। পূজ্যপাদ লাটু মহারাজেরও দর্শন এই সময় ভাগ্যে ঘটে। দুটি মাস হরি মহারাজজীর সঙ্গ ও কিঞ্চিৎ সেবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হই।

অক্টোবর মাসে পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ৺কাশী হতে বেলুড় মঠে আসি। রাজা মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরেই ছিলেন। পরদিন পথের সন্ধান নিয়ে বাগবাজার বলরাম মন্দিরে যাই তাঁকে দর্শন ও প্রণামাদি করতে। গিয়ে জানলাম তিনি উপরের হল ঘরটিতে একাকী বসে আছেন। আমি তাঁর সেবকের অনুমতি নিয়ে উপরের হলে গিয়ে রাজা মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেই বললাম, 'আমি কনখল মিশন থেকে কাশী আশ্রম হয়ে আসছি আপনাকে দর্শন করতে।' তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি আমাকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করলো। তাঁর তেজঃপুঞ্জ আকৃতি, সুন্দর প্রসন্ন আনন, এবং অন্তর্মুখী দৃষ্টি দেখে মনে হলো যেন শান্ত সমাহিত অবস্থা। মাথায় হাত দিয়ে তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। তাঁর দিব্যস্পর্শে এক অপার্থিব আনন্দে আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত দেরী করে এলি কেন ? কেমন আছিস ?' আমি সংক্ষেপে সবই বললাম। তিনি বললেন, 'তোর কথা ভুলিনি, এবার দীক্ষা নিয়ে নে। বল, মার থেকে নিবি, না আমার থেকে নিবি ? কি ইচ্ছা তোর ?' তখন মা জয়রামবাটীতে, ওখানে যাতায়াতও সহজ নয় ভাবছি। এমন সময় আমার অন্তরের ইচ্ছা বুঝেই মহারাজ বললেন, 'বেশ তো, তোকে আমিই মন্ত্র দেব, ভাবনা কি ? জয়রামবাটী যাতায়াত এখন খুবই কষ্টকর। তুই মঠে গিয়ে থাক, আমি পাঁজি দেখে শুভদিনেই মঠের ঠাকুর-ঘরে তোকে দীক্ষা দেব।'

তাঁর অযাচিত কৃপার কথা ভেবে আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে গেলো। আমি তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মঠে ফিরে এলাম। রাজা মহারাজের কৃপা পাবো জেনে মঠের পূজনীয় মহারাজরাও আনন্দিত হলেন। আমিও দীক্ষার শুভদিনের প্রতীক্ষায় মঠের সুন্দর শান্ত পরিবেশে মনের আনন্দে নিত্য ঠাকুরদর্শন ও সাধুসঙ্গাদি করতে থাকলাম।

রাজা মহারাজ ক'দিন পর এসে মঠের পুরাতন ঠাকুরঘরে আমাকে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষা দিতে আসনে বসেই তিনি যেন ধ্যানস্থ হলেন। দিব্যজ্যোতিঃপূর্ণ তাঁর সৌম্য সহাস্য ধ্যানমগ্ন মূর্তি দেখে আমিও অব্যক্ত আনন্দে আত্মহারা হলাম। এক দিব্যভাবে বিভোর হয়েই তিনি ঠাকুরের পূজা করলেন এবং আমাকে দীক্ষা দিলেন। কিভাবে জপধ্যান করতে হবে সবই বলে দিলেন। আশীর্বাদ করলেন, 'তোর অভীষ্ট পূর্ণ হোক, তুই সেই অমৃতের অধিকারী হ, ধ্যানজপে ডুবে যা।' ঐ দিন

মহারাজ পরে আরও দু'একজনকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষার দিন বিকালে রাজা মহারাজকে প্রণাম করতেই বললেন, 'ভুলবি না, ভগবানলাভই জীবনের একমাত্র আদর্শ। তিনি সর্বদা সর্বত্রই বিরাজমান। খুব মনপ্রাণভরে তাঁকে ডাকবি। তাঁর কাছে যা চাইবি তাই পাবি, তবে যারা তাঁকে চায় তারাই বুদ্ধিমান। যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। মনটাকে এমনভাবে তৈরী করবি যাতে তাঁর ধ্যান, তাঁর স্মরণ-মনন ছাড়া অন্য কোন চিন্তা বা বাসনা মনে স্থান না পায়। খুব আকুল প্রাণে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করবি, জানবি সরল পবিত্র হৃদয়ই তাঁর আসন। কলিতে যোগযাগের চেয়ে জপই হচ্ছে সহজ উপায়। জপের ফলেই মন স্থির হয়ে ইষ্টতে লয় হয়। যখন বহুজন্মের পুণ্যবলে বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, তখন সব চিন্তা ছেড়ে তাঁকেই জোর করে ধর। তিনিই সব ভুলভ্রান্তি শুধরে তাঁর দিকেই টেনে নেবেন। কখনো হতাশ হবি না, শরীর মন শুদ্ধ নিষ্পাপ করতে তাঁর ধ্যান-জপ, ভজন ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নেই। জানবি সন্ধিক্ষণ ও নিশীথ রাতের মতো তপস্যার ভালো সময় আর নেই। ঐ সময় সুষুম্না নাড়ী চলে—অর্থাৎ দুই নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বয়। তাই মন সহজেই স্থির হয়।' কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ যেন ভাবস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর সুন্দর দিব্যকান্তি ও অন্তর্মুখী ভাব দেখে আমি তাঁর ধ্যান করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, 'এবার যা, আমি একটু কাজকর্ম করি।'

বেলুড় মঠে আর এক দিনের ঘটনা। রাজা মহারাজ দুপুরে খাবার পর বিশ্রাম করবেন এমন সময় আমাকে তাঁর দরজার পাশে দেখে বললেন, 'কিরে মঠে তোর কেমন লাগছে? জপধ্যান হচ্ছে তো?' আমি বললাম, 'আপনার আশীর্বাদে ভালই লাগছে, বেশ আনন্দেই আছি। তবে জপ সম্বন্ধে আমার একটু জিজ্ঞাস্য আছে—মালায় বা করে সংখ্যা রেখে জপ করার চেয়ে আমার শুধু মানস জপই ভালো লাগে। মনে মনে শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্বদাই জপ করা অভ্যাস করতে পারলে সংখ্যা রেখে জপ করার দরকার আছে কি?' মহারাজ বললেন, "বেশ কথা, তোর ভালো লাগলে ঐভাবেই নিত্য জপ করবি। যত বেশী সময় পারিস, তাঁর স্মরণ-মনন করে যাবি। মালা বা করে নাই বা জপ করলি। উদ্দেশ্য সংখ্যা রাখা নয়, যত বেশী তাঁকে স্মরণ-মনন করতে পারা যায়, ততই ভালো। যার মালা বা করে সুবিধা হয়, সে তাই করবে—বাধা নেই। ঠাকুর বলতেন, 'পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান। ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান।' "

এ কথার পর মহারাজ শুয়ে পড়লেন। বললেন, 'তুই একটু আমাকে টিপে দে পিঠের দিকটা।' আমি মনের আনন্দে জোরে জোরে টিপতে শুরু করলাম। জীবনে পূর্বে কোনদিন কাউকে এভাবে সেবা করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই দুহাত দিয়েই ভয়ে ভয়ে টিপে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার মুখের ঘাম মোছার জন্য একহাতেও টিপতে হচ্ছে, কারণ, ঘাম যদি ওঁর গায়ে পড়ে মহা অপরাধ হবে। কিছু পরে মহারাজ আমার অবস্থা বুঝেই বললেন, 'তোর কষ্ট হচ্ছে, বড় নরম হাত তোর, ঘেমেও যাচ্ছিস। কাউকে কোনদিন টিপিসনি মনে হয়। তুই যা, আমার সেবকদের একজনকে ডেকে দিয়ে তুই গিয়ে বিশ্রাম কর।' অযাচিতভাবে গুরুসেবার সৌভাগ্য লাভ করেও বঞ্চিত হলাম ভেবে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে বিদায় নিলাম।

রাজা মহারাজের নির্দেশমতো আমি কিছুকাল মঠেই থাকলাম। নিত্যই পূজনীয় মহারাজদের দর্শন, প্রণাম ও সৎসঙ্গলাভের সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য-বোধ করেছি। তাঁদের কত আশীর্বাদ ও আশ্বাসবাণী লাভ করেছি, যা আজও স্মরণ করি সকৃতজ্ঞ অন্তরে। অমৃতের আস্বাদ পেয়ে তাঁরা পূর্ণ! আমাদের কল্যাণের জন্য কতভাবেই না উপদেশ

দিতেন! ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যেন এক দিব্য ভাবরাজ্যে চলে যেতেন। ওঁদের পূতসংস্পর্শে এক অনির্বচনীয় শান্তি অনুভব করতাম

মঠে তখন ঠাকুরঘরে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে গিয়ে সাধুরা ধ্যানজপে বসতেন। দেড়-দুঘণ্টা ধ্যানজপ ক'রে পরে রাজা মহারাজের ঘরে গিয়ে সমবেতভাবে ভজনকীর্তন করতেন, মহারাজ মাঝে মাঝে ধর্মোপদেশও দিতেন। তারপর সবাই পরম তৃপ্তি লাভ করে মঠের কাজকর্মে যোগ দিতেন।

রাজা মহারাজ কয়েকদিন মঠে থেকে আবার বলরাম মন্দিরে চলে গেলেন।

দীক্ষার পরে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছিলেন, 'মা, ঠাকুর, স্বামীজী এবং রাজা মহারাজ—এঁরা সবাই এক, মহাভাগ্যের ফলে রাজা মহারাজের কৃপা তুমি পেলে। নিত্য খুব জপধ্যান প্রার্থনা করবে। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাঁকে ডাকবে…।'

কিছুকাল পরে রাজা মহারাজ উড়িষ্যায় চলে যাওয়ায় তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি দিলেন আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার জন্য। আমাকেও পত্রে জানালেন এ বিষয়ে। ১৯২০ সালের জানুয়ারী, বাংলা ১৩২৬ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, স্বামীজীর শুভ জন্মতিথিতে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করলেন

কিছুদিন মঠবাসের পর মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গিয়ে আবার সেবাকার্যে ব্রতী হলাম। পূজা, পাঠ, সেবা ও ধ্যানজপাদিতে দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটতে লাগলো।

১৯২১-এর জানুয়ারী (বাংলা ১৩২৭) রাজা মহারাজ ৺কাশীধামে এসেছেন জেনে শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবতিথি-উৎসবের পূর্বেই তাঁর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় কনখল থেকে কাশী গিয়ে আমি সেবাশ্রমে উঠি। রাজা মহারাজ তখন কাশী অদ্বৈতাশ্রমে রয়েছেন, পৌঁছেই তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানালাম। তিনি কনখল মিশনের সংবাদ এবং কল্যাণানন্দজী ও নিশ্চয়ানন্দজীর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে গিয়ে পূজ্যপাদ হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ ও অন্যান্য পূজ্যপাদ স্বামীজীদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালাম। দেখলাম বিভিন্ন কেন্দ্রের বহু ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসব্রত নেবার জন্য এসেছেন। পরদিন হঠাৎ কানে এলো মহারাজ নাকি বলেছেন, 'যারা সন্ন্যাস নিতে এসেছে তাদের কাউকেই সন্ন্যাস দেওয়া হবে না।' এজন্য সবাই ব্যথিত ও চিন্তিত। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেল। হঠাৎ আমাকে একাকী পেয়ে পূজনীয় শুদ্ধানন্দ মহারাজ ও জগদানন্দ মহারাজ বললেন, 'তোমার একটা শুভ সংবাদ আছে। মহারাজ তোমাকে সন্ন্যাস দেবেন, তুমি তৈরী হও। যা করতে হবে, না হবে—আমাদের কাছ থেকে সব জেনে নেবে।' আমি তো অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কৃপার কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। কারণ অন্তরে একটু ইচ্ছা পোষণ করলেও সন্ন্যাসের কথা মহারাজকে আমি জানাইনি—নিজেকে অযোগ্য ও অনধিকারী ভেবে। তাই উত্তরে বললাম, 'আপনারা বুঝি আমায় পরীক্ষা করছেন?' ওঁরা হেসে বললেন, 'বেশ, মহারাজের কাছে গেলেই তুমি জানতে পারবে।' পরদিন প্রাতে একাকী রাজা মহারাজকে প্রণাম করতেই বললেন, 'তুই তৈরী হ, ঠাকুরের তিথিপূজার দিনই তোকে সন্ন্যাস দেব। সব জেনে বুঝে নে শুদ্ধানন্দের কাছ থেকে।' আমি তো আনন্দে আত্মহারা হলাম! অযাচিতভাবে তাঁর এই অহৈতুকী কৃপা! পূর্বে জেনেছিলাম দীর্ঘদিন যাতায়াত ক'রে ব্যাকুলভাবে ধরলেই তবে তিনি মন্ত্রদীক্ষা বা সন্ন্যাস দিতেন উপযুক্ত বোধ করলে। সহজে তিনি দীক্ষাদি দিতে রাজী হতেন না। বহু বৎসর চেষ্টা করেও অনেকের ভাগ্যে তাই এ সুযোগ হতো

না। শুনেছি মহারাজ বলতেন, 'মন্ত্র দেবার ও নেবার পূর্বে গুরুশিষ্যের পরস্পরকে পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। মন্ত্র নিয়ে অনেকেই জপধ্যান করে না। এজন্য যাকে তাকে দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়।' যাদের প্রবল বিষয়ানুরাগ রয়েছে দেখতেন, মহারাজ তাদের মন্ত্র না দিয়েই ফিরিয়ে দিতেন—সাধু করা তো দূরের কথা! ইংরাজী ১৯২১-এর মার্চ মাসে, বাংলা ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে রাজা মহারাজ আরও কয়েক-জনের সঙ্গে আমাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করায় পরমানন্দের অধিকারী হলাম! [ক্রমশঃ]

স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কয়েকটি পত্রের সারাংশ

সঙ্কলয়িতা : স্বামী অন্নদানন্দ

[পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কয়েকটি পত্রের সারাংশ স্বামী অন্নদানন্দজী সংকলিত করিয়া রাখেন। মূল পত্রগুলি পাওয়া না গেলেও, সারাংশগুলি প্রামাণিক এবং এইগুলি পাঠ করিলে বহু লোকের উপকার হইবে—এইজন্য সংকলনটি প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক]

(ক) ১৯২৩-২৫ সালে মধুপুর, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, রাজসাহী, শিলং প্রভৃতি স্থানে বায়ু-পরিবর্তনকালে বিভিন্ন স্থান হইতে সারগাছি আশ্রমে লিখিত কিছু পত্রের সারাংশ :

[সারগাছি আশ্রমের কর্মী ব্রহ্মচারী মণিকে লিখিত]

(১)

Calcutta, 16. 8. 1924

সকলের সকল প্রকার কাজ জানিয়া রাখা ভাল।…তোমাদের বিবেচনা ও গুরুলঘুর বিচার-বুদ্ধির বহর দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়াছি। আবার তোমাদের বুদ্ধির তারিফ করিয়া এরূপ লিখিতেছি বটে, কিন্তু ভয় হয় পাছে আকাশপাতাল দুর্ভাবনা তোমরা টানিয়া আন।…তোমাকে কম ভালবাসি! তুমি কি ইহাই ভাবিতেছ? বলিহারি! ধন্য তোমার বুদ্ধি!…

ব্রহ্মচর্যের [ব্রত গ্রহণের] কথা লিখিয়াছ—তাহা এই ভাদ্র মাসে হয় না। যতই অধৈর্য হও—কালাকালের বিচারটা ত করিতে হয়। 'ব্রহ্মচর্যে' দীক্ষিত হইবার ব্যাকুলতা যতই আন্তরিক ও অকপট হইবে, উহা গ্রহণের পবিত্রতা এবং গাম্ভীর্যও ততই বাড়িয়া যাইবে। ভগবানলাভের জন্য অন্তরে খুব ব্যাকুল হও। ব্রহ্মচর্যের মন্ত্রকয়টা আওড়াইলেই ব্রহ্মচারী, এবং সন্ন্যাসের হোমটা করিতে পারিলেই সন্ন্যাসী হয় না। ঠাকুর শীঘ্রই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; ভাবিও না।…

আর একটি কাজের কথা। তোমরা জান যে আমি আশ্রমে সকলকেই অন্ততপক্ষে প্রত্যহ এক ঘণ্টা চরকা চালাইতে লিখিয়াছি। তোমরা আশ্রমে কয়েকটি চরকা অবশ্যই রাখিবে, এবং প্রত্যহ এক ঘণ্টা সকলে মিলিয়া সুতা কাটিবে।…এতদিন পরে গিয়া যদি তোমাদের হাতে চরকা দেখি, ত পরম সন্তোষ লাভ করিব।

(২)

Panchani Lodge, Rajsahi, 20. 9. 1924

যাহা রয় সয় তাহাই করা উচিত। আমার একটি কথা সর্বদা মনে রাখিও—অকপটে ও শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ খুব আনন্দসহকারে যে প্রাণপণ যত্নে করে, সে কেবল নিজেরই কল্যাণ করে না, প্রত্যুত দশের কল্যাণ করিয়া ধন্য হয়। ঐ কর্মের শেষ নাই। একটু করিয়া যে মনে করে, 'খুব করিলাম', সে কিছুই করে না, বরং আরো মরে। আর যে সর্বদা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও ভাবে যে কিছুই করি নাই, সেই কর্মীই সাধ্যবস্তু লাভ করিয়া ধন্য হয় এবং শ্রীশ্রীপ্রভুর কৃপায় অমর হয়।

(৩)

Panchani Lodge, Rajsahi, 25. 9. 1924

তুমি সরল প্রাণে অনলস হইয়া যদি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করিয়া যাও ত তোমাকে কে কি বলিতে পারে? তুমি যাহা করিতেছ, তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, আর কাহারও নয়। ঠাকুরের মনে করিয়া যদি তুমি সকল কাজ কর এবং যদি তোমার উহাতে শৈথিল্য না থাকে ত কেহই তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না।

[সারগাছি আশ্রমের কর্মী ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশে লিখিত]

Islington, Shillong, 5. 11. 1924

সতত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার কৃপায় তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। তাঁহার ভুবনমোহিনী মায়ায় যেন তোমাদিগকে কখনও মুগ্ধ হইতে না হয়। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তি হউক।

[বিভিন্ন স্থান হইতে ১৯২৩-২৫ সালে বিভিন্ন পত্রে আশ্রমকর্মী ব্রহ্মচারী ভবানন্দকে (বাবর শেখ *) লিখিত]

(১)

তোমার ব্যবহারে কাহাকেও দুঃখিত করিও না।…

তুমি খুব সাবধানে থাকবে। সকলকে খুব ভালবাসবে। ভালবাসায় জন্তুজানোয়ারও বশ হয়ে যায়।

তোমরা সর্বদা দেখবে যে, হওয়া-গাছ যেন নষ্ট না হয়, আর যা নেই বা নষ্ট হয়েছে তার জন্য আবার বীজ লাগান হয়।…

* বাবর শেখ শৈশবে নিজাম রাজ্যে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়। দস্যুদল পরে মুর্শিদাবাদে ধৃত হইলে নাবালক বাবরকে পুলিশ সারগাছি অনাথ আশ্রমে পাঠায়।—স্বামী অখণ্ডানন্দ: স্বামী অন্নদানন্দ, পৃঃ ১৬৭

আমি ওখানে থাকতে তোমরা যেমন ছিলে, ঠিক সেইরূপ শান্তভাবে সব দিক ভেবে আশ্রমের সব কাজকর্ম করবে এবং খুব সাবধানে থাকবে।···

তোমরা আমাকে ভুলিলেও আমরা তোমাদের ভুলিতে পারি না।

(২)

তুমি বহু পুরাতন ছেলে। তোমার কাজ এমন হওয়া চাই যাতে সকলেই তোমার সুখ্যাতি করে, এবং তোমার কাছে কিছু কিছু শিখিতে পারে।···

আশ্রমের গরুর যখন দুধ হয়, তখন ওখানে আমি থাকি না কেন জান? 'মনে প্রাণে' আমি চাই যে আশ্রমের সুখের ভাগটা তোমরাই সম্পূর্ণরূপে ভোগ কর। কিন্তু আমি যদি সেখানে থাকি ত আমার মনোবাঞ্ছা ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ওখানে থাকিলেই আমাকে 'ভাগ' বসাইতে হয়। সেইজন্যই ঠাকুর আমাকে তফাতে রাখিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করেন।··· গরুগুলির সেবাযত্নের যেন ত্রুটি না হয়। সর্বদা সকল দিকে লক্ষ্য রাখিবে। গাছগাছালি যেন অযত্নে মরিয়া না যায়। যে তিনটি নূতন ছেলে আসিয়াছে, তোমাদের সকলের ভালবাসায় যদি তাহারা মুগ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমার আর আনন্দের সীমা থাকিবে না।

(৩)

তুমি যথাসাধ্য আশ্রমের কাজকর্ম খুব শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত করিলে আমার আর আনন্দের সীমা থাকে না। তুমি সকলের বড় ও আশ্রমের বহু পুরাতন বালক, সুতরাং তোমার কাছে সকলেই কিছু কিছু শিখিবার আশা করে। আশ্রমের যে কাজটি না করিলে নয়, তাহা যদি তুমি উপযাচক হইয়া কর, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে আর সকলেও তাহা করিতে শিখিবে। দোহাই বাবা, আমি যেন আশ্রমে গিয়া সকলের মুখেই তোমার সুখ্যাতি শুনিতে পাই। এখন যদি তুমি প্রাণপণ যত্নে ঐ আশ্রমের উন্নতির জন্য তোমার সাধ্যমত কাজ করিয়া ঐ আশ্রমেই পড়িয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার যেমন কল্যাণ হইবে, এমন আর কিছুতেই হইবে না। ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও, এবং পরে তোমাকেই আবার ঐ আশ্রমের সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিবে, এমন আর কাহাকেও নয়। কোন কারণেই যেন আশ্রম ছাড়িয়া আর কোথাও যাইও না। অমন আপনার ও জোরের স্থান তোমাদের আর কোথাও নাই।···

বাবা, আশ্রমের উন্নতির জন্য সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে, মন খারাপ করিও না। ঠাকুর একদিন নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সকল প্রকারে সুখী করিবেন।···ছোট ভাইগুলিকে তুমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিবে, এবং যাহাতে তাহাদের কল্যাণ হয় তাহাই করিবে।

(৪)

সত্যি, আশ্রমের সব পুরাতন কথা মনে হলে আমারও প্রাণটা কেমন করে ওঠে, এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ার কথা ভেবে অবাক্ হয়ে থাকতে হয়।···মেলায় (এলাহাবাদে কুম্ভমেলায়) সরস্বতী পূজার আগের দিন বড়ই বিভ্রাট হয়েছিল। ধুনির কাঠের জন্য উদাসী ও বৈরাগী নাগাদের মধ্যে খুব ঝগড়া ও মারামারি হয়, তারপর খুব মার খেয়ে উদাসীরা দশনামী নাগাদের আখড়ায় পালাবার পর বৈরাগী নাগারা দশনামীদের আখড়ায় দিনদুপুরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে দাউদাউ করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় দেড় লাখ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়!!···এইসব

কাণ্ডজ্ঞান-রহিত সাধুদের দেখে আমি একেবারে মর্মাহত হয়েছি ; আমি এখন কেবল এই ভাবছি যে আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমায় কবে উহাদের রাগ, দ্বেষ, গোঁড়ামি দূর হবে !

(৫)

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যেন সে দিনান্তে একবার কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে, তাহলেই ওর উপর তাঁর দয়া হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তার সুমতি হোক ; এবং ঐ আশ্রমেই যেন সে চিরকাল ভাল হয়ে থাকতে পারে ···

এইবার তোমাকে লিখছি যে, তুমি ঐ আশ্রম থেকে আর কোথাও গিয়ে সুখী হতে পারবে না। এই কাশীতে আমি চারমাস থেকে সব দেখছি, যেমনই হোক সারগাছি আশ্রমের মত সুবিধা তোমার আর কোথাও হবে না। তার উপর ঐ সকল আশ্রমে সহজে কাউকে থাকতে দেয় না, এবং আইনকানুনও বড় কড়া। আর একটা কথা, তোমাদের পক্ষে আর কোথাও কর্তা হওয়ার চেয়ে ঐ আশ্রমে কুত্তা হয়ে পড়ে থাকলেও লাভ আছে। ঠিক নিষ্ঠা করে যদি থাকতে পার, ত তোমাদের পরম কল্যাণ হবে।

(৬)

অনেকদিন হইল, তোমাদিগকে না দেখিয়া আমি যে মনে মনে কত কষ্ট পাইতেছি, তাহা আর তোমাদিগকে লিখিয়া কি জানাইব ? এক একদিন তোমাদের সকলকে স্বপ্নে দেখিয়া আমার মন আরও ব্যাকুল হইয়া উঠে।···

তোমরা এখনও আশ্রমে যেরূপ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছ, আশ্রমের বাহিরে কোথাও তোমরা সেরূপ সুখে থাকিতে পারিবে না, ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও। আশ্রমের মত আপনার স্থান তোমাদের আর কোথাও নাই। আশ্রম যেমনই হউক উহা তোমাদের নিজের ঘর।···আমার এই কথাটি যদি মনে রাখো ত আর কখনই আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও পলাইতে ইচ্ছা হইবে না।··· আমাদের পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে পাইয়াছ, এবং এতবার তাঁহাদের অপার মহিমা স্বচক্ষে দেখিতেছ—আবার চাই কি ? যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াও যদি উদ্ধার না হও ত আর কোথায় উদ্ধার হইবে ? শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া রোজ সরল মনে প্রার্থনা করিয়া দেখ দেখি, কি হয় ! ঐ আশ্রমটির উন্নতির জন্য সর্বদা প্রার্থনা করিবে। তিনি শীঘ্রই তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

(৭)

আমার কাছে এতকাল ঐ আশ্রমে থাকিয়াও যখন তুই এখনও লোকের সেবায় যে কি ধর্ম ও আনন্দ হয় তাহা বুঝিতে পারিলি না, তখন আমি আর কি করিব ? ইহা ভাবিয়া যে আমার কিরূপ দুঃখ হয় তাহা আর কাহাকে জানাইব ! আমার গত পত্রে আমি তোকে এত সদুপদেশ দিয়াছি, তাহাতেও তোর একটু হুঁস হয় নাই দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।···আমার কথা শুনিয়া যদি আরও কিছুদিন আশ্রমে ভাল হইয়া থাকিতে পারিস তো যথার্থই তোর খুব ভাল হইবে।

(৮)

আশ্রমে শ্রীশ্রীস্বামীজীর জন্মতিথিপূজা ও উৎসব—আশ্রমের যেরূপ অবস্থা সেইরূপই হইয়াছে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। আশা করি তোমরা সকলে মিলিয়া বেশ ভক্তিপূর্বক শ্রীশ্রীঠাকুর ও

স্বামীজীর পূজা করিয়াছিলে। তোমরা যদি প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে সরল প্রাণে প্রার্থনা করিতে পার ত আমাদের দয়াল ঠাকুর তোমাদের সকল ইচ্ছা একদিন নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। একদিন শুধু হাতে ও এক কাপড়ে ঐ মহুলায় গিয়া আমি কেবল সেই আমাদের পরম দয়াল ঠাকুরকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই এই ১৮।১৯ বৎসরকাল, ঐ দেশের কত লোকের কতই না উপকার হইয়া গেল !

এখন যদি তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের বড় সাধের ঐ আশ্রমটির উন্নতির জন্য একবার তাঁহাকে 'ডাকার মত ডাকিতে পার' ত তিনি তোমাদের সকল সাধ ও সকল আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন। সুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, যখন যেরূপ অবস্থাতেই থাকো না কেন তোমাদিগকে সর্বদাই ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ আশ্রমের মত আপনার স্থান তোমাদের আর কোথাও নাই; এবং ঐ আশ্রমের উন্নতি হইলেই তোমাদেরও উন্নতি হইবে, এবং পরে ঐ আশ্রমে থাকিয়া তোমরা যেরূপ সুখী হইতে পারিবে, সেরূপ আর কোথাও নয়। ইহা ভাবিয়া যদি তোমরা সকল কাজ কর তাহা হইলে শীঘ্রই শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সকল অভাব দূর করিবেন।

(খ) [দিনাজপুরের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডুকে লিখিত]

(১)

সারগাছি আশ্রম, ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭
(21. 11. 1920)

৺ইচ্ছাধীন কার্যে কাহারও হাত নাই। তোমার এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনার একমাত্র এই কথাই আছে।

(২)

সারগাছি আশ্রম, ২০শে ফাল্গুন ১৩৩৫
(4. 3. 1929)

আগামী ২৯শে ফাল্গুন তিথিপূজার দিন মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে না। সেইজন্য আগামী ৪ঠা বৈশাখ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজার দিনই শ্রীমন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও উৎসবের দিন স্থির হইয়াছে। ঐ শুভ-দিনেই শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩০৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় এখানে 'মা অন্নপূর্ণা' রূপে প্রকট হইয়া দেশের অন্নকষ্ট দূর করেন। তাহার পর এই ৩২ বৎসর কত 'দানসত্র' এবং কত শত শত আশ্রমের উদ্ভব হইয়াছে।

(গ) [সারগাছি আশ্রমের ভূতপূর্ব বালক শ্রীমান বিচিত্রকে লিখিত]

(১)

সারগাছি আশ্রম, ১০ পৌষ ১৩৩৮
(25. 12. 1931)

সকাল-সন্ধ্যা কিছুক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিলেই তুমি শান্তি পাইবে। কেঁদে কেঁদে ভক্তি-ভাবে যদি নাম করতে পার, ত কথাই নাই।...মায়ার সংসারে কেউ তোমার না থাকলেও

শ্রীশ্রীঠাকুরের সংসারে ধর্মবাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলই ছিল, এবং যদি মনে কর, ত এখনও সব আছে। তুমি একবার এখানে এসো—আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো।…অপরাধ করিয়া যে তাহা স্বীকার করিয়া দুঃখ করে ও ক্ষমা চায়, তাহার সকল অপরাধ ঠাকুর ক্ষমা করেন।…বাহিরে থাকিয়া আমার প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধাভক্তি এবং আশ্রমের প্রতি যে ভালবাসা হইয়াছে, তাহা অক্ষয় হউক।

(২)

সারগাছি আশ্রম, ২৯শে চৈত্র ১৩৩৮
(12. 4. 1932)

তোমার এক বড় পত্র আমি পেয়েছি, এবং উহা আমি পড়ে সকলকে শুনিয়েছি। সংসার যে কেমন, এবং এই আশ্রমের বাহিরে যে কি সুখ তাহা এখন তুমি বেশ বুঝতে পারছ জেনে আমরা সকলেই খুশী হয়েছি।…তোমার এখনকার মনের ভাব বুঝে আমার মনে হয় তুমি সাধুর সেবায় থেকে সাধু হলেই ভাল হয়।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[ ]

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আমরা একটি সুন্দর জিনিস লক্ষ্য করেছি। সেটি হ'ল এই যে, 'পঞ্চকোষ'-তত্ত্বানুসারে যখন অন্ন থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বিজ্ঞান, এবং পরিশেষে, বিজ্ঞান থেকে আনন্দে উপনীত হওয়া গেল, সেই উচ্চতম স্তরে নিম্নের চারটি স্তরকে অতিক্রম ক'রে (৩।৬), তখন হঠাৎ ঋষি নেমে এলেন সেই নিম্নতম 'অন্নে'রই স্তরে পুনরায় একটি অপূর্ব 'অন্নবন্দনা' দ্বারা ঠিক তার পরের মন্ত্রগুলিতেই—

'অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ ব্রতম্।'
'অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্।'
'অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ ব্রতম্।'
'ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ ব্রতম্। তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ।'
(৩।৭-১০)

'অন্নকে নিন্দা করবে না—তা ব্রত।'
'অন্নকে পরিত্যাগ করবে না—তা ব্রত।'
'অন্নকে বহু করবে—তা ব্রত।'
'বাসের জন্য আগত বা আশ্রয়প্রার্থী কাউকে ফিরিয়ে দেবে না—তা ব্রত। সেজন্য যে কোনো প্রকারেই হোক, বহু অন্ন সংগ্রহ করবে।'

এস্থলে আমাদের আধুনিক যুগের দুটি সর্বজন-বিদিত তত্ত্ব আমরা পাই—যথা, 'Refugee Rehabilitation' এবং 'Grow More Food Campaign' অর্থাৎ বহিরাগতকে আশ্রয় দান, এবং ফসল বাড়াও আন্দোলন।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নয় কি যে, 'আনন্দ-ব্রহ্মে' বহু কষ্টে, বহু সাধনার মাধ্যমে উন্নীত হয়ে অকস্মাৎ তার পরেই একেবারে 'অন্ন' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া?

কিন্তু কেন? উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিরা হঠাৎ কেন এরূপ অর্থহীন অদ্ভূত কথা বলবেন? সেজন্য আনন্দ-ব্রহ্ম থেকে পুনরায় অন্ন-ব্রহ্মে নেমে আসা নিরর্থক নয়। এর থেকে এই মূলীভূত সত্যই ঔপনিষদিক ঋষিরা স্পষ্ট করতে চাইছেন যে, এই পঞ্চকোষতত্ত্বের প্রত্যেক উচ্চতর স্তর প্রত্যেক নিম্নতর স্তরকে অবশ্যই অতিক্রম করছে, কিন্তু কোনোক্রমেই অস্বীকার করছে না। যেমন, একটি সোপান-শ্রেণীর দ্বিতীয় সোপানটি প্রথম সোপানটিকে অতিক্রম করে নিশ্চয়ই, কিন্তু সেজন্য তা অসত্য বা মিথ্যা হয়ে যায় না—তার যা মূল্য, তার যা আবশ্যকতা তা ত থেকেই যায় চিরকাল। একইভাবে—ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মে উপনীত হলেও ব্রহ্মাণ্ড অসত্য বা মিথ্যা হয়ে যায় না; ব্রহ্মাণ্ড থেকে যায় ব্রহ্মেই। সেজন্য ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত সাধকও অন্নকে ত্যাগ করবেন না। এ থেকে ব্রহ্মের আনন্দের স্বরূপের একটি লক্ষণ আমরা পেয়ে গেলাম—সেই আনন্দ একাকী নয়, কিন্তু সমন্বয়মূলক; তাতে অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞানের স্থান রয়েছে এবং এই সব কিছুকেই গ্রহণ ক'রে স্বীয় শক্তিতে সব কিছুকেই মিলিয়ে নিয়ে একটি অভূতপূর্ব রসের সৃষ্টি, সুধার সৃষ্টি, মধুর সৃষ্টি—হয়ত তা-ই হ'ল 'আনন্দ'।

এই সকল মন্ত্র থেকে স্বরূপের আরেকটি লক্ষণও আমরা পাই। সেটি হ'ল এই যে, আনন্দ স্বভাবতঃই সর্বব্যাপী,—কেবল নিজের মধ্যেই তা আবদ্ধ হয়ে থাকে না, কেবল নিজের মধ্যেই নিজেকে কৃপণের মত সঞ্চিত ক'রে রাখে না বঞ্চিত ক'রে অন্য সকলকে। বরং তা নিজের অংশ অপরকে বিলিয়ে দেয়। শুনুন ঋষিদের সেই সানন্দ আশ্বাস—

'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৭)

'তিনিই রস। এই জীব সেই রসকে প্রাপ্ত হয়েই আনন্দ লাভ করেন। যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকত, তাহলে কেই বা জীবন-ধারণ করতেন এবং কেই বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন? ইনিই জীবকে আনন্দদান করেন।'

'এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদে-ষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৩।৩২)

'ইনিই জীবের পরমা গতি। ইনিই জীবের পরমা সম্পদ্। ইনিই জীবের পরম লোক। ইনিই জীবের পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র অন্যান্য জীবগণ ভোগ করে।'

অমৃত-গ্রন্থ উপনিষদ্‌সমূহ থেকে ব্রহ্মের আনন্দের বিষয় যেটুকু আমরা জানতে পারলাম, তা-ও ত হ'ল আমাদের পরম আশা-ভরসার স্থল। কারণ, ব্রহ্মের আনন্দে আমরাও আছি, ব্রহ্মের আনন্দের আমরাও অংশীদার—এই দুটি তত্ত্বও কি কম আশাব্যঞ্জক, কম আনন্দদায়ক, কম কল্যাণকারক?

ব্রহ্মের গুণাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি বিষয় প্রারম্ভেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সেটি হ'ল এই যে, এই সকল গুণের মধ্যে কোনো কোনো বিশেষ গুণকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ ব'লে অভিহিত করা হয়েছে নানাস্থানে নানাভাবে। যেমন, বৈষ্ণব-বেদান্তে স্থলবিশেষে ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ গুণরূপে কীর্তিত হয়েছে তাঁর আনন্দময়ত্ব, রসময়ত্ব, লীলাময়ত্ব, মাধুর্য, সৌন্দর্য, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি (ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯ দেখুন)। কিন্তু এতে স্ববিরোধদোষের কিছু নেই—যেহেতু এই গুণগুলি অনেক স্থলেই প্রায় সমার্থক; এবং অন্যান্য

অনেক স্থলেই ঘনিষ্ঠতম অঙ্গাঙ্গিভাবেই বিজড়িত। যথা, 'আনন্দময়ত্ব' ও 'রসময়ত্বে'র মধ্যে প্রভেদ এইমাত্র যে, 'আনন্দে'র মধ্যে যখন আসে 'আস্বাদন-চমৎকারিত্ব' অর্থাৎ, 'আনন্দ'কে যখন অতি চমৎকারভাবে আস্বাদন করা যায়, তখন তা 'রসে' পরিণত হয়। পুনরায়, বেদান্তদর্শনের একটি মূলীভূত তত্ত্ব 'লীলাবাদ' অনুসারে 'আনন্দে'র বহিঃপ্রকাশ 'লীলা' বা খেলা, এবং এরূপ লীলাচ্ছলেই পরমানন্দরসঘন পরমেশ্বর জীবকে তাঁর লীলাসঙ্গী, এবং জগৎকে তাঁর লীলা ভূমিরূপে সৃষ্টি করেছেন (শ্রাবণ ১৩৮৬, পৃঃ ৩৪০ দেখুন)। পুনরায়, এই সকল অতি সুন্দর গুণের সমাবেশেই তাঁর 'মাধুর্য' ও 'সৌন্দর্য'। এই দিক থেকে এসে পড়ছে অনিবার্যভাবেই তাঁর 'ভক্তবাৎসল্য'-প্রমুখ গুণাবলী, কারণ 'ভক্ত'ই তাঁর 'আনন্দ' ও 'লীলা'র প্রকাশ; এবং সেজন্য, এরূপ ভক্তের জন্য তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি, অহেতুকী করুণা প্রভৃতি অতি স্বাভাবিক। সুতরাং, একই ব্রহ্মের গুণাবলী এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়তম অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ব'লে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে কোনো কোনোটিকে যদি ভক্ত প্রধান ব'লে গ্রহণ করেন ভাবের আবেগে, তাহলে তা নিশ্চয়ই স্ববিরোধদোষের সৃষ্টি করে না কোনোক্রমেই।

যেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে বলদেব ব্রহ্মের সাতটি গুণকে প্রধান ব'লে গ্রহণ করলেও সেগুলি ব্যতীতও অন্যান্য বহুগুণের কথা তিনি যে বলেছেন কেবল তা-ই নয়, কোনো কোনোটিকে কোনো কোনো স্থলে প্রধান ব'লে বর্ণনা করতেও দ্বিধাবোধ করেননি—যেমন, তাঁর 'ভক্তবাৎসল্য' প্রভৃতি (ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৯ দেখুন)। কিন্তু এটিকে স্ববিরোধদোষ ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে।

[ক্রমশঃ]

টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস

ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী

কোন্ বিদেশীয় ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করেছে অথবা প্রেরণারূপে কাজ করেছে—এর উত্তরে নিঃসন্দেহে জেমস্ টডের কথা উল্লেখ করতে হবে। দ্বিতীয় জেমস্ টডের রচিত 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থটির দু'টি খণ্ড আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ছোট-বড়, খ্যাত-অখ্যাত কত লেখককেই যে উদ্বুদ্ধ করেছে গ্রন্থরচনায়, তার পরিচয় পেলে বাস্তবিকই বিস্মিত হ'তে হয়। স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। স্বামীজী বলেছিলেন, 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত।' (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৩২৪)। স্বামীজী ছিলেন মূলতঃ অধ্যাত্ম জগতের অধিবাসী। কিন্তু বাংলা সাহিত্যেরও যে তিনি একজন একনিষ্ঠ অনুরাগী পাঠক ছিলেন, তা তাঁর এই মন্তব্যটি থেকেই বোঝা যায়। আপাতভাবে মনে হতে পারে যে, স্বামীজীর উক্তিটি অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, স্বামীজীর উক্তিটি কত যথার্থ; বহুকাল আগেই তিনি যে-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন, দীর্ঘদিন পরে আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে সেই সিদ্ধান্তের বাস্তবতাই প্রমাণিত হ'ল। বাংলা সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নেই, যা নাকি রাজস্থান প্রভাবিত নয়। বাংলা উপন্যাস, নাটক,

কাব্য, প্রবন্ধ, গল্প—সব ক'টি বিভাগেই 'রাজস্থান' গ্রন্থটির সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিদ্যমান। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাংলা উপন্যাসে 'রাজস্থান' গ্রন্থটি কতখানি প্রেরণারূপে কাজ করেছে, তারই পরিচয় গ্রহণ করব।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই 'রাজস্থান' অবলম্বনে উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। বঙ্কিম তাঁর 'রাজসিংহ' (১৮৭৭) উপন্যাসটির বিষয়বস্তু লাভ করেছিলেন 'রাজস্থান' থেকেই। এ তথ্য তিনিই স্বয়ং 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসেও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঔরঙ্গজেব প্রবর্তিত জিজিয়া করের বিরুদ্ধে রাজসিংহ কর্তৃক পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে টডের অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন। রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে যে-বিরোধের সূত্রপাত ঘটে, টডের রাজস্থানে বর্ণিত সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করেই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের কাহিনীটি পরিকল্পিত। ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মহারাণা রাজসিংহের রাজপুত সৈন্য সংস্থাপনের বিবরণ লেখক টডের বর্ণনানুসরণেই প্রদান করেছেন। ৭ম খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদে লেখক ঔরঙ্গজেবের সৈন্যোদ্যোগের যে-বিবরণ প্রদান করেছেন, তাও টডের বর্ণনানুগত। বঙ্কিম রাজসিংহকে 'Xerxes of Hindusthan' বলে অভিহিত করেছেন। টডও রাজসিংহকে 'Xerxes of Hindusthan' বলে উল্লেখ করেছেন। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক দোবারি, দয়েলবারা এবং নয়ন—এই তিনটি গিরিপথের মধ্যে প্রথমটিতে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং বিখ্যাত উদয়-সাগর নামে সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপনপূর্বক শাহজাদা আকবরকে পঞ্চদশ সহস্র সৈন্যসহ মেবারে প্রেরণের বিবরণও টডের গ্রন্থে বর্তমান। বিক্রম শোলাঙ্কি এবং গোপীনাথ রাঠোর কর্তৃক মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর পরাজিত হওয়ার যে বিবরণ উপন্যাসের ৮ম খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হয়েছে, তার সমর্থনও টডের বর্ণনাতে মেলে। ৮ম খণ্ডের ১৬শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঔরঙ্গজেব ও আজিমের চিতোরে আশ্রয়গ্রহণ, রাজপুত সেনাপতি সুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে খাঁ রহিলার অধীনে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য রেখে ঔরঙ্গজেবের আজমীরে পলায়ন, কুমার ভীমসিংহের মোঘলের অধিকারভুক্ত গুজরাটে প্রবেশ, রাজমন্ত্রী দয়াল সাহ কর্তৃক কাজিদের মস্তকমুণ্ডন এবং কূপমধ্যে কোরাণ নিক্ষেপের বিবরণাদিসমূহ টডের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত।

রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯)। শেষোক্ত উপন্যাসটির উপাদান লেখক সংগ্রহ করেছিলেন টডের রাজস্থান থেকে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক অনুষ্ঠানে রমেশচন্দ্র প্রদত্ত ভাষণ থেকে পূর্বোল্লিখিত উপন্যাসদ্বয় রচনার সূত্র সম্পর্কে জানা যায়। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' যে লেখক বিশেষভাবে টডের রাজস্থান অবলম্বনেই রচনা করেছিলেন, উপন্যাসটির শেষ পরিচ্ছেদে প্রতাপের মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হবার পর লেখক স্বয়ং তা পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধ, রাণাপ্রতাপের কৃচ্ছ্রসাধন, শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, মন্ত্রী ভামসা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থসাহায্যদান—সবই রাজস্থান অবলম্বনে রচিত। এমন কি প্রতাপের বীরত্ব উপলক্ষে আকবরের সভাসদ খান-খানানের রচিত কবিতাটিও লেখক টডের অনুসরণেই রচনা করেছেন। উপন্যাসে বর্ণিত বিকানীর-অধিপতি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক প্রতাপকে প্রেরিত কবিতাগর্ভ পত্রটিও টডের অনুসরণেই রচিত।

প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী

দেবীর তিনটি উপন্যাস 'রাজস্থান'-নির্ভর। এগুলি হ'ল যথাক্রমে 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭) এবং 'বিদ্রোহ' (১৮৯০)। 'দীপনির্বাণে'র মুখ্য ঘটনা হ'ল মহম্মদ ঘোরী ও পৃথ্বীরাজ চৌহানের মধ্যেকার যুদ্ধ। উপন্যাসে বর্ণিত সমরসিংহের পত্তন রাজকন্যার পাণিগ্রহণের বিষয়টির সমর্থন টডের বর্ণনায় মেলে। উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে যে, পত্তন রাজকন্যার গর্ভে জাত কুমারসিংহ নিরুদ্দিষ্ট হবার কারণেই সমরসিংহ চতুর্ভুজা দেবীর কাছে তাঁর মাথার মুকুটটি পরিত্যাগ করেছিলেন। সমরসিংহ আরও শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি অতঃপর আর রাজকীয় বেশভূষায় ভূষিত হবেন না, মাথায় বহন করবেন জটাভার এবং সমরসিংহ এরপর থেকে 'যোগীন্দ্র' নামে পরিচিত হন।—এসবও টডের গ্রন্থ থেকেই সংগৃহীত। কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ জয়চন্দ্রের সঙ্গে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বিরোধের অন্যতম কারণরূপে উপন্যাসে বর্ণিত দিল্লীশ্বর কর্তৃক পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারটি টডও বর্ণনা করেছেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজ যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন, তারও সমর্থন মেলে 'রাজস্থানে'। সমরসিংহের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ করণসিংহ যে চিতোরাধিপতির উত্তরাধিকারী ছিলেন, এ তথ্য লেখিকা 'রাজস্থান' থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। করণসিংহের জননী সম্বন্ধে টড বলেছেন—'his mother, Karmudevi a princess of Putun'—লেখিকা এই কার্মুদেবীকেই উপন্যাসে 'কমলদেবী' বলে উল্লেখ করেছেন। সমরসিংহের বাগ্মিতা, যুদ্ধনৈপুণ্য, বিচক্ষণতা ইত্যাদির উল্লেখ 'রাজস্থানে'ও আছে। এমনকি দিল্লীতে সমরসিংহের উপস্থিতি কতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি করত, তার এবং পৃথ্বীরাজ ও তাঁর সভাসদ্গণ কর্তৃক সমরসিংহের প্রত্যুদ্গমনের বর্ণনাও টডের বর্ণনানুগত। যুদ্ধে কল্যাণসিংহ ও তাঁর পিতা সমরসিংহের মৃত্যুর ঘটনাও টডের অনুসরণেই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দিল্লীর কুলদেবী বলে অভিহিত যে আশাপূর্ণা দেবীর উল্লেখ আছে, তাও টডের অনুসরণেই করা হয়েছে। 'দীপনির্বাণে'র কাহিনী মুখ্যতঃ টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনেই রচিত। আবার টড নিজে যেহেতু পৃথ্বীরাজ-সমরসিংহ-মহম্মদ ঘোরীর কাহিনী বর্ণনায় মুখ্যতঃ চাঁদকবির কাব্যকে অনুসরণ করেছেন, আমাদের লেখিকাও তদ্রূপ বহু উপাদান চাঁদকবির কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

'মিবাররাজ' ষোড়শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত স্বল্পায়তন বিশিষ্ট উপন্যাস। ভীল ও রাজপুতের জাতিগত বিরোধকেই গ্রন্থমধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। যে-ঘটনাকে গ্রন্থে রূপায়িত করা হয়েছে, সেটি ছোট গল্প রচনার পক্ষেই অধিকতর উপযুক্ত। যাইহোক, উপন্যাসে গুহার জন্মবিবরণ ও তাঁর বাল্যকাল বর্ণনায় লেখিকা টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে লেখিকা কমলাবতীকে মৃত পুরোহিতের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু টড তাঁকে পুরোহিতের কন্যারূপে অভিহিত করেছেন। তবে লেখিকা 'কমলাবতী' নামটি ঠিকই রেখেছেন। কিন্তু কমলাবতীর কন্যা সত্যবতী-চরিত্রটি লেখিকার নিজস্ব সংযোজন।

উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে গুহার নামানুসারেই মিবারের রাজগণকে পরবর্তী কালে 'গুহলুট' আখ্যায় ভূষিত হ'তে দেখা গেছে। এই বিষয়ে 'রাজস্থানে' বলা হয়েছে—'Goha's name became the patronymic of his descendants, who were styled, Gohilote, classically Grahilote, in time softened to Gehlote.' ক্রীড়াচ্ছলে ভীল বালকগণ কর্তৃক গোহকে রাজা নির্বাচন এবং ভীলর জ মাণ্ডলিক কর্তৃক তার স্বীকৃতিদানের বিষয়েও 'রাজস্থানে'র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

উপন্যাসে গোহকেই ভীলরাজ মাণ্ডলিকের হত্যা-কারীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। টডও বলেছেন—'The sequel fixes on Goha the stain of ingratitude, for he slew his benefactor.'

স্বর্ণকুমারী দেবীর ষড়্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত 'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসের সূত্র 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত হলেও লেখিকা এই উপন্যাসে এমন এক কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন, 'রাজস্থানে' যে-বিষয়ে নিতান্ত সীমিত পরিসরে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উপন্যাসের গল্পাংশ রচনার জন্যই যে লেখিকা এইরূপ এক বিষয়কে অবলম্বন করেছিলেন, তা স্পষ্টতঃই অনুমিত হয়।

দামোদর মুখোপাধ্যায় মহারাণা প্রতাপসিংহের অলৌকিক জীবন অবলম্বনে রচনা করেন 'প্রতাপ-সিংহ' (১৮৮৪) উপন্যাসটি। উপন্যাসটির ঐতিহাসিক উপাদান লেখক টডের 'রাজস্থান' থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। লেখকের ভাষায়, "'ভারতহিতৈষী মহাত্মা' টড প্রণীত 'রাজস্থান' নামক অপূর্ব গ্রন্থই আমার প্রধান অবলম্বন।" লেখক একদিকে টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, অন্যদিকে তাঁর স্বাধীন কল্পনাশক্তিরও স্বাক্ষর রেখেছেন। কোন কোন স্থলে আবার টডের বর্ণনার ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ লক্ষিত হয়। মহারাণা উদয়সিংহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, তা টডেরই বর্ণনানুগত। চিতোর উদ্ধারকল্পে প্রতাপের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন, সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর প্রত্যাবর্তনকালে মহারাজা মানসিংহের স্বেচ্ছায় প্রতাপের আতিথ্যগ্রহণ এবং মানসিংহের সঙ্গে আহারে অসম্মত হওয়ায় প্রতাপের সঙ্গে তাঁর বিরোধ, হলদিঘাটের যুদ্ধের বিবরণ, যুদ্ধে প্রতাপের অসীম বীরত্ব প্রদর্শন, ঝালাপতি মান্নার আত্মোৎসর্গ, চৈতকের মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ সবই টডের বর্ণনানুসরণেই। বিকানীররাজ পৃথ্বীরাজ কর্তৃক কবিতায় রচিত পত্রে ভগ্নমনোরথ প্রতাপকে উৎসাহদান, সম্রাট আকবরের পৃথ্বীরাজপত্নীর রূপে আকৃষ্ট হওয়া এবং তাঁর সঙ্গে অবৈধ মিলনে লিপ্ত হবার চক্রান্ত, কিন্তু পৃথ্বীরাজপত্নীর নির্ভীকতায় সেই চক্রান্তের ব্যর্থতা—সবই 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত।

গার্হস্থ্য ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে খ্যাত হারাণচন্দ্র রক্ষিতও 'রাজস্থানের বিষয় অবলম্বনে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত উপন্যাসটি হল 'মন্ত্রের সাধন' (১৩০৫)। গ্রন্থটির রচনার উৎস বিষয়ে লেখকের স্বীকারোক্তি, 'মনস্বী টডের রাজস্থান আমার প্রধান অবলম্বন।' উপন্যাসটির নামপত্রে লেখক টডের গ্রন্থ থেকে প্রতাপ সম্পর্কিত বহুল পরিচিত উদ্ধৃতিটি মুদ্রিত করেছেন :

'There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pratap, some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon.' উপন্যাসটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের নাম ব্রতগ্রহণ, দ্বিতীয় খণ্ডের নাম ব্রতপালন এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম ব্রত-উদ্যাপন বা অবসান। ব্রতগ্রহণ খণ্ডে লেখক চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত প্রতাপের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনের বিবরণ যা দিয়েছেন, তা সবই টডের বর্ণনানুগ। ঝালাপতি মান্নার আত্মোৎসর্গ, প্রভুভক্ত চৈতকের দ্বারা প্রতাপের জীবনরক্ষা, অনুসরণকারী দু'জন মোঘল সৈন্যের হাত থেকে শক্তসিংহের প্রতাপকে রক্ষা—সবই টডের অনুসরণেই উপস্থাপিত। 'ব্রতপালনে'র ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত পরাজিত প্রতাপের মর্মন্তুদ বিবরণ, সপ্তদশ পরিচ্ছেদে তৃণবীজে প্রস্তুত রুটি বনবিড়াল কর্তৃক অপহৃত হলে প্রতাপের বালিকা কন্যার মর্মভেদ-

ক্রন্দন এবং এই ঘটনায় প্রতাপের গভীরভাবে অভিভূত হওয়া, দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে প্রতাপের সিন্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে প্রতাপকে রাজমন্ত্রী ভামসার অর্থদান—সবই যে রাজস্থান গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী তা লক্ষ্য করা যায়। এমন কি নবম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট সম্রাট আকবরের চারিত্রিক দুর্বলতার যে-চিত্র প্রকাশিত, তাও 'রাজস্থানের'ই অনুসরণে কৃত।

এছাড়াও রোহিণীকুমার সেনগুপ্তের 'চণ্ড বিক্রম' (১২৯৩), দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'হামির' (১৯১৫), বরদাকান্ত মজুমদারের 'কর্মদেবী' (১৯২০) মনোমোহন রায়ের 'সতীর মূল্য' (১৩২৯), সীতানাথ চক্রবর্তীর 'সরোজসুন্দরী' শীর্ষক উপন্যাসগুলিও টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত বিষয় অবলম্বনেই রচিত।

জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

ডক্টর নিমাইসাধন বসু

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

শ্বেতাঙ্গদের মুখপত্র 'পায়োনীয়র' (Pioneer), 'ইংলিশম্যান' (Englishman) প্রভৃতি কাগজের ইলবার্টবিরোধী মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (Indian Mirror) অভিযোগ করে (১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩) যে শ্বেতাঙ্গরা তাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। এরা এদেশ থেকে যা কিছু পেয়েছে নিয়ে চলে গেছে। এখানকার মানুষের কল্যাণের জন্য কিছুই ফেলে রেখে যায়নি। ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Criminal Procedure Code-এর তেমন তীব্র বিরোধিতা ভারতীয়রা করেনি, কেননা তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ভবিষ্যতে করা হবে। এখন আশা করা যায় যে সরকার তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে বিচারব্যবস্থায় জাতিবৈষম্যের অবসান ঘটাবে। ঐ দিনেরই 'বেংগলী' (Bengalee) সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে যে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও সকল শ্রেণীর নাগরিকের সম-অধিকার ইংরাজ আইন ও বিচারব্যবস্থার এক মৌল স্বীকৃত নীতি। কিন্তু যে ফৌজদারী আইন ও বিচারব্যবস্থা বর্তমানে এদেশে বলবৎ রয়েছে তা ঐ নীতি-বিরোধী। সেই বিচারে ইলবার্ট বিলে প্রস্তাবিত সংস্কার সামান্য হলেও প্রশংসনীয়। ভারত সরকারের কাছে আবেদন যে শ্বেতাঙ্গদের উগ্র জাতি-প্রাধান্য ও জাতি-বিদ্বেষী মনোভাব এবং অন্যায় জিদের কাছে নতিস্বীকার যেন না করা হয়। যেটুকু পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়েছে তার জন্য ভারতীয়রা কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশের সমস্ত আইন থেকে বিদেশী শাসনের শেষ চিহ্নটুকু মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হতে পারব না।

ইতিমধ্যে কলকাতার বিত্তবান ও প্রভাবশালী শ্বেতাঙ্গরা ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী Calcutta Chamber of Commerce-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় প্রস্তাবিত বিলের নিন্দা এবং পূর্ণ-উদ্যমে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বোম্বাই এবং মাদ্রাজের বণিক সভাগুলিকে এই আন্দোলনের সামিল হবার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। শ্বেতাঙ্গদের বিক্ষোভ, উত্তেজনা এবং ভারতত্যাগ করার হুমকি দেশীয় সংবাদপত্র-পত্রিকায় শ্লেষ ও বিদ্রূপ উদ্রেক করে। বোম্বাই-এর 'দেশীমিত্র' কাগজে প্রকাশিত

বিদ্রূপাত্মক বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা হয় যে 'যেহেতু ভাইসরয় দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহেবদের বিচার করার অধিকার দান করেছেন সেইহেতু লণ্ডনের 'টাইম্‌স' (London Times) কাগজে সমস্ত শ্বেতাঙ্গদের ভারত ছেড়ে চলে যাবার আহ্বান জানান হয়েছে। হায় ভগবান! সব সাহেব, যাদের এত সাধ্যসাধনার পর এবং যারা এত কষ্ট-স্বীকার করে এ-দেশে এসেছে, তারা সবাই যদি এদেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে সমস্ত হাইকোর্টের বিচারপতির পদ, জেলা জজের পদ, কলেক্টরের পদ পূর্ণ হবে কি করে? সুতরাং এতদ্‌দ্বারা এই সব শূন্যপদপূরণপ্রার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা যেন অবিলম্বে তাদের আবেদনপত্র খানা-নর্দমাতে নিক্ষেপ করে।' রোস্ত গফ্‌তর মন্তব্য করে যে একটি প্রচলিত গল্প আছে যে ইংরাজরা ভারতবর্ষে আসবার সময় সুয়েজের কাছে তাদের সমস্ত সদ্‌গুণ ত্যাগ করে আসে। বর্তমানে শ্বেতাঙ্গদের আচরণ ঐ গল্পের সত্যতা প্রমাণ করছে।

লণ্ডনের খ্যাতনামা প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদ-পত্র 'টাইমস্‌' ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। আন্দোলনের সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য প্রায় নিয়মিত এই কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী 'টাইম্‌স' কাগজে কলকাতার ইলবার্টবিলবিরোধী সভার (২১ ফেব্রুয়ারী) বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সংবাদদাতা মন্তব্য করে যে এত প্রবল বিরোধিতার ফলে সরকার আর অগ্রসর হতে সাহস করবে বলে মনে হয় না। বোম্বাই এবং অন্যান্য অঞ্চলে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয়রা যে সব জনসভার আয়োজন করেছিল, তার সমালোচনা প্রসঙ্গে সংবাদদাতা মন্তব্য করে যে সবচেয়ে আশঙ্কার কারণ হল যে ভারতীয় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। ভাইসরয় রিপন যে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের দানব সৃষ্টি করেছেন, তার দাবী মেটান সম্ভব হবে না। পৃথক্‌ সম্পাদকীয়তে রিপনের 'দুর্ভাগ্যজনক' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, তার উল্লেখ করে বলা হয় যে শুধুমাত্র সিভিলিয়ানদের দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গদের মতামতকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া বিজ্ঞ রাজনীতির পরিচায়ক হবে। পরিশেষে মন্তব্য করা হয় যে যদি ভারতবর্ষে ঐ 'কৃত্রিম সমতা' আমরা নেহাতই প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল ঐ দেশ ছেড়ে চলে আসা। ইংরাজ শাসন, আইন এবং সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে রেখেছে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার টাউন হলে শ্বেতাঙ্গদের উদ্যোগে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বহু শ্বেতাঙ্গ সিভিল সার্ভেণ্ট, সামরিক অফিসার এবং সরকারী কর্মচারীও যোগদান করেন। সভার অন্যতম প্রধান বক্তা কেসউইক বলেন যে এটা কল্পনা করা যায় না যে ভারতীয় বিচারপতিরা মাত্র তিন-চার বছর ইংলণ্ডে থেকে এমন ইউরোপীয় শিক্ষা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে যে তারা ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা বিচার করবে। ইথিওপিয়ার অধিবাসী তার গায়ের রঙ বা চিতাবাঘ কি তার গায়ের দাগ কখনও পালটাতে পারে? তিনি সভায় গৃহীত হবার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ঐ প্রস্তাবে ইলবার্ট বিলের তীব্র নিন্দা করে বলা হয় যে এর দ্বারা একমাত্র শ্বেতাঙ্গদের অত্যন্ত মূল্যবান প্রাচীন অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। এই আইনের ফলে মফঃস্বলে বস-বাসকারী শ্বেতাঙ্গদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং তার ফলে ভারতে বৃটিশ মূলধন

বিনিয়োগ হ্রাস পাবে। প্রস্তাবিত বিলের ফলে জাতিবিদ্বেষের অগ্নি এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে যা ১৮৫৭'র পর আর পরিলক্ষিত হয়নি। প্রস্তাবিত আইন একমাত্র বাঙালীদের ছাড়া সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের খুশি করবে না। সরকার এই বাঙালীদের শিক্ষাদান করেছে এবং এখন ঐ শিক্ষিত বাঙালীরাই সরকারকে বিদ্রূপ ও সমালোচনা করছে। কেসউইক বলেন যে আনন্দের কথা হল সমস্ত ইংরাজী পত্র-পত্রিকা শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন করছে, একমাত্র ব্যতিক্রম হল 'স্টেটসম্যান'।

সভার আর এক প্রধান বক্তা ছিলেন খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ব্র্যানসন (Branson)। তিনি বলেন 'আত্মসম্মান সব মানুষেরই অত্যন্ত প্রিয় বস্তু, কিন্তু এমন কোনও অন্ধ-ব্যক্তি আছেন কি যিনি মনে করেন আত্মসম্মানের মূল্য একজন ভারতীয়ের কাছে যা একজন ইংরাজের কাছেও তাই? এক স্বাধীন জাতি স্বাধীনতা কতখানি ভালবাসে, তার পরিমাপ কি বিজিতের গ্লানিপূর্ণ আর এক জাতি করতে পারে? বিজয়ীর ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ জাতির লোকের পক্ষেই তার পরিমাপ করা সম্ভব। কয়েকজন হট্ট-গোলকারী বাঙালীবাবুর সন্তুষ্টির জন্য শ্বেতাঙ্গদের অধিকার কেড়ে নিয়ে ভারতীয় বিচারপতিদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কোনও যুক্তি নেই।' তুমুল করতালি ও অভিনন্দনের মধ্যে ব্র্যানসন বলেন 'সত্যই বিচিত্র যে মূর্খ গর্দভ সিংহকে পদাঘাতে উদ্যত হয়েছে।' তিনি নাটকীয়ভাবে শ্বেতাঙ্গ শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন 'আপনারা দেখান যে সিংহ মৃত নয়, সিংহ নিদ্রিতমাত্র। ঈশ্বরের দোহাই, সেই সিংহের জাগরণ গর্দভের মনে ত্রাসের সঞ্চার করুক।' ব্র্যানসন বাঙালীদের ও বি. এল. গুপ্তকে তীব্র আক্রমণ করেন। তাঁর ভাষণকে শ্রোতারা মুহুর্মুহুঃ করতালি ও চিৎকার করে সমর্থন জানায়। পিট কেনেডি (Pitt Kennedy) মন্তব্য করেন যে শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার এইটুকু লুপ্ত করে বাঙালী সম্পাদকরা সন্তুষ্ট থাকবে না। এতেই তাদের ইউরোপীয়দের অবমাননার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হবে না। ভূমি-আইন পাস করে যেমন পারনেল প্রমুখ আইরিস নেতাদের সন্তুষ্ট করা যায়নি, তেমনি ইলবার্ট বিল পাস করে বাঙালীদের সন্তুষ্ট করা যাবে না। এই সভায় গৃহীত অন্য দুটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে প্রতি-বাদপত্র, স্মারকলিপি প্রভৃতি প্রেরণের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। জার্মান কনসাল ব্লিক (Bleeck) প্রস্তাবগুলির প্রতি তাঁর সমর্থন জানান।

শ্বেতাঙ্গদের ইলবার্টবিলবিরোধী টাউন হল সভা, বিশেষ করে, ব্র্যানসনের বক্তৃতা সারা ভারতবর্ষে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। 'ইংলিশ-ম্যান' কাগজে প্রকাশিত (১ মার্চ) এক পত্রে জন ক্রফ্‌ট নামে এক শ্বেতাঙ্গ লেখেন যে যদিও তিনি নিজে ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক, তবুও তিনি উক্ত সভায় ব্র্যানসন ও অন্যান্য বক্তারা যে ভাষা ব্যবহার ও কটূক্তি করেছেন, তার তীব্র নিন্দা না করে পারছেন না। পরের দিন (২ মার্চ) ব্র্যানসন তাঁর প্রত্যুত্তরে দুঃখপ্রকাশ করে লেখেন যে তিনি উত্তেজনার আতিশয্যে সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন, কেননা ঐরকম উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে তিনি বক্তৃতা দিতে একেবারেই অভ্যস্ত নন। কিন্তু সংবাদপত্রে দুঃখ প্রকাশ করলেও অপমানিত রাজনৈতিক-চেতনাসম্পন্ন বাঙালীরা ব্র্যানসনকে ক্ষমা করেননি। 'বেংগলী' কাগজ (৩ মার্চ) স্মরণ করিয়ে দেয় যে মাত্র কিছু-কাল পূর্বে একজন সহিসকে প্রহার করার জন্য জনৈক ভারতীয় বিচারপতি কেসউইককে ২০৲ জরিমানা করেছিলেন। 'বেংগলী' পরামর্শ দেয় যে এদেশীয় অ্যাটর্নি ও উকিলদের উচিত ব্র্যানসনকে বয়কট করা। শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলনকে অদ্ভুত

ও বিচিত্র এক ঘটনা বলে অভিহিত করে মন্তব্য করা হয় যে এই আন্দোলন এক দিক দিয়ে বিচার করলে আনন্দের কথা। এই আন্দোলন ভারত সরকারের নীতি এবং মহারানীর ঘোষণার আন্তরিকতা যাচাই করতে সাহায্য করবে। অতঃপর জানা যাবে ভারতবর্ষে আইন প্রণয়নের জন্য কার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। ইংলণ্ডের মহারানী এবং এদেশীয় শাসকদের, না কলকাতা এবং বোম্বাই-এর শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের।

কয়েকদিন পরেই হাইকোর্টের দেশীয় এ্যাটর্নিরা সিদ্ধান্ত করেন যে তাঁরা ব্র্যানসনের সঙ্গে পেশাগত বা অন্য কোনও প্রকার সম্পর্ক রাখবেন না (১০ মার্চ)। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (৫ মার্চ) ব্র্যানসনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে ষোল বছর পূর্বে তাঁকে খাঁটি ইংরাজ নয় এই অভিযোগে বেংগল ক্লাবে অপমানিত করার উদ্যোগ করা হয়েছিল। এর কারণ ছিল কলকাতার স্মল্ কজেস্ কোর্ট-এর অন্যতম বিচারপতিরূপে তিনি তাঁর রায়ে শ্বেতাঙ্গদের চরিত্রের কয়েকটি দোষের সমালোচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর মনে রাখা উচিত যে ভারতীয়দের পক্ষে ওকালতি করেই তিনি বিপুল অর্থ অর্জন করেছেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' এদেশীয় ভোকিল, মোখতার এবং এ্যাটর্নিরা ব্র্যানসনকে বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাকে অভিনন্দন জানায় এবং মন্তব্য করে যে এই রকম মতৈক্য ও সমবেত প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও আশাব্যঞ্জক (৬ মার্চ)। কয়েকদিন পরে আর একটি সম্পাদকীয়তে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' ভারতীয়দের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির পরিবর্তে এক ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত হতে আহ্বান জানায় (১০ মার্চ)।

ব্র্যানসনকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট এত সফল হয়েছিল যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ (Richard Girth) ভারতীয় এ্যাটর্নিদের বয়কটের সিদ্ধান্ত যাতে প্রত্যাহৃত হয় তার জন্য তাঁর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার সমালোচনা করে 'বেংগলী' মন্তব্য করে (৭ এপ্রিল) যে এতে কোনও ফল হবে না। যত ওপর মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হোক না কেন ব্যবহারজীবীরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন। সাপ্তাহিক 'নব বিভাকর' পত্রিকায় রিচার্ড গার্থের প্রচেষ্টার নিন্দা করে মন্তব্য করা হয় যে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করার অনুপযুক্ত (১৬ এপ্রিল)। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেষ পর্যন্ত ব্র্যানসনকে হতাশমনে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

কলকাতার টাউন হলের সভায় শ্বেতাঙ্গদের ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার বাংলার বাইরের পত্র-পত্রিকাতেও নিন্দিত হয়েছিল। 'বম্বে গেজেট' একজন স্থানীয় কবির একটি শ্লেষাত্মক কবিতা প্রকাশ করে (১৬ মার্চ)। 'The Miller and His Men' নামক কবিতাটির শেষ ছত্রে লেখা হয়:

'And lastly, so seldom
　　offenders are we,
That to try us no trouble
　　at all can be,
So we clearly must make
　　all possible fuss,
Since the change was not
　　required by us.
Nor did Government
　　our opinion take—
'Tis as bad as though
　　a change they should make.
Such injustice is almost
　　beyond belief
In the laws against theft
　　without asking the thief.'

ইংলণ্ডে ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Criminal Procedure Code-এর স্রষ্টা জে. এফ. স্টীফেন্স। 'লণ্ডন টাইম্‌সে' প্রকাশিত এক পত্রে (১ মার্চ) তিনি লেখেন যে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। 'ভারতীয় এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে আইনের দৃষ্টিতে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয়'—এই ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক নীতি প্রতিষ্ঠা করাই হল ঐ আইনের উদ্দেশ্য। তিনি মন্তব্য করেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তির অপসারণ করা উচিত নয়। ভারতে বৃটিশ শাসন মূলত স্বৈরাচারী। বিজিতের সম্মতি নয়, বাহুবলের ওপরই এই শাসন নির্ভরশীল। স্পষ্ট, সোজাসুজি এবং আপোষহীন জাতি-প্রাধান্যের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিজিতদের ওপর শাসন অটুট রাখা কোনমতেই সম্ভব নয়। 'টাইম্‌স'-এর সম্পাদকীয়তে (৫ মার্চ) স্টীফেন্সের বক্তব্যকে সমর্থন জানান হয়। টাউন হল সভার ভাষণগুলির যুক্তির পুনরুল্লেখ করে মন্তব্য করা হয় যে, বেশীর ভাগ ভারতীয়রাই প্রস্তাবিত পরিবর্তন চায় না। দেশীয় পত্র-পত্রিকা ও দু'-একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ করছে এবং তাদের সন্তুষ্টির জন্যই আইনটি প্রস্তাব করা হয়েছে। স্টীফেন্সের অভিমতের কঠোর সমালোচনা করে 'বেংগলী' মন্তব্য করে (৩১ মার্চ) যে ঐ রকম বক্তব্য সম্রাট নীরোর যুগের কোন রোমানের উপযুক্ত হতে পারত যদিও ট্যাসিটাস্ পর্যন্ত ঐরকম মনোভাব প্রকাশে লজ্জা পেতেন!

ইলবার্টবিল-আন্দোলন রাজনৈতিক-চেতনা-সম্পন্ন সর্বশ্রেণীর ভারতীয় এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে ঐক্যস্থাপনে সহায়তা করেছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হবার পর থেকেই এই নতুন সংস্থাটির সঙ্গে বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক ভাল ছিল না এবং ক্রমশঃই উভয় সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ ও পার্থক্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া ভারতীয় রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদ তখনও পর্যন্ত তেমন প্রবলভাবে দেখা না দিলেও সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন সক্রিয়ভাবে যোগদান করেনি। কিন্তু ইলবার্ট বিল এই পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। কিছুকাল পূর্বে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও প্রভাবশালী কাগজ 'সোমপ্রকাশ' (১১ ফাল্গুন, ১২৮৭) এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে 'দেশীয় সভাসকলের নির্জীব ভাব' সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করে যে গত দু'বছর চারিদিকে জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহ এবং আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার অস্তিত্ব বজায় থাকলেও জনসাধারণ এর প্রতি আর তেমন আকৃষ্ট নয়। রাজনৈতিক সংস্থাগুলি প্রায় অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে। অথচ ভারতীয়দের দুঃখকষ্ট নিবারণের কোন ব্যবস্থাই হয়নি। ইলবার্টবিল-আন্দোলন ভারতীয়দের এই নির্জীবতা ও নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে দূর করেছিল।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, মহামেডান লিটারারি সোসাইটি, ন্যাশানাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, ইস্টবেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা হাইকোর্টের ভোকিলস্ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক যুগ্ম স্মারকলিপি ভাইসরয় রিপন ও তাঁর পরিষদে প্রেরণ করা হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল স্মারকলিপিটি ৮ই মার্চ ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিবের হাতে অর্পণ করেন। স্মারকলিপিতে জাতি, বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আইন প্রস্তাব করা হয়েছে তার জন্য রিপনকে ধন্যবাদ জানান হয়।

ভারতীয়রা প্রস্তাবিত আইনটি সম্বন্ধে আগ্রহী নয় এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে স্বাক্ষরকারীরা ঘোষণা করেন। তাঁরা প্রথমে ঐ ধরনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে একটি সভা আহ্বানের কথা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু পরে ঐ ধরনের প্রতিবাদ জানানর ফলে উত্তেজনা এবং জাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পেতে পারে এই চিন্তা করে তাঁরা সভা আহ্বানে নিবৃত্ত হয়ে ভারতীয়দের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য এই স্মারকলিপি পেশ করছেন। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করেন এবং শ্বেতাঙ্গদের মনে আঘাত দিতে ও সম্পর্ক তিক্ত করতে অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে আবেদন জানান হয় যে ভারত সরকার যেন কোন বিক্ষোভ, বিদ্রূপ, ভীতিপ্রদর্শন বা ভ্রান্ত ধারণার ফলে প্রস্তাবিত ন্যায্য কল্যাণকর আইনটি কার্যকরী করতে পরাঙ্মুখ না হন।

উপরোক্ত স্মারকলিপিটি 'ইংলিশম্যান্' ছাপতে অসম্মত হয়। অসম্মতির কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে যদিও স্মারকলিপির ভাষা প্রশংসনীয়ভাবে সংযত তবু যেহেতু বিতর্কিত বিষয়টি সম্বন্ধে ভারতীয়দের কোন মন্তব্য করার অধিকার নেই সেই কারণে স্মারকলিপিটি আমরা ছাপতে সম্মত নই। আইনটি পাস হলে ভারতীয়দের কি লাভ হবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু তাদের কি ক্ষতি হবে তা আমরা জানি এবং আমরা আশা করি ভারতীয়রা চারিদিকে তাকিয়ে দেখে চিন্তা করবে এই সব করার কোন সার্থকতা আছে কিনা।

শ্বেতাঙ্গদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকার শ্লেষ ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংস্থার পক্ষ থেকে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং আবেদন-পত্র, স্মারকলিপি ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। উড়িষ্যা পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন উপরোক্ত যুগ্ম স্মারকলিপির বক্তব্য সমর্থন করে একটি আবেদন-পত্র প্রেরণ করে (১৯ মার্চ), অনুরূপ বর্ধমান অ্যাসোসিয়েশন, পাবনা জেলার তরাস সাধারণ হিতসাধিনী সভা, উড়িষ্যা অ্যাসোসিয়েশন্, হাওড়া পিপল্‌স্ অ্যাসো-সিয়েশন, শ্রীপুর নীতিসভা, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কালনা শাখা প্রভৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়। বাংলার বাইরে উড়িষ্যা ছাড়া সুদূর কালকা, সাতারা, এলাহাবাদ, আজমীর, পুণা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

বোম্বাই শহরে ২৮শে এপ্রিল ইলবার্ট বিলের সমর্থনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আহ্বায়কদের মধ্যে ছিলেন জামসেদজী জিজিভয়, বদরুদ্দীন তায়েবজী, কারসেতজী নসরওয়াঞ্জি কামা, ফিরোজশা মেহ্‌তা, কে. টি. তেলাং, জামসেদজী টাটা, এস. ডি. ভাণ্ডারকর ও দাদাভাই নাওরোজী। সভায় তিলধারণের স্থান ছিল না। আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুণা, সোলাপুর, সুরাট, ভীরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসে-ছিলেন। বোম্বাই-এর আঞ্জমান-ই-ইসলাম-এর প্রতিনিধিদলও সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র তিন চার জন শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। বোম্বাই-এর শেরিফ রঘুনাথ ঘোটে তাঁর ভাষণে ভারতীয়দের ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে নীরব ও উদাসীন থাকা সম্বন্ধে সতর্ক করে বলেন যে এর ফলে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে। সরকারের হাত শক্ত করার জন্য ভারতীয়দের সক্রিয় হতে হবে। বদরুদ্দীন তায়েবজী বলেন যে তিনি ইতিপূর্বে এতবড় এবং এত প্রতিনিধিমূলক সভা আর দেখেননি। তিনি সকলের কাছে সংযম ও সহিষ্ণুতার জন্য আবেদন জানান। নাখোদা মহম্মদ আলি রোগে

তাঁর জোরাল ভাষণে বলেন যে এই সভা না হলে ইলবার্ট বিলের বিরোধীরা বলে বেড়াত যে শুধুমাত্র বাঙালীবাবুরাই বিলের সমর্থনে আন্দোলনে মেতেছে। বি. এল. গুপ্ত একজন বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিষয়টি একটি স্থানীয় ব্যাপার মাত্র। কিন্তু বিলের বিরোধীদের মনে রাখা দরকার যে, যে সমস্যা বাঙালীদের সমস্যা সেটি সমস্ত ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত। রোগের ভাষণে শ্রোতারা তুমুল হর্ষধ্বনি করে সমর্থন জানায়। অনুরূপ এক ভাষণে কে. টি. তেলাং বলেন যে শ্বেতাঙ্গদের পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হচ্ছে যে বাঙালীরা বৃটিশজাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারেন এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।

বোম্বাই-এর জনসাধারণের পক্ষ থেকে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়। স্মারকলিপিতে বলা হয় যে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত বিলটিই বর্তমান উত্তেজনা ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করেনি, এর মূলে রয়েছে বর্তমান সরকারের সামগ্রিক নীতির প্রতি শত্রুতার মনোভাব। ভারতীয়রা নয়, শ্বেতাঙ্গরাই বর্ণ-বিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয়রা বিলটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ এই ধারণা বা বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয়রা গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিলটির ভাগ্য লক্ষ্য করছে। তার কারণ বিলটির অন্তর্নিহিত মূল নীতি তাদের স্বার্থ এবং কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যোগ্যতা, সাফল্য, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের শাসন-কার্যে অবদান যাই থাকুক না কেন ভারতীয়দের নিকৃষ্ট জাতির মানুষ বলে গণ্য করা হবে কিনা এই হল মৌলিক প্রশ্ন। নিকৃষ্টতার অজুহাতে চিরকালই কি তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে? আরও বৃহত্তর প্রশ্ন হল ভারতবর্ষ কি মহারানীর ঘোষিত নীতি এবং আদর্শের দ্বারা শাসিত হবে—না ইলবার্টবিরোধীদের দ্বারা শাসিত হবে?

পুণা সার্বজনিক সভার উদ্যোগেও ইলবার্ট বিলের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল (২৩ জুন, ১৮৮৩)। সভাপতিত্ব করেছিলেন কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নলকর। সভায় গৃহীত একটি স্মারকলিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। লাহোরের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পাঞ্জাব সরকারের কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে ইলবার্ট বিলের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বর্তমানে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধিতার কাছে যদি নতিস্বীকার করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে এই প্রস্তাব পুনরায় করা হলে আরও বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। অমৃতসরের আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। লাহোরের শ্রীগোবিন্দ সিং সভা শিখদের পক্ষ থেকে ইলবার্ট বিল সমর্থন করে; কেননা এই বিল জাতিবৈষম্যের আবরণ অপসারণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। কসুরের আঞ্জুমান-ই-মুফিদ-ই-আম ইলবার্ট বিল সমর্থন করে এই অভিমত ব্যক্ত করে যে শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার ও আচরণ থেকে ভারতীয়রা শিক্ষালাভ করবে এবং ঐ শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি কি হতে পারে তাও অনুমান করা দুরূহ নয়।

[ক্রমশঃ]

বন্দনাষ্টকম্

রামনারায়ণভট্টাচার্যতর্কতীর্থেন বিরচিতম্

পশ্যন্ বিশ্বং স্বমায়াবিরচিতমভিতো ধর্মগ্লানৌ নিমগ্নং
তত্ত্রাণার্থং স্বতন্ত্রঃ পরমকরুণয়া বঙ্গভূমৌ পুনঃ সঃ।
জ্ঞানানন্দাতিশুদ্ধাং তনুমিহ রুচিরাং যো দধানোঽবতীর্ণঃ
সেবে শ্রীরামকৃষ্ণং পরিকরকলিতং সারদারাধ্যমানম্॥১

আরূঢ়ং ভগবৎকথোৎসবসুধাস্বাদাৎ সমাধৌ মুহুঃ
পাদদ্বন্দ্বমহোৎপলস্থিতকরং চেলাঞ্চলালঙ্কৃতম্।
প্রায়ো মুদ্রিতদীর্ঘলোচনযুগং ত্যক্তার্থসর্বগ্রহং
ধ্যানস্থং স্মিতসুন্দরং নিরুপমং শ্রীরামকৃষ্ণং ভজে॥২

রামকৃষ্ণং শ্রিয়া বন্দে পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽপি যোঽবতীর্ণো যুগে যুগে॥৩

মাতরং সারদাং বন্দে রামকৃষ্ণস্বরূপিণীম্।
মহাশক্তিং মহাভাবাং মহাযোগসমন্বিতাম্॥৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভুম্।
গদাধরপ্রাণনাথমদ্বৈতানন্দবিগ্রহম্॥৫

দিগম্বরং ঘনশ্যামং ভগ্নজানুকরস্থিতম্।
লড্ডুকযাচকং বন্দে ব্রহ্মগোপালমদ্বয়ম্॥৬

কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয়াং কৃষ্ণহ্লাদিনীং প্রেমরূপিণীম্।
বৃন্দাবনেশ্বরীং রাধাং নমামি কৃষ্ণভাবনাম্॥৭

কৃষ্ণ ত্বামভিবন্দে শ্রীকিশোরং[১] প্রাণবল্লভম্।
শ্রীরাধালিঙ্গিতং দেবমন্তর্যামিণমীশ্বরম্॥৮

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং রামকৃষ্ণায় ধীমহি, গৌরাঙ্গায় কিশোরায়
গোপালায় নমো নমঃ।

---

১ গৃহদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নাম 'কৃষ্ণকিশোর'।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

তৃতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে বাস করছেন। উপরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসে আছেন। মহিমাচরণ চক্রবর্তী নিকটেই থাকেন। মহিমাচরণ ঠাকুরের কুশল সংবাদ নিতে এসেছেন। উপস্থিত বুড়োগোপাল।

আজ ১১ই ফাল্গুন, কৃষ্ণাচতুর্থী, সোমবার, ইংরাজী ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীঃ। মাষ্টারমশাই ঘরে ঢুকে মহিমাচরণকে দেখতে পান। পূর্বে মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন সাধকমাত্র গণ্য করতেন। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকার করতেন না। ইদানীং তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। আজ মহিমাচরণ বলেন: [অবতারেরও দেহধারণে] কষ্ট। রাবণের শক্তিশেলে বীর লক্ষ্মণ অচেতন হলে শ্রীরামচন্দ্র 'ভাই লক্ষ্মণ' বলে কেঁদেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখে খুশী। মহিমাচরণ চলে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেন: **এখন খুব হয়েছে।**

বুড়োগোপাল: এখন খুব কাজ করছেন—আপনি বলেছিলেন—

পরবর্তী দৃশ্য। বাগানবাড়ীর নীচ তলা। মাষ্টারমশাই নীচে আসেন। তাঁর সাক্ষাৎ হয় সুবোধের সঙ্গে। মহিমাচরণের প্রসঙ্গ ওঠে। খোকা বলেন: মহিমাবাবুর তন্ত্রের চক্রগঠন, যশোরেশ্বরীতে গমন—এ সব কথা মিথ্যা। তবে দু'একটা উঁচুদরের কথা বলে থাকেন

নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাঁর খুল্লতাত তারকনাথ[১] দত্ত গুরুতর পীড়িত, এ খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। 'তারকনাথ দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটের উকিল ছিলেন এবং তারকনাথ দত্তের ঠাকুর পরিবারের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।'[২] তারকনাথ দেহত্যাগ করেন ২১শে মার্চ, ১৮৮৬ খ্রীঃ।

নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর বাগানে ফিরে আসেন।

পরদিন মঙ্গলবার, কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি, ১২ই ফাল্গুন; ইংরাজী ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীঃ।

মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করেন, যেন নরেন্দ্রনাথের ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। কাশীপুর বাগানে রকমারি ভাববৈচিত্র্যের প্রদীপ জেলে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-বিলাস করছিলেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক ভক্তদের মাঝে মাঝে নিকটবর্তী গ্রামে পাঠাতেন ভিক্ষার জন্য। ঠাকুর বলতেন মাধুকরীর অন্ন পবিত্র। আজ যুবক ভক্তদের কয়েকজন ভিক্ষান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন। মনে হয় ভিক্ষা বিশেষ কিছু জোটে নি। এ বিষয়ে মাষ্টারমশাই নরেন্দ্র-নাথের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেন। নরেন্দ্রের নীরবতায় সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মাষ্টারমশাই হতাশ

১ রামমোহন দত্তের দুই পুত্র ছিল, দুর্গাপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিশ্বনাথ নরেন্দ্রনাথের পিতা। কালীপ্রসাদের দুই পুত্র, কেদারনাথ ও তারকনাথ। (Bhupen Dutta : Swami Vivekananda—Patriot Prophet, 1954, p. 421)

২ মহেন্দ্র দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১০৫

হয়ে চুপ করে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: কথা কইলেই গোল—

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার গৃহী ও ত্যাগীদের মন-কষাকষির মধ্যে উদাসীনতা বজায় রেখেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন: দেবেনবাবু দুদিকে উদাসীন।

মাষ্টারমশাই: তিনি কোন দিকেই নেই।

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি ও মন-কষাকষি বেড়েই চলেছিল যেন। এর প্রধান কারণ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখেছেন:

উদ্যানেতে ব্যয়াধিক দেখিয়া গৃহীরা।
একত্তরে পরামর্শ করে যোগ্য যাঁরা॥
রামচন্দ্র কালীপদ স্বরেন্দ্র এ তিনে।
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে॥
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায়।
হিসাব রাখিতে হবে তুলিয়া খাতায়॥

(পৃঃ ৬১০)

এ-সম্বন্ধে লাটু মহারাজের স্মৃতিকথাতে পাই একটুকরো বিবরণ। লাটু মহারাজ বলেন: "একদিন টাকা-পয়সার হিসেব রাখা নিয়ে কথা উঠলো। লোরেনভাই বললে, 'এত হিসেব রাখা-রাখি কেন? এখানে কেউ ত চুরি করতে আসে নি?' বাকী হাম্‌নে বললুম, 'তবু একটা হিসেব রাখা ভালো।' হামার কথা রাখালভাই মেনে নিলো। গোপাল দাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার পড়লো।" (পৃঃ ২৪০)। অন্যান্য মতে হুটকো গোপালের[৩] উপর হিসাব রাখার দায়িত্ব পড়েছিল।

এই মন-কষাকষির বিষয় উল্লেখ করে মাষ্টারমশাই উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের বলেন: এ যেন মা ও ছোট ছেলের ব্যামোর মত। মায়ের ব্যামো বাড়লে ছেলের ব্যামো বাড়ে।

অথবা যেন ভীম ও বকরাক্ষসের[৪] উপাখ্যানের মত।

নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: ও পরমহংস অবস্থায়…

মাষ্টারমশাই: তোমরা [ও-রকম মনে] করো না।

তোমরা কত বড লোক ওরা জানে না।

ঠিক যেমন বরাহ-অবতারে নারায়ণ মায়ার ফাঁদে[৫] পড়েছিলেন। নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়েছিলেন। অথবা, যেমন ভূতে-পাওয়া মানুষ নিজের

৩ এঁর পুরো নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। কলকাতার গড়পারের বাসিন্দা। ভক্তমহলে 'ছোট গোপাল' বা হুটকো গোপাল নামে পরিচিত। প্রায়ই হুট্ করে কোথাও চলে যেতেন, সেকারণে তাঁর জনপ্রিয় নাম হয় হুট্‌কো' গোপাল। তাঁর ছিল বিধবা মা ও দুটি ছোট ভাই। স্বরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেছিলেন, গোপালের বাড়ীর আর্থিক ব্যবস্থা তিনিই করবেন, গোপাল যেন ষোল আনা মন দিয়ে কাশীপুর বাগানে কাজ করেন। গোপালের উপর দায়িত্ব পড়েছিল সেবকদের হিসাবপত্র রাখার।

৪ পিতামহ ব্যাসের উপদেশে পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তীদেবী একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। বক নামে এক মহাবল রাক্ষস ঐ দেশ রক্ষা করত, প্রতিদানে ঐ দেশের রাজা প্রতিদিন রাক্ষসকে সরবরাহ করতেন একটি মানুষ, দুটো মহিষ ও প্রচুর অন্ন। ইতিমধ্যে উল্লিখিত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হয়। পরিবারের মধ্যে শোকের ছায়া পড়ে। সবাই কান্নাকাটি করতে থাকে। ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে কে আত্মাহুতি দিবে সে-বিষয়ে জল্পনা চলতে থাকে। সবকিছু শুনে কুন্তীদেবী ব্রাহ্মণকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর আদেশে ভীম পরদিন অন্নাদি নিয়ে রাক্ষসের কাছে যান। ভীম নিজেই অন্নাদি খেতে স্বরু করেন। ক্রুদ্ধ বকরাক্ষস একটা গাছ উপড়ে নিয়ে তা দিয়ে ভীমকে আক্রমণ করে। ভীম রাক্ষসকে বধ করেন। (মহাভারত, আদিপর্ব, ২৮ অধ্যায়)

৫ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় কাহিনীটি এরূপ: 'হিরণ্যাক্ষ বধ করার জন্য বরাহ অবতার

স্বরূপ ভুলে অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে।

মাষ্টারমশাই উপস্থিত যোগীনকে লক্ষ্য করে বলেন : পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।

সেদিন রাত্রিবেলা মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানে থেকে যান। স্বপ্নে দেখেন, তিনি পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। বাড়ীর দ্বারে কেউ তাঁর পদসেবা করছে।

এ-সময়কার একটি বিচিত্র ঘটনা। একদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হয় তিনি জামরুল খাবেন। সেবক লাটু স্মৃতিচারণ করেছেন : "একদিন ত ঠাকুরের জামরুল খেতে ইচ্ছে হোলো, তখন শীতের শেষ, জামরুল পাওয়া যায় না। কলকাতার বাজারে কেউ জামরুল পেলো না। দেখো! কেমন ব্যেপার হোলো! একজন ভক্ত সেইদিনই কোন এক বাগানে জামরুলের ফুল দেখতে পেয়ে শশীভাইকে সে খবর জানালে। শশীভাই সেইদিন সেই বাগান হোতে জামরুল পেড়ে নিয়ে এলো। জামরুল দেখে তিনি ত অবাক হোয়ে বললেন—'এমন সময় জামরুল কোথায় পেলি রে?' বাকী ঠাকুর তা খেতে পারলেন না।" (স্মৃতিকথা, পৃঃ ২৫৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুর বাগানে বাস করছেন। তাঁর দেহে মারাত্মক ব্যাধি, কিন্তু তাঁর সর্বদাই এক চিন্তা, কিসে ভক্তদের মঙ্গল হয়।

আজ শুক্রবার, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, ১৫ই ফাল্গুন। ইংরাজী ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীঃ।

স্কুলের কাজ সেরে মাষ্টারমশাই বেলা সাড়ে বারোটার সময় রওয়ানা হন। কাশীপুর বাগানে পৌঁছে দোতলায় পূর্বপরিচিত ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাদ-বন্দনা করে বসেন। আজ ঠাকুরের দয়ার প্রস্রবণ যেন উথলিয়ে উঠেছে। তিনি মাষ্টারকে বলেন তাঁর পায়ে হাত বোলাতে। মাষ্টার নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিদ্রার আবেশ হয়। মাষ্টার মনের আনন্দে ঠাকুরের পদসেবা করতে থাকেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের নিদ্রার আবেশ কেটে যায়। সেবক শশী ও মাষ্টার পাখা দিয়ে ঠাকুরকে হাওয়া করেন।

সেবক ঠাকুরের গলার ক্ষতে ঘি লাগাতে যান। আতঙ্কিত মাষ্টার সরে দাঁড়ান। ঠাকুর মাষ্টারকে ইঙ্গিতে বলেন মাদুরের উপর তাঁর কাছে বসতে।

নিকটেই রাখা হয়েছিল কয়েকটি সুগন্ধি ফুল। ঠাকুর পাত্র হতে ফুল তুলে ঘ্রাণ গ্রহণ করেন এবং মাষ্টারকে ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে দেন

ঠাকুরের নির্দেশে মাষ্টার ঠাকুরের পদসেবা করেন। সে-সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 'সোঽহং'-ভাবের উদ্দীপন হয়। ব্যাধি যেন একধারে পড়ে থাকে। অবতার-পুরুষ আত্মপূজায় মেতে ওঠেন। তিনি নিজের মাথায় ফুল দেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে ছিল এক টুকরো আমলকী। তার একটি ছোট টুকরো মাষ্টারকে দেন ও বলেন : **খেলে বাহ্যে খোলসা—পিত্ত প্রভৃতি দমন থাকে।**

মাষ্টার প্রসাদস্বরূপ আমলকীর টুকরো গ্রহণ করেন।

হ'লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লো, কিন্তু নারায়ণ স্বধামে যেতে চান না। বরাহ হ'য়ে আছেন। কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে। তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন। দেবতারা বলেন, এ কি হ'লো, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটি নিবেদন ক'রলেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিনি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল এনে শরীরটা ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন স্বধামে চলে গেলেন।'

(কথামৃত ২।১৩।১)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যসেবকদের নানা-ভাবে আনন্দে রাখার ব্যবস্থা করতেন। তাঁর ইচ্ছা হয় সেবকদের মাংসপ্রসাদ খাওয়াবেন। তিনি মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন : **তুমি মাংসের দাম দিবে? পাঁচ আনা কি ছয় আনা লাগবে। জিজ্ঞাসা করো বুড়োগোপালের কাছে। দেখ সরকারী[৬] হয় কিনা।**

নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেবক বাবুরাম। তাঁর জন্য প্রয়োজন একটি বালিশ। শ্রীরামকৃষ্ণ বালিশটির মাপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : **কত লাগবে?**

তিনি বাবুরামকে লক্ষ্য করে বলেন : **না, আমার একটা বালিশ নিবি?** অন্যদের লক্ষ্য করে তিনি আবার বলেন : **এখানেই ত ক্রয় করে নিবি?**

মাষ্টারের মনে আশঙ্কা হয়—কেনাকাটির ব্যাপারে তিনি অনেক সময় গোলমাল করে ফেলেছেন, সে-জন্যই কি ঠাকুর সেবকদের সরাসরি কিনে নিতে বলছেন?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টারকে বলেন : **তুমি এখন একটু নীচে যাও—আমি বাহ্যে করবো।**

পরবর্তী দৃশ্য। মাষ্টারমশাই বাড়ীর নীচতলায় নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন : সাধন করতে দক্ষিণেশ্বরে যাব।

মাষ্টারমশাই : [এখানে ঠাকুর এত অসুস্থ। তাঁকে ছেড়ে তোমার] সাধনে মন যাবে না।

এ-সকল যুক্তির অবতারণা করে মাষ্টারমশাই *নরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চেষ্টা করছিলেন।*

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে অবস্থান করছেন। শরীর খুবই অসুস্থ কিন্তু ভক্তদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদাই আকুল। ছোটখাট ঘটনার মধ্যেও ঠাকুরের যে সহানুভূতি ও প্রসারতা উন্মোচিত হয়, তা তাঁর ভাগবত-জীবনেরই চালচিত্র।

আজ রবিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১২৯২, মাঘী কৃষ্ণা দশমী। ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মাষ্টারমশাই সকালেই কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর কিশোরী।

বাগানবাড়ীর নীচের তলায় 'দানাদের' ঘর। সেখানে উপস্থিত নৃত্যগোপাল, নরেন্দ্রনাথ, কালীপদ, নবগোপাল, রামচন্দ্র প্রভৃতি।

সেবক সুবোধের জ্ঞানযোগের সাধন সম্বন্ধে নৃত্যগোপাল মন্তব্য করেন : এ যেন তুরকমের যাগ।

বাগানবাড়ীর খরচপত্র নিয়ে কথা ওঠে। নরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্রের মধ্যে এ বিষয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। মতান্তরে মনান্তর দেখা দেয়। অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

নৃত্যগোপাল বলেন : দুই কাঁটা। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বলেন : দুই-ই ত্যাগ করো—যে-কথা পরমহংসদেব বলেন।[৭]

নৃত্যগোপাল আরও বলেন : Take things as they are. আমার আগে তো শ্যামের রূপের বর্ণনায় কোন উপমাতেই মন উঠতো না। মনে হত ময়ূরকণ্ঠ, নবনীরদ এর কোনটাই শ্যামের রূপের

---

৬ তখনকার কলকাতায় সাধারণতঃ কালীস্থানে বলি দিয়ে পাঁঠার মাংস বিক্রি হত। সে-সময়ে কলকাতায় ছিল অসংখ্য কালীস্থান। ১৮৮৪ খ্রীঃ নভেম্বরে কলকাতা করপোরেশন আইন করে বিনা লাইসেন্সে পাঁঠাকাটা নিষিদ্ধ করে, কালীস্থানগুলিকে লাইসেন্স দিতে আপত্তি করে। হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি কালীস্থানে পাঁঠাবলি দিতে ও মাংস বিক্রি করতে অনুমতি দেওয়া হয়। (S. W. Goode : Municipal Calcutta, 1916, pp. 308-9) এরূপে বিক্রীত মাংস 'সরকারী' আখ্যায় পরিচিত হয়েছিল।

৭ তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : 'অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ করতে

সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু এখন যে যা বলুক কিছু মনে হয় না। শুধু ভাবের অনিষ্ট না করলেই হ'ল।

শৃঙ্গারতত্ত্ব সম্বন্ধে—শৃঙ্গারের বিভিন্ন নূতন উপাদান সম্বন্ধে কথা ওঠে। নৃত্যগোপাল উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন একটা নিবন্ধ রচনার জন্য প্রয়োজন কালি কলম কাগজ ইত্যাদি। অথবা, যেমন নানা পথ ধরে যাওয়া চলে একই গন্তব্যস্থলে।

নরেন্দ্রনাথ ধূমপান করতে করতে মন্তব্য করেন: এতে ভুল কি?

মাষ্টারমশাই কাশীপুর হতে বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে যান। বরাহনগর-নিবাসী কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার মাষ্টারমশায়ের ভগ্নীপতি। ঈশানচন্দ্র কখনও কখনও ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন। মনে হয় সেখানেই তিনি মধ্যাহ্নভোজন করেন।

তিনি বরাহনগর হতে যান দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে। বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপূত বিল্ববৃক্ষ স্পর্শ ও প্রণাম করেন। বেদিকা পরিক্রমা করে বেদিকার পূর্বদিকে ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন।[৮] বিল্ববৃক্ষতলে কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। সেখান হতে যান পঞ্চবটীতে। পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করেন। সেখান হতে যান হরিতলা বা বটবৃক্ষতলায়, তারপর গঙ্গাতীরে। মন্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘকালের বাসস্থান। সেই পবিত্র ঘরে গিয়ে বসেন ও প্রণাম করেন, তারপর যান ৺রাধাশ্যামের মন্দিরে এবং সেখান হতে ৺ভবতারিণীর মন্দিরে। তিনি ব্যাকুল-হৃদয়ে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেন: মাগো, তোমার ছেলের জন্য আমি আর কি বলব? তুমিই ভাল জান। তবে মাগো! আর এত যন্ত্রণা দিও না।

মাষ্টারমশাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য জগন্মাতার প্রসাদ গ্রহণ করেন। বরাহনগরে ঈশান কবিরাজের বাড়ী হয়ে তিনি কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হন। বাগানবাড়ীর আবহাওয়া গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মতসংঘর্ষের ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন।

মাষ্টারমশাইকে দেখে উপস্থিত সেবক সকলে একসঙ্গে বলে ওঠেন: মাষ্টারমশাই, আপনি ছিলেন না, কেলেঙ্কারী হয়ে গেল।

সেবক শশী সে-সঙ্গে বলেন: পরমহংসদেব আমাদের support করলেন।

'কেলেঙ্কারী' গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মন-কষাকষিকে কেন্দ্র করে। রামচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, বলরাম, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তগণ কাশীপুর বাগানবাড়ীর ব্যয় বহন করতেন। ঠাকুরের আদেশে সুরেন্দ্রনাথ বাড়ীভাড়া দিতেন, ও বলরাম ঠাকুরের পথ্যখরচ দিতেন। বাকী খরচের ব্যবস্থার জন্য গৃহী ভক্তগণ গিরিশচন্দ্র বা রামচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিমাসে আলোচনা করে চাঁদার পরিমাণ স্থির করতেন। এ বিষয়ে শ্রীমা স্বমুখে বলেছেন: তাঁর অসুখের সময় একজন ভেগে গেল বিশ টাকার জন্য—চাঁদা ধরেছিল। (শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২।৫৪) বাগানবাড়ীর পরিচালনার ব্যাপারে রামচন্দ্র নেতৃত্ব[৯] গ্রহণ করেছিলেন।

হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান।' (কথামৃত ৩।১৬।১)

বলা বাহুল্য, নৃত্যগোপালের এ-সকল যুক্তি বিবদমানদের শান্ত করতে পারেনি, যদিও সাময়িকভাবে তাঁদের শান্ত করেছিল।

৮ শ্রীম-দর্শন, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য।

৯ ঠাকুরের শ্যামপুকুরে থাকাকালীন প্রবীণ ভক্তদের এক একজন প্রত্যহ Superintend করতেন। কোনদিন গিরিশচন্দ্র, কোনদিন রামচন্দ্র, কোনদিন সুরেন্দ্রনাথ, কোনদিন নবগোপাল ইত্যাদি। (কথামৃত ১।১৭।২)

শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছিলেন : ছ্যাখ, গেরস্তদের বুকের রক্ত এই পয়সা, অপব্যয় করিস নি। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই সকলে আসে। ('স্বামী অখণ্ডানন্দ', পৃঃ ১৮)। এ বিষয়ে সেবকদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও বাগান-বাড়ীর খরচ বেড়েই চলেছিল। আলোচ্যদিনে রামচন্দ্র ব্যয় হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব দেন যে ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষার জন্য দুইতিন জন সেবকই যথেষ্ট ; অপর সেবকেরা যে যার বাড়ী চলে যাবে এবং সুবিধামত কাশীপুরে এসে কাজকর্ম করবে। নরেন্দ্রনাথ এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন না। কথাকাটাকাটি তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। সেবকেরা নরেন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ান। ক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথ সকল বিষয় ঠাকুরের নিকট নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন করে বলেন :

নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুণ্ণ কন প্রভুরায়।
চল্ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায়॥
যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব।
যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব॥
নরেন্দ্র বলেন স্কন্ধে তোমায় লইয়া।
রাখিব খাওয়াব ভিক্ষা দুয়ারে মাগিয়া॥
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, পৃঃ ৬১১)

ঠাকুরের সমর্থন লাভ করে তাপসেরা স্থির করেন ভিক্ষা করে খরচপত্র চালাবেন। পরদিন প্রভাতে নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, হুটকো গোপাল ও কালীপ্রসাদ ভিক্ষা করতে বের হন। প্রথমেই ভিক্ষা দেন শ্রীমা। ভিক্ষাতে তাপসদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। কেউ দেয় চাল, আলু, কাঁচকলা ; আবার কেউ দেয় গালাগাল। সংগৃহীত ভিক্ষা ঠাকুরের সামনে ধরা হয়। ঠাকুর দেখে খুব খুশী। ভিক্ষান্ন পবিত্র, এতে কোন কামনা থাকে না। শ্রীমা ভিক্ষান্নের তরলমণ্ড তৈরী করেন ও ঠাকুরকে পথ্য দেন। সেবকেরা সিদ্ধান্ত করেন, 'গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব। লাঠি-শোটা লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব॥'

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মনোমালিন্য[১০] বেশী দূরে অগ্রসর হবার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ

ডাকাইলা উভয়ে আপন সন্নিধান॥
সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন পরস্পর।
… … …
গৃহী সন্ন্যাসীতে দুয়ে সমান আদর।
মধ্যে বাধাইয়া দ্বন্দ্ব করিলা রগড়॥
(পুঁথি, পৃঃ ৬১২)[১১]

[ক্রমশঃ]

১০ এই ঘটনা সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলেছিলেন : 'যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, যাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর কৃপা লাভ করেছেন—তা গৃহস্থই হোন আর সন্ন্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-কষাকষির কারণ কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। তিনি যেন মহাসূর্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙিন কাঁচ চোখে দিয়ে সেই এক সূর্যকে নানা রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি।' (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১১)

১১ এই নিবন্ধের মূল আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী পৃঃ ৬৭১-৬৭৪।

রামকৃষ্ণ-শিষ্য ছোট নরেন

ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ছোট নরেনের পুরো নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্র।[১] শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'ছোট নরেন' বলে।[২] তাঁর বাড়ী ছিল বাগবাজারে[৩] তেলিপাড়ায়।[৪] খুব কম বয়সে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন। ছোট নরেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শ্রীম ছিলেন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ঈশ্বরানুরাগী বালকদিগকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন। এভাবে তেজচন্দ্র, নারায়ণ, বিনোদ, ছোট নরেন, পল্টু প্রভৃতি অনেক বালককে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয়ে নিয়ে এসেছিলেন।[৫] কথামৃতে তাঁর প্রথম দর্শনের তারিখ পাই ১৮৮৫ সালের ৭ই মার্চ।[৬] কথামৃতকার শ্রীম লিখেছেন, "...১৮৮৫ মধ্যে সুবোধ, ছোট নরেন্দ্র, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন।"[৭] পুঁথিকার লিখেছেন—

> জুটিয়া নরেন্দ্র-ছোট এবে দিল দেখা।
> কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা মাখা ॥
> গড়নে সরল যেন অন্তরে সরল।
> ভিতরের ভাব বাহ্যে ব্যক্ত সমুজ্জ্বল ॥[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারীভেদে ভক্তদের নানাভাবে দীক্ষিত করতেন। যখন কোন ভক্ত ঠাকুরের কাছে আসতেন, তখনই বা তার কিছুকাল পরে ঠাকুর তাঁদের প্রত্যেককে একান্তে ডেকে ধ্যান করতে বলতেন। তাঁদের বুক, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, "ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্যজ্যোতিমাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ময় মূর্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ, কাহারও হৃদ্‌গ্রন্থিসকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্বিকল্প সমাধির পূর্বাভাস আসিয়া উপস্থিত হইত।... ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি।"[৯]

১, ২ শ্রীরামকৃষ্ণ—সুবোধচন্দ্র দে, ২য় সংস্করণ (আষাঢ়, ১৩৫৮), পৃঃ ২৬৯

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—স্বামী সারদানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ (১৩৮০), দিব্যভাব, পৃঃ ১৯৫ [এর পর থেকে 'লীলাপ্রসঙ্গ']

৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল, ১ম সংস্করণ (১৩৪৩), পৃঃ ৩৩৪ [এর পর থেকে 'লীলামৃত']

৫ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ১৯৪-৯৫

৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—শ্রীম, ৩য় ভাগ (১৩৮১), পৃঃ ১১৫ এবং ৫ম ভাগ (১৩৮১), পৃঃ ২৪৫ [এর পর থেকে 'কথামৃত']

৭ কথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৮১), পৃঃ ৫

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয় সেন, ২য় সংস্করণ (১৩৩১), পৃঃ ৪০৩

৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৫১-৫২

ঠাকুর ছোট নরেনকে খুব ভালবাসতেন। তাঁকে শুদ্ধ আধার বলে সবাই-এর কাছে বলতেন। একদিন বলরাম মন্দিরে ঠাকুর মাষ্টারমশাইকে বলছেন, "হ্যাঁগা, ছোট নরেন যাওয়া আসা ক'চ্ছে, বাড়িতে কিছু বলবে? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ কখনও হয় নাই।" মাষ্টার—"আর খোলটা বড়।" শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, "হাঁ, আবার বলে যে, ঈশ্বরীয় কথা একবার শুনলে আমার মনে থাকে। বলে ছেলেবেলায় আমি কাঁদতুম—ঈশ্বর দেখা দিচ্ছেন না বলে।"[১০] শ্যামপুকুরে একদিন ঠাকুর ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ছোট নরেনকে দেখিয়ে বলছেন, "এ অতি শুদ্ধ! বিষয়বুদ্ধির লেশ এতে লাগে নাই।" সেদিন শ্যামপুকুরে রামতারণের গান হচ্ছিল—(১) 'দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ত্ব-রজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,' (২) 'ধরম করম সকলি গেল, শ্যামাপূজা বুঝি হলো না!' গান শুনতে শুনতে ঠাকুরের ভাব হল। সেসঙ্গে অনেক ভক্তেরও। ছোট নরেনেরও ভাব হয়েছিল। তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ডাঃ সরকারকে একথা বলেছিলেন। ঠাকুরের কথা শুনে ডাক্তার ছোট নরেনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।[১১]

ঠাকুরের সঙ্গে ছোট নরেনের এই মেলামেশা তাঁর বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করতেন না। বরং তাঁকে 'যেন তেন প্রকারেণ' বাধা দিতেন। তাই তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বেশী আসতে পারতেন না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই যেতেন কলকাতার ভক্তবাড়ীতে তাঁর শুদ্ধাত্মা ভক্তদের দেখবার জন্য। বলরাম বসু বা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুর এসেই ঐ সব শুদ্ধাত্মাদের তাঁদের বাড়ীতে ডেকে পাঠাতেন। সেখানেই তাঁদের মিলন হত। একবার ঠাকুর কলকাতায় কাপ্তেনের বাড়ী গেছেন (যাঁর নাম ছিল বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপাল রাজদরবারে চাকুরী করতেন)। ঠাকুর ছোট নরেনকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর তাঁকে বললেন, "তোর বাড়িটা কোথায়? চল যাই। —সে বললে 'আসুন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে লাগল সঙ্গে,—পাছে বাপ জানতে পারে!"[১২] বলরাম মন্দিরে ঠাকুর এসেছেন। ছোট নরেন প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত। অনেক কথাবার্তার পর ছোট নরেন বিদায় নিচ্ছেন। ঠাকুর জানেন, ছোট নরেনের বাড়ীর লোকেরা, বিশেষ করে, তাঁর বাবা-মা পছন্দ করেন না যে, ছোট নরেন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করুক। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "তুই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি।—কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবিনি। খুব রোক আনবি—শালার বাপ!"[১৩] ভগবানের জন্য মা-বাবার কথা না মানা অন্যান্য ভক্তদেরও বলতেন। তাই বাধা সত্ত্বেও ছোট নরেন মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে রাত কাটাতেন।[১৪]

দক্ষিণেশ্বরে বালক-ভক্তেরা এলেই ঠাকুর আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁদের তিনি নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। একদিন ছোট নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তাঁর দিকে একদৃষ্টে দেখছেন। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ। এরপর কথামৃতকারের অনবদ্য বর্ণনা—"শুদ্ধাত্মা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন? ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খুশী হইতেছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিঃস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত জোড় করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

"কিয়ৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুরের

১০ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮৯ ; ১১ ঐ, ৪র্থ ভাগ (১৩৮১), পৃঃ ২৬২
১২ ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ ১৮২ ; ১৩ ঐ, পৃঃ ১৫২
১৪ শ্রীরামকৃষ্ণ—সুবোধচন্দ্র দে, পৃঃ ২৭০ ; কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২৯

বায়ু স্থির হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে ভক্তদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

"এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) 'তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক একবার—আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস্?—জ্ঞান, না ভক্তি?'

"ছোট নরেন—শুধু ভক্তি।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভক্তি কাকে করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাস্যে) এঁকে যদি না জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? (মাষ্টারের প্রতি)—তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে—'শুধু ভক্তি চাই'—এর অবশ্য মানে আছে।

"আপনা-আপনি ভক্তি আসা, সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি—বিচার করা ভক্তি।

"(ছোট নরেনের প্রতি) দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন;—তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্।"

ছোট নরেনের কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, সে কোন্ থাকের ভক্ত, ভাবস্থ অবস্থায় ঠাকুর সেদিন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুধু ছোট নরেনের নয়, সেদিন পল্টু, মোহিনীমোহন প্রভৃতির সম্বন্ধেও এ সম্পর্কে বলেছিলেন।[১৫]

ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন এলে তাঁর ছোট-খাট সেবা করতেন। অনেক সময় ঠাকুরও ভক্তদের দিয়ে সেবা করিয়ে নিতেন। একদিন বলরাম মন্দিরে এসেই ঠাকুর মাষ্টারমশাইকে বলছেন, "ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য এলাম।"[১৬] তাদের ডাকতে পাঠান হল। ছোট নরেন এসেছেন। ঠাকুর মুখ ধুতে যাচ্ছেন। অমনি ছোট নরেন গামছা নিয়ে ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। আবার পশ্চিমের বারান্দায় উত্তর কোণে ছোট নরেন ঠাকুরের পা ধুয়ে দিচ্ছেন। কাছে মাষ্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন।[১৭]

বলরাম মন্দির থেকে ঠাকুর গাড়ী করে নিমু গোস্বামী লেনে দেবেনবাবুর বাড়ীতে যাচ্ছেন। সঙ্গে মাষ্টার, ছোট নরেন, আর দু'-একটি ভক্ত। ঠাকুর পূর্ণের জন্য ব্যাকুল। মাষ্টারকে বলছেন ঠাকুর—"আজ তাকে আনলেই হত। আনলে না কেন?" ঠাকুরের এ কথা শুনে ছোট নরেন হেসে ফেললেন। এরপর শ্রীম লিখছেন, "ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাষ্টারকে বলিতেছেন—গ্যাখো গ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা হাসে। যেন কিছু জানে না! কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই,—তিনটেই মনে নাই—জমীন, জরু, রুপেয়া। কামিনীকাঞ্চন মন থেকে একেবারে না গেলে ভগবান লাভ হয় না।"[১৮]

ঠাকুর যে তিনজনের পুরুষের সত্তা বলে ভক্তদের বলতেন, ছোট নরেন হলেন তাঁদের মধ্যে একজন—আর অন্য দু'জন হলেন নরেন্দ্র আর পূর্ণ। তিনি বলতেন, "ছোট নরেনের পুরুষভাব,—তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবাদি নাই।"[১৯]

শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাদিনে (১৮৮৫ সালের ১৩ই জুলাই) ঠাকুর প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বলরামবাবুর বাড়ীতে এসেছেন। বাড়ীর বৈঠক-খানায় মহেন্দ্র মুখুয্যে, হরিবাবু, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেক ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর

১৫ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১১৮-১৯; ১৬ ঐ, পৃঃ ১২৭; ১৭ ঐ, পৃঃ ১২৯
১৮ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৩০; ১৯ ঐ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২১৪

কথাবার্তা বলছেন। ছোট নরেনের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন, "শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব হয়ে গেল, তা নয়।

"তাঁকে ঘরে আনতে হয়—আলাপ করতে হয়।

"কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে।

"রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে। কিন্তু দু এক-জন বাড়ীতে আনতে পারে, আর খাওয়াতে-দাওয়াতে পারে।"[২০]		[ক্রমশঃ]

২০ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২০

পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দু-মোসলেম ধর্মজগৎ সংক্রান্ত গ্রাম-নাম

বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত নানান গ্রাম—কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যায় শতাধিক—একই আখ্যায় চিহ্নিত হলে সে-অভিধাকে আমরা অবশ্যই জনপ্রিয় গ্রাম-নাম বলতে পারি। এই শ্রেণীর মোট ৫১টি পল্লী-নাম বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার মধ্যে ৪৮টি হিন্দু ও ৩টি মোসলেম ধর্মজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত। হিন্দু ধর্মজগৎ সংক্রান্ত জনপ্রিয় নামগুলির ৪৪টির অন্ত্য-পদ 'পুর' এবং ৪টির 'নগর'। কিন্তু হিন্দু দেবলোক বা দেব-দেবীর নামাশ্রিত পল্লী-নামে অন্যান্য অন্ত্যাংশেরও যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। যথা (বর্ণানুক্রমে)—ইন্দ্রগাছা (বীরভূম : সিউড়ি), ঈশ্বরদা (বাঁকুড়া : শালতোড়া), কমলাটোলা (মেদিনীপুর : নয়াগ্রাম), কানাইদীঘি (মেদিনীপুর : কাঁথি), কার্তিকখালি (মেদিনীপুর : খেজুরী), কালিকাকুণ্ড (মেদিনীপুর : মহিষাদল), কালীবাস (নদীয়া : নাকাশিপাড়া), কৃষ্ণনগর (২৪-পরগনা : মহেশতলা), কেশবচক (মেদিনীপুর : খেজুরী), গোপালবেড় (বর্ধমান : খণ্ডঘোষ), চণ্ডীতলা (হুগলি : চণ্ডীতলা), তারাহাট (হুগলি : গোঘাট), দুর্গাপুর (২৪-পরগনা : বজবজ), নারায়ণবাড় (মেদিনীপুর : সবং), বলরামপোতা (হাওড়া : উলুবেড়িয়া), বিষ্ণুবাটি (হুগলি : তারকেশ্বর), ভগবানবসান (মেদিনীপুর : ডেবরা), মনসাদ্বীপ (২৪-পরগনা : সাগর), মহেশডাঙ্গা (বর্ধমান : মেমারি), রাঘবকাটি (২৪-পরগনা : স্বরূপনগর), রাধাবন (মেদিনীপুর : পাশকুড়া), রামবাগ (মেদিনীপুর : মহিষাদল), লক্ষ্মীসাগর (বাঁকুড়া : সিমলাপাল), শিবনিবাস (নদীয়া : কৃষ্ণগঞ্জ), সরস্বতীগঞ্জ (বর্ধমান : কাঁকসা), হরিপাল (হুগলি : হরিপাল), হরিহরচক (বাঁকুড়া : কোতুলপুর) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই নমুনা-তালিকা আরও বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। কেননা, এতে, বহু অন্ত্য-পদের স্থান-সংকুলান হয়নি এবং আমাদের দেবদেবীর নামও অগণিত।

তা ছাড়া, গ্রাম-নামে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় কোনও দেবতারই একটিমাত্র বা প্রধানতম নামটিই শুধু ব্যবহৃত হয়নি, অধিকাংশ স্থলে তাঁদের নামের নানান রকমফের দেখা যায়। যেমন, 'কৃষ্ণ' এই প্রধান-নামের কয়েকটি (সব কয়টি নয়) বিকল্প—কানাই, কানু, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণরাম, কেশব,

কেষ্ট, গোপাল, গোপীকান্ত, গোপীনাথ, গোপীবল্লভ, গোপীমোহন, গোপীরমণ, গোবিন্দ, ঘনশ্যাম, জনার্দন, দামোদর, নন্দকিশোর, নন্দলাল, বনমালী, মদনমোহন, মধুসূদন, মাধব, মুরারি, রাধাকান্ত, রাধাবল্লভ, রাধামাধব, রাধামোহন, রাধারমণ, শ্যাম, শ্যামকান্ত, শ্যামচাঁদ, শ্যামলাল, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি। এইসব প্রতিটি নামানুযায়ী গ্রাম-নাম আছে পশ্চিমবাংলায় যাদের অন্ত্য-পদের পার্থক্যও প্রচুর। সেজন্য, শুধু কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যত গ্রাম-নামের সৃষ্টি হয়েছে এ-রাজ্যে, তার অপরিমেয়তার কথা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য, শ্রীচৈতন্যোত্তর বঙ্গদেশে কৃষ্ণ একান্ত লোকপ্রিয় দেবতা। তাঁর নাম গ্রাম-নামের অঙ্গীভূত করবার ব্যাপক জন-বাসনা স্বতঃবোধ্য। কিন্তু রাম পশ্চিমবঙ্গে এতটা বন্দিত হননি। তবু, তাঁরও যেসব বিকল্প নাম আমাদের পল্লী-নামে স্থান পেয়েছে তাদের সংখ্যা প্রচুর। যথা, জানকীবল্লভ, রঘু, রঘুদেব, রঘুনন্দন, রঘুনাথ, রঘুবীর, রাঘব, রাজারাম, রামকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব, সীতানাথ প্রভৃতি। মূল 'রাম' শব্দটি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও কয়েকটি নামের সৃষ্টি করেছে যেগুলি একই গোষ্ঠীভুক্ত। যেমন—রামকৃষ্ণ, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামজীবন, রামতনু, রামনাথ, রামনারায়ণ, রামপ্রসাদ, রামরাম, রামশরণ, রামহরি, রামানন্দ, শ্রীরাম প্রভৃতি। এই সমস্ত নামের শেষে কোন-না-কোন অন্ত্য-পদ যুক্ত হয়ে গ্রাম-নামের উদ্ভব হয়েছে, যাদের মোট সংখ্যা ভূরি পরিমাণ অতএব, দেবতাবিশেষের উপাসনা বঙ্গদেশে সুপ্রচলিত না হলেও তাঁর নামাশ্রয়ী পল্লী-নামের প্রাচুর্যে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। অনুরূপ আর এক দৃষ্টান্ত—জগন্নাথ। মেদিনীপুর ছাড়া পশ্চিমবাংলায় তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি বেশী নয়। কোনও কালে ছিলও না। তবু, জগন্নাথপুর নামের ৭২টি ও পুরুষোত্তমপুর ('পুরুষোত্তম' জগন্নাথের অপর নাম) নামের ৩৬টি পল্লী আছে এ-রাজ্যে। 'জগন্নাথ'-এর সঙ্গে অন্যান্য অন্ত্য-পদ (চক, বাটি ইত্যাদি) যুক্ত হয়ে আরও ২১টি গ্রাম-নামের সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ, আমাদের গ্রামীণ জনমানসে দেবদেবীর নামাঙ্কিত পল্লী-নাম প্রায়শঃই নির্বাচিত হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। এর মূলে সমকালীন পল্লীবাসীদের—কি হিন্দু কি মুসলমান—প্রগাঢ় ধর্মপরায়ণতা (বা ধর্মভীরুতা) এবং ধর্মীয় নামের জাদু-আবরণে নিজ নিজ লোকালয়কে অশুভ শক্তির কোপ থেকে রক্ষা করবার আগ্রহ যে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিছু পরেই আমরা যখন ইসলামী ধর্মচিন্তা-প্রসূত গ্রাম-নামের আলোচনা করব তখন দেখা যাবে, আমীনাবাজার, আমীনাবাদ, আলীচক (৭টি), আলীনগর (৫টি), আলীপুর (২৫টি), আল্লাডি (৩টি), খুদারগাছি, খোদারবাজার, নবীপুর (৩টি), নামাজগ্রাম, পীরগাঁও, পীরচক (৪টি), পীরপুর (৪টি), মদিনা, মহম্মদপুর (২৬টি), মামুদপুর (৩১টি), রসুলপুর (২২টি), সিয়াগ্রাম, হজরতপুর, হোসেনপুর (২২টি), হোসেনাবাদ (৭টি) প্রভৃতি মোসলেম ধর্মজগৎ সংক্রান্ত পল্লী-নামের সংখ্যাও কম নয়।

হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর ধর্মজগৎ থেকে আহৃত গ্রাম-নামের বর্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে এই উপক্রমণিকাটুকুর শেষে আমরা এখন মূল বিষয়ে প্রবেশ করতে পারি। প্রথমেই একটি সুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর হওয়া দরকার। আমরা, শিক্ষিত বাঙালী-সাধারণ, যখন (ধরা যাক) শ্রীরামপুর নামের স্থানটির কথা ভাবি, তখন একটি মাত্র নির্দিষ্ট স্থান—হুগলি জেলার অন্যতম মহকুমা-শহরের কথাই শুধু আমাদের মনে পড়ে। ওই একই নামের যে বহু গ্রাম (বা শহর) থাকতে পারে তা হয় আমরা জানি না, না হয় ভুলে যাই। সাধারণতঃ হুবহু একই নামের একাধিক লোকালয়ের খবর আমরা বড় একটা রাখি না বলে এ-ভুলটা হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিন গ্রাম-নামগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া

করলেই বোঝা যায়—অবিকল সদৃশ পল্লী-নামের কিছুমাত্র অভাব নেই পশ্চিমবাংলার জেলায় জেলায়। শ্রীরামপুরের কথাই ধরা যাক। মহকুমা-শহরটিকে বাদ দিলেও (কেননা সেটা গ্রাম নয়), ওই একই নামের ৭৩টি গ্রাম আছে এ-রাজ্যে যাদের জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-১৯, বর্ধমান-১০, ২৪-পরগনা-৯, হুগলি-৭, মুর্শিদাবাদ-৬, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম দিনাজপুর-৫ করে, হাওড়া, নদীয়া ও মালদহ-২ হিসাবে এবং পুরুলিয়া-১।

'শ্রীরামপুর' গ্রাম-নামটির এই প্রারম্ভিক ও স্থূল সমীক্ষা থেকে স্বভাবতঃই কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথমতঃ, হিন্দুর ধর্মজগৎ থেকে আহৃত শ্রীরামপুরের মতো আরও জনপ্রিয় পল্লী-নাম আছে কিনা, এবং থাকলে, তাদের নাম কি? দ্বিতীয়তঃ, সেগুলির জেলাওয়ারি সংখ্যা কত? তৃতীয়তঃ, সেসব সংখ্যা থেকে নামগুলির জেলাওয়ারি বা আঞ্চলিক প্রাদুর্ভাবের কোন কারণ নির্ণয় করা যায় কিনা? চতুর্থতঃ, এগুলিই কি সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রাম-নাম?

প্রথম প্রশ্নের আলোচনার আগে, জনপ্রিয় গ্রাম-নাম বলতে আমরা কি বুঝি সে-বিষয়ে একটি সংজ্ঞার্থ স্থির করে নেওয়া প্রয়োজন। এজন্য পঁচিশ বা ততোধিক সংখ্যক একই পল্লী-নামকে আমরা জনপ্রিয় আখ্যা দেওয়া সমীচীন মনে করেছি। এ-সংখ্যাটি অবশ্যই মনগড়া এবং এটির নির্ধারণের ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট বা যুক্তিসহ কারণ নেই। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে একথা উল্লেখযোগ্য যে, এই মাপকাঠি অনুসারে হিন্দুধর্মলোক থেকে আহৃত ৪৮টি ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত ৩টি গ্রাম-নামের বিচার-বিশ্লেষণ করতেই আমাদের স্থান-সংকুলানের কথা ভাবতে হবে। মোটামুটি হিসাব করে দেখেছি, মাপকাঠিটি ২০-তে নামিয়ে আনলে, বিবেচ্য গ্রাম-নামের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়; আরও কমালে তো কথাই নেই। সেজন্য, পরবর্তী গবেষকদের হাতে সেকাজের ভার দিয়ে আমরা এখন অগ্রসর হতে পারি।

আলোচ্য গ্রাম-নামগুলির উল্লেখের সময় আমরা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিটি অনুসরণ করব না। তার পরিবর্তে এক এক উপাসিতের মূল ও বিকল্প নাম-গুলি পৃথক দলে ভাগ করে দেখানো হবে যাতে পল্লী-নামোদ্ভবের ক্ষেত্রে তাঁরা, এক বা একাধিক নামে, কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন সে-বিষয়ে ধারণাটা স্পষ্ট হয়। আবার, এই বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত নামগুলিও বর্ণানুক্রমিকভাবে উল্লিখিত না হয়ে তাদের সংখ্যাধিক্য অনুসারে পর পর বিন্যস্ত হবে। কেননা, তা থেকে কোনও বিশেষ উপাসিতের কোন্ বিকল্প নামটি কতখানি জনপ্রিয় তারও একটা হদিস মিলবে। প্রতিটি গ্রাম-নামের জেলাওয়ারি সংখ্যাও উল্লিখিত হবে যা থেকে সে-নামের আঞ্চলিক জনপ্রিয়তার একটা তথ্যানুগ অনুমান সম্ভব হয়।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-নামোৎপত্তির ক্ষেত্রে কৃষ্ণ এবং তাঁর কয়েকটি বিকল্প অভিধাই যে সর্বাধিক জনরঞ্জক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ৭৩টি শ্রীরাম-পুরের কথা শুনেই যাঁরা বিস্ময় বোধ করেছেন, তাঁরা কৃষ্ণ (বা তাঁর বিকল্প নাম) অনুসারী পল্লী-নামের সংখ্যা জেনে হতবাক্ হবেন।

কৃষ্ণের বিবিধ অভিধা থেকে নিষ্পন্ন জনপ্রিয় (অর্থাৎ, ২৫ বা তদূর্ধ্বসংখ্যক) গ্রাম-নামগুলির প্রথমটি গোপালপুর (মোট-১৪২টি) (মেদিনীপুর-৪০, বাঁকুড়া-১৯, পুরুলিয়া-১৩, বর্ধমান ও ২৪-পরগনা-১১ করে, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৯ হিসাবে, নদীয়া ও বীরভূম-৮ সংখ্যায়, কোচ-বিহার-৬, হুগলি ও মুর্শিদাবাদ প্রতিক্ষেত্রে-৩ এবং হাওড়া-২)। প্রসঙ্গতঃ, এটিই এ-রাজ্যের সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রাম-নাম। প্রথমেই লক্ষণীয়,

পশ্চিমবাংলার ১৫টি জেলার মধ্যে ১৩টিতেই এ-নামটি অল্পাধিক সংখ্যায় বিদ্যমান। অতএব, তার প্রবল জনপ্রিয়তা যে বহুবিস্তৃতও বটে তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে, আমরা পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছি। যথা, উত্তরবঙ্গ (মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা), রাঢ়বঙ্গ (মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলা) এবং দক্ষিণবঙ্গ (২৪-পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলা)। এই অঞ্চল-বিভাগের কারণস্বরূপ একথা হয়ত বলা যায় যে, কোনও সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা গোষ্ঠীমানসের অন্যবিধ প্রতিফলন-ক্ষেত্রে প্রভাব-পরিমণ্ডল নির্ণয়ে অপরিসর জেলাগুলি থেকে এই অপেক্ষাকৃত সুপরিসর অঞ্চলগুলি অবশ্যই যোগ্যতর মাপকাঠি। আলোচ্য গ্রাম-নামটির এই অঞ্চলওয়ারি বিভাগ থেকে দেখা যায়—উত্তরবঙ্গে তার সংখ্যা ২৪, রাঢ়বঙ্গে ৯৬ ও দক্ষিণবঙ্গে ২২। অতএব, এ-রাজ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এই গ্রাম-নামটি আবার, তুলনামূলকভাবে, উত্তর এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে রাঢ়বঙ্গে অনেক বেশী সংখ্যায় লভ্য। পুনরপি, নামটির সিংহভাগ যে মেদিনীপুর জেলা-এলাকায় অবস্থিত এ-তথ্যটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শতকরা হিসাবে, মেদিনীপুরের একার হিস্যা এক্ষেত্রে দাঁড়ায় ২৮·২%। পূর্বোল্লিখিত শ্রীরামপুর নামটির বেলায়ও আমরা দেখেছি, সে-নামের মোট ৭৩টি পল্লীর মধ্যে ১৯টিরই অবস্থান একই জেলায়, যার শতকরা অংশ দাঁড়ায় ২৬%। অন্ত্য-পদগুলির আলোচনার সময়েও আমরা মেদিনীপুরের এই আপেক্ষিক গুরুত্বের বিষয়টি বারংবার লক্ষ্য করেছি। এর কারণ কি তা অনুসন্ধানযোগ্য।

আয়তন ও জনসংখ্যার মাপকাঠিতে ২৪-পরগনা পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ জেলা। তার পরেই মেদিনীপুর। ১৯৬১ সালের আদমশুমার অনুসারে এ-রাজ্যের মোট এলাকা ও লোকসংখ্যার তুলনায়, এই দুই বিষয়ে ২৪-পরগনার অংশ ছিল যথাক্রমে ১৬·৪৯% ও ১৭·৯৮% এবং মেদিনীপুরের যথাক্রমে ১২·৪৩% ও ১৫·৩৬%। (বর্ধমান ও তার থেকেও ছোট অবশিষ্ট জেলাগুলির স্থান এ-প্রসঙ্গে এত পিছনে যে, এখানে তাদের তুলনামূলক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। কিন্তু মৌজার সংখ্যায় (এবং সেই সঙ্গে মৌজা বা গ্রাম-নামের সংখ্যায়) মেদিনীপুর, বেশ বড় ব্যবধানে, ২৪-পরগনার পুরোবর্তী। এ-রাজ্যের মোট মৌজাসংখ্যার (৪২,৬১৫) তুলনায় মেদিনীপুরের মৌজাসংখ্যার (১২,২৮৭) শতকরা অনুপাত ২৮·৮৩% যা ২৪-পরগনার ক্ষেত্রে মাত্র ৯·৬৩%। দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মৌজাগুলির (সাধারণ্যে যারা 'লাট' নামে পরিচিত) বিরাট বিরাট আয়তন অবশ্য তার অন্যতম কারণ। কেননা, তাতে সে-জেলার মোট মৌজাসংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমাটি (বা তার পশ্চিমাংশ) কিছুটা বিরলবসতি হলেও সেখানকার জন-ঘনত্ব (এবং মৌজার সংখ্যাধিক্য) সুন্দরবনের তুলনায় অনেক বেশী। তা ছাড়া, ২৪-পরগনার এক বিশাল অংশ শহরাঞ্চল হওয়ায় সে-জেলার গ্রাম-নামের সংখ্যা স্বতঃই অনেক হ্রাস পেয়েছে। এসব ও অন্যান্য কারণে, ২৪-পরগনাকে (এবং বাকি জেলাগুলিকে) বহু পিছনে ফেলে পশ্চিমবাংলার মোট মৌজা বা গ্রাম-নামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই (সঠিকভাবে ২৮·৮৩%) যে শুধু মেদিনীপুরে বিদ্যমান এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়। সেইজন্য সে-জেলা থেকে আহৃত গ্রাম-নামের আপেক্ষিক প্রাচুর্য।

গোপালপুর ও শ্রীরামপুর নামের মোট গ্রাম-সংখ্যা, যথাক্রমে ২৮·২% ও ২৬% মেদিনীপুরে অবস্থিত কেন, এ-প্রশ্নের সমাধানকল্পে পূর্বগামী আলোচনা থেকে দেখা যায়, মৌজাসংখ্যার

রাজ্য-গড় যখন সে-জেলার ক্ষেত্রে ২৮·৮৩%, তখন উল্লিখিত শতকরা হিস্যা ত্বটিকে বেশী বলা তো চলেই না বরং সামান্য কমই বলতে হয়। এই পার্শ্বচারণটুকুর পরে, আমরা মূল প্রসঙ্গে—কৃষ্ণ-সম্পর্কিত পরবর্তী জনপ্রিয় গ্রাম-নাম গোবিন্দপুর-এর বিষয়ে—ফিরে যেতে পারি।

সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে, গোপালপুরের পরে এ-রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গ্রামের নাম—গোবিন্দপুর (মোট ১২৫টি)। তার জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-৩৮, ২৪-পরগনা-১৫, পুরুলিয়া-১২, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৯ করে, বাঁকুড়া-৮, নদীয়া ও বর্ধমান-৭ হিসাবে, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ প্রতিক্ষেত্রে ৬, হুগলি-৫, হাওড়া-২ এবং কোচবিহার-১। এখানেও মেদিনীপুরের হিস্যা খুব বেশী। ১২৫টির মধ্যে ৩৮টি, অর্থাৎ ৩০·৪%। আর, গোপালপুর-এর মতোই, এ-গ্রাম-নামটিরও অল্পাধিক সংখ্যায় দেখা মেলে দার্জিলিং ও জলপাই-গুড়ি ছাড়া বাকি ১৩টি জেলাতেই। প্রসঙ্গতঃ, দার্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমা ছাড়া বাকি পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রাম-নামগুলির সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য এলাকার পল্লী-নামের বিশেষ সাদৃশ্য নেই আর, স্থানীয় ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী জলপাইগুড়ি জেলায় মৌজার (এবং সেই সঙ্গে গ্রাম-নামের) সংখ্যা যথেষ্ট নয়। প্রধানতঃ এই কারণে, সে-জেলা ত্বটির গ্রাম-নাম অল্পক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হবে। গোবিন্দপুর নামটির সংখ্যা উত্তর, রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গে কত তা এখানে নির্ণয় না করে, কৃষ্ণ-নামাশ্রিত যাবতীয় পল্লী-নামের জেলাওয়ারি ভাগ উল্লেখ করবার পর সামগ্রিকভাবে তা করা বেশী সমীচীন হবে। তাতে, পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী অধিকতর সংখ্যক নমুনা বা 'লার্জ স্যাম্পল'-এর ভিত্তিতে যে সব সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হব, তাদের নির্ভুলতা আপেক্ষিক-ভাবে বাড়বে।

প্রসঙ্গতঃ, গোপালপুর বা গোবিন্দপুর নামের সব পল্লীকেই সমান গুরুত্বের মনে করা ভুল হবে। সেজন্য, সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর খুব বড় (অর্থাৎ, ৩ হাজারের বেশী জন-অধ্যুষিত) গ্রামগুলির জেলা ও থানা-ওয়ারি অবস্থান নির্দেশ করা এখানে সমীচীন। যথা, গোপালপুর (৭টি) (২৪-পরগনা : রাজারহাট ও হাড়োয়া/মেদিনীপুর : মহিষাদল/বর্ধমান : কাঁকসা / মালদহ : মানিকচক / জলপাইগুড়ি : মাদারিহাট /কোচবিহার : কোচবিহার) এবং গোবিন্দপুর (৪টি) (২৪-পরগনা : মহেশতলা / হাওড়া : জগৎবল্লভপুর / নদীয়া : শান্তিপুর ও হাঁসখালি)। অনুরূপ সংযোজন অন্য জনপ্রিয় গ্রাম-নামগুলির ক্ষেত্রেও করা হবে।

কৃষ্ণ-অভিধাশ্রিত তৃতীয় গ্রাম-নাম গোপীনাথ-পুর (মোট ৬৫), যার জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-৩০, বাঁকুড়া-১০, বর্ধমান-৫, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর-৩ করে, ২৪-পরগনা, নদীয়া ও মালদহ-২ হিসাবে এবং হাওড়া ও হুগলি প্রতিক্ষেত্রে ১। এ-নামটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—মোট সংখ্যার গুরুতর হ্রাস যার ফলে, প্রাচুর্যের বিচারে এটির গুরুত্ব পুরোগামী আর ত্বটি নামের প্রায় অর্ধেক বা তারও কম। সংশ্লিষ্ট পল্লীগুলি যে এ-রাজ্যের ১৫টি জেলার মধ্যে ১২টিতেই অল্পাধিক সংখ্যায় বিদ্যমান, তা নামটির ব্যাপক জনপ্রিয়তা সমর্থন করে। এই শ্রেণীতে খুব বড় গ্রাম (অর্থাৎ, ৩ হাজারের বেশী জন-অধ্যুষিত) ৩টি (নদীয়া : তেহট্ট / মুর্শিদাবাদ : বেলডাঙ্গা / বর্ধমান : দুর্গাপুর)।

এই পর্যায়ের চতুর্থ নাম—কৃষ্ণপুর (মোট ৫৬টি), যার জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-১৩, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুর-৬ করে, ২৪-পরগনা-৫, হুগলি ও মালদহ-৪ হিসাবে, বীরভূম, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ প্রতিক্ষেত্রে ৩, পুরুলিয়া-২ এবং কোচবিহার-১। এটিরও প্রাপ্তিস্থান ১২টি

জেলায় বিস্তৃত। তবে আশ্চর্যের বিষয়, কৃষ্ণের মূল নামানুসারী হলেও এই অভিধা-আশ্রিত গ্রাম-নামের সংখ্যা গোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ থেকে উদ্ভূত নামগুলির তুলনায় অনেক কম। এই দলে খুব বড় গ্রাম (জনসংখ্যা ৩ হাজারের বেশী) ৪টি (২৪-পরগনা : রাজারহাট / মুর্শিদাবাদ : লালগোলা / মালদহ : কালিয়াচক / কোচবিহার : তুফানগঞ্জ)।

পঞ্চম নামটি মাধবপুর (মোট ৫৩টি), যার জেলাওয়ারি ভাগ—মেদিনীপুর-২০, বাঁকুড়া-৯, ২৪-পরগনা-৭, পশ্চিম দিনাজপুর-৫, হুগলি-৪, বর্ধমান-৩, পুরুলিয়া-২, হাওড়া, বীরভূম ও নদীয়া-১ করে। এটির ব্যাপকতার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সীমিত। কেননা, নামগুলি মাত্র ১০টি জেলা থেকে সংগৃহীত ; মুর্শিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংয়ে এ-নামের কোন গ্রাম নেই। পশ্চিম দিনাজপুরে, কিছুটা বিস্ময়করভাবে, ৫টি নাম থাকলেও, উত্তরবঙ্গের অন্যত্র, মায় দক্ষিণবঙ্গের উত্তরাংশের মুর্শিদাবাদেও, পল্লী-নামটির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থেকে এ-সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে, নামটি উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রিয় নয়। এ-শ্রেণীতে খুব বড় গ্রাম একটিও নেই।

ষষ্ঠ নাম শ্যামপুর-এর (মোট ৫২টি) জেলাওয়ারি অংশ—মেদিনীপুর-১৩, বাঁকুড়া-১০, পুরুলিয়া-৯, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৫ করে, হুগলি-৩, বর্ধমান ও মালদহ-২ হিসাবে এবং হাওড়া, বীরভূম ও ২৪-পরগনা প্রতিক্ষেত্রে ১। নামটির পরিসরক্ষেত্র সংকীর্ণ নয়—১১টি জেলায় বিস্তৃত। কৃষ্ণের বিকল্প নাম শ্যাম গ্রাম-বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় হলেও, এ-নামের মোট ৫২টি পল্লী যার ১টি মাত্র ২৪-পরগনায় এবং কৃষ্ণ-উপাসনার লীলাভূমি নদীয়ায় তাও নয়—বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বস্তুতঃ, কৃষ্ণঘটিত যাবতীয় জনপ্রিয় গ্রাম-নামের সংখ্যার ক্ষেত্রে নদীয়ার স্থান এতই কম যে, পরে এ-বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব। এই পর্যায়ে খুব বড় গ্রাম আছে ২টি (২৪-পরগনা : মগরাহাট/ হুগলি : পুরশুড়া)।

সপ্তম নাম কৃষ্ণনগর-এর (মোট ৫০টি) জেলাভিত্তিক অংশ—মেদিনীপুর-২০, বাঁকুড়া-৯, ২৪-পরগনা-৭, হুগলি ও নদীয়া-৩ করে, বীরভূম ও পশ্চিম দিনাজপুর-২ হিসাবে এবং হাওড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ-১টি করে। জনপ্রিয় (অর্থাৎ, ২৫ বা তদূর্ধ্বসংখ্যক) গ্রাম-নামের আলোচনা প্রসঙ্গে 'নগর' অন্ত্য-পদটি এই প্রথম পাওয়া গেল। বস্তুতঃ, এই পরিচ্ছেদে হিন্দু-মুসলিম ধর্মজগৎ থেকে আহৃত মোট যে ৫১টি পল্লী-নাম আলোচিত হবে, তার মধ্যে ৪৭টিরই অন্ত্য-পদ 'পুর', বাকি মাত্র ৪টির 'নগর'। এ ছাড়া অন্য অন্ত্যাংশ একেবারেই নেই। 'কৃষ্ণনগর' নামটির আহরণক্ষেত্র যে ১১টি জেলায় বিস্তৃত তা তার সুপরিসর প্রভাব-পরিমণ্ডল সূচিত করে। কিন্তু নামটি সবক্ষেত্রেই যে দেব-নাম থেকে উদ্ভূত এমন নাও হতে পারে। গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণঘটিত কোন নামধারী হলেও এ-রকম হওয়া সম্ভব। উপরের জেলাওয়ারি তালিকায় কৃষ্ণনগর নামটি কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে সৃষ্ট—না, স্থানীয় কোন কৃষ্ণ-বিগ্রহ থেকে উদ্ভূত তা সরজমিন অনুসন্ধানসাপেক্ষ। বস্তুতঃ, এই প্রবন্ধে আলোচিত গোপালপুর, গোবিন্দপুর, গোপীনাথপুর প্রভৃতি ১৩টি কৃষ্ণঘটিত গ্রাম-নামের সব কয়টিই যে কৃষ্ণ-ঠাকুরের নাম থেকে উৎপন্ন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পল্লীনামে ব্যক্তি-নাম আরোপের নিদর্শন আগেও কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে ; এখানেও, সংক্ষেপে, আর কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা, চক ব্রজলাল মল্লিক (নদীয়া : করিমপুর), চক রাধা দাসী (হাওড়া : শাঁকরাইল), বিশ্বনাথ দত্তের চক (মেদিনীপুর : সুতাহাটা), হাট সাদি খাঁ (কোচবিহার : মেখলিগঞ্জ), ফ্রেজারনগর (মুর্শিদাবাদ :

রঘুনাথগঞ্জ), প্রাণ মজুমদার (কোচবিহার : হলদিবাড়ি), মানিক কুণ্ডু (মেদিনীপুর : চন্দ্রকোণা), মুনু বৈরাগী (দার্জিলিং : শিলিগুড়ি) প্রভৃতি। আদ্য ও অন্ত্য-পদ বর্জিত শেষ তিনটি নাম যে গ্রাম-নাম তা বিশ্বাস করতেই দ্বিধা হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সেজন্য, আলোচ্য কৃষ্ণনগর বা দেবতাসম্পর্কিত অন্যান্য গ্রাম-নামের কোন্‌গুলি ব্যক্তি-নাম থেকে এসেছে বা আসেনি তা নির্ণয় করা এক চিত্তাকর্ষক সরজমিন অনুসন্ধানের বিষয়। এই দলভুক্ত ৪টি খুব বড় গ্রামের অবস্থান —২৪-পরগনা : মহেশতলা ও সাগর/মেদিনীপুর : খেজরী / হুগলি : জাঙ্গিপাড়া।

অষ্টম নামটি শ্যামসুন্দরপুর (মোট ৪০টি), যার জেলাওয়ারি হিস্যা—মেদিনীপুর-২১ (অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী), বাঁকুড়া-৮, বর্ধমান-৬, হুগলি ও পুরুলিয়া-২ করে এবং ২৪-পরগনা-১। মাত্র ৬টি জেলায় সীমাবদ্ধ এ-নামের জনপ্রিয়তার পরিসর যে বেশ সংকীর্ণ তা সহজেই চোখে পড়ে। মেদিনীপুরের সিংহভাগ (এক্ষেত্রে ততোধিক কিছু) যদিও বা খুব অপ্রত্যাশিত মনে হয় না, তবু ২৪-পরগনায় এ-নামের মাত্র ১টি গ্রামের অস্তিত্ব বিস্ময়কর। অন্যান্য জেলার বেলায় তারতম্য অবশ্য বিশেষ কিছু অস্বাভাবিক নয়। খুব বড় গ্রাম একটিই আছে এ-শ্রেণীতে যেটি বর্ধমানের ফরিদপুর থানায় অবস্থিত।

নবম নাম গোপালনগর-এর (মোট ৩৮টি) জেলাভিত্তিক ভাগ—মেদিনীপুর-৮, ২৪-পরগনা-৭, হুগলি-৫, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ-৪ করে, বাঁকুড়া-৩, বর্ধমান, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-২ হিসাবে এবং পুরুলিয়া-১। বর্তমান প্রসঙ্গে, 'নগর'-অন্ত নামের এটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবং বোধ করি সেই কারণে, সংখ্যার বিচারে, গোপালপুর-এর (১৪২টি) অনেক পিছনে। নামটির মোট সংখ্যা কম হলেও গ্রামগুলি যে ১০টি জেলায় ছড়ানো তা লক্ষণীয়। এই নামের খুব বড় গ্রাম আছে ২টি (মেদিনীপুর : পাঁশকুড়া / হুগলি : সিঙ্গুর)। *

* এই প্রবন্ধটি লেখকের 'পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম' শীর্ষক আসন্নপ্রকাশ গ্রন্থের অংশবিশেষ।—সম্পাদক

সমালোচনা

অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা : রাধারমণ চৌধুরী। প্রকাশক : কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। (মহালয়া-১৩৮৫), পৃঃ ১০+১৬+১৭২, মূল্য : দশ টাকা।

'নিবেদন'-এ প্রকাশকের উক্তি—'প্রবর্তক পত্রিকার ১৩৮১-র বৈশাখ থেকে ১৩৮২-র পৌষ পর্যন্ত ২১টি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধমালার সংকলিত গ্রন্থরূপ "অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা" শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় আজ প্রকাশিত হল'।—নিবন্ধমালা সমাপ্ত করার পরের মাসেই লেখক ('প্রবর্তক'-সম্পাদক) আকস্মিক দুর্ঘটনায় ঘোরতর অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করেন।

এই রচনাগুলি সম্পাদকীয় নিবন্ধরূপে বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও একই ভাবসূত্রে গ্রথিত। লেখক প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়ের ভাবদৃষ্টি বিশ্লেষণ করে সঙ্ঘের আদর্শ ও কার্যক্রমে কীভাবে তা রূপায়িত হয়েছে তার কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন। লেখক সঙ্ঘগুরুর শিষ্য ও আদর্শবাহী সহকর্মী। তিনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘগুরুর সাহচর্যলাভ করে তাঁকে অনুধ্যান করবার সুযোগ পাওয়ায়, উপরন্তু আমৃত্যু সঙ্ঘের সেবায় নিয়োজিত

থাকায়, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আলোকে প্রায় অর্ধশতাব্দীর সঙ্ঘসাধনার ইতিহাস আর তার মূলগত প্রেরণাকে তত্ত্বদৃষ্টিতে অনুধাবন আর বিশ্লেষণ করার অবকাশ পেয়েছেন। অভিজ্ঞ সম্পাদকের পরিশীলিত পরিণত বোধ ও ধৃতি বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

গ্রন্থটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম —'অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা'; একশো পৃষ্ঠাব্যাপী এগারোটি নিবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয়াংশ—'ততঃ কিম্'; বাহাত্তর পৃষ্ঠায় নটি প্রবন্ধ। প্রথমাংশে লেখক মুখ্যত ইতিহাসচেতনাযোগে দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুর আদর্শের তাৎপর্য আর সার্থকতা বিশ্লেষণ করেছেন; দ্বিতীয়াংশে সঙ্ঘগুরুর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয়ই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

লেখক সঙ্ঘগুরুর ভাবদৃষ্টি আর জীবনসাধনার মূলে অধ্যাত্মযোগ আর আর্থ-উদ্যোগের সমন্বয় অনুভব করেছেন। সঙ্ঘগুরুর ধর্মচেতনা জীবন-বিমুখ নয়। তিনি বৈদিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে অন্তর্মুখ উপাসনায় বিশ্বাসী; কিন্তু সেই সঙ্গে জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আর শক্তি অর্জনের জন্য অর্থকরী উদ্যোগ যে অবশ্য প্রয়োজন (বিশেষত এই বৈশ্যযুগে) এ কথা তিনি কেবলমাত্র আদর্শরূপে গ্রহণ বা প্রচার করেন নি, জীবনব্রতরূপে নিজে পালনও করেছেন। লেখক ব্যবসায়িকা বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবসায়যোগের এই আদর্শ বৈদিক বা ঔপনিষদ সাহিত্য, গীতা বা অন্য সাধনশাস্ত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় সাধক বা মনীষী, সেই সঙ্গে কোনো কোনো বিদেশী মনীষীর ভাবনার পটভূমিকায় পরিস্ফুট করে তুলেছেন। মননশীল পাঠক এই অংশে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান পাবেন।

দ্বিতীয়াংশে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ভাবনার স্পর্শ নিবন্ধগুলিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সঙ্ঘগুরুর ব্যক্তিসত্তার পরিচয় শ্রদ্ধাশীল পাঠকের কাছে উপাদেয় হবে। লেখক ভারতীয় সাধনধারার, বিশেষত বাংলার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধনাগত ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুকে স্থাপনা করে অধ্যাত্মসাধনক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত ব্যক্তিগত আবেগ-প্রবণতার জন্য এই অংশ তুলনায় অসংহত ও দুর্বল। ভারতীয় ধর্মসাধনধারার তাৎপর্য-বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। অবশ্য লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য সঙ্ঘগুরুর ধর্ম ও কর্ম-জীবনের মর্মোদ্ঘাটন—সে বিষয়ে তিনি সফল হয়েছেন।

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রীর 'ভূমিকা'টি মূল্যবান্। 'প্রস্তাবনা'য় শ্যামাদাস দে লেখকের এবং গ্রন্থের বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন। মুদ্রণাদির পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

(ক) ত্রিপুরায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক গত এক মাসে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরিত হইয়াছে। ২৫শে জুন, ১৯৮০ হইতে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত আগরতলা, উদয়পুর ও ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় ২৬টি শরণার্থী-শিবিরের মাধ্যমে ৪,৬৭৪টি ধুতি ও শাড়ি, ৯,৭৭৯টি সার্ট ও প্যান্ট, ৫,৭৮১টি বাসনপত্র, ১,১৪৭টি বাঁশের চাটাই, ৩,৩০১টি পুরাতন বস্ত্রাদি, ১,১৭৮টি পশমী কম্বল, ৪০৫টি লণ্ঠন ও ৮৬টি স্টীল ট্রাংক ৫,০৯৪টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৪,৭০০ ছেলেমেয়ে ও আহত বয়স্ক ব্যক্তিদের

দুধ, পাউরুটি, ফল ও মিষ্টান্ন এবং প্রায় ৫০০ পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধপত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। প্রায় ৫০টি গ্রাম হইতে চলিয়া-আসা মানুষের ২৬টি শরণার্থী-শিবিরে মিশনের কর্মীরা বর্তমানে ত্রাণকার্যে নিযুক্ত আছেন। (২৯.৭.৮০'র সংবাদ)

(খ) খেতড়ি (রাজস্থান)—খরাত্রাণ : ঝুনঝুনু জেলার ববাই, পপুর্ণা, বাঘোর, তিহাডা, বিব্বা, শ্যামপুরা, জসরাপুর প্রভৃতি গ্রামের খরাপীড়িত ১০৯২টি গোরু ও ৫১৮টি বাছুরের জন্য মিশন কর্তৃক মোট ৬টি বিতরণকেন্দ্রের মাধ্যমে ১লা জুন, ১৯৮০ হইতে ১২ই জুলাই, ১৯৮০ পর্যন্ত মোট ৮৮২ কুইণ্ট্যাল, ৩০ কিলোগ্রাম পশুখাদ্য বিতরিত হইয়াছে। ইহাতে তেত্রিশ হাজার টাকারও বেশী ব্যয় হয়। দৈনিক প্রতিটি গোরু ও বাছুরের জন্য বিতরিত খাদ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কিলো ও ৬ কিলো। দরিদ্র ব্যক্তিদের গোরু-বাছুরের জন্য মোট ৩৫২টি রেশন কার্ড দিয়া এই বিতরণকার্য সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে, রাজস্থানে এই ধরনের সংগঠিত ও সুপরিচালিত খরা-ত্রাণকার্য এই প্রথম।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের বিষয়, **স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ** (হীরেন মহারাজ), গত ১৯শে জুন ১৯৮০, বেলা ১-১০ মিনিটে (সিঙ্গাপুর সময়) সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর। শ্বাসকষ্ট, উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত ১২ই জুন ১৯৮০, তাঁহাকে উক্ত হাসপাতালের 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট'-এ ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার শুরুতে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও বহুমূত্র, নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ এবং বৃক্ক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার দেহান্ত হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৪ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩০ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কলম্বো এবং সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রেঙ্গুন সোসাইটি, অদ্বৈত আশ্রম (মায়াবতী ও কলিকাতা), মাদ্রাজ স্টুডেণ্টস্ হোম এবং বেলুড় মঠে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরল ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ২২শে এপ্রিল ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ১০ই মে .৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখেছি, ঠাকুর কেশবের সঙ্গে স্টীমারে ক'রে গঙ্গাবক্ষে বিহার ক'রে এসেছেন। ব্রাহ্মদের নববিধানসমাজের ভক্তদের সঙ্গে তিনি সেদিন (২৭শে অক্টোবর, ১৮৮২) খুবই আনন্দে কাটিয়েছেন।

পরদিন আমরা দেখছি মাষ্টারমশাই ব্রাহ্ম-ভক্তদের একটি মহোৎসবের উল্লেখ করছেন, যাতে ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এবং তিনিও তাতে সানন্দে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন তিনি যাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তাঁরা সাধারণ-

ব্রাহ্মসমাজের লোক। শিবনাথ শাস্ত্রী এঁদের মধ্যে প্রধান। এঁরা কেশবের সমাজ থেকে পৃথক্ হয়ে গেছেন কেশবের মেয়ের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই দলভুক্ত। এই সমাজেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেণীমাধব পালের বাগানবাড়ীতে উৎসবের আয়োজন হয়েছে।

ঠাকুর কিভাবে আসছেন, কিভাবে ব্রাহ্মভক্তরা তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন—এ সব বর্ণনা মাষ্টার-মশাই অপূর্ব ভাষায় করেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে ঠাকুরের আগমনের প্রসঙ্গে মাষ্টারমশাই সকলের মনের ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন, 'সকলেই যেন ভগবদ্দর্শন-পিপাসু।' এই যে মনের পিপাসা এটি লক্ষণীয়। ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা—এটি ভক্তের হৃদয়ের ঐকান্তিকতার প্রতীক। তাঁদের প্রাণের আগ্রহ মিটানোর জন্যই যেন ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

এই পরিচ্ছেদে (১।৩।১) মাষ্টারমশাই ঠাকুরকে 'মহাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এটা ব্রাহ্মভক্তদের উৎসব-প্রসঙ্গে লেখা। ব্রাহ্মভক্তরা অবতারতত্ত্ব বিশ্বাস করেন না। তাঁরা ঠাকুরকে 'মহাপুরুষ' বলেই গ্রহণ করতেন।

ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাঁর আনন্দমূর্তিতে নিবদ্ধ হল। অপূর্ব উপমা-সহায়ে মাষ্টারমশাই বলছেন: যতক্ষণ মঞ্চের ড্রপসিন না উঠছে ততক্ষণ সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যেই ড্রপসিন উঠে যায়, অমনি সকলে সব কাজ-কথা ফেলে দিয়ে একদৃষ্টে নাট্যরঙ্গ দেখতে থাকে। আরও একটি সুন্দর উপমা দিচ্ছেন: মৌমাছি ফুলের মধু খেতে ভালবাসে। নানা ফুলে সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পদ্মফুল পেলে অন্য সব ফুল ছেড়ে দিয়ে পদ্মফুলেরই মধু পান করে। সেই 'পদ্মমধু' যিনি বিতরণ করবেন, তিনি এসেছেন। তাই ভক্তমধুপদল অন্য সব রস পরিত্যাগ ক'রে উল্লসিত হয়ে ছুটে এসেছেন তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত সেই মধু পান করবার জন্য। (১।৩।১)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামমাহাত্ম্য আর ভক্তির কথা আছে। তাই এটি আরম্ভ হচ্ছে গীতার এই শ্লোকটি দিয়ে—

> মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
> স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
> (১৪।২৬)

—[শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন:] 'আমাকে যে অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বারা সেবা করে, সে গুণত্রয় অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে।' ঠাকুর এখন কি বলবেন, মাষ্টারমশাই এইভাবে তারই আভাস দিয়েছেন।

ঠাকুর বলছেন, 'এই যে শিবনাথ! দেখ, তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয় হয় ত তার সঙ্গে কোলাকুলিই করে।'

নারদভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে, 'তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ' (সূত্র ৪১) অর্থাৎ, ভগবান আর তাঁর ভক্তের মধ্যে ভেদ নেই। ভগবানের ভক্ত ভগবানেরই মতো। এই কথাটাই ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, 'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন।' ভাগবতেও আছে, শ্রীহরি দুর্বাসা ঋষিকে বলছেন—

> অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
> সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
> (৯।৪।৬৩

—'হে ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তের অধীন। সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য; ভক্তজন আমার প্রিয়, সাধু-ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করেছে।' কাজেই ঠাকুর যা বলছেন—ভক্তের স্বভাবের কথা—সেটি প্রণিধানযোগ্য। ভক্তদের দেখলে এইজন্যই তাঁর আনন্দ হতো। এইটি তিনি হাস্য-পরিহাসের

মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

দক্ষিণেশ্বরে অনেকে ঠাকুরের কাছে যেতো। ঈশ্বরে মন নেই দেখলে ঠাকুর তাদের কালীবাড়ীর 'বিল্ডিং' দেখতে পাঠিয়ে দিতেন। ভগবানের কথা শুনতে সকলের ভাল লাগে না। কাদের ভাল লাগে না, সে কথা শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলছেন—যারা 'পশুঘ্ন'। যারা পশুহত্যা ক'রে মনটাকে পাথরের মতো ক'রে ফেলেছে, সেই কসাই ছাড়া আর কেউই ভগবানের অমৃতময়ী কথা শুনতে অপছন্দ করবে না। একমাত্র এই রকম স্বভাবসম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোকই ভগবৎ-কথা শুনতে ভালবাসে না। ঠাকুর বলছেন, এই ধরনের 'হাবাতে' লোক ভক্তদের সঙ্গে তাঁর কাছে এসে কিছুক্ষণ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে অধৈর্য হয়ে উঠে পড়তো, বিরক্ত হয়ে শেষে নৌকায় গিয়ে বসতো!

তাহলে সংসারী লোকদের উপায় কি? ঠাকুর বলছেন, "সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর-নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি-বোল।' প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনাম-সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই; 'যুবতী মেয়ে' কিনা—পৃথিবী। 'যুবতী মেয়ের কোল কিনা'—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি।"

মহাপ্রভুর যুগে এই সহজ ধর্ম দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সে সময় সাধারণ মানুষ মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল। কারণ, তাদের ধর্মও খুবই সহজ ছিল। সে ধর্মে বলা হয়েছে, আল্লাকে বিশ্বাস করো, আর বলো মহম্মদ রসুল বা তাঁর প্রেরিত পুরুষ। সেযুগে ধর্মের নামে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তান্ত্রিক ধর্মের নানান আচার-অনুষ্ঠানে একটা তামসিকতা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঘৃণিত, অবহেলিত হচ্ছিল—সাধারণ পূজা-অনুষ্ঠানাদিতে তাদের কোন স্থান ছিল না। মহাপ্রভু এই সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মের গ্লানি দূর করতে এসেছিলেন। তিনি আপামর জনসাধারণকে কম্বুকণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেন—হরি বলো, হরিনাম করো। একবার হরিনাম করতে পারলেই তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে। 'মুচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে॥' কাজেই হরিনাম করো। এই শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দ এই হরিনাম কোন রকমে করিয়ে নিতে চাইতেন। তাই ঐ আপাত-প্রলোভনের আয়োজন।

এই হরিনামের মাহাত্ম্যের কথা ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছেন, 'যেমন কেউ বাড়ির কার্নিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে বাড়ি ভূমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল।'

কথাটা এই যে, হরিনাম অমোঘ, কিন্তু অনুরাগ না থাকলে দেরীতে ফলপ্রসূ হয়—যে-কথা ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, 'নামের খুব মাহাত্ম্য আছে বটে, তবে অনুরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়া দরকার। শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে তাতে কি হয়?' শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলছেন, 'ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ'—যাঁদের মন সাম্যে স্থিত, তাঁরা এই জীবনেই সংসারকে জয় করেছেন। সুতরাং লক্ষ্য হবে যে, এই জীবনেই যেন আমরা নামের অমোঘ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

এরপর ঠাকুর বলছেন, 'যেমন সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে ; তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে।' এই তিন গুণ সম্বন্ধে এখানে একটু আলোচনা করা দরকার। সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় থাকে। তারপরে কোনক্রমে পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, যদিও সে সংস্পৃষ্ট হয় না, কিন্তু প্রকৃতি তার দ্বারা কার্যকরী হয়ে উঠে। প্রকৃতির মধ্যে বিকার সৃষ্টি হয়। এই বিকারের ফলে প্রথমে সৃষ্টি হয় বুদ্ধির। এ বুদ্ধি বিশ্বাত্মক বুদ্ধি, এর নাম 'মহৎ'। মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে মন, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তন্মাত্রার সৃষ্টি হয়। তন্মাত্রা হচ্ছে —শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের সৃষ্টি হয়। এবং এইগুলি মিলে এই জগৎকে সৃষ্টি করে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে এই তিনটি গুণ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন জিনিসে কোন কোন গুণ প্রধান—যেটা দেখেই আমরা বলি যে, এটা হচ্ছে সত্ত্বগুণী, এটা হচ্ছে রজোগুণী, এটা হচ্ছে তমোগুণী। এই বিভাগ অনুসারেই ঠাকুর পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেছেন।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের বাহ্যিক প্রকাশ কিরকম তা ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছেন ; 'সংসারীর সত্ত্বগুণ কি রকম জান ? বাড়িটি এখানে ভাঙ্গা ওখানে ভাঙ্গা—মেরামত করে না। ঠাকুরদালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওলা পড়ছে হুঁশ নাই।...লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, অমায়িক ; কারু কোনও অনিষ্ট করে না।'

ভাঙ্গা বাড়ি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন—এ থেকে আমরা যেন মনে না করি যে, বাড়ি ঐরকম নোংরা করেই রাখতে হবে। তা নয়। কিন্তু সত্যি-সত্যিই যদি কোন মানুষ ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে যান, শুদ্ধ সত্ত্ব অন্য কিছুই যদি তাঁতে না থাকে, তাহলে তিনি বাড়ির দিকে মন দেওয়া তো দূরের কথা নিজের শরীরের দিকেও মন দিতে পারেন না।

এরপর ঠাকুর সংসারীর রজোগুণ ও তমোগুণ এবং ভক্তির সত্ত্ব ও রজোগুণের কথা বলেছেন। ভক্তির তমোগুণের কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে এসেছে।

নারদভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে, 'গৌণী ত্রিধা গুণভেদাৎ, আর্তাদিভেদাৎ বা।' (৫৬)। অর্থাৎ, যেটি রাগানুগা, প্রেমা বা মুখ্যা ভক্তি নয়—যেটি গৌণী ভক্তি বা বৈধী ভক্তি, তার মধ্যে তিনটি ভেদ রয়েছে, 'গুণভেদাৎ'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের ভেদবশতঃ ; 'আর্তাদিভেদাৎ বা'—অথবা আর্তাদিভেদবশতঃ। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান বলছেন—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

(৭।১৬)

অর্থাৎ, চাররকমের মানুষ আমাকে ভক্তি করে। যে আর্ত, বিপন্ন, সে বলে 'হে ভগবান, আমার পুত্র পীড়িত তাকে নিরাময় কর ; সংসারে অভাব, তুমি সেই অভাব মোচন করো—রক্ষা করো ভগবান, রক্ষা করো।' যে জিজ্ঞাসু, সে ভাবে—এই জগতে সকলেই ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলছে, এর থেকে নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় আছে কি ? শান্তির কোন পথ আছে কি, এই তার জিজ্ঞাসা। যে অর্থার্থী সে বলে, 'ভগবান, আমাকে মান, যশ, অর্থ দাও।' চণ্ডীতে যেমন আছে, 'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'—'হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ করো' ইত্যাদি। শুধু দাও দাও।

নারদ এই তিন রকমের ভক্ত নিয়েছেন। সেইজন্য 'ত্রিধা' বলেছেন, কারণ ঐ সূত্রে তিনি গৌণী ভক্তিরই বিভাগ দেখাচ্ছেন। 'জ্ঞানী'কে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা শ্রীভগবান বলছেন,

'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে।' জ্ঞানী কে? না—যিনি সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত আর যাঁর ভক্তি ঐকান্তিক অর্থাৎ গৌণী ভক্তি নয়, মুখ্যা ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি। 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।' 'জ্ঞানী আমারই স্বরূপ', শ্রীভগবান বলছেন।

ঠাকুর এখানে গুণত্রয়ভেদে ভক্তির ভেদ দেখিয়েছেন, নারদ যা 'গুণভেদাৎ' বলে উল্লেখ করেছেন। এতে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে, তামসিক ভক্তি হচ্ছে নীচু স্তরের ভক্তি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এর পরের পরিচ্ছেদে কথাপ্রসঙ্গে তামসিক ভক্তিকে একটু উঁচু স্থান দিয়েছেন। (১।৩।২)

গীতা—

আগের দিন আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন [৪।১৯ শ্লোকে] যে, কর্মে অকর্মদর্শন-রূপ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা যাঁর সমস্ত কর্ম দগ্ধ হয়েছে, জ্ঞানীরা তাঁকেই পণ্ডিত বলেন।

সেই যথার্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীভগবান আরও বলছেন: "তিনি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, নিত্যতৃপ্ত, নিরবলম্বন, কর্ম করেও কিছুই করেন না; তিনি নিষ্কাম, সমস্ত-পরিগ্রহত্যাগী, তাঁর মন, ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহ সংযত—তিনি 'শারীর' কর্মই করেন এবং তাঁকে পাপ স্পর্শ করে না।"

কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করেছেন বলে তিনি 'নিত্যতৃপ্তঃ'—সর্বদা সন্তুষ্ট; 'নিরাশ্রয়ঃ'—নিরবলম্বন—কারোর উপর নির্ভর ক'রে তিনি কিছুই করেন না। তিনি জানেন, তাঁর যে কর্ম তা তাঁর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কাজেকাজেই তিনি আপাতদৃষ্টিতে কর্ম করছেন মনে হলেও তিনি কর্ম করছেন না সত্যি-সত্যিই। তিনি 'নিরাশীঃ'—তাঁর কোন আশা নেই—কোন কামনা নেই। তিনি 'যতচিত্তাত্মা'—তাঁর চিত্ত ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, সেইজন্য তিনি 'ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ'—অন্যের কাছ থেকে তিনি কোন পরিগ্রহ করেন না। 'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং'—শরীরের যেকর্ম সেটা আপনা হতেই হয়ে যাচ্ছে, তাতে তিনি মনেও করেন না যে, তিনি এটা-ওটা করছেন। অহংত্ব ও মমত্ব-বর্জিত হয়ে তিনি কর্ম করছেন। এইরকম করে যদি কর্ম করা যায় তাহলে কেউ পাপের দ্বারা বিদ্ধ হয় না। (৪।২০-২১)

জ্ঞানী কর্মীর আরও পরিচয় শ্রীভগবান দিচ্ছেন: 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ'—যেমন আসছে আপনা থেকে—কেউ দিল নিলাম, না দিল তাতেও ক্ষোভ নেই। সংসারে কিছু পাচ্ছি ভাল, না পাচ্ছি তাতেও দুঃখ নেই—যতটুকু জুটছে তাতেই সন্তুষ্ট; 'দ্বন্দ্বাতীতঃ'—এরকম মনের অবস্থা যে, সুখ হচ্ছে, ভাল; দুঃখ হচ্ছে তাও ভাল, গরম হচ্ছে, ভাল; শীত হচ্ছে সেও ভাল। সব দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তিনি। 'বিমৎসরঃ'—মাৎসর্যবর্জিত, নির্বৈর তিনি। সিদ্ধি-অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান—এ সবে সমান বুদ্ধি তাঁর। তিনি কর্ম করলেও বন্ধনে পড়েন না। (৪।২২)

এইভাবে কর্ম করাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের জন্য কর্ম করা বলছেন। যেটা নিজের জন্য করা হয়, সেটা যজ্ঞ নয়। কিন্তু দেবতার জন্য, অন্য প্রাণীর রক্ষার জন্য—যা কিছু করা যায়, সবই যজ্ঞ। বৈদিক যাগযজ্ঞের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে এখানে সেটি তিনি বলছেন না। যজ্ঞের সংজ্ঞাটা একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, যে-কোন কর্ম করা যাক না কেন, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান ক'রে, কোনরকম ফলের ইচ্ছা না ক'রে, যা কিছু করা যায় তাই হচ্ছে যজ্ঞ। এই যজ্ঞ নানান রকমের হতে পারে। তার আগে বলে নিচ্ছেন 'গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥'—যিনি আসক্তিশূন্য, কামনা না থাকায় যিনি মুক্ত, জ্ঞানে যাঁর চিত্ত অবস্থিত, তিনি যজ্ঞের জন্য কর্ম করলে তাঁর সমগ্র

কর্মই বিলীন হয়। গীতায় 'জ্ঞান' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ; তা পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। এখানে জ্ঞান বলতে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধির জ্ঞানকেই বোঝাতে চেয়েছেন, অনুভূতির জ্ঞানকে নয়। কারোর যদি নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যায়, তার আর কোন কর্ম থাকে না। কিন্তু তার পূর্বে বুদ্ধিতে এই বিচার আনা যায় যে, সব কিছু এক। বার বার সাধনের দ্বারা বুদ্ধিতে এটা দৃঢ়ীভূত করা যায় যে, এই যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সব রয়েছে, তত্ত্বতঃ এরা একই। আর ঐ যে-কথাটি 'আত্মা মরেনও না, মারেনও না, ইনি অবিনশ্বর শাশ্বত সনাতন'—সেটা যখন আমি বুঝতে পারব সেই হল আত্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান—বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলছেন বুদ্ধিকে ঐ আত্ম-সম্পর্কিত জ্ঞানে অবিচলিত রেখে 'যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম' —যজ্ঞের জন্য কর্মানুষ্ঠান করা, নিজের জন্য নয়—এইভাবে কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির শেষে সমস্ত কর্ম চলে যায়, থাকে শুধু জ্ঞান। যে-জ্ঞানটাকে এখন আমরা বুদ্ধিতে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি, এবং তার সঙ্গে কর্মও করার চেষ্টা করছি, সেই কর্ম চলে যাবে, চলে গিয়ে কেবলমাত্র অনুভূতি থাকবে সেই এক ব্রহ্মের। (৪।২৩)

সমস্ত কর্মটি যদি যজ্ঞবুদ্ধিতে করি, তাহলে যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুতেই ব্রহ্মবুদ্ধি আনতে হবে। প্রথমেই শ্রীভগবান বলছেন, আহুতি দেওয়ার যে-হাতা সেটি ব্রহ্ম, যে-হবি দিয়ে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেটি ব্রহ্ম, যে-অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেটিও ব্রহ্ম। যিনি আহুতি দিচ্ছেন, তিনি কে ? তিনিও ব্রহ্ম। 'হুতম্'—যে-হোমরূপ কর্ম সেটিও ব্রহ্ম। এই বুদ্ধিতে যজ্ঞ করলে কি হবে ? না—সেই ব্রহ্ম-বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হবেন। এই ভাবকে আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মে আনতে হবে। (৪।২৪)

কোন কোন যোগী আছেন, যাঁরা ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন, তাঁদের প্রীতির জন্য। আবার কেউ কেউ এই সংসারের অধিষ্ঠানরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞ করে থাকেন। তিনি চিন্তা করেন—যা কিছু করছি সবই সেই ব্রহ্মেই সমর্পণ করছি। একে বলে জ্ঞানযজ্ঞ। (৪।২৫)

অন্য কোন কোন যোগী আবার সংযমরূপ অগ্নিতে তাঁদের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে আহুতি দেন। অর্থাৎ সংযত হন। আমার চোখকে কু-দৃশ্য দেখতে দেব না, কর্ণকে কু-কথা শুনতে দেব না, ইত্যাদি। এই যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা এটাও যজ্ঞ। এতে চিত্ত স্থির হবে। আবার অনেকে কি করেন ? না—ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে অর্থাৎ বিষয়কে আহুতি দিয়ে থাকেন। কোন জিনিস কামনা করছি তা নয়। শাস্ত্রবিহিত সমস্ত বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে নিবেদন করা হচ্ছে। এটিও একটি যজ্ঞ। (৪।২৬)

আবার এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কর্ম, প্রাণের কর্ম জ্ঞানশক্তি-প্রদীপিত যে আত্মসংযম সেই সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। এঁরা ধ্যাননিষ্ঠ। গভীর ধ্যানেতে এঁদের পঞ্চ-প্রাণ ও দশ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত কর্ম উপরত হয়ে যায়। (৪।২৭)

কোন কোন ব্যক্তি তীর্থে দান বা ইষ্টাপূর্ত কর্ম করেন—'অগ্নয়ে স্বাহা' ব'লে অগ্নিতে ঘৃত, তিল, যবাদি আহুতি দেন, এঁরা 'দ্রব্যযজ্ঞাঃ'। আবার যাঁরা শরীরকে শীর্ণ ক'রে চান্দ্রায়ণাদি কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তাঁরা 'তপোযজ্ঞাঃ'। 'যোগ-যজ্ঞাঃ' হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা রাজযোগের সাধন করেন। তাছাড়া স্বাধ্যায় করছেন কেউ কেউ। যেমন কেউ কেউ সংকল্প করলেন ১০৮ বার চণ্ডী-পাঠ করবেন। এই স্বাধ্যায় যদি কাম্য কর্ম হিসাবে

না হয়ে দেবীর প্রীতিকামনার জন্য হয়, তবেই সেটি স্বাধ্যায়যজ্ঞ হবে। যথাবিধি শাস্ত্রপাঠ করাই স্বাধ্যায়যজ্ঞ। আবার ঐ শাস্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থবোধ ও মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞ। এদুটি যাঁরা একসঙ্গে করেন সেই দৃঢ়ব্রত, যত্নশীল ব্যক্তিরাই 'স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ'। (৪।২৮)

তারপর শ্রীভগবান যাঁরা প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ করেন, তাঁদের কথা বলছেন। মানুষের শরীরে পঞ্চ-প্রাণ ক্রিয়াশীল। এদের মধ্যে প্রাণের গতি উপরের বা বাইরের দিকে আর অপানের গতি নীচের দিকে। এখানে বলা হচ্ছে 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং'—অপানবায়ুতে প্রাণবায়ুকে আহুতি দেওয়া হচ্ছে। কিভাবে? না—পূরকের দ্বারা। প্রাণ-বায়ুকে প্রশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিয়ে নীচের দিকে অপানবায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার 'প্রাণে অপানং জুহ্বতি'। কি রকম? না—ভিতর থেকে ঐ অপানবায়ুকে টেনে এনে প্রাণ-বায়ুতে আহুতি দিয়ে তাকে বের ক'রে দেওয়া হচ্ছে। এটি রেচক। আবার প্রাণ ও অপানবায়ুর গতিকে রুদ্ধ ক'রে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ক'রে রাখা হচ্ছে। এটি কুম্ভক। (৪।২৯)

আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁরা আহার সংযম ক'রে প্রাণবায়ুসমূহে অন্যান্য প্রাণবায়ু আহুতি দেন। শংকরাচার্য বলছেন, 'যে যে বায়ুকে তাঁরা জয় করেন, অন্যান্য বায়ুকে সেই সেই বায়ুতে আহুতি দেন। অর্থাৎ সেই অন্যান্য বিজিতবায়ুতে প্রবিষ্টের ন্যায় হয়ে যায়।'

এই যে এতগুলি যজ্ঞের কথা বলা হল, এই যজ্ঞগুলিকে যাঁরা জানেন এবং অনুষ্ঠান করেন তাঁরা সকলেই নিষ্পাপ হয়ে যান। (৪।৩০)

যেরকম যজ্ঞই হোক না কেন, তার শেষে যজ্ঞকারীরা অমৃত লাভ করেন। অর্থাৎ সনাতন যে ব্রহ্ম তাঁকেই লাভ করেন, যদি তাঁরা মুমুক্ষু হন। কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞ না করে, তাহলে এই জগতেই তার কিছু প্রাপ্তি হয় না—স্বর্গাদি অন্য লোক বা সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করা তো দূরের কথা। (৪।৩১)

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

ভদ্রেশ্বর সারদা পল্লীতে গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ ১৯৮০, সারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব পালিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা অভয়প্রাণা। সঙ্ঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন অধ্যাপক শ্রীশিশির দত্ত। এরপর ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও সভানেত্রী প্রব্রাজিকা অভয়প্রাণা। সভায় পল্লীর মহিলারা শ্রীশ্রীসারদা-মায়ের চরিত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন কুমারী পূর্ণা মুখার্জী, অমিতা সরকার, জয়ন্তী রায় ও লিলি দত্ত। সন্ধ্যায় শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের শিল্পীবৃন্দ 'ভক্ত-ভৈরব গিরীশ' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন। রাত্রে লিলুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' পরিবেশিত হয়। ১৬ই মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, ভজন-গান, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, কথামৃতপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ রামনাম-সংকীর্তন করেন। মধ্যাহ্নে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে ধর্ম-সভায় শ্রীজিষ্ণু ভট্টাচার্য, শ্রীপার্থ বিশ্বাস ও কুমারী অর্পিতা দাসগুপ্তা ভাষণ দেন। শ্রীভবতোষ দত্ত,

শ্রীশ্যামল দত্ত ও কুমারী লিলি দত্তের ভক্তি-সঙ্গীতের পর সভাপতি স্বামী উমানাথানন্দ ও স্বামী সর্বদেবানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতি ও ভজনের পর রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে 'রানী রাসমণি' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরলোকে

গভীর দুঃখের বিষয়, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) সহিত প্রায় পঁচিশ বৎসর ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট **সতীশচন্দ্র ঘোষ** গত ৩১শে মে ১৯৮০, সকাল ৯টা নাগাদ বনহুগলীতে স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন।

হুগলী জেলায় তারকেশ্বরের সন্নিহিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম নিলারপুরের এক জমিদার বংশে ১৯০৫ সালে সতীশচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা চারুচন্দ্র ও মাতা পঙ্কজিনী দেবী ধর্মপ্রাণ দম্পতী ছিলেন। ফলতঃ সতীশচন্দ্রের অন্তরে বাল্যকালেই ধর্মভাবের স্ফুরণ হয় এবং কুলদেবতা শ্রীধরজীউর প্রসাদ গ্রহণ না করিয়া তিনি কোন আহার স্পর্শ করিতেন না।

কলিকাতা টাউন স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেধাবী ছাত্র সতীশচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কিছুকাল জমিদারীর কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। প্রজাদের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। নিলারপুরস্থ বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি তৎকর্তৃক স্থাপিত এবং তাঁহারই প্রচেষ্টায় ঐ গ্রামে একটি 'সমবায়-সমিতি' ও 'সমবায়-ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান অদ্যাপি গ্রামের বহু লোকের কল্যাণ করিতেছে।

কলিকাতা 'মেয়ো' হাসপাতালের প্রধান হিসাবরক্ষক হিসাবে তাঁহার চাকুরীজীবনের সূত্রপাত। সুদীর্ঘকাল ঐ পদে সুনামের সহিত অধিষ্ঠিত থাকিয়া যথাসময়ে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণের পূর্ব হইতেই তিনি উদ্বোধন কার্যালয়ে সেবার কাজ করিতেন। অবসর গ্রহণের পর সম্পূর্ণভাবে ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অফিস-সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ, মুখ্যতঃ হিসাবরক্ষা, তিনি সেবাবুদ্ধিতে বহু বৎসর নিষ্ঠার সহিত করিয়া গিয়াছেন।

স্বল্পভাষী, শান্তস্বভাব, ভক্তিমান ও সেবানিষ্ঠ সতীশচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। জপধ্যান, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

গভীর দুঃখের বিষয়, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট **অমিয়কুমার বসু** গত ৩০শে জুন ১৯৮০, মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে দক্ষিণ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

১১ই নভেম্বর ১৯২০-তে তাঁহার জন্ম। পিতা রায় বাহাদুর ধীরেন্দ্রনাথ বসু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ফলে শৈশবেই অমিয়কুমার শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের দর্শনে ধন্য হন এবং তাঁহার অন্তরে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত হয়।

অমিয়বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন এবং বিলাতে অনারেবল সোসাইটি অব ইনার টেম্পলস হইতে ১৯৪৬ সালে ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি প্রতিভা ও বিদ্বত্তার জন্য প্রচুর সুনামের অধিকারী হন এবং কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র স্ট্যাণ্ডিং কাউনসেল হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন।

গত বিশ বৎসর যাবৎ অমিয়বাবু রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের মুখ্য কেন্দ্র বেলুড় মঠকে আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে অক্লান্তভাবে প্রভূত সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহান্তে বেলুড় মঠ একজন একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন। আমরা তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)— স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৩'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২'৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য ১৫'০০
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫'০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩'২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য ৫'০০

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৪৪, মূল্য ১'৫০

আচার্য শঙ্কর—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬'০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭'৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫ মূল্য ৪'০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬'৩৫

আরতি-স্তব— পৃঃ ৩১, মূল্য ০'৮০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী ভাবাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩'০০

মহাভারতের গল্প—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩'০০
৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষেপিত "দ্রুতপাঠ্য" সংস্করণ—পৃঃ ৭০, মূল্য ১'০০

শঙ্কর-চরিত — ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, মূল্য ২'৫০

দশাবতার-চরিত—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ১০৮, মূল্য ১'৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'২০

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য ৩'৫০

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৬৪, মূল্য ৫'০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪'০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭০, মূল্য ৫'০০

শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা — শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০'০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১'০০

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০'৭২

প্রকাশক ও প্রোপ্রাইটার : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 JULY 1980 Regd. No. WB/NC-19

৮০।৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

ভাদ্র ১৩৮৭
৮২তম বর্ষ
৮ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনা :—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

নিবেদন

বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিদ্যুৎ-পরিস্থিতির অভূতপূর্ব অবনতি ঘটায়, গত কয়েক মাস যাবৎ পত্রিকা বহু বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে। ফাল্গুন সংখ্যা ডাকে দেওয়া হয় ২৮শে ফাল্গুন: চৈত্র সংখ্যা ৩রা বৈশাখ: বৈশাখ সংখ্যা ৭ই জ্যৈষ্ঠ: জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ৭ই আষাঢ়: আষাঢ় সংখ্যা ১৭ই শ্রাবণ; শ্রাবণ সংখ্যা ১১ই ভাদ্র। এই বিলম্বের মূল কারণ হইল, বিদ্যুৎ সরবরাহে নিদারুণ ঘাটতির জন্য প্রেসের কাজ অত্যন্ত বিঘ্নিত হওয়ায় প্রেস নির্দিষ্ট দিনের বহু পরে ছাপার কাজ শেষ করিতেছে।

পত্রিকা বিলম্বে পাওয়ার জন্য গ্রাহকগণের নিকট হইতে আমরা প্রতিদিনই অভিযোগপত্র পাই। তাহাদের, লেখকদের তথা পাঠকদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু বর্তমান বিদ্যুৎ-সঙ্কটে আমরা নিরুপায়।

বিদ্যুৎ-পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই বিলম্বের কোনই প্রতিকার নাই।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ
সম্পাদক

২০শে ভাদ্র, ১৩৮৭

উদ্বোধন, ভাদ্র, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এইবাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা—১



৮২তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভাদ্র, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

আমার সঙ্কল্প এই : প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্প লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলি—যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই ঐগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই ; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্বসাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক, তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের এক মহান্ অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে। সংস্কৃত ভাষা যে কঠিন, তাহা তোমরা এই কথা বলিলেই বুঝিবে যে, আমি সারাজীবন ধরিয়া ঐ ভাষা অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি প্রত্যেক নূতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে। যাহাদের ঐ ভাষা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিবার অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা কিরূপ কঠিন হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারো। সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই-সকল তত্ত্ব শিক্ষা দিতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃতশিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় সং, ৫।১৮৬-৮৭]

কথাপ্রসঙ্গে

অধিকারিভেদে উপদেশ

কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্গনে আত্মীয়স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে ভাবিয়া অর্জুনের মনে শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, অর্জুন মহাবীর হইলেও ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুবর, জয়দ্রথের প্রতি শিবের বর এবং কর্ণের অমিত বিক্রমের কথা তাঁহার অবিদিত না থাকায় তিনি কিছুটা ভীতও হইয়াছিলেন। ভয়ের কথা স্বীকার না করিলেও বিষাদগ্রস্ত অর্জুন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক, শরীর অবসন্ন ও কম্পিত এবং হাত হইতে ধনুক খসিয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ না করিবার সপক্ষে তিনি নানা যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বংশধর অর্জুনের সকল কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে 'ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য' ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তথাপি অর্জুন বলিয়াছিলেন যে, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি পূজ্য গুরুবর্গকে বধ করা অপেক্ষা ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করাই শ্রেয়স্কর। শংকরাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'স্বতঃ এব ক্ষত্রধর্মে[1] যুদ্ধে প্রবৃত্তঃ অপি, তস্মাদ্ যুদ্ধাদ্ উপররাম, পরধর্মং চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্তুং প্রববৃতে।' অর্থাৎ, অর্জুন নিজেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন এবং পরধর্ম—ভিক্ষার দ্বারা জীবননির্বাহ—করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করার অর্থ সন্ন্যাসী হওয়া। অর্জুনের বৈরাগ্য যদি যথার্থ হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সন্ন্যাসগ্রহণে বাধা দিতেন না। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য অযথার্থ ছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বারংবার স্বধর্ম পালন করিতে বলিয়াছিলেন।

অন্যদিকে আমরা দেখি, লীলাবসানের অল্প কিছু পূর্বে দ্বারকাপুরীতে নৈসর্গিক ঘোর অমঙ্গলচিহ্ন-সমূহ দেখিয়া সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন যাদবগণসহ প্রভাসতীর্থে গমন করিতে ইচ্ছুক, তখন সেবক ও চিরসখা উদ্ধব তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছেন না, কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রভু শীঘ্রই লীলাসংবরণ করিবেন। উদ্ধব পাঁচ বৎসর বয়স হইতেই শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সমগ্র জীবন শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যতীত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে নিজ আরাধ্য প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করা দুষ্কর ছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, তিনি যেন বল্কল-পরিহিত হইয়া বন্য-ফলমূলে প্রাণধারণ করিয়া শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ও সমাহিতচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট তিনি আজীবন যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করেন; এই-রূপ করিলেই তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই প্রাপ্ত হইবেন। প্রভুর আদেশ শুনিয়া উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে অতি কষ্টে বিদায় লইলেন। বলা বাহুল্য, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া পরমা গতি লাভ করেন।

লক্ষণীয় যে, উদ্ধব না চাহিলেও শ্রীভগবান তাঁহাকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, উদ্ধব সন্ন্যাসের অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে অর্জুন চাহিলেও শ্রীভগবান তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইতে দেন নাই,

১ পাঠান্তর: ক্ষাত্রধর্মে

কারণ অর্জুন সন্ন্যাসের অধিকারী ছিলেন না। অধিকারিভেদে উপদেশদানের ইহা অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণও অধিকারিভেদে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, ইহার বহু দৃষ্টান্ত আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণও অনুরূপভাবেই উপদেশ দিতেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম—অর্থাৎ, ব্রহ্ম ও আমি এক) —এই কথা বলা বা চিন্তা করা তিনি পাপ মনে করিতেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানিতেন, নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈতজ্ঞানের অতি উত্তম অধিকারী এবং ভবিষ্যতে অদ্বৈতবেদান্তের ঐ বাণীই তাঁহাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করিতে হইবে। এইজন্য নরেন্দ্রনাথের আপত্তি সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' পাঠ করিতে বলিতেন। বলিতেন, 'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক আমাকে শুনা না। তাতে তো আর মনে করতে হবে না, তুই ভগবান।'

ইহার বিপরীত দৃশ্যে দেখা যায়, জটাজুটধারী রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে বসিয়া অন্য কোন কথাবার্তা না বলিয়া কেবলই 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' করিতে থাকায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "কেবল 'শিবোঽহম্' 'শিবোঽহম্' করলে কি হবে? যখন সেই সচ্চিদানন্দ শিবকে হৃদয়ে ধ্যান ক'রে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, সেই অবস্থায় বলা চলে। তা ছাড়া শুধু মুখে 'শিবোঽহম্' বললে কি হবে? যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ সেব্যসেবকভাবে থাকাই ভাল।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমোঘ উপদেশে ব্রহ্মচারী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং যাইবার সময়ে দেওয়ালের গায়ে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, 'স্বামি-বাক্যে আজ হতে রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী সেব্যসেবকভাব প্রাপ্ত হল।'

উদ্ধব ও অর্জুন এবং নরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীর ব্যাপারটা একই—অধিকারিভেদে উপদেশদানের দিক হইতে। পার্থক্য এই যে, অর্জুন গীতা শুনিয়া 'করিষ্যে বচনং তব' বলিয়াছিলেন আর রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী ঐ কথাই অন্য ভাষায় দেওয়ালে লিখিয়াছিলেন! উদ্ধব ও নরেন্দ্রনাথ এবং অর্জুন ও রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী—এই চরিত্রগুলির মধ্যে বৈসাদৃশ্য অবশ্যই আছে। তবে সাদৃশ্যটুকুই আমাদের গ্রহণীয় এবং লক্ষণীয় যে, যুগযুগান্তের ব্যবধান সত্ত্বেও উপদেষ্টা একই ব্যক্তি।

'অষ্টাবক্র-সংহিতা' গ্রন্থখানি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরেই থাকিত। নরেন্দ্রনাথ ভিন্ন অপর কাহাকেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব উহা পড়িতে দিতেন না—কেহ পড়িতেছে দেখিলে নিষেধ করিতেন এবং তাঁহাদের গীতা বা পুরাণাদি অন্য গ্রন্থ পড়িতে বলিতেন। নরেন্দ্রনাথকে জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করিলেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্যান্য বালক-ভক্তদের—কাহাকেও সগুণ-সাকার উপাসনা, কাহাকেও নিরাকার-সগুণ-উপাসনা, কাহাকেও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কাহাকেও বা শুদ্ধা ভক্তির উপদেশ দিয়া নানাভাবে ধর্মপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন। অধিকারিভেদে উপদেশের ইহা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্তই এই ছিল যে, প্রত্যেক সাধক তাঁহার মনের অবস্থাভেদে দ্বৈতমত,

বিশিষ্টাদ্বৈতমত ও অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া থাকেন। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 'অদ্বৈতবিজ্ঞানকে চরম ব'লিয়া নির্দেশ করিলেও তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত-তত্ত্বের কথাই সর্বদা উপদেশ করিতেন এবং কখন কখন দ্বৈতভাবে ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন না।' এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের বন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'পঞ্চদশী-টশী' পড়েন নাই শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'বাঁচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে ঐ সব পড়ে আসে ; কিছু করবে না, অথচ আমার হাড় জালায়।'

পরবর্তী কালে বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল তাঁহার রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, '[শ্রীরামকৃষ্ণদেব] করুণাপুরঃসর কহিতেন—অন্নগত, অল্পবুদ্ধি তোরা, কি ক'রে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধারণা করবি ? আমাতে প্রাণ ঢেলে দে, সর্বার্থসিদ্ধি হবে।'

আরও দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একই ঘটনায় অধিকারিভেদে বিপরীত উপদেশ দিতেন। ঘটনাগুলি সুবিদিত। তথাপি প্রাসঙ্গিক বলিয়া উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য যোগেন (পরবর্তী কালে স্বামী যোগানন্দ) একদা নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিতেছিলেন। জনৈক সহযাত্রী উহা জানিয়া ঠাকুরের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঐ এক ঢং আর কি ; ভাল খাচ্চেন, গদিতে শুচ্চেন, আর ধর্মের ভান ক'রে যত সব স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্চেন' ইত্যাদি। শান্তস্বভাব যোগেন এই নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করিলেন না। দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে ঘটনাটি বলিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, স্তুতি-নিন্দায় নির্বিকার ঠাকুর ঐ নিন্দাবাদ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, 'আমার অযথা নিন্দা করলে, আর তুই কিনা চুপ ক'রে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জানিস ?—গুরু-নিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবা সেই স্থান ত্যাগ করবে। তুই মিথ্যা রটনার একটা প্রতিবাদও করলি না!'

পক্ষান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য উগ্রস্বভাব নিরঞ্জন (পরবর্তী কালে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া ঠাকুরের নিন্দাবাদ শুনিবামাত্র তীব্র প্রতিবাদ করেন। নিন্দুকরা তাহাতেও নিরস্ত না হইলে তিনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ও রোষদৃপ্ত মূর্তি দেখিয়া নিন্দুকরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া অনুনয় বিনয় ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে নিরস্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন ঘটনাটির বিবরণ শুনিলেন, তখন নিরঞ্জনকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হইতে নাই, হীনবুদ্ধি লোকেরা কত কি বলে, তাহা লইয়া বাদ-বিসংবাদ করিতে গেলে উহাতেই জীবনটা কাটাইতে হয়, ইত্যাদি।

আরেকটি ঘটনা। জনৈক যুবক শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কাম দূর করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন, 'ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে, ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে ?'[২] দুর্বল অসহায় মানুষের প্রতি অনন্তসহানুভূতিপূর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যুবকের সহিত যেন যুবকেরই পর্যায়ে নামিয়া আসিয়া এই ধরনের নানা কথা বলিয়া

২ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি : 'আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন : ঠিক যে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও যে-ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত।' (বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৮৭)

তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐ সকল মলিন ভাব শরীরের ধর্মে আসে যায়—ঐগুলির দিকে নজর দিতে নাই।

অন্যদিকে ঈশ্বরকোটি যোগেন ঐ একই প্রশ্ন করিলে যোগ্য অধিকারী বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, খুব হরিনাম করিলেই কাম দূর হইবে। ঠাকুরের কথায় যোগেন ভাবিলেন, 'উনি কোন ক্রিয়া-টিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা-তা ব'লে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়!—তাহলে এত লোক কচ্চে, যাচ্চে না কেন?' ইহার পর 'ক্রিয়া-টিয়া' শিখিবার উদ্দেশ্যে একদিন যখন তিনি পঞ্চবটীতে একজন হঠযোগীর কথাবার্তা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে ঐসব শিখিতে নিষেধ করেন, কারণ উহাতে শরীরেরই উপর মন পড়িয়া থাকে। যোগেন ঠাকুরের কথা প্রথমতঃ দ্বিধাহীন-চিত্তে গ্রহণ না করিলেও অবশেষে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একমনে খুব হরিনাম করিতে থাকেন এবং অল্পদিনেই প্রত্যক্ষ ফল পান। স্মরণীয় যে, এই যোগেন বা যোগীন সম্বন্ধে উত্তর-কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'আমাদের ভেতর যদি সম্পূর্ণভাবে কেউ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন।' ঠাকুর জানিতেন, পূর্বোক্ত যুবকটির কাম যাইবার নহে, কিন্তু ঈশ্বরকোটি যোগেন সম্পূর্ণ কামজয়ী হইবেন—তাই অধিকারিভেদে দুই প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন।

এখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিব, যাহাতে অধিকারিভেদে উপদেশের ভিন্নতা সুপরিস্ফুট :

"আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'একথা বলো না—আমারই পথ সত্য আর সব মিথ্যা, ভুল।' হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবানলাভ হবে।

"বিজয়ের শাশুড়ী বলে, 'তুমি বলরামদের বলে দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার। নিরাকার সচ্চিদানন্দকে ডাকলেই হোলো।'

"আমি বললাম, 'অমন কথা আমিই বা বলতে যাবো কেন—আর তারাই বা শুনবে কেন?' মা মাছ রেঁধেছে—কোনও ছেলেকে পোলওয়া বেঁধে দেয়, যার পেট ভাল নয় তাকে মাছের ঝোল করে দেয়। রুচিভেদে অধিকারিভেদে একই জিনিস নানারূপ করে দিতে হয়।"

"যারা সংসারে আছে, আর যাদের দেহ-বুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহং এ ভাবটি ভাল নয়। সংসারীর পক্ষে যোগবাশিষ্ঠ, বেদান্ত—ভাল নয়। বড় খারাপ। সংসারীরা সেব্য-সেবকভাবে থাকবে। 'হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য—প্রভু, আমি সেবক—আমি তোমার দাস।'

"যাদের দেহবুদ্ধি আছে, তাদের সোঽহং এ ভাব ভাল না।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় শ্রীমা সারদাদেবীও অধিকারিভেদে উপদেশ দিতেন দেখা যায়, তাঁহার দীক্ষিত সন্তানদের কাহাকেও বলিতেছেন দশহাজার-বিশহাজার জপ করিতে, কাহাকেও ১০৮ বার, কাহাকেও দশবার, কাহাকেও বা একেবারেই কিছু করিতে হইবে না বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন সন্তানদের প্রশংসা মা সর্বদা করিতেন। বলিতেন, যে বিবাহ করে নাই, সে অর্ধেক মুক্ত, ঘুমাইয়া বাঁচিবে, 'বিয়ে করাই মহাপাপ' ইত্যাদি। আবার দেখা যায়, কাহাকেও বলিতেছেন, বিবাহ করিলে কি সৎ হওয়া

যায় না, ঠাকুর কি তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই? কোনও ভক্ত যখন বলিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না, তখন মা হাসিয়া বলিতেছেন, 'সে কি গো? সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমন পুরুষ ও প্রকৃতি।' কোন স্ত্রীভক্ত ভোগলালসা একেবারে কাটাইয়া দিতে বলিলে মা বলিয়াছিলেন, 'তা কেন বৌমা? তোমাদের ঘরে ছেলে না হলে আমার ভক্ত-সংখ্যা বাড়বে কি ক'রে?' মা সন্ন্যাসীদেরও কাজ করিতে বলিতেন। বলিতেন কাজে মন ভাল থাকে, ইত্যাদি। কিন্তু জনৈক সন্ন্যাসীকে বলিয়াছিলেন, 'সাধনভজন করার জন্যই সংসার ছেড়েছ। সর্বদা সাধনভজন করতে পার না ব'লেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার।' এই উক্তিটিতে মা সাধনভজনকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন, অন্যত্র এই ধরনের কথা নাই, কাজের প্রয়োজনীয়তার উপরই জোর দেখা যায়।

এইভাবে মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন—অর্থাৎ, দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন। এইজন্য অধিকারিবিশেষে প্রযুক্ত তাঁহাদের উপদেশ যে সর্বসাধারণের জন্য নহে, এই বিষয়ে অবহিত হইতে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উপদেশ নরেন্দ্রনাথ আজীবন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। প্রথমবার আমেরিকাযাত্রার পূর্বে স্বামীজী যখন বোম্বাই-এ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সহিত তিনি ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন। একদিন তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে ঐ কাজ করিতে বলেন। তুরীয়ানন্দজী সমবেত ভক্ত নরনারীদের খুব ত্যাগবৈরাগ্যের উপদেশ দিলেন। পরে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'এই সংসারীদের কঠোর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা শুনালে কেন? তুমি তপস্বী সন্ন্যাসী, কিন্তু এরা তো গৃহী। এদের উপযোগী তোমার কিছু বলা উচিত ছিল। এসব কথা শুনে এরা ঘাবড়ে যাবে, বিচলিত হবে। এরা যা ধরতে বুঝতে পারে, তা বললে ভাল হতো।' তুরীয়ানন্দজী উত্তর দেন, 'আমার মাথায় ছিল যে আপনি রয়েছেন, আপনি শুনছেন। অতএব যা-তা বলা চলে না। বেশী ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল!'

শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে স্বামীজী একদা বলিয়াছিলেন, 'তোরা যে আমার লেকচারে পড়েছিস—সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জায়গায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্য অত্যাবশ্যক নয়। কি করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমণ্ডলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আসত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে ঝোঁক হয়, সেইজন্যই ঐভাবে লেকচার দিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্য ছাড়া এতটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে তোরা এই ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবি।'

পাশ্চাত্যদেশে প্রদত্ত স্বামীজীর 'কর্মযোগ' বক্তৃতাবলীতে আছে যে, গৃহী ও সন্ন্যাসী নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান। আবার দেখা যায় স্বামীজী একজনকে বলিতেছেন, "এ-কথা মনে মনে বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে

কখনও ভুলিও না যে,

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

—মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, সূর্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।" ('স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে': বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।৩০১) অধিকারিভেদে উপদেশ হিসাবে গ্রহণ না করিলে এই উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায় না

ইহা সুবিদিত যে, স্বামীজী জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করিতে বলিতেন স্বামীজী কর্তৃক স্বহস্তে অঙ্কিত রামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রতীকেও এই সমন্বয়াদর্শ প্রতিফলিত। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে, এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর চরিত্রগঠনের অধিকারী বিরল। এইজন্য অধিকারি-ভেদে তাঁহার অন্যরূপ উপদেশও আমরা পাই। যেমন, ২৭শে এপ্রিল ১৮৯৬, তিনি মঠ পরিচালনা সম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে যে সুদীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে আছে: 'মঠবাসী প্রচারকেরা পর্যায়ক্রমে ভক্তি, জ্ঞান, যোগ ও কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন এবং তৎসম্বন্ধে দিবস ও সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষাগৃহের দ্বারে লটকাইয়া দিবেন—অর্থাৎ, যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞাসু জ্ঞানশিক্ষার দিনে আসিয়া আঘাত না পায় ইত্যাদি।' থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে তিনি বলিয়াছিলেন, 'অধিকাংশ স্থলে কেবল একটা পথই প্রয়োজন' এবং 'অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার গঠিত হয়েছে, শিষ্যের প্রবণতা অনুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম—এর মধ্যে যে-কোন একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর; কিন্তু অন্যান্য ভাব-গুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও।' স্বামীজীর আরেকটি উক্তি: 'জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে। তবে এই যুগে কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।'

স্বামীজী কর্মযোগকে মুক্তির একটি স্বতন্ত্র পন্থা হিসাবে নির্দেশ করিতেন।—ইহা একটি পক্ষ। পক্ষান্তরে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, 'সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না।' প্রথম পক্ষটিকে সার্বজনীন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিলে শেষোক্ত পক্ষটিকে অধিকারিভেদে উপদেশের একটি দৃষ্টান্ত বলিতে হয়। আর শেষোক্ত পক্ষটিকে সার্ব-জনীন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিলে প্রথম পক্ষটিকে অধিকারিভেদে উপদেশ বলিতে হয়। কোন্ পক্ষটি সার্বজনীন সিদ্ধান্ত, তাহা নির্ণয় করা বর্তমান প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। যেদিক দিয়াই হউক, আমরা যে অধিকারিভেদে উপদেশের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাইতেছি, ইহাই যথেষ্ট।

'রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে'—এই প্রচলিত শ্লোকার্ধটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্বামীজী শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলিয়াছিলেন যে, মূর্খ ও বুদ্ধি-মানের ধর্ম যদি পৃথক্ না হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে এত অধিকারি-নির্দেশের হাঙ্গামা থাকিত না। প্রসঙ্গতঃ স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন যে, যাঁহারা বলেন ভগবানের সহিত একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে, তাঁহারা ঠিকই বলেন, উহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য। কিন্তু যাঁহারা সংসার-ত্যাগী, তাঁহারা কি করিয়া ভগবানের উপর সাংসারিক সম্বন্ধ আরোপ করিয়া সাধনা করিতে পারেন! সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা নিঃসন্দেহে অতি কঠিন, কিন্তু তাই বলিয়া অমৃত ছাড়িয়া কি বিষ খাইতে হইবে! এই বলিয়া অদ্বৈতবেদান্তনিষ্ঠ শিষ্যকে স্বামীজী উপদেশ দিয়াছিলেন, 'ঐ সব ভাবখেয়ালের পারে চলে যা।' লক্ষণীয় যে, শিষ্য গৃহস্থ হইলেও স্বামীজী তাঁহাকে অধিকারী বুঝিয়া সন্ন্যাসীদের উপযোগী

অদ্বৈতবেদান্তের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

অধিকারিভেদে উপদেশদান সম্বন্ধে স্বামীজীর এই ধরনের আরও অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। যেটুকুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই পর্যাপ্ত মনে করি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছিলেন: 'সাধনভজন সম্বন্ধে general (সাধারণ) ভাবে দু-একটা কথা ছাড়া সকলের সামনে ব্যক্তিবিশেষকে কিছু বলা চলে না। ঠাকুরকেও দেখেছি, তিনি প্রত্যেককে আলাদা ডেকে, অধিকারিবিশেষে বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। সাধনভজন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে হলে একান্তে প্রশ্ন করা উচিত।'

অন্য সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন: 'আমাকে অনেকে বলে আশীর্বাদ করুন, কৃপা করুন। শুনে আমার হাসি পায়। যা করতে বলব তা করবে না, সামনে থেকে সরে গিয়ে নিজের মনের মত যা ইচ্ছে করে, আর মনে করে নিজে একজন মস্ত সমঝদার। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যেমনটি বলেছিলুম করবার চেষ্টা করছ ত? হয় বলে সময় হয় না, না হয় বলে আমার মত দুর্বল, পাপীর দ্বারা কি হয়? যদি বিশ্বাসই নেই, কথাও মানবি নে, তাহলে যা ইচ্ছা কর না বাপু। কেবল ফাঁকি মারার চেষ্টা। এই রকম লোক যারা আমার কাছে আসে, তাদের নিয়ে আমি ঠাট্টা-তামাসা ও বাজে গল্প করে সময় কাটিয়ে দিই। কেন মিছেমিছি বকে মরি! আর যারা দু-চারজন খাটবে খুটবে ও কথা নেবে মনে হয়, তাদের সাধনভজনের কথা বলে দিই, তারাও ঠিক ঠিক ভাবে করবার চেষ্টা করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদগণের সঙ্গধন্য দেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন: 'দৃষ্টিমাত্রে মহারাজ অধিকারী বুঝিয়া লইতেন এবং কাহারও বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া ভাবানুযায়ী শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহার প্রবল কর্মানুরাগ তাহাকে নিষ্কাম কর্মে, যাহার শাস্ত্রানুরাগ তাহাকে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যাহার ধ্যান, জপ বা পূজার্চনায় অনুরাগ তাহাকে তাহাতেই উৎসাহিত করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেন।'

উপসংহারে প্রসঙ্গতঃ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। আমাদের সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে সর্বাগ্রে অধিকারি-নির্ণয়ের কথা আছে। শাস্ত্রে যে-সকল উপদেশ দেওয়া আছে, নির্বিচারে সকলেই তাহার অধিকারী হইতে পারে না। যেমন, শংকরাচার্য 'ব্রহ্মসূত্রে'র ভাষ্যে উক্ত গ্রন্থপাঠের অধিকারী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌-সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব—এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবেন। নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতির জন্য এই সাধনচতুষ্টয় যে অপরিহার্য, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে কি আছে, তাহার পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আপত্তি কি? আমরা তো কত বিষয়েই তথ্য আহরণ করিতেছি! সুতরাং শাস্ত্রে কি আছে, তাহা জানিবার অধিকার সকলেরই আছে। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ চাহিতেন যে, শাস্ত্রের তত্ত্বসমূহ সর্বসাধারণের নিকট প্রচারিত হউক (এই সংখ্যার 'দিব্য বাণী' দ্রষ্টব্য)। স্বামীজীর অনুসরণে তদীয় গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ কোন্নগর হরিসভায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন: 'পূর্বে শাস্ত্রীয় সত্য যাতে সাধারণে না পড়তে পায়, এইভাবে লুকিয়ে রাখা হতো। এতে পুরোহিতের আধিপত্য অটুট রইল, কিন্তু জাতীয় জীবন বিদ্যা-হীন হয়ে অনেক নীচে পড়ে গেল। পুরোহিত তাঁর ঈদৃশ কার্যের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী

হবার পূর্বে মানুষকে সকল সত্য বললে অনেক সময় না বুঝে উল্টো উৎপত্তি হয়ে থাকে, যেমন বেদান্ত ঠিক না বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে মানুষকে অধিক বিষয়পরায়ণ করে থাকে। এ কথার উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী চেনবার শক্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও আলোচনা করবার ক্ষমতা দাও। সে নিজেই তার উপযোগী পথ বেছে নেবে। আজকাল সমস্ত শাস্ত্র মুদ্রিত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার চেষ্টাই বৃথা।'

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

স্বামী দেবানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সন্ন্যাসজীবন লাভ করতে পারায় অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ ও রাজা মহারাজের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া আমার মতো অযোগ্য ও অনধিকারীর আর অন্য কিছুই সম্বল ছিল না। অযাচিতভাবে পাওয়া মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাসদীক্ষার শুভ দিন দুটি আমার জীবনে চির-স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। রাজা মহারাজের অফুরন্ত দয়ার কথা কখনই ভুলতে পারবো না। তাঁর চরণে শুধু প্রার্থনা জানালাম, যেন তাঁর ধ্যানে আজীবন ডুবে থাকতে পারি, রাগ-দ্বেষ-অহংকার যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি যেন অমৃতত্ব লাভ ক'রে জীবন ধন্য করতে পারি।

১৯২১ সালে কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শিবচতুর্দশীর দিনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পুরানো ফটোখানি পরিবর্তন ক'রে যখন নতুন প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়, তখন রাজা মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং আশ্রমের অন্যান্য সাধুরা—'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, (তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদা ঝুলে॥'—এই গানটি গাইতে গাইতে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে নাচতে এক অপূর্ব-ভক্তিপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন। সেই দিব্য দৃশ্যের স্মৃতি আজও আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে।

১৯২১ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন দিনে কাশীতে রাজা মহারাজকে সাধুভক্তদের যে সব উপদেশ দিতে শুনেছি, সেগুলির সারাংশ: 'তোমরা জপধ্যান একদিনও বাদ দেবে না, মন চতুর্দিকে ছোটাছুটি করলেও তাকে বিবেক-বিচারের সাহায্যে টেনে এনে ভগবানের আরাধনায় লাগাবে, কখনও নিরাশ হবে না; ধৈর্য ধরে নিয়মিত সাধনভজন ক'রে যাবে, জানবে কর্মের ফল অনিবার্য। সাত্ত্বিক আহার, সৎসঙ্গ এবং ব্রহ্মচর্যপালনের কথা ভুলবে না। ত্যাগ-বৈরাগ্য, সাধনভজন না থাকলে সাধুদের উপদেশ ধারণা হয় না। সাধুদের ভাব ও শাস্ত্রের অর্থ বুঝতে হ'লে ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা চাই। মন শুদ্ধ না হলে ব্যাকুলতা আসে না। সব বাসনা ও আসক্তি মন থেকে উঠে যাওয়া চাই। শুধু থাকবে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে লাভ করার। সংসারে বিতৃষ্ণা না এলে তাঁর উপর টান আসে না। তিনি অন্তর্যামী, তিনি বিচার করেন মন দেখে। তাই মনমুখ এক ক'রে সরল-ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকতে হবে। ভগবানে যত মন যাবে, তত রিপুর তাড়না কমে যাবে। কর্তৃত্বাভিমান ও মানযশের আকাঙ্ক্ষা মহাবন্ধন সাধুর পক্ষে। গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও নির্ভর ক'রে মানুষ যদি মনে-প্রাণে খাটে, তবে তার সব

অভাব, দুঃখ, ব্যথা ভগবানই দূর ক'রে দেন। তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান যারা আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকে—তাঁর শরণাগত হয়। ভয়, সংশয় ও দুর্বলতা মন থেকে দূর ক'রে দেবে। তাঁর কৃপাকটাক্ষে লক্ষ জন্মের পাপ এক মুহূর্তেই কেটে যায়। কত মহা-পাতকী এই নামের বলেই উদ্ধার হয়ে গেছে। শুধু চাই ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতা।

'মনটাকে তৈরী করো এমনভাবে যাতে কোন কামনাবাসনা মনে স্থান না পায়। অবশ্য এগুলি ত্যাগ করা সহজ নয়। যারা ভাগ্যবান—যাদের জন্মজন্মের পুণ্যবল আছে তারাই পারে মনকে বশীভূত করতে। ভগবৎকৃপা ও নিজের তীব্র ইচ্ছা থাকলেই সব হয়। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগবৈরাগ্য না থাকলে তাঁর দিকে ঠিক ঠিক এগুনো যায় না। ভগবানে অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা এলেই ব্রহ্ম-চর্য পালন করা সহজ হয়। ধর্মপথে উন্নত হ'তে হ'লে অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের উপর নিষ্ঠা রাখা চাই, নচেৎ অগ্রসর হওয়াই কঠিন। নিত্যনিয়ত নিজের মনকে সদ্বিষয়ে নিযুক্ত রাখতে হবে। সাধুসঙ্গ, জপধ্যান, পূজাপাঠ যত করবে ততই মনের মলিনতা কেটে গিয়ে মন একাগ্র হবে। বিবেকবিচার জাগ্রত থাকলে কিছুই অসাধ্য বা কষ্টকর নয়। আসক্তি ও মায়ামোহে জীবনের আদর্শ ভুলে গিয়েই মানুষ বারবার জন্মমৃত্যুর যাতনা ভোগ করছে। এমন কাজ করতে হবে যাতে এই জন্মমৃত্যু-যাতনার হাত হ'তে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আত্ম-জ্ঞান বা ভগবানলাভ ছাড়া জন্মমৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। অহঙ্কার-অভিমান, মান-যশ ও ভোগবাসনা ছেড়ে যতদিন না তাঁকে আশ্রয় করবে ততদিন সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির কোনই আশা নেই। আসল আনন্দ পেতে হলে ঐ সব ক্ষণিক আনন্দের লোভ ছেড়ে ষোল-আনা মন ভগবানকেই দিতে হবে। জাগতিক আনন্দের পিছনে নিরানন্দ আসবেই। মনে যখন যেটা উঁকি মারবে তাকে তখনই দূর করতে হবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। আসক্তি ও অহঙ্কার থাকতে কিছুই হবে না। মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। অনেক তপস্যার ফলেই সূক্ষ্ম বাসনাকামনা জয় করা যায়। ত্যাগ ও সংযমের অভাবেই জিহ্বা অনেক অনর্থ ঘটায়। মন বশে না আসা পর্যন্ত নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলতেই হবে। তাঁতে অনুরাগ-ভালবাসা না এলে মনস্থির করা কঠিন। প্রথমে মনটাকে তমঃ, রজঃ থেকে শুদ্ধ করতে হবে, সত্ত্বগুণে নিতে হবে। পরে তপস্যার ফলে কামক্রোধাদি দমন করা খুবই সহজ হয়। মনকে সর্বদা উচ্চ চিন্তা, উচ্চ আদর্শে ডুবিয়ে রাখতে হবে, নচেৎ শুধু গেরুয়া পরে ঘুরে বেড়ালে কিছুই হবে না। মন বসুক আর নাই বসুক সর্বদাই চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা থাকলেই মনের শক্তি বাড়বে। নির্জনে একমনে ধ্যানজপ যতই করবে ততই ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হবে। তাঁর দিকে মন বেশী গেলেই আনন্দ বেশী পাবে। চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, তাঁর কৃপা তত অনুভব করবে।'

সাধুদের ভিতর ধ্যানজপ, ত্যাগ-তপস্যা, জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সেবার ভাব যাতে দিন দিন বাড়ে, তার দিকে রাজা মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ লীলাসহচর এবং মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ হয়েও দীর্ঘকাল নিজেও ধ্যানধারণা ও কঠোর তপস্যায় কাটিয়েছেন। সে তিতিক্ষা ও কঠোরতার তুলনা নেই।

মহারাজ বলতেন, 'কর্ম জীবনের লক্ষ্য না হলেও চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কামভাবে কর্ম সবাইকেই করতে হবে। ভগবানলাভের জন্য বারো-আনা মন সাধনভজনে রেখে বাকী চার আনা মন কর্মের দিকে দিলেই যথেষ্ট। দুর্লভ মানবজীবন লাভ ক'রে যদি ভগবানলাভের চেষ্টা না থাকে, তবে সে জীবন বৃথা। যারা এই দুর্লভ জীবন হেলায় হারায় তাদের মহা দুর্ভাগ্য। বিবেক-বিচার, জ্ঞান-ভক্তি,

শ্রদ্ধা-বিশ্বাস যাদের আছে তারাই প্রকৃত মানুষ। সকল সুখশান্তির মূল আনন্দস্বরূপ ভগবানকে দূরে ঠেলে রেখে যারা মিথ্যা তুচ্ছ অসার বস্তুর পিছনে জন্মজন্ম ছোটে—তাদের দুঃখ, ব্যথা, অশান্তির শেষ নেই। ব্যাকুলতা ও অনুতাপ এলেই শত-জন্মের ময়লা মন থেকে ধুয়ে যায়। ভোগবাসনা শেষ না হলে তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না।' উনি বলতেন, "যতই কাজ থাক না কেন তাঁর স্মরণমনন করতে যেন ভুল না হয়। বাজে চিন্তায় বা বড় বড় প্রশ্নে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবে না। জানবে সুস্থ শরীরই সাধনভজনের সহায়। ধ্যান-জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত নির্মল করা, তা যদি না হয়, তাহলে বুঝবে তোমার ধ্যানজপ ঠিক হচ্ছে না। মনকে বশে আনাই লক্ষ্য। যার যত বৈরাগ্য তার তত ভিতরে শান্তি, আর যার যত অনিত্য পদার্থে আসক্তি তার ততই ভিতরে অশান্তি। তাঁকে ভুলে মানুষ যতই 'আমার' 'আমার' করে, ততই দুঃখ, ব্যথা বাড়ে। তাই যারা অনাসক্ত ও তাঁর শরণাগত, তারাই প্রকৃত আনন্দে থাকে। তারা জানে তিনিই সব করছেন—আমরা কিছুই না—শুধু নিমিত্তমাত্র।"

কাশীতে রাজা মহারাজের ঘরে সাধুরা যখন নিত্য প্রণাম করতে যেতেন, তখন তাঁর মধুর সঙ্গ-লাভে এক অপার শান্তি সবাই অনুভব করতেন। তপস্যা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তির কত কথা তাঁরা তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেতেন। তাঁর হৃদয়স্পর্শী সরল সুন্দর উপদেশগুলির ভিতর যেন সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আমরা দেখতে পেতাম।

মহারাজের দূরদর্শিতা এবং মানুষ চেনার শক্তি ছিল অসাধারণ। দৃষ্টিমাত্রেই সবার বর্তমান ও ভূত-ভবিষ্যৎ সবই যেন জানতে পারতেন—বলেও দিতেন কথনো কখনো। কে কার গুরু, কার কি মন্ত্র সবই বুঝে নিতেন দেখা মাত্র। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহু ঘটনায় আমরাও পেয়েছি। সময়বিশেষে একটু ফষ্টিনষ্টি করেও ভক্ত ও অন্তরঙ্গদের আনন্দ দিতে দেখেছি। অনেক সময় হাস্য-পরিহাস, গল্প ও রসিকতাদির অবতারণা ক'রেও মহারাজকে আত্ম-গোপন ক'রে থাকতে দেখা গিয়েছে।

মহারাজ ও তাঁর গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পর যে অপার্থিব প্রেম ও অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় পেয়েছি তা ভাবতে গেলেও আনন্দে বিভোর হই। ওঁদের ভাবাবস্থা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। শুনেছি, মহারাজ কত উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেছিলেন। তাঁর কত অলৌকিক দর্শন ও ভাবসমাধি হতো, মুখমণ্ডলে তখন এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হতো, অনেকেই অভিভূত হতেন তখন তাঁকে দর্শন করে।

অনেক সময়েই দেখা যেতো, মহারাজ আত্মস্থ, নির্বিকার, নিমীলিতনয়ন—যেন ধীরে ধীরে গভীর সমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন। ওঁর সেই ভাবাবস্থা দেখে আমাদের মনে হতো শাস্ত্রের সেই বাণী—

'কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধৌ ॥'

[জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিতে নিত্যবোধস্বরূপ, কেবলানন্দরূপ, নিরুপম, অসীম, নিত্যমুক্ত, নিষ্ক্রিয়, সীমাহীন আকাশসদৃশ, নিষ্কল, নির্বিকল্প, অচিন্ত্য পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে অনুভব করেন।]

কখনো দেখতাম, সরল পবিত্র শিশুদেরই মত তাঁর সরলতা ও বালকভাব। আবার কখনো দেখা যেত ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যেন কোন অপার্থিব রাজ্যে চ'লে গিয়েছেন। তাঁর সর্বতো-মুখী অসাধারণ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও বিস্মিত হতেন। পূজাপাঠ বা মন্দিরাদি দর্শন করতে করতে দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। তিনি উপস্থিত থাকলে রামনাম-সংকীর্তন ও কালী-

কীর্তনের সময়ে এক অভিনব পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হতো। আজও সে সব স্মৃতি আমাদের প্রাণে কত আনন্দ দান করছে!

নিত্য সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরাত্রিক ও জপ-ধ্যানাদির পর ভিজিটার্স-রুমে গিয়ে যাতে সাধুরা সমবেতভাবে ভজনকীর্তনাদি করেন, তার জন্যও মহারাজের বিশেষ আগ্রহ দেখা যেতো। নিজেও কখনো যোগদান ক'রে সকলকে আনন্দসাগরে ভাসিয়ে দিতেন। সে অপূর্ব দৃশ্য ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না।

১৯১৯ সালে মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবক্ষেত্র এই গুপ্ত বারাণসীতে তাঁর মঠ স্থাপন করার উদ্দেশ্য সাধুরা এই নির্জন মনোরম তীর্থে থেকে ধ্যানজপ করবে। নানা দেশ থেকে ভাল ভাল ফলফুলের গাছ এনে মহারাজ লাগিয়েছেন। তাঁর খুবই প্রিয় ফলফুলের বাগান। দেখলেই মনে হতো যেন সেই প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিদের তপোবন। ফলফুল, শাক-সবজী, গাছ-পালার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাজ ব'লতেন, 'ওদের সেবাযত্ন করলে ওরা মানুষের মতন নেমকহারামী করে না। ওরা ছায়া ও ফল-ফুলাদি দিয়ে আশীর্বাদ করে, আর দেহমনকেও আনন্দ রাখে।'

ধর্মপথের পথিককে কিভাবে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হতে হবে সে বিষয়ে মহারাজ যা বলতেন তার সারমর্ম: 'ধর্মপথ অতি দুর্গম। যাদের সৎ বাসনা জেগেছে তাদের উপর ভগবানের অপার করুণা আছে, জানবে। সদিচ্ছা, সদ্‌ভাব লক্ষ লোকের মধ্যে হয়তা দু'এক জনারই হয় তাঁর আশীর্বাদে। তাঁরা ক্ষণিক সুখলাভের জন্য অনন্ত সুখকে কখনো বলি দেন না। এত দুর্লভ মানব-জীবন পশুর মত খেয়ে ঘুমিয়ে কতকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাস করার জন্য নয়। তাঁকে ঠিক ঠিক চাইলে আসক্তি ও ভোগবাসনা ত্যাগ করতেই হবে। আর এ সংসার ভোগ করতে হ'লে ঈশ্বরকে ছাড়তে হবে; দু-নৌকায় পা দিলেই বিপদ ভুল বুঝেই মানুষ ভোগের পিছনে ছুটে ছুটে দিন দিন পশু হতে চলেছে। তাই পশুত্ব দূর ক'রে প্রকৃত মানুষ হবার জন্যে মনটাকে নিত্য নিয়ত কশাঘাত করতে হবে। সৎসঙ্গ এবং বিবেক-বিচার লাভের জন্য সর্বদাই চেষ্টা চাই। পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং বিচার-বৈরাগ্যের দ্বারা জোর করে মনকে বশীভূত করতে হবে। এজন্য চাই অদম্য অধ্যবসায় ও সাধুসঙ্গ। মনে-প্রাণে যত তাঁর নাম করবে দেহমন ততই শুদ্ধ হবে। ইন্দ্রিয়গুলিও আপনিই সংযত হবে। চিত্ত অশুদ্ধ থাকলে তাঁর কৃপালাভ করা যায় না। কাম-ক্রোধাদি রিপুগুলি সংযত করতে পারলেই ধ্যান-ধারণা করা সম্ভব হয়। ওগুলি দমন করাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। বিবেক-বিচার, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস ও ধৈর্য না থাকলে উন্নত হওয়া যায় না। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন কখন শেষ হবে তা যখন কেউ বলতে পারে না, তখন পরপারের সম্বল সংগ্রহ করতে কালবিলম্ব করা মহামূর্খতা। আর এও সত্য, সিদ্ধগুরুর আশ্রয় না পেলে ভগবান লাভ করা অসম্ভব। তাঁর জীবন দেখে, তাঁর উপদেশ শুনে জীবন তৈরী করতে হবে। ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা না থাকলে তাঁদের ভাব বা উপদেশ কিছুই নিতে পারবে না। নিজের বা অপরের কল্যাণ করা তখনই সম্ভব যখন নিজের চরিত্র ঠিক ঠিক তৈরী হবে। সর্বপ্রথম অহঙ্কার-অভিমান দূরে রেখে তাঁর শরণাগত হওয়া চাই। ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ যাতে বাড়ে, তার জন্য ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করতে হবে। মায়ামোহ, আসক্তি যাতে জন্মজন্ম দুঃখ না দেয়, তার জন্য কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতে হবে। দুঃখ-ব্যথার পারে গিয়ে অনন্ত সুখ লাভ করার এ ছাড়া অন্য পথই নেই। তাঁর বলে

বলীয়ান না হ'লে কারো শক্তি নেই এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হবার।'

সব কাজের মধ্যেও মহারাজকে সর্বদা অন্তর্মুখী, অনাসক্ত ও নির্বিকার থাকতে দেখা যেত। নির্বিষয় মনই যে মুক্তির কারণ তা বেশ অনুভব করতাম মহারাজের জীবন দেখে। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' ভগবানকে পেয়ে আনন্দে ভরপুর থাকায় অন্য কিছুরই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ দুজন সাধুকে ও কয়েকজন ভক্তকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন—"গরুকে ভাল ক'রে না খাওয়ালে যেমন ভাল দুধ দেয় না তেমনি মনকেও উত্তম খাদ্য না দিলে সে শান্ত বা সংযত হয় না। মনের উত্তম খাদ্য হচ্ছে সৎসঙ্গ, সৎচিন্তা, ধ্যানজপ, পূজাপাঠ ও প্রার্থনাদি। নিয়মনিষ্ঠা নিয়ে সাধনভজন করলেই কৃতকার্য হওয়া যায়। এই জীবনের কিছু স্থিরতা নেই। তাই সময় থাকতেই উঠে পড়ে লাগতে হবে, পরে করার আশা ছেড়ে। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।' দুঃখ-ব্যথা, জন্ম-মৃত্যুর পারে যেতে হবে, অমৃতের আস্বাদ পেলে চিন্তা-ভয়ের আর কারণ থাকবে না। তাঁর আস্বাদ পেলে এ মরজগতের ভোগসুখ সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভগবান লাভ না হ'লে তো দুর্লভ মানবজীবন বৃথাই গেল। এ সংসারের কোন কিছুতেই সেই নিরবচ্ছিন্ন স্থায়ী আনন্দ পাবে না। তাই সময় থাকতে ঠিক রাস্তা ধ'রে এগুতে হবে। এজন্য চাই আত্মবিশ্বাস এবং অদম্য তীব্র পুরুষকার। কালে বা সময় হ'লে হবে ব'লে বসে থাকলে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হবে। জীবনের ভাল সময়টা গোলমালে কাটিয়ে বুড়ো বয়সে যারা ধর্ম করতে চায়, তারা নিজেদেরই ঠকায়। তাদের মত মূর্খ আর কে আছে!"

কাশীধামে রাজা মহারাজকে একদিন একাকী পেয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার আশীর্বাদ ও অনুমতি পেলে আমি হিমালয়ে গিয়ে কিছুকাল তপস্যা ক'রে জীবন উন্নত ও ধন্য করতে চাই। আপনার কৃপাশিস্ না পেলে আমার সাধনভজন, তপস্যা কিছুই সার্থক হবে না। হিমালয়ের ভাব-গম্ভীর পরিবেশ ও নির্জনতার কথা অনেক শুনেছি—তাই নিঃসঙ্গভাবে একাকী থেকে তাঁর আরাধনা করতে চাই, আপনি দয়া ক'রে অনুমতি দিন। এই আমার প্রার্থনা। ছেলেবেলা থেকেই কাজকর্মের চেয়ে নির্জনে ভগবানের আরাধনা করার আকাঙ্ক্ষাই আমার বেশী। আমার ভাগ্যে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা, আপনিই জানেন।'

মহারাজ আমার কথাগুলি শুনতে শুনতে যেন একটু ভাবস্থ হয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে বললেন, "বেশ কথা, কনখল সেবাশ্রমের সেবা-পূজাদির কাজ আর কিছুদিন ক'রে পরে হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা কর। হিমালয় মহাপবিত্র তপস্যার স্থান। সাধনভজন ছাড়া চরম সত্যের পথে কেউ এগুতে পারে না। অহংকার ও কামনাবাসনা থেকে মুক্ত হতে পারলেই প্রকৃত সুখী হওয়া যায়। এজন্য চাই তীব্র ব্যাকুলতা, বিবেক-বৈরাগ্য ও পুরুষকার। মনে রাখবি, যে দিনটা যায় সে দিনটা আর ফেরে না। তাই সময়ের সদ্‌ব্যবহার করবি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কিছুই হয় না। বিবেক-বিচার প্রতি মুহূর্তে জাগ্রত রাখতে হবে। ধ্যান-জপ, তপস্যার নামে যারা আলস্য, জড়তা ও কুঁড়েমির প্রশ্রয় দেয়—তাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। কাজের ভিতর যথার্থ আনন্দ পেতে হলেও ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ পাওয়া চাই, নচেৎ কর্মেও শান্তি নেই—বন্ধন বেড়েই চলে। তাই জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সাধনভজনের অভাবে সাধুরা পর্যন্ত অহঙ্কার-অভিমান, যশ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মত্ত থাকে। সব ত্যাগ ক'রেও শেষে ঐ সবে আবদ্ধ হয়, ভুলে যায়—'প্রতিষ্ঠা শূকরীবিষ্ঠা'—তাই কত দুর্গতি ভোগ করে সংসার ছেড়ে এসেও। তুই

বাবা, খুব তপস্যা কর হিমালয়ে গিয়ে, তাঁর ধ্যানে ডুবে যা—জন্মজীবন সার্থক কর। এই আমার আশীর্বাদ। বহু পুণ্যফলে এই কম বয়সে যখন সব মায়ার বাঁধন কেটে বেরিয়ে এসেছিস, তখন আর অন্য কোনদিকেই তাকাবি না; তাঁকেই জীবনের সর্বস্ব কর। যা, ভয় নেই, তিনি তোকে রক্ষা করবেন।" এই কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ যেন গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সে এক অপার্থিব দৃশ্য! মহারাজের এই জ্ঞানগর্ভ হৃদয়স্পর্শী কথাগুলি শুনে এক অনাবিল আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হল।

রাজা মহারাজের নির্দেশে কনখল সেবাশ্রমে গিয়ে সেবাপূজাদির কাজে ব্রতী হই। কিছুকাল পরে আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ মহারাজের অনুমতি নিয়ে হিমালয়ে যাই তপস্যার জন্য। উত্তরাখণ্ডের বহু স্থানে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসম্বলভাবে থেকে ভগবানের আরাধনা এবং তীর্থদর্শনে কাটিয়ে প্রায় বারো বছর বাদে বেলুড় মঠে আসি। পূজ্যপাদ রাজা মহারাজের অফুরন্ত কৃপা ও আশীর্বাদ ছিল বলেই হিমালয়ের ভাবগম্ভীর পরিবেশে একাকী থেকে দীর্ঘ দিন একটু তপস্যা করতে পেরেছিলাম। উত্তরাখণ্ডের সে পুণ্যময় আনন্দস্মৃতি জীবনসায়াহ্নে আজও অম্লান হয়ে রয়েছে আমার প্রাণে।

১৯২০-২১ সালে লেখা রাজা মহারাজের দুটি আশীর্বাদী পত্র আমি পাই। পত্র দুটি জীর্ণ ও কীটদষ্ট হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা যায়নি। এইজন্য দুটি পত্রেরই অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে এই স্মৃতিকথা শেষ করছি :

(১) শ্রীমান দেবানন্দ, কনখল হইতে তোমার লেখা পত্র মাঝে মাঝে আমি পাই। তুমি উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘদিন আছো এবং তোমার নির্জনতা ও সাধনভজন ভাল লাগে জানিয়া খুশী হইয়াছি। মহাপবিত্র হিমালয়ে থাকিয়া তপস্যা করা মহাভাগ্যে হয়। তীব্র ব্যাকুলতা ও পুরুষকার থাকিলেই চরম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। সর্বদা বিবেক-বিচার জাগ্রত রাখিবে। সময়ের অসদ্ব্যবহার যেন এতটুকুও না হয়। ঐ সুন্দর সুযোগ তাঁর কৃপাতেই হইয়াছে। না খাটিলে বস্তু পাওয়া যায় না। স্মরণ-মনন, ধ্যান-জপ নিত্যনিয়ত করিলে তোমার কল্যাণ অবশ্যই হইবে। মন যত অন্তর্মুখী হইবে ততই বেশী আনন্দ অনুভব করিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

(২) শ্রীমান দেবানন্দ, এই কম বয়সেই মনটি গড়িয়া লও। অনাবশ্যক কথাবার্তা বা চিন্তা ত্যাগ করিবে। উদ্যম-উৎসাহ সর্বদাই মনেতে রাখিবে। তাঁর উপর ও নিজের উপর কখনো বিশ্বাস হারাইবে না। নিত্যই আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকিয়া যাইবে। এক মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়। জানিবে তোমার জন্য সময় দাঁড়াইয়া থাকিবে না। গোনাদিন ক্রমেই ফুরাইয়া আসিবে। তাই ধৈর্য ও উৎসাহ লইয়া সাধনভজন করিয়া যাইবে। তাঁর কৃপাশীষ যথাসময়েই লাভ করিতে পারিবে। কখনো হতাশ হইবে না। অমৃতের আস্বাদ পাইলে কোন সংশয় বা চিন্তাভয় থাকিবে না। তিনিই পথ দেখাইয়া লইবেন, যদি তাঁর শরণাগত হইতে পারো। তীব্র অনুরাগ ছাড়া ভগবানকে লাভ করা যায় না। জন্মজীবন সার্থক কর তাঁর ধ্যান, জপ, উপাসনায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাসনা তিনি পূর্ণ করুন। তুমি সেই আনন্দের অধিকারী হও। আমি ভাল আছি। আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
ব্রহ্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য ছোট নরেন

ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

ছোট নরেন প্রশ্ন করছেন, "আচ্ছা, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা (ফ্রি উইল) আছে কি না?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, "আমি কে খোঁজ দেখি। আমি খুঁজতে খুঁজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন! 'আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী'। চীনের পুতুল দোকানে চিঠি হাতে করে যায় শুনেছ। ঈশ্বরই কর্তা! আপনাকে অকর্তা জেনে কর্তার ন্যায় কাজ করো। যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান, আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী; আমি কর্তা বাবা গুরু—এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী'—এই জ্ঞান। অন্য সব উপাধি চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্দ থাকে না—উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা!—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!"[২১]

এরপর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে গান গাইতে বললেন। অনেক টালবাহানা করে নরেন্দ্রনাথ গান ধরলেন—(১) 'কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার। হয়ে পূর্ণকাম বোলবো হরিনাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার॥'; (২) 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'। রথযাত্রা বলে বলরাম আজ কীর্তনের ব্যবস্থা করেছেন—বৈষ্ণবচরণ ও বেনোয়ারীর কীর্তন। এবার বৈষ্ণবচরণ গাইছেন—'শ্রীদুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার। দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে নিস্তার॥' গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ। এরপর কথামৃতকারের বর্ণনা—"ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহাস্য-বদন। ক্রমে সব স্থির! একঘর ভক্তেরা অবাক হইয়া দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন! কি করে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে এসেছেন!"[২২]

সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে খুব কম ভক্তেরা স্পর্শ করতে পারতেন। বাবুরাম, রাখাল, ভবনাথ প্রভৃতি ভক্তেরা ছিলেন এ দলের মধ্যে। শুদ্ধাধার ছোট নরেন যে এ দলভুক্ত, উপরোক্ত কথামৃতের বর্ণনাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। কিন্তু অন্য এক সময় এর ব্যতিক্রম হয়েছিল। ১৮৮৫ সালের রথ-যাত্রা উৎসবে বলরাম বসুর বাটীতে ঠাকুরের শুভা-গমন হয়েছিল—উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন তিনি ওখানে রাত্রিবাসও করেছিলেন। পরের দিন তিনি নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। সঙ্গে ছিলেন যোগেন, ছোট নরেন প্রভৃতি কয়েকটি বালক-ভক্ত ও আর জনাকয়েক স্ত্রীভক্ত। স্ত্রীভক্তেরা নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গেলেন। ঠাকুর বালক-ভক্তগণসহ কালীমন্দিরে প্রণাম করতে এসে ভাবাবিষ্ট হয়ে নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে বসে মধুর কণ্ঠে গান ধরলেন—'ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনী। মূলা-ধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী।' ভক্তেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনছেন। গাইতে গাইতে ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। গান থেমে গেল। ঠাকুর গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন। তাঁর শরীর একটু হেলে পড়েছে দেখে, পাছে

২১ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২৩; ২২ ঐ, পৃঃ ২২৩-২৪

ঠাকুর পড়ে যান, ছোট নরেন তাঁকে ধরতে গেলেন। কিন্তু স্পর্শমাত্র ঠাকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলেন। ছোট নরেনের স্পর্শ ঠাকুরের ঈপ্সিত নয় বলে তিনিও সরে দাঁড়ালেন। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ছোট নরেনের মাথায় বাঁদিকে একটি ছোট আব হয়েছিল এবং ক্রমে বড় হচ্ছিল। যন্ত্রণা হবে বলে ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে ঐ জায়গাটিতে ঘা করে দিয়েছিলেন। এরপর লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন, "পূর্বে শুনিয়াছিলাম বটে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দেবমূর্তি স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু কথাটার সত্যতা যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এইরূপে প্রমাণিত হইবে, তাহা আর কে ভাবিয়াছিল! দেবভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইলেও ঠাকুর যে কি অন্তর্নিহিত দৈবশক্তিবলে ঐরূপ করিয়া উঠিলেন, তাহা বুঝা সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাঁহার যে বাস্তবিকই কষ্ট হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। ছোট নরেনকে ঠাকুর কত শুদ্ধস্বভাব বলিতেন তাহা আমাদের জানা ছিল এবং সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর অপর সকলের ন্যায় তাঁহাকে শরীরে ঐরূপ ক্ষতস্থান থাকিলেও ছুঁইতেছেন, পদস্পর্শ করিতে দিতেছেন ও তাঁহার সহিত একত্র বসা-দাঁড়ান করিতেছেন। অতএব তিনিই বা কেমন করিয়া জানিবেন, ভাবের সময় ঠাকুর ঐরূপে তাঁহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারিবেন না? যাহা হউক, তদবধি তিনি যত দিন না উক্ত ক্ষতটি আরাম হইল, ততদিন আর ভাবাবস্থার সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করিতেন না।"[২৩]

১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই ঠাকুর এসেছেন বলরাম মন্দিরে। নিরঞ্জন, পূর্ণ, মাষ্টার, নরেন্দ্র, বেলঘরের তারক প্রভৃতি ঠাকুরের দর্শনে এসেছেন। কিন্তু ছোট নরেন আসেননি। ভক্তদের কাছে ছোট নরেনের গুণের প্রশংসা করে ঠাকুর বলছেন, "কি আশ্চর্য! সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাঁদতো। (ঈশ্বরের জন্য) কান্না কি কমেতে হয়! আবার বুদ্ধি খুব। বাঁশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাঁশ! আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যেদিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) গিছিল,—কিন্তু, 'তিনি কই' বলে আর হুঁশ নাই, —লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়! আবার ভয় নাই—যে বাড়ীতে বকবে। দক্ষিণেশ্বরে তিন রাত্রি সমানে থাকে।"[২৪] আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের সামনে ঠাকুর বলছেন, "এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চর্য! ছোট নরেন-এর কুম্ভক আপনি হয়! আবার সমাধি! এক-একবার কখন কখন আড়াই ঘণ্টা। কখনও বেশী! কি আশ্চর্য!"[২৫] কাশীপুরে ছোট নরেন সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, "হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বুদ্ধি আদপে ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা জানি না।"[২৬]

ছোট নরেনকে ঠাকুর কত উচ্চাসন দিতেন, তাঁর কত প্রশংসা করতেন—দক্ষিণেশ্বরে একদিন আর একটি ঘটনা হতে জানতে পারা যায়। পানিহাটি মহোৎসবের (১৮৮৫ সাল) পর ভক্তসহ ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছেন। ভক্তেরা প্রণাম করে ঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে নৌকাতে উঠলেন। হঠাৎ এক ভক্তের জুতো আনতে ভুল হওয়ায়, আবার তিনি ঠাকুরের ঘরে গেলেন। ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে ঠাকুর সেদিনকার আনন্দের কথা, ভক্তদের

২৩ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-উত্তরার্ধ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৪৯
২৪ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২৮-২৯; ২৫ ঐ, পৃঃ ২৪১
২৬ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২৬৩

ভাবাবেশের কথা বলছেন। ছোট নরেনের প্রশংসা করে তাঁকে বললেন, "…'ছোট নরেন বেশ ছেলে—না? তুই একদিন তাহার বাটীতে যাইয়া আলাপ করিয়া আসিবি—কেমন?' যুবক তাঁহার সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, 'কিন্তু মশায়! বড় নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আর কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটীতে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।' ঠাকুর উহাতে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, 'তুই ছোঁড়া ত ভারী একঘেয়ে, একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির কাজ, ভগবানের পাঁচ ফুলে সাজি—নানাপ্রকারের ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে না পারাটা বিষম হীনবুদ্ধির কাজ; তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি—কেমন, যাইবি তো?' সে অগত্যা সম্মত হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা গিয়াছিল, ঐ ব্যক্তি কয়েকদিন পরে ঠাকুরের কথামত ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়া তাহার কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমস্যার সমাধান লাভপূর্বক ধন্য হইয়াছিল।"[২৭]

বলরাম মন্দিরে একবার ঠাকুর এসেছেন বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। ছোট নরেনও এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর বলরামের বাটীতে এলেই ছোকরা-ভক্তদের ডেকে পাঠাতেন। ছোট নরেন মাঝে বলেছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বদা আসিতে পারি না, পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি। তাই ছোট নরেন এলে ঠাকুর বলছেন, "তোকে ডাক্‌তে পাঠাই নাই।" ছোট নরেন হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "তা আর কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর হলে আসবে!" ঠাকুর যেন অভিমান করে কথাগুলি বললেন।[২৮]

বলরাম মন্দির থেকে ঠাকুর নন্দ বোসের বাড়ীতে এলেন ছবি দেখার জন্য—চতুর্ভুর্জ বিষ্ণুমূর্তি, হনুমান-শ্রীরাম, বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণ, বামনাবতার প্রভৃতি। এরপর ঠাকুরের শুভাগমন হল শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে। এই শোকাতুরা ব্রাহ্মণী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচিতা 'গোলাপ-মা', যিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গিনী ছিলেন। এই গোলাপ-মার বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন। গোলাপ-মা ছোট নরেনকে ডেকে এনেছেন। ভক্তদের তিনি বলছেন, "ছোট নরেনকে এনেছি,—বলি তা না হ'লে হাসবে কে?"[২৯] ছোট নরেনের কথায় সকলে হাসতেন। যখন ঠাকুর গোলাপ-মার কাছে বিদায় নিয়ে গণুর মার বাড়ীতে যাবেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একজন প্রদীপ ধরে আসছেন ঠাকুরকে পথ দেখাবার জন্য। আসতে আসতে এক জায়গাতে আলো পড়ল না। ছোট নরেন উচ্চস্বরে বলছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে ক'রো না যে, পিদ্দিম ধরা ফুরিয়ে গেল!" একথাতে সকলে হেসে লুটোপুটি। এ হাসির ফোয়ারা এখানেই থামল না—গণুর মার বাড়ী অবধি চলল। গণুর মার বাড়ীতে ঠাকুরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কয়েকজন ছোকরা কনসার্ট বাজাচ্ছিল। ছোকরা-ভক্তদের গান গাইতে বলা হল। গোলাপ-মাও এসেছেন। তিনি বললেন যে, ছেলেরা কেউ গান জানে না। যদিও একজন জানেন, তিনি ঠাকুরের সামনে গাইতে পারবেন না। তখন একজন ছোকরা বলল, "কেন? আমি বাবার সুমুখে গাইতে পারি।" ছোট নরেন উচ্চহাস্য করে বললেন, "—অতদূর উনি এগোন নি।" সকলে তখন হাসছেন।[৩০]

ঠাকুর ছোট নরেন সম্বন্ধে একবার বলেছিলেন,

---

২৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৭৯-৮০; ২৮ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯৬
২৯ ঐ, পৃঃ ২০৭; ৩০ ঐ, পৃঃ ২০৯-১০

"ওর খুব উচ্চ অবস্থা ; যদি কামিনী-কাঞ্চনে ছোব না ছ্যায় (দংশায়), তাহলে এ একজন মহাযোগী হবে।"[৩১] কিন্তু বিধির বিধানে ছোট নরেনকে বিয়ে করতে হল ১৮৮৬ সালের প্রারম্ভে। ঠাকুর তখন অন্তিম শয্যায় কাশীপুরে। ছোট নরেন বিয়ে করার পর কাশীপুরে ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছেন। সেদিনকার ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, "...জনৈক (ছোট নরেন) বিবাহ করিয়া কাশীপুরের বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত হইয়াছে এইরূপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্বক অজস্র রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরকে ভুলিয়া যেন একেবারে (সংসারে) ডুবিয়া যাসনি।'"[৩২]

কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখকর হয়নি।[৩৩] তিনি ক্রমশঃ কামিনী-কাঞ্চনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ভক্তদের একবার বলেছিলেন, "...ছোট নরেন শেষে বড় কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে পড়লো, টাকা-পয়সায় জড়িয়ে পড়লো। ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।"[৩৪]

ছোট নরেন পরে ওকালতি পড়ে কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্নী হয়েছিলেন, যদিও তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে খুব পসার জমাতে পারেননি।[৩৫] বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন বলরাম মন্দিরে ১৮৯৭ সালের ১লা মে ভক্তদের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মিশনের প্রথম সেক্রেটারী হয়েছিলেন আমাদের ছোট নরেন—বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র।[৩৬] ১৯০৯ সালে যখন মিশনকে রেজেস্ট্রিভুক্ত করা হয়, তখন ছোট নরেন মিশনকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। মিশনের যখনই কোন আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তখনই তিনি হাসিমুখে মিশনের সাধুদের ডাকে সাড়া দিয়ে কাজ করেছেন।

৩১, ৩৩ লীলামৃত, পৃঃ ৩৩৪ ; ৩২ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ১৮২-৮৩
৩৪ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, পৃঃ ১২৯
৩৫ লীলামৃত, পৃঃ ৩৩৪ ; ৩৬ History of the Ramakrishna Math and Mission by Swami Gambhirananda, 1st Edn. (1957), p. 121 এবং স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৯ম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ৫৭

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণ : প্রভুত্ব

পূর্বের দু'-একটি সংখ্যায় (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৮৬, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৮৭) বলদেবের মতানুযায়ী ব্রহ্মের প্রধান সপ্তবিধ গুণের বিষয় কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাতটি গুণ হ'ল : সর্বজ্ঞত্ব, আনন্দময়ত্ব, প্রভুত্ব, সৌহার্দ্য, জ্ঞানদাতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব এবং সৌন্দর্য।

এই সাতটির প্রথম দুটির কথা জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৮৭ সংখ্যায় বিস্তারিত বলা হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় ব্রহ্মের তৃতীয় প্রধান গুণ নিয়ে আরম্ভ করা হচ্ছে।

(৩) **প্রভুত্ব**—বলদেবের মতে ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে তৃতীয়টি হ'ল 'প্রভুত্ব'।

কিন্তু তার ঠিক পূর্বের দ্বিতীয় প্রধান গুণটি ছিল যখন 'আনন্দময়ত্ব', তখন হঠাৎ ঠিক তার পরেই একটি সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ 'প্রভুত্ব'কে তিনি এনে ফেললেন কেন? আমাদেরও মনে হ'ল যেন হঠাৎ স্বর্গ থেকে মর্তে আমরা পড়ে গেলাম এক নিমেষেই অকস্মাৎ! কারণ, যখন আমরা ব্রহ্মকে জানলাম 'আনন্দময়'রূপে, তখন আমরা কতই না নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম—যে-ব্রহ্মকে আমরা আমাদের সাধারণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এতদিন জানতাম একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী, অতীব ভয়াবহ, অতীব কঠিন-কঠোর, অতীব রুক্ষ-শুষ্ক, অতীব দৃঢ়-রূঢ়, অতীব ভাবলেশহীন, অতীব দয়ামায়াশূন্য সার্বভৌম সম্রাট ব'লে, শাসক ও বিচারক ব'লে, চালক ও তাড়ক ব'লে, তাঁকেই ত আমাদের পরমপ্রাজ্ঞ মুনিঋষিগণ আমাদের সম্মুখে নানা যুক্তি-অনুভূতি-সহকারে 'আনন্দময়'রূপে প্রকাশিত, প্রমাণিত ক'রে আমাদের যেন হঠাৎ তুলে দিলেন স্বর্গে—বললেন সানন্দে: পরব্রহ্মকে ভয় করো না, তিনি আনন্দস্বরূপ ও আনন্দগুণ—এবং এইভাবে 'আনন্দ' যখন তাঁর স্বরূপ ও গুণ উভয়ই একাধারে, তখন তিনি ত কারো নিরানন্দের কারণ হতেই পারেন না; তিনি স্বয়ং ওতপ্রোতভাবে 'আনন্দ' ব'লে সেই 'আনন্দ'ই ত তিনি সর্বত্র বিচ্ছুরিত করতে বাধ্য, অথবা সকলকেই আনন্দ দিতে বাধ্য; নতুবা তা হবে তাঁর নিজের স্বরূপেরই বিরুদ্ধে যাওয়া। সুতরাং, আমরাও প্রগাঢ় আনন্দের সঙ্গে, আমাদের আনন্দরসঘন পরমদেবতাকে গ্রহণ ক'রে নির্ভয় হলাম।

কিন্তু হায়, হঠাৎ এ কি হ'ল? বলদেবের ন্যায় মধুররসঘন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তের একজন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাও আমাদের নিকট হঠাৎ ব্রহ্মের 'প্রভুত্বে'র কথা এনে ফে'লে আমাদেরও ফেললেন বিষম ধাঁধায়; আমাদেরও দিলেন ভীষণ ভয় পাইয়ে; আমাদেরও করলেন একেবারে হতাশ—হঠাৎ ক'রে দিলেন আমাদের দাসানুদাস, পরাধীন, শাসনপীড়িত, শঙ্কাতাড়িত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জনই মাত্র—যে আমরা একটু আগেই ছিলাম অনন্ত আনন্দে বিভোর হয়ে, স্বয়ং শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গীরূপে তাঁরই আনন্দের অংশীদার হয়ে, তাঁরই সমস্তরভুক্ত হয়ে, তাঁরই গুণশক্তির আধার হয়ে।

কিন্তু কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। এটি ত কেবল একাকী বলদেবেরই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধদুষ্ট আচরণ মাত্রই নয়—সমস্ত বৈদান্তিকেরাই, এমন কি, মধুররসপূরিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বৈদান্তিকেরাও এই কথা নির্দ্বিধায় বলেছেন—বলেছেন ব্রহ্মের আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত দুটি রূপের কথা—ঐশ্বর্য-প্রধান রূপ, এবং মাধুর্য-প্রধান রূপ। এ সম্বন্ধে পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে। প্রথম দিক থেকে তিনি 'ভীষণ'; দ্বিতীয় দিক থেকে 'মধুর'।

এরূপে, প্রথম দিক থেকে, অর্থাৎ তাঁর 'ঐশ্বর্যে'র দিক থেকে, তাঁর অনন্ত অসীম অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় 'শক্তি'র কথাই আমরা বেশী ভাবব; দ্বিতীয় দিক থেকে, অর্থাৎ, তাঁর 'মাধুর্যে'র দিক থেকে, তাঁর তুল্য অনন্ত অসীম অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় 'প্রীতি'র কথাই আমরা বেশী ভাবব। কিন্তু এও ত আমাদের জানতে হবে একই সঙ্গে যে, এদের মধ্যে কেবল একটিকে নিয়ে থাকলে হবে আমাদের ভীষণ ভুল—'শক্তি'র সঙ্গে চাই 'প্রীতি'কে; 'প্রীতি'র সঙ্গে চাই 'শক্তি'কে অবশ্যম্ভাবী-রূপেই। সেজন্যই 'আনন্দময়ত্বে'র স্তরে কেবলমাত্র 'প্রীতি'কে নিয়েই যেন আমরা উন্মত্ত না

হই ; না যেন মনে করি যে, ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেবল খেলাখেলির, কেবল রসারসির, কেবল নাচানাচির ; না যেন মনে করি যে, তাঁর আর অন্য কিছুই কাজ নেই আমাদের সঙ্গে এইভাবে কেবল লীলা বা খেলায় মত্ত হয়ে থাকা ছাড়া ; না যেন মনে করি যে, তিনি কেবলমাত্র আমাদের ভালইবাসেন—সেই সঙ্গে শাসন করেন না একেবারেই, পরিচালিত করেন না একেবারেই, নিয়ন্ত্রিত করেন না একেবারেই—তাহলে তা একেবারেই ঠিক কাজ হবে না।

দেখুন, আমরা তুজনের মধ্যে যতপ্রকার সম্বন্ধের কথা জানি, তার প্রত্যেকটিতেই কি এই তুটি দিক—এই 'ঐশ্বর্যে'র দিক ও 'মাধুর্যে'র দিক, এই 'শক্তি'র দিক ও 'প্রীতি'র দিক ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হয়ে নেই, কমবেশী পরিমাণে? নিশ্চয়ই। ধরুন, পিতা-সন্তান ও মাতা-সন্তানের মধ্যে অতি সাধারণ, সর্বজনবিদিত সম্বন্ধের কথাই। হয়ত পিতার ক্ষেত্রে আছে বেশী 'ঐশ্বর্য' বা 'শক্তি' ; মাতার ক্ষেত্রে 'মাধুর্য' বা 'প্রীতি'। কিন্তু পিতা কেবলই শাসন করেন, ভালবাসেন না এতটুকু ; মাতা কেবলই ভালবাসেন, শাসন করেন না এতটুকু—এ কথাও কি হাস্যকর নয়? নিশ্চয়ই। কারণ, আমরা জানি যে, পিতা ও মাতা উভয়েই শাসনও করেন, আদরও করেন—নয়ত সন্তান মানুষ হবে কি করে ?

আবার ধরুন, আরোও নিকটতর মধুরতর সম্বন্ধের কথা—যেমন বন্ধু-বন্ধু, পতি-পত্নী, প্রিয়-প্রিয়ার রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর সম্বন্ধের কথা। এস্থলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারি যে, এই সব সম্বন্ধ এরূপ নিকটতম প্রাণের সম্বন্ধ যে, এদের ক্ষেত্রে আছে কেবলই প্রীতি, কেবলই লীলাখেলা, কেবলই আবেগোচ্ছাস, কেবলই উন্মাদনা-উন্মত্ততা—একেবারে বাধাহীন, একেবারে শৃঙ্খলাহীন, একেবারে নিয়মহীন যথেচ্ছ আচারাচরণই মাত্র। কিন্তু সত্যই কি তা-ই? সামান্যমাত্রও চিন্তা করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে, না, সত্যই তা নয়। কারণ, আমাদের নিজেদেরই মানব-স্বভাব এরূপ যে, কেবলই ভাবের আবেগে 'বুঁদ' হয়ে থাকলে, বিহ্বল হয়ে থাকলে আমাদের চলে না একেবারেই কোনো ক্ষেত্রেই। কারণ, মানবরূপে, সকল পশুজগতের মধ্যেও, আমাদের রয়েছে এক অতি নিজস্ব সম্পদ—অর্থাৎ, বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারানুশীলনশক্তি, যেজন্য মানবের সর্বজনজ্ঞাত সেই সুবিখ্যাত সংজ্ঞা বা definition হ'ল : 'Man is a rational animal'—'মানব বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পশু।' এই বিচারবুদ্ধি ত সেজন্য কোনো দিনও মরে না, মরতে পারে না। কারণ, তাহলে ত 'মানব' আর তখন 'মানবই' থাকবেন না, হয়ে যাবেন কেবলমাত্র দেহসর্বস্ব 'পশু'—কুকুর-বেড়ালের মতই। সেজন্য, তাঁর যখন অত্যন্ত প্রীতির অবস্থা, ভাবাবেগের অবস্থা, হৃদয়োচ্ছ্বাসের অবস্থা—তখনও তাঁর প্রিয়তম জনের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই থাকে প্রীতির পাশে ভক্তি, আবেগের পাশে সংযম, উন্মাদনার পাশে দৃঢ়তা, চাঞ্চল্যের পাশে স্থিরতা। নয়ত কেবলমাত্র তথাকথিত প্রীতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা প্রভৃতি নিয়ে থাকলে, কেবলমাত্র রামধনুর পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, কেবলমাত্র কল্পনার রথে রথে উড়ে উড়ে, কেবলমাত্র পদ্মমধুর মদে মদে বিভোর হয়ে হয়ে আর কদিন চলবে? তখন ত সবই যাবে 'গেঁজিয়ে', সবই যাবে 'বুঁদিয়ে', সবই যাবে 'তিতিয়ে', সবই যাবে 'বিষিয়ে'। আমরা এস্থলে এই দার্শনিক প্রবন্ধেও এরূপ একেবারে যাকে বলে অতি সাধারণ জনদের ভাষা (colloquial) ব্যবহার করলাম অবস্থাটার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবার জন্য—নয় কি? নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই তখন জীবনে অচিরেই এসে যাবে অনিবার্যভাবেই শ্রান্তি, ক্লান্তি, বিরক্তি, নৈরাশ্য, 'একঘেয়েমি', বৈচিত্র্যবিহীনতা।

এ ত আমাদের নিজেদের সামান্য-সাধারণ জীবনের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় স্পষ্টতমভাবে।

অতএব ভাবাবেগের উদ্দাম পালতোলা নৌকাকে বেঁধে ফেলতে হবে সাহসভরে, সুবুদ্ধি-সহকারে স্থির শৃঙ্খলতার সুদৃঢ় নোঙরে—প্রীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে শ্রদ্ধাকে, আবেগের সঙ্গে সম্ভ্রমকে, উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মনোবলকে। এই ত বেদান্তদর্শনের মূল কথা—'ঐশ্বর্য' ও 'মাধুর্যে'র অনুপম সমন্বয়ের মূল কথা।

আর, ভেবে দেখুন—যা একটু আগেই বলা হল—আমাদের সঙ্গে এরূপ প্রীতিমধুর, আনন্দরসঘন লীলাখেলা ছাড়া অনন্ত-অচিন্ত্য-গুণ শক্তিধর শ্রীভগবানের কি আর কিছু নেই করবার? নিশ্চয়ই আছে। তাঁকে ত করতেই হবে এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়সাধন। কারণ, তিনি ব্যতীত আর অন্য কে বলুন এই দুঃসাধ্য কার্য সম্পাদন করতে পারবেন? জীব? জগৎ?—অসম্ভব। জীব অল্পজ্ঞ, জগৎ একেবারেই অজ্ঞ। তাহলে? তাহলে তারা কিরূপে এই সুবিশাল সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করবে? কল্পনাতীত!—অসম্ভব!!

বস্তুতঃ, আরোও কত কাজ আছে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের। তিনি কেবল প্রারম্ভের সৃষ্টিকর্তা নন; তিনি পরিশেষেরও মুক্তিদাতা; তিনি জ্ঞানদাতা, শক্তিদাতা, এক কথায়—সর্বকল্যাণদাতা; তিনি কেবলমাত্র জগল্লীন (Immanent) নন, কেবলমাত্র অন্তর্যামী নন, কেবলমাত্র হৃদয়মন্দির-দেবতা নন; সেই সঙ্গে জগদ্বহির্ভূতও সমভাবে—

'পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।'

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩।১২।৬)

'সমুদয় ভূত তাঁর এক পাদ; (অবশিষ্ট) তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত।'

সেজন্য বেদান্তদর্শনে নির্দ্বিধায় বলা হয়েছে যে, ঐশ্বর্যবিমণ্ডিত, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই জীব-জগৎ-সংবলিত সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা, চালক, ধারক ও শাসকরূপে তাকে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করছেন—তাঁরই কঠোর শাসনে এই বিশাল বিশ্বচরাচরের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেই স্ব স্ব কার্য সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত করছে। সেজন্য শ্রুতি তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের সঙ্গে স্তুতি নিবেদন করেছেন অতি উপযুক্তভাবে—

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥'
'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

(কঠোপনিষদ্ ২।৩।২-৩)

'প্রাণ থেকে নিঃসৃত চঞ্চল বস্তুজাত
প্রাণেই হয় সদা কম্পিত।
উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ানক তাঁকে
যাঁরাই জানেন তাঁরাই হন অমৃত॥'
'তাঁরি ভয়ে অগ্নি হয় প্রজ্জ্বলিত,
তাঁরি ভয়ে সূর্য তাপ দেয় সতত।
তাঁরি ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যু
স্ব স্ব কার্যে হয় ধাবিত॥'

প্রায় একই মন্ত্র আছে তৈত্তিরীয়োপনিষদেও—

'ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৮)

'তাঁরি ভয়ে বায়ু হয় প্রবাহিত।
তাঁরি ভয়ে সূর্য হয় উদিত।
তাঁরি ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু
স্ব স্ব কার্যে হয় ধাবিত॥'

সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও একই সুরে বলা হয়েছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক

পরমপ্রজ্ঞাশীলা গার্গীকে 'অক্ষরব্রহ্মতত্ত্ব' প্রপঞ্চনা-কালে—

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত···' ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৮।৯)

'হে গার্গি! এই অক্ষরের (ক্ষয়হীন ব্রহ্মের) প্রশাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে রয়েছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে দ্যাবাপৃথিবী (স্বর্গধাম ও মর্ত্যভূমি) বিধৃত হয়ে রয়েছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত, অহোরাত্র, অর্ধমাস, ঋতু ও সংবৎসরসমূহ বিধৃত হয়ে রয়েছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে শ্বেতপর্বত (হিমাচল) থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাচ্য নদীসমূহ ও প্রতীচ্য নদীসমূহ যার যে দিকে গতি, সে সেই দিকে ধাবিত হচ্ছে। হে গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যগণ বদান্যগণকে প্রশংসা করেন; দেবগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্বীহোমের অনুগত হন।'

সেজন্যই ত তিনি আমাদের 'প্রভু'; আমরা তাঁর চিরদাসানুদাস। 'আনন্দময়' হলেও তিনি আমাদের এইভাবে, এরূপ সুকঠোরভাবে, এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে, এরূপ সুবিন্যস্তভাবে, এরূপ ন্যায়-পরায়ণভাবে, এরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে, এরূপ স্থির-ধীর-দৃঢ়-দৃপ্তভাবে পরিচালিত ক'রে চলেছেন অহরহ। তাহলে বলতেই হবে যে, 'প্রভুত্ব'ও তাঁর একটি প্রধান গুণ, যা—ভালো লাগুক আর নাই লাগুক—আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হবেই হবে অবশ্যম্ভাবীভাবেই। [ক্রমশঃ]

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[ফাল্গুন, ১৩৮৬ সংখ্যার পর]

'বর্তমান ভারত' 'উদ্বোধনে' শেষ হবার পরেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' শুরু হয়ে যায়।[১] এজন্য 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-রচনাটির প্রথম কয়েকটি অনুচ্ছেদ 'বর্তমান ভারতে'র ভঙ্গীতে সমাসবদ্ধ পদের ধারাবাহিক গাম্ভীর্যের অন্তরালে স্বামীজীর নিগূঢ় হাস্যপরিবেশন চলেছে। প্রথম অনুচ্ছেদটি শেষ হচ্ছে 'বর্তমান ভারত' শব্দে।

ভারতবর্ষে বিপুল সম্পদের পাশাপাশি নিদারুণ দারিদ্র্যের ছবি স্বামীজীর ভাষায়—"সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্বকারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃন্ময়-প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশা-ব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।"

সেদিনের 'বর্তমান ভারত' থেকে এদিনের 'বর্তমান ভারত' পর্যন্ত খুব কি পার্থক্য ঘটেছে? মানুষ এবং জীবজন্তু দুয়েরই সমান দুর্দশা স্বামীজী 'সমধর্মী সমশরীর' বিশেষণদুটির মাধ্যমে ফুটিয়েছেন। এ বর্ণনায় বিষাদ ও ব্যঙ্গ দুয়ের নিপুণ সমাবেশ।

---

১ দ্বিতীয় বর্ষের 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮ম সংখ্যা, ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭—এই সংখ্যায় 'বর্তমান ভারত' সমাপ্ত। এই বর্ষের ১০ম সংখ্যা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩০৭ থেকে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

"অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।"—এমন পরিপূর্ণ বিপরীতচিত্রের সহাবস্থান বোধ করি আজকের ভারত সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য! কলকাতার নগরচিত্র আজও অনেকটা এ ধরনের। আজ থেকে আশি বছর আগের ভারতের কথাই এখানে স্বামীজী লিখেছেন। সে চিত্র তাঁর জন্মভূমি ভারতের অন্যত্র যাই হোক, বাংলায় প্রায় অপরিবর্তিত।

প্রথমে ভারতে প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রটি ফুটিয়ে তুলে স্বামীজী বিদেশীর দৃষ্টিতে ভারতবাসী এবং ভারতবাসীর দৃষ্টিতে বিদেশী সভ্যতাকে দেখার সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং শেষ অবধি মন্তব্য করেছেন—"দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না।…এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু-দলেই ভেতরের আসল জিনিস দেখেনি।"

এ প্রবন্ধ লেখার পরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। বিদেশীদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দু'দলই পরস্পরকে বুঝবার পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যাঁরা দুই ভাবাদর্শের সেতুবন্ধনে পথিকৃৎ, স্বামীজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক এবং এ প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সভ্যতাচর্চার এক অমর উদাহরণ।

ভারতবাসীর প্রাণসত্য যে আজও অনির্বাণ, সেকথা মনে রেখেই স্বামীজী লিখেছেন—"আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইউরোপীদের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হ'লে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল।"

মূল প্রতিজ্ঞাটুকু উপস্থাপিত করে স্বামীজী এবার স্বদেশী ও বিদেশী মতবাদের ধ্বজাধারীদের সঙ্গে যুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ। আর তাঁর সংগ্রাম অনেক সময়ই কলকাতার চলতি বাংলার খরশাণ ভাষাদীপ্তিতে তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ নিয়ে আসে।

"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাবো, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ।…এটি তোমরাও বেশ ক'রে বোঝ—যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইউরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' ব'লে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন ব'লে 'হাঁসেন হোঁসেন' ক'রছ।"—উদ্ধৃত অংশে আক্রমণের ধার বিদেশীর চেয়ে এদেশী 'সাহেব'দের উপরেই বেশী। একটু বিশ্লেষণ করলে ঐ যীশু-ভক্তির বাড়াবাড়ি তখনকার ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে বেশী দেখা যেত না কি? কেশবচন্দ্র, প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতির খ্রীষ্টায়িত ব্রাহ্মধর্ম দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদেরই যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়েছিল। মূল আপত্তি 'খৃষ্ট'-চরিত-অনুধ্যানে নয়, ঐ সূত্রে পাশ্চাত্যানুকরণের বাড়াবাড়িতে। একথা এ কালের ভারতবর্ষের মিশনারি প্রচারকেরাও মনে রাখলে ভালো। ইংরেজ আগমনেই ভারতে যীশুর আগমন—এমন অদ্ভুত দাসমনোবৃত্তিজাত বক্তৃতাও সেকালের নেতারা দিতেন! বোধ হয় ভুলে যেতেন যে যীশুর ধর্মপ্রচার ভারতে সর্বপ্রথম যীশুশিষ্য সেন্ট টমাসই করেছিলেন। পোর্তুগীজ পাদ্রীদের বাংলায় খ্রীষ্টধর্মপ্রচার ইংরেজের বহু আগে। আসলে যীশু-বন্দনা তখন রাজশক্তি-বন্দনা বলেই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মনেতাদের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এঁদের বা এঁদের কাছাকাছি মনো-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত যীশুভক্তিকেই স্বামীজী

'হাঁসেন হোঁসেন'-করা বলে ব্যঙ্গ করেছেন। এখানে 'হাঁসেন হোঁসেন'-করা একটু বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত।

পাঠকদের হয়তো 'পরিব্রাজকে' স্বামীজীর এই শব্দব্যবহার মনে পড়বে—"ঐ যে একদল দেশে উঠছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন,...ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন হোঁসেন' করেন...।"[২] সেখানে কারবালার যুদ্ধে নিহত ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে বুক চাপড়ে কান্নারই ব্যঙ্গাশ্রিত সরস প্রয়োগ। আর 'যীশু এসে ভারতে বসেছেন ব'লে 'হাঁসেন হোঁসেন'-করা অর্থে গদ্‌গদ ভক্তিতে বিগলিত অশ্রুপাত।

স্বভাবতঃই কেশব-প্রচারিত যে ব্রাহ্মধর্ম খৃষ্টধর্মেরই ভারতীয় সংস্করণ, আমেরিকাবাসীরা তাকে তত গুরুত্ব দেয় নি। মনে রাখা ভালো যে, ম্যাক্সমূলরও কেশব সেন খৃষ্টান না হওয়ার দুঃখ চেপে রাখতে পারেন নি। সেদিক থেকে সমকালীন য়ুরোপীয়দের রামমোহনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে প্রত্যাশাও বিফল হয়।

স্বামীজী এই মতলববাজ খৃষ্টভক্তির বিরুদ্ধেই তর্জনীসংকেত করে লিখেছেন—"ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চ'ড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান, সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী ক'রে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম !!"

খ্রীষ্টধর্মপ্রচারের নামে গোপন সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার প্রতি ধিক্কার এবং বিদেশীর অনুগ্রহ লাভের জন্য খ্রীষ্টভক্তির আতিশয্যের উদ্দেশে অবজ্ঞা স্বামীজীর এই ব্যঙ্গধর্মী মন্তব্যের ছত্রে ছত্রে যেভাবে ঝ'রে পড়েছে, তার তুলনা স্বামীজীর লেখাতেও খুব কম মেলে।

'বুড়ো শিব', 'মা কালী', 'বংশীধারী' কৃষ্ণ—এখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক। নানা রূপান্তরে একদা এই পৌরাণিক ভারতীয় ধর্ম এশিয়া ও য়ুরোপের অনেক অংশেই আপন স্বাক্ষর রেখেছে। যাঁরা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, চীনে, জাপানে, দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছেন তাঁরা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। ভারতের পৌরাণিক সভ্যতা যে কতদূর বিস্তৃত ছিল আজকের থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), কাম্পুচিয়া (কম্বোজ), জাভা, বালি প্রভৃতিতে তার সহস্র প্রমাণ। বৌদ্ধদেবী-রূপে তারা বা কালী চীন-জাপানে সেদিনও পূজা পেতেন। স্বামীজীর দৃষ্টিতে এই মাতৃপূজারই প্রভাব খ্রীষ্টানদের মেরী-পূজায়। তা না হলে খ্রীষ্টানদের ভগবান পিতা (God, the Father), কখনোই মাতা ন'ন। কিন্তু স্বামীজী যেমন কিছু পরেই 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে' লিখেছেন—"প্রটেস্ট্যাণ্ট তো ইউরোপে নগণ্য—ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে জিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি—সব অন্তর্ধান—জেগে বসেছেন 'মা'! শিশু-যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'! বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর

---

২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৮৮

(Field-marshal) সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজা-হস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী'—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।"—সে বর্ণনা পড়লে মনে হয় ধর্মতত্ত্ব হিসাবে যাই থাক, মেরীর মহিমা অথবা ঈশ্বরের মাতৃমহিমা রোমান ক্যাথলিক ধর্মে বড়ো স্থান অধিকার করেছে। আর এই মাতৃমহিমা তন্ত্রপ্রভাবজাত কোনো ধর্মচেতনার সুদূর প্রভাব হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়! বস্তুতঃ খৃষ্টধর্মের উৎপত্তিই যে বৌদ্ধধর্ম থেকে এমন মতবাদও কোনো কোনো মনীষীর দ্বারা স্বীকৃত।

সে যাই হোক, স্বামীজীর মূল বক্তব্য হলো এই, চিরাগত ঐতিহ্যের দ্বারাই ('বুড়ো শিবের ষাঁড়', 'মা কালীর খাঁড়া', 'বংশীধারীর বাঁশী বাজানো') ভারতের উন্নতি নিজস্ব পদ্ধতিতে হ'বে। বিদেশী প্রচারকের সাধ্য নয় এই ধারাকে বিপথগামী করে।

"ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চার জনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হ'তে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!!"

এখানেও 'যীশুর জয় গাওয়া' বলতে পাশ্চাত্য সভ্যতার জয় গাওয়া, নিজের হীনতা লোকের কাছে জাহির করে গোলামি মনোভাবের পরিচয় দেওয়া। কিন্তু এর পরে এদেশী খোসামুদেদের উদ্দেশে স্বামীজীর আক্রমণ আরো তীক্ষ্ণ—"ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ', এ কথা ঠিক হ'তে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ঐ 'আমরা'র ভেতর দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্‌দিশি ভদ্রতা হে বাপু?"

এ ধরনের সাহেব-ভক্ত একালেও যে মেলে না, তা নয়। আধুনিককালে ইংরেজীতে লিখে নাম করেছেন এমন লেখকদের মধ্যে অনেকেই বিলক্ষণ ভারতনিন্দুক এবং সেজন্যই বিলাতপ্রসিদ্ধ। বাঙালী হিন্দু নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাঁদের মধ্যে বয়সে সর্বপ্রাচীন উদাহরণ। সেকালে স্বামীজী যেসব পাশ্চাত্য-অনুকরণসর্বস্বদের কথা ভেবেছিলেন, তাদের সব গুণগুলিই এঁর 'কন্টিনেন্ট অফ সার্সি', 'হিন্দুইজম' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকট। স্বামীজী যীশুর পদতলে 'হাঁসেন হোঁসেন'-রত এদেশীদের সম্বন্ধে যা যা বলেছেন সবই এ জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে সুপ্রযোজ্য।

ভারতীয় চিন্তাধারায় (সামগ্রিকভাবে এশীয় চিন্তাধারায়) জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য সম্বন্ধে একটি সূত্রে ব্যাখ্যা করে স্বামীজী এ দুই আদর্শের অন্তর্গত সূক্ষ্ম-পার্থক্যগুলি যে বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসনিষ্ণাত ভাষায় সর্বজনবোধ্য করে তুলেছেন, সমকালীন বাংলা গদ্যে তার জুড়ি মেলা ভার।

স্বামীজীর ভাষায়, "আমরা চাই কি 'মুক্তি'। ওরা চায় কি?—'ধর্ম'।" প্রবৃ সুখান্বেষণ আর নিবৃত্তিমূলক মুক্তির আদর্শ—এ দুয়ের মূলগত পার্থক্য থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনচেতনার অন্যান্য পার্থক্যের সূত্রপাত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে এই মোক্ষ বা নির্বাণের আদর্শ প্রধান হয়ে উঠেছিল।

"বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মতো আর কি আছে, দুনিয়া-সুদ্ধ মুক্তি নেবে চল।' বলি, তা কখন হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম

কর'—এ কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? ছটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, ছটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না —মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!!"

যাঁর জীবনে লক্ষ্য 'মুক্তি'—তিনি সর্বভূতে সমদর্শী হয়ে সব প্রতিক্রিয়ার উর্ধ্বে থাকবেন। কিন্তু যাঁর জীবনে লক্ষ্য 'ধর্ম'—তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবশ্য সংগ্রাম করবেন—"অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে।" "...শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে।"

ধর্মের নাম করে যারা নির্জীব নিষ্কর্মা জড়পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়, তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে স্বামীজীর বিদ্রূপ—"আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।" "ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন? আহম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান!"

এর পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভঙ্গীর পার্থক্য বিশ্লেষণে স্বামীজী যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণনৈপুণ্যে আর মনীষাজাত হাস্যরসের গভীরসঞ্চারী আলোকে এ দুই সভ্যতার আপাতবৈপরীত্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে 'হিউমার'-জাতীয় রচনার অনবদ্য উদাহরণ।

"প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হ'ল; ওরা—ইউরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ ক'রে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগত-জলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্' গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে।"

এতদূর অবধি দু'পক্ষের উলটো সমঝানোর বর্ণনার পর স্বামীজীর মোক্ষম মন্তব্য—"গীতার উপদেশ শুনলে কে? না—ইউরোপী। আর যীশুখৃষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!!"

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির নামে ভারতবাসীর জড়পদার্থের মতো তমোগুণাচ্ছন্ন মনোভাব, আর য়ুরোপীয়দের সদাপ্রাণচঞ্চল নিত্য অস্থির নব নব সুখান্বেষণ-তৎপরতার রজোগুণী চেতনা—এ দুয়ের এমন উজ্জ্বল, কঠোর অথচ সমবেদনাময় সরস সমালোচনা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে'র অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ।[৩]

[ক্রমশঃ]

৩ আলাদাভাবে নির্দিষ্ট না থাকলে সাধারণভাবে উদ্ধৃতিগুলি বাণী ও রচনা: ৬ষ্ঠ খণ্ডের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' থেকে নেওয়া।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

তৃতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

কাশীপুর উদ্যানবাটীর দোতলায় শ্রীরামকৃষ্ণ দুরারোগ্য ব্যাধিতে শায়িত। তাঁর প্রতি ভক্ত-সমাজের অন্তরঙ্গতা ও প্রীতিশ্রদ্ধা ক্রমেই হয়ে উঠেছিল ব্যাপক ও নিবিড়। যবনিকার পদধ্বনি ভক্তচিত্তকে যেন অধিকতর সন্নিকট করে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ চিরকালই অসাধারণ। তিনি এক অসাধারণ নিজস্বতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছিলেন। অবিচ্ছিন্ন কৃপাশীল শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সরস সহানুভূতি ও প্রবল রসবোধ দিয়ে সকলকেই প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু কখনই কারও নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেন নি। তিনি স্বমহিমায় বিরাজ করেছেন।

বাগানবাড়ীর খরচপত্র নিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের অবতারণা[১] হয়। গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কুজ্ঝটিকার ঘনঘটা দেখা দেয়। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে যেন একটা বৈরীভাব সৃষ্টি হয়।[২] জানা যায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র দিতেন বাড়ীর ভাড়া, বলরাম দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্যাদির খরচ, রামবাবু দিতেন সেবকদের খরচ। সম্ভবতঃ গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ (মাষ্টার) প্রমুখ ভক্তেরা অন্যান্য খরচ বহন করতেন।

সে সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্য ছিল ন্যাকড়া-ছাঁকা সুজির মণ্ড বা ভাতের মণ্ড, বা মাংসের সুরুয়া, কখনও বা শামুকের ঝোল, কখনও বা অন্য কিছু। তৎসত্ত্বেও ভগবদ্ভাবের স্ফূর্ততার প্রকাশহেতু ঠাকুরের জীবনের প্রতিক্ষণ ছিল আনন্দে উদ্ভাসিত।

সেদিন বুধবার, ৩রা মার্চ, ১৮৮৬ খ্রীঃ, ২০শে ফাল্গুন, ১২৯২ সাল।

মাষ্টারমশাই কাশীপুরে উপস্থিত হন। তিনি সেবক লাটুকে বালিশের জন্য এবং 'দানাদের' ও শ্রীমাতাঠাকুরানীর জলখাবারের জন্য ৪ টাকা দেন; ঋণশোধের জন্য গোপালকে ৬ টাকা দেন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতুলচন্দ্র ঘোষ ও নব কবিরাজ।

সন্ধ্যার পূর্বে মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, ঠাকুর দিগম্বর হয়ে অবস্থান করছেন। সেবক শশী অধ্যাত্মরামায়ণ

১ সেবক বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল লিখেছেন: 'গৃহী ভক্তরা ঘাতপ্রতিঘাতমধ্যে আপন ভাব বজায় রাখিয়া যুগপৎ ধর্মচিন্তা এবং সংসার ও সমাজ-সেবা সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন। সুতরাং কুমারগণকে এই কল্যাণমার্গ দিয়া আনয়ন না করিলে তাঁদের ত্যাগ ও নির্ভরতা পূর্ণ-বিকাশ হইবে না এবং সংসারী সন্তানগণেরও তাঁহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে না; বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী ও গৃহী সন্তানমধ্যে কিছুদিনের জন্য যেন একটা ঝটিকা সৃজন করিলেন।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, ২য় সং, পৃঃ ২১০-১১)

২ রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন: 'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সন্ন্যাসী ভক্তদিগের কথা গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন না এবং গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্ন্যাসীদিগকে বলিতেন না। কিন্তু কখন কখন উভয় পক্ষের নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া দিতেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে শাসন করিতেন। এইরূপে এই উভয় শ্রেণীমধ্যে কিঞ্চিৎ বৈরীভাব ছিল।'

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৭৯)

পড়ে শোনাচ্ছিলেন। 'রামের বনবাস' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় পড়ছিলেন। অধ্যায়ের পাঠ সমাপ্ত হবার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: **'থাক, থাক'**।

পরবর্তী দৃশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্য 'সুরেন্দর' এবং আরও কেউ কেউ। এই ঘটনার পটভূমিকাস্বরূপ অক্ষয়কুমার সেনের লেখনীতে পাই—

'দ্বিতলে যাইতে আর নাহি দেন কারে।
দরশনে আসে যারা সবে যায় ফিরে॥
ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র।
কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র॥

রাম ও সুরেন্দ্রের দুয়ে বিষাদিত মন।
সুরেন্দ্র নির্জনে করে অশ্রু বিসর্জন॥
গম্ভীরাত্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুমরে।
মনোদুঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে॥'

(পুঁথি, ৭ম সং, পৃঃ ৬১৯-২০)

ভক্তবৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রকে আদেশ করেন তাঁর বিছানার উপর বসতে। এই স্নেহ-কৃপার বিস্ফুরণে সুরেন্দ্রের অভিমান উথলিয়া ওঠে। তিনি অঝোরে কাঁদতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন: "গুরুদেব, আমি আপনাকে বই জানি না; [ঘুম থেকে] উঠবার সময়, খাবার সময়, অফিসে 'গুরুদেব' 'গুরুদেব' স্মরণ না করে কাজ করি না—আমি কি অপরাধ করেছি বলুন! কাল থেকে রাতে ঘুম নেই। এমন অশান্তি আর কখনও হয় নি।"

দরদ-বিগলিত শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রের গায়ে হাতে মাথায় হাত বোলান, যেন স্নেহশীলা জননী অভিমানী সন্তানকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শান্তকণ্ঠে বলেন: **আমি [তো] কিছু বলি নি**।

সুরেন্দ্র: 'তবে শুনতে পাই যে আমাদের উপরে আসবার হুকুম নাই।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে ইঙ্গিত করেন সব কিছু বুঝিয়ে বলার জন্য

মাষ্টার: 'না, না, [সেরকম কোন হুকুম ঠাকুর করেন নি]।'

সুরেন্দ্র শান্ত হন না। তিনি আবার বলেন: "আবার আমরা উঠে গেলেই নাকি বলেন, 'ও শ্যালারা, ওদের জিনিস কি আমি খাই …ও বিষ্ঠা!'

"শুনলুম, খোট্টাদের কাছে নাকি লোক গেছে৩ টাকার জন্য বলতে।"

এদিকে সুরেন্দ্রের বিলাপ বিলম্বিত হয়। তিনি বলেন: 'আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই আপনার সেবা করতে পেলুম না।'

'[হায়,] এইজন্যই কি আমরা আপনাকে দক্ষিণেশ্বর থেকে আনলুম?'

বিলাপকারীর খেদোক্তি বেশীদূর অগ্রসর হবার পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের রক্তবমন আরম্ভ হয়। মাষ্টার ইঙ্গিতে সুরেন্দ্রকে নিরস্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন, তাঁকে নীচতলায় যেতে। সেবকেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন।

দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। মাষ্টারমশাই হুটকো গোপালের সঙ্গে বাগানের পথে পায়চারি করতে থাকেন। হুটকো গোপালের নিকট থেকে জানা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে তিনজনের বাড়ী যেতে বলেছিলেন। প্রথম জন জনৈক ধনী মাড়োয়ারী। তিনি বড়বাজারে বাস করতেন

৩ 'তারপর বলিলেন হৃদয়বিহারী। / ডাকিয়া আনহ সেই খোট্টা মারোয়াড়ী॥ /… খবর পাইয়া সেই খোট্টা মারোয়াড়ী। / গোচরে হাজির সঙ্গে লয়ে টাকাকড়ি॥' শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, তদেব, পৃঃ ৬১৯)

এবং ঠাকুরের সেবা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন বহু কাল থেকেই। দ্বিতীয় জন, পাইকপাড়ার জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ সিংহ। ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে। তৃতীয় ব্যক্তি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিমান, ব্যবহারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, 'আমিই সব খরচ চালাবো। আমি যখন পারবো না তখন বলবো, তখন তোমরা অন্য চেষ্টা করো।'[৪]

যাহোক গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে মনোমালিন্য মিটে যায়, 'প্রভুর ইচ্ছায় অচিরে আনন্দ-মিলন সংঘটন হয়।' কিছুকালের মধ্যে সহজাবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইতোমধ্যে গিরিশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, মাষ্টারমশাই প্রভৃতি দানাদের ঘরে মিলিত হয়েছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে সেবক শশীর কথা ওঠে। সকলেই তাঁর অটল গুরুভক্তি ও নিবিড় নিষ্ঠার সেবা দেখে-শুনে মুগ্ধ। সকলেই পঞ্চমুখে তাঁর প্রশংসা করতে থাকেন। জনৈক সেবক তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন: 'একনিষ্ঠ শশিভূষণই কেবল পর্যায়বিধি লঙ্ঘন করিয়া, কোনমতে স্নানাহার সমাপনে সদাসর্বক্ষণ যেন ছায়ার ন্যায় প্রভুপার্শ্বে বিদ্যমান থাকিতেন; বলিতেন—মূর্ত ভগবান-জ্ঞানে যাঁহার শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহাকে অনাদর করিয়া, কোন্ সুখে অদৃশ্য দেবতার আরাধনা করিব?'[৫]

একনিষ্ঠ সেবক শশীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রসঙ্গ হতে থাকে। মধুর ভাবের সাধিকা এক পাগলী শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য প্রায়ই উপদ্রব করত। পাগলী প্রায়ই বাগানে আসে ও দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে, 'ভক্তেরা প্রহারও করেন, —কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না।' (কথামৃত ৩।২৬।২) ইতোমধ্যে পাগলী একদিন ঠাকুরের ঘরে ঢুকে পড়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে শশী পাগলীকে হড় হড় করে টেনে নীচে নামিয়ে দেন।

সেবানিষ্ঠ শশীর চারিত্রগুণের সঙ্গে তুলনা করে গিরিশচন্দ্র বলেন যে চিত্রকূট পর্বতে রাম ও সীতার বনবাসের সময় তাঁদের পাহারা দিতেন লক্ষ্মণ। তিনি বলেন: 'লক্ষ্মণ বলেছিল, চোখ ঘুমুবি? চৌদ্দ বছর যদি ঘুমুবি—চোখ উপড়ে ফেলব।'[৬]

'এইসব ভক্তিশ্রদ্ধা নিষ্ঠা হয় গুরু-কৃপায়।' তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে নমস্কার জানান।

গিরিশচন্দ্র আরও বলেন, "কিছুদিন আগে শশীর হাতে কি বেরিয়েছিল। ঠাকুর তাকে গঙ্গা-মৃত্তিকা মাখতে বলেছিলেন। ব্যস, গঙ্গামাটি মেখে বেলা একটা পর্যন্ত বসে আছে, কারণ 'উনি যে বলেছেন!'

"এদিকে নরেনকে খুব ভক্তি করে। সেদিন নরেন শশধর [পণ্ডিত]কে উপরে পরমহংসদেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যস, স্পষ্টবক্তা শশী নরেনকে চেপে ধরেছেন, 'কে তোমায় শশধর [পণ্ডিত]কে নিয়ে যেতে বলেছিল? তুমি permission নাও নি কেন?'

৪ 'মহাভক্ত শ্রীগিরিশ বিশ্বাসের বীর। / বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির ॥ / শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ। / প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ ॥ / একা যোগাইব ব্যয় ভয় কিবা তায়। / নহি ভীত যদি মোর ভিটামাটি যায় ॥' (পুঁথি, তদেব, পৃঃ ৬১৯)

৫ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, তদেব, পৃঃ ২৯২

৬ 'লক্ষ্মণ-বর্জন' নাটকে পঞ্চমদৃশ্যে রামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলছেন: 'ধনুর্ধারী প্রহরী আমার, / অনাহারে অনিদ্রায় ছিল বিপিনে, চতুর্দশ বিজন বৎসর;' গিরিশরচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

"শশী আবার Christ ও চৈতন্যের life বড় ভালবাসে।[৭] ওর সেবা দেখে ধারণা হয় Christian love কি বস্তু।

"একদিন পরমহংসদেব বলেছেন বেল খাবেন। তা রাত চারটা থেকে বেল খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে।"

সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : নরেন্দ্রই দেখছি ওদের মাথাটা খেলে।…

শশী : না, আমরা নরেনকে বলেছি, তাই [সে সব ব্যবস্থা করেছে]।

গিরিশচন্দ্র বলেন : 'সাহস দেখ। এই সাহসও গুরুকৃপা।'

পরবর্তী দৃশ্য। মুর্শিদাবাদের জনৈক যুবকের সঙ্গে কথা হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কয়েকটি। জোর করে কর্মত্যাগ করলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন ঘা ভাল করে শুকোবার পূর্বে মামড়ি তুললে রক্ত ঝরতে থাকে।[৮]

কামাদি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব একমাত্র ঈশ্বরের কৃপায়। যেমন বরফ কঠিন হলেও আগুনের তাপে ক্রমে ক্রমে গলে যায়।

উপায় হল শরণাগতি। ঈশ্বরে ঐকান্তিক শরণাগতি। তাঁর পাদপদ্মে সব সমর্পণ করা—যেমন বিড়ালের ছানা করে থাকে।[৯] যেমন রামের শরণাগত ব্যাঙ রামের ধনুকে বিদ্ধ হয়ে চুপ করে সহ্য করেছিল।[১০]

পরবর্তী দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের মানসিকতার একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা-সান্নিধ্যে নাট্যকার কবি গিরিশচন্দ্রের মধ্যে শুরু হয়েছিল বিবর্তনশীল পরিবর্তন। যুক্তিনিষ্ঠ গিরিশ-চন্দ্রের মধ্যে বিশ্বাস ও ভক্তির নবপ্লাবন এসেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রশ্রয়পুষ্ট গিরিশচন্দ্র প্রেমভক্তির মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ প্রচার করছিলেন তাঁর বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে। তিনি ভাবের গাঢ়তার সঙ্গে নাভাজী দাসের হিন্দী 'ভক্তমাল' গ্রন্থের একটি গান গাইতে থাকেন। গানটি হচ্ছে, 'আখের

৭ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বলেছিলেন : 'I always had a strong feeling for Christ even in my boyhood… I read a book by Lord Gouranga and at once I gave up all animal food.' (Sister Devmata : Days in an Indian Monastery, p. 22-31)

৮ ভোগান্তের পূর্বেই কর্মত্যাগের চেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলতেন : "ফোড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।" (কথামৃত ৫।৩।৩) তিনি আরও বলতেন : "কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই,—ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়।" (কথামৃত ৩।৯।৬)

৯ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন : দু'রকম সাধক আছে ; এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব।… বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে! মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে ; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না।" (কথামৃত ৩।৭।১)

১০ শ্রীরামকৃষ্ণ এ কাহিনীটি বলেছেন : পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গুঁজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন, ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে।…লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোলা ব্যাঙ। মুমূর্ষু অবস্থা। রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি শব্দ কর নাই,…যখন সাপে ধরে, তখন তো খুব চীৎকার করো।' ভেক বললে, "রাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি, রাম রক্ষা কর, রাম রক্ষা কর। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ করে আছি।" (কথামৃত ৩।১০।১)

মিট্টিমেঁ মিল যানা' ইত্যাদি। (শেষকালে সবই মাটিতে মিলিয়ে যায়, পঞ্চভূতে পরিণত হয়।)[১১]

গানের শেষে হৃষ্টচিত্ত গিরিশচন্দ্র বলেন : বড় আনন্দ হচ্ছে।

সেবক রাখালচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের একটি প্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন :

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে
আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে
পাবি রে প্রেম রত্নধন ॥
খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্ খুঁজলে পাবি
হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি
হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ ॥
ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে
চালায় বল সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্
ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

অতঃপর সেবক শরৎচন্দ্রও একটি ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেন। চিরঞ্জীব শর্মা রচিত সঙ্গীত :

গভীর অতলস্পর্শ, তোমার প্রেমসাগরে ;
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে।
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কূল কিনারা,
হ'ল চিরমগন,
ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন,
রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত,
একেবারে মুগ্ধ করে ॥[১২]

(চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী, পৃঃ ৩৫।)

[ক্রমশঃ]

১১ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে গিরিশচন্দ্র নাভাজী দাসের ভক্তমাল' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ থেকে তাঁর "বিল্বমঙ্গল ঠাকুর" নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন। এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন।

১২ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৭৪-৬৭৬

হৃদয়ের মায়াবতী

শ্রীমতী জয়ন্তী সেন

সম্পূর্ণ নির্জন হও, তারপর বাজবেই সুর
গুহাতে যা প্রতিধ্বনি
পাহাড়ের ফাটলে ফাটলে !
এ জীবন অভিযান—
পাকদণ্ডী বেয়ে
চূর্ণিত তুষারে একা পদচিহ্ন রেখে
চলে যাওয়া !
উত্তুঙ্গ শিখর আর আনত আকাশ রাখীবদ্ধ
ধ্যানমগ্ন নিঃসঙ্গ হৃদয়ে !
তারি নাম মায়াবতী—
সে এক আশ্চর্য গভীর
অব্যক্তের অনুভূতি কবিতার মিলে !
জ্যোতির্ময় অনন্তের
সান্তে মিলে যাওয়া—
অদ্বৈতহিমাদ্রি-অঙ্গে রবিদীপ্তি
দ্বৈততরঙ্গের রঙ্গে !

সৌরাষ্ট্র-কচ্ছ বন্যাত্রাণ

রাজকোট, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের আবেদন

সম্প্রতি সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছে অবিরাম বর্ষণের ফলে বর্তমানে বন্যায় যে বিপর্যয় সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। নদীর জলোচ্ছ্বাসে বহু গ্রাম জলমগ্ন। বহু পরিবারের গৃহ ও ধ -সম্পত্তি বিনষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, ইতিমধ্যেই জুনাগড় জেলার মালিয়া, হাতিনা ও কেশোড় এবং রাজকোট জেলার ঝাঁঝমের, ফারেনি ও সুপেড়ি গ্রামসমূহে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে। খাদ্যশস্য, বাসনপত্র ও বস্ত্রাদি ৫৫৮টি দুর্গত পরিবারের মধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বিতরিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের অন্যান্য বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাতেও রাজকোট আশ্রম কর্তৃক ত্রাণকার্য শীঘ্রই শুরু করা হইবে।

গত বৎসর মোরভির ত্রাণকার্যে সদয়হৃদয় বন্ধুগণের বিপুল উৎসাহ ও মুক্তহস্তে দানের কথা স্মরণ করিয়া আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পুনরা সকলের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এই সঙ্কটকালে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে দুর্গত জনগণের সেবায় তাঁহাদের সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

এই বন্যাত্রাণকার্যের জন্য আপনাদের সহৃদয় দান কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 'একাউন্ট-পেয়ী' চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট' এই নামে লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে:

অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট
রাজকোট-৩৬০০০১

স্বামী ব্যোমানন্দ
অধ্যক্ষ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট
১৬।৮।৮০

বিঃ দ্রঃ—আই. টি. অ্যাক্ট, ১৯৬১'র ৮০/জি ধারা অনুসারে সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।
দ্রষ্টব্য: স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নং ১১০১ আরকিউ ২১২৫/ক্যাল/টিসি/সি.

স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী দিব্যানন্দকে লিখিত]

The Ramakrishna Vedanta Society
(A Charitable and Philanthropic Institution)

President
Swami Abhedananda

Registered under Act XXI of 1860
19B Raja Raj Krishna Street
Calcutta, Feb. 24th 1933

স্নেহের দিব্যানন্দ,

তোর 22nd তারিখের ও 17th তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। এইসঙ্গে শচীনবাবুকে পত্র দিলাম। ইহা তাঁহাকে দিবি। Walter Bushnell-এর case retrial চলিতেছে, এখনও শেষ হয় নাই একথা শচীনবাবুকে বলবি। আমাদের স্কুলে নূতন মাষ্টার রাখিয়াছিস এবং ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বের মত হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম। উমানন্দ এখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দেশে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিলে cooker তাহাকে দিয়া কিনিবার বন্দোবস্ত করিব এবং তাহাকে যে ২০৲ টাকা দিয়াছিস তাহা হইতে পুস্তকগুলি ক্রয় করা হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত ঝামাপুকুরের Edition-এ কেবল বাংলা পদ আছে। সংস্কৃত নাই। বসুমতী হইতে যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য বাহির হইয়াছে তাহাতে সংস্কৃত মূল ও শঙ্করভাষ্যের বঙ্গানুবাদ আছে, দাম মাত্র ৩৷৹ টাকা। অর্দ্ধেক মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। তোর কেবল বাংলা অনুবাদ আবশ্যক। আমার বোধ হয় বসুমতীর Edition ভালই হইবে। আশ্রমের স্কুল M. E. করিতে পারিলে ভাল হইবে। High School আমরা চাহিনা। এখানে খুব গরম পড়িয়াছে। আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। অপর সকলে ভাল আছে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবি ও সকলকে দিবি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

পুনঃ পূজা করিবার জন্য ব্রহ্মচারী এবং ডাক্তার পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। ইতি—অঃ

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র গুহরায়কে লিখিত]

(১)

Founder & President
Swami Abhedananda

The Ramakrishna Vedanta Ashrama
A Philanthropic and Charitable Institution
Darjeeling, 20. 8. 1936

কল্যাণীয় নারায়ণচন্দ্র,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি গত বৎসর কলিকাতায় আমাকে দেখিয়া আমার প্রতি তোমার ভক্তিশ্রদ্ধা হইয়াছে জানিয়া প্রীত হইয়াছি। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে তুমি জীবন গঠন করিতে চাও শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

বর্ত্তমানে তোমার পাঠ্যাবস্থা। মনোযোগ দিয়া পাঠাভ্যাস করিবে এবং তোমার মেজদাদা যেরূপভাবে তোমাকে শিক্ষা দিবে সেইভাবে চলিবে। তুমি শ্রীরামকৃষ্ণনাম জপ করিবে দশবার প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এবং তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিবে যাহাতে তোমার ভক্তিবিশ্বাস জন্মে। মধ্যে ২ কথামৃত পাঠ করিবে।

তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

The Ramakrishna Vedanta Society
A Philanthropic and Charitable Institution
Registered under Act XXI of 1860
19B Raja Raj Krishna Street
Calcutta, 10. 4. 1937

President
Swami Abhedananda

স্নেহের নারায়ণচন্দ্র,

তোমার ২৬শে চৈত্রের পত্র এইমাত্র পাইলাম। জপ সম্বন্ধে তোমার মেজদাদা যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক। তবে প্রত্যহ নিয়মমত ১০৮ বার সংখ্যা রাখিতে পার, তদুপরি যতবার পার করিবে।

আমি বৈশাখ মাসের শেষের সপ্তাহে দার্জ্জিলিং যাইব স্থির করিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাসে ভীষণ গরম পড়িবে। ১৮ই এপ্রিল কয়েক জনের দীক্ষা হইবে সেই সময়ে যদি সুবিধা হয়ত আসিতে পার। দীক্ষা লইতে হইলে অন্তত ৫৲ টাকা খরচ করিতে হইবে। যদি বৈশাখ মাসে তোমার এখানে আসিবার সুবিধা না হয় তাহলে ৺শারদীয়া পূজার সময় আমি দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিলে হইতে পারে।

অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অভেদানন্দ

পুনঃ তোমার পূর্ব্বপত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে পারি নাই।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে

শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা

ভ্রমণ—তা সে দেশভ্রমণই হোক বা পুণ্য-লোভাতুর মন নিয়ে তীর্থভ্রমণই হোক, তার একটা আনন্দ আছেই। এই আনন্দের তাগিদেই মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আমিও গত বছর জুলাই মাসে বাবা অমরনাথ ও মা ক্ষীর-ভবানীর দুর্নিবার আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

১১ই জুলাই ১৯৭৯, বুধবার। ভোর পাঁচটায় বিডন স্ট্রীটের 'আনন্দ আশ্রম' থেকে যাত্রা শুরু। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি বহু যাত্রীর সমাবেশ। কুণ্ডু স্পেশালের কর্মীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ও তৎপরতা—'হিমগিরি এক্সপ্রেস' ট্রেনে মালপত্র তোলা, যাত্রীদের বসার বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি সব দায়দায়িত্ব যে তাঁদেরই! প্রত্যেক যাত্রীর টিকিট খরচ হাজার টাকা আহারাদিসহ।

সকাল ৬টা ২০ মিনিটে হিমগিরি এক্সপ্রেসের দেহটা নড়ে উঠলো। কয়েকদিনের জন্য সংসারের মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি আমার। রথযাত্রার দিন ঠাকুরঘরে বসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অঞ্জলি দিতে দিতে মনে মনে প্রাণের যেকথা তাঁকে জানিয়েছিলুম আজ তা বাস্তবে পরিণত হলো। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো।

হিমগিরি এক্সপ্রেস চলেছে। পিছনে কী পড়ে রইলো—সেদিকে তাকাবার অবসর নেই তার। আমাদেরও মনের অবস্থা সেই রকম। পেছনের নয়, শুধু সামনের চিন্তা—বাবা অমরনাথকে দর্শন করতে পারবো তো? —দুর্গম পথ নির্বিঘ্নে অতি-ক্রম করতে পারবো তো?··· ট্রেন চলেছে তীব্র-গতিতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। আহারাদি ট্রেনেতেই। সুন্দর ব্যবস্থা কুণ্ডু স্পেশালের। নিখুঁত। এঁদের সংরক্ষিত কামরা দুটি—একটি বড় ও একটি ছোট। বড় কামরাটিতে মেয়ে-ভক্তের সংখ্যাই বেশী।

পাটনা, মোগলসরাই, বারাণসী—বড় বড় স্টেশনগুলি পার হয়ে গেল একে একে। সন্ধ্যায় সুমধুর কীর্তন ট্রেনের কামরায়। সব চিন্তা যেন মুহূর্তের মধ্যেই মন থেকে মুছে গেল!

রাত ৮টা ৩৫ মিনিট। ট্রেন এসে পৌঁছলো লক্ষ্ণৌ-এ। রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে সবাই একে একে আশ্রয় নিলাম নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে। —'যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥'

১২ই জুলাই। ভোর চারটে। ট্রেন ছুটে চলেছে হু হু করে। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম। অনেকেই তখন ঘুমে অচেতন। কেউ-বা উঠে বসে ঘুমচোখেই আধো-আলো আধো-ছায়ায় দেখছেন বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য। গোল গোল হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে দুপাশের বিস্তীর্ণ জমি—গাছপালা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হয় সেগুলোই ছুটছে, আমরা বসে আছি স্থির হয়ে—কি ভ্রান্তি! শঙ্করাচার্যের ভাষায়—'অধ্যাস'।

ভোর পাঁচটার মধ্যেই স্নান সেরে নিলাম। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আর মায়ের ধ্যান ঐ ট্রেনের কামরাতেই। উপায়ই বা কি! অনেকে উঠে পড়েছে এর মধ্যে ঘুম থেকে। চা খেল তারা—'ন চায়ুক্তস্য ভাবনা'—চা-রসিকদের রসের কথা! আমি ও রসের রসিক নই—একটু হরলিকস খেলাম তাই।

বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই জম্মু স্টেশনে

হিমগিরি এক্সপ্রেসের পৌঁছানর কথা। ২৪ ঘণ্টার বেশী কেটে গেছে ট্রেনে। জম্মু স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। এবার নেমে পহলগাঁওয়ের পথে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। ঠেলাঠেলি, হৈচৈ,—কর্মব্যস্ততা। হাতে হাতে যার যার ছোট ছোট মালগুলি নিয়ে আমরা উঠে বসলাম রিজার্ভ-করা পহলগাঁওগামী বাস দুটিতে। তখন প্রায় বেলা বারোটা। বাস ছাড়লো। কুণ্ডুর কর্মীরা দুপুরের খাবারের প্যাকেট হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছিল বাসের মধ্যেই। তাঁরাও তো আমাদের চলার পথের সাথী।

বাস চলছে হেলেদুলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সময়ের কথা তখন মনেই আসছে না আমাদের। দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছি দুপাশে। কি অপূর্ব দৃশ্য! চোখ আর মন দুই-ই ভরে উঠলো। আবার এরই মধ্যে শুরু হলো ভজনকীর্তন। ভজনকীর্তন যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিয়ে দিল সবাইকে। রাস্তায় তিন-চারবার বাস থামিয়ে চা জলখাবার ইত্যাদি খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সবাইকে।

রাত প্রায় একটা। বাস এসে থামল পহলগাঁওয়ে। খুব কাছেই একটি হোটেল। নাম 'পাইন হোটেল'। সার্থক নাম। চারদিকেই পাইন গাছের শোভা। ২৫নং ঘরে আমার স্থান হলো। সাথী আরও দুজন বয়স্কা মহিলা। নাম নমিতা আর অনীতা। চোখে ঘুম আর দেহে পথশ্রম-জনিত ক্লান্তি। হাত-পা ছড়িয়ে শুতে না শুতেই ঘুমের কোলে অচেতন হয়ে পড়লাম সবাই। পহলগাঁও থেকেই ট্রেন-বাস বিদায় দিয়ে হেঁটে বা অন্যভাবে আমাদের যেতে হবে অমরনাথে।

১৩ই জুলাই। খুব ভোরেই উঠেছিলাম। স্নানাদি সারতে না সারতেই ডাক পড়লো খাবারঘরে। লুচি, ছোলার ডাল আর শেষে চা। বাইরে থেকে আওয়াজ আসছিল ছেলেদের। ডাণ্ডী, ঘোড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। যার যেভাবে খুশী যেতে পারে। চমৎকার আবহাওয়া। আমি এই ফাঁকে ছেলেকে চিঠি লিখে পহলগাঁওয়ে পৌঁছনর খবর দিলাম।

এর পর বেরিয়ে পড়লাম সহযাত্রী কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে। সুন্দর একটি ঝর্না নজরে পড়লো। স্বচ্ছ জল ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। আমরা বসলাম সেখানে। অতি মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিছু দোকানও রয়েছে। সুন্দর সুন্দর শাল আর শাড়ির দোকান। ফিরে এলাম সন্ধ্যার একটু আগে।

ঘোড়ায় চড়তে আমার খুব ভয়। তাই ডাণ্ডীতেই যাবো স্থির করেছিলাম। আগামী কাল যাত্রা শুরু হবে। স্বামী শিবানন্দ গিরির ছোট ভাই—সেজমেয়ে ভারতীর ছোট দেওর সমীর এসে ডাণ্ডীভাড়া ১২০০ টাকা নিয়ে গেল। মাঝে সামান্য বৃষ্টি হয়েছিল। এখন বেশ চমৎকার আবহাওয়া। ঘরে বসেই বাবা অমরনাথকে ডাকছি আর বলছি: 'বাবা অমরনাথ, তোমার পাদমূলে যেন পৌঁছতে পারি, তোমার দর্শন যেন পাই।'

সন্ধ্যা হতেই আমি আমার ঘরে ঢুকে ধূপ জ্বালিয়ে ঠাকুর আর মায়ের ধ্যান করলাম। স্মরণ করলাম বাবা অমরনাথকে। এর পরই রাতের খাওয়ার ডাক পড়লো। খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম।

১৪ই জুলাই। এখান থেকে আজই আমাদের রওনা হতে হবে। প্রথমে চন্দনবাড়ি গিয়ে সেখানে রাত্রিবাস করতে হবে। স্থির করলাম জীপ গাড়ীতে যাবো। ভাড়া বেশী পড়বে ৫০ টাকা, কিন্তু একঘণ্টায় পৌঁছে দেবে দশ মাইলের পথ। এ খবরটা গতকালই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যাত্রী-দলের নেতা পূজ্যপাদ শিবানন্দ গিরি মহারাজ

আহারাদি সারার পর যাত্রার আয়োজন। ঘোড়া, ডাণ্ডী, জীপ—সব প্রস্তুত। সবাই যে যার সঙ্গের অল্প মালপত্র নিয়ে নিজ নিজ বাহনের ওপর স্থান করে নিল। কিছু লোক আবার হাঁটাপথেও রওনা হলো। আমরা পহলগাঁও থেকে বেলা বারোটায় রওনা হয়ে বেলা একটাতেই পৌছলাম চন্দনবাড়িতে কুণ্ডুদের ক্যাম্পে। একে একে বাকী সবাইও এসে গেল সময় মতো। নতুন জায়গা। নতুন পরিবেশ। সবার মনেই আনন্দের তুফান। ফটো তোলা, বেড়ানো, হৈচৈতে সময় কেটে গেল কোথা দিয়ে কিছুই বোঝা গেল না। ক্যাম্পের মধ্যে খাটিয়ার ব্যবস্থা। কুণ্ডুর লোকেরা প্রতিটি খাটিয়াতে একটি করে তোশক দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যা হতে না হতেই হিমেল হাওয়ার বেশ বোঝা গেল। বুঝলাম, রাত্রে ভালোই শীত লাগবে। তাড়াতাড়ি সবাই ক্যাম্পে ঢুকে আশ্রয় নিলাম। ইতিমধ্যে আমরা ঝর্না থেকে হাত-মুখ ধুয়েই এসেছিলাম। কুণ্ডুর লোকেরা হাতে হাতে তেলেভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছিলেন সবাইকে। শীতের ভয়ে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই ক্যাম্পের পর্দাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ঠাকুরের নাম করতে চেষ্টা করলাম। ভক্তবৃন্দসহ মহারাজজী যথাপূর্ব ভজনকীর্তন ক'রে সবাইকে আনন্দ দিলেন। তারপর কুণ্ডুর কর্মীরা তাঁবুতে তাঁবুতে মোমবাতি জেলে দিয়ে গেলেন। আর সবার হাতে হাতে রাত্রের খাবার দিলেন। কাল সকালেই শেষনাগের দুর্গম পথে পাড়ি দিতে হবে। মনের মধ্যে নানান চিন্তা নিয়ে শুয়ে পড়লাম তাড়াতাড়ি।

১৫ই জুলাই। ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে ধূপ জ্বালিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের, মায়ের আর শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতি সাজিয়ে জপ-ধ্যান করলাম প্রাণভরে। তারপরই সাজ সাজ রব উঠে গেল চন্দনবাড়ি ক্যাম্পে। বাইরে শোনা গেল—ডাণ্ডীওলা, মালবাহক, ঘোড়ার মালিক আর কর্মী ও যাত্রীদের হৈচৈ; মালপত্র গোছানো, আর বাঁধাছাঁদার শব্দ। আমিও জুতো জামা মোজা পরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। বেশ ঠাণ্ডা। গরম পোশাকেও হাড় কাঁপিয়ে দেয়। চন্দনবাড়ি থেকে এখন আমাদের গন্তব্যস্থল—শেষনাগ। কী দুর্গম পথ!—যাঁরা গেছেন, তাঁরাই জানেন।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—পহলগাঁও থেকে এই দুর্গমপথে রওনা হওয়ার সময় যাত্রীরা যেমন অল্প জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছিল, তেমনি পয়সাকড়িও বেশী সঙ্গে নেয়নি। কুণ্ডুদের ব্যবস্থা খুব ভালো। ওঁদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক আছে, সবাই সেখানে টাকা-পয়সা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নেয়। আমিও পহলগাঁওয়ে আমার ১৫০ টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়েছিলাম ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে। সবারই মালপত্র একটি নির্দিষ্ট ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছিলেন তিনি।

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ মাত্র ৮ মাইল। কিন্তু এই দুর্গমপথ পার হওয়া প্রাণ হাতে ক'রে পার হওয়ার মতো। পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই তো আছেই। এছাড়া ঝড়, তুষারবৃষ্টি—প্রাকৃতিক বিপর্যয় কতো রকমের! মাঝে মাঝে ডাণ্ডীওলা যখন বরফের ওপর পা টিপে টিপে পার হচ্ছিল আমায় ডাণ্ডীতে নিয়ে, তখন ভয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে ফেলছিলাম আমি। যদি একটু বেসামাল হয়—ব্যস, আর দেখতে হবে না—কোথায় যে কোন্ খাদের ফাঁকে গড়িয়ে গিয়ে আটকে যাবো কেউ বলতে পারে না। ডাণ্ডীওলা অভয় দিলেও আমি কিন্তু মনে মনে ভয়ই পেয়েছিলাম। ভয় খুব বেশী হলে ঠাকুরের কথা, মায়ের কথা, গুরুদেবের কথা স্মরণ করি—মনে বল পাই। মনে মনে ভাবি,—মানুষ হয়ে জন্মেছি যখন, মরতে তো একদিন হবেই। তার ওপর এই

তীর্থস্থানে মৃত্যু—সে তো পরম ভাগ্যের কথা!

পাহাড়ের সরুপথ। নজরে পড়ে হিমালয়ের গা বেয়ে নেমে আসছে কল্লোলিনী ঝর্নাধারা। চারিদিকের মনোরম দৃশ্য—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয় যেন! শুধু দেখছি আর দেখছি। কত কথাই মনে আসছে!—নয়নাভিরাম এই প্রকৃতি যাঁর বিভূতি, সেই চির-সুন্দরের নিঃসীম সৌন্দর্যের তুলনা কোথায়!

আমরা এসে পৌঁছলাম 'পিসুঘাটি'তে। ডাণ্ডী-ওলা ডাণ্ডী নামাল এখানে। সব লোকজন এসে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ডাণ্ডীওলা টাকা নিয়ে গেল চা খেতে। আমি এবং অন্যান্য যাত্রীরাও হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। কেউ কেউ চা খেল। আমি কলেতে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। বেশ রোদ। অসহ্য মনে হচ্ছে। মাথা ব্যথা করছে। বেশীক্ষণ অপেক্ষার সময় নেই। আবার যাত্রা শুরু হলো। ডাণ্ডীতে, ঘোড়ায় আর হেঁটে যাত্রীর দল সারিবদ্ধ-ভাবে চলেছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাবার সময় পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে মাঝে মাঝে মানুষ-জন হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। বড় চমৎকার দৃশ্য। তারপরই আবার তাদের সাক্ষাৎ মেলে। হেঁটে যাঁরা আসেন, ভাবি তাঁদের কথা। তাঁদের কষ্টের কথা। আবার ভাবি, এঁরাই বাবা অমরনাথের সত্যিকার ভক্ত। তীর্থ করতে হয় পায়ে হেঁটেই। আমরা তো আরামে চলেছি অপরের কাঁধে চেপে।

আমরা চন্দনবাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম বেলা সাড়ে আটটায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে এর মধ্যে। সূর্যের তাপও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। গায়ের কিছু গরম পোশাক খুলে ফেলতে হলো বাধ্য হয়ে। রোদের ঝলকানিতে মাথা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু কোন উপায় নেই। কষ্ট তো করতেই হবে। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে কি?—এটা তো সবারই জানা!

এইভাবে চলতে চলতে আমরা শেষনাগ হ্রদের পাড়ে এসে পৌঁছলাম। ডাণ্ডী থেকে নেমে শেষ-নাগের শোভা দেখতে লাগলাম। শ্যামাভ জলের রঙ। এমন জলের রঙ আর কখনও দেখিনি। অপরূপ দৃশ্য। হ্রদের গা ঘেঁষেই সুন্দর পাহাড় ভাগে ভাগে বিরাজিত। দেখে মনে হয়, একটু ধ্যান করলেই এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যাবে।

এভাবে শেষনাগের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেলা একটা নাগাদ আমার ডাণ্ডীটা এসে পৌঁছল কুণ্ডুর নির্দিষ্ট ক্যাম্পে। আসার পথে নজরে পড়েছিল আশপাশে ছড়িয়ে-থাকা অনেক কঙ্কাল। এমন কি ক্যাম্পের চারপাশেও অনেক কঙ্কাল দেখা গেল!

এর পর যার যার নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া তাঁবুতে আশ্রয় নিলাম আমরা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম নিরাপদ আশ্রয়ে এসে। সারা শরীর ব্যথা-বেদনায় আড়ষ্ট। ক্লান্তিতে দেহ-মন যেন ভেঙে পড়ছে। কুণ্ডুর কর্মীরা এসে প্রত্যেকটি খাটিয়াতে তোশক পেতে দিয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম খাটিয়াতে। সকাল থেকে কিছু খাইনি। ব্যাগ থেকে সন্দেশ বের করে খেলাম। আর একটু গ্লুকোজ। এর মধ্যে বাকী সব যাত্রীও একে একে এসে পৌঁছল। একটু পরেই কুণ্ডুর কর্মীরা গরম চা আর জলখাবার দিয়ে গেল সবাইকে। পরম তৃপ্তিতে খেয়ে দেহ-মনে চাঙ্গা হয়ে উঠলো সবাই। আগে শুনেছিলাম, পরবর্তী ক্যাম্প 'পঞ্চতরণী'তে আজই পৌঁছে সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু যাত্রীদের দৈহিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে দলনেতা সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, আজকের রাতটা এখানেই কাটানো হবে এবং আগামী কাল ভোরে শুধু চা খেয়ে আবার যাত্রা শুরু ক'রে কালই আমরা বাবা অমরনাথকে দর্শন করবো। এই সংবাদে আনন্দ আর তৃপ্তি পেলাম মনে। ভোরের অপেক্ষায় রইলাম সকলে—এক চিন্তা, শরীর সুস্থ থাকবে তো, বাবা অমরনাথের দর্শন পাবো তো!

অমরনাথ-দর্শন

১৬ই জুলাই, সোমবার। রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ আমার সেজমেয়ে ভারতীর দেওর—দলনেতা মহারাজজী স্বয়ং তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। বললেন, সবাই তৈরী হও, আজই পঞ্চতরণী হয়ে বাবা অমরনাথকে দর্শন করতে হবে।

শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর দূরত্ব প্রায় আট মাইল। এই পথও অতি দুর্গম। বহু জায়গায় অনেকে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। অনেক জায়গায় আবার ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে বরফে-ঢাকা পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। ঘোড়ার পা কখনও কখনও বরফের মধ্যে বসে যাওয়ায় পাহাড়ী পথে চলায় অভ্যস্ত ঘোড়াগুলিও টাল সামলাতে পারছে না। চলার পথে ঝর্নাসৃষ্ট নদীগুলি অতিক্রম করতে ডাণ্ডীওলা অনেক সময় আমাকে কাঁধে করে পার করেছে। তখন মনে হয়েছে, এই বুঝি আমার বৈতরণী পার হওয়া! আমাকেও অনেক সময় কিছু পথ হেঁটে যেতে হয়েছে। চোখের সামনে দেখলাম অনেকে পড়ে যাচ্ছে। এইভাবে দুর্গম পথ অতিক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল অনেকেই। সবাই ভাবছিল, আর কতদূর!

শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর পথে যেতে সর্বোচ্চ যে চূড়ায় উঠতে হয়, সেটির নাম 'মহাগুণা টপ'। এর উচ্চতা সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট। এখানে দেখা গেল, কুণ্ডুদের ডাক্তারবাবু অক্সিজেন নিয়ে বসে আছেন। প্রয়োজনবোধে যাত্রীদের জন্যই এই অক্সিজেন রাখা। পথে যেতে আরও নজরে পড়লো টিনের প্লেটে লেখা—'হুঁশিয়ার'। কোথাও বা লেখা—'আস্তে চলুন, দম শেষ করে ফেলবেন না। এগিয়ে যান। বাবার গুহা সামনে এসে গেছে।'—ইত্যাদি পথ-নির্দেশ। যাই হোক, আমরা ভোর পাঁচটায় শেষনাগ থেকে রওনা হয়ে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পঞ্চতরণীতে কুণ্ডুর ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম।

এখানেই চা আর জলখাবার খেয়ে একটু বিশ্রামান্তে নৈবেদ্যের ডালি সাজিয়ে যার যার নির্দিষ্ট বাহনে উঠে বেরিয়ে পড়লাম সবাই বাবা অমরনাথের দর্শনে। বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। পথশ্রমের সব ক্লান্তি মুছে গেছে মন থেকে। শুধু আনন্দ আর আনন্দ!

বাবা অমরনাথের কৃপায় আবহাওয়া খুবই ভাল ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে হয়নি। যদিও রাস্তা অনেক জায়গায় বরফে ঢাকা, তবু বৃষ্টি নেই বলে শীতে বিশেষ কাবু করতে পারেনি। রোদ ছিল মাথার ওপর। যাই হোক ক্রমে আমরা অমরনাথের গুহার নিকটে এসে পৌঁছলাম। গুহায় ওঠার সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে যেখানে, ডাণ্ডী সেখানে এসেই থামলো। 'মাতাজী নামো নামো, এখান থেকেই হাঁটতে হবে' বললে ডাণ্ডীওলা। শুনে মাথায় যেন বাজ পড়লো। আজ সোমবার—অমরগঙ্গায় স্নান করবো বলে গামছা, বোতল, বর্ষাতি অনেক কিছু এনেছি, না খেয়েই রয়েছি—শুধু একটু গ্লুকোজ ছাড়া। কি করি! ডাণ্ডীওলার হাতে কিছু জিনিস দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই সমীর বললে, 'হেঁটে উঠছেন কেন? ডাণ্ডীওলাই আপনাকে মন্দিরে তুলে দেবে।'

ডাণ্ডীওলাকে বলাতে সে আমাকে তুলে নিয়ে একেবারে বাবার দুয়ারের কাছে এসে থামলো। আগে থেকেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল অমরগঙ্গায় স্নান করবো। সবাই দেখিয়ে দিলে অমরগঙ্গা-মাকে। বরফের গুহা থেকে বরফ-গলা জল নীচে পড়ছে বরফের চাতালে—চৌবাচ্চার মতো জায়গা। সেখান থেকে জল নিয়ে সবাই দিচ্ছে বাবার চরণে; আবার সঙ্গে ক'রে নিয়েও যাচ্ছে। আমি সেখানেই মাকে পূজো দিয়ে স্নান সেরে নিলাম। অমরগঙ্গার জল বোতলে পুরে নিলাম কলকাতায় নিয়ে যাবো

ব'লে। অনেক দিনের একটা সাধ মিটলো আমার।

বেলা তিনটে বেজে গেছে তখন। শুকনো কাপড়-জামা পরে সামনেই বসে-থাকা ফুলওলার কাছ থকে ফুল কিনে নিলাম। বাবার বেদীমূলের সিঁড়ির কাছে দাঁড়ালাম। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বরফের বাঁধানো বেদী। বেদীমূলের গা ঘেঁষেই বাবার বরফের শিবলিঙ্গ-মূর্তি দর্শন করলাম—প্রায় এগার ফুট উঁচু।

আমরা যেদিক দিয়ে যাচ্ছি, সরু পাথরের উপর দু' পা পেতে চলার মতো রাস্তা। রাস্তা ঘেঁষেই ছোট্ট রেলিং। রেলিং ঘেঁষেই উঠছি সবাই। একটু যাবার পরই সামনেই একজন পূজারী সাধুজীকে নজরে পড়লো। তিনি সবার নাম গোত্রাদি জেনে নিয়ে সংকল্পমন্ত্র পাঠ করিয়ে পূজা নিবেদন করাচ্ছেন। সাধুজীর পাহাড়ী ভাষা ভাল বোঝা গেল না। আমরা নিজেরাই 'বাবা অমরনাথায় নমো নমঃ' ব'লে যার যা প্রাণের ইচ্ছা মতো মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ফুল-বেলপাতা ও পূজার অন্যান্য সামগ্রী বাবার চরণে নিবেদন করলাম। জয়ধ্বনি উঠলো চারদিক থেকে—'জয় বাবা অমরনাথজীকী জয়।'

আমার মেয়েরা অমরনাথের পূজোর জন্য রূপোর বেলপাতা, টাকা, ফল, মিষ্টি প্রভৃতি তাদের নামে উৎসর্গ করবার জন্য দিয়েছিল। আমিও ১০৮টি চন্দন-মাখানো বেলপাতা, ফল-মিষ্টান্নাদি বাবাকে নিবেদন করবো ব'লে সঙ্গে এনেছিলাম। সবই নিবেদন করলাম বাবাকে। অমরগঙ্গার জল চরণে দিলাম। ধূপ-মোমবাতি জেলে দিলাম। পূজা, অঞ্জলি, দর্শন, স্পর্শনে মন ভরে গেল। বাবা অমরনাথের করুণা স্মরণ ক'রে কাঁদতে লাগলাম। একটি আসন পেতে একপাশে বসে পরম পূজ্যপাদ গুরুদেব বিরজানন্দজী মহারাজের হাতের দেওয়া মালা বের ক'রে মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করলাম। আমাদের দলনেতা শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ গিরি মহারাজ পূজা, আরতি, স্তবস্তুতি, প্রার্থনা ক'রে বাবা অমরনাথকে পূজার ডালি নিবেদন করলেন। তাঁর উদাত্ত-কণ্ঠোৎসারিত শিবের স্তুতিগানে বাবার গুহা মুখরিত হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে বাবার উপর দিয়ে একজোড়া পায়রা উড়ে গেল। কেউ দেখলো, কেউ দেখতে পেল না, কেউ বা শুধু ডানা-ঝাপটার শব্দ শুনলে।

সাড়ে তেরহাজার ফুট উঁচুতে বরফের রাজ্যে রয়েছি আমরা। নগ্নপদে পুরো একটি ঘণ্টা কিভাবে আমাদের কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। সময়ের জ্ঞান ছিল না। এরপর নেমে আসার পালা। শুনলাম পাশেই আছে একান্ন পীঠের এক পীঠ। সতীর এক অঙ্গ এখানে পড়েছিল। বরফের বেদীপীঠ দর্শন ও প্রণাম করলাম সবাই। চমৎকার ভাবগম্ভীর পরিবেশ!

সারা বছরই কিন্তু বাবা অমরনাথের দর্শন মেলে না। গুরুপূর্ণিমা থেকে শ্রাবণী ঝুলনপূর্ণিমা পর্যন্ত তীর্থপিপাসুরা এখানে আসতে পারেন। বাকী সময় থাকে বরফাবৃত। বাবা অমরনাথের মাথার উপরে পাহাড়ের ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে সেই জল জমেই বাবার তুষারমূর্তির আবির্ভাব ঘটে। তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—বাবার এই তুষারমূর্তির পরিমাপ তুষারপাতের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই তুষারশিবলিঙ্গ দর্শন করতে যাঁরা আসেন, তাঁরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই আসেন। দুর্গম পথে কারও কিছু বিপদ ঘটলে সঙ্গের সাথীরাও কিছু করতে পারেন না। মা ছেলেকে হারান, ছেলে মাকে হারায়—এ ধরনের ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। পথে যেতে আসতে বহু নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছি।

পঞ্চতরণীর ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমরা বিকেল

সাড়ে ছটা নাগাদ। এ সময়ে এখানে রাত ৮টা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে। ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত আমরা সকলেই। কুণ্ডুর কর্মীরা একঘণ্টার মধ্যেই আলু ও পাঁপড়ভাজা সহ খিচুড়ির থালা আমাদের হাতে হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মুখে তা অমৃতবৎ মনে হলো। তারপর বাবা অমরনাথের শুভ্র সৌম্য ধ্যানমূর্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে ক্লান্ত দেহটি নিয়ে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

১৭ই জুলাই। সকালের চা-জলখাবার খেয়ে বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ শেষনাগের পথে যাত্রা শুরু হলো। কিছুটা পথ যেতে না যেতেই দারুণ বৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো তুষার-ঝড়। অবশ্য ঝড়টা আরম্ভ হওয়ার পরই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি শেষনাগ পর্যন্ত হয়েছিল। যাই হোক অনেক কষ্টে আমরা শেষনাগ ক্যাম্পে এসে পৌঁছলাম। কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ না ভেবে সকলের পরামর্শ মতো আমরা নেমে চললাম চন্দনবাড়ির দিকেই। একে ভিজে জামা-কাপড়, তার ওপর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা—আমাদের দুর্গতির আর সীমা ছিল না। এইভাবে চন্দনবাড়ির ক্যাম্পে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন বিকেল পাঁচটা। অক্ষত শরীরেই এসে পৌঁছেছিলাম সবাই। তবে আমরা যারা ডাণ্ডীতে করে এসেছিলাম, অন্যদের তুলনায় অনেক ভালভাবে পৌঁছেছিলাম। বেশী কষ্ট পেয়েছেন ঘোড়ায়-চাপা যাত্রীর দল। আমার ডাণ্ডীবাহক চারজনই খুবই ভালো ছিল। তা সত্ত্বেও সব সময়েই মনে হতো তাদের হাতেই প্রাণটা যাবে।

চন্দনবাড়িতে এসে রোদের মুখ দেখলাম। ভিজে জামা-কাপড় বিছানাপত্র রোদে দিলাম। কুণ্ডুর লোকেরা এত দীর্ঘ পথ কষ্ট ক'রে এসেও অল্প সময়ের মধ্যেই গরম গরম আলুর চপ, চা ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। সন্ধ্যায় গিরি মহারাজ ভজন ও নাম-কীর্তন পরিবেশন করলেন। তারপর রাতের আহার এবং শেষে নিদ্রা

১৮ই জুলাই। ফিরে চললাম সবাই পহলগাঁওয়ের পথে সকালের জলখাবার খেয়েই। ফুটফুটে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা যাওয়ার পথে পয়সা, বিস্কুট-লজেন্সের জন্য বায়না ধরলো। দিলাম তাদের। সাথী অনীতা ঘোষও দিল। পয়সা, বিস্কুট-লজেন্স পেয়ে কী আনন্দ তাদের! তাদের আনন্দ আমরাও বুকভরে উপভোগ করলাম। বেলা এগারটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম পহলগাঁওয়ে। দারুণ ঠাণ্ডায় নাক-মুখ পুড়ে গেছে আমাদের। কিন্তু দুঃখকষ্ট যতই হোক, আনন্দ তার থেকে অনেক বেশী। দুর্গমপথ অতিক্রম ক'রে বাবা অমরনাথকে দর্শন করা কজনের ভাগ্যে ঘটে! সেদিনটা আমরা পহলগাঁওয়ে ছিলাম। জায়গাটি অতি মনোরম—আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। আমরা অনেকেই এখানকার বাজার থেকে কিছু কেনাকাটা করলাম। সন্ধ্যায় ভজন-কীর্তন হলো। রাতের আহারের পর শুয়ে পড়লাম। অনেকদিন পরে সুনিদ্রা হলো।

১৯শে জুলাই। আজ শ্রীনগর রওনা হওয়ার পালা। দুপুরের আহারপর্ব মিটে গেলেই পহলগাঁও থেকে বেলা একটা নাগাদ শ্রীনগরের বাসে রওনা হলাম। বিকেল চারটের মধ্যেই শ্রীনগরের হোটেলে এসে পৌঁছলাম আমরা। একটু পরেই কুণ্ডুর কর্মীরা গরম গরম সিঙাড়া আর চা দিয়ে গেলেন আমাদের যার যার নির্দিষ্ট ঘরে।

অনেকেই বেরিয়ে পড়লো এরপর শ্রীনগরের পথে। কেনাকাটা, বেড়ানো দুই-ই হলো। সন্ধ্যায় যথারীতি ভজনকীর্তনের আসর বসলো। গিরি মহারাজ মাতৃনামে মাতোয়ারা হয়ে গেলেন।

রাত দশটা বেজে গেছে। পাশের হোটেলে

শ্রদ্ধেয় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী উঠেছেন শুনে মহারাজজী আমাদের সবাইকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। প্রণামাদির পর শুরু হলো ভজনগান। দু পক্ষেরই ভক্তেরা যোগ দিলেন তাতে। মোহনানন্দজী নিজে মন্দিরা বাজিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও একঘণ্টার ওপর গান করলেন। এরপর প্রসাদ ও হোমের ফোঁটা নিয়ে হোটেলে যখন ফিরলাম, তখন অনেক রাত। আহারাদি সেরে শুতে শুতে রাত একটা!

২০শে জুলাই। দিনের আহারাদি সেরে বেলা এগারটার মধ্যেই বাসে চেপে রওনা হলাম গুলমার্গ দেখতে। সেখানে পৌঁছে কেউ কেউ ঘোড়া ভাড়া করে ঘুরতে বেরুলো। আমরা কয়েকজন হেঁটেই ঘুরলাম। পাহাড়ের ওপর শিবের মন্দির—ফুল দিয়ে খুব সুন্দর ক'রে সাজিয়েছেন পূজারী ঠাকুর। হঠাৎ এ সময় বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় ঐ মন্দিরেই আশ্রয় নিলাম আমরা। বাবার মাথায় গঙ্গাজল ও পয়সা দিয়ে প্রণাম করলাম। বৃষ্টি থেমে যাবার পর হোটেলে ফিরে এলাম সবাই সন্ধ্যার মধ্যেই। সেদিনও মোহনানন্দজীর ওখানে ভজনকীর্তনের আসর বসেছিল। অনেকেই যোগদান করেছিলেন।

ক্ষীরভবানী-দর্শন

২১শে জুলাই, শনিবার। সকালে চা খেয়ে সবাই বাসে উঠে বেরিয়ে পড়লাম ক্ষীরভবানী মায়ের দর্শনের জন্য। মন্দিরের সামনেই বিক্রেতারা দুধ, ফুল ও পূজার ডালি সাজিয়ে বসে আছে। সবাই নিজেদের রুচি মতো পূজার সামগ্রী কিনে মায়ের পূজা দিলাম, দর্শন ও প্রণামাদি ক'রে এলাম।

মন্দিরের ফটকের মধ্যে ঢুকেই বাঁদিকে রয়েছে শিবের মূর্তি আর মহাবীরের বিরাট মূর্তি। আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। অতি সুন্দর জায়গাটি। পরিবেশের মাধুর্য মনকে অভিভূত করে।

মন্দির থেকে ফেরার পথে ডাল হ্রদ এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মসজিদটি দেখলাম।

এরপর হোটেলে ফিরে এলাম। আহারাদির পর বেলা আড়াইটা নাগাদ কুণ্ডুদের কর্মীরাই বাসে ক'রে আমাদের নিয়ে চললেন শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দর্শনে।

শিবমন্দির থেকে বাস থামল বেশ কিছু দূরেই। এখান থেকে অনেকখানি হেঁটে যেতে হলো মন্দিরে। মন্দিরচত্বরে পৌঁছে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতে না উঠতেই প্রবল বৃষ্টি। অনেকে ফিরে গেলেন বাসে। আমরা কয়েকজন বৃষ্টিতে ভিজেই উঠতে লাগলাম। এ বৃদ্ধবয়সে আমার পক্ষে এভাবে ভিজে সিঁড়ি ভাঙাই মুশকিল। এত জোরে বৃষ্টির জল আসছে যে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছি না—হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হলো। আমার হাত থেকে বটুয়া আর ভিজে শালখানি কমলা নামে একটি মেয়ে নিল এবং আমার হাত ধরে তুলতে সাহায্য করলো। সর্বাঙ্গ সিক্ত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করেই প্রাণের আবেগে বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম। বাবার মাথায় গঙ্গাজল ও পয়সা দিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা করলাম। সমস্ত দুঃখ-বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই মুছে গেল মন থেকে।

এই স্থানটি শ্রীনগরের মধ্যে বেশ উঁচু। এখান থেকে পরিষ্কার শ্রীনগর শহরটিকে দেখা যায়। চমৎকার উপভোগ্য দৃশ্য। পদ্মের ও গোলাপের শ্রী সবচেয়ে মনোরম।

সেদিন আমরা যারা ভিজে গিয়েছিলাম, তাদের আর অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব হলো না। যাঁরা মন্দিরে যাননি, বৃষ্টিতে ভেজেননি, তাঁরা কুণ্ডুদের বাসে চেপে নিশাতবাগ প্রভৃতি আরও কিছু দর্শনীয় স্থান দর্শন করতে চলে গেলেন। আমরা যারা ভিজে গিয়েছিলাম, সংখ্যায় ছিলাম পনেরো ষোল জন। এতগুলি লোকের জন্য ট্যাক্সি পাওয়া

সম্ভব না হওয়ায় তিনটি শিকারা ভাড়া ক'রে হ্রদের উপর দিয়ে দিব্যি চারপাশের সৌন্দর্য উপভোগ ক'রে হোটেলে ফিরলাম বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ। মহারাজজী আমাদেরই সঙ্গে ছিলেন।

সেদিন হোটেলের মাঠেই ভজনকীর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। টুকিটাকি বাজার সেরে সন্ধ্যার মধ্যেই হোটেলে ফিরলাম। ভজনকীর্তন রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তারপর হরিলুটের শেষে হোটেলের ভিতরে এসে রাতের আহার শেষ ক'রে যে যার ঘরে নিজের নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। আগামী কাল ভোর ছটায় শ্রীনগর ছেড়ে জম্মুর বাসে উঠতে হবে।

২২শে জুলাই। সকালে এক কাপ চা খেয়ে বাসে উঠলাম। সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ল। কুণ্ডুদের স্থন্দর ব্যবস্থাপনায় বাসেতেই চা-জলখাবার, দুপুরের আহার এবং বিকেলে চিঁড়ে-বাদাম সহযোগে চা-পর্ব সমাধা হলো। জম্মুর হোটেলে পৌছলাম রাত প্রায় আটটার পর। স্থন্দর হোটেল। আলাদা আলাদা বাড়ি। রাতে কুণ্ডুর কর্মীরা ভাত, তরকারি সব তাড়াতাড়ি রান্না ক'রে আমাদের তৃপ্তি ক'রে খাওয়ালেন। আমরা যার যার নির্দিষ্ট ঘরে শুয়ে পড়লাম।

২৩শে জুলাই। আজই আমাদের জম্মু স্টেশন থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেস ধরতে হবে। ভোরে উঠে স্নান-আহ্নিক সেরে নীচে নেমে হোটেলের ম্যানেজারবাবুর কাছে শুনলাম জম্মুর প্রসিদ্ধ রঘুনাথজীর মন্দির দেখবার মতো। অনীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রঘুনাথজীর দর্শনে।

সত্যিই দেখবার মতো মন্দির! বিরাট জায়গা নিয়ে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। রাম লক্ষ্মণ-সীতার মূর্তি মাঝখানে। চারপাশে অগণিত দেবদেবীর মূর্তি এছাড়া বৃহৎ শিবলিঙ্গ ও মহাবীরের মূর্তিও রয়েছে দেখলাম। এ মন্দিরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, এখানে রয়েছে প্রচুর শালগ্রাম-শিলা। শুনলাম সোয়া বারো লাখ শালগ্রাম-শিলা এখানে আছে। মৌমাছির চাকের মতো। আকারে একটু বড় এই যা তফাত। ঘুরে ঘুরে সব দর্শন করলাম। রামমন্দিরে ফুল-ফল দিয়ে পূজা ক'রে হোটেলে ফিরে এলাম।

কুণ্ডুদের ব্যবস্থা খুবই ভাল লাগছিল। নির্দিষ্ট সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে এতগুলি লোককে খাওয়ানো এবং সব বিষয়ে যোগ্যতার সঙ্গে তদারকি করা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমার পনের দিনের অভিজ্ঞতার পটভূমিতে কুণ্ডু স্পেশালের স্থখ্যাতি না করলে এই দুর্গম তীর্থ-যাত্রার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

দুপুরে ভুরিভোজনের পর জম্মু-স্টেশনগামী বাসে উঠলাম প্রায় দুটোর সময়। স্টেশনে পৌছতে একঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। স্টেশনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিকেল ছটা পর্যন্ত। এর মধ্যে কুণ্ডুর কর্মীরা চা দিয়ে গিয়েছিলেন বিকেলে যথারীতি।

কলকাতাগামী হিমগিরি এক্সপ্রেস ঠিক সময়ে এসে দাঁড়ালো। কুণ্ডুদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাদুটিতে যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে বসলাম সবাই। ট্রেন ছেড়ে দিল যথাসময়ে। সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার —'চেন টান', 'চেন টান' ব'লে। চেন টানায় ট্রেন থেমে গেল। মাল তোলার কাজ তখনও শেষ হয়নি। কুণ্ডুর কর্মীরা সকলের মালপত্র গাড়ীতে তুলে যার যার মাল বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। একটু পরেই ট্রেন ছাড়ল আবার।

সন্ধ্যায় শুরু হলো ভজনকীর্তন। মহারাজজীর পরিবেশিত হরিনাম, কৃষ্ণনামে সবাই মুগ্ধ। কীর্তন-শেষে কুণ্ডুর কর্মীরা যথারীতি রাতের খাবার

পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আহারাদির পর একে একে সবাই শয্যা নিলেন। ট্রেন চলেছে দুরন্ত গতিতে।

২৪শে জুলাই। অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু দেরীতে ঘুম ভেঙেছিল। তাই লাইন দিয়ে স্নানাদি সারতে হলো। তারপর জপধ্যান শেষ ক'রে একটু মিষ্টি ও জল খেলাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম লক্ষ্ণৌ স্টেশন পার হচ্ছি তখন আমরা। কীর্তনের আসর শুরু হয়ে গেল। রুবি নামে একটি সাধিকা পর পর ভক্তিমূলক গান এবং হরিনাম ও কৃষ্ণনাম পরিবেশন করলেন। মৃদঙ্গ বাজালেন মহারাজজী স্বয়ং। আজকের দুপুরের আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল রেলওয়ে ক্যান্টিন থেকেই।

সন্ধ্যায় মহারাজজী ভজনকীর্তন আরম্ভ করলেন। আজকের ভজনকীর্তনের মাধুর্য সকলেরই মনে সুগভীর রেখাপাত করলো।

রাতের খাবার এসে গেল সবায়ের জন্য। ট্রেন চলেছে দু'ঘণ্টার বেশী লেট-এ। ঘড়ি দেখছে সবাই। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবার কথা রাত সাড়ে দশটায়। কিন্তু পৌঁছলো রাত প্রায় একটায়। আমি তো ভেবেছিলাম বিডন স্ট্রীটে 'আনন্দ আশ্রমে'ই রাতটা কাটিয়ে সকালে যোধপুর পার্কে বাড়ি ফিরবো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! এত রাতেও পুত্র আর পুত্রবধূ স্টেশনে উপস্থিত ছিল আমাকে নিয়ে যেতে। ছেলে অমলেন্দু আনন্দে 'মা' 'মা' ব'লে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করলো। আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম। আমাদের তিন জনকে সন্দেশ প্রসাদ দিলেন মহারাজজী। তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে ছেলের নিজের গাড়ীতে উঠে ফিরে এলাম আবার সেই মায়ার সংসারে!

এইভাবে গুরু-ইষ্টের কৃপায় আমার মনের একটি চিরপোষিত সাধ পূর্ণ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, 'তীর্থস্থান দেখে এসে জাবর কাটতে হয়।—তীর্থদর্শনে যে-সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে জাগে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় আর তাইতে ডুবে যেতে হয়…।' অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন ক'রে এসে যখন 'জাবর কাটি', দেখি ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর কথা বিশেষভাবে মনে জেগেছিল। এখন তো রাস্তা কত সহজ হয়েছে! স্বামীজী পুরানো পথে বহু কষ্টে অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করেছিলেন। বাবা অমরনাথ তাঁকে ইচ্ছামৃত্যু-বর দিয়েছিলেন আর মা ক্ষীর-ভবানী—'তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?' ব'লে—লোকনায়ক স্বামীজীকে মাতৃ-অঙ্কশায়ী শিশুর মতো ক'রে দিয়েছিলেন। তাই এই দুই মহাতীর্থস্থানের দর্শন আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ, সন্দেহ নেই।

বিবেকানন্দ-অনুরাগিণী ম্যাকলাউড স্বামীজীর স্মৃতিচারণা ক'রে লিখেছেন, স্বামীজীর মহাসমাধির পর তিনি অনেক বছর কেঁদে কাটিয়েছিলেন, তারপর একজন বিখ্যাত লেখকের বইতে পড়েন : 'কেউ যদি তোমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকেন, তাহলে সেটা তোমার জীবন দিয়ে প্রমাণ করো, অশ্রু দিয়ে নয়।' তারপর থেকে ম্যাকলাউড আর স্বামীজীর জন্য কাঁদেননি, কিন্তু যেখানে যেখানে স্বামীজী গিয়েছিলেন, যথাসম্ভব সেই সব জায়গায় তিনিও গেছেন এবং থেকেছেন—বেলুড় মঠেও তিনি অনেকবার এসেছেন এবং অতিথি-ভবনে বাস করেছেন। ম্যাকলাউডের যে-অধিকার, যে-সৌভাগ্য, তা আমার নেই—বলাই বাহুল্য। তবু অজ্ঞাতসারেও যে তাঁকে অনুসরণ ক'রে স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন ক'রে আসতে পেরেছি—এটিই আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি।

সমালোচন

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত—দ্বিতীয় খণ্ড: রামপদ চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক: শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২। (১৯৮০), পৃঃ ১১৮২, মূল্য: ৭০ টাকা।

পুণ্যশ্লোক ধন্যজীবন অনন্যচরিত্র সাধকপ্রবর প্রাজ্ঞবর ৺রামপদ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত' শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রথম খণ্ডটির ন্যায়ই অতীব চিত্তাকর্ষক ও মঙ্গলজনক হয়েছে, নিঃসন্দেহে। বিশ্ববিশ্রুত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ডের, অর্থাৎ, সর্বজনসমাদৃত উপনিষৎসমূহের সার-সঙ্কলন মহর্ষি বাদরায়ণ বিরচিত এই অনুপম ব্রহ্মসূত্রগুলি স্বভাবতঃই জ্ঞানমূলকরূপেই সুপরিচিত, যদিও ভক্তিবাদী রামানুজাচার্য থেকে আরম্ভ ক'রে বলদেবাচার্য পর্যন্ত বহু ভক্তিবাদী বৈদান্তিকও এই জ্ঞানখনি ব্রহ্মসূত্রগুলির ব্যাখ্যামূলক বিবিধ বিচিত্র ভাষ্য-টীকাদি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সাগ্রহে সাদরে সানন্দে সশ্রদ্ধায়। তা সত্ত্বেও, ওতপ্রোতভাবে ভক্তিমূলক 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে'র সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রসমূহের প্রকৃত সম্বন্ধ কি, তা যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরূপণের এরূপ বিশদ ও সর্বাঙ্গসুন্দর প্রচেষ্টা পূর্বে হয়নি। সেইদিক থেকে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভক্তিরসসিঞ্চিত গ্রন্থটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন, নিঃসন্দেহে।

বস্তুতঃ, জ্ঞান ও ভক্তি যে পরস্পর-বিরোধী নয়, উপরন্তু পরস্পর-পরিপূরক, এই শাশ্বত সত্যটি পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে প্রমাণিত ক'রে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাণের কথা প্রকাশিত করেছেন পরিপূর্ণ মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। সাম্য-ঐক্য, সমন্বয়-সামঞ্জস্যের দেশ এই দেবধাম ভারতবর্ষ—যে-দেশই সর্বপ্রথম নির্ভয়ে সানন্দে প্রচারিত করে 'যত মত তত পথ'—এই উদার তত্ত্বটি। সেজন্য জ্ঞানই হোক, বা ভক্তিই হোক, পরিশেষে সকল পন্থাই সেই একই লক্ষ্যে, সেই একই পরব্রহ্মের শ্রীচরণারবিন্দতলে সকলকে উপনীত করে, সুনিশ্চিত— যে-পরব্রহ্মকে একই সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, পূজা নিবেদন করা হয়েছে পরমপ্রজ্ঞাস্বরূপ এবং পরমরসঘন ব'লে:

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।'
'রসো বৈ সঃ।'
'ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত।'
'তিনি রসস্বরূপ।'

নানারূপ মতবাদে জর্জরিত এবং তৎপ্রসূত নিরর্থক বিবাদ-বিসংবাদে অহরহ লিপ্ত, পথভ্রষ্ট, হতবুদ্ধি, দুঃস্থ-দুর্গত পৃথিবীর নিকট আজ সাম্যভূমি ঐক্যভূমি প্রীতিভূমি মৈত্রীভূমি শান্তিভূমি সমন্বয়-ভূমি ভারতবর্ষের এই মধুর-মিলন-গীতি ঝঙ্কৃত ক'রে বর্তমান মনোরম গ্রন্থটি সকলেরই বিশেষ আনন্দের, অপার অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছে, নিঃসন্দেহে।

যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায় এই পরমকল্যাণপ্রসূ গ্রন্থটির এরূপ সুষ্ঠু সুন্দর প্রকাশনের ব্যবস্থা ক'রে সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

পরমানন্দময়ী পরমা জননীর অজস্র আশীর্বাদে সকলের সুপবিত্র জীবন চিরমধুময় হোক।

ডক্টর রমা চৌধুরী

উপনিষদের দ্যুতি (ঈশ ও কেন): ব্রহ্মচারী অমলচৈতন্য। প্রকাশক: শ্রীজগন্নাথ পালচৌধুরী, ১২২বি, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। (মহাষ্টমী-১৩৮৪), পৃঃ ১৪+১৫৫+৩, মূল্য: পাঁচ টাকা।

ভূমিকায় হালিসহর নিগমানন্দ সারস্বত মঠ ঋষি বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার ষট্‌তীর্থ ঈশোপনিষদের প্রথম সাতটি মন্ত্র অবলম্বন করে সংক্ষেপে ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থকার তাঁর ছাত্র; স্বভাবতই ছাত্রের কৃতিতে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি অনুকূল আলোচনাসহ মন্তব্য করেছেন, 'লেখক ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই এই বর্ণনাজাল বয়ন করিয়াছেন।'

অবশ্য ব্রহ্মের কূটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ অদ্বৈত-বেদান্তের দৃষ্টিতে নির্গুণ স্বরূপকে লেখক প্রত্যাখ্যান করেননি, আবার সগুণ রূপকেও উপেক্ষা করেন-নি। আচার্য শংকরের মতো ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বলা বা 'পঞ্চদশী'কারের মতো ঈশ্বরকে মায়াবিম্বরূপে উপস্থাপনা করা লেখকের অভিপ্রেত ছিল না। অদ্বৈতবেদান্তের 'মায়া'র পরিবর্তে তিনি 'শক্তি' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে তিনি মুখ্যত বৈদিক ভাবভাবনাই বরণ করেছেন, শৈবাগম বা শাক্তাদ্বৈতবাদের অনুগতি তাঁর রচনায় নেই। বরং তাঁর কল্পনা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কথা মনে করিয়ে দেয় যাতে তিনি হনুমানের রাম-ভাবনার সহজদৃষ্টান্ত দিয়ে উপলব্ধির স্তরভেদে ব্রাহ্মী চেতনার প্রকারভেদ বুঝিয়েছেন।

লেখক দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হননি—গ্রন্থ থেকে পরিপূর্ণাঙ্গ কোনো দার্শনিক মতবাদের পরিচয়ও পাওয়া যাবে না। দার্শনিকতা লেখকের উদ্দেশ্য নয়; তিনি সাধকের ভূমিকা থেকে ঈশ ও কেন এই দুই উপনিষদের মন্ত্রাবলীর অনুধ্যান করেছেন। লেখক যে আধ্যাত্মিক সাধনাপরায়ণ বিদগ্ধ পুরুষ গ্রন্থে তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করতে চাননি, অনুকূল ভাবের বৈদিক বা ঔপনিষদ মন্ত্র বা গীতাপ্রমুখ সাধনশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করে তিনি মন্ত্রের ভাবমর্ম উপাদেয় করে প্রকাশ করেছেন। দার্শনিক বিচারে লেখকের ব্যাখ্যানের কোনো কোনো অংশ বিতর্কমূলক বা তত্ত্বগতভাবে দুর্বল বলে মনে হবে; তবে মন্ত্রানুধ্যান সাধনব্রতীর পক্ষে হৃদ্য সহায়ক তথা ঔপনিষদ ভাবনায় অনুরাগী পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে।

ভাষাগত সুষমা আর রচনাভঙ্গী শ্রীমৎ অনির্বাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীমৎ অনির্বাণ অর্থাৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী পরমহংস নিগমা-নন্দ সরস্বতীর শিষ্য এবং লেখকের আচার্য (গুরু) স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতীর শিক্ষাচার্য। সুতরাং গ্রন্থটিতে ভাবে ভাষায় শ্রীমৎ অনির্বাণের 'বেদমীমাংসা' বা ঈশ-কেন-ব্যাখ্যান গ্রন্থদুটির কিছুটা প্রভাব থাকা অসংগত হয়নি; লেখক শ্রীমৎ অনির্বাণের (বিশেষত কেনোপনিষদের) ব্যাখ্যানের কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করে গুরুপরম্পরা স্বীকার করেই মন্ত্রাবলীর অনুধ্যান করেছেন। অবশ্য পরিবেশনায় লেখকের স্বকীয়তাই ফুটে উঠেছে। তিনি শ্রীমৎ অনির্বাণকে সর্বথা অনুসরণও করেননি, অনুকূল ভাবনাক্রমে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যানের পরিচয় দিলেও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে তাঁর অনেক কল্পনার মিল নেই। আচার্য শংকরের সঙ্গে মতের অমিলের সবচেয়ে বড়ো নিদর্শন জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ঘোরতর মতানৈক্য। ঈশোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য জ্ঞান আর কর্মের বিরোধকে 'পর্বতবৎ অকম্প্য' বলেছেন। লেখকের মতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় এই উপনিষদের বিশেষ নির্দেশ।

মুদ্রণাদি শোভন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

বিশ্বকবির কৌতুক : শ্রীসুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। (১৩৮৭), পৃঃ ৯৭, মূল্য : ছয় টাকা।

রবীন্দ্রপ্রতিভার নানা মহৎগুণের মধ্যে অন্যতম তাঁর আনন্দকৌতুকোচ্ছল হাস্যরসিক ব্যক্তিত্ব। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসকে তিনি কত সূক্ষ্ম সুনিপুণ অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনায় ভরে দিয়েছেন সেকথা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তাঁর লেখায় যে হাস্যরসের ধারা প্রথম থেকে শেষজীবন অবধি নানা রচনায় প্রবাহিত, তার মধ্যে 'জীবন-স্মৃতি' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আত্মচরিত এবং কবিচরিতের আদিপর্ব হ'লেও এ গ্রন্থের অন্যতম প্রধান গুণ বর্ণনার অন্তরালে বিচ্ছুরিত হাস্যরসদীপ্তি। তাঁর 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' বাংলায় হাস্যরসাত্মক একাঙ্কিকার দিক থেকে চিরস্মরণীয়। কমেডি-জাতীয় তাঁর নাটকগুলি তো এদিক থেকে পড়তে এবং অভিনয় দেখতে রসিকচিত্তে সমান আকর্ষণীয়। তাঁর প্রতিদিনের কথোপকথনও উচ্চাঙ্গের হাস্যরস-রসিকতার পরিচয়বাহী।

এই শেষোক্ত ধরনের হাস্যকৌতুকের পরিচয় দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বের একটি দিক তুলে ধরার প্রয়াস। উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্তু লেখকের অনিপুণতা এই বিষয়টির যথাযোগ্য মর্যাদার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ঠিক এইভাবেই কোনো বই লেখা না হ'লেও উৎসাহী পাঠক রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যধন্য তিনজনের তিনটি বই পড়ে দেখতে পারেন—প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'; মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'; রানী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'।

পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি আদ্যন্ত সম্পাদনা করে প্রকাশক মহোদয় নব-সংস্করণ করলে রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির সার্থকতা ঘটবে। কিন্তু আলোচ্য বইটিতে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় যে কৌতুককণা বিচ্ছুরিত তার স্পর্শ পাঠকচিত্তকে নাড়া দিয়ে যায়। সেরকম দু'একটি বর্ণনা লেখকের বর্ণনা থেকেও পাঠকদের কাছে তুলে ধরা যায়।

"কবি বিছানায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মহাদেবকে ডেকে কবি বললেন, ওরে চাঁদটা ঢেকে দেতো। ঘুম হচ্ছে না।

"দূরে আকাশে রয়েছে চাঁদ। মহাদেব (ভৃত্য) তো বুঝেই পেলো না চাঁদটা কেমন করে সে ঢেকে দেবে। বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। কবি হেসে বললেন, আরে পারছিস নে। এক কাজ কর। ঐ জানালাটা বন্ধ করে দে তো।" (পৃঃ ৮৭)

কবি গেছেন রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে। একদিন বেলা প্রায় ন'টায় দেখা গেল, কবি তাঁর ডান পায়ের মোজা খুলে পায়ের তলা হাত দিয়ে ঘষছেন। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলো। "তিনি হাসিমুখে বললেন, চরণপদ্ম, চরণকমল ইত্যাদি কথা বহুবার শুনেছি, কবিতায়ও ঐ সকল কথা ব্যবহারও করেছি। কিন্তু কেন যে তাকে 'চরণ-কমল' বলে, সেটা আজ সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করেছি। এই দেখ না, এতো জায়গা থাকতে গরম মোজার বন্ধন ভেদ করে একেবারে পায়ের তলায় দিল হুল বিঁধিয়ে মৌমাছিটা। চরণ যদি কমল না হবে, তাহলে কি মৌমাছি এমন কাণ্ড করতো?" (পৃঃ ৭০)

রবীন্দ্রনাথের ভাষাগত কৌতুকদক্ষতার পরিচয় লেখক নিজেই কিশোরবয়সে একবার পেয়েছিলেন। মনে হয়, সে ঘটনাই এ বই লেখার মূলে। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে করোনেশন পার্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। কবিগুরুকে ভালো করে দেখবার জন্য উৎসুক লেখক ভিড়ের ধাক্কায় একটু ঢালু জায়গায় গড়িয়ে পড়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ দৌড়ে এসে তাঁকে টেনে তুলে ধুলো ঝেড়ে সস্নেহে নাম জিজ্ঞাসা করলেন। "নাম শুনে তিনি মৃদু হেসে বললেন, সুশীল নাম তোমার, এতো দুঃশীল কেন? এ ভিড়ের মধ্যে এসেছ, যাক পড়ে গেছ, ব্যথাও

পেয়েছে কিছু নিশ্চয়ই। কথায় বলে, উত্থান পতনের মূল ; পতনও কিন্তু উত্থানের মূল।" (পৃঃ ৫৪)

এ-জাতীয় বেশ কিছু উদাহরণ লেখক সাজিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাজানোটি আকর্ষণীয় হয় নি বলেই বইটি পড়ার পর পাঠক হিসাবে প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ মোটের উপর ভালো। বিশ্বকবির কৌতুক আরো পরিণত লেখনীর স্পর্শে পূর্ণ পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করবে—এটুকু আমাদের প্রত্যাশা। মুখরোচক কৌতুকের আনন্দ যাঁরা পেতে চান, এ বই তাঁদের পক্ষে সহায়ক, সন্দেহ নেই।

শুভ গুপ্ত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) ত্রিপুরা—হাঙ্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণকার্য : বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় ১,৬৫৬টি পশমী কম্বল, ৫,৭০৪টি ধুতি ও শাড়ি, ৬,৮১৯ সেট অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্র, ৮,৬২৬টি নূতন পোশাক, ৫,৪০৫টি পুরাতন পোশাক, ১,৩৫৫টি মাদুর, ১,৬৮২টি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও ৯৩টি স্টীল ট্রাংক ৭,৫৪১টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। তাছাড়া কয়েকটি ত্রাণ-শিবিরে মাতা, শিশু এবং পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কমপক্ষে আরও ৩,০০০ পরিবারের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ : মালদা (১৯৮০-এর বন্যায়) বন্যাত্রাণ : মালদা জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে চিঁড়া-গুড় বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ত্রাণকার্য ১৫ই আগস্ট, ১৯৮০ শুরু করা হয়। পরে ১০,০০০ বন্যাদুর্গত জনসাধারণের মধ্যে রান্না-করা খিচুড়ি বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য : বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে দিঘড়ায় 'নিশ্চিন্ত নীড়' সংলগ্ন গৃহনির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ-খরাত্রাণ : খরাপীড়িত দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে মূলকেন্দ্র কর্তৃক পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ১০০০টি ধুতি ও ১০০০টি শাড়ি, কামারপুকুর শাখাকেন্দ্র মারফত ২৫০টি ধুতি ও ২৫০টি শাড়ি এবং জয়রামবাটী শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২২৫টি ধুতি ও ২৭৫টি শাড়ি বিতরিত হইয়াছে।

(গ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য : মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন জনগণের পুনর্বাসনকল্পে ভানালিয়া এবং লালবাগে গৃহনির্মাণকার্য যথারীতি প্রাগ্রসর।

বর্তমান বৎসরে (১৯৮০) প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যাবিধ্বস্ত জুনাগড় ও রাজকোট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু হইয়াছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

ভক্তসম্মেলন

তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ১৭ই ও ১৮ই মে ১৯৮০, ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে তমলুক, ঘাটাল ও কাঁথি হইতে সমাগত বহু ভক্ত এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সন্ন্যাসিগণ যোগদান করেন। ১৭ই শ্রীশচীকান্ত

বেরার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বাগত-ভাষণ দেন তমলুক আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ। স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাত্রে শ্রীধ্রুব চৌধুরী গুরুমাহাত্ম্য-সম্বন্ধীয় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ১৮ই মঙ্গলারতির পর সমবেত জপধ্যান হয়। ক্রমে ভক্ত-সংখ্যা ১৮০০তে দাঁড়ায়। স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ গীতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীকানাইলাল সামন্তের সঙ্গীতের পর স্বামী স্মরণানন্দ বেলুড় মঠে ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ হইতে যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, সে-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অপরাহ্নে সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর স্বামী স্মরণানন্দ নারদীয় ভক্তি সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং স্বামী ভর্গানন্দ ও স্বামী বীতরাগানন্দ কথামৃতপ্রসঙ্গ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। স্বামী সিদ্ধিদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ভক্তগণের লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী অমলানন্দ। সন্ধ্যারতির পর স্বামী স্মরণানন্দ স্বামীজী সম্বন্ধে, স্বামী অমলানন্দ শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। স্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দের ভাষণের পর শ্রীআশুতোষ দণ্ডপাটের সমাপ্তি-সঙ্গীত হয়। সম্মেলনটিতে ভক্তগণের প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়।

উৎসব

জামতাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি-উৎসব মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের রবীন্দ্র মঞ্চে ২২শে ফেব্রুআরি হইতে ২৪শে ফেব্রুআরি পর্যন্ত সাধারণ উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। ২২শে ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী ভবহরানন্দ। প্রধান অতিথি শ্রী কে. কে. মিত্র এবং সভাপতি স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ। সন্ধ্যায় 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৩শে ধর্মসভায় শ্রীমা সারদাদেবী সম্বন্ধে আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, প্রধান অতিথি শ্রী ডি. কে. গুপ্ত এবং সভাপতি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় 'রাণী রাসমণি' ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। ২৪শে মঙ্গলারতি, বৈদিক শান্তি-মন্ত্রপাঠ, উপনিষদ্‌পাঠ চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা ও হোম হয়। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও সহশিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। দুইটি হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় চার হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। বৈকালে স্বামী বিবেকানন্দের 'স্বদেশপ্রেম' সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার-বিতরণ করেন স্বামী পাবনানন্দ। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন স্বামী ভৈরবানন্দ, স্বামী ভবহরানন্দ, প্রধান অতিথি শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ২৩শে মার্চ ১৯৮০, প্রতিমায় শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪,৫০০ ভক্ত ও দরিদ্র-নারায়ণ প্রসাদ পান।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

নরেন্দ্রপুর কলেজের তিনজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৯ সালের রসায়ন, পরিসংখ্যান ও গণিতের ফাইন্যাল বি.এ., বি.এস্‌সি-র অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। **বেলুড়** বিদ্যামন্দিরের তিনজন ছাত্র পূর্বোক্ত পরীক্ষায় রসায়নে ষষ্ঠ ও নবম স্থান এবং পদার্থবিদ্যায় নবম স্থান অধিকার করিয়াছে। সেণ্ট্রাল বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন পরিচালিত অল-ইণ্ডিয়া সেকেণ্ডারী স্কুল পরীক্ষায় (১৯৮০) **দেওঘর** বিদ্যাপীঠের ৩১ জন পরীক্ষার্থী এবং **আলং** স্কুলের ৭ জন পরীক্ষার্থীর প্রত্যেকেই ডিস্টিংকশনসহ প্রথম

বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। উক্ত পরীক্ষায় **নরোত্তমনগর** স্কুলের ১৩ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হয় এবং তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৮ জনের মধ্যে ৬ জন ডিস্টিংকশন লাভ করে।

নরেন্দ্রপুর স্কুলের ছাত্রগণ এই বৎসরের (১৯৮০) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম, চতুর্থ, দশম, অষ্টাদশ ও বিংশ স্থান অধিকার করিয়াছে।

চেরাপুঞ্জী স্কুলের দুইজন ছাত্র মেঘালয় বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন-পরিচালিত এচ. এস. এল. সি. পরীক্ষায় (১৯৮০) দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ৬ই মে ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ২৪শে মে ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১।৩।৩) শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষকে সব ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্য এবং ভগবন্মুখী হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তাই মাষ্টারমশাই এই পরিচ্ছেদের শুরুতেই গীতা থেকে অনুরূপ ভাবের একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন—

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥
(২।৩)

—'হে পার্থ, কাপুরুষতার আশ্রয় নিও না; এ তোমার শোভা পায় না। হে শত্রুতাপন, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়াও।'

এই পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণ 'ভক্তির তমঃ' সম্বন্ধে বলেছেন। আমরা আগের দিন বলেছি, তিনি 'ভক্তির তমঃ'-কে একটু উঁচু স্থান দিয়েছেন। 'ভক্তির তমঃ'-কে নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন। নিকৃষ্ট তমোগুণকে কি ক'রে sublimate করতে হবে—উদ্গতির পথে নিয়ে যেতে হবে, সেটি দেখাচ্ছেন। তামসিকতাকে ভয় পাবার কিছু নেই; তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে—এই কথা বলছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব বলছেন :

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্যাৎ স তামসঃ ॥
(৩।২৯।৮)

—'যে ভেদদর্শী, ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, দম্ভ, অথবা মাৎসর্যের অভিসন্ধি নিয়ে আমাকে ভক্তি করে, সে হচ্ছে তামসিক ভক্ত।' অর্থাৎ তার ভক্তি তামসিক।

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্যমেব বা।
অর্চাদাবর্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥
(৩।২৯।৯)

—'যে ভেদদর্শী ব্যক্তি বিষয়সমূহ, যশ অথবা ঐশ্বর্যের অভিসন্ধি নিয়ে প্রতিমা, পট প্রভৃতিতে আমাকে পুজো করে, সে হচ্ছে রাজসিক ভক্ত।' অর্থাৎ তার ভক্তি রাজসিক।

কর্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ ॥
(৩।২৯।১০)

—'যে ভেদদর্শী ব্যক্তি পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্যে, অথবা পরমেশ্বরে কর্মার্পণ অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে, অথবা কর্তব্যবুদ্ধিতে পূজাদি কর্ম করে, সে সাত্ত্বিক ভক্ত।' অর্থাৎ তার ভক্তি সাত্ত্বিক। প্রসঙ্গতঃ এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই ত্রিবিধ ভক্তই ভেদদর্শী। কপিলদেব এরপর নির্গুণা

ভক্তির কথা বলেছেন—কেবলমাত্র অভেদদর্শী ব্যক্তিই সেই ভক্তির অধিকারী।

কপিলদেব উল্লিখিতভাবে তামসিক, রাজসিক, ও সাত্ত্বিক ভক্তির বিভাগ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও রাজসিক ও সাত্ত্বিক ভক্তির কথা তাঁর মতোই বলেছেন। কিন্তু তামসিক ভক্তির বেলায় তিনি কপিলদেবের মতো না ব'লে তমোগুণকে উচ্চতর ভাবখাতে প্রবাহিত করেছেন। কিভাবে এইটি করেছেন তা এই পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, "ভক্তির তম যার হয়, তার বিশ্বাস জ্বলন্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো।' এইরূপ ডাকাত-পড়া ভাব।"

ধর্মলাভ করতে হ'লে আমাদের বিষয়াভিমুখী বৃত্তিগুলির মোড় ফিরিয়ে ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে তুলতে হবে। তামসিক-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেদের ভক্তিকে কিভাবে মোড় ফিরিয়ে যথার্থ ভক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই কথাই বলছেন। তামসিক লোকের 'ডাকাত-পড়া' ভাব। সেটার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে ভগবানের দিকে। তখন তার জ্বলন্ত বিশ্বাসের বলে সে জোর ক'রে দাবি করবে ভগবানের কাছে—'কি! তুমি দেখা দেবে না! আমি তোমার সন্তান, আমাকে দেখা দিতেই হবে।' এইরকমভাবে আবদার করতে হবে। তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন যে একটি মেয়ে একটি পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। সে যেমন সেই লোকটিকে বলতে পারে, 'কি তুমি আমাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসেছো, আর এখন আমায় খেতে দেবে না!'—এই রকম ভাব হবে। এটা যেন ডাকাত-পড়া ভাব।

নারদভক্তিসূত্রেও আছে, 'তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্।' (সূত্র ৬৫) অর্থাৎ, 'সমস্ত কর্ম তাঁতে (ঈশ্বরে) অর্পণ ক'রে কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি ঈশ্বরের প্রতিই করণীয়।' এরই নাম মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। কামনা যদি করতেই হয়, ভগবানকে কামনা করো। ক্রোধ যদি করতেই হয়, ভগবানের উপরই ক্রোধ করো। কি দেখা দেবে না! দিতেই হবে, এই ভাব! আবার অভিমানও তাঁরই উপর করো তাঁর দর্শন না পাওয়ার জন্য। এইভাবে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদি সব রিপুর মোড় ফিরিয়ে তাঁর দিকেই দিতে হবে। একবার শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য হরিনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী তুরীয়ানন্দ) ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মশাই, কামটা একেবারে যায় কি ক'রে?' উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, 'যাবে কেন রে? মোড় ফিরিয়ে দে না!'

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কপিলদেব যে তমোগুণী ভক্তের কথা বলেছেন, সেই ভক্ত কিভাবে সত্ত্বগুণী ভক্তে রূপান্তরিত হতে পারেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও নারদ তারই উপায় নির্দেশ করেছেন। সমস্ত নিম্নাভিমুখীবৃত্তি ভগবানে আরোপ করতে হবে।

'ডাকাত-পড়া' ভাবের কথা ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান ধরেছেন অমিয়কণ্ঠে—

'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি
ফুরায়॥' ইত্যাদি

'অজপা যদি ফুরায়'—অজপা হচ্ছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের নাম আপনা হতেই হওয়া। যখন প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন উচ্চারিত হচ্ছে 'সঃ', আবার যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন উচ্চারিত হচ্ছে 'হং'। অর্থাৎ, শ্বাসে-শ্বাসে 'হংসঃ' মন্ত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে জপ হয়ে যাচ্ছে,—চেষ্টা ক'রে নয়। যাগযজ্ঞ জানি না, জানি শুধু ব্রহ্মময়ী মায়ের রাঙা চরণ-দুখানি। সেই চরণের মাহাত্ম্য, সেই মায়ের নামের মাহাত্ম্য কে বুঝতে সক্ষম? একমাত্র

পঞ্চাননই সেই নামের মাহাত্ম্য জানেন। তাই তো তিনি পঞ্চবদনে শুধু 'কালী' 'কালী' ব'লে ভাবে উল্লসিত।

এরপর ঠাকুর আর একটি গান গাইছেন—

'আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী ॥'

দুর্গা-নামের গুণে সব পাপ দূর হয়ে যাবে আর আখেরে অর্থাৎ, অন্তিমকালে মা উদ্ধার করবেনই। তাই ভক্ত জোর ক'রে বলছেন, 'জানা যাবে গো শঙ্করী', অর্থাৎ যদি উদ্ধার না করো, তোমাকে দেখে নেবো—এই রকম ভাব। মায়ের ওপর ক্রোধ ক'রে মুক্তি আদায় ক'রে নেওয়ার ভাব। গানটির ভাব ব্যাখ্যা ক'রে ঠাকুর বলছেন, 'কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে! তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোক চাই!'

এই রোক, এই বিশ্বাস আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় গিরিশচন্দ্রের জীবনে। তাঁর ছিল 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস, জ্বলন্ত বিশ্বাস—ডাকাত-পড়া ভাব। যাঁর এই রকম মনের ভাব, তাঁর সব পাপ দূর হয়ে যায়, পাপ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় না। তাই ভগবানের কাছে জোর করতে হবে। স্বামীজীর ভাষায় মিনমিনে পিনপিনে ভক্ত হলে চলবে না। তিনি তো পর নন, তিনি সবচেয়ে আপনার। তাই জোর ক'রে তাঁর ঐশ্বর্য, তাঁর দর্শন চেয়ে নিতে হবে তাঁর কাছ থেকে।

এরপর ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন এই তমোগুণকে কিভাবে পরের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়। বলছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম বৈদ্যের কথা। উত্তম বৈদ্যের এই তমোগুণ আছে—জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন। রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে, বুকে হাঁটু দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন; কেন না তাতে রোগীরই কল্যাণ এবং বৈদ্যের কর্তব্যও তাই। এই যে বুকে হাঁটু দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ কঠোরভাবে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা, এতে তমোগুণের প্রকাশ থাকলেও রোগীর কল্যাণই হয়, অপকার হয় না। মধ্যম বৈদ্য এভাবে রোগীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করে না। শুধু মিষ্টি কথায় বলে ওষুধ খাওয়ার জন্য। অধম বৈদ্য শুধু ওষুধ দিয়ে চলে যায়, রোগী খেল কি খেল না খোঁজ নেয় না। বৈদ্যের মতো আবার আচার্যও আছেন। তাই ঠাকুর বলছেন, 'বৈদ্যের মত আচার্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লন না—সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় এই উত্তম আচার্যের উদাহরণ-স্বরূপ আমরা পাই তোতাপুরীকে। তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণকে সন্ন্যাস দেওয়ার পরে অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে উপদেশ করছেন। মনকে আজ্ঞা-চক্রে নিবিষ্ট করতে বলছেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—হচ্ছে না অদ্বৈত ভাবনা, জ্যোতির্ময়ী মা এসে দাঁড়াচ্ছেন। তখন তোতাপুরী উত্তেজিত হয়ে কঠোর ভাষায় তিরস্কার ক'রে এক টুকরো কাঁচ মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর ভ্রূমধ্যে বিদ্ধ ক'রে বলছেন, 'কেঁও, হোগা নেহি!' 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন!' বলতে বলতেই ঠাকুরের মন সব বাধা অতিক্রম ক'রে নির্বিকল্পভূমিতে অধিরূঢ় হয়ে গভীর সমাধিতে ডুবে গেল। এই হ'ল উত্তম আচার্যের কাজ। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে কাঁচ ফুটিয়ে দেওয়া, এটা তো নিষ্ঠুর অত্যাচার।

কিন্তু তা নয়। উত্তম আচার্য শিষ্যের কিসে কল্যাণ হয়, তা জানেন। তাই জোর ক'রেও শিষ্যকে শ্রেয়ের পথে নিয়ে যান। শিষ্যের কল্যাণের জন্য যেটুকু তমোগুণ আশ্রয় করা দরকার তা করেন। (১।৩।৩)

গীতা—

আগের দিন আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান অনেকগুলি যজ্ঞের কথা বলেছেন। কোন কোন টীকাকারের মতে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ৩০ সংখ্যক শ্লোকে ১২টি যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। এগুলি কর্মযজ্ঞ। এগুলিতেই কিন্তু সব কর্মযজ্ঞের শেষ নয়। আরও অনেক কর্মযজ্ঞ আছে। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন: 'বেদমুখে এই-ভাবে বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তার ক'রে বলা হয়েছে। সেগুলি সবই কর্মজ ব'লে জানবে। এই রকম জানলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে।' (৪।৩২)

শ্রীভগবান বলছেন, এই সব নানারকম যজ্ঞের কথা আমরা জানতে পারি 'ব্রহ্মণো মুখে' অর্থাৎ বেদমুখে। এখানে 'ব্রহ্ম' বলতে 'বেদ'কে বোঝান হয়েছে। আর সেই সব যজ্ঞকে 'কর্মজান্ বিদ্ধি'—কর্ম থেকে উদ্ভূত জানো। এটা জানতে পারলে মোক্ষলাভ হবে। এই প্রসঙ্গে ভগবান শংকর বলছেন, 'কর্মজান্ কায়িক-বাচিক-মানস-কর্মোদ্-ভবান্ বিদ্ধি তান্ সর্বান্ অনাত্মজান্, নির্ব্যাপারঃ হি আত্মা।' অর্থাৎ, এই সমস্ত যজ্ঞকে কায়িক, বাচিক, বা মানসিক কর্ম হতে উদ্ভূত জানবে, এরা আত্মা থেকে উদ্ভূত নয়, আত্মা নির্ব্যাপার—নিষ্ক্রিয়। তিনি কিছুই করেন না। শংকরাচার্য আরও ব্যাখ্যা ক'রে বলছেন, "এই সব কর্মযজ্ঞ 'আমার ব্যাপার নয়, আমি নির্ব্যাপার, উদাসীন'—এই রকম জানলে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।"

এই সব কর্মযজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, সেই কথাই এখন শ্রীভগবান বলছেন, "হে শত্রুতাপন, 'দ্রব্যময় যজ্ঞ' অর্থাৎ দ্রব্য দ্বারা নিষ্পাদিত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ, হে পার্থ, সমস্ত কর্মই নিঃশেষে—সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়।" (৪।৩৩)

শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে জ্ঞানযজ্ঞ। অর্থাৎ, বুদ্ধি দিয়ে সর্বদা বোঝা যে, 'আমি আত্মা, ব্রহ্ম; আমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, কোন কর্ম নেই—নিষ্ক্রিয় সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ আমি।' এই বুদ্ধিকেই স্বামীজী বলেছেন 'কর্মপরিণত অদ্বৈতজ্ঞান'। এই জ্ঞান কিন্তু অপরোক্ষ অনুভূতি নয়। এটা বৌদ্ধিক জ্ঞান—মানস ব্যাপার। এই জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ সম্ভব। কারণ, 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।' এই শ্লোকার্ধে যে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেটা অপরোক্ষ অনুভূতির কথা—সর্বোচ্চ উপলব্ধির কথা। আগে যে বৌদ্ধিক জ্ঞানের কথা—জ্ঞান-যজ্ঞের কথা বলা হ'ল, সেটা চরমে পরম জ্ঞানে মিশে যাবে। কারণ ঐ জ্ঞানযজ্ঞ মানস ব্যাপার বলে এক রকমের কর্মই। আর এই যে পরম জ্ঞান এটি সকল কর্মের বিলয়ভূমি। কাজেকাজেই কর্ম-পরিণত এই অদ্বৈতজ্ঞানের সহায়ে সেই চরম জ্ঞানে আমাদের পৌঁছতে হবে।

এই চরম জ্ঞান কি উপায়ে পাওয়া যাবে?—এর উত্তরে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'প্রণিপাতের দ্বারা, পরিপ্রশ্নের দ্বারা এবং সেবার দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করো। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করবেন।' (৪।৩৪)

জ্ঞানলাভ করতে হলে প্রথমতঃ গুরুকে সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করতে হবে। কেন এই প্রণাম? এটি গুরুর জন্য নয়। শিষ্যেরই নিজের প্রয়োজনে। এটি তার অহংকার দূর করার জন্য। শিষ্যের মনে এই অহংকার থাকতে পারে যে, সে নিজে খুব জ্ঞানী, গুণী, ধনী ইত্যাদি। সেই অহংকার তাকে দূর করতে হবে। তাই বিনীতভাবে গুরুর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে। তার পরে প্রশ্ন করতে

হবে গুরুর কাছে। প্রশ্ন না জাগলে মুক্তির সম্ভাবনা নেই। কি প্রশ্ন করতে হবে? না—আত্মবস্তু কি? কি ক'রে আমি এই সংসার থেকে মুক্তি লাভ করবো? গুরুর কাছে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে এই সব প্রশ্ন করতে হবে। তারপর তাঁর কাছে সর্বক্ষণ থেকে পরিচর্যা ক'রে তাঁকে পরিতুষ্ট করতে হবে। সর্বক্ষণ তাঁর কাছে থাকার ফলে, তাঁর আচার-আচরণ, চরিত্র দেখার ফলে শিষ্যের মনের উপর সেই সবের ছাপ পড়বে। কাজেকাজেই এই তিনটি সাধনসহায়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুর শরণ নিলে তিনি তাঁর নিজের উপলব্ধ যে-জ্ঞান, যার দ্বারা সমস্ত কর্ম পরিসমাপ্তি লাভ করে, সেই পরম জ্ঞান উপদেশ দেবেন এবং তাঁর কৃপায় শিষ্যের অপরোক্ষ অনুভূতি হবে।

এখানে 'জ্ঞানী' ও 'তত্ত্বদর্শী' এই দুটি কথা লক্ষ্য করার বিষয়। কেন এই দুটি শব্দ ব্যবহার করা হ'ল, এটা আমাদের বুঝতে হবে। আমি হয়তো খুব বিচার করি বুদ্ধি দিয়ে। বিচার ক'রে বেশ বুঝতে পারি—জগৎ মিথ্যা, আত্মা সত্য। কিন্তু এটা আমার পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান নয়। আমি 'জ্ঞানী' অর্থাৎ, পরোক্ষ জ্ঞানী কিন্তু 'তত্ত্বদর্শী' নই। এখানে ভগবান শংকর বলছেন, 'জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্ যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলাঃ অপরে ন, ইতি বিশিনষ্টি তত্ত্বদর্শিনঃ ইতি।' অর্থাৎ, জ্ঞানীদের ভেতরে কেউ কেউ ঠিক ঠিক তত্ত্বদর্শন-শীল, অন্যেরা নন; তাই ভগবান এখানে জ্ঞানীর বিশেষণ দিলেন 'তত্ত্বদর্শী'। 'তত্ত্বদর্শী' বলতে সম্যগ্‌দর্শী, যাঁর সম্যগ্‌রূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছে। যাঁর 'উপদিষ্টং জ্ঞানং কার্যক্ষমং ভবতি'—উপদিষ্ট জ্ঞান কর্মক্ষম হয়। জ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা তত্ত্বদর্শী নন তাঁরা উপদেশ করলে সেটা কার্যকরী হয় না, শিষ্যের অপরোক্ষ অনুভূতি হয় না—এইটি শ্রীভগবানের অভিমত।

এই চরম জ্ঞান লাভ হলে কি হবে? শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'হে পাণ্ডুপুত্র, এই জ্ঞান লাভ করলে তুমি আর মোহগ্রস্ত হবে না, তুমি সর্বভূতকে নিজের আত্মাতে এবং আমাতেও দর্শন করবে।' (৪।৩৫)।

তাৎপর্য এই যে, এই চরম জ্ঞান লাভ হলে জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর—এই তিনই যে এক বস্তু, এই সত্যের উপলব্ধি হয়।

এই চরম জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে শ্রীভগবান বলছেন, 'যদি সমস্ত পাপীদের মধ্যে তুমি সব চেয়ে পাপকারী হও, তাহলেও এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে তুমি পাপ-সমুদ্র পার হয়ে যাবে।' (৪।৩৬)

শংকরাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে (১৮।৬১) লিখেছেন, অর্জুন যে 'বিশুদ্ধান্তঃকরণ', এটি তাঁর নামের অর্থ থেকেই পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, 'অর্জুন' শব্দটি 'শুক্ল' অর্থে ঋগ্বেদেও ব্যবহৃত হয়েছে। অর্জুনের হৃদয় শুভ্র—তিনি মহাপবিত্র। তা সত্ত্বেও, তিনি যদি পাপিষ্ঠদের মধ্যেও পাপিষ্ঠতম হয়ে যান—এমন অসম্ভবও যদিই বা সম্ভব হয়, তবু জ্ঞান হ'লে মানুষ যে পাপমুক্ত হবে না, তা হতেই পারে না। তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানের ফলে পাপমুক্তি অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য—এমনই জ্ঞানের মাহাত্ম্য! এই প্রসঙ্গে শংকরাচার্য লিখেছেন, 'ধর্মঃ অপি ইহ মুমুক্ষোঃ পাপম্ উচ্যতে।' অর্থাৎ, এই শ্লোকে যদিও ভগবান 'পাপের' কথাই বলেছেন, 'পুণ্য'ও গ্রহণ করতে হবে; কারণ, মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে 'ধর্ম' বা 'পুণ্য'ও পাপেরই তুল্য। জ্ঞান হ'লে মানুষ যে শুধু পাপমুক্ত হয়, তা নয়—পুণ্যমুক্তও হয়। ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যায়। পাপপুণ্য দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হয়, আত্মার দ্বারা নয়—জ্ঞানী ব্যক্তির এই অপরোক্ষ অনুভূতি হয়। তিনি জানেন, পাপপুণ্য তাঁকে স্পর্শও করে না।

বিবিধ সংবাদ

রজতজয়ন্তী

শ্রীসারদা সঙ্ঘের অষ্টাদশ সম্মিলনী ও রজতজয়ন্তী কলিকাতা শাখাকেন্দ্র কর্তৃক গত ১৪ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১৫টি বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হইতে ১২৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। মহারাষ্ট্র নিবাসে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ই রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে রাজ্যপাল শ্রীত্রিভুবন নারায়ণ সিং সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী বেদপাঠ করেন। ডঃ রমা চৌধুরী শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার সঙ্ঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। প্রধান অতিথি স্বামী বন্দনানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবেদ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সর্বভারতীয় শ্রীসারদাসঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রামণি দেবী অন্ধ্রভাষায় ভাষণ দেন ও সভানেত্রী শ্রীমতী বিবেকানন্দ দেবী উহার অনুবাদ করেন। ১৬ই মহারাষ্ট্র নিবাসে সারাদিনব্যাপী সকল প্রতিনিধির বৈঠকে প্রতিনিধিগণের স্ব স্ব কেন্দ্রের কার্যবিবরণী পাঠ ও আলোচনা হয়। ঐ দিন বৈকালে মহিলা-সভায় ডঃ রমা চৌধুরী স্বাগত ভাষণ দেন। পরে রাজমুন্দ্রির শ্রীমতী বিবেকানন্দ দেবী ভাষণ দেন। উপসভানেত্রী শ্রীমতী স্নেহময়ী মহাপাত্র শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষাজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে বলেন। পাটনা শাখার শ্রীমতী অদিতি দেবী শিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী কামনা করেন। মহিলা-সভার প্রধান অতিথি প্রব্রাজিকা অমলাপ্রাণা শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৭ই প্রতিনিধিদের ও ভক্ত মহিলাদের দক্ষিণেশ্বর, সারদা মঠ ও উদ্বোধনে লইয়া যাওয়া হয়। শেষে বেলুড় মঠে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আগত প্রতিনিধিদের ও ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাণী জানান। ডঃ রমা চৌধুরী এই মহাসম্মিলনীতে যে স্বর্গীয় আনন্দ সকলেই অনুভব করিলেন তাহা প্রকাশ করেন। হায়দ্রাবাদের সভানেত্রী চন্দ্রামণি দেবী সকলকে ধন্যবাদ জানান। পরে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃনাম-কীর্তন ও ভজন পরিবেশন করেন। ১৮ই প্রতিনিধিগণ কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন করিয়া আসেন। ১৯শে তাঁহারা স্ব স্ব কেন্দ্রে ফিরিয়া যান। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে শ্রীসারদা সঙ্ঘের রজতজয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

শিক্ষণ-শিবির

কল্যাচক শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে অখিলভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের আদর্শে বড়বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ হাইস্কুলে ২২শে হইতে ২৪শে ফেব্রুআরি ১৯৮০, একটি যুব-ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে বৈকালে স্বামী শিবময়ানন্দ শিবিরের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও সঙ্গীতান্তে স্বামী শিবময়ানন্দ স্বামীজীর আদর্শে জীবন গঠনের জন্য শিবির-শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। স্বামী অমলানন্দ মনঃসংযোগ ও ব্রহ্মচর্যের প্রতি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জাতীয় শিক্ষক শ্রীযুত ঈশ্বর-চন্দ্র প্রামাণিক দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের চরিত্রগঠন ও মনুষ্যত্ববিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২৩শে ও ২৪শে সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় পতাকা উত্তোলন, মনঃসংযোগ, সমবেত ব্যায়াম, মনুষ্যত্বলাভ ও চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় অংশ-

গ্রহণ করেন সর্বশ্রী বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরা এবং বলেন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২৪শে সকালে শিবিরবাসিগণ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ, সঙ্গীত ও বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামের পথ পরিক্রমা করেন। সন্ধ্যায় স্বামী ভর্গানন্দ শিবিরবাসিগণ ও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ অনুশীলনই জাতীয় জীবন-গঠনের সুষ্ঠুতম পন্থা বলিয়া নির্দেশ করেন। ১০টি স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক এবং ৫টি মহামণ্ডল কেন্দ্রের সদস্য লইয়া মোট ১৫০ জন শিবির-শিক্ষার্থী ছাড়া প্রতিদিন গড়ে ১০ জন অতিথি শিবিরে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত দেবাশিষ ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে এগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের কর্মী যুবকগণ সমগ্র শিবিরটি পরিচালনা করেন।

উৎসব

ধুবড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। প্রভাতফেরি, পূজা, হোম, ধর্মসভা ও সঙ্গীতাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান। স্বামী তত্ত্ববোধানন্দ উভয় দিন ভাষণ দেন এবং স্বামী ভজনানন্দ ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গত ২৫শে মার্চ, স্বামী আত্মস্থানন্দ বর্তমান যুগে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা এবং যুবসমাজের কাছে উহার উপস্থাপনা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

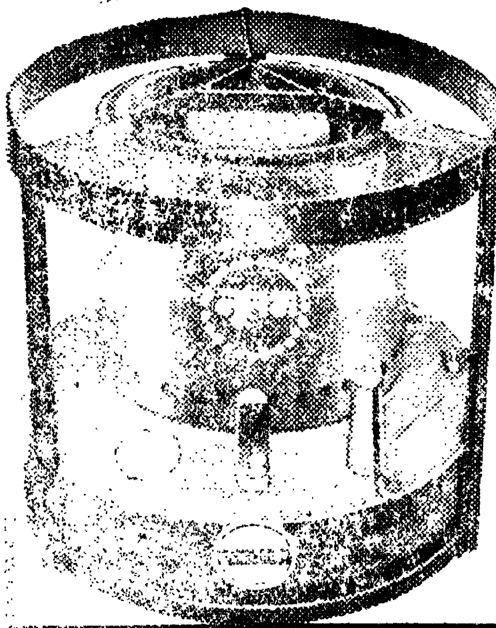
পূর্ণিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১৯শে মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব ও শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় বক্তৃতা দেন স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ, স্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী প্রত্যয়ানন্দ, শ্রীশ্রীধর প্রসাদ এবং শ্রীশ্যামসুন্দর প্রসাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীফণীভূষণ প্রসাদ, পুরস্কার-বিতরণ করেন শ্রীমতী প্রসাদ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও স্বামী কালিকাত্মানন্দ। ২০শে মার্চ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। ২১শে মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নবমী পূজার দিন ৭,০০০ নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

রাখালচণ্ডী (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি লইয়া হরিনাম-সংকীর্তনসহ নগরপরিক্রমা, পূজা ও হোম হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ছয় শতাধিক ভক্ত নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্ণে আশ্রমপ্রাঙ্গণে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, প্রধান অতিথি শ্রীপরেশ চক্রবর্তী ও সভাপতি স্বামী নিবৃত্তানন্দ। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীরেবতী মণ্ডল।

পরলোকে

গভীর দুঃখের বিষয়, গত ১০ই জুন ১৯৮০, সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে অরুণোদয় চৌধুরী ৭০ বৎসর বয়সে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ইউরিমিয়া রোগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রামকৃষ্ণ মিশনের সভ্য এবং বারাসাত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।








KOLAY
DELTA

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ [illegible], মূল্য [illegible]

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৫০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮ মূল্য ৮·০০

উপনিষদ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ [illegible], মূল্য ১১·০০

২য় ভাগ পৃঃ [illegible], মূল্য ১১·০০

৩য় ভাগ পৃঃ [illegible], মূল্য [illegible]

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬·৪০

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯·২৫

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ [illegible], মূল্য [illegible]

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬·০০, ৩য় খণ্ড ৪·০০, ৪র্থ খণ্ড ৩·০০; ২য় অধ্যায় ১৩·০০; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০; ৪র্থ অধ্যায় [illegible]

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭২, মূল্য ২·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি—পৃঃ ৬৩, মূল্য ১·৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত পৃঃ ২২০, মূল্য ১০·০০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ১১৬, মূল্য ২·৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৭·০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১০·০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪·০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

Udbodhan—Phone : 55-2447 AUGUST 1980 Regd. No. WB/NC-19

...গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
...রণ্যানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শারদীয় সংখ্যা ১৩৮৭



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** কবিতা ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, আশ্বিন, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।

যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত

জনৈক-ভক্ত

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত

ভক্ত

* * *

"রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন কি ভক্ত ছেলেদের এঁটো পর্য্যন্ত পরিষ্কার করছেন!

ঠাকুরের গলায় ঘা হয়েছিল রামকৃষ্ণ সংঘ তৈরীর জন্য, আর মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট কচ্ছেন গৃহী ভক্তদের গার্হস্থ্য ধর্ম শেখাবার জন্য।"

—স্বামী প্রেমানন্দ

উদ্বোধনের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের এই ভাবমূর্তি আমাদের সব ধারণের অনুধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হউক।

—জনৈক কৃপাপ্রার্থী।

* * *





৮২তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 'সচ্চিদানন্দময়ী'—চিদ্‌ঘনমূর্তি। মা সর্বব্যাপী;—শূন্যে থাকতে পারেন, মানুষের ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইটকাঠের ভিতরে, এমন কি সেই ক্ষুদ্র বালুকণার ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না—এ কখনই হতে পারে না। আমার যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে; মাকে দেখতে না পেলে মহা অশান্তি বোধ করি—প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি হয়,—নিশ্চয়ই বলছি—মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই আসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। যেমন ক'রে হ'লে আমার এই ক্ষুদ্র মন তাঁকে বুঝতে পারবে, তেমনি ক'রেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই স্নেহময়ী জননী। ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আসবেনই আসবেন, কোনও সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী; আমার ক্ষুদ্র আধারের মত হয়েই মা আমার নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন।

—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

[উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৫৫১]



কথাপ্রসঙ্গে

ভ্রান্তিরূপিণী

শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তশতীর সুপ্রসিদ্ধ চারিটি স্তবের তৃতীয়টির অন্তর্গত একটি মন্ত্রে আছে :

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

অর্থাৎ, যে-দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে বিরাজিত, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে বারংবার প্রণাম।

যে-দেবীকে এই মন্ত্রে স্তুতি করা হইয়াছে, তিনি 'দুর্গা ভগবতী ভদ্রা'। তাঁহারই অন্যান্য নাম—অম্বিকা, কৌশিকী, চণ্ডিকা, কাত্যায়নী, অপরাজিতা, শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী প্রভৃতি। শুম্ভ ও নিশুম্ভ—এই দুই মহাসুর কর্তৃক স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত হইলে দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীকে অন্যান্য মন্ত্রসহ এই মন্ত্রে বন্দনা করিয়াছিলেন।—এ-সকলই শ্রীশ্রীচণ্ডীর পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু মন্ত্রটিতে যে 'ভ্রান্তি'র উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ কী? শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার প্রাক্‌লগ্নে জগন্মাতার প্রীতিকামনায় এ-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

টীকাকারগণ এই মন্ত্রটির যে-সকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে 'ভ্রান্তি'র আমরা দুইটি অর্থ পাই—(১) বিস্মৃতি এবং (২) অপ্রমা বা অযথার্থ জ্ঞান।

'বিস্মৃতি' অর্থটি সকল টীকাকার গ্রহণ না করিলেও শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্রহ্মাকৃত প্রথম স্তবটিতেই মহামায়াকে 'মহাস্মৃতিঃ' অর্থাৎ মহাবিস্মৃতি বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে, ইহা আমরা লক্ষ্য করি। সুতরাং যাঁহারা 'বিস্মৃতি' অর্থটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা নিরাধার নহে। এই 'বিস্মৃতি'র দুইটি দিক আছে। একটি মঙ্গলময়, অপরটি অমঙ্গলময়—অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে। জীবনে আমরা অনেক অবিচার-অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক-তাপ ভোগ করি। যখন ভোগ করি, তখন জীবন দুর্বিষহ মনে হয়। কিন্তু সমস্ত ব্যথা-বেদনা কালক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়। যদিই বা কখনো স্মৃতিপথে উদিত হয়, তাহার তীব্রতা এতই মন্দীভূত হইয়া যায় যে, তাহাকে অনায়াসে বিস্মৃতপ্রায় বলা যায়। এই বিস্মৃতি যদি না থাকিত, তাহা হইলে জীব মৃত হইয়া জীবনধারণ করিত। সুতরাং শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ইহা অশেষ করুণা যে, তিনি ভ্রান্তিরূপিণী হইয়া আমাদের সকলের হৃদয়ে বিরাজমানা। ইহা তাঁহার কল্যাণময়ী মূর্তি।

অপর দিকে বিস্মৃতির অমঙ্গলময় দিকও আছে। শাস্ত্র ও আচার্যগণের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানুষ সমস্ত পুরুষার্থের অযোগ্য হয়। গীতাতে ইহার উল্লেখ আছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'স্মৃতিবিভ্রম' ও 'স্মৃতিভ্রংশ'—এই দুইটি পর্যায়বাচী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সমস্ত অনর্থের মূল যে রূপরসাদি বিষয়সমূহের বিরামহীন চিন্তা, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন :

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ
ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ
স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
(২।৬২-৬৩)

অর্থাৎ, মানুষ বিষয়সমূহের অবিরত চিন্তা করিতে থাকিলে সেগুলিতে তাহার আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং [প্রতিহত] কামনা হইতে

ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্যক্ মোহ এবং তাহা হইতে স্মৃতিবিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় আর বুদ্ধিনাশ হইলেই মানুষ প্রণষ্ট হয়

যদিও এই শ্লোকদ্বয়ে 'স্মৃতিবিভ্রম' বা 'স্মৃতিভ্রংশ' যে কী বিষয়ে তাহার উল্লেখ নাই, তথাপি আচার্যগণের ব্যাখ্যায় উহা স্পষ্টীকৃত। শংকরাচার্য তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, শাস্ত্রাচার্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাৎ বিভ্রমঃ ভ্রংশঃ—স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিঃ।' তাৎপর্য এই যে, শাস্ত্র ও আচার্যগণের উপদেশ বারংবার শ্রবণের ফলে আমাদের অন্তঃকরণে একটি শুভ সংস্কার উৎপন্ন হয়। প্রতিহত কামনা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইলে ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয় অর্থাৎ কোন্‌টি করণীয় আর কোন্‌টি করণীয় নহে, সে-সম্বন্ধে বিবেক-বিচার থাকে না। এই সম্মোহের ফলে পূর্বোক্ত শুভ সংস্কারের স্মৃতি বিলোপ পায়—সেই শুভ সংস্কারজনিত স্মৃতির উৎপত্তি হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও উহার উৎপত্তি হয় না। শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের উপদেশের সংস্কারজনিত স্মৃতি তো এই সকল সঙ্কটকালেই মানুষকে রক্ষা করে; সুতরাং সেই স্মৃতি যে উৎপন্ন হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত, কিন্তু বিষয়চিন্তা এমনই অনর্থের মূল যে, ঐ সংস্কারজনিত স্মৃতিও মোহগ্রস্ত মানুষের মনে উদিত হয় না। ফলে মানুষের হয় বুদ্ধিনাশ—শাস্ত্রবিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অযোগ্য হওয়ায় সে আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকে না।

এই 'স্মৃতিবিভ্রম' বা ভ্রান্তি সাধকের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে অমঙ্গলময়, কিন্তু সিদ্ধের দৃষ্টিতে নহে। সিদ্ধব্যক্তি এখানেও ভ্রান্তিরূপিণী জগজ্জননীর করুণাময়ী মূর্তিই দর্শন করেন। তিনি দেখেন প্রত্যেকটি পতন তাঁহার উত্থানের কারণ হইয়াছে—প্রত্যেকটি ভুল তাঁহাকে চলার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে; ভুল ও ভুল-ভাঙা, আবার ভুল ও আবার ভুল-ভাঙা—এই টানাপোড়েনে চলিয়াই তিনি পথের শেষে উপনীত হইয়াছেন, শুধু একটি জীবনে নহে, বহু জন্মের অন্তে। প্রয়াত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রায় সকলেই কবির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলি বটে—

> 'আজিকে হয়েছে শান্তি,
> জীবনের ভুলভ্রান্তি
> 　　সব গেছে চুকে।
> রাত্রিদিন ধুক্‌ধুক্
> তরঙ্গিত দুঃখসুখ
> 　　থামিয়াছে বুকে।'
>
> (রবীন্দ্রনাথ : 'মৃত্যুর পরে')

কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন না। শাস্ত্র বলেন, 'বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে' (গীতা ৭।১৯)—বহু জন্মের অন্তে মানুষ চরম জ্ঞান লাভ করে। নিহিতার্থ এই যে, অন্তিম জীবনের পূর্ব পর্যন্ত 'ভুলভ্রান্তি'র হিসাবনিকাশ চুকিয়া যায় না, 'তরঙ্গিত দুঃখসুখ'ও থামিয়া যায় না। মানুষের পূর্ব পূর্ব জীবনের অশুভ সংস্কার এবং শাস্ত্র ও মহাজনবাণী-জনিত শুভ সংস্কারের সংগ্রাম চলে ইহজীবনের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া এবং জগন্মাতার কৃপায় যে-জীবনে শুভ সংস্কারগুলিই বিজয়ী হয়, সেই অন্তিম জীবনেই সমস্ত 'ভুলভ্রান্তি' নিঃশেষে চুকিয়া যায়, 'তরঙ্গিত দুঃখসুখ'ও চিরকালের জন্য থামিয়া যায়।

তাই যে-কথা বলিতেছিলাম—'স্মৃতিবিভ্রমে' সিদ্ধব্যক্তি ভ্রান্তিরূপিণী জগজ্জননীর মঙ্গলময়ী মূর্তিই দেখেন। 'স্মৃতিবিভ্রম'-জনিত পতন আর অমঙ্গলময় মনে হয় না—অগ্রগতির পথে, জগন্মাতাকে পাইবার পথে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে হয়। তিনি দেখেন—'আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কার্য নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্মবিস্মৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাঁহাকে জগতে

যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ করাইলেন ; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ হারানো মহিমা ফিরিয়া পাইলেন, নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহারা এই পদ-চিহ্নহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহা-দিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইভাবে তিনি অনাদি অনন্ত কাল কার্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে সুখদুঃখের মধ্য দিয়া, ভাল-মন্দের মধ্য দিয়া জীবাত্মাগণ অনন্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।' (স্বামী বিবেকানন্দ : রাজযোগ)

বিস্মৃতিরূপিণী ভ্রান্তির পর অপ্রমারূপিণী ভ্রান্তির কথা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচণ্ডীর টীকা-কারগণ আলোচ্যমান মন্ত্রটিতে 'ভ্রান্তি'র দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন 'অপ্রমা'। 'প্রমা' শব্দটির অর্থ যথার্থজ্ঞান। সুতরাং 'অপ্রমা'র অর্থ অযথার্থজ্ঞান। গুপ্তবতী টীকায় আছে—'ভ্রান্তিঃ অপ্রমা' ; চতুর্ধরী টীকায়—'অতস্মিন তৎ ইতি প্রত্যয়ঃ' (যেটি যে-বস্তু নহে, সেটিতে সেই বস্তুর জ্ঞান) ; শান্তনবী টীকায়—'অতস্মিন্ তৎ ইতি জ্ঞানং ভ্রান্তিঃ' ; নাগোজী ভট্টের টীকায়—'ভ্রান্তিঃ অতদ্বতি তদ্-বৎ-প্রত্যয়ঃ' ; দংশোদ্ধার টীকায়—'ভ্রান্তিঃ অতদ্-বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানম্'। এই সকল ব্যাখ্যায় শব্দের কিছু ইতরবিশেষ থাকিলেও বক্তব্য একই এবং 'রজ্জুতে সর্পজ্ঞান' দৃষ্টান্তটি মনে রাখিলে বক্তব্যটি বুঝিতে অসুবিধা হয় না। 'অপ্রমা' আর 'অধ্যাস' একই কথা। শংকরাচার্য অধ্যাসের সংজ্ঞা দিয়াছেন—'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'। উল্লিখিত টীকা-গুলিতে প্রায় একই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অধ্যাস' সম্বন্ধে বৈশাখ ১৩৮৭ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। রজ্জুতে যখন আমাদের সর্পভ্রম হয়, শুক্তিকাতে রজতভ্রম হয়, মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম হয়, জলে কাচভ্রম হয়, তখন সেই অধ্যাস বা অপ্রমা ভ্রান্তিরূপিণী জগ-জ্জননীরই লীলামাত্র—শাক্তের দৃষ্টিতে। আবার নিষ্ক্রিয় আত্মায় যখন সক্রিয় দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আরোপিত হয় এবং জড় দেহেন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ধর্ম আরোপিত হয়, তখনও শাক্ত ভ্রান্তি-রূপিণী মায়েরই লীলা দেখেন। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রান্তিও ভ্রান্তিরূপিণী মায়েরই লীলাবিলাস। বেদান্তের ব্রহ্মের উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কী! মা ই তো বলিতেছেন, 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা-পরা ?'—'একা আমিই আছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আর আছে এ-জগতে ?' বেদান্তও বলেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য উপ. ৬।২।১), 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (বৃহদারণ্যক উপ ৪।৪।১৯, কঠ উপ. ২।১।১১)—'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন', 'নানা বলিয়া এই বিশ্বে কিছুই নাই।' সুতরাং কথা একই—কেহ বলিতেছেন 'ব্রহ্ম', কেহ বলিতেছেন 'মা'। একমাত্র মা-ই আছেন, তথাপি আমরা নানা দেখিতেছি ভ্রান্তিতে। এই ভ্রান্তি ভ্রান্তিরূপিণী মায়েরই খেলা !

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সমাসন্ন শুভাবসরে ভ্রান্তিরূপিণী জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা এই যে, তাঁহার কৃপায় আমাদের যেন 'স্মৃতিবিভ্রম'-রূপিণী ভ্রান্তি না হয়—শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের বাণী স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকিয়া যেন আমাদের সকলের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে এবং অন্তে বিশ্বাতীতাতে বিশ্বভ্রান্তিও নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—মায়ের এই মহাবাণীর অপরোক্ষ অনুভূতি যেন আমাদের কৃতকৃতার্থ করে।

কাবেরীর উৎস-সন্ধানে

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

কাবেরীর উৎস-সন্ধানে চলিয়াছি। ১৯৩৮ সালের এক দ্বিপ্রহর। কুর্গ্ রাজ্যের মার্কারা শহর হইতে ১০।১২ জন সাধু লইয়া বাস ছাড়িয়াছে। উৎসের নাম 'থল-কাবেরী'।

শ্রীরঙ্গমে কাবেরীতে স্নান করিয়াছি—অতি-প্রসারিত নদী। শ্রীরঙ্গপট্টমে শৈলরাজির মধ্যে আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিতা অনতিদীর্ঘা কাবেরীর অন্য এক রূপ দেখিয়াছি। আবার শিবসমুদ্রমে ঐ নদীর জলপ্রপাতও স্তব্ধবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই বহুভঙ্গিমাময়ী স্রোতস্বিনীর কি রূপ দেখিব তাহার উৎসে? বড় কৌতূহল চিত্তে।

বাস চলিয়াছে। আধ-কাঁচা রাস্তা। হেলিয়া দুলিয়া, মাঝে মাঝে বেশ ঝাঁকুনি দিয়া যেন লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়াছে; গতি কখনও মন্দা, কখনও দ্রুত। পাহাড়ের গায়ে কোথাও ক্ষুদ্র গ্রাম, দু-চারটি কুটির। বড় সুন্দর এই কুর্গ্ প্রদেশ। ক্রমশঃ লোকবসতি পিছে ফেলিয়া বিজন ঘোর জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা উপরে উঠিতেছে। এক পাশে গভীর খাদ। সেই দিকে তাকাইয়া কেহ কেহ ভয় পাইতেছেন। রাস্তাও বেশ সরু, আবার প্রায়ই বাঁক। মুহূর্তের অসাবধানতায় গাড়ির চাকা পিছলাইয়া গাড়ি খাদে পড়িতে পারে। কেহ কেহ মৃদুস্বরে এই আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন। ড্রাইভার উৎসাহী কুর্গী যুবক। তাহার চাকা ঘুরাইবার কৌশল প্রশংসনীয়। সে স্বামীজীদের হাসিয়া অভয় দিতেছে—"ভয় পাইবেন না, যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের এতগুলি সাধুর আকস্মিক মৃত্যু কতবড় একটি আন্তর্জাতিক সংবাদের সৃষ্টি করিবে, আমি কি তাহা জানি না? আমি ঠিক আপনাদের থল-কাবেরী ঘুরাইয়া সন্ধ্যায় মার্কারায় পৌছাইয়া দিব। কোনও চিন্তা করিবেন না।"

একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জনৈক জাপক সাধুকে বলিতেছেন, আপনি সকলের হয়ে জপ করুন। জাপক তৎক্ষণাৎ মালা বাহির করিয়া নিঃশব্দে জপ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ একবার ভয়াবহ খাদের দিকে তাকাইয়া আর একবার ঘোর বনানী আচ্ছাদিত পর্বতগাত্রে চোখ ফিরাইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে সময় গুণিতেছেন। দু-একজন ভক্তিভরে উচ্চারণ করিতেছেন, জয় মা কাবেরী-গঙ্গা।

কিন্তু কাবেরী-মা কোথায়? যে কাবেরী সিন্ধু-সঙ্গমে, শ্রীরঙ্গমে, মহীশূর-রাজ্যে—সেই প্রবাহিণীই নিশ্চিতই শিলাপ্রস্তর ভেদ করিয়া অরণ্যানীর কোল বাহিয়া আমাদের চোখের আড়ালে নাচিয়া নাচিয়া নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রবাহে তো কোনও ছেদ নাই। আমরাই দেখিতে পাইতেছি না। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। উৎসে মায়ের আবার দেখা পাইব। যে মাকে নীচে দেখিয়াছি সেই মা-ই উপরে। তাঁহাকে চিনিতে পারিব তো? উৎসে তাঁহার অতি-ক্ষীণা মূর্তি দেখিয়া বিশ্বাস হারাইব না তো?

কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যায়। ড্রাইভার বলিতেছে, এইবার আমরা নিকটে পৌঁছিয়াছি। জঙ্গল ভেদ করিয়া অতিদূর হইতে মৃদু জলকল্লোল শোনা যায়। সকলের প্রাণে উৎসাহ জাগিয়া ওঠে। ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে—হাঁ, উহা কাবেরী-মায়ের স্রোতধ্বনি

কতদূরে?

সে হাসিয়া বলে, অনেক দূর।

কাছে যাওয়া যায় কি?

না। বড় দুর্গম জঙ্গল।

অবশেষে বাস থামে—একখণ্ড সমতল জমিতে

আশেপাশে তাকাইয়া জলধারার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। ড্রাইভার বলে, এবার হাঁটিতে হইবে। হাঁটা শুরু হয়। বেশ চড়াই সরু পাহাড়ী রাস্তা।

প্রায় আধঘণ্টার উপর হাঁটিবার পর পাহাড়ের গায়ে জঙ্গলে প্রায় অদৃশ্য একটি ক্ষীণ জলপ্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়। ড্রাইভার উচ্চস্বরে ঘোষণা করে, দেখুন দেখুন কাবেরী-মা নামিয়া আসিতেছেন। সকলে করজোড়ে নমস্কার করিয়া বলিয়া উঠেন :

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

আরও বেশ কিছুক্ষণ উপরে উঠিতে হয়
ড্রাইভার বলে, পৌঁছিয়াছি। কাবেরী-গঙ্গার উৎস —থল-কাবেরী

বিশ্বাস কি হয় আগাছায় আবৃত একটি নাতি-গভীর গর্ত হইতে ক্ষীণভাবে নির্গত একটি সামান্য জলধারা—যে কাবেরীকে শ্রীরঙ্গপট্টম, শিবসমুদ্রম এবং ত্রিচিনাপল্লী-শ্রীরঙ্গমে দেখিয়াছি সেই বহু-বিস্তীর্ণা নদীর উৎস ?

তবুও তাহাই তো সত্য। থল-কাবেরী যদি কোনওক্রমে বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে কাবেরী শুকাইয়া যাইবে। আপাত-সামান্য উৎসটিই বৃহৎ স্রোতস্বিনীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বহুপ্রকাশমান জীবন-ভঙ্গিমার শক্তি ও সৌন্দর্য অবিচ্ছিন্নভাবে যোগাইয়া যাইতেছে

ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রে বিশ্বসংসারকে কখনও সমুদ্র, কখনও বৃক্ষ, অরণ্য, কখনও বা নদীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

শিষ্য গুরুর নিকট হৃদয়ের আর্তি জানাইতেছেন—

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং
কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।

"কেমন করিয়া আমি এই সংসারসমুদ্র পার হইব ? কি আমার গতি ? কোনও উপায় আছে কি ?"

(শঙ্করাচার্যকৃত-বিবেকচূড়ামণি, শ্লোক ৪০)

ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্.

"এই বিশ্বসংসারকে জ্ঞানীরা একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" (ভগবদ্গীতা ১৫।১)

নদীর উপমা—

(হরি) দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে ॥

(প্রাচীন বাংলা ধর্মসঙ্গীত)

নদী যেমন বহিয়া যায়, এক স্থানে এক জল সামনে সরিয়া অপর জলের জন্য স্থান করিয়া দেয়, বিশ্বসংসারও সেইরূপ অনবরত পরিবর্তনের স্রোত। আজ যাহা দেখিতেছ কাল সেই স্থানে অপর কিছু আসিয়া দাঁড়াইবে। পরশ্ব অপর কিছু। নদী কখনও শান্ত, কখনও তরঙ্গ-সঙ্কুল; কখনও জীবনপোষক, কখনও মহা-প্লাবনে ধ্বংস-আনয়নকারী। জগতে সেইরূপ সুখশান্তি আছে, আবার দুঃখবিপর্যয়ও আছে। নদীর যেমন বহু শাখাপ্রশাখা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও সেইরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য। সংসারকে নদীর সহিত তুলনা করা অযৌক্তিক নয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ সংসার-নদীর বর্ণনা দিতেছেন—

পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চপ্রাণোর্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাম্।
পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥

"পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার পাঁচটি স্রোত, পঞ্চ-ভূতের বিস্তার দ্বারা যাহা দুস্তর ও বক্র, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় যাহার ঢেউ, পাঁচটি ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের কারণ মন যাহার মূল, শব্দাদি পাঁচটি বিষয় যাহার আবর্ত, (গর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুরূপ) পাঁচটি দুঃখ যাহার স্রোতোবেগ, (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ) পাঁচটি ক্লেশ যাহার সোপান এবং অন্যান্য

বিস্তার লইয়া পঞ্চাশপ্রকার ভেদযুক্ত সংসার-নদীর সত্য আমরা পর্যালোচনা করিব।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ১।৫)

এই সংসার-নদীর পারে যাইতে না পারিলে জীবের পরমা শান্তি ও নিরাপত্তা নাই। সেইজন্য সংসার-নদীর প্রকৃতি ও মূল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা অধ্যাত্ম-সাধকের মানসে স্বতই উপস্থিত হয়। কোথা হইতে এই নদী আসিতেছে? যেমন স্থূল কাবেরীর উৎস-সন্ধানে গিয়া পরিশেষে অবিশ্বাস্য সরল এবং সামান্য একটি জলধারায় গিয়া পৌছাই এবং ঐ থল-কাবেরীকেই দূর দূর প্রসারিত কাবেরী মহা-নদীর জীবন- ও শক্তি-দায়ক মূল কারণ বলিয়া মানিয়া লই, সেইরূপ এই বিশ্বসংসাররূপ বহু-শাখান্বিত নদীর সরল কোনও আদি সত্য আছে কি—যেখানে সকল বৈচিত্র্য গুটাইয়া আসিয়াছে অথচ যাবতীয় অভিব্যক্তির সকল সম্ভাবনা অতিসূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে?

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে ঋষিরা এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন দেখিতে পাই। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ সহায়ে যুক্তিবিচার করিয়া তাঁহারা একটির পর একটি কল্পকে 'ইহা মূল কারণ হইতে পারে না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কাল নয়, স্বভাব নয়, নিয়তি বা যদৃচ্ছা নয়, পঞ্চভূত বা চেতন জীবও নয়, ইহাদের সংহতিও নয়। তবে কি? যুক্তিবিচার যখন পথ দেখাইতে পারিল না, তখন তাঁহারা 'ধ্যানযোগা-নুগতা অপশ্যন্'—ধ্যানযোগে নিবিষ্ট হইয়া উপলব্ধি করিলেন (শ্বেতাশ্বতর উঃ ১।৩)—ত্রিগুণাত্মিকা আত্মশক্তি সহায়ে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। তিনিই সৃষ্টি করিতেছেন, ধারণ করিতেছেন আবার তাঁহাতেই সব লয় পাইতেছে। উপনিষদের ভাষায় সেই পরমাত্মা সগুণব্রহ্ম।

সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনে উপনিষদ্ মুখরিত। মানুষের শ্রেয়ের পথ হইল সগুণব্রহ্মের উপাসনা। নানা প্রতীকসহায়ে নানা উপাসনার নির্দেশ উপনিষদে দেখিতে পাই। উপাসনা অভ্যাসের ফলে চিত্ত নির্মল হয়, অধ্যাত্মজ্ঞান ধীরে ধীরে হৃদয়ে স্ফুরিত হয়। সংশয়, মোহ, ভয় অপসারিত হইয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের স্পর্শে জীবন ধন্য হয়।

কিন্তু কাবেরীর উৎস-সন্ধান সমাপ্ত হয় নাই। উপনিষদের ঋষি সগুণ হইতে নির্গুণব্রহ্মে অভিযাত্রা করিলেন। সগুণ যখন তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিত্ব এবং অন্যান্য ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া আপন নিরুপাধিক স্বরূপে দাঁড়ান তখন তিনি নির্গুণ। তিনি তখন আমাদের বাক্যমনের অতীত। তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারি না, মন দিয়া তাঁহার ধ্যান করিতে পারি না, বাক্য দিয়া তাঁহার স্তুতিগানও করা চলে না। তবে তাঁহাকে লইয়া কি করিব? তিনি আমাদের কোন্ উপকার সাধন করিবেন?

ঋষি তাঁহার উৎস-সন্ধানে ক্ষান্তি দিলেন না। চলো, চলো, আরও উপরে চলো। অন্তিম উৎস পাওয়া গেল মানুষেরই অন্তরতম সত্যে। ঈশ্বরের সর্বোত্তম স্বরূপ যেমন নিরুপাধিক ও নির্গুণ, মানুষও যখন তাহার সকল আবরণ, সকল পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া উপরে চলিতে থাকে তখন আখেরে সে তাহার স্বরূপে পৌছিতে পারে। তাহার নিরাবরণ, নিরুপাধিক সত্য আর ঈশ্বরের নিরুপাধিক স্বরূপ একই। উপনিষদের ঘোষণা—'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি'—"আমিই ব্রহ্ম", "তুমিই তাহা"। এই অন্তিম উৎসে পৌছানো বড় সহজ কথা নয়। একান্ত সাহস চাই, প্রখর অনাসক্তি চাই। আমি দেহ নই, মন নই, প্রাণ নই, কর্তা নই, ভোক্তা নই—এই প্রতীতি একদিনে আসে না। কিন্তু আসিতে পারে। আত্মজ্ঞান কবিকল্পনা নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের পিছনে, জগৎসংসারের অসংখ্য অভি-ব্যক্তির পশ্চাতে, সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরেরও মহিমার

পিছনে যে অদ্বয় সত্য রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি একটি অসন্দিগ্ধ ধ্রুব জ্ঞান। ঐ জ্ঞান অবশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, মন দিয়া ভাবা যায় না। পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মানুষ অপরিচ্ছিন্ন বৃহত্তমকে 'জানে' না—উহার সহিত এক হইয়া যায়। এই একত্বই উপনিষদ্ বলেন, মানুষের চরম আধ্যাত্মিক সংপ্রাপ্তি। ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মুক্তি, অপরিবর্তনীয় শাশ্বত আশ্রয়।

আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আত্মদ্রষ্টার চিন্তাধারা বদলাইয়া যায়। তিনি তখন বলেন না, সংসার-কাবেরীর উৎস সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই বিভূতি। তিনি বলেন, (যদি বলিবার প্রয়োজন হয়) যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি তাহার উৎস 'আমি', জগৎসংসার আত্মস্বরূপ আমারই প্রতিচ্ছবি

মুণ্ডক উপনিষদ্ একটি অধ্যায়ে (২।১) অক্ষর (সচ্চিদানন্দ সগুণব্রহ্ম) হইতে বিশ্বসৃষ্টি (স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ) বর্ণনা করিয়া শেষ শ্লোকে পরম-সত্যের ইঙ্গিত করিলেন, 'এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য।'—"এই অক্ষর পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে নিহিত অন্তরাত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থি সর্বতোভাবে ছিন্ন করেন।"

তাৎপর্য এই যে অন্তরাত্মাই সংসার-নদীর চরম উৎস।

কঠোপনিষদ্ দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম বল্লীর দুইটি শ্লোকে সেই উৎসের কথা এইভাবে বলিতেছেন—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ॥

"এই দেহের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-স্থানে অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনিই অতীত-অনাগতের নিয়ন্তা। যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন তিনি কোনও প্রকার ভয়ের বস্তু হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা করেন না, অর্থাৎ সর্ববস্তুকেই আত্মস্বরূপ জানিয়া তিনি সকল অবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। না আছে তাঁহার মৃত্যুভয়, না নরকের ভয়।"

"অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়-গুহায় অবস্থিত সেই আত্মা নির্ধূম অগ্নিশিখার মতো উজ্জ্বল। ভূত-ভবিষ্যতের নিয়ন্তা তিনি ইদানীং বর্তমান, আবার কল্যও থাকিবেন। অর্থাৎ কালের গতি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।"

আত্মদ্রষ্টা এইভাবে আত্মার স্তুতিগান করেন—

হে আমার অন্তরপুরুষ, এই জগৎ-প্রবাহের উৎস খুঁজিতে গিয়া আমি বাহিরে কত ছুটিয়াছি—ছুটিয়াছি বৈকুণ্ঠে, শিবলোকে, ব্রহ্মলোকে। দেখা দাও, দেখা দাও, প্রকাশিত হও, প্রকাশিত হও বলিয়া কত আকুল প্রার্থনা দূরদূরান্তরে পাঠাইয়াছি। ধাপে ধাপে থামিয়াছি। ভাবিয়াছি এখানেই বুঝি উৎস। প্রাণ মানে নাই। তাই অন্বেষণ থামাই নাই। খুঁজিয়াছি, খুঁজিয়াছি। অবশেষে তুমি সাড়া দিলে, আমারই পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে, শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে, মনের চিন্তারাশির মধ্য হইতে, আমার 'আমি' 'আমি' বোধের পিছন হইতে সাড়া দিলে। যাহা জীবচেতনা বলিয়া গ্রাহ্য করি নাই, তাহাই যে বিশ্ব-মূল, দুর্বুদ্ধি আমি আগে বুঝিতে পারি নাই।

তুমি এত সরল, এত সামান্য, থল-কাবেরীর বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত অঙ্গুলি-পরিমিত অতি-সাধারণ জলধারার মতো সামান্য অথচ অতি-বিস্তীর্ণা কাবেরী নদীর সমগ্রতা যেমন সেই জলধারাটুকুতেই নিহিত, সেইরূপ হে আমার দেহ-মনের সামান্য চেতনা তুমিই যে অখণ্ড অনন্ত বিশ্বচেতনা। যাহা কিছু আছে, তোমাতেই আছে। যাহা কিছু ঘটিতেছে তোমাতেই ঘটিতেছে। তোমাতে দূর নাই, নিকট নাই; এক নাই, বহু নাই।

একদিন নির্গুণ পরব্রহ্মকে 'নেতি' 'নেতি' করিয়া ধারণা করিতে গিয়াছিলাম। তুমি হাসিয়া বুঝাইলে —সেই নেতি নেতির লক্ষ্য তুমিই—আমারই অন্তরাত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন—

অথাত আত্মাদেশ এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি।

"অতঃপর আত্মা-সংক্রান্ত ঘোষণা। আত্মাই নীচে, আত্মাই উপরে, আত্মা পিছনে আবার সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে। আত্মাই এই সমস্ত।" (ছান্দোগ্য উঃ ৭।২৫।২)

এইভাবে আমরা উৎসে পৌছাই। উৎসে পৌছিলে আর কোনও খেদ, ভয়, সংশয় থাকে না। জীবের সামান্য চেতনা সামান্য নয়; ইহা সর্বব্যাপী, সকল মলিনতা-মুক্ত, চিরভাস্বর, সর্বানুস্যূত, সর্বময়, সব কিছুর মূল, সব কিছুতে ওতপ্রোত। 'আত্মৈবেদং সর্বম্।' আত্মা ছাড়া আর কিছু নাই।

স্বামীজীর বাংলা রচনা

ডক্টর সুকুমার সেন

স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' ও 'পরিব্রাজক'—এ দুটি রচনা গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল ১৯০৫ ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এ বই দুটি প্রকাশ করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ। ইনি যে স্বামীজীর রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন তা 'বর্তমান ভারতে'র ভূমিকা থেকে বোঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ যথার্থ কথা লিখেছেন—

> "'বর্তমান ভারত' প্রথমে প্রবন্ধাকারে পাক্ষিকপত্র 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হয়। অনেকের মুখে ঐ সময় শুনিয়াছিলাম যে, উহার ভাষা অতি জটিল ও দুর্বোধ্য। এখনও হয়তো অনেকে ঐ কথা বলিবেন, কিন্তু অদ্য আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন করিয়া ভাষার দোষ স্বীকারপূর্বক 'বর্তমান ভারত' উপহারহস্তে সলজ্জভাবে পাঠক-সমীপে সমাগত নহি। আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অত অল্পায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকাশিত।"

স্বামী সারদানন্দ স্বামীজীর রচনার ভাষার যেমন মূল্যবিচার করেছেন ভাবেরও তেমনি যাচাই করেছেন—

> "পরিশেষে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের উপর স্বামীজীর কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়া যে প্রতিবাদ-ধ্বনি 'বর্তমান ভারতে'র প্রথমাবির্ভাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া পাঠকের সত্যানুরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার উপরেই আমরা নির্ভর করিলাম। সহস্র প্রতিবাদেও সত্যের অপলাপ বা অসত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না এবং 'মন মুখ এক করাই' সত্যলাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন আমরা নিত্য মনে রাখিতে পারি।"

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুআরি (১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১লা মাঘ) স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকাটি একটি পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বামীজী স্বয়ং তার 'প্রস্তাবনা' লিখে দেন। সেটিই 'উদ্বোধনে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম

প্রবন্ধ। স্বামীজীর প্রায় সমস্ত বক্তব্যই কোন না কোন ভাবে এই প্রবন্ধটিতে আছে। 'বর্তমান ভারত' এই প্রবন্ধেরই যেন ভাষ্য। 'প্রস্তাবনা' প্রবন্ধটিতে স্বামীজী তাঁর জীবনের বাণী ও অভীপ্সা যেন উজাড় করে দিয়েছেন। বিষয় যেমন মহান্ ভাব তেমনি উদাত্ত—ভাষাও তেমনি সমুজ্জ্বল। প্রবন্ধটি সাধুভাষায় লেখা, কঠিন শব্দও মাঝে মাঝে আছে, কিন্তু কুত্রাপি নীরস নয়। স্বামীজীর নিগূঢ় সাহিত্য-প্রতিভা এই ছোট রচনাটির মধ্যে দিয়ে যথেষ্ট বিস্ফুরিত হয়েছে।

উদ্বোধনের 'প্রস্তাবনা' ও 'বর্তমান ভারত' ছাড়া স্বামীজীর সব বাংলা রচনাই—কিছু গান ও কবিতা ছাড়া—ডায়েরি অথবা চিঠি-জাতীয় রচনা। এগুলি সাধারণের গোচর করবার জন্যে মুখ্যত লেখা নয়। তাই এগুলির ভাষা সাধারণত সাধুভাষা হলেও বেশ হালকা এবং প্রায়ই সরস। তবে কখনো কখনো সাধুভাষায় লিখতে লিখতে স্বামীজী অজ্ঞাতসারে চলিত ভাষায় এসে পড়েছেন। এটা অসাবধানতা হলেও খুবই সাধারণ ব্যাপার এবং মারাত্মক নয়। একটি উদাহরণ দিই 'পত্রাবলী' থেকে। (এখানে বলে রাখি 'পত্রাবলী'তে সবসুদ্ধ ৫৭৬ খানি চিঠি আছে। তার মধ্যে ১৫৩ খানি বাংলায় লেখা, ৩ খানি সংস্কৃতে লেখা, এবং ৪১৮ খানি ইংরেজী ও ২ খানি ফরাসী ভাষায় লেখা থেকে অপরের দ্বারা বাংলায় রূপান্তরিত।)

> "বাবাজী, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ।...এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন! সকল কাজ এরাই করে। স্কুল-কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলেদের পথ চলিবার জো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেকচার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে ক'রে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হবো না।" [পত্রসংখ্যা ৮০, আমেরিকা থেকে লেখা, ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৩, পত্রাবলী, ৪র্থ সং]।

উদ্বোধন পত্রিকায় যা 'বিলাতযাত্রীর পত্র' বলে বেরিয়েছিল (১লা ভাদ্র, ১৩০৬ সাল থেকে) তা পরে 'পরিব্রাজক' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৬)। এই পত্রাকার ডায়েরিটির ভাষা চলিত, এবং খুব সরস। স্বামীজী অনেক সময় কলকাতার ককনিও ব্যবহার করে ফেলেছেন। যেমন, 'ওছল পাছল', 'আঁব-কাঠের', 'লোহার দেল' =দেয়াল), 'দ্যালে' (=দেয়ালে), 'শোর' (=শুয়ার), 'কলকেতার' ইত্যাদি

ডায়েরির মাঝে মাঝে বেশ ভাবুকতার ও কবিত্বের প্রকাশ আছে। সরসতা তো আছেই। কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করছি—

> '...আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চির-নীহারমণ্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ান্বিত ধূলি-ধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে—কিংবা পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জেলে—আঁব-কাঠের তক্তায় ব'সে থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে—হুবহু ছবিগুলি—চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ

উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার ক'রে একঘটি জল খেলেই বস্—সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম—বর্ধমান পর্যন্ত নাকি শুনতে পাই।'

কে এই শ্যামাচরণ? যাঁরা স্বামীজীর বিষয়ে নিখুঁত আলোচনা করেছেন তাঁদের কাছে আমার এই প্রশ্ন রইল।

বাংলা ভাষার কোন ষ্টাইল্ আমরা ব্যবহার করব সে বিষয়ে স্বামীজীর স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক বোধ ছিল। ১৯০০ সালের ২০শে ফেব্রুআরি আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। চিঠিটির উপযুক্ত অংশ 'বাঙ্গালা ভাষা' নাম দিয়ে 'ভাববার কথা'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংস্কৃতঘেঁষা সাধুভাষা ক্রমশ সাধারণের ব্যবহার থেকে দূরে সরে গিয়ে 'অস্বাভাবিক' হয়ে যাচ্ছে। চলিত ভাষা অস্বাভাবিক নয়, সকলের গ্রাহ্য ভাষা—সুতরাং তা-ই বাংলা ভাষার standard হওয়া উচিত। চলিত ভাষা বলতে কেউ যদি মুখের ভাষা বুঝে থাকেন তাদের সাবধান করে স্বামীজী বলছেন—

> 'যদি বল ও-কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে।'

স্বামীজীর ভবিষ্যদ্‌বাণী ফলবতী হয়েছে।

'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি'

রমা চৌধুরী

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক ধন্যজীবন অনন্যচরিত্র সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একদিন মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে জগতের সম্মুখে রেখেছিলেন সেই মহাজিজ্ঞাসা, সেই পরম প্রশ্ন:

> 'কো ন আত্মা? কিং ব্রহ্মেতি?'
>
> (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১১।১)

> 'কে আমাদের আত্মা? কে ব্রহ্ম?'

> 'ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—
> কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
> জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
> অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু
> বর্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥'
>
> (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১।১)

> 'ওঁ ব্রহ্মবাদিগণ বলছেন:
> ব্রহ্ম কি অখিলজগৎকারণ?
> কোথা হতে মোরা জাত?
> কাঁর দ্বারা মোরা আছি জীবিত?
> কাঁতে মোরা শেষে অবস্থিত?
> কাঁর দ্বারা মোরা সুখদুঃখভোগে
> আছি হয়ে ব্যবস্থিত?'

কিন্তু এই সকল মূলীভূত প্রশ্নের উত্তর—আমাদের সৃষ্টিস্থিতিলয়, আমাদের সুখদুঃখভোগের কারণ সম্বন্ধে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসার যথোপযুক্ত উত্তর তাঁরা নিজেরাই পেয়েছেন, তাঁদের নিজেদেরই স্থির প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোকে, তাঁদের নিজেদেরই ধীর উপলব্ধির সুগম্ভীর সঙ্গীতে, তাঁদের নিজেদেরই চির অনুভূতির স্নিগ্ধ সুধায়। তারই ফলস্বরূপ বিশ্ববন্দ্য উপনিষদ্-সমূহকে পেয়ে আমরাও ধন্যাতিধন্য হয়েছি। মনে পড়ছে—অসংখ্য স্তুতিবাদের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত জার্মান বিষাদবাদী (pessimist) দার্শনিক Schopenhauer-এর সেই উদাত্ত বন্দনা-বাণী: 'In the whole world, there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.'

'সমগ্র পৃথিবীতে উপনিষদের ন্যায় এরূপ কল্যাণজনক এবং উন্নয়নকারী শাস্ত্র আর নেই। এ হয়েছে আমার জীবনের সান্ত্বনা; এ হবে আমার মরণেরও সান্ত্বনা।'

এই অনুপম উপনিষদ্-শাস্ত্রে কি আছে? আছে মানবজীবনের দুটি সার্বজনীন প্রশ্নের উত্তর, যা পেলেই আমাদের হয়ে যাবে সব কিছুই পাওয়া—অর্থাৎ, একটি প্রারম্ভের কথা, অন্যটি পরিশেষের কথা; প্রথমটি সাধনার কথা, শেষেরটি সিদ্ধির কথা। কারণ, এই দুটি প্রশ্ন কেবল দার্শনিক-ধর্মগুরু-নীতিতত্ত্ববিদ্, জ্ঞানি-গুণি-মানী, ভক্ত-সাধক-তাপস প্রভৃতিরই প্রশ্ন নয়, এ সমগ্র মানব-সমাজেরও প্রশ্ন—শাশ্বত, অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন—আমাদের জীবনের সিদ্ধি লাভ করা যাবে কিরূপে; এবং তার উপায়ই বা কি? সে সিদ্ধি হোক না যে কোনো প্রকারের সিদ্ধি, লৌকিক বা আধ্যাত্মিক; সে সাধনা হোক না যে কোনো প্রকারের সাধনা—স্বার্থপর বা নিঃস্বার্থ।

বস্তুতঃ, উপনিষদের মাত্র কয়েকটি পাতা উল্টোলেই আমরা পেয়ে যাই সাধনা ও সিদ্ধি সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর নির্দেশ—কি সহজ সরল সুমধুর ভাষায়, তথাপি কি প্রগাঢ় নিগূঢ় গভীর ভাবের মাহাত্ম্যে! উপনিষদের অতুলনীয় অসংখ্যমণি-মঞ্জুষার মধ্যেও এরূপ কয়েকটি প্রোজ্জ্বলতম রত্ন আমরা পাই, যা চিরকাল আমাদের মনপ্রাণজীবন ভরে রাখবে; ভরে রাখবে আমাদের দীন-হীন রিক্ত-তিক্ত ক্লিষ্ট-পিষ্ট জীবনকে অপরূপ সম্পদে সৌভাগ্যে সাফল্যে। আজ এই অমৃতরসঘন ৺শ্রীশ্রীমাতৃপূজার অশেষ শুভলগ্নে মনে পড়ছে এরূপই একটি সুবিখ্যাত মন্ত্রের কথা, যা আমরা পেয়েছি বারংবার (আট বার), এবং যাতে আমরা আমাদের জীবনের সেই দুটি মূলীভূত প্রশ্নের—সাধনা ও সিদ্ধি-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়েই যাই একই সঙ্গে:

'য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

(কঠোপনিষদ্ ২।৩।২, ২।৩।৯)

'যে তদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।১৪)

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।১, ৩।১০, ৩।১৩, ৪।১৭ ও ৪।২০)

শেষেরটি: 'য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।'

সুবিখ্যাত বৃহদারণ্যকোপনিষদের সমগ্র মন্ত্রটি হ'ল এরূপ:

'ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভব—
ন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি ॥'

(৪।৪।১৪)

'এই জগতেই জেনেছি মোরা
ব্রহ্মকে করে' প্রয়াস।
নতুবা হতাম জ্ঞানহীন মোরা
ঘটে যেত মহাবিনাশ ॥

যাঁরা তাঁকে জানেন এরূপে
　　হন তাঁরা অমৃত সত্বর।
কিন্তু অপরে লভেন কেবল
　　শোকদুঃখই নিরন্তর॥'

কঠোপনিষদের একটি মন্ত্র এরূপ :

'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং
　　প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং
　　য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

(২।৩।২)

'সকল জগৎ হয় ব্রহ্মে কম্পিত,
　　ব্রহ্ম থেকে হয়ে নিঃসৃত।
উদ্যত বজ্রসম ভয়ানক তিনি,
　　তাঁকে জেনে সবে হন অমৃত॥'

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের একটি মন্ত্র হ'ল এই :

'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
　　ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-
　　মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥'

(৪।২০)

'তাঁর রূপ ইন্দ্রিয়গোচর নয়।
　　করে না দর্শন তাঁকে নয়ন।
হৃদয়-মনদ্বারা যিনি হৃদিস্থিত—
　　তাঁকে জেনে সবে অমৃত হন॥'

এই অতি সুন্দর মন্ত্রটিতে আমরা পেয়ে গেলাম, পেয়ে যাই একাধারে সাধন ও সিদ্ধি বা মুক্তি উভয়ই,—যা উপরেই বলা হ'ল। সেই সাধন হ'ল 'জ্ঞান', সেই সিদ্ধি হ'ল 'অমৃত'।

বস্তুতঃ, সর্বপ্রথম আমাদের স্থির ক'রে নিতে হয় আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বিষয়টি—এবং একেই বলা হয় 'মোক্ষ' বা 'মুক্তি'। সত্যই, আকারে ক্ষুদ্র অথচ প্রকারে বৃহৎ এই অতি রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর মন্ত্রটিতে আমাদের জীবনের সর্বাপেক্ষা মহিমময়, গরিমময়, মধুরিমময় কাম্যের কথা সগৌরবে ঘোষণা করা হয়েছে উদাত্তকণ্ঠে—যে শান্ত-স্নিগ্ধ-শুচি-শুভ্র-শিব-সৌম্য সুরের ঝঙ্কারে আজও দিব্যভূমি ভারতবর্ষ রণিত-প্রতিরণিত হয়ে রয়েছে—সেই অশেষ শুভ দিনটি থেকেই, যেদিন প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠা সাধিকা-প্রবরা মৈত্রেয়ী তাঁকে পার্থিবধন-দানেচ্ছু স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে তথা সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখেই সেই বিশ্ববিশ্রুত মহাজিজ্ঞাসা, পরম প্রশ্ন রাখেন এইভাবে—

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং
　　তেন কুর্যাম্ ?

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।৩, ৪।৫।৪)

'যা দিয়ে আমি অমৃতা হব না, তা দিয়ে আমি কি করব ?'

এস্থলে, একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার যে, সকল উপনিষদের মধ্যে, কেবল 'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ' ব'লে খ্যাত এই অধ্যায়টিরই দুবার আদ্যোপান্ত পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় (২।৪, এবং ৪।৫ এ)। এর থেকেই বোঝা যাবে এই দুই অধ্যায়ে বিবৃত বিষয়টি বা অমৃত-ব্রহ্ম-লাভের গুরুত্ব ভারতীয় দর্শন-ধর্ম-নীতিশাস্ত্রে, এককথায় ভারতীয় জীবনে। প্রকৃতকল্পে, সেই দিনটি থেকেই, সেই সুবর্ণরৌদ্র-করোজ্জ্বল প্রভাতকালটি থেকেই এই অমৃতের সাধনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় সাধনার মূলীভূত কথা।

তাহলে, প্রথমেই স্বতঃই সেই প্রশ্নই উঠবে—'অমৃত' বলতে আমরা কি বুঝি ? এবং অমরত্ব লাভের অর্থটিই বা কী ?

প্রথমেই এই সর্বজনবিদিত সর্বজনসমাদৃত শব্দটির যা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যা এটি উচ্চারণমাত্রেই আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়—তা হ'ল 'মরণ-হীনতা'। আমরা সকলেই জানি, আমাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা কঠোর, সর্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক, সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক, সর্বাপেক্ষা অনিবার্য, সর্বাপেক্ষা অবশ্যম্ভাবী সত্য হ'ল 'মরণ'। কতই না

হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি; কতই না হ'ল নব্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি; কতই না হ'ল বর্তমান মানবসমাজের সর্বদিকব্যাপী বিজয়—কিন্তু মরণকে ত কেউ রোধ করতে পারলেন না! অথচ অনিত্যকে অতিক্রম ক'রে নিত্যত্বের কামনা, মরণকে জয় ক'রে জীবনের জন্য আকূতি ত মানবের চিরন্তন। তাহলে? তাহলে, বলছেন ভারতীয় দার্শনিকেরা স্থির বিশ্বাসভরে দৃপ্তকণ্ঠে—ভয়ের কিছু নেই, নৈরাশ্যের কিছু নেই, দুঃখের কিছু নেই; কেবল চলো ধর্ম-দর্শন-নীতির পথে, ত্যাগ করো সকাম কর্ম, আরম্ভ করো নিষ্কাম কর্ম ও সুযোগ্য সাধনা। তাহলে, ন্যায়ের অমোঘ বিধানবলে তোমার প্রাক্তন ও বর্তমান সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফল ভোগ ক'রে, তারপরে নূতন নিষ্কাম কর্ম ও সাধনাভ্যাসের ফলে এই জন্মের পর তোমার হবে নবজন্ম, শাশ্বতজন্ম, দিব্যজন্ম পরব্রহ্মের পরমধামে; সেই জন্মের পরে আর মরণ নেই, তুমি হয়ে গেলে অমৃত, অমর শ্রীভগবানের অমর সান্নিধ্যে। অবশ্য, যতদিন তুমি পৃথিবীতে আছ, ততদিন তুমি মরণকে এড়াতে পারবে না কোনোক্রমেই—যেহেতু তোমার নিজের সকাম কর্মের ফলেই তোমাকে বারংবার ফিরে ফিরে আসতেই হবে এই শোকদুঃখপূর্ণ সংসারে, বারংবার জন্ম-মরণের ফাঁদে পড়তে হবে, ভারতবর্ষের সেই মূলীভূত 'কর্মবাদ' ও 'জন্মজন্মান্তরবাদ' অনুসারে। 'কর্মবাদ' অনুসারে স্বীয় স্বেচ্ছাকৃত, বিচারবুদ্ধিসহকারে কৃত, ও স্বাধীনভাবে কৃত সকাম কর্মের ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে ন্যায়-ধর্মানুসারেই। সেজন্য, একজন্মেই এরূপ অসংখ্য সকাম কর্মের ফলভোগ পরিসমাপ্ত না হ'লে তোমাকে মরতেও হবে, পুনরায় জন্মাতেও হবে বারংবার—যতদিন না তোমার প্রাক্তন ও বর্তমান সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফলভোগ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু যে কোনো জন্মে তোমার শুভবুদ্ধির উদয় হ'লে সেই অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনে তোমার প্রাক্তন সকাম কর্মের ফল যথাযোগ্যভাবে পরিপূর্ণ ভোগ ক'রে তুমি নূতন কর্মগুলি করলে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, সেই সঙ্গে করলে জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি সাধনানুশীলন, তার ফলে এইটিই হ'ল তোমার শেষ পার্থিব জন্ম ও পার্থিব মৃত্যু। এদুটিই সমান দুঃখক্লেশের কারণ ব'লে পার্থিব দিক থেকে দুটিই তোমার পরিত্যাজ্য—পার্থিব মরণ চাইব না অথচ পার্থিব জীবন চাইব—তা কি হয় কখনো! কারণ পার্থিব জীবন ও মরণ ত সেই একই সূত্রে গ্রথিত! কাজেই ভয় করো না কেবল পার্থিব মরণকে। ভয় করো পার্থিব জীবন ও মরণ উভয়কেই; ত্যাগ করো পার্থিব জীবন ও মরণ উভয়কেই। আশ্রয় করো অপার্থিব জীবনকে—মরণহীন জীবনকে।

অতএব নঞর্থক বা 'নেগেটিভ' দিক থেকে পেলাম 'অমৃতে'র বা অমরত্বের কি সুন্দর লক্ষণ! —প্রাকৃত মরণহীনতা নয়, যা একেবারেই অসম্ভব কিন্তু প্রকৃত মরণহীনতা, যেক্ষেত্রে অচল অটল ও শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবনই আছে কেবল; পুনঃ পুনঃ জন্ম নেই, পুনঃ পুনঃ মরণও নেই। এরূপে, পার্থিব জন্মমরণহীনতা 'অমৃতে'র প্রথম প্রকৃত লক্ষণ, নঞর্থক বা 'নেগেটিভ' দিক থেকে।

দ্বিতীয়তঃ—আসুন, এবার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমরা অন্বেষণ করি 'অমৃতে'র সদর্থক বা 'পজিটিভ' লক্ষণ; কারণ এইটিই ত আসল। সদর্থক দিক থেকে 'অমৃত' কথাটির মধ্যেই ত তার স্বরূপ-লক্ষণ নিহিত হয়ে রয়েছে। কারণ, 'অমৃতে'র আরেকটি অর্থ হ'ল সুধা, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় nectar বা ambrosia এবং এই ত হ'ল 'অমৃতে'র সদর্থক দিক—'অমৃত' হ'ল সুধা, মধু হ'ল রস। 'সুধা-মধু-রসে'র স্বরূপলক্ষণ কি? একটিই—'মিষ্টতা' নিঃশর্ত, নির্বাধ, নিরন্তর, নির্ভেজাল, নিঃসীম 'মিষ্টতা'। পুনরায় এরূপ 'মিষ্টতা'ই বা কি? কিন্তু তা ত বলা যাবে না যথোপযুক্তভাবে, সম্পূর্ণ-

ভাবে—যেহেতু এ হ'ল সাক্ষাৎ অনুভবের বস্তু, আস্বাদনের বস্তু, উপভোগের বস্তু,– পার্থিব সীমা ছাড়িয়ে, সাংসারিক বন্ধন কাটিয়ে, দৈহিক ভোগ সরিয়ে স্বীয় আত্মার এবং আত্মারই অপর রূপ ব্রহ্মের অনুভব, আস্বাদন, উপভোগ। কোন্ চিন্তার দ্বারা তাঁকে বোঝা যাবে ? কোন্ বাক্যের দ্বারা তাঁকে বলা যাবে ? তিনি যে অবাঙ্মানস-গোচর—সাধারণ বাক্য-মনের অতীত! কিন্তু আমরা তাঁকে জানতে পারবই পারব; কারণ তিনি ও আমরা এক ও অভিন্ন। হ্যাঁ, সেই 'অমৃত' ও আমরা এক ও অভিন্ন—আমরাই ত অমৃত-নির্ঝর, আমরাই ত অমৃত-সাগর, আমরাই ত অমৃত-ধারা! আর অন্য কে ?

এইভাবে আমরা যখন 'অমৃত' হয়ে গেলাম, তখন একই সঙ্গে সমগ্র জীবজগৎও ত হয়ে গেল ঠিক তাই আমারই নিকট। একদিকে আমার 'ব্রহ্ম' ত 'অমৃত' হয়েই রয়েছেন চিরকাল আমারই জন্য। অন্যদিকে, আমার জীবজগৎও ত হয়ে গেল তাই আমারই জন্য। কী কল্পনাতীত সৌভাগ্য আমার! ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ও আমি নিজেই সবাই ত হয়ে গেলাম 'অমৃত'। রইল না আর কণামাত্র ধরণীর ধূলা আমার জন্য, রইল না মর্ত্যের মাটি, রইল না সংসারের পঙ্ক, রইল না কামনার ক্লেশ, বাসনার বিভীষিকা, পাপের কলঙ্ক, দুঃখের বেদনা; রইল পড়ে কেবল 'অমৃত'—অন্তরে বাহিরে, ব্রহ্মে ব্রহ্মাণ্ডে, শিবে জীবে, জীবে জড়ে সর্বত্রই।

কিন্তু কি করে ? —প্রশ্ন করবেন হয়ত নাসিকাকুঞ্চনকারী পণ্ডিতজন—থাকুন না হয় তোমার অমৃত-ব্রহ্ম তাঁর অমৃত-লোকে, কিন্তু সেজন্য জীবজগতের সকলেই নিমেষেই 'অমৃত' হয়ে যাবেন কেন, 'অমৃত' হয়ে যাবেন কিরূপে ?

আমরা মূর্খজন হলেও সাহসভরে তার উত্তরে বলবো—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়ে যাবেন; কারণ, সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ কি বলেন নি সগৌরবে, একবার নয়, একুশবার সেই একই স্থলে ?—

'এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩।৭।৩-২৩)

'এই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী, অমৃত।'

এস্থলে বলা হয়েছে যে, সেই একই অমৃত-ব্রহ্ম অন্তর্যামিরূপে অন্তরে রয়েছেন কেবল জীবের নয় জড়-প্রকৃতিরও। পৃথিবীতে, জলে, আকাশে, বাতাসে, সূর্যে, চন্দ্রে, তারকায়, চক্ষুতে, কর্ণে, ত্বকে, বাক্যে, মনে, বিজ্ঞানে, অন্ধকারে, তেজে, দিকসমূহে ইত্যাদি —সর্বত্রই রয়েছেন সেই অন্তর্যামী অমৃত-ব্রহ্ম।

পুনরায়, সেই একই উপনিষদ্ অন্যত্রও বলছেন একবার নয়, চোদ্দবার—

'ইদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৫।১-১৪)

'ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব।'

সুতরাং এরূপ 'অমৃত' ব্রহ্মই যদি সর্বত্র বিরাজিত সকলের মধ্যেই, তাহলে সকলেই তাঁরই ন্যায় 'অমৃত' হতে বাধ্য।

তাহলে আর শঙ্কা-সন্দেহ-সঙ্কোচ কেন ? তাহলে আর ব্রহ্মও 'অমৃত', জীবজগৎও 'অমৃত', আমিও 'অমৃত' বলতে বাধা কোথায় ? তাহলে আর সকলের সঙ্গে প্রীতি-মৈত্রীর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেরী কেন ?

এখন সবকিছু মিলিয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে, সব কিছু পুরিয়ে, এসে গেছি একেবারে শেষে—'অমৃত কি ?'—এই মহাপ্রশ্ন ভাবতে ভাবতে। হঠাৎ চোখে পড়ল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরম প্রিয় সেই মনোমুগ্ধকর মন্ত্রটির প্রতি—

'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি।'

(মুণ্ডকোপনিষদ্ ২।২।৭)

'তাঁকেই বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা
জ্ঞানিগণ করেন দর্শন।

আনন্দরূপে অমৃতরূপে
যিনি উদ্ভাসিত চিরন্তন ॥'

অর্থাৎ, যিনি 'অমৃত', তিনিই 'আনন্দ'। কী অপরূপ কথা এটি? কারণ. 'আনন্দ' কি আমরা সকলেই জানি—জানি 'তৃপ্তি' কি, 'শান্তি' কি। সেই 'আনন্দে'র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরাও ত আজ আবদ্ধ—ব্রহ্মও আনন্দ, জীবজগৎও আনন্দ, আমিও আনন্দ। অতএব বাইরের বাঁধনে নয়, চোখ-রাঙানির তাড়ায় নয়, লাঠির গুঁতোয় নয়—কিন্তু কেবলই 'আনন্দে'র ফুলহারে আমরা সবাই অবিচ্ছেদ্যভাবেই আবদ্ধ, শাশ্বতকাল—কে সাহস করবে সেই ফুল ছিঁড়ে মাটিতে ফেলতে? নিশ্চয়ই কেউ নন।

সেজন্য আজ যখন 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে', তখন আমরাও বলি আধুনিক আনন্দ-ঋষির সঙ্গে আনন্দে সুর মিলিয়ে—

'মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু
সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী
মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি
অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে—
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি
দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ
এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি।
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।'
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা: 'Angels Unawares'*

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

১

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে 'Angels Unawares' কবিতাটি অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে কবিতাটি পাঠ করলে স্বামীজীর জীবনদর্শনের একটি মূলসূত্র যে এ কবিতায় অনুস্যূত, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার একটি মহৎ ভাব ও উচ্চমানের কাব্যসৃষ্টি আবিষ্কারের আনন্দ পাঠকের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো লাভ।

মুক্তছন্দে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত। তিনটি অংশে তিনটি চরিত্র ও তাদের জীবনকাহিনীর রূপরেখা আভাসিত। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদমণ্ডলীর কারু কারু জীবনকথা কবিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে, একথা মনে হতেই পারে। কিন্তু সব মিলিয়ে যা গড়ে উঠেছে, তা জীবনচেতনার গভীরতম উপলব্ধির বাণীরূপ। কিছুটা কাহিনীধর্মী, কিছুটা চরিত্রবিশ্লেষণে

* রচনাকাল. নভেম্বর, ১৮৯৮। 'অজানা দেবতা' নামে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (৭ম খণ্ড)-গ্রন্থে বর্তমান লেখকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য। মূল ইংরেজী কবিতাটি অদ্বৈত আশ্রম-প্রকাশিত স্বামীজীর 'In Search of God and other Poems' (পূর্ব নাম Poems) গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অন্তর্মুখী, বাকি অংশে দুঃখসুখময় 'সংসার-জলধি'-পরিক্রমার অমৃত-অভিজ্ঞতা—এই সবের মাধ্যমে কখন আমরা স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আত্ম-পরিচয়ের আলোকে এই মানবজন্মের চরিতার্থতা অনুভব করতে থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই স্বামীজী নানারূপে নারায়ণের আত্মপ্রকাশ-কথা শুনেছিলেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিরন্ন, নিরালোক, পাপী, তাপী, দুঃখী সব মানুষের মধ্যে তিনি ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করে বিশ্বের বেদনাসিন্ধু আপন অন্তরে বহনের অধিকার অর্জন করেছিলেন। তাঁর সেই জগৎ ও জীবন-জোড়া অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ 'Angels Unawares' বা আত্মবিস্মৃত দেবদূতদের কাহিনী-মালা গড়ে উঠেছে। স্বামীজীর অন্যতম অমর বাণী হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু যাদের মনে আছে—"May I be born again and again, and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls—and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship." (আমি যেন বারে বারে ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ ও বেদনা ভোগ করি, যাতে করে আমি আমার সেই একমাত্র ঈশ্বর—যিনি সমস্ত আত্মার সমষ্টিস্বরূপ—একমাত্র যাঁকে আমি বিশ্বাস করি, তাঁরই পূজা করতে পারি। সবার উপরে খলরূপী ভগবান, দুঃখীরূপী ভগবান, সব জাতির সব শ্রেণীর দরিদ্রনারায়ণ—এঁরাই আমার বিশেষভাবে পূজনীয়।)—তাঁরাই অনুভব করবেন যে আলোচ্য কবিতাটির ভাববীজ বহুদিন থেকে বিবেকানন্দ-মানসে অঙ্কুরিত হয়েছে।

'Angels Unawares' নামটির সঠিক অনুবাদ হওয়া কঠিন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার সপ্তম খণ্ডে নাম রয়েছে 'অজানা দেবতা'। কিন্তু 'Unaware' কথাটির অনুবাদ 'অজানা' হওয়ার কথা নয়। অবশ্য Angel বা 'দেবদূত'-অর্থে 'একমাত্র' ঈশ্বরের দূতের পৌরাণিক কল্পনা আমাদের নেই। তার বদলে আছে বিভিন্ন দেবদেবীর দূতের কল্পনা। এক্ষেত্রে দেবদূতের জায়গায় 'দেবতা'ই গ্রহণীয়। কিন্তু Unaware-এর অনুবাদ এখানে 'আত্মবিস্মৃত' হওয়াই সমীচীন। 'অসতর্ক' অর্থ এখানে হ'বে না;—যে দেবতা বা দেবতারা নিজেদের স্বরূপ ভুলে গেছেন, স্বামীজী এখানে তাঁদের কথাই বলতে চান। সুতরাং যদি বাংলায় নামকরণ হয় 'হে দেবতা! আপনাবিস্মৃত'—তাহলে স্বামীজীর ভাবব্যঞ্জনাটি অনেক বেশী ফুটে ওঠে। কারণ—'Unaware' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ অসচেতন করলেও স্বামীজীর অভীপ্সিত বক্তব্য প্রকাশিত হয় না। মানুষ যে মূলতঃ দেবতা বা ব্রহ্ম—এমন কি 'সর্বভূতে সেই প্রেমময়'—একথাটি মনে রেখে মানুষ আত্মবিস্মৃত দেবতা,—এইভাবে দেখলেই স্বামীজীর ভাবলোকের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে সব আত্মার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্ম-সম্ভাবনার ('potentially divine') পটভূমিকায় তাই 'পাপ' বা 'পাপী' বলে কোনো কিছুই থাকা সম্ভব নয়। চিকাগো ধর্মমহাসভায় এই অর্থেই তিনি বলেছিলেন—"Ye divinities on earth—sinners! It is a sin to call a man so; it is a standing libel on human nature." 'হে অমৃতের পুত্রগণ! পাপী? মানুষকে পাপী বলাই তো পাপ! মানবাত্মার বিরুদ্ধে এ তো চিরন্তন কলঙ্ক-আরোপ!' ('চিকাগো-বক্তৃতা' পুস্তিকার 'হিন্দুধর্ম' দ্রষ্টব্য) যে অনন্তপ্রসারিত সহানুভূতি ও ভ্রাম্যমাণ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় হীনতম মানুষের প্রতিও বিবেকানন্দের অমেয় করুণার

উৎস উন্মোচিত হয়েছিল, সেই করুণা, প্রীতি ও মানবমহিমার গভীরতম উপলব্ধিতে আলোচ্য কবিতাটি সমুজ্জ্বল।

'Angels Unawares' বা 'হে দেবতা! আপনাবিস্মৃত' কবিতাটির প্রথম চরিত্রটি জীবনের সব আশা-বঞ্চিত এক হতভাগ্যের কাহিনী। কেমন করে অকূল নিরাশার অসীম অন্ধকারে সহসা এক আলোকরেখা এসে তার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিল—সেই কথাই আভাসে ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে সবার আগে স্বামীজীর নিজের জীবনের সেই চরম দুর্দিন ও পরম সুদিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন রাত্রে পায়ে পায়ে ঘুরে জীবিকা-অন্বেষণরত নরেন্দ্রনাথ একটি বাড়ীর রোয়াকের উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। সংসারের সব দুঃখদুর্ভাগ্য তখন চারদিকে উদ্যত, একমাত্র অচঞ্চল তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আস্থা। সেদিন কি ঘটেছিল? স্বামীজী কখনো ব্যাখ্যা করেন নি, কিন্তু সেই রাতেই তাঁর অন্তরের অন্তরে জীবন-রহস্যের সমাধানসূত্র ধরা দিল। স্বামী সারদানন্দজীর অমরগ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর মুখের ভাষাই সাধু গদ্যে রূপান্তরিত—"গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্ন পদে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। এটা কিন্তু স্মরণ আছে, মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটী ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে।" (লীলা-প্রসঙ্গ: দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ: ১৩৪২ সাল সংস্করণ: পৃঃ ২৪০)

নরেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা আমরা উপরি-উদ্ধৃত অংশের প্রথম দিকে পাই, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে 'লীলাপ্রসঙ্গে', তাঁর পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যবিপর্যয়ের বর্ণনায়। আমরা সে বিবরণের শেষাংশটুকু মাত্র গ্রহণ করেছি। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে এমন কত ভাগ্যহত, জীবনক্লান্ত, অবসাদরিক্ত মানুষকে স্বামীজী দেখেছেন, যে-সব মানুষ তাঁরই কাছে চলার অমৃতপ্রেরণা পেয়ে অস্তিত্বের সার্থকতা অনুভব করেছেন! নিজের এবং আরো অনেকের জীবনযন্ত্রণার এক চরমমুহূর্তের রূপায়ণে স্বামীজী এ কবিতার সূচনা করেছেন এইভাবে—

> One bending low with load of life
> That meant no joy, but suffering harsh and hard,—
> And wending on his way through dark and dismal paths,
> Without a flash of light from brain or heart

To give a moment's cheer,—till the line
That marks out pain from pleasure, death from life ···

ইংরেজী উদ্ধৃতি আর না দিয়ে আমরা এখন পাঠক-দের সুবিধার জন্য বাংলা অনুবাদের উদ্ধৃতি দেব—

অন্ধকার নিরাশার বিসর্পিল পথে, ক্লান্ত পদে,
এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভারনত
চলেছে পথিক।
হৃদয়ের মননের কোনো প্রান্ত হ'তে
কোথাও মেলে না প্রাণে
নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন।
অবশেষে একদা যখন
লুপ্তপ্রায় সীমারেখা
ভালোমন্দ সুখদুঃখ জন্মমরণের—
অকস্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে
অপরূপ জ্যোতিরেখা হৃদয়েতে তার।

সেই একটি আলোকরেখা এতদিনের সংশয়তিমির নিশ্চিহ্ন করে এই দুর্ভাগা মানুষটির জীবনকে এক স্বপ্নাতীত মহিমায় অভাবিত আশার বাণীতে পূর্ণ করে দিল। আর এক অনন্ত আনন্দধামের দুয়ার তার কাছে খুলে গেল।

কোন্ উৎস হ'তে এলো অচেনা এ আলো—
কিছুই তো জানে না সে,
তবুও জানালো
আলোক-ঈশ্বরে তার প্রাণের প্রণাম।

কিন্তু যারা নিজেদের অতি-বুদ্ধিমান বলে জানে, তারা সংশয়কেই ঈশ্বরের জায়গায় বসায়। ঈশ্বরের আলোকে অবিশ্বাস করাতেই তাদের গৌরব সুতরাং—

বলিলেন মৃদু হেসে পণ্ডিতের দল—
'অন্ধ এ বিশ্বাস।'
সে আলোর দীপ্ত শান্তি অনুভব করি'
বলিল সে নম্র প্রত্যুত্তরে—
'ধন্য মানি এ অন্ধবিশ্বাস।'

উদ্ধৃত শেষ চরণের মূল ইংরেজীতে রয়েছে—"O Blessed Superstition!" আমরা অনুবাদে 'অন্ধবিশ্বাস' কথাটি ব্যবহার করেছি। আশা করি রসিকজনের স্বীকৃতি পাবো।

সর্বরিক্ততার বুকভাঙা মুহূর্তেই জীবনের শ্রেষ্ঠ সত্য কেমন করে ধরা দেয়, কবিতাটির প্রথম পর্বে সেই কথা।

২

'Angels Unawares' বা 'হে দেবতা! আপনাবিস্মৃত' কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে যে চরিত্রটির আভাস স্বামীজী দিয়েছেন, তার নিগূঢ় বিশ্লেষণনৈপুণ্য মহৎ ঔপন্যাসিকেরই সাধ্য। কিন্তু অল্প কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে স্বামীজী এক দুরন্ত জীবনের বিচিত্র বাসনার আবর্তনে পতন ও উত্থানের বিস্ময়কর ছবি এঁকেছেন, আর সে ছবি স্বামীজীর বিপুল অভিজ্ঞতার আর এক পরমাশ্চর্য রূপায়ণ!

One drunk with wine of wealth and power
And health to enjoy them both, whirled on
His maddening course,—till the earth, he thought,
Was made for him, his pleasure-garden···

মূল ইংরেজী রচনার সূচনাংশটুকু দিয়ে আমরা বাংলা অনুবাদে ফিরে আসি—

স্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদের সুরামত্ত
আর এক পথিক,
জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ছুটে চলে উন্মাদের মতো,
অবশেষে একদা যখন
এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন
খেলার পুতুল যত কীটসম মানুষের দল,

নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলো
দৃষ্টিরে আচ্ছন্ন করে, ইন্দ্রিয় অবশ,
সুখদুঃখ একাকার, অনুভূতিহীন ;
প্রমোদমদিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা
শবসম লগ্ন হয়ে থাকে তার দুই বাহুপাশে,
যত সে ছাড়াতে যায়,
তত তার বক্ষ জুড়ে আসে ;
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বহুরূপে মৃত্যুরে সে চায়,
ফিরে আসে আরবার মুগ্ধ আকর্ষণে।

তারপর একদিন
দুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে—
হৃতশক্তি, সম্পদবিহীন,
বেদনায়, অশ্রুধারে, মর্মযন্ত্রণায়—
আত্মীয়তা ফিরে গেল সারা নিখিলের।
বন্ধুজন করে পরিহাস।
কৃতজ্ঞ হৃদয় তার করে উচ্চারণ :
'ধন্য দুঃখ, ধন্য এ বেদনা।'

স্বামীজী যাঁদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জেনেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবনকাহিনীর সঙ্গে এ অংশের চরিত্রচিত্রণের মিল অনেকখানি। তবে স্বামীজীর প্রসারিত অভিজ্ঞতায় এদেশে বা বিদেশে এমন আরো মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিশ্চয় ঘটেছে। নিরন্তর ভোগবাসনার উন্মাদনা একদিন সম্ভোগকেই কী দুর্বিষহ করে তোলে সেকথা গিরিশচন্দ্রের মতো সমস্ত জীবন দিয়ে ক'জন বুঝেছে! আর অপরিসীম মর্মযন্ত্রণায় যখন জগতে কোথাও আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, তখনই দুঃখরূপী ঈশ্বরের অপার করুণা কেমন করে ভক্তকে বুকে টেনে নেয়, সেকথাও তাঁর মতো ক'জন জানতেন!

কিন্তু উদ্ধৃত অংশটির শেষ দিকে ঠিক গিরিশচন্দ্রের কথাই আছে, এমন নাও হ'তে পারে। সমানধর্মা আরো কারু কারু জীবনে সমস্ত সংসার যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন সেই আর্ত যন্ত্রণার মাঝখানেই সব গর্ব, সব অভিমান মুছে গিয়ে ঈশ্বরের চরণপাত ঘটেছে! তাই 'ধন্য দুঃখ, ধন্য এ বেদনা।'—"O Blessed Misery!"

৩

দীর্ঘ কবিতাটির তৃতীয় চরিত্রটি এক হিসাবে আরো সূক্ষ্ম অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। এ এমন এক মানুষের কথা, যার জীবনে আপাতদৃষ্টিতে তীব্র গতিবেগ নেই, যে মানুষকে সবাই নিরীহ নিপট ভালোমানুষ বলেই জানে। কিন্তু সেই বাইরের পরিচয়ের আড়ালে এ মানুষটির আর একটি দিক আছে। অন্য সব মানুষের দুর্বলতা, কামনা-বাসনার দাসত্ব, প্রলোভন ও অধঃপতন— এ সবকে সে নিতান্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। ফলে ধীরে ধীরে কখন সে নির্মম সমালোচকে পরিণত! নিজে ভালো—এই অহঙ্কারে সে অন্যের বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা মলিনতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেখে। আর এইভাবে অন্যের ত্রুটি দেখতে দেখতে একদিন নাটকীয়ভাবে তার জীবনে সৌভাগ্যসূর্য এসে অবাধ সম্ভোগের অধিকার এনে দিল। এতদিন যে সুযোগ সে পায় নি, আজ ধনজনের মদিরামত্ত হয়ে সেই ভালোমানুষটিও প্রলোভনের পথে পা বাড়ালো। ফলে সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে সুনামও অন্তর্হিত হলো। মানুষের অধঃপতনকে সে এতদিন ঘৃণা করতেই শিখেছে। নিজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বহুবাঞ্ছিত এ শিক্ষা তার হলো যে, ভুল মানুষেরই হয়, আবার মানুষই ভুল সংশোধন করে সত্যের পথে অগ্রসর হয়। নিজের অধঃপতন দিয়ে জীবনের এ সত্য সে যখন বুঝতে পারলো, তখনই তার জীবনের সত্যিকার সার্থকতা। তাই এক হিসাবে এই অধঃপতনের কাছেই তার সবচেয়ে বড়ো ঋণ।

One born with healthy frame.—but not of will
That can resist emotions deep and strong,
Nor impulse throw, surcharged with potent strength,—
And just the sort that pass as good and kind,
Beheld that *he* was safe, whilst others long
And vain did struggle 'gainst the surging waves ;

সুন্দর সুঠাম দেহ,
শুধু মন তার শক্তিহীন
দুর্বার গভীর কোনো আবেগ-সংযমে ;
অমোঘ-প্রবৃত্তি-স্রোত
রুদ্ধ করা অসাধ্য তাহার।
সংসারে সবাই তারে
সদাশয়, ভালো বলে জানে।
পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে।
দূর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে—
সংসার-তরঙ্গসাথে বৃথা যুদ্ধে রত
নরনারী যত।

এমন মানুষটির ঠোঁটে দুর্বলচিত্ত মানুষদের অপরাধের জন্য যে বিদ্রূপের হাসিটি লেগে থাকতো, সেই হাসিকে চোখের জলে মুছে দিয়ে স্বামীজী যখন তাকে আর সবার সমভূমিতে নামিয়ে আনলেন, তখন—

সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন।
বুঝিল সে : নিয়ম ভাঙে না কভু
তরু ও প্রস্তর,
তবু তারা তরু ও প্রস্তর হ'য়ে থাকে।
নিয়মবন্ধন হ'তে উর্ধ্বে এসে
সংগ্রামসাধনা দিয়ে
ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয়—
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে।
চিত্তের জড়তা ঘুচি' নবীন জীবন
হ'ল মুক্ত, প্রসারিত—
সংগ্রাম-সমুদ্রপারে যে অনন্ত শান্তি বিরাজিত
তাহারি আলোক-রশ্মি
উদ্ভাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়।
পশ্চাতে রয়েছে পড়ি'
অতীতের অকৃতার্থ নিষ্ফল জীবন,
তরু ও প্রস্তরসম চেতনাবিহীন,
আর একদিকে তার স্খলনপতন,
যার লাগি' বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার।
সানন্দ-অন্তরে তবু
ধন্য মানি এ অধঃপতন
ঘোষিল সে : 'ধন্য এই পাপ।'

মূল ইংরেজীতে শেষাংশ—

...looking back on all that made him kin
To stocks and stones, and on to what the world
Had shunned him for, his fall, he blessed the fall,
And with a joyful heart, declared it,—"Blessed Sin !"

মহাজীবনের অভিজ্ঞতায় স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন স্খলন পতন পাপ ও কলঙ্কেরও মহামূল্য ! যে পরমসত্যের সন্ধানে মানবাত্মার যাত্রা—তাকে পাওয়ার জন্য সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই যেতে হবে। সে অভিজ্ঞতা যার হয়নি, তার পক্ষে পাপ পুণ্য ভালো মন্দের সংঘাতে কোনো সহজ সিদ্ধান্ত না করাই ভালো। শ্রীরামকৃষ্ণ-আশীর্বাদধন্য দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ('ভবসাগর-তারণ-কারণ হে'-শীর্ষক অমর গুরুসঙ্গীত-রচয়িতা। মনে রাখা ভালো যে এ গুরু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।) শ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের দেহাবসানের পরে একসময় কিছুকাল থিয়েটারের কাজে যুক্ত ছিলেন। সে সময় তাঁর কিছুটা মানসিক অবনতিও ঘটেছিল। স্বামীজী একথা শুনে বলেছিলেন, 'একটানা উন্নতিই প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়, প্রতি পদস্খলনের পরে যে পুনরভ্যুত্থান, আসলে সেখানেই প্রকৃত মহত্ত্ব।'

কিন্তু তেমন সৌভাগ্যবান ক'জন যাঁরা জীবনের এই গ্লানিকেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ জেনে পরমসত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেন!

Blessed Superstition, Blessed Misery, Blessed Sin—এই কথাগুলির মধ্যে বাইবেলে যীশুর কথার প্রতিধ্বনি আছে, কিন্তু স্বামীজী সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এই Blessed বা 'ধন্য' কথাটির সুপ্রয়োগ করেছেন। যা সাধারণবুদ্ধির মানুষের কাছে পাগলামি, তাই অসাধারণ অধিকারীর পক্ষে আলোকদৃষ্টি; যে দুঃখকে সবাই পরিহার করতে চায়, তাকে অবলম্বন করেই কেউ চিরশান্তির অধিকারী হয়; যা আর সবার দৃষ্টিতে 'পাপ'—তাও অনুতাপের অশ্রুজলে মানুষের সব অভিমান ধুয়েমুছে চিরপ্রণম্য করে।

বিশ্বসাহিত্যে ভিক্তর হুগো, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র সমাজসংসারের সবচেয়ে অবহেলিত মানুষদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে মহিমা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সঙ্গে স্বামীজীর আর্ত, পীড়িত, ব্যথিত-মানবাত্মার সঙ্গে সহানুভবের আশ্চর্য মিল। তবে স্বামীজীর আর্যদৃষ্টি এ জগতের সব দুঃখ-বেদনা-গ্লানিকে যে মহাসত্যের পটভূমিতে পরম-সার্থকতায় মণ্ডিত দেখেছে, তার তুলনা সাহিত্যিক-সমাজে বিরল। এ কবিতা জীবনরসের বিচিত্র-গভীর পরিচয়বাহী হ'লেও এর রসব্যঞ্জনা মূলতঃ অধ্যাত্মরসের। নিঃসংশয়ে স্বামীজীর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

১

"আচ্ছা, মশায়, এরকম কি আপনার হয়?"—ডাক্তার সরকারকে প্রশ্ন করেছেন গিরিশচন্দ্র।

কি রকম?

"এখানে আসব না আসব না করছি,—যেন কে টেনে আনে!—আমার নাকি হয়েছে, তাই বলছি।" (কথামৃত ৪।২৭।৫)

গিরিশের এ অবস্থা নতুন কিছু নয়। স্টার থিয়েটারে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ 'চৈতন্যলীলা' দেখতে আসেন সেইদিনই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় হল—সেও এমন কিছু ঘনিষ্ঠ নয়। তার কয়েক-দিন পরে গিরিশ পাড়ার চৌরাস্তার রকে বসে আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ দু'তিনটি ভক্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন বলরাম বসুর বাড়ি। থিয়েটারে সেদিনের সেই সামান্য পরিচয়-সূত্র ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ নমস্কার করলেন উপবিষ্ট গিরিশকে, গিরিশও প্রতিনমস্কার করলেন। রামকৃষ্ণ এগিয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ-দিকের রাস্তায় কিন্তু গিরিশের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠল এক প্রবল আকর্ষণ: "তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে।"

থিয়েটারে বসে আছেন, একটা চিরকুট কি জানি কে রেখে গেছে—মধু রায়ের গলিতে রামকৃষ্ণ আসছেন। চিরকুট পড়ামাত্র তাঁর মধ্যে জেগে উঠল সেদিনের মত প্রবল আকর্ষণ। গিরিশ লিখেছেন, "আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর

বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে।"

সেই তীব্র আকর্ষণের রূপটি ফুটে উঠল গিরিশের নাটকের গানে :

আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে,
কূলে আমায় কে আনে।
প্রাণের কথা প্রাণই জানে ॥···
আমি ফিরব না আর মনে করি
ডুরি ধরে কে টানে।
আমি প্রাণের টানে দেখতে আসি,
বুঝালে কি প্রাণ মানে ॥
(নিমাই সন্ন্যাস ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক)

শুধু গিরিশের নয়—রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, যাঁদের তিনি কাছে টানতে চেয়েছেন তাঁদের সকলেই অনুভব করেছেন এ আকর্ষণ। রাম দত্ত প্রমুখ শিষ্যরা শনিবার শেষ রাতে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করতেন—বরানগরে পৌঁছলে তবে আলো ফুটত—দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রণাম করতেন প্রাতঃসূর্য। সারাদিন সেখানে কাটত—গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে কলকাতার দিকে হাঁটা শুরু করতেন। সেই দুর্নিবার আকর্ষণের রূপটি গিরিশ ফুটিয়ে তুলেছেন 'রূপসনাতন'এর একটি গানে—একথা রামচন্দ্রই বলেছেন। ('যোগোদ্যানে শ্রীরামচন্দ্র'—বিজয়নাথ মজুমদার, 'তত্ত্বমঞ্জরী', ভাদ্র ১৩২৩)

যখন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে।
সে যে অকূলপাথার নাইক সাঁতার,
কূল-কিনারা কে পাবে ?
আগে ধীর তরঙ্গ বয়,
তা'তে হেলে দুলে খেলে আশা ভয়,···
ক্রমে জোর বয়ে যায় দু'কূল ভাসায়,
টানের টানে কে রবে ?
(১ম অঃ, ৩য় গঃ)

২

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের অজস্র গানে নিজেকে উৎসারিত করে দিয়েছেন। ব্যক্তি-জীবনের সুখ-দুঃখ-ভালবাসা নানাভাবে তাঁর নাটকে ছায়াপাত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর মানসিক উদ্বোধনের সুরগুলিও নাট্যসঙ্গীতে ধরা পড়েছে, তাঁর গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই তা সহজে চোখে পড়বে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আলোচনা 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থে করেছি। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে আসার পর গিরিশের প্রথম নাটক 'নিমাই সন্ন্যাস'। সে নাটকের গানে 'পতিত-পাবনে'র প্রতি যেমন বিশ্বাসের চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তেমনি দোলায়িত চিত্তের সংবাদটুকুও অবারিত :

ডাকে হে পতিত তোমায়,
পতিত-পাবন পুরাও সাধ।
দীনের ঠাকুর, কোথায় গৌরচাঁদ ॥···
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে,
দাও হে প্রেমসুধার স্বাদ ॥
(১ম অঃ, ২য় গঃ)

কিন্তু 'বুদ্ধদেব চরিতে'র গানে গিরিশ নিঃসংশয়।

'বুদ্ধদেব চরিতে'র দেববালাদ্বয়ের চরিত্র সঙ্গীত-নির্ভর। বুদ্ধের তাৎক্ষণিক মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রদান অথবা বুদ্ধের প্রতি অলৌকিক নির্দেশের জন্যই এই চরিত্র পরিকল্পনা। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেববালাদ্বয়ের সুবিখ্যাত গান 'জুড়াইতে চাই কোথা জুড়াই' বুদ্ধ-চিত্তের উদ্বোধক। তিনটি স্তরে গানটি নাটকে পরিবেশিত। প্রথম দুটি স্তবক গীত হয়েছে সিদ্ধার্থ ও গোপার মিলনকুঞ্জে কিন্তু তৃতীয় অংশটি একমাত্র সিদ্ধার্থের কাছে—প্রায়

স্বগতোক্তির মত :

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল
কে জানে কেমন, কি খেলা হল
প্রবাহের বারি—রহিতে না পারি
যাই—যাই কোথা ?—কূল কি নাই ?···
যে আছ চেতন ঘুমাও না আর
দারুণ এ ঘোর, নিবিড় আঁধার
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই।

(২য় অঃ, ২য় গঃ)

গানটির সর্বত্র বুদ্ধ-চিন্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেও একেবারে শেষ পঙ্‌ক্তি দুটিতে গিরিশচন্দ্র যে শরণাগতির সংকেত দিয়েছেন তা একান্তভাবে তাঁর নিজস্ব, কারণ কোনো নির্দিষ্ট দেবতার কাছে আত্মনিবেদন বুদ্ধের সাধনার লক্ষ্য নয়—'বুদ্ধদেব চরিত' নাটকেও তার কোনো পরিচয় নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় নাট্যকার স্বয়ং বুদ্ধের চিন্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন এবং এই সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ উপস্থিতি ঘটেছে। গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের আলোকে এই শরণাগতির মূল্য বিশেষ অর্থবহ।

'অশোক' নাটকে সঙ্ঘমিত্রা ও মহেন্দ্রের সম্মিলিত গানে এই আত্মনিবেদনের রূপটি আরও স্বচ্ছন্দ। গিরিশচন্দ্র 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' প্রবন্ধে লিখেছেন, "গুরুর কৃপায় একটি অমূল্যরত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাতেই গিরিশচন্দ্র যে তাঁকে চিনেছিলেন গিরিশের এই ধারণা তাঁর অন্য রচনাতেও দেখতে পাই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতায় গিরিশ বলেছেন :

'চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব
পুরুষ প্রধান !'

সেই ধারণাটিও যুক্ত হয়েছে—এই সম্মিলিত আত্মনিবেদনের গানে :

যাঁর পদে সঁপেছি জীবন,
তাঁরই কাজে যাই চলে।
চরণ—ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥
কৃপাময় তাঁহারই কৃপায়
চিনেছি তো তাঁয়—
প্রাণ স'পেছি তাইতে রাঙা পায় ;
কায়মনে যাঁর শরণ নিলে
চতুর্বর্গ ফল ফলে ;
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে।
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে ॥

গানটির শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসবে গীত গিরিশের একটি গানের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

গগনভেদী উঠেছে জয়রব
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসব ॥ ··

'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকের একটি গান রামকৃষ্ণ-সঙ্গীত হিসাবে 'রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বা ঠাকুরের নামামৃত' (যোগোদ্যান থেকে প্রকাশিত) পুস্তকে গৃহীত হয়েছে :

যদি শরণ নিতে পারি রাঙা পায়
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায়
পলায় ॥···
যে জন করুণা যাচে, (ঠাকুর) আসেন তাঁর কাছে,
অভয়চরণ তার তরে আছে ;
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের
মহিমায় ॥

নাটকের গানের তৃতীয় চরণে (উদ্ধৃতাংশে) বন্ধনীর মধ্যে 'ঠাকুর' শব্দটি নেই। সম্ভবত গিরিশ-চন্দ্র পরে শব্দটি সংযোজন করেন। তবে অর্থ-সম্পূর্ণতার দিক থেকে শব্দটি অপরিহার্য সন্দেহ নেই।

'পারস্তপ্রসূনে'র মত লঘু নাটকের কোনো কোনো গানেও আত্মনিবেদনের গভীরতা ভক্ত গিরিশের গুরুপদে প্রার্থনা মূর্ত করে তুলেছে :

অন্তে তব কিঙ্করে রেখো
জ্যোতির্ময় রাজীব চরণে
আসি ধরা 'পরে নরদেহ ধরে
বঞ্চি চিত নিয়ত সাধনে।...

জীবনের শেষ কয়েক বছর গিরিশচন্দ্র রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন। সে যন্ত্রণার চিহ্ন শেষ জীবনের নাট্যসঙ্গীতে প্রকট হয়ে উঠেছে। বিষণ্ণতার সঙ্গে মুক্তির আকুলতা, তাঁর চিরআশ্রয়ের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তিতে গানগুলি মর্মস্পর্শী। 'অশোক' নাটকে কুনালের গান :

নিদারুণ বন্ধন কতদিন সহিব
ত্রিতাপদহনে কতদিন দহিব
পান্থবাসে কত রহিব।...
নিতি শমনশাসন, পীড়ার তাড়ন
কবে হইবে মোচন
একে মাটির কায়া আছে বেড়িয়া মায়া
ভৃত্য পাবে কবে চরণছায়া
শান্তিবারি প্রাণভরে পিয়িব।

(৪র্থ অঃ, ৬ষ্ঠ গঃ)

এই গানটির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতার কিছু অংশের সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে :

নিরন্তর ত্রিতাপদহন
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন
কর্মফল নিজ দেহে সহিয়া অপার স্নেহে
কর দূর শমন-শাসন
কর ত্রাস, হর পাশ ত্রিতাপহরণ।

এই ত্রিতাপহরণের কাছে শান্তিবারির প্রার্থনা গিরিশের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকে ফুলীর গানেও সেই কলুষহরণ করুণাময়ের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা :

হে দীনশরণ বন্ধনমোচন
তাপে তাপ বার ত্রিতাপহরণ
নিষ্ঠুরতা নয় হে করুণাময়
করুণা তোমার কলুষহরণ।...

(১ম অঃ, ৫ম গঃ)

'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে হরমণির একটি গানে নাট্যকারের বেদনা ও উপলব্ধি সহজ ঐকতানে মিলিত হয়েছে :

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে।
মৃদু মৃদু ভাষে হৃদি পরশে,
কে বলে, "তাপিত তনয়, আয়রে কোলে!
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি;
কেন পান্থবাসে, ভ্রম নিরাশে, এসো আবাসে
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা
জ্বালা সবে না—হৃদি কমলে"।

(১ম অঃ, ১ম গঃ)

গিরিশের জ্বালা, গিরিশের বেদনাকে যিনি অকুণ্ঠ-চিত্তে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, সেই দুঃখমোচন শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁর শেষ জীবনের একমাত্র আশ্রয়। নাট্যসঙ্গীতে তাঁরই পরোক্ষ উপস্থিতি।

৩

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' কবিতায় গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন:

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণজ্ঞান,
প্রেম-ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে,
দুঃখসুখ নেহারে সমান;...
বিবেক হৃদয়ে ফোটে বিষয়বন্ধন টোটে
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে— নহে অনুমান।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি রামকৃষ্ণ-সংস্পর্শে এসে গিরিশচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই তিনি রঙ্গমঞ্চের জন্য

আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, তাই বার বার তাঁর মধ্যে যখন বৈরাগ্যসঙ্কল্প জেগেছে তিনি ছুটে গেছেন সারদাদেবীর কাছে, বিবেকানন্দের কাছে, ব্রহ্মানন্দের কাছে আর প্রতিবারই তাঁদের কণ্ঠে গুরুর নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে—গিরিশের কামনাও হয়েছে প্রতিহত। বাইরের দিক থেকে সংসার-জীবনে যত সম্পৃক্তই থাকুন না কেন অন্তরজীবনে গিরিশ বৈরাগী। বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং সেই আদর্শের স্বীকৃতি দেখতে পাই তাঁর নাটকের বিভিন্ন গানে। এই কারণেই তাঁর নাটকে প্রায়শই ফকীর, দরবেশ, ভিখারী, টহলদার অথবা বৈষ্ণবী প্রভৃতি চরিত্রগুলির অবতারণা। চরিত্রগুলি সঙ্গীত-ভিত্তিক এবং সেই সঙ্গীতের মূল শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক উপদেশ। 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে টহলদারদের গান 'কি ছার আর, কেন মায়া কাঞ্চন কায়া তো রবে না' সেকালের বাঙালী-সমাজে বহুল-প্রচারিত—একালেও হয়ত একেবারে অপরিচিত নয়। সেই একই চিন্তার প্রকাশ 'মনের মতন' নাটকে ফকীরের গানে—এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবেরই প্রতিধ্বনি :

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিয়া—কুছ মালুম হ্যায়
লিয়া লিয়া পরমায়ু লিয়া কাঁহা গিয়া কোই পাত্তা
বাতায় !

আজ দিন গিয়া ভাই
দিনকা চিজ কুছ মূল লিও
ক্যা আজকা দিন বরবাদ দিও,
তুনিয়াকি কামসে ঘুমতে রহো
আয়েগা দিন সো ভুল গিও ;···
ছোড়না ঘোর, খাড়া হ্যায় চোর
চোর নিদিয়া লাগায়
চোর নিতি চোরায় !
(২য় অঃ, ১ম গঃ)

ফকীরের আর একখানি গান :

লাগা রহো মেরি মন
পরম-ধন কি মিলে বিন যতন।···
ওহি আপনা সবভি বেগানা
সমঝ লেনা কো আপন
এক হ্যায় উও পরমধন।

'আবু হোসেন' নাটকের বহুল প্রচারিত একটি গান :

রামরহিম না জুদা কর ভাই
দিল কো সাচ্চা রাখো জী।

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম সম্পর্কে সমদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব।

যব যেসা তব তেসা হোয়ে
সদা মগন মে রাখনা জী

'যখন যেমন তখন তেমন' কথাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার

মিট্টিমে ইয়া বদন বনি হ্যায়
ইয়াদ হরদম রাখনা জী
যবতক সেকো ফারাক রহো ভাই
যিস যিস কামমে মানা জী।

বৈরাগ্যের সহজ অভিব্যক্তি। কিন্তু বৈরাগ্য তো শুধু সংসার-বিরাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে প্রশ্ন করলেন, 'বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি।' উত্তরে শ্রীম বললেন, 'ঈশ্বরে অনুরাগ, আর সংসারে বিরাগ'। অনুমোদন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছ'। গিরিশচন্দ্র নশ্বরতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পৌঁছেছেন ঈশ্বর-অনুরাগে :

তুসমন তেরা সাথ ফিরতা, দেখো ভাইসব সকো জী
তুসমন সে বাঁচানে-ওয়ালে উন বিন হ্যায় নেই
কোই জী।

'বড়দিনের বখশিশে'র মত লঘু নাটকের গানেও সেই একই চিন্তার প্রকাশ :

কেয়া দেল কেয়া তোমনে জানা
যব তক রাম না পছানা।

সীতারাম নাম কভি না লিয়া
মাল খাজানা পিয়ারা।…
কুছ কেয়া তেরা সাথ চলে গা
সমঝনা ভাই জেরা
লেড়কা লেড়কী জরু তোমারা
সমঝো যো আপনা
খাকি কায়া খাক বনেগা
কিসসে হোগা মানা।… (১ম দৃশ্য)

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে বালক শম্ভাজীর নৃত্যসহ গানে :

দুনিয়ামে যব আয়া ভাইয়া, সওদা
কুছ তো লেনা
মিট্টিমে কব মিট্টি মিলেগা উসকা কা ঠিকানা।
ভুখে অন্ন দিজো, কিজো সাচ্চা সওদাগরি
লজ্জে বস্ত্র দেকে মোলো আমিরি তোমহারি॥…
যো চাহে মূল লে সেকে কিসিকা নেই মানা।
বেফয়দা যব দিন গুজারে আখেরমে পছতানা॥
(৪র্থ অঃ, ৪র্থ গঃ)

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বললেন, "সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বরলাভ হয়। কয়েকজনের জ্ঞান হয় না। ১ম—যার বাঁকা মন, সরল নয়; ২য়—যার শুচিবাই; ৩য়—যারা সংশয়াত্মা।"

(কথামৃত ৫।১৬।৪)

'অভিশাপ' নাটকে গিরিশ সেই কথাটাই পরিবেশন করলেন দুষ্টা সরস্বতীর সঙ্গীতে :

অভিমানে ভুবন সৃজন অভিমানে এ মেলা
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা।
অহঙ্কার এ ভবপাথার, এমন শক্তি আছে কার
জ্ঞানতরণী বিনা পাথার হতে পারে পার।…
সরল প্রাণে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা
নইলে নাচে দুবেলা—মহামায়া করে যে হেলা।
(২য় অঃ, ১ম গঃ)

মহামায়ার লীলা ও ভবসাগরের তরীর রূপ-কল্পটিও শ্রীরামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণ তুলনা দিয়ে ঈশানচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, "সংসারে বদ্ধ করে রাখা সে মহামায়ার ইচ্ছা। কি জান! 'ভবসাগরে উঠছে ডুবছে কতই তরী'…লক্ষের মধ্যে দুই একজন মুক্ত হয়ে যায়।" (কথামৃত ২।১৯।৫) আর সে মুক্তি আসে সরল প্রাণের শরণাগতিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা : "সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়ি! তিনি বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যামায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন, বিদ্যামায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন।" (কথামৃত ৫।১৫।৫)

সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় 'বাসর' নাটকে। দুষ্টা সরস্বতী আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছে, "অজ্ঞান জ্ঞান আমি উভয়ই। অবিদ্যারূপে আমি রমণী, জ্ঞানরূপে আমি জননী।…আমি পথ না ছাড়লে সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন পায় না।" সেই ভাবটিই প্রকাশিত হয়েছে দুষ্টা সরস্বতীর গানটিতে :

আমি সারদা বরদা বাগ্‌বাদিনী।—
ভ্রান্তিবিধায়িনী, দাম্ভিক জন মনছাদিনী।
বিমল চিত্ত মম শতদল আসন
মত্ত মতি করি বিভ্রমশাসন,
বিদ্যা অবিদ্যা দেবনরারাধ্যা
মধুর বীণাধ্বনি ভক্ত-আমোদিনী
কভু কুরূপা বিরূপা অশুভ-নিনাদিনী।
(২য় অঃ, ৩য় গঃ)

কিন্তু অজ্ঞান দূর করবে কেমন করে? শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "অজ্ঞানকাঁটা পায়ে ফুটেছে—তুলবার জন্যে জ্ঞানকাঁটার দরকার। তারপর তোলা হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেয়।"

(কথামৃত ৪।১৯।১)

"চৈতন্যের উদয় হলে জ্ঞানের আর আবশ্যক থাকে না। শরীরের কোন অংশে কাঁটা বিঁধলে অন্য একটি কাঁটার দ্বারা সেই কাঁটাটি বার করতে হয় এবং বিদ্ধ কণ্টকটি বেরিয়ে গেলে আর কোন কাঁটার প্রয়োজন থাকে না।" (সুরেশচন্দ্র দত্ত

প্রকাশিত 'পরমহংসদেবের উক্তি'—'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ও ভাষান্তরিত)

'শঙ্করাচার্য' নাটকে গিরিশচন্দ্র মহামায়ার মুখে শোনালেন :

"বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংস না হলে জীবের চৈতন্য হয় না—

পরলে পরে সাধের বাঁধন খুললে খোলে না
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, কথায় চলে না
সোনায় লোহায় ঘসে ঘসে তবে লোহার
শেকল খসে
যত্নে গড়ে সোনার শেকল কিনতে মেলে না।..."

'স্বপ্নের ফুল' নাটকে সেই একই চিন্তার প্রতিধ্বনি :

"দেখলি কেমন মোহের কাঁটা—প্রেমের কাঁটা দে উঠে গেল! এখন দুটোই ফেলে দে—

দুটো কাঁটা ফেলে দে দেখ
সেই সেই সেই রে
দেখ খুঁজে পেতে আর কি পাবি
আমি তো নেই রে।"

"প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি" উপমা দিয়ে বোঝালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কোনো এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গে বললেন, "শুধু শুষ্ক জ্ঞান!—ও যেন ভস্-করে-ওঠা তুবড়ী—খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙে যায়।" (কথামৃত ৪।১৯।১)

গিরিশচন্দ্রের 'তপোবন' নাটকে বেদমাতার গানে সেই কথাটিই রূপান্তরিত :

শুকনো ধ্যানে পায় না ঠিকানা
সন্দ এসে দ্বন্দ্ব বাধায়—ভাবে এই কিনা
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি
প্রাণ দে আমায় যায় কেনা। (১ম অ:, ২য় গঃ)

৪

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা ও বিবেকানন্দের কর্মযোগের আদর্শ সমন্বিত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের বহু নাট্যসঙ্গীতে। সাধারণভাবে এগুলি নাটকের গান হিসাবে রচিত ও পরিচিত কিন্তু এগুলির মর্মমূলে রয়েছে মহত্তর আদর্শের সঙ্কেত যা গিরিশচন্দ্র লাভ করেছিলেন মহৎ জীবনের সংস্পর্শে। সর্বজীবে ঈশ্বরের প্রকাশ—এই উপলব্ধির দ্বারা জীবসেবার আদর্শকে নাটকীয় চরিত্রের উপযোগী করে তুলতে ভাব ভাষার প্রয়োগ গিরিশের মুন্সিয়ানার পরিচয় বহন করে।

'অশোক' নাটকে চণ্ডাল বালকবালিকারা গাইছে :

দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে
উসিকো আপনা সমঝ্না॥
কিসিকো বুরাই ন মাননা কোহি নেহি বেগানা
সবকোই কো আপনা বিচারনা॥

'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে সেই বালকবালিকা-দেরই গান চরিত্রানুযায়ী স্বতন্ত্র, কিন্তু বক্তব্যের দিক থেকে নৈকট্য আছে :

বোঝাতে অনাথের ব্যথা, করেছেন রূপায়
অনাথা
না বুঝলে ব্যথা হয় না মমতা;
নেব পেলে অনাথ বলে
শ্রীনাথের অনাথ পেলে।
প্রভুর সেবা—অনাথা সেবায়
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়
কায়মনে রই সেবায় রত—ঘৃণালজ্জাভয়
ঠেলে॥
(৩য় অঃ, ৪র্থ গঃ)

'অশোক' নাটকে মহেন্দ্র-সঙ্ঘমিত্রা-কুনালের গানে জনহিতব্রত তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শকে আভাসিত করে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজীবনের মহত্তম লক্ষ্যরূপে সর্বমানবের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারারই ইঙ্গিতবাহী। গানটির সঙ্গে ভাষার দিক থেকে কোথাও কোথাও 'ভ্রান্তি' নাটকের

রঙ্গলালের সংলাপের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গলাল চরিত্রটি স্বামীজীর তিরোভাবের অব্যবহিত পরে তাঁর চরিত্র-আদর্শে রচিত :

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা :

নরদেহে তবে কেন এসেছি ভবে
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি।
আছে মানবহৃদয় তবে দিব পরিচয়
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি ॥

কুনাল :

মিছার এ ছার শরীর ধারণ
করি অনাথ সেবা
সফল হবে মানবজীবন।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা :

হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন
মুছাতে নয়নবারি নারি যতনে।
কর বিফল দোলে, কেন চরণ চলে
জনহিতব্রত যদি না থাকে মনে ॥...
আত্মপ্রসাদ যদি নাহি করি সাধ
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল আশে।
ধনজনমান—বিনা আত্মপ্রদান
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে।

(২য় অঃ, ৫মঃ গঃ)

এই একই ভাবের অভিব্যক্তি 'তপোবন' নাটকের ব্রহ্মণ্যদেবের গানে :

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই
ফেরে যে জন পরের হিতে ॥
দুদিনের দুনিয়াদারি, কদর তারই
হিতবাণী বোঝে না চিতে
দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন কিনে নিতে...

৫

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিসভায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর পঠিত প্রবন্ধে বলেছিলেন, "ভাববীর গিরিশ হাসিতে হাসিতে সংসারের হলাহল স্বয়ং পান করিয়াছিলেন, গুরুর কৃপায় নীলকণ্ঠ হইতে পারিয়াছিলেন ; জীবের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদত্ত অমৃত বাঙ্গালাদেশের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।"

সেই "গুরুদত্ত অমৃতেই" তাঁর রচনাবলী কালজয়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে তিনি বাংলার হৃৎস্পন্দন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভক্তিই যে বাঙালীর মানসপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, সেই উপলব্ধি গিরিশের কাব্যপ্রেরণার মূলে। নিবিড় বিশ্বাস ও ভক্তির সাধনায় গিরিশ ব্যক্তিজীবনে যে অক্ষয় সম্পদলাভ করেছিলেন তা সর্বসাধারণের কাছে দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন—নাটকে, নাট্যসঙ্গীতে। গিরিশচন্দ্র আত্মস্বরূপকেই যেন উদ্ঘাটিত করেছেন নাটকের একটি গানে :

আসে যদি আপনি আসে
কোমল হৃদি ভালবাসে
বসলে পরে হৃদমাঝারে
আর ত যাবে না ॥
আপন হয়ে ফেলে ফাঁদে
হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে
দিনে রেতে মাতায় মাতে
মান তো রাখে না।...
বোঝে না যে বুঝব বলে
মেলে আপন হারা হলে
ছল থাকে না বুঝ রাখে না
বোধ তো মানে না।
রইতে নারে ছলে বলে
বোধ হলে যায় সে চলে
বোঝা যায় মজে, বুঝে জানলে জানে না।

(কালাপাহাড় ৩য় অঃ, ৪র্থ গঃ)

গিরিশচন্দ্র মজেছিলেন। তাঁর দিনরাত্রির সমস্ত কর্মপ্রেরণায় সেই প্রেমরসে মেতেছিলেন—মাতাতেও চেয়েছিলেন

বাঁশির আশ্বাস

দিলীপকুমার রায়

বলি যদি—তোমার বাঁশি শুনেছি নাথ কানে—
(এমন কথা—রাখা উচিত গোপনে যা প্রাণে)
আলাপে বা কাব্যে আমি যদি প্রকাশ করি,
কী পেয়েছি বাঁশির কৃপায়—ক্ষমা কোরো হরি !
জানো না কি যায় না ঢাকা আগুনকে ছাই দিয়ে ?
কৃপা পেলে পারে কি কেউ থাকতে না রটিয়ে
এমন দৈবী অঘটনের কথা শতমুখে ?—
যে-আনন্দে উছল জগৎ রাখবে চেপে বুকে
কেমন ক'রে সে যে তোমার শুনল ব্রজবাঁশি—
মৌনী হবে কী দুঃখে সে না হ'য়ে উচ্ছ্বাসী ?

এ অভিমান ? শুধাই—সে পায় মান প্রসাদে কার ?
এ মান যাকে দাও পারে কি পতন হ'তে তার ?
অহঙ্কার এ ? কিন্তু বলো তো, এ-অহং কার ?
তুমি যাকে ছুঁলে তার কি অহং থাকে আর ?
জানে যে—সে রেণুর রেণু, তোমার দাসের দাস,
তারপরেও পারে কি তার হ'তে সর্বনাশ ?
গান গেয়ে সে বলে যে, নেই আপন কিছুই তার
রত্ন মণি পারের কড়ি সমস্তই তোমার ।
বলে যদি সে—পেয়েও মেটে নি তার তৃষা,
যতই যে চায় পায় না কি সে ধ্রুবতারার দিশা ?
যে-কৃতজ্ঞ চায় বলতে তোমার বরের কথা,
ভাসায় সে কি কেঁদে যদি পায়ও গভীর ব্যথা ?

চোখের জলেও তার যে তোমার হাসির রঙিমায়
ইন্দ্রধনু রাঙে শ্যামল, কোমল করুণায়,
এ-করুণা কল্পনা নয়—জানেই জানে তায়
অন্তরে সে যাকে তুমি প্রসাদ দাও তোমার,
বাজিয়ে বাঁশি জানাও যাকে : "হৃদয়বৃন্দাবন
কথার কথা নয় নয়, সে নিত্য চিরন্তন ।
সেই অধরার মধুরিমার ঝর্না ঝরাতে
নামি আমি যুগে যুগে ধুলার ধরাতে,
ঘুমন্তদের জাগরণের মন্ত্র দিতে আসি
করতে প্রতি অকিঞ্চনে অমর ব্রজবাসী ।"

গায় মুরলী : "নামের মধুর দীক্ষা দিতে আমি
করি অবতরণ নিতে প্রাণের প্রেমপ্রণামী ।
অবিশ্বাসী যখন ঘোষে : 'নেই মর্ত্যে কেউ
অন্ধকারে করতে আবাহন আলোকের ঢেউ'
শুনলে আমার বাঁশি, ভোলা, শুনবি তাল আমারি
(বেতালেরও সিংহনাদে) : 'আছে পারের পারী,
কান পেতে যে চায় শুনতে সে প্রাণসাধনায়
আমার দেখা না পেয়েও কৃপার পরশ পায় ।
বাধাও তার হয় রে সহায় চ্যুতিও হয় সোপান
তার বিকাশের, কাঁটায়ও সে শোনে ফুলের গান ।
বেদনায়ও তাই সে কাঁপে পুলক-শিহরণে,
জীবনে যা হারায় তাকেও পায় ফিরে মরণে ।' "

ভয়-বরাভয়-রূপা

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

তোমাকে করেছে লোকে ভয়,
আবার ডেকেছে বারংবার ব'লে বরাভয়।
ঘরে ঘরে ক্ষণে ক্ষণে আসো নিঃশব্দ চরণ
সুপ্তিমগ্ন কিংবা আর্ত ত্রস্ত পরিজন
শুনিতে পায় না তব সেই আগমন।

রূপ তব দেখে নাই কেহ।
শুনেছি পুরাণে
পিঙ্গল বসনখানি, গুণ্ঠিত বদন,
দৃষ্টিহীন সকরুণ মুদিত নয়ন
চোখে জল ঝরে অবিরত।
কহো বিধাতারে, পারিব না কাঁদাইয়া পরিজন
হরিতে জীবন।···
ধাতা কন—শোনো কন্যা, মোর কথা কররে শ্রবণ—
জীব জানিবে না তোর পায়ের সঞ্চার।
কোন পাপ হবে না তোমার
তুমি শুধু হরিবে ভূভার।—

দুই করে ভয়-বরাভয় সকরুণ আঁখি অশ্রুময়
নীরবচরণ মৃত্যু আসে ঘরে ঘরে।
তারি আঁখিজলধারা যেন জীবনেত্রে দিয়ে যায় ভরে।

সংহারকারিণী যিনি
সৃজনকারিণী তিনি
'অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।'

মা

[গান : তিলককামোদ—একতালা]

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

গাওরে মায়ের সুধাঝরা নাম—
শ্রান্ত প্রাণের চিরবিরাম ॥
চিত্ত ভরিবে, জীবন জুড়াবে,
মরমের কোষে অমৃত ক্ষরিবে—
লইলে সে নাম হৃদয়ারাম ॥

ত্রিভুবনে কিছু জানিনে আর,
মায়ের চরণ করেছি সার।
মা যে সারাৎসারা, মা যে পরাৎপরা,
অদ্বয়া অব্যয়া মা যে রূপাধারা ;
ব্রহ্ম হতে স্তব্ধ মায়েরি ধাম ॥

জাগৃতি

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

অগভীর নদীপথে জাহাজের গতি স্থির হলে
অফুরন্ত বন্যাবেগে ধুয়ে দেবে উচ্ছ্বসিত জলে,
আকাশে মেঘের দেখা নীলমুক্তি আসন্ন ভোরের
একটা সূর্যের তেজ আশ্বাসের অনেক মনের।

খরার রুক্ষতা থেকে শ্যামলতা বন্যা বারবার
ধ্যানের দৃষ্টির মতো সঞ্চারিত দীপ্তি বিজ্ঞতার
আনন্দের অভীপ্সিত সন্নিকটে মালঞ্চ অবশ্য,
সেই আশা—অভাবনী সৌন্দর্যের জগতে নমস্য।

সমুদ্রের উচ্ছলিত সফেন উত্তালে রাখা-ঢাকা
হাতের দৃঢ়তা নিয়ে পায়ের মাটিকে নিয়ে থাকা।
কোথায়? কোথায় আর—গণ্ডির সীমিত বৃত্তে ঘিরে-
ক্ষমতা কুটিল চিত্তে আসবে কি অনুভূতি ফিরে?

প্রশান্তির পৃথিবীতে যখন ফোটায় ফুল যত
নিভৃতির নিরন্তর জাগৃতিই প্রার্থিত নিয়ত।

অচিন্তনীয়া

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোর খেয়ালের হদিস আমি
পাইনে মাগো, চিন্তা করে,
ইচ্ছেমত যা খুশি তুই
করতে পারিস খেয়ালভরে।
এই যে আঁধার, এই যে আলো,
এই যে মন্দ, এই যে ভালো ;
তোর খেয়ালের পরশ লেগে
বদলে যে যায় নিমেষ পরে।

অসাধ্য তোর নেই মা, কিছুই,
তোর কাছে সব সহজ অতি,
বোঝার মত শক্তি কোথায়,
আমরা যে সব ক্ষুদ্রমতি।
আপন মনে গড়িস ভাঙিস—
দূরে ফেলিস কাছে টানিস ;
অবাক্ হয়ে দেখি সে সব,
কখন আমার নয়ন ঝরে।

স্বঃ ও ভূঃ

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

দূরে—মেঘে চেয়ে রই—স্বপ্নময় আঁখে—
বিহ্বল বিজন দিঠি! মন শোনে—আঁকে—
—গায়ত্রীর বেদধ্বনি হোল মূর্তিমতী—
রূপে, রঙে, পারিজাতে, নন্দন আরতি!
এ কে? শিখা নেই, তবু দীপ্তি সমুজ্জ্বল!
স্রোত কোথা? ঢেউ কই? নিথর অতল!
নেপথ্যে নিভৃতে, তবু করুণার ধারা—
তৃষিতের স্বাদে নামে মন্দাকিনীপারা!
নিম্নে স্থূল দৃষ্টি যায়—একটি কুটির—
নারী নয়, জননী সে—সংবেদ্য সমীর!
ঘর হাসে, গন্ধ ভাসে চন্দ্রমল্লিকার—
বন্ধনের এ সংসারে মুক্তজ্যোতি তার!
পাপ নেয়, পুণ্য দেয়, দেহ রমণীর—
ভোগ ঝরে, যোগ স্বরে, ধারা গঙ্গোত্রীর!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ডক্টর জলধিকুমার সরকার

বিষয়বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করলে সহজ কথায় বলতে পারা যায় যে, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল, শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বা লেখার মাধ্যমে তাঁদের বৈজ্ঞানিক মনকে আবিষ্কার করা। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি হাস্যকর না হলেও কৌতূহলোদ্দীপক বলা যেতে পারে। কারণ, যে রামকৃষ্ণের পাঠশালায় শুভঙ্করী বুঝতে ধাঁধা লাগত; শ্রীম বা মাষ্টারমশাই মাটিতে আঁক কেটে মাধ্যাকর্ষণ, জোয়ার, পূর্ণিমা প্রভৃতি বুঝাবার সময় যাঁর মাথা ঘুরে টনটন করাতে শিশুর মত জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আচ্ছা, এত দূরের কথা কেমন করে জানলে?'; নৃত্য করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে যাঁর মন কোন্ এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যেত; 'ইলেকট্রিসিটি' (electricity) কথাটি শুনে বালকের ন্যায় ঔৎসুক্যে যিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁরে, ···ইলেকটিক্‌টিক্ মানে কি?'[১]; তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্তার কথা ভাবা সত্যই কঠিন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি সারা ভারতবাসীকে বলতে বলেছেন, 'বল, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী'; গভীর সমাধিতে যিনি দেখেছেন, 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর'; আবার কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'রামকৃষ্ণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি হইয়াছে'[২] - তাঁকেই বা কি ক'রে বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে ভাবা যায়? সমস্যাটি সত্যই চিন্তার বিষয়। কিন্তু এ সমস্যাটি সমাধানের আগেই আমাদের ভাবতে হবে, বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কি কি বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক।

ইংরেজী অভিধান-মতে সায়েন্স (Science) বলতে বুঝায় systematised knowledge বা প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। আরও সবিস্তারে, knowledge of facts, phenomena, laws and proximate cause gained and verified by observation, experiment and correct thinking.[৩] বাংলা অভিধান-মতে বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান বা নিয়মিত গবেষণার ফলে ক্রম-অনুসারে লব্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের এইসব সংজ্ঞা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের অর্থ যে ল্যাবরেটরি, টেস্ট টিউব, মাইক্রসকোপ ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা ত নয়ই, বরং ব্যাকরণ, সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক কিছুই বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে।'[৩] 'বিজ্ঞান' শব্দটির অর্থের এই ব্যাপকতা থাকার জন্য এবং খানিকটা বোধ হয় শব্দটির আভিজাত্যের জন্য আমরা পাই হোম সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, লাইব্রেরি সায়েন্স, সোশ্যাল সায়েন্স ইত্যাদি। শ্রীম-লিখিত 'কথামৃতে' আমরা 'বিজ্ঞান' শব্দটি অনেক স্থলে পাই, যেটির অর্থ বাংলা অভিধানগত বিজ্ঞানের সূত্র হতে খুব একটা তফাত নয়, তবে ভাব আরও গভীর। সেখানে পাই, 'তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান; জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে থাকে বিজ্ঞান'; 'দুধের কথা শুনেছে, সে অজ্ঞান, যে দুধ খেয়েছে, তার জ্ঞান হয়েছে, আর যে দুধ খেয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে'; 'ঈশ্বর আছেন এইটে জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে, সে জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে রাঁধা খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী।' অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা আপাতদৃষ্টিতে দুটি পৃথক্‌রূপ

পাচ্ছি। একটি সাধারণ অর্থে, যেটিকে বলতে পারা যায় 'জড়বিজ্ঞান'; অপরটি, শ্রীরামকৃষ্ণ যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, যাকে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' বলতে পারা যায়। 'জড়' কথাটি অবশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে, নিকৃষ্টার্থে নয়।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণে এইসব জটিলতা এসে গেলেও আমরা যখন 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি' কথাটিতে আসি, অথবা বৈজ্ঞানিকের আবশ্যকীয় গুণাবলী বিবেচনা করি, তখন সমস্যাটি অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের থাকবে খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, দৃষ্টবস্তু বা ঘটনার পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) মূল্যায়ন করার যোগ্যতা, গভীর চিন্তাশীলতা বা তন্ময়তা, এবং যাচাই না করে কিছু মেনে না নেওয়ার প্রবণতা। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সামিল হবে শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার-ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা, 'মতুয়ার বুদ্ধি' না করা বা dogmatic না হওয়া, এবং এমন কিছু না বলা যা verifiable নয় অর্থাৎ পূর্ব প্রদর্শিত পথে চলেও যার সত্যতা প্রতিপাদন করা যাবে না। এই সব গুণাবলীকে মানদণ্ড করলে সহজেই বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিকের কাজে নিযুক্ত না থেকেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব, যদিও বৈজ্ঞানিকের কাছেই পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশী আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'যন্ত্রপাতি ব্যবহাররত বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সকলকে আমি বৈজ্ঞানিক বলে ধরি না; আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই আসল।'[৪]

এটা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু বললে তা শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করে, কারণ, তা যুক্তিভিত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক। শ্রোতা যেন এক্ষেত্রে জাতসাপের এক কামড়ে চুপ হয়ে যায়। তাই আমরা দেখতে পাই প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্থির হয়ে শুনছেন বিদ্যাসাগর, বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানসূর্য নরেন্দ্রনাথ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীম বা মাষ্টারমশাই। বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার শেষে স্তম্ভিত হয়ে চাদর নিতে ভুলে গেলেন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মাত্র কিছুক্ষণ আলোচনার পরে উদ্ভ্রান্ত বোধ করেছিলেন।[৫] এমন কি বালক-অবস্থাতেও রামকৃষ্ণকে দেখি, মহতী পণ্ডিতসভা যেখানে জটিল প্রশ্নের সমাধানে অপারগ, সেখানে সুমীমাংসা করে দিচ্ছেন। 'কথামৃতে' তাঁকে বারেবারে বলতে শুনা যায়, 'একটি মতকে বিশ্বাস কোরো, তবে অন্যরকম কিছু হতে পারে না এরূপ ভেবো না' অর্থাৎ dogmatic হোয়ো না, মনের কপাট খোলা রেখো। তিনি কারও 'আমি সব জানি' বলা পছন্দ করতেন না। সব কিছু যাচাই করে নিতে বলতেন, অন্ধবিশ্বাস করাকে প্রশ্রয় দিতেন না। প্রিয় শিষ্য যোগেন রাত্রে যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর শয্যায় না দেখে সন্দেহ করেছিলেন যে, তিনি পত্নীর নিকট নহবতে গেছেন এবং পরে পঞ্চবটীর দিক হতে তাঁকে ফিরতে দেখে এরূপ সন্দেহ করার জন্য লজ্জিত হলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত না হয়ে বরং খুশী হয়ে বললেন, 'বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।'[৬] একজন ব্রাহ্মভক্ত যখন সদরওয়ালাকে যুক্তি দিয়ে না বুঝে মেনে নিতে বলেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, 'তুমি কি রকম লোক! কথায় বিশ্বাস না ক'রে মেনে নেওয়া! কপটতা। তুমি ঢং কাচ দেখছি।' তিনি বারেবারে ভক্তদের বলতেন তাঁরা যেন বিশ্বাসে দৃঢ় হন, কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি না করেন, অর্থাৎ 'অন্যরা ভুল, তাঁরাই ঠিক' এরকম মনোভাব না আনেন। কিন্তু তিনি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে বলেছেন। একজনের চোখের সামনে দেওয়াল ভেঙে পড়ায় সে খবর

দিলেও খবরের কাগজে সেই খবরটা না থাকার জন্য অবিশ্বাস করাকে তিনি বিদ্রূপকশাঘাত করেছেন। এদিকে 'কথামৃতে'র পাতায় পাতায় প্রমাণ পাই তাঁর power of observation বা খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, খই ভাজার সময় যেগুলি লাফিয়ে পড়ে, সেগুলি মল্লিকা ফুলের মত সাদা, খোলার উপরে যেগুলি থাকে সেগুলি ততটা সাদা হয় না। কুস্তিগিরের মলের চেহারা দেখে তিনি তার হজমের অতিরিক্ত আহার করা বুঝতে পেরেছেন; লক্ষ্য করেছেন, কীর্তনীয়া সেজেগুজে কি রকম ঢং করে কাশে, মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরিয়ে তাবিজ, অনন্ত প্রভৃতি অলঙ্কার দেখায়, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তারি মাঝে 'আসুন' বলে অভ্যর্থনা করে। বাইরের দৃষ্টি শুধু তীক্ষ্ণ নয়, অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অমেয়—চেহারায়, চলনে-বলনে লোকের চরিত্র বুঝতে পারতেন; একজনের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভিতরবার বুঝতে পারতেন। আর জাগতিক ঘটনাই হোক, অথবা আধ্যাত্মিক দর্শনাদিই হোক, শ্রীরামকৃষ্ণের মূল্যায়ন যে নৈর্ব্যক্তিক হোত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইজন্যই সেগুলি গ্রহণ করতে সকল শ্রেণীর শ্রোতাদেরই কারও কোন দ্বিধা হোত না। বৈজ্ঞানিকের যে মনঃসংযোগ বা চিন্তার তন্ময়তার প্রয়োজন, তা যে তাঁর ছিল, এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। চিন্তার গভীরতায় সমাধিলাভের চেয়ে তন্ময়তা আর কি হতে পারে? এদিকে, তিনি যে নিজেই ঈশ্বরদর্শন করেছেন তা নয়, অন্যকেও দর্শন করাতে পেরেছেন, যাঁরা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করতে গেলে এবিষয়ে বিরুদ্ধ মতগুলিরও আলোচনা দরকার। তাঁর শুভঙ্করীতে ধাঁধা লাগা বা সূর্যগ্রহণ বুঝতে না পারার অর্থ তাঁর বুদ্ধির অভাব নয়। বরং ঠিক উল্টা। লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন, বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশে পিতা ক্ষুদিরাম বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও দেখেছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ ও ধারণা করে অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তেমনি উদাসীন থাকে। পাঠশালায় গিয়ে তার গণিতেও বেশ উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু 'চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে।'[৭] যিনি সারাজীবন মনকে একাভিমুখী করে রেখে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর কেবলমাত্র জগতের মঙ্গলের জন্য মনকে অন্য জগৎ হতে একধাপ নীচে নামিয়ে রাখতেন, তাঁর পক্ষে এখন মনকে বহির্মুখী বা বহুমুখী করা সম্ভব নয়। মাথা টনটন করা তাঁর এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বাস বলতে তিনি ব্রহ্ম-দর্শনকারীদের কথায় বিশ্বাস করতে বলেছেন, যেমন আমরা ডারউইন, হাক্সলির কথায় বিশ্বাস করি। আর নূতন কোন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে কি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করা চলে? মনে রাখা দরকার যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি-প্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্তীর্ণ হয় নাই। অঙ্কশাস্ত্রের বেলাতেও তাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গিডেল (Goedel) বলেছেন, 'Even in Mathematics we must admit truths that are not provable.'[৮] (অঙ্কশাস্ত্রেও কতকগুলি সত্য মেনে নিতে হয়, যেগুলি প্রমাণ

করা যায় না)। সেইরকম, ধর্মজগতে প্রবেশ করার শুরুতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হয়।

এবার স্বামী বিবেকানন্দের কথায় আসা যাক। শৈশব হতেই তাঁর যুক্তিবাদী মনের সত্যকে যাচাই ক'রে নেওয়ার প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন দেখি বীরেশ্বর বা বিলে গাছে চড়ে বসে আছেন সত্যি সত্যি ব্রহ্মদত্তি ঘাড় মটকে দেয় কিনা দেখবার জন্য, অথবা কলাগাছের ঝোপে বসে আছেন মহাবীরের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায়। আবার পিতার বৈঠকখানায় যখন কেউ নেই, বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট হুঁকাগুলিতে মুখ দিয়ে ফুড়ুক ক'রে টেনে দেখছেন সত্যি সত্যি জাত যায় কিনা। আর এই মনোবৃত্তিরই অভিব্যক্তি পাই তাঁর উত্তর-জীবনে যখন দেখি তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করছেন, 'আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?'; শ্রীরামকৃষ্ণকে বলছেন, 'রূপটুপ যা দেখেন তা আপনার মাথার খেয়াল'; অথবা তাঁকে বলছেন, 'অন্যেরা যা বলুক, আমার নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখন আপনাকে অবতার বলব।' স্বামীজী বলেছেন, 'অন্ধবিশ্বাস করার অর্থ হইল মানবাত্মার অধঃপতন। নাস্তিক হতে চাও তো তাই হও; কিন্তু বিনা প্রশ্নে কোন কিছু গ্রহণ করিবে না।'[৯] এদিকে, যে স্বামীজী বেদের এত প্রশংসা করেছেন, তিনিই বলছেন, '…আমি… বেদের ততখানিই গ্রহণ করি; যতখানি যুক্তির সঙ্গে মেলে।'[১০] অন্যত্র স্বামীজী বলছেন, 'Why was reason given us if we have to believe?…What right have we not to use the greatest gift that God has given to us?'[১১] (যদি আমাদের বিশ্বাসই করিতে হয়, তা হইলে আমাদের বিচারক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কেন? ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে ব্যবহার না করিবার আমাদের কি অধিকার আছে?)। আর বৈজ্ঞানিকের তন্ময়তা আমরা স্বামীজীর মধ্যে পাই তাঁর জীবনের প্রতি স্তরে। শৈশবে সীতারামের মূর্তির সামনে ধ্যানমগ্ন যে-বিলেকে দরজা ভেঙে বার করতে হয়েছিল, যৌবনে কাশীপুরের বৃক্ষতলে কৃষ্ণ কম্বলের মত মশকাবৃত ধ্যানমগ্ন তাঁকেই গিরিশবাবু ডেকে জাগাতে পারেন নাই; আবার জার্মানীর কিয়েল-নগরে অধ্যাপক পল ডয়সন কাব্যগ্রন্থরত তাঁকেই ডেকে সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন। অবশ্য প্রফেসর যখন দেখলেন যে স্বামীজী তন্ময়ভাবে পড়ার সময়ের কবিতাগুলি হুবহু উদ্ধৃত করলেন তখন তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন।[১২] ধ্যান সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য: "যদি তুমি প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, (ইহা ধ্যানের অনুশীলনেই সম্ভব হইবে)। আজকাল বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাঁহারা (বৈজ্ঞানিকগণ) বিষয়বস্তুটি তন্ময়ভাবে অনুধ্যান করিতে থাকেন এবং সবকিছু ভুলিয়া যান—এমনকি নিজেদের সত্তা পর্যন্ত, এবং তখন মহান্ সত্যটি বিদ্যুৎপ্রভার মতো আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ ইহাকে 'অনুপ্রেরণা' বলিয়া ভাবেন। কিন্তু নিঃশ্বাস ত্যাগ যেমন আগন্তুক নয়, (নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেই উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ 'অনুপ্রেরণা'ও অকারণ নয়। কোন কিছুই বৃথা পাওয়া যায় নাই।"[১৩]

স্বামীজী পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে বহু পুস্তক পড়েছিলেন; তার সঙ্গে পড়েছিলেন ফলিত গণিত ও গ্রহবিজ্ঞান। কেউ কেউ হয়ত জানেন না যে, তিনি শারীরিক গঠন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে মাঝে মাঝে যেয়ে এ্যানাটমির বক্তৃতা শুনতেন।[১৪] যদিও তিনি কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে আর্টসেরই ছাত্র ছিলেন, তাঁর জীবনীতে পাই, উত্তরজীবনে যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন

তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় দুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন।[১৫] আর এটা আমরা জানি যে, দুচার কথায় বুঝিয়ে দিতে তাঁরাই পারেন যাঁদের সেই বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে

বিজ্ঞানমনস্কতা স্বামীজীর মধ্যে এমন ঘনীভূত হয়েছিল যে, যখন তিনি বেলুড় মঠে অসুস্থ হয়ে গুরুভাইদের কথায় কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছেন, তখনও তাঁর মনের কথা—'আমার মত কিন্তু একজন সায়েন্টিফিক চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল ; layman (হাতুড়ে) যারা বর্তমান সায়েন্সের কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে পাঁজিপুঁথির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে, তারা যদি দু-চারটে রোগী আরাম করেও থাকে, তবু তাদের হাতে আরোগ্য-লাভ আশা করা কিছু নয়।'[১৬] অন্যত্র বলেছেন, 'যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার উহা দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না।...বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হইলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ কর।'[১৭] তাঁর আর এক উক্তি—'পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, আর আমাদের হবে না?...একবার একজনের জীবনে যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্যের জীবনেও সিদ্ধ হবে।'[১৮] তবে সেই সঙ্গে স্বামীজীর একটি বক্তব্য স্মরণীয়: "প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই নিজস্ব অনুসন্ধান-প্রণালী আছে।...মনে কর, একজন রাসায়নিক—বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট আসিয়া রসায়নশাস্ত্রের কথা বলিলেন। যদি তুমি তাঁহাকে বলো, 'আমি রসায়নবিদ্যার কিছুই বিশ্বাস করি না, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই পাই নাই।', তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রশ্ন করিবেন, 'কখন তুমি ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে?' তুমি বলিবে, 'যখন ঘুমাইতে যাইতাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা উচ্চারণ করিতাম—হে রসায়নশাস্ত্র, আমার নিকট এসো। কিন্তু সে কখনও আসে নাই।' উত্তরে বৈজ্ঞানিক হাসিবেন ও বলিবেন, 'না, উহা যথার্থ প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়া ক্ষার-রস, অম্লরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের পর দিন গবেষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই? ঐ প্রণালীতেই তুমি ধীরে ধীরে রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে পারিতে।'"[১৯] ধর্মানুশীলনেরও সেইরূপ বিশিষ্ট প্রণালী আছে।

বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি এত প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর বক্তব্যের অনেক অংশ, এমনকি ধর্মীয় ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে বুঝিয়ে দিতেন। এগুলির মাধ্যমে তাঁর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ করছি। (ক) 'বেদ বলেন—সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির সমষ্টি সর্বদা সমপরিমাণ।'[২০] (খ) "'ডিসকভার' শব্দটির অর্থ—অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরাইয়া লওয়া। আমরা বলি, নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা কি এক কোণে বসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল? না, উহা তাঁহার নিজ মনে অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি উহা দেখিতে পাইলেন।"[২১] (গ) 'মস্তিষ্কের দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দর্শনেন্দ্রিয়, চক্ষুটি নয়। এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ। একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া ঘটিলেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষ

জ্ঞানের জন্য সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয় প্রকার নার্ভই (sensory and motor nerves) প্রয়োজন।'[২২] (ঘ) "ধ্বংস বলিতে কারণে লয়, কারণে প্রত্যাবর্তন—যে-সকল উপাদান হইতে কোন বস্তু নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি তাহাদের আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস শব্দের এই 'অর্থ' ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ যে অসম্ভব, তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কপিল অনেক যুগ পূর্বে ধ্বংসের অর্থ যে 'কারণে লয়' করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহা দ্বারা যে তাহাই বুঝায়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।···বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে···প্রমাণ করা যাইতে পারে—জড়বস্তুও অবিনশ্বর।"[২৩] ডারউইনের ক্রমবিকাশ (Evolution theory) সম্বন্ধে স্বামীজী যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, তা থেকে তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারা যায়। তিনি এই মতবাদকে চূড়ান্ত ব'লে বিশ্বাস করেন নাই। পতঞ্জলির এই বিষয়ে মত উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, 'আমার বিবেচনায় struggle (লড়াই) এবং competition (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) জীবের পূর্ণতা-লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ···জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ।···প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন-রাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। সুতরাং obstacle (প্রতিবন্ধক)-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কার্য না ব'লে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।'[২৪] স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' বুঝাতে যেয়ে ঘন ঘন এ্যানাটমির (anatomy) সাহায্য নিয়েছেন। আবার সৃষ্টি ও লয় বুঝাতে যেয়ে 'ইথার' (ether) সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর তৎকালীন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির কথাই প্রকাশ পায়। তিনি বলেছেন, "বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে তাহার সমষ্টিকে 'প্রাণ' বলে।···কঠিন, তরল প্রভৃতি যে-সব বস্তুকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়া থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে;···এই মূল পদার্থের নাম 'আকাশ' (ইথার)···। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্যের ফলেই বিশ্ব সৃষ্ট হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের অন্তে—অর্থাৎ কল্পান্তে—একটি সৃষ্টির বিরতি-সময় আসে।···যখন প্রলয়কাল আসে, তখন···সব কিছুই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া 'আকাশে' লীন হয়।"[২৫] মনে রাখবেন, স্বামীজী যে সময় ether-এর কথা বলেছেন, তখন সূর্যের কিরণ কিভাবে পৃথিবীতে আসে, এই সম্বন্ধে নিউটনের কর্পাসকুলার মতবাদ (Corpuscular theory) চলে যেয়ে হাইগেনের (Huyghen) ওয়েভ মতবাদ (Wave theory) বা ইথার মতবাদই বলবৎ ছিল। পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের ডিউয়াল মতবাদ (Dual theory) এসে ইথার মতবাদকে ধূলিসাৎ করে দেয়। এরূপ আর একটি অধুনা-মতে বৈজ্ঞানিক ভুল স্বামীজী বলেছিলেন, যখন তিনি তাঁর গুরুভাই (স্বামী শিবানন্দ)কে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হতে উদ্ধার পাবার জন্য জল ফিলটার করে খেতে বলছেন।[২৬] ওই কালে, মশা দূষিত জলের মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া বিস্তার করত, এই ধারণা বলবৎ ছিল।[২৭] অবশ্য এটা ত আপনারা জানেন যে, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যই পরে পরিবর্তিত বা পরিত্যক্ত হয় এবং ভুল মেনে নিয়ে সত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠ গৌরব।

স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের আশু প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার। তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৭ সালে মঠে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে লিখছেন 'এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistryর (রসায়নের) সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও microscope (অণুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। ···আর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উত্তম Scientific (বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিনবে ও পাঠ করবে।'[২৮] অন্যত্র বলছেন, 'আমাদের চাই কি জানিস ?—স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী আর Science (বিজ্ঞান) পড়ানো ; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা);··· High education (উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, আর গেলেই বা কি ?'[২৯] মহীশূরের রাজাকে বলছেন, 'যদিও ভারতের বিশেষত্ব বলিতে দর্শন ও ও ধর্মকেই বুঝায়, তথাপি যুগপ্রয়োজনে তাহাকে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-অর্জনে ও সামূহিক সমাজসংস্কারে আশু তৎপর হইতে হইবে।'[৩০] এই মানসিকতা থাকার জন্যই তিনি প্যারিসে জগদীশ বোসের বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। আর জনগণের বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা বুঝেই 'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্য স্বামীজী যে সব বিষয় নির্দিষ্ট করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট স্থান আছে।[৩১]

বহুদিন যাবৎ আলাদা হয়ে থাকা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে একত্র এনে স্বামীজী কিভাবে সমন্বয় করেছেন, সেই বিষয়ে আসা যাক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভাষায় 'আমরা বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাই।'[৩২] স্বামীজীর কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের উদ্দেশ্য একই সত্যানুসন্ধান। তিনি বলেছেন, 'রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য।···ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ,···বৈজ্ঞানিকগণও সেরূপ ধর্ম-বিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ।'[৩৩] 'যুক্তি ও ধর্ম' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে ?··· আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি ইহাও মনে করি,···এরূপ অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক কুসংস্কার-মাত্র ছিল ; যতশীঘ্র উহা লোপ পায়, ততই মঙ্গল।'[৩৪] স্বামী বিবেকানন্দের মতে, 'জ্ঞান-অর্থে···একত্ব-আবিষ্কার। রাসায়নিকেরা সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্তুকে ঐগুলির মূল উপাদানে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন ; আর যদি সম্ভব হয়, তবে যে-এক উপাদান হইতে ঐগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, যখন তাঁহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিবেন,···তখন আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিবেন না ; তখন রসায়নবিদ্যা সম্পূর্ণ হইবে।'[৩৫] 'প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ (Heat, light and electricity) বিভিন্ন শক্তি বলিয়া সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র।'[৩৬] 'একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, সুতরাং আমরা প্রথমতঃ বিশ্লেষণ (analysis), তারপর সমন্বয় (synthesis) অবলম্বন করিয়া থাকি। বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অন্তর্নিহিত প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানের ফলে শক্তিগুলির সংখ্যা কমিতে থাকে। চরম একত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে

উপনীত হয়। একত্বে পৌঁছিলেই আমাদের বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা। সকল বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহু পূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, সেই একত্বে অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় এক পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি তাঁহারই অভিব্যক্তি মাত্র।'[৩৭] অন্যত্র বলেছেন, "যখন আবিষ্কৃত হইল, 'আমি ও আমার পিতা অভিন্ন' তখনই ধর্ম সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া গিয়াছে, তারপর বাকি রহিল শুধু খুঁটিনাটি।"[৩৮] আরও বলেছেন, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই যে শুধু মেলে তাহা নয় বরং ঐ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পর্শ করিয়াছে।'[৩৯] আরও বলেছেন, 'কেবল জড়-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটির, যথা—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্যার কথা ধরুন; উহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করুন, ঐ তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, দেখিবেন স্থূল ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পদার্থে লয় পাইতেছে; শেষে ঐগুলি এমন স্থানে আসিবে, যেখানে এই সমুদয় জড়বস্তু ছাড়িয়া একেবারে অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে। জ্ঞানের সকল বিভাগেই স্থূল ক্রমশঃ সূক্ষ্মে মিলাইয়া যায়, পদার্থবিদ্যা দর্শনে পর্যবসিত হয়।'[৪০]

স্বামীজী জড়বিজ্ঞানের সীমিত পরিধি দেখেছেন তিনি বলেছেন, "আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যদি কেবল এইটুকু জানাই জীবনের একমাত্র কাজ হয়, তবে তো আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সঙ্কল্প—সব কিছুর মর্মস্থল অনুসন্ধান করিব।...আমার 'দর্শন' বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে।...অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে,... কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা ছাড়া জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নাই তখন সে নির্বোধের মত কথা বলিতেছে।"[৪১]

স্বামীজীর এই সব উক্তি হতে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মবিজ্ঞান শুধু যে বিজ্ঞান তাই নয়, আরও উন্নততর বিজ্ঞান (স্বামীজীর ভাষায় 'greatest of all sciences'), যা সমস্ত বস্তু, প্রাণী বা সৃষ্টিরহস্যের মূল তত্ত্ব অনুসন্ধান করে। আগেই দেখান হয়েছে যে, জড়বিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান উভয়ের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। ধর্মবিজ্ঞানের শেষ লক্ষ্য অদ্বৈতজ্ঞান এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানর পর যিনি এক ধাপ নেমে এসে লোকশিক্ষা দেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকেই বলেছেন 'বিজ্ঞানী'। এই লক্ষ্যে যেতে হয় প্রত্যক্ষানুভূতির মাধ্যমে, এবং এখান হতেই অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে-ছিলেন 'এক চৈতন্যে জগৎ জরে রয়েছে', 'এক চৈতন্য অভেদ, লোকের মধ্যে, মলমূত্রের মধ্যে।' এই যে অনুভূতির রাজ্য এটা unscientific বা অবৈজ্ঞানিক নয়; বলা যেতে পারে beyond science বা জড়বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা, আমার বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক' কথাটির তাৎপর্য খানিকটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

অতীতে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় স্বামীজীর বাণী ও রচনার মাধ্যমে সারা জগৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তাদের যথাস্থানে দেখতে সমর্থ হবে এরূপ দেখা এখন বিশেষ প্রয়োজন।*

* ৫ই ও ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

আকর-নির্দেশিকা

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৪ ; ২ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ২য় সং, পৃঃ ২৯ ; ৩ Britannia World Language Dictionary ; ৪ Science Information Notes, Albert Einstein, Indian National Science Academy, Oct. 1979, p. 2 ; ৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৭৩ ; ৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ১৬৬ ; ৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড (১৩৬৩), পৃঃ ৮৮, ১১৯, ১৩৮ ; ৮ Meghnad Saha Medal Lecture, 1978 (Atom & Self) by D. S. Kothari, Indian National Science Academy, p. 14 ; ৯ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৫৬ ; ১০ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪ ; ১১ Complete Works of Swami Vivekananda, Vol. VI, 8th Ed., p. 12 ; ১২ যুগনায়ক, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩০৯ ; ১৩ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৯ ; ১৪ লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড (১৩৬৬), পৃঃ ২১৯ ; ১৫ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৭৩-৭৪ ; ১৬ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৩য় সং, পৃঃ ২০৮ ; ১৭ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০৩ ; ১৮ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮ ; ১৯ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৩ ; ২০ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪ ; ২১ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪ ; ২২ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৯৭-৯৮ ; ২৩ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬ ; ২৪ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২০ ; ২৫ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯ ; ২৬ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৩য় সং, পৃঃ ৩৩৩ ; ২৭ A Text Book of Practice of Medicine, by F. W. Price, 8th Ed., p. 274 ; ২৮ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫-৩৬ ; ২৯ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২-৩ ; ৩০ যুগনায়ক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ ; ৩১ উদ্বোধন, মাঘ (১৩৮৫), পৃঃ ৪ ; ৩২ বিশ্ববিবেক, প্রথম প্রকাশ (১৩৭০), পৃঃ ১৯৭ ; ৩৩ বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৪১ ; ৩৪ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২ ; ৩৫ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১ ; ৩৬ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ ; ৩৭ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১১ ; ৩৮ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫ ; ৩৯ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১ ; ৪০ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯ ; ৪১ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা-প্রসঙ্গে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে প্রচলিত। দুর্গা বৈদিক না পৌরাণিক দেবতা, এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাঁরা এই মহাদেবীকে বৈদিক দেবতা ব'লে প্রচার করেন, তাঁরা স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় নানা উদ্ধৃতি উপস্থাপনা করেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে স্পষ্টই দুর্গাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় :

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ ॥'

উক্ত আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদে ভগবতী দুর্গার একটি গায়ত্রী মন্ত্রও দৃষ্ট হয়:

'কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।' বেদের খ্যাতনামা ভাষ্যকার সায়নাচার্যের মতে 'দুর্গি' এবং 'দুর্গা' একার্থবাচক, অর্থাৎ অভিন্ন।

ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে যে প্রসিদ্ধ 'দেবীসূক্ত'টি 'অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্'…ইত্যাদি) রয়েছে, অনেকের মতে, সেটি মহাদেবী দুর্গারই সূক্ত। মারিচীকল্পে 'দুর্গাসপ্তশতী'র পুরশ্চরণ প্রয়োগে উল্লিখিত 'দেবীসূক্ত' এবং উক্ত বেদান্তর্গত রাত্রিসূক্ত' ('রাত্রী ব্যক্ষদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ' ইত্যাদি)-এর মন্ত্রসমূহের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধিও লক্ষিত হয়।

বিষ্ণুসংহিতায় 'দুর্গাসাবিত্রী' পাওয়া যায় এবং ঋষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থেও 'দুর্গা'র উল্লেখ রয়েছে। তা ছাড়া, বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডে জ্যোতিষ্মতী দক্ষতনয়া' দুর্গার পূজা এবং 'হব্যবাহিনী' কাত্যায়নী দেবীর অর্চনার বিধিও দেখা যায়।

আর্য ঋষিগণ দেব-দেবীর প্রতিমা পূজা করতেন না, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদিক দেবতাগণের আরাধনা করতেন। কিন্তু কালক্রমে যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ ও আচারসর্বস্ব হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, সাধারণ নরনারীগণ ঐ সকল ব্যয়বহুল ক্রিয়াকাণ্ডের সংযোগ ও সহযোগ হ'তেও ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। তার ফলে, বৈদিকোত্তর যুগে হিন্দুগণের উপাসনা-ধারা ধীরে ধীরে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'তে শুরু করে।

পুরাকালে বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের মধ্যে 'অশ্বমেধ-যজ্ঞ' ছিল অন্যতম। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের সুফলও ছিল অশেষ—সর্ব অরিষ্টনাশক, পরম মঙ্গলকর ও বিশেষ অভীষ্টপ্রদ। এজন্য ঐ মহাযজ্ঞের আবেদন এবং প্রসিদ্ধিও ছিল সর্বত্র। যা হোক, পণ্ডিতগণ অনেকেই মনে করেন, সেই প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞেরই বিকল্প অনুষ্ঠানরূপে 'শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা' ও 'নবরাত্র-ব্রত' প্রবর্তিত হয়। এ-বিষয়ে 'দেবীপুরাণ' (২২।২৩)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

'অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্বকামপ্রদায়িকা॥'

বস্তুতঃ, এই জন্যই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বিধি-পদ্ধতি, মন্ত্র-তন্ত্র, অনুষ্ঠানক্রম, উপচার-সামগ্রী সমস্তই ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময়। যেমন—কল্পারম্ভ, বোধন, আমন্ত্রণ-অধিবাস, জাগপ্রদীপ-রক্ষা, নবপত্রিকা অর্চনা, মহাস্নান, বিভিন্ন তিথিতে বিহিত বিশেষ পূজাসমূহ, কুমারীপূজা, সন্ধিপূজা, বলিদান, দীপমালা-উৎসর্গ, চণ্ডীপাঠ, হোম এবং আরও নানা সাড়ম্বর অনুষ্ঠান এই মহাপূজার অপরিহার্য অঙ্গ। এই মহাপূজার শুভ কল্পারম্ভ-কৃত্য কোথাও কোথাও চান্দ্র আশ্বিনের কৃষ্ণা-নবমীতে, কোথাও কোথাও শুক্লা-প্রতিপদে, আবার কোথাও কোথাও শুক্লা-ষষ্ঠী প্রভৃতি তিথিতে সূচিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শুভ কল্পারম্ভের দিবস হতে মহানবমী পর্যন্ত প্রত্যহ শ্রীশ্রীদুর্গার অর্চনা বিধেয়।

শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পূজা বৎসরে দুইবার—একবার চান্দ্র আশ্বিনে, আর একবার চান্দ্র চৈত্রে বিশেষ সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য শরৎকালীন পূজা 'শারদীয়া' এবং বসন্তকালীন পূজা 'বাসন্তী' দুর্গাপূজা নামে অভিহিত। বস্তুতঃ এই মহাদেবীর উভয় ঋতুরই পূজার্চনার যাবতীয় আচার-পদ্ধতি এবং আঙ্গিক প্রকরণসমূহ সর্বাংশেই প্রায় অভিন্ন। শারদীয়া মহাপূজা অকালে অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সময় দেবতারা নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। সেজন্য শারদীয়া পূজায় দেবীর 'বোধন' (জাগরণ) অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। কিন্তু বাসন্তী পূজায় উক্ত বোধন-কৃত্যের প্রয়োজন হয় না, কারণ দেবতারা ঐ কালে জাগ্রত অবস্থায় বিরাজ করেন।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, একই মহাপূজার অনুষ্ঠান উক্ত দুই ঋতুতে দু'বার প্রচলিত কেন? শরৎ ও বসন্ত ঋতু 'যমদংষ্ট্রা', অর্থাৎ যমের করাল দন্তরূপে চিহ্নিত। ঐ দুই ঋতু ইহজগতের প্রাণিকুলের দুর্গতিসাধন ও জীবননাশের বিচিত্র সম্ভার ও সম্ভাবনা নিয়ে আবির্ভূত হয়। তার ফলে, ঐ উভয় ঋতুতে চারদিকে অতি ব্যাপক আকারে নানা দুঃখ-দুর্ভোগ ও কঠিন পীড়াদির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। তাদের ভীষণ প্রকোপে সর্বত্রই অশেষ দুর্দশা প্রকটিত হয়, এবং অসংখ্য নরনারী ও জীবজন্তুর প্রাণনাশ ঘটে।

মানুষ নিজ বুদ্ধি ও শক্তিবলে পার্থিব প্রণালী-সমূহের দ্বারা ঐ ভীষণ মহামারী প্রতিরোধে অক্ষম হ'লে, স্বভাবতঃই সে তার প্রতিবিধানকল্পে দৈব-নির্ভর হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী সর্বদুর্গতিনাশিনী, সর্ব-সর্বার্থসাধিকারূপে প্রসিদ্ধা। আমাদের তন্ত্র-পুরাণাদি যুগযুগান্তর ধ'রে এই মহাদেবীর অপার করুণা ও অনবদ্য শক্তি-মহিমা কীর্তনে মুখর। সুতরাং আর্ত-পীড়িত-বিপন্ন নরনারী সমস্ত দুর্গতি-দুর্দশা ও মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে পরিত্রাণলাভের জন্য উল্লিখিত ঋতুদ্বয়ে এই মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। এ-প্রসঙ্গে দেবীভাগবত (৩।২৬।৫-৭)-এর অভিমত:

'শরদ্-বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।...
বসন্ত-শারদা বেব জননাশকরাবুভৌ॥
তস্মাৎ তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসি ভক্তিপূর্বং নরাধিপ॥"

যা হোক, বর্তমানে আমরা যে-সমস্ত বিধি-প্রণালী অনুসারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর পূজার্চনা করি, এ-সব আচার-পদ্ধতি এ দেশে বহু শতাব্দী ধ'রে অনুসৃত হয়ে আসছে। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন এই একই বিধি-প্রণালী অবলম্বনে অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরেরও পূর্ব হতে এ দেশে মৃন্ময়ী প্রতিমায় এই মহাপূজানুষ্ঠান প্রচলিত। বাংলাদেশ, মিথিলা, কামরূপ (আসাম) প্রভৃতির প্রাচীন স্মৃতি-নিবন্ধকার পণ্ডিতগণের গ্রন্থ-মালায় মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর (শারদীয়া ও বাসন্তী) অর্চনার বিস্তারিত বিধিক্রম লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। এজন্য মনে হয়, বৃহত্তর বঙ্গেই মৃন্ময়ী প্রতিমায় মহাদেবীর পূজার্চনার প্রচলন সর্বাধিক কারণ, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে ধাতু, প্রস্তর বা কাষ্ঠদ্বারা নির্মিত মূর্তিরই পূজানুষ্ঠান সর্বত্র লক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য অন্যান্য রাজ্যেও মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা ক্রমশঃ প্রসারলাভ করছে।

কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান, আমাদের এই মহাপূজার বর্তমান নিয়ম-প্রণালী শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদপ্রসূত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বঙ্গের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫০০-১৫৭৫ খ্রীঃ) শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরও বহু পূর্ববর্তী স্মৃতি-নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়।

বাংলার প্রাচীনতম স্মৃতি-নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট—যিনি একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি তাঁর রচিত স্মৃতি-নিবন্ধে এই মহাপূজার বিস্তারিত বিধি-ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর নিবন্ধে তিনি তাঁরও বহু পূর্ববর্তী জীকন, বালক ও শ্রীকর দত্ত প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতগণের বহু বাক্য উদ্ধৃত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, জীকন, বালক প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলার সেন রাজাদেরও পূর্ববর্তী। পণ্ডিত শূলপাণি (১৩৭৫-১৪৬০ খ্রীঃ)-কৃত 'দুর্গোৎসববিবেক', 'বাসন্তী-বিবেক', 'দুর্গোৎসবপ্রয়োগ'; জীমূতবাহন-কৃত 'দুর্গোৎসবনির্ণয়'; বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০ খ্রীঃ)-কৃত 'দুর্গোৎসবপ্রকরণ'; বিদ্যাপতি ঠাকুর-কৃত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১৪১৯ খ্রীঃ); রঘুনন্দন

ভট্টাচার্য (১৫০০—১৫৭৫ খ্রীঃ)-কৃত 'দুর্গোৎসব-তত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'; পণ্ডিত রামকৃষ্ণ-কৃত 'দুর্গার্চনকৌমুদী'; রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ ভট্ট-কৃত 'দুর্গোৎসববিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থে মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার বিধি-ব্যবস্থাদির সবিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেবীভাগবত, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ, আদি মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহেও এই মহাপূজার বিবরণী ও প্রসঙ্গ রয়েছে।

শ্রীশ্রীদুর্গার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসপটে মূর্ত হয় ত্রিনয়না, সিংহবাহিনী, মহিষ-মর্দিনী এক অপার মহিমান্বিতা দেবীর রূপ। তবে, তাঁর সমস্ত মূর্তির বাহুসংখ্যা সমান নয়। চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, ষোড়শ-ভুজা, অষ্টাদশভুজা—এমন কি শতভুজা দুর্গা-প্রতিমাও দেখা যায়। বঙ্গদেশে এই মহাদেবীর দশভুজা প্রতিমার আরাধনাই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। তা ছাড়া, ভগবতী দুর্গা এদেশে সপরিবারে পূজিতা। মনে হয়, এই আচারটি বাঙ্গালীর মাতৃবন্দনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ মহাদেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক প্রভৃতির সম্মিলিত অধিষ্ঠান আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক যৌথ জীবনযাত্রারই এক সুঠাম সুন্দর অভিপ্রকাশ। তত্ত্বতঃ ঐ দেব-দেবীগণ মহাশক্তি দুর্গারই অভিন্ন রূপ ও প্রকট বিভূতি।

মহাদেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁর পরিবারস্থ ঐ দেবতাগণের সন্নিবেশনায় একটি তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে। শ্রীদুর্গার দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে এবং বামপদ মহিষাসুরের স্কন্ধে স্থাপিত। তাঁর দক্ষিণে লক্ষ্মী ও গণেশ, বামে সরস্বতী ও কার্তিক এবং ঊর্ধ্বে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজিত। তাঁর দশ হস্তে দশপ্রহরণ শোভিত; পশুশক্তি ও দানব-শক্তির ঊর্ধ্বে তিনি স্বমহিমায় বিরাজিতা। অতএব মন ও প্রবৃত্তির পাশবিক ও আসুরিক স্তরসমূহ সর্বপ্রযত্নে অতিক্রম না করলে মহামাতৃকার শ্রীপাদপদ্মের সাযুজ্যরূপ সম্পত্তিলাভ কখনই সম্ভবপর নয়। মহাদেবীর শ্রীপাদপদ্মের সান্নিধ্য পেলে, সাধক সিদ্ধি-ঋদ্ধি, জ্ঞান-বীর্য ও পরম কল্যাণ লাভে সুচরিতার্থ হন। গণেশ সিদ্ধিদাতা, লক্ষ্মী ধনৈশ্বর্যদাত্রী, সরস্বতী জ্ঞান-দায়িনী, কার্তিক মহাপৌরুষ ও পরাক্রমের প্রতিভূ এবং শিব সদা মঙ্গলময়। অতএব ভাগ্যবান সাধক মহাদেবীর সন্দর্শন-কৃপা লাভ করলে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গফল প্রাপ্ত হন।

ভগবতী দুর্গার দশহস্ত দশদিকের প্রতীক। তিনি দশভুজে দশপ্রহরণ ধারণ ক'রে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। অশুভ শক্তিগুলিই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধির ঘোর অন্তরায়। ঐ আয়ুধসমূহ দ্বারা মহাদেবী সমস্ত আসুরিক উপদ্রব ও অশুভ বাধা বিনাশ করেন। তাঁর করপল্লবে শোভিত ঐ তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্রগুলি অসুর-কুলের নিকট নিদারুণ ভীতিসঞ্চারক, কিন্তু শরণাগত আশ্রিত সন্তানগণের নিকট পরম অভয়প্রদ—'দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তনামভয়ায় চ।'—চণ্ডী

মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী তত্ত্বতঃ মহাসত্ত্বশক্তি ও সমূহমূর্তি। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রমুখ দেবতাগণের সম্মিলিত তেজ ও শক্তিতেই তাঁর মহাবির্ভাব এবং তাঁদের প্রদত্ত অমোঘ আয়ুধসমূহ তাঁর শ্রীকরপল্লবে পরিশোভিত। তিনি সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তিসমন্বিতা। আমরা সেই সর্বেশ্বরী মহাদেবীর শরণাগত।

'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥'

—চণ্ডী

ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব

ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা সমন্বয়ধর্মিতা। ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এর প্রমাণ সুস্পষ্ট। অশনে, বসনে, ভাষায়, ধর্মাচরণে —এককথায়, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সমন্বয়ধর্মী ক্রিয়াকলাপ অতি প্রত্যক্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে তাই আত্মীকরণের ইতিহাস বলা হয়। পরম উদারতায় ভারতবর্ষ বহিরাগতদের বহু কিছু গ্রহণ করেছে এবং কালক্রমে সে সবকিছুই তার আপন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিকতা এই চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নীলাচলের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথ। পুরীর মন্দিরে তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আছেন বলরাম এবং সুভদ্রা। মূর্তিত্রয়ীর উপাদান, অবয়ব, বেশভুষা, দৈনন্দিন অর্চনারীতি, এঁদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব এবং রথযাত্রা, সবকিছুই বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। হিন্দুদের অগণিত তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে নীলাচল অন্যতম—এই বক্তব্য কিন্তু অসম্পূর্ণ। জৈন বা বৌদ্ধতীর্থ, শৈব বা শক্তিতীর্থ—এ ধরনের কোন একটি সংজ্ঞার পরিধিতে নীলাচলকে পাওয়া যায় না। এর মধ্যে এমন একটি সমন্বয়ধর্মিতা অনুস্যূত হয়ে আছে, যা অন্য কোন তীর্থক্ষেত্রে নেই। ফলে এই তীর্থে এলে, ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শটি সন্ধানীর চোখে সুস্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, এই মূর্তিত্রয়ীর পরিকল্পনাসূত্র খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত আপন আপন ঐতিহ্যধারার মানদণ্ডে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। বৌদ্ধদের মতে তিনটি মূর্তি বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের প্রতীক। জৈনদের অভিমত হোল মূর্তিত্রয়ী মূলতঃ সম্যক্‌জ্ঞান, সম্যক্‌চরিত এবং সম্যক্‌দৃষ্টিরই প্রতীক। ব্রাহ্মণ্য ধর্মমতের দিক থেকে ব্যাখ্যা হোল, এঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরই প্রতিভূ। এই ব্যাখ্যায় যাঁরা পরিতৃপ্ত নন তাঁরা বলেন, কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর পাণ্ডবেরা তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলে দেখা গেল যে অগ্নিতে শুধু হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় ভস্মীভূত হয়েছে। সেই অবস্থায় দেহটিকে সমুদ্রে বিসর্জন দেবার দৈবাদেশ শ্রুত হয় এবং পাণ্ডবেরা সে আদেশ পালন করেন। এরপর দৈবাদেশ শ্রুত হয় যে কৃষ্ণ দারুব্রহ্মের মূর্তিতে আবির্ভূত হবেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দারুভূত কৃষ্ণ এবং সঙ্গে আছেন দারুভূত বলভদ্র ও ভগিনী সুভদ্রা। নীলাচল এঁদের কাছে দ্বারকারই দোসর।

দেবদেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য থাকার ফলেই তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা আবিষ্কারে একদিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা অন্যদিকে চিন্তাশীল ঐতিহাসিকেরা বহুদিন থেকেই ব্রতী হয়েছেন। কিছু সমাজতত্ত্ববিদ্‌ ভক্তিমার্গীয় এবং যুক্তিমার্গীয় ব্যাখ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও করেছেন। আশার কথা, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু গবেষণা হয়েছে এবং এখনো চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাবো।

উড়িষ্যার ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাঁরা গবেষণায় ব্রতী ছিলেন তাঁদের মধ্যে সদ্যপ্রয়াত কুমারী Dr. A. Eschmann নাম্নী জার্মানতনয়ার স্মৃতিতর্পণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ South Asia Institute এর পক্ষ থেকে ইনি উড়িষ্যায় এসেছিলেন এবং অচিরেই ভাষা, বেশভুষা

এবং আচরণে নিজেকে 'উড়িষ্যার কন্যা'য় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, 'The Cult of Jagannath and the Regional Tradition of Orissa'। অতি অল্প বয়সে এই গবেষকের মৃত্যু উড়িষ্যার সুধী-সমাজকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে এবং তাঁর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি তহবিল গঠন করে শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্মৃতি-বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইতিহাসাশ্রিত একটি কাহিনী আছে। সেটি হোল এই যে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শবর উপজাতি কর্তৃক কোন এক দেবমূর্তি পূজিত হতেন। সেই দেবতার নাম বা আকৃতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। মাথারা রাজবংশের উদ্ভব ঘটে আনুমানিক চতুর্থ শতকের শেষার্ধে। এই রাজবংশীয়েরা 'মহারাজ' আর 'কলিঙ্গাধিপতি' উপাধি ব্যবহার করেন। এই রাজবংশেরই কোন এক রাজা শবরদের দেবতাকে নিয়ে আসেন এবং 'স্বয়ম্ভূ' বা নারায়ণ রূপে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে উড়িষ্যার দক্ষিণকূলবর্তী অঞ্চলে শৈলোদ্ভব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মাথারা রাজবংশের দেবতাও হস্তান্তরিত হন। শৈলোদ্ভব বংশও দেবতাটিকে 'স্বয়ম্ভূ' নামেই চিহ্নিত করেন। পরবর্তী কালে উড়িষ্যায় সোমবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশীয় রাজা যযাতিকেশরী পুরী ও ভুবনেশ্বরে দেবমন্দির নির্মাণ করেন ও পুরীতে জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী রাজবংশ গঙ্গ। গঙ্গবংশীয় রাজা দেবেন্দ্র বর্মা ও তাঁর চোলববংশীয়া রানী সুন্দরীর পুত্র অনন্ত বর্মা আপন নামের সঙ্গে 'চোলগঙ্গদেব' বা চোড়গঙ্গদেব উপাধি সংযুক্ত করেন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ১০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে পুরীর ভগ্নপ্রায় মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করে বর্তমান রূপ দিয়েছিলেন রাজা অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গদেব। এরপর উল্লেখ্য অনঙ্গভীমদেবের নাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দৈনন্দিন কাজকর্মের নিয়মাবলী ইনিই রচনা করেন এবং দেবতার প্রতিভূ হিসেবে রাজ্য শাসন করেন।

আনুমানিক অষ্টম শতকে রচিত স্কন্দ পুরাণের মধ্যে পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য অংশে কথিত আছে যে শ্রীশ্রীজগন্নাথই বিষ্ণু-কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-বাসুদেব। দ্বাদশ শতকে কবি জয়দেব গোস্বামী জগন্নাথদেবকে কৃষ্ণের সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই মতেরই সমর্থক।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের হস্তান্তরণ ও রূপান্তরণ একই সঙ্গে সঙ্ঘটিত হয়েছে। কোন কোন গবেষকের ধারণা এই হস্তান্তরণ-ধারার আদিপর্বে মূল দেবমূর্তি ছিলেন নীলবর্ণের একটি শিলাখণ্ড। শবর উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন শিব। হস্তান্তরণের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর 'নীলমাধব' নামও পাওয়া যায়। অনুমিত হয় যে, এই সময় শিবপরিকল্পনা কৃষ্ণচেতনায় রূপান্তরিত হয়। একথা প্রায় সবারই জানা যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে 'ভৈরব' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। অতএব এই বিবর্তনের পথ বেয়ে যে দেবতা চূড়ান্ত পর্যায়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবরূপে চিহ্নিত হলেন, আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ভারতবর্ষে তিনি দোসরহীন। দারুনির্মিত, অসম্পূর্ণাঙ্গ এক অভিনব আকৃতির দেবতাত্রয়ী জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারাকে স্বাঙ্গীকরণ করেছেন। ভারতবর্ষীয় হিন্দুধর্মাশ্রিত এই ত্রিবেণীসঙ্গমে ভারতীয় সংশ্লেষণমূলক চিন্তা-ধারারই প্রতীকরূপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা প্রতিষ্ঠিত। এঁদের মধ্যে আবার জগন্নাথ-দেবকে সূর্যদেবতা কল্পনা করেছেন কোন ভক্ত-দার্শনিক, পঞ্চদেবতার সমাহার দেখেছেন কেউ কেউ, কেউ বা এঁদের বলেছেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের প্রতীক।

আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া মূর্তিনির্মাণে কাষ্ঠখণ্ডের ব্যবহারটিও গবেষণার উপযুক্ত বিষয়। কথিত আছে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ড থেকে দেবমূর্তি নির্মাণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা এবং আরাধনার আদেশ পান স্বপ্নে। যথাকালে সমুদ্র-তীরে বিরাট কাষ্ঠখণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু দেবমূর্তি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন সুদক্ষ সূত্রধরের সন্ধান পাওয়া গেল না। দৈবাদেশ কার্যকরী করার উদ্দেশ্যেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সূত্রধরের মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন এবং তিন-সপ্তাহের মধ্যে দারুদেবতা নির্মাণের ভার নিলেন। তাঁর শর্ত রইল, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে দেবতা নির্মাণের কালসীমার মধ্যে কেউই তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজী হলে ছদ্মবেশী সূত্রধর দ্বার রুদ্ধ করে কাজ শুরু করলেন। প্রথম কয়েকদিন বাহির থেকে কাজ-কর্মের সাড়া পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে তা মৃদু হয়ে এসে এক সময় সবটুকু স্তব্ধ হয়ে গেল। রানী গুণ্ডিচার প্রবল আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মন্দিরের দরজা খোলা হোল এবং দেখা গেল যে, তিনটি মূর্তিই অসমাপ্ত রেখে সূত্রধর অন্তর্হিত হয়েছেন। সেই থেকে ঐ অসম্পূর্ণাঙ্গ মূর্তিত্রয়ীকেই তাঁদের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং কলেবর পরিবর্তনের সময় মূল আকৃতির অনুকরণই স্বীকৃত হয়ে আসছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিবর্তনধারাটি স্বীকার করে নিলে তাঁর সঙ্গে শবর বা ঐ শ্রেণীর উপজাতিদের মৌলিক সম্পর্কটিকেও স্বীকার করে নিতে হয় প্রকৃতপক্ষে এই দেবতাত্রয়ীর বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়ের সম্পর্কটি নিবিড়।

উপজাতি সম্প্রদায়ের দেবদেবী পূজার মধ্যে মূর্তির স্থান নেই। গাছ, পাথর বা কাষ্ঠখণ্ড এ সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতীক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে—দেবতার আদেশ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শোনা যায় আবিষ্ট কোন নর বা নারীর কণ্ঠস্বরে। অপরপক্ষে হিন্দুদের ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত উপাসনা অজস্রপ্রকার মূর্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এই সব মূর্তির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নেই। প্রকৃতপক্ষে মূর্তিতে ত্রুটি থেকে গেলে বা কোন প্রকারে খুঁত সৃষ্টি হলে, সে মূর্তিকে পূজার অযোগ্য বলেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আসলে মূর্তিতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে সুনির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে তাঁর পূজাই বিধি। কোন-প্রকারে অঙ্গহানি ঘটলে সে মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ওঠে না। এ দিক থেকে বিচার করলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাত্রয়ীর মূর্তি পরিকল্পনায় উপজাতি সম্প্রদায়ের পূজাবিধির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী পূজাবিধির সমন্বয় সহজেই চোখে পড়ে।

কাষ্ঠখণ্ডকে দেবদেবীর প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও তার অর্চনার ধারা উড়িষ্যার উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচলিত। মাঝে মাঝে এগুলির পরিবর্তন (নব কলেবর)-ও করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'কন্ধ' উপজাতির দারুদেবীর কথা বলা যায়। একটি সাধারণ গৃহের মধ্যে পুঁতে রাখা কাঠের একটি খুঁটিকে তারা দেবীর প্রতীক বলেই শ্রদ্ধা জানায়। অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোন এক সময় স্বপ্নে প্রতীক পরিবর্তনের আদেশ দেন এবং প্রয়োজনীয় বৃক্ষটি কোথায় পাওয়া যাবে তার ঠিকানাও জানিয়ে দেন। ঢাক ঢোল বাজিয়ে সেই বিশেষ গাছটি কেটে এনে খুঁটি বানানো হয়, পুরোনো খুঁটি সরিয়ে এবং গর্তটি ভাল করে সাফ করে নিয়ে তার মধ্যে নতুন খুঁটি বসিয়ে দেওয়া হয়। নতুন খুঁটি বসানোর আগে গর্তের মধ্যে পঞ্চধাতুর (সোনা, রূপা, লোহা, তামা ও পেতলের) ছোট ছোট টুকরো ফেলে দেবার রীতি আছে। নতুন খুঁটি বসানোর পর তার সামনে

কখনো কখনো মহিষ বলি দেওয়া হয়ে থাকে। এই দারুখণ্ডকে বলা হয় 'খম্বেশ্বরী'।[১]

উড়িষ্যার শোনপুর অঞ্চলে দুমল উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীর প্রতীক হিসেবে দারুনির্মিত খুঁটি বা থামের পুজো প্রচলিত আছে। শবরদের মধ্যেও 'খম্বেশ্বরী' পুজোর প্রচলন যথেষ্ট প্রাচীন। দুমলরা বলে 'বাড়ি'[২] পুজো। এই 'বাড়ি' পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তন-উৎসব কন্ধ উপজাতিদের মতই বিশদ। কন্ধ এবং শবর সম্প্রদায় যখন নতুন দারুদেবীকে প্রতিষ্ঠা করে তখন আবার ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের ডেকে আনে। তাঁরা পুথি থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে পুরাতন দারুদেবীর বিসর্জন এবং নতুন দেবীর আবাহন অনুষ্ঠানটি নিষ্পন্ন করেন। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজামন্ত্র-সংবলিত যে সব মুদ্রিত পুস্তিকা ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে 'বনদুর্গার' পূজামন্ত্রই উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট গাছটিকে সনাক্ত করা, বিশেষ উপায়ে সেটিকে কাটা, বয়ে আনা, পীঠস্থানের কাছেই অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে সূত্রধর কর্তৃক খুঁটিটিকে বানানো এবং সেটিকে যত্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি আদ্যন্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের অন্ত নেই। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবর অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐগুলিরই বর্ধিত এবং কোথাও কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। আয়তনগত এই পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। কালক্রমে বাহুল্য এবং বর্ণাঢ্যতা নবকলেবর উৎসবটিকে যতই বৈশিষ্ট্য দান করুক না কেন, উপজাতি ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই সমন্বয়ধর্মী রূপটি ভারতীয় ঐতিহ্যের মৌলিক চরিত্রটিকেই স্পষ্টতর করে তোলে। খুঁটিনাটির বিচারে কন্ধ বা দুমলদের দারুদেবীর কলেবর পরিবর্তনের সঙ্গে পুরীধামের দেবতাত্রয়ীর নবকলেবর অনুষ্ঠানের রীতিগত পার্থক্য মোটেই বেশী নয়। উপজাতি সম্প্রদায় নতুন কাষ্ঠখণ্ড গর্তের মধ্যে স্থাপন করার পূর্বে বিভিন্ন প্রকারের ধাতুখণ্ড তার অভ্যন্তরে স্থাপন করে, এদিকে পুরীর দেবতাত্রয়ীর দারুদেহের মধ্যেই ধাতুখণ্ড 'ব্রহ্মপদার্থ' রূপে সংগুপ্ত থাকে। কলেবর পরিবর্তনের সময় নবমূর্তির মধ্যে ঐ ব্রহ্মপদার্থ স্থানান্তরিত হয়।

উড়িষ্যার তালচের অঞ্চলে গোপালপ্রসাদ নামক স্থানের হিঙ্গুলাদেবীর পুজোও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যায়। পুরীতে যে হিঙ্গুলাদেবী আছেন গোপালপ্রসাদবাসিনীকে তাঁরই সহোদরা বলা হয়ে থাকে। এখানেও দারুদেবীর পুজো হয়। তবে এই দারুনির্মিত খুঁটিকে হিঙ্গুলাদেবীর প্রতীক না বলে বনদুর্গা খম্বেশ্বরী বলেই পুজো করা হয়। তালচের রাজবংশ এই দেবীগণের প্রতিষ্ঠাতা। রাজবংশে নতুন বংশধর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে বনদুর্গার কলেবর পরিবর্তন হয়। নবকলেবরের প্রতিষ্ঠা করেন রাজবংশের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিন্তু তাঁর আরাধনার ভার থাকে উপজাতীয় পূজক 'দেহুরী'দের ওপর। নবকলেবর প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'কালিসী'র (যার ওপর দেবী ভর করেন) মুখ দিয়ে দেবী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নতুন শাসকের ভবিষ্যৎ বর্ণনা করেন। শোনপুর অঞ্চলেও শামলেশ্বরী (ভুবনেশ্বরী), খম্বেশ্বরী (দুর্গা) এবং সুরেশ্বরীর (দক্ষিণাকালী) পুজো বিখ্যাত। এই তিনটি মন্দির সংলগ্ন একটি বেদীতে দারুদেবী পৃথক্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দারুদেবীর কলেবর পরিবর্তনের অনুষ্ঠান পুরীর অনুষ্ঠানের প্রায় সমান্তরাল।

শবরদের পূজিত দেবতা তাঁর প্রাকৃতিক পীঠস্থান পরিত্যাগ করে কয়েক শতাব্দী পরে পুরীর মন্দিরে

১ কাঠের মোটা খুঁটি। 'খম্বাখানা'=হাতি বাঁধার খুঁটি। (Dr. Sukumar Sen : An Etymological Dictionary of Bengali, Vol. I, p. 181)

২ লাঠি (Ibid. Vol II, p. 635)

এসে কীভাবে নবরূপ ও ভাব অঙ্গীকার করে প্রতিষ্ঠিত হলেন তার বিশদ বিবরণ না পাওয়া গেলেও প্রাপ্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতে হারিয়ে-যাওয়া অধ্যায়গুলিকে অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। বিভিন্নতার বহুমুখী ধারা পুরীর মূর্তিত্রয়ীর মধ্যে যে ঐক্যমুখীনতা পেয়েছে এবং এই আদর্শই যে ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলধর্ম, বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দিষ্ট বক্তব্য ঐ একটিই। সর্বশ্রেণীর হিন্দু নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্রও প্রাধান্য না দিয়েই পুরীর মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভোগ গ্রহণের সময় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দেন না। বাৎসরিক রথযাত্রাকে উপলক্ষ করে দেবতাত্রয়ীর মূর্তি মন্দিরের বাইরে এনে উচ্চ রথের ওপর স্থাপন করে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকেই দর্শনের সুযোগ প্রদান করা হয়। তাঁরা রথরজ্জু স্পর্শ করে দেবতার স্পর্শই লাভ করেন—এই সব তথ্য অসামান্য সমন্বয়ধর্মিতারই সাক্ষ্য বহন করছে। নীলাচলের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাংবাৎসরিক উপাসনা সংক্রান্ত রীতিনীতির মধ্যে উপজাতীয়, ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের যে সংমিশ্রণ ঘটেছে এ বিষয়ে জগন্নাথ-দর্শনের আলোচকেরা মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই সংমিশ্রণের পটভূমিতে যে ধর্মীয় উদারতা রয়েছে সেইটিই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক বলা সঙ্গত।

শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলেই তাঁর মহামূল্যবান জীবনাংশ অতিবাহিত করেছেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পর প্রথমতঃ বৃন্দাবনের প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরে তিনি নীলাচলের জন্যই আকুল হয়ে ওঠেন। পুত্র নীলাচলে এসে বসবাস করুক, এতে শচীমাতারও সম্মতি ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় কবিরাজ গোস্বামী শচীদেবীর বক্তব্য শুনিয়েছেন—

* * *

নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়॥
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে দুই ঘর।
লোকগতাগতি বার্ত্তা পাব নিরন্তর॥

এর পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের মুখে শুনি—

আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি তোমা সবায় দিব দরশন॥

পরম পণ্ডিত দূরদর্শী এই সন্ন্যাসী সমগ্র দক্ষিণভারত পরিভ্রমণ করে এসে ভারতবর্ষীয় ধর্মচিন্তার পটভূমিতে নীলাচলের বৈশিষ্ট্যটি অভ্রান্তভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি যে প্রেমধর্মের উদ্গাতা তার যথোচিত পুষ্টি ও প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে নীলাচল যে অনন্য এ বিষয়ে তিনি সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তিতে তিনি নিখিল মানবের ভক্তি ও প্রেম প্রত্যক্ষ করে বিমোহিত এবং ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। মূর্তিত্রয়ীর পরিসীমায় ভূমাকেই শ্রীচৈতন্যদেব অনুভব করেছিলেন। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের এই অন্তরঙ্গ রূপটিই যে তাঁকে আকর্ষণ করে এনেছিল এ সত্য অনস্বীকার্য। ক্ষেত্রাধিপতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্যদেব তাই আত্মনিবেদন করে বলেছিলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি
নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি-
র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমা-
নন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়ো-
র্দাসদাসানুদাসঃ।
(চৈ. চ., মধ্যলীলা)

আজও ভক্তকণ্ঠের আকুতি শ্রুত হয়—

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপারাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র

ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও সার্থকতা

রবীন্দ্রদর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য কি, সার্থকতাই বা কিসে? বিচিত্রের মধ্যে অবস্থান করিয়া মর্মগত ঐক্যবোধের দ্বারা সমগ্র জীবনকে পরমলক্ষ্যমুখীন করিয়া তোলাই শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষার বিচিত্র বিষয়, এমন কি তার অবলম্বনও, আপাত-বিরুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু সেখানেও সামঞ্জস্য-রচনার গুণে জীবিকা ও জীবনকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্যদান করিতে পারে একমাত্র অধ্যাত্ম শক্তি—কেবলমাত্র শারীরিক প্রাকৃতিক বা মানসিক শক্তিই নয়। শিক্ষাক্ষেত্র আশ্রম তথা বিদ্যাপীঠের জীবন-সাধনায়ই ঐ শক্তি-লাভ সহজলভ্য হইতে পারে। কারণ ঐক্য-শক্তির নিয়ন্ত্রণে অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্য-রচনার দ্বারা শক্তিলাভই ঐ শিক্ষার মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বহু বিচিত্রের পথে ওই শক্তির স্ফুরণকেই শিক্ষাজীবনে সহজ ও স্বভাবসঙ্গত রূপে অগ্রসর দেখিতে চাহিয়াছেন। কারণ 'মানবজীবনের সেই পরমলক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই।'[১]

শিক্ষালাভের এই গভীরতম বা উচ্চতম লক্ষ্যমুখী সোপান-বিন্যাসটি কিরূপ :

'ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানযোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

'এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যে বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

'অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই বোধের সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবর্ষের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।'[২]

স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে এই শিক্ষার মৌল পার্থক্য কোন্‌খানে সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা :

'আমাদের স্কুল কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা, বোধের তপস্যা নয়। জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে একঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক—তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।'[৩]

'বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না। সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। যে জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে

জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

'এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয়, তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনে স্কুল কলেজে জ্ঞানের ও মনের তপস্যার স্থান আছে, এবং তার কিছুটা মূল্যও আছে, কিন্তু সেই মূল্যবোধে শিক্ষার পরম-লক্ষ্যমুখিতা নাই। অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা মানসিক বা Mental মাত্র, ইহার কাজ শুধু বুদ্ধি-দ্বারা বোঝা—বোধদ্বারা গ্রহণ করা নয়—ইহা Understanding, Realisation নয়। কিন্তু আশ্রমের তপস্যা হইল বোধের বা 'রিয়ালাই-জেশন'-এর তপস্যা, তাই শেষপর্যন্ত ইহা অধ্যাত্ম বা 'স্পিরিচুয়াল'। সংক্ষেপে প্রথমটি মূল লক্ষ্যচ্যুত বলিয়া অবিদ্যা, দ্বিতীয়টি মূল লক্ষ্যমুখী বলিয়াই বিদ্যা

'We have come to this world to accept it not merely to know it. We may become powerful by knowledge but we attain fulness by sympathy. The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence.'[৪]

'মানুষের জীবনে চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বর্তমান যুগ কিছুকালের জন্য বিস্মৃত হয়েছে বলেই যে সে প্রাচীন যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তাকে পুনর্বার বুঝতে হবে তার সেই প্রয়োজন আছে এবং তাকে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আত্মার সেই প্রয়োজনবোধই আশ্রমকে আশ্রয় করেছে…।'[৫]

মানুষের জীবনে আত্মার অসীম ক্ষুধা মিটাইবার লক্ষ্যে যে আয়োজন সেখানেই শিক্ষা-প্রণালীর সার্থকতা। আমাদের জীবনের একট দিক সীমাবদ্ধ এবং সেখানে পদে পদে আমরা নিঃশেষিত, তেমনি আর একটা দিকও আমাদের জন্য চিরমুক্ত রহিয়াছে—সেখানে আমাদের আদর্শবোধ ও আকাঙ্ক্ষা, আমাদের আনন্দ ও ত্যাগ অসীমেরই দিশারী ; সেখানে বদ্ধ জীবনের ক্ষুদ্র ভোগের দিকটি একেবারেই নিরর্থক। কারণ, মৈত্রেয়ীর এই চেতন-বাণীই সেখানে নিরন্তর ঘোষিত হয়—'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিম্ অহং তেন কুর্যাম্।'[৬] কাজেই এই চেতনায় মানুষ কি করে ? সে তুচ্ছ ও জীর্ণ উপায়-অবলম্বন ত্যাগ করিয়া এক আদর্শ জীবন রচনা করিতে চায় এবং সেই জীবনের জন্য যে মৃত্যুতরণ উপাদানগুলি প্রয়োজন তাহাই তাহার একমাত্র আশ্রয়। একটি পূর্ণ আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়াই যে অমরত্বের অর্থাৎ অমৃতত্বের সন্ধান লাভ সম্ভব সে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারে। সে তাই এই মর্ত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আত্মোপলব্ধির দ্বারাই সেই অমৃত জীবনকেই উৎসারিত করিতে থাকে :

'Therefore it refuses all that is flimsy and bubble and incongruous. It builds for its dwelling a paradise, where only those materials are used that have transcended the earth's mortality.

'For men are the children of light, whenever they fully realise themselves they feel their immortality. And, as

they feel it, they extend their realm of the immortal into every region of human life.'[৭]

স্বতঃই একটি গুরুতর প্রশ্ন জাগে : তবে কি জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জৈবিক দাবী থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন সূত্রেই এই অমৃতের সন্ধান, এই লক্ষ্যাভিমুখিতা ? না, মানবজীবনের বিচিত্র অভিপ্রকাশের মধ্য দিয়াই তাহার পূর্ণতার সন্ধান ও অমৃতত্বের অধিকার সম্ভব, এবং ইহাই তাহাকে কথাশ্রয়ী সুরের মতো মুক্তির দিকে উৎসারিত করিয়া তোলে, বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতার বোধ ও বোধির মাধ্যমেই সর্বথা ঐক্যশক্তিকে লাভ করিয়া সে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সম্ভাবনাকে মুক্তি দিতে হইবে, কিন্তু ইহাকে শেষ পর্যন্ত আত্মিক বা অধ্যাত্ম শক্তির দিকে যুক্ত করিতে না পারিলে বোধলাভ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শারীরিক বা মানসিক বা এমন কি কেবলমাত্র অধ্যাত্মশিক্ষাও সর্বাঙ্গীণ নয়, বরং আংশিক বলিয়াই বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র বলিয়াই অসম্পূর্ণ। আমাদের ইংরাজী শিক্ষা এই বিচ্ছিন্নতার ও বৈষম্যের জন্যই সচেষ্ট, এবং মূললক্ষ্যহীন বলিয়াই ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন মানবসভ্যতার প্রথমদিকে প্রাচীনকালে মানুষের জীবন দেহে-মনে ও আত্মোপলব্ধিতে ঐক্যময় ছিল, কিন্তু কালক্রমে ঐ প্রথম, দ্বিতীয় স্তরের স্ফীতিদৌরাত্ম্যে তৃতীয় স্তরের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে।

'The object of Education is to give men the Unity of truth. Formerly when life was simple all the different elements of man were in complete harmony. But when there came the separation of the intellect from the Spiritual and the Physical, the School education put entire emphasis on the intellect and the physical side of man. We devote our sole attention to giving children information, not knowing that by their emphasis we are accentuating a break between the intellectual, physical and the spiritual life.'[৮]

—অর্থাৎ আমাদের ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাজীবন ও সমাজজীবনে পরিকল্পিত ব্যবধান বর্তমান। এই বিচ্ছিন্নতার অর্থাৎ ঐকমুখিতার ও পরম লক্ষ্যমুখিতার অভাবেই শিক্ষা জীবনসাধনার বিষয় হয় না, হয় জীবনধারণের উপায় মাত্র। রবীন্দ্রদর্শনে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যর্থতা এই জাগতিকতায়—প্রাকৃতিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতায়ই। অর্থাৎ এই পথে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রতিযোগিতায় জয়ের পর জয়ের ভূমিকার পরেও বারংবার ঐ একই প্রশ্ন থাকিয়া যায় – 'ততঃ কিম্।'[৯]

আবার অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সচল অধ্যাত্মশিক্ষার সঙ্গে যে প্রাকৃতিক শারীরিক মানসিক যোগাযোগটি সহজ ছিল, তাহারও সম্যক্ অভাব ঘটিয়াছে বর্তমান ভারতের স্তব্ধগতি এক জীবনধর্মচ্যুত আধ্যাত্মিকতার বৈরাগ্যে। অধ্যাত্মজীবন [Spiritual life] এখানে ধী-জীবন [Intellectual life] এবং জৈবিকজীবন [Physical life] হইতে স্খলিত,—অপভ্রষ্ট। অথচ ভারতের ঔপনিষদীয় অধ্যাত্মবাণীতেই আছে সর্বাঙ্গসাধনার সর্বার্থক সাধনার পথনির্দেশ :

'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥'[১০]

কাজেই সর্বকালের প্রয়োজনেই আমাদের জীবন পরিবেশ ও উপাদানের মধ্য দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করুক, নিভৃত অসীম প্রাণ-স্পর্শাঘাতে আমাদের

জীবন বীণাযন্ত্রের মতোই তাহার সঙ্গীত উৎসারিত করিয়া তুলুক। কারণ পরিপূর্ণভাবে জীবনধারণ করিলেই জীবনোত্তরণ সম্ভব—'only by living life fully you can outgrow it.'[১১]

'বিষয়ের সেবা ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়।'[১২]

জাগতিকতার তথা বৈষয়িকতার আপাত-বিরুদ্ধ সোপান বাহিয়াই আধ্যাত্মিকতার আনন্দমার্গে আরোহণ করিতে হয় ব্যবহারিকতার মাধ্যমেই চারিত্রিকতাকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিতে হয়। ইহা ঔপনিষদীয় নজিরেই পাশ্চাত্যের চারিত্রিকতার সঙ্গে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মিলনে আধুনিক যুগের নব শিক্ষাদর্শনের রবীন্দ্রবাণী

২। ছাত্রজীবনে শিক্ষাসাধনা

জাগতিকতার ভিত্তি-স্তর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজন[১৩] মনে করিলেও পাশ্চাত্যসুলভ প্রণালীসর্বস্ব কোনো অভ্যাসে পারদর্শী হওয়াটা রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ছিল শিক্ষারই স্বভাব-বিরোধী। স্বপ্রকাশের স্বাধীন ও স্বকীয় রীতিতেই শিক্ষার অনুকূল অগ্রগতি সম্ভব, কারণ অবাধ পরিবেশেই মন ছাড়া পাইতে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু অবাধ প্রকাশে মনের স্বাধীনতা দান করায় ঝুঁকি আছে বিরাট, বিশেষত নবীন শিক্ষার্থীর জীবনে। স্বভাবের ঝোঁক যেদিকে, সেদিকে ঝুঁকি তো থাকিবেই। দায়দায়িত্ব থাকিবে না, অথচ মন তথা জীবন গড়িয়া উঠিবে এমন নিরীহ পাকা পথ এবং ফাঁকা পথ জীবনের নয়।

'I for my part believe in the principle of life, in the soul of man, more than in methods I believe that the object of education is the freedom of mind which can only be achieved through the path of freedom, though freedom has its risk and responsibilities as life itself has.'[১৪]

আসলে, মানুষের আত্মিক শক্তির সহজাত ও স্বভাবসঙ্গত প্রকাশে অটল বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের, --বিশেষত শিশুজীবন সম্পর্কে ইহা তো নির্বিরোধ সত্য। সেইজন্যই নিজের বিদ্যাশ্রমে শান্ত সুবোধ ছাত্রদেরকেই তিনি স্থান দেন নাই, বরং ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে সব ছাত্রকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন প্রচলিত নৈতিক বা চারিত্রিক ধারণামতো তাহারা সুবোধ-সুশীল নয়, এবং গৃহীত মান-বিচারে প্রথম শ্রেণীর কোনো বিদ্যাপিপাসু তো নয়ই, 'আদর্শ ছাত্র' -এর প্রচলিত আভিধানিক নজিরে তাহারা দাঁড়ায় না।[১৫] কিন্তু নির্দিষ্ট ছাপ মারিয়াই মানুষকে জানিলে, এবং তাহাও কেবল বাহির হইতে জানিলে, তাহাকে সেইখানেই শেষ করিয়া ফেলিয়া মনুষ্যত্ববিরোধী অসত্যেরই বশ্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে অবশ্য নির্বিবাদে কাজ চালাইবার সুবিধা বেশি, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা সৃষ্টিরই চিরবিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ন্যায় ও অন্যায়ের, ভালো ও মন্দের স্থির দুই বিরুদ্ধ দণ্ডের বা মার্কামারা মাপকাঠিতে ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের নব নব সম্ভাবনা-উন্মুখ স্বাধীন সত্তাকে তথাকথিত শিক্ষকের ঠুলিচক্ষে সঙ্কুচিত দেখেন নাই, —প্রেমিকের চোখে তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, স্নেহে-ক্ষমায় গ্রহণ করিয়াছেন, আদর্শ সহৃদয় শিক্ষকের সহায়তায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাই তিনি আদর্শ-বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া ব্যথিত হইলেও বিক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হন নাই। যেসব ছাত্র অধিকাংশ অধ্যাপকের মতেই বহিষ্কারযোগ্য তাহাদের ব্যক্তিত্বকেও স্পর্শ করিয়া তিনি তাহাদের স্ব-পথে

ফিরাইয়াছেন, ইহাদের অনেকেই কালে কৃতী হইয়াছেন। ছাত্রজীবনে শিশুসুলভ আচরণকে তিনি বৃদ্ধের বা নীতিবাগীশ শিক্ষাদাতার চক্ষে দেখেন নাই, এবং ক্ষেত্রমতো সমুচিত শিক্ষাদানের জন্যও উৎসাহবোধ করেন নাই। কারণ, তিনি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকেই আগুপিছু ছাড়াইয়া দেখিতে পারিতেন এবং শিশুজীবনকে একটা গণ্ডীটানা অর্থাৎ গতিহীন ও পরিবর্তনবিমুখ চূড়ান্ত অবস্থা বা অচলায়তন কিছু বলিয়া মনে করিতেন না। আপনার শিক্ষকজীবনে ইহার বহু দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

একবার এক শৃঙ্খলা-তৎপর ও কৃতী প্রধান-শিক্ষকের [নাম : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়] অভিযোগ ছিল ছাত্রদের যদৃচ্ছা অর্থাৎ খুশিমতো চলাফেরা, পড়ার ব্যাপারে—বিশেষ করিয়া এমনকি গাছে চড়িয়া পড়াতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যাপারটাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার পরিচয় মনে না করিয়া তাহাদের বয়সোচিত অভিনবত্ব ও প্রাণ-চাঞ্চল্যকে সমর্থনই জানাইয়াছিলেন[১৬],—প্রধান-শিক্ষকের জ্ঞানবৃদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বরং ছাত্রদেরকেই সমর্থন করিয়াছিলেন। এবং সেই কৃতী প্রধানশিক্ষককেই বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া ক্ষেত্রবিচারে অযোগ্য ভূমিকায় বিদায় লইতে হইয়াছিল। [দ্র. 'স্মৃতি' দুষ্প্রাপ্য পত্রগ্রন্থ]

'কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।'[১৭]—রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনোপলব্ধিই নয়, তাঁহার সমস্ত জীবনেরই বিশ্বাস-বাণী। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আশ্রমের শিক্ষাসম্পর্ক এই বিশ্বাসের ও প্রত্যাশারই এক চর্যাক্ষেত্র—এই বিশ্বাসেরই প্রেমময় প্রাণবন্ত রূপ। উপনিষদ্-ভাবপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন মানুষ ও সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ জগৎ-প্রকৃতি-মানবপ্রকৃতিজোড়া নিখিল সৃষ্টি মূলত সৎ ও মহৎ, এবং এই বিশ্বাসের জন্যই তার আত্মশক্তি-প্রকাশের ও স্বাধীনতার অধিকারও প্রকৃতি-সম্মত। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে অসৎ-এর নয়, সমস্ত সৃষ্টিই সচ্চিদানন্দের প্রকাশ। রবীন্দ্রদৃষ্টি-উন্মোচক বারংবার আশ্রিত একটি শ্লোক তাই 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'।[১৮]

অসৎ বলিয়া মৌল কিছু না থাকিলেও যা কিছু অশুভরূপে নিরানন্দরূপে দেখা দেয় তা সৎ ও শুভের বিপরীত কিছু নয়, বরং উহারই অপ্রকাশ বা অপূর্ণতার রূপ, অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহাকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র বলিয়াই উদগ্র, এবং ভগ্নাংশ বলিয়াই আকারে প্রকারে বড় মনে হয়—বিভ্রান্তি ঘটে। কিন্তু ভুল যত বড়ই হউক না, ভুলের মধ্যেই তার পরিণতি নয়, পূর্ণতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্রমপরিবর্তনের ধারায়ই ইহা ভ্রান্তিমুক্ত হইয়া ওঠে। ভ্রান্তির এমন কোনও স্বয়ম্ভু শক্তি নাই যে সে জীবনপ্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে, —জড় বস্তুপিণ্ডের যেমন এমন ক্ষমতা নাই যে সৃষ্টি-প্রবাহকে গতিস্তব্ধ করে। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে দেখি বলিয়াই রুদ্ধ ও উগ্র রূপকে বড় করিয়া দেখি।

'Error, by its nature cannot be stationary ; it cannot remain with truth; like a tramp, it must quit its lodging as soon as it fails to pay its score to the full.

'As in intellectual error, so in evil of any other form, its essence is impermanence for it cannot accord with the whole. Every moment it is being corrected by the totality of things and keeps changing its aspect. We exagge-rate its importance by imagining it as at a standstill...But evil is ever moving with all its incalculable immensity, it

does not effectually clog the current of our life...'.[১৯]

'The potentiality of perfection outweighs actual contradictions.'[২০]

'An imperfection which is not all perfection, but which has perfection for its ideal, must go through a perpetual realisation...

'For we feel that good is the positive element in man's nature, and in every age and every clime what man values most is his ideal of goodness.'[২১]

রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মহাপ্রবাহের ইতিহাসে সৎ-অসতের সম্পর্কে সৎ-এর চির-উত্তরণ ভূমিকাটি নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে চান নির্দিষ্ট কোনো স্থানকালপাত্র নির্বিশেষ নিরপেক্ষতায়—কোনো খণ্ডিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে অসতের উচ্চ-উন্মার্গ ভূমিকাটিও রবীন্দ্রদূরদর্শনে পতনে বা সমঞ্জসীকরণে বিলীন হইবার প্রাক্‌বিক্ষোভ মাত্র অতএব ঐ উন্মার্গ বা আপাত-অসৎ রূপটি যতই প্রধান হউক না, তাহা তাঁহার ভাবভাবনার সাম্য-স্থিতিকে বিচলিত বা আক্রান্ত করে না। ভয়ংকর ঝড়ঝঞ্ঝা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধশক্তির আপাত-উচ্চ আস্ফালনে কিছু ধ্বংস ও ক্ষতি সাধন করিলেও শেষ পর্যন্ত জগৎপ্রকৃতির শিবশান্তির মধ্যেই পূর্ণতা বা সমাপ্তি লাভ করে। মনুষ্যজীবন তথা মানব-প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তদ্রূপ।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ছিল ছাত্র বা অধ্যাপকদের জীবনে যা-কিছু সাময়িক দ্বন্দ্ব বা ভুল-ভ্রান্তি বৃহত্তর জীবনসত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানেই শমিত হইয়া পড়িবে। তবে অধ্যাপকদের জীবনের এই আত্মপ্রকাশে আশ্রমবিরোধী ভাবকে রবীন্দ্রনাথ সর্বথা অপ্রভাবিত দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে না পারিলেও ছাত্রজীবনের মহৎ শক্তির অভ্যুদয়ে ছিলেন একান্তই রাগানুগা মার্গে বিশ্বাসী—বৈধী মার্গে নয়। এবং এইজন্যই তিনি ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সহজ স্ফুরণের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন-ছাত্রজীবন পরিচালনায় ছাত্রদের উপরেই আত্ম-কর্তৃত্বদানে তাহার প্রামাণিক পরিচয়। এই ছাত্র-কর্তৃত্বের বা ছাত্রস্বরাজে ভুলভ্রান্তি ঘটিলেও তাহাই যে একমাত্র আদর্শপন্থা এবং স্বাভাবিক পন্থাও—সেকথা মানিয়া লইবার জন্য অধ্যাপকদের পরামর্শ দিয়াছেন।

'ছাত্রদের যথাসাধ্য কর্তৃত্ব দিয়ো, বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ভিতরকার সম্বন্ধ যেন হয়ে ওঠে—এতে যদি কিছু অসুবিধাও ঘটে তবে সেও স্বীকার করে নিতে হবে—ছাত্রদের কাজেকর্মে শয়নে জাগরণে চালনাটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে। সাধনাটাই বড় হয়, হয়ে উঠবার মতোই যেন তাগিদ থাকে, করে তুলবার জন্য নয়। আমি দেখেছি, অধিকাংশ লোকের মানুষের শক্তির উপর শ্রদ্ধা নেই, সেইজন্যে শক্তিকে কেবল দমন করতে চায়। আমি শক্তির উপরেই বিশ্বাস রাখি—আমি জানি একবার মানুষের ঠিক মর্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা যায়।'[২২]

স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ ছাত্রজীবনে একই সঙ্গে বাড়িয়া উঠুক এবং ইহারই মাধ্যমে নবীন ছাত্রদের আত্মশক্তির সানন্দ প্রকাশ ঘটুক—শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তো ইহাই চাহিয়াছিলেন—আর চাহিয়াছিলেন শিক্ষক হউন ছাত্রদেরই স্বপক্ষে এক অনুকূল শক্তিবিশেষ।

'Our School is a living body. The smallest of us must feel that all its problems are his own......Even the little boys should not be kept ignorant of our difficulties. They should be made proud of the fact that they

also bear their own share of the responsibility.'[২৩]

বিদ্যায়তনের দায়দায়িত্বের ক্ষেত্রে ছাত্রদের এইরূপ চেতনার কথা—শুধু কথা নয় কাজের কথা তখন পর্যন্ত এদেশে সম্ভবত একমাত্র রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতেই শোনা যায়—বিশেষত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই যখন ছাত্রদের গুরুদেব—বিদ্যাশ্রমপ্রধান।

কিন্তু এই দায়িত্ববোধও যাহাতে অনাগ্রহ কর্তব্যকর্ম না হইয়া ওঠে সেদিকে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় দৃষ্টি ছিল। এই বিষয়ে তিনি তাই অধ্যাপকদেরও সজাগ করিয়া দিয়াছেন—ছাত্রেরা যাহাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কাজকে নিয়মিত করিয়া তুলিতে পারে সেইজন্যই অধ্যাপকদের সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইতে বলিয়াছেন ছাত্রদের পশ্চাতে। বাইরের শাসনে নয়, নিজের কর্তৃত্বের সৃষ্টিশীল আগ্রহেই যেন ছাত্রেরা তাহাদের সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারে।

শিক্ষাশাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-স্বাধীনতার মূল্যায়ন করিতে গিয়া বলিতেছেন—

'কি করলে সবচেয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে সেই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই ছেড়ে দাও এবং তাদের ব্যবস্থা মতো চলবার জন্যে তোমরা প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিস গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক—কেননা এই গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদের জন্যেই আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সঙ্কোচ রেখো না—এই ছাত্ররাজক শাসন-প্রণালীকে যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটি মস্ত জিনিস হবে।...প্রথমে অনেক বাধা ও বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে কিন্তু তোমরা ভয় করো না—ভুল করতে দাও তা হলেই ভুল সমূলে বিনষ্ট হবে—ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় একথা নিশ্চয় জেনো।'[২৪]

কিন্তু এই স্বাধীনতার দায়িত্বে ছাত্রস্বরাজ লাভ করার যোগ্যতা গ্রহীতাদের না থাকার জন্য (এবং দাতাদেরও আন্তরিক সমর্থনের অভাবেও কি?) বারংবার অবাঞ্ছিত অবস্থাও যে না ঘটিয়াছে তাহা নয়।[২৩] ছাত্রদের হাতেলেখা প্রাচীন পত্রিকায় ছাত্রদের আত্মসমালোচনায় এইজাতীয় স্বীকৃতিও দেখা যায়। 'আশ্রমের যে এখন এমন অবস্থা···নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।'[২৫] তবু ছাত্রবন্ধু গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস অবিচল ছিল যে 'ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয়।'

৩। শিক্ষকের জীবনসাধনা

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক পর্বেও (১৯০৪খ্রীঃ) যখন এক প্রধান শিক্ষককে বিধাতার প্রতিনিধি'[২৬] রূপেই ছাত্রদের পরিচালনা করিবার কথা বলিয়াছেন, তখনো কিন্তু বিদ্যালয়ের একমাত্র 'আইডিয়াল'[২৭]-এর কথায় রবীন্দ্রনাথ বলিতে ভোলেন নাই—'হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করিতে হয়, কলের সাহায্যে নয়, এইটেই আদত কথা।'[২৮]

কিন্তু এই যে আত্মকর্তৃত্বাধিকারের এবং ছাত্রদের ইচ্ছানুসারেই অধ্যাপকদের পরিচালিত হওয়ার বিষয় আমরা রবীন্দ্রপ্রত্যাশার মধ্যে লক্ষ্য করিলাম তাহার মূল নির্ভর হইল সহানুভূতি ও সহৃদয়তার শক্তি—প্রীতি ও প্রেম। যে সোনার কাঠিতে মানুষের, বিশেষত বিদ্যাশ্রমের ছাত্র ও অধ্যাপকের মর্মস্থানটি স্পর্শ করিয়া ঘুম ভাঙ্গানো যায়—মনুষ্যত্বের মণিকোঠায় তাঁহার সন্ধান লাভ সম্ভব। জ্ঞান নয়, যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,—সেই মণিকোঠায় বিরাজ করে সর্বজীয়নকন্যা প্রেম—সহজ কথায় যাকে আমরা 'দরদ' বলি। সত্যই ভালোবাসা ছাড়া মনুষ্যত্বের উপরে এমন নির্ভরতা আর কার? এই প্রেমপ্রীতির মধু-কোষটি ঘিরিয়া ঘিরিয়াই রবীন্দ্রজীবনের তথা রবীন্দ্রশিক্ষার বিচিত্র দলগুলি আলোক-সৌরভে প্রকাশিত। এই প্রেমের পারস্পরিক অধিকারেই

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবচঞ্চল ছাত্রদের জীবনে স্বাধীনতার ও আনন্দের স্ফূর্তিকে তুলিয়া ধরিবার অনন্যসুলভ সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে চহিয়াছেন আপন বিদ্যাশ্রমে, এবং উচ্চভাব-ছাত্রদের জীবনে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কর্তব্যবোধের তাড়নায় কোনো উচ্চভাব কেবল গুরুভার বা প্রাণহীন অভ্যাস মাত্র না হইয়া ওঠে সেই স্নেহস্বভাব শঙ্কাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কাজ ও খেলার যে অনন্য এক স্বতন্ত্র রূপ রবীন্দ্রনাথ নিজেই আপন বিদ্যাপীঠে গড়িতে চাহিয়াছেন—তাহারও মূল কথা ঐ প্রেম। আদর্শের প্রতি কঠোর কর্তব্যচেতনা হইতে এই প্রেম জন্মিতে পারে না, পারে সহৃদয়তা ও সহানুভূতি হইতে। রবীন্দ্রপ্রকাশিত শিক্ষক-জীবনের চিরউৎসই ঐ প্রেম,—আদর্শকে ভালোবাসা, জীবনকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, ছাত্রকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার অধিকার-বঞ্চিত পাণ্ডিত্য নিরেট হইলেও কঠিন উপাদান মাত্র,—ইহা গলাধঃকরণে যেমন যন্ত্রণা, হজম করাও তেমনি কঠিন।

'We must know that *only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men...The real teaching is a gift, it is a Sacrifice,* it is not a manufactured article of routine work, and because it is a living thing, *it is the fulfilment of knowledge for the teacher himself.*'[২৯]

মা যখন সন্তানকে অন্নদান করেন তখন শুধুমাত্র অন্নই দেন না, সঙ্গে থাকে তাঁহার স্নেহামৃত, শিক্ষকও যখন ছাত্রকে শিক্ষাদান করিবেন তার সঙ্গে থাকে যেন প্রীতির সর্বসঞ্জীবনসুধা। কারণ এই প্রীতি-যোগেই আত্মদান সম্ভব, আর একমাত্র এই প্রীতি-প্রেমে আত্মদানেই আনন্দে পূর্ণ হয় আত্মবিকাশ। শিক্ষাদাতা নিজে যেমন হইবেন জীবনের অর্থাৎ চিরতারুণ্যের সন্ধানী, তেমনি শিক্ষাকেও মনে করিবেন জীবনেরই শক্তিবিশেষ, প্রাণেরই মৌল প্রকৃতিবিশেষ, তবেই শিক্ষাও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিবে প্রাণস্পর্শে। শিক্ষা একই সঙ্গে হইয়া উঠিবে পুষ্টিকর এবং সুখকর। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন—'Why should not schooling be as pleasurable a process as the taking of food with appetite?'[৩০] এই বোধ থাকিলে নির্বিচার খাদ্য শিশুর দেহ মনের কাছে আর নির্মম-ভাবে ঠেলিয়া বা ঠাসিয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। এবং তাই তো বিদ্যাশ্রমে স্বচ্ছ প্রাকৃতিক পরিবেশ, পারিবারিক সম্পর্ক এবং আনন্দযোগের বহু বিচিত্র ব্যবস্থা।

শিক্ষক তাঁহার বিদ্যাশ্রমের ছাত্রদের কী চক্ষে দেখিবেন, কীভাবে গ্রহণ করিবেন? হৃদয়ের সাহায্যে ছেলেদের মানুষ করিতে হইলে ছেলেদের হৃদয়ের অধিকারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হইবে, তাহাদের সৃজনানন্দের সমস্ত রকম স্বাধীনতাকেই প্রসন্নমনে বরণ করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ বড় সহজসুন্দরভাবে মনের কথা প্রকাশ করিয়াছেন—

'আমরা বাইরে থেকে যা কিছু চেষ্টা করি সেসব চেষ্টার শক্তি অতি সামান্য, কিন্তু আমাদের ছাত্রেরা নিজের জীবনসাধনাকে যতই সত্য করে তুলবে ততই তারা পরস্পরকে শক্তি দিতে পারবে··· তাছাড়া কখনই যথার্থ মঙ্গল ঘটতে পারে না, আমাদের ছাত্রেরাই এই বিদ্যালয় সৃষ্টি করে তুলেছে—তাদের প্রাণের মধ্য থেকে যে সুর বেজে উঠবে সেই সুরই এই বিদ্যালয়ের সুর। তাদের উপর এই যে দায়িত্ব আছে সেটি যে কত বড় সেকথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তারা যেন একদিনের জন্যও এ ভ্রম না করে যে আমরা শিক্ষকেরা বিদ্যালয়কে চালনা করছি, কিন্তু এর প্রধান ভারটি তাদের

উপরেই আছে। তারা যেখানে দুর্বল আমাদের বিদ্যালয় সেখানেই দুর্বল—তারা যেখানে নিষ্ফল হচ্ছে আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই ব্যর্থ হচ্ছে। আমার ছাত্রেরা আমাদের বিদ্যালয়কে শ্রী দিচ্চে, শক্তি দিচ্চে, আনন্দ দিচ্চে আমি তা নিশ্চয় জানি—আমাদের এই নবীন তাপসেরাই আশ্রমের উপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ আকর্ষণ করে আনচে—আমরা তো কেবলমাত্র নদীর উপকূল, কিন্তু এ নদীর স্রোতের ধারা তো তারাই—'[৩১]

দ্রষ্টব্য, পত্রখানি লেখা বিদেশ থেকে, বিশেষ করিয়া সেজন্যও রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা-সমুজ্জ্বল অবাধ দৃষ্টিতে ছাত্র ও শিক্ষকের জীবনের বিরাট রূপটি কথার প্রাণাবেগে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে—বাণীগ্রন্থনে আদর্শের উপলব্ধিই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্রজীবনের রূপটি কবিপ্রেমিক শিক্ষাব্রতীর চক্ষে কত সুন্দর,—সৃজনশক্তির উচ্ছলোজ্জ্বল ধারায় তাহা কীভাবে উৎসারিত—ভাবিলে বিস্ময় লাগে, শ্রদ্ধা হয়। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিই সদাজাগরূক থাকিবে ইহা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ছিল, তাই তো এমন কথা বলাও সম্ভব হইয়াছে যে শিক্ষকদিগকে 'ছাত্ররাজক' ব্যবস্থামতো চলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, এমন কি সেখানে ভুল থাকিলেও আত্মপ্রস্তুতির পথে স্বাধীন শিক্ষার সুযোগ হইতে ছাত্রদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য কোনরকম উপরি-কর্তৃত্ব খাটানো সঙ্গত হইবে না। 'শিক্ষকেরা ছাত্রদের চালক ও নিয়ন্তা, সাধনা কেবল ছাত্রদের'—এই ভাবনাই শিক্ষক-ছাত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পর্কের মধ্যে ক্রম-ব্যবধান সৃষ্টি করে। আর, প্রাণের সেই ব্যবধানকে কৌশলে পূরণ করিবার জন্য অযোগ্য শিক্ষকেরা কি করেন? তাঁহারা উর্ধ্বপদের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং কর্তৃত্বের ফলে সমস্ত অপরাধকে অধীনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া অবিবেকী তৃপ্তিলাভ করেন। অর্থাৎ শিক্ষাদানের মৌল অধিকার না থাকিবার জন্যই নকল অধিকারের পথ গ্রহণের দ্বারা গোঁজামিল দিতে হয়।

একমাত্র শান্তিনিকেতন ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক-সম্পর্কের মধ্যে ছাত্রজীবনাদর্শকে ও তাহার প্রকাশাধিকারকে এতখানি সশ্রদ্ধ স্বাধীনতা দান এবং অবিচল মনুষ্যত্বে বিশ্বাস-জনিত মহৎ প্রত্যাশার কথা আর কোথাও দেখা দিয়াছে কিনা সন্দেহ। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের মনে রাখা উচিত রবীন্দ্রদৃষ্টির ঐ পত্র-পরিচয় ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা, এবং অপ্রভাবিত দূরদৃষ্টিতে বিদেশ থেকে লেখা। তবু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সঙ্গত অধিকারে বলা সম্ভব—'এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত ছাড়া পেয়েছে।'[৩২]

—তবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের এই আত্মকর্তৃত্বাধিকার তথা 'ছাত্রস্বরাজ' রাজনৈতিক অধিকারপ্রসূত ছিল না, দলগত দাবী আদায়ের ব্যাপারও নয়,—ইহা আত্মবিকাশেরই অধিকার, মনুষ্যত্বেরই অধিকার। এই 'ছাত্রস্বরাজ' বর্তমানের যুগধর্মী ছাত্রসংসদীয় ব্যাপার নয়। প্রায় পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বকালের এই ব্যবস্থা ছিল বিদ্যাশ্রম-কর্তৃপক্ষেরই সাগ্রহ ব্যবস্থার ফল—অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষের নিকট ছাত্রসংগ্রাম কমিটির দ্বারা দাবী আদায়েরই 'বিজয়' নয়। যে বিষম বোধ ও অসম ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক বা ছাত্র-কর্তৃপক্ষের মধ্যে আত্মদ্রোহী ভাঙনের পালা শুরু হয় তাহার স্থূল কারণ ও অপবুদ্ধির স্ফীতির কোনো স্থানই ছিল না—শান্তিনিকেতনের প্রাণ-প্রীতিময় সার্বযৌগিক আশ্রমিক পরিবেশে। পরে ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রজীবনপ্রান্তে এবং আরো বিশেষত এই শিক্ষাশাস্ত্রীর মহাপ্রয়াণের পরবর্তী 'নবকলেবর' পর্বে কখনো কখনো নতুন নতুন রবীন্দ্র-অপ্রভাবিত রূপেরই দৌরাত্ম্য দেখা যায়।

৪। শিক্ষক-ছাত্রের যুগ্ম-সাধনা

শিক্ষার অধিকার মানবজীবনে এক পরম-বাঞ্ছিত সৌভাগ্য। এই সৌভাগ্যের যথার্থ অধিকারী তিনিই, যিনি কেবলমাত্র বিদ্যা নয়, 'কায়েন মনসা বাচা' নিত্যবহ প্রেমের অধিকারী। এবং এই প্রেমেরই বিশুদ্ধ সার হইল শিশুপ্রীতি—এই প্রীতি নিত্য নবাগত কত বিস্ময়কর সম্ভাবনার স্বপ্নে কোমলোজ্জ্বল। এই প্রীতির অফুরন্ত উৎসারে নিত্য অভিষিক্ত শিক্ষকজীবনই শিক্ষার জন্য ছাত্রদের আগ্রহী করিতে পারে,—দাতাগ্রহীতার বা শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক দানে-গ্রহণে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল এই সহজাত শিশুপ্রীতির চিরন্তন উৎস—এই নিভৃত উৎস থেকেই বহু প্রেরণায় ও প্রয়োজনে তিনি শিক্ষাক্ষেত্রের বিচিত্র আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। শিক্ষকের কাজ শুধু শিক্ষকতা নয়—মানুষ তৈরী করা, ইহা তাঁহার নিজের জীবনসাধনারই অঙ্গীভূত, এবং এই সাধনায় তিনিও নিজেকে আবিষ্কার করেন, নিজেকে গঠন করেন, অলভ্যকে লাভ করেন। এবং এই সাধনায় তিনি শিক্ষকমাত্র নন অর্থাৎ শিক্ষা-দানের যন্ত্রমাত্র নন—তিনি মানুষ, এবং ছাত্রও গলাধঃকরণী স্বতোবৃত যন্ত্রবিশেষ নয়—সেও মানুষ, বিকাশোন্মুখ শিশু। শিক্ষাক্ষেত্রে তাই ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্কের বাহনমাত্রই নয়—মানুষরূপেই যুগ্মজীবনসাধনা; কারণ উভয়েই একই মানবিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর এবং উভয় উভয়ের সম্পূরক। ইহা আরণ্যক আশ্রমের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থের মিলনক্ষেত্রে ব্রহ্মচারী বালক ও বানপ্রস্থ গুরুর যুগ্ম-সাধনা-সদৃশ।

'এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভীর যোগ, কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র—এখানে বিদ্যার সঙ্গে ধর্মের ভেদ নেই—কেননা উভয়েই এক লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের মত সমগ্রভাবে সচল; স্নানাহার, পাঠাভ্যাস, খেলা, উপাসনা সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্তব্য বা নৈতিক কর্তব্য নয় সে তাঁর সাধনা—তার দ্বারা তিনি তাঁর হৃদয়গ্রন্থি মোচন করচেন, ভূমা উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করচেন।'[৩২] 'এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন, এখানে গুরু শিষ্য সকলে একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি।'[৩৩] রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যন্তই বিশ্বাস ছিল বর্তমান পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ইস্কুল-কলেজীয় শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ [শিক্ষণীয় বিষয় নয়] ভারতবর্ষের পক্ষে অযোগ্য ও স্বভাববিরুদ্ধ এবং তাই কৃত্রিম-কাঠিন্যে বিকৃত,—স্বভাবসঙ্গত যথার্থ বিদ্যালাভ সম্ভব আশ্রম তথা বিদ্যাপীঠোচিত ব্যবস্থায় ও পরিবেশে—গুরু-শিষ্যের নিত্যসহযোগে যুগ্ম-সাধনায় একই সমতল আসনে।

শিক্ষকের সাধনা পরোপকারব্রত নয়—আত্ম-সাধনা, আত্মব্রত। শিক্ষকেরা উচ্চাসন হইতে শুধু পাঠ দান করিলে এবং ছাত্ররাও কেবল যন্ত্রবৎ পাঠ গ্রহণ করিলে ছাত্রদের উপরে কিছু বারোয়ারী মাপসই জিনিস চাপাইয়া দিয়া কিছুটা শ্রমরূপ তেল যোগ করিলেই শিক্ষা চালু রাখার কাজে কর্তব্যমুক্ত বা খালাস হওয়া যায়, কিন্তু ঠিক প্রদীপের মতোই নিজে প্রকাশিত হইয়া অন্যকে প্রকাশিত করাটাই হইল শিক্ষাসাধনার বিষয়। জীবনসাধনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশাই ছিল শিক্ষকদের কাছে, এবং এক্ষেত্রে তিনি 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায় নীতিরই' অনুগামী।[৩৪]

শিক্ষক-জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরও পরিণত কালের অর্থাৎ জীবন-সায়াহ্নের দিকেও ঐ একই দৃষ্টিপ্রসূত কথা শোনা যায়।—'তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ

নন, সক্রিয়ভাবে ; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন যে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর থেকে।'[৩৫]

উদ্ধৃতি-সূত্র ও উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গ

১ লক্ষ্য ও শিক্ষা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯, শিক্ষাগ্রন্থ, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী, সংস্করণ (র. র. জ. সং) ১১ খণ্ড, পৃ. ৬৩১ ; ২ তপোবন, পৌষ, ১৩১৬, ঐ সূত্র, পৃ. ৬০২-৩ ; ৩ ঐ, পৃ. ৬০৩ ; ৪ My School, Personality গ্রন্থ, পৃ. ১১৬ ; ৫ পত্রাবলী, বি. ভা. প., অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃ. ২৯৪ ; ৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২।৪।৩, ৪।৫।৪ ; ৭ What is Art, Personality, পৃ. ৩০-৩১ ; ৮ My School, Personality, পৃ. ১২৬ ; ৯ ভর্তৃহরি : বৈরাগ্যশতকম্, শ্লোক ৬৭ দ্র. 'প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ···তনবস্ততঃ কিম্॥' ; ১০ ঈশোপনিষদ্, নবম ও একাদশ শ্লোক, 'The World of Personality' ভাষণ-প্রবন্ধে রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদের জন্য দ্র. Personality, পৃ. ৫৭-৫৮ ; ১১ The World of Personality, Personality, পৃ. ৬৪ ; ১২ দ্র. শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, বাক্যটি উপনিষদের একটি শ্লোকেরই অনুবাদ, ঐ শ্লোকটিও রবীন্দ্র-উদ্ধৃতিটির পূর্বেই আছে : 'ন তথৈতানি···জ্ঞানেন নিত্যশঃ।' ১৩ ঐ শিক্ষাগ্রন্থ, পৃ. ৭৭৩-৭৪, র. র. জ. সং. ১৮ খণ্ড ; ১৪ ঐ ৮ সূত্র, পৃ. ১৪৭ ; ১৫ প্রাসঙ্গিক ছাত্র নমুনার কিছু পরিচয়ের জন্য দ্র. প্রমথনাথ বিশীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', পৃ. ১৭-১৮, ৩৮-৪০, এবং সুধীরঞ্জন দাশের লেখা 'আমাদের শান্তিনিকেতন', পৃ. ৮৯-৯১, প্রথম দিকের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নাম বা দুর্নাম রটিয়াছিল 'রিফর্মেটরী স্কুল' রূপে দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পিতৃস্মৃতি ; ১৬ ভাষণ-সংখ্যা ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থ, র. র. জ. সং, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৭৫৪-৫৫, এবং রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ও' কাম্পো-র কথোপকথন, এল্মহার্স্ট কর্তৃক অনুলিখন : Schooling, B. V. B. Vol. 29, No. 4, 1963-64, এবং My School, Personality, পৃ. ১১৭-১৮ ; ১৭ সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর, পৃ. ৩৯০ ; ১৮ শ্লোক সংখ্যা ১, ঈশোপনিষদ্ ; ১৯ The Problem of Evil, Sadhana, পৃ. ৪৮-৪৯, ৫০, ৫৩ দ্রষ্টব্য ; ২০ ঐ, পৃ. ৫২ ; ২১ ঐ, পৃ. ৫৩ ; ২২ পত্রাবলী, বি. ভা. প., অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃ. ২৭৯ ; ২৩ ঐ, পত্রের তাং ১২ নভেম্বর, ১৯১৪ ; ২৪ ঐ, পৃ. ২৮৯ ; ২৫ আদি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের হাতে-লেখা এক পত্রিকা 'বাগান', ১৩২৪ পৌষ, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সাধনা কর লিখিত 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়', পৃ. ১১ দক্ষিণার্ধ ; ২৬ সিটি কলেজের অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন স্বপদ ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রতী হন এবং আপন আদর্শের ছক মতো বিদ্যালয়টিকে বহু ছাত্র যোগে 'পূর্ণাঙ্গ' করিয়া তোলেন; ২৭ নিম্নরেখা মূলানুযায়ী; ২৮ পত্রাবলী, বি. ভা. প., অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পত্রের তাং ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১, মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা ; ২৯ ঐ, ১৩৪৯, পৃ. ৩০৭, তাং ২৮ আগষ্ট, ১৯২০, 'ইটালিক' মূলানুযায়ী নয় ; ৩০ ঐ, ১৬ নং টীকার দ্বিতীয় অংশ ; ৩১ পত্রাবলী, বি. ভা. প. পৃ. ২৮২ ; ৩২ বি. ভা. প. ১৩৪৯, অগ্রহায়ণ, অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে লেখা পত্র ; ৩৩ ধর্মশিক্ষা, র. র. জ. সং, ১১ খণ্ড, পৃ. ৬১৭-১৮ ; ৩৪ নীতিবাক্যটি শ্রীচৈতন্যদেবের ; ৩৫ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, প্রথম প্রবন্ধ, র. র. জ. সং, ১১ খণ্ড, পৃ. ৭২৫।

ভারতীয় ভাস্কর্যে নটরাজ

ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

এক

মহাদেবের নৃত্যমূর্তি ভারতীয় চিন্তার ও শিল্পের জগতে একটি অসাধারণ সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বনন্দিত। এই নৃত্যমূর্তির রূপভেদ আছে এবং এগুলির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক পরিচিত রূপ-প্রমূর্তি নটরাজ নামে চিহ্নিত। নটরাজমূর্তিগুলি ব্রোঞ্জে তৈরি, প্রাচীনতম নিদর্শন দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের আমলের আদিপর্বে—অষ্টম শতাব্দীর শেষদিকে ও নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে। বস্তুতঃ নটরাজমূর্তি বললেই দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জনির্মিত নৃত্যপর শিব-প্রতিমার কথা মনে আসে এবং প্রধানতঃ এই মূর্তিগুলিই দেশ-বিদেশের শিল্পরসিকদের প্রশংসা অর্জন করেছে।

দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জমূর্তির নটরাজ শিব চতুর্ভুজ ; তাঁর চার হাতের মধ্যে সামনের বাম হাত দোল- বা গজ-হস্ত ভঙ্গীতে উত্থিত বাম পদকে নির্দেশ করে প্রলম্বিত, সম্মুখের দক্ষিণ হস্ত অভয়-মুদ্রায় বিন্যস্ত, পশ্চাতের বাম হস্তে অগ্নিগোলক এবং পশ্চাতের দক্ষিণ হস্তে ডমরু (তামিল ভাষায় 'উদুক্কই') ; মহাদেব অপস্মার-পুরুষ (তামিল ভাষায় 'মুয়লক') নামে এক কুশ্রী বামনের উপর নর্তনশীল, তাঁর দক্ষিণ পদ অপস্মারের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত, বাম পদ একটু ডান দিক ঘেঁষে উঠে আছে ; একটি পীঠিকায় সংস্থাপিত সম্পূর্ণ মূর্তিটি অগ্নিশিখার অলংকরণ-সমন্বিত প্রভাবলী (তামিল ভাষায় 'তিরুবসি') দ্বারা বেষ্টিত, প্রভাবলীর প্রান্ত দু'টি পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। এই অপূর্ব মূর্তিরূপের শিল্প-ব্যাখ্যা পাওয়া যায় 'উণমই বিলক্কম্' নামে একটি মধ্যযুগীয় তামিল গ্রন্থে, ১৯১২ সালে আনন্দ কুমারস্বামী সর্বপ্রথম এই ব্যাখ্যার প্রতি বিদ্বৎসমাজ ও শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[১] ব্যাখ্যাটি এরকম : ডমরু থেকে সৃষ্টির সূচনা, অভয়মুদ্রায় স্থিতির ইঙ্গিত ; অগ্নিগোলক প্রলয় বা ধ্বংসের প্রতীক, উত্থিত বাম পদে জীবের মুক্তির আভাস। কুমারস্বামীর মতে 'তিরোভাব' বা মায়া নামে মহাদেবের আর একটি বৈশিষ্ট্য বা 'কৃত্য' প্রভাবলীর মধ্যে রূপায়িত। সুতরাং মহাদেবের 'পঞ্চকৃত্য'— সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, প্রসাদ বা অনুগ্রহ এবং তিরোভাব—দক্ষিণ-ভারতীয় ধাতব নটরাজ-মূর্তির মধ্যে বিশিষ্টভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এবং চিন্তার ও শিল্পভাষার এই সুন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে-নটরাজমূর্তির বর্ণনা করা হলো, সেটি শিবের দক্ষিণী নৃত্যমূর্তির পরিণত রূপ। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এই রূপ-প্রমূর্তির প্রকাশ ঘটে। প্রথম দিকের অনুরূপ মূর্তিগুলিতে অপস্মার-পুরুষ অনুপস্থিত, দেবতা সেখানে পীঠিকার উপর নর্তনশীল। আরও একটি কথা স্মরণীয়, মহাদেবের নটরাজমূর্তির উদ্ভব চোল শিল্পশৈলীর ব্রোঞ্জ-নিদর্শনগুলির প্রায় তিন শ বছর আগে। এবং সম্ভবতঃ এই মূর্তি-কল্পনার উদ্ভব উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতে নয়। এই অনুমানের সমর্থনে আমি সম্প্রতি আবিষ্কৃত অসনপতের মূর্তির

১ কুমারস্বামীর ইংরেজী প্রবন্ধটি বেরোয় মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 'সিদ্ধান্তদীপিকা' নামক পত্রিকায়। পরে এটি তাঁর Dance of Siva and other Essays (প্রথম প্রকাশ ১৯২০) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উল্লেখ করতে পারি।

উড়িষ্যার কেওনঝাড় জেলার অন্তর্গত অসনপত গ্রামে প্রাপ্ত এই মূর্তিটি পাথরের, মূর্তির পাদপীঠে ব্রাহ্মী হরফে লেখা একটি তেরো পঙ্‌ক্তির অভিলেখ; অক্ষরতত্ত্বের বিচারে লেখটি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিককার বলে আমার বিশ্বাস।[২] অসনপতের ভাস্কর্যে নৃত্যপর শিব অষ্টভুজ ও তৃতীয় নয়ন-বিশিষ্ট; তাঁর প্রধান ও মূল দুই হাতে বীণা, উপরের দু'টি হাতে ধৃত একটি সর্প তাঁর আচ্ছাদনরূপে প্রলম্বিত, অবশিষ্ট দুই ডান হাতে অক্ষমালা ও ডমরু এবং বাম হাতে ত্রিশূল ও বরদমুদ্রা; ঊর্ধ্বলিঙ্গ (যোগীশ্বর শিবের প্রতীক) দেবতার একদিকে ভক্ত (পাদপীঠস্থ লেখটিতে উল্লিখিত রাজা শত্রুভঞ্জ?), অন্যদিকে বাহন নন্দী; প্রভুর নৃত্য-কুশলতায় মুগ্ধ ও অনুপ্রেরিত নন্দী দেবতার মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে (মৎস্যপুরাণে এই ভঙ্গীতে পরিদৃশ্যমান নন্দীকে বলা হয়েছে 'দেবতাবীক্ষণতৎপর')। অসনপতের ভাস্কর্যটির প্রায় সমসাময়িক একটি নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের সিরপুরে পাওয়া গেছে।

অসনপত ও সিরপুরের অল্পবিস্তর পরবর্তী কালের প্রতিমাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাদামী ও এলোরার ভাস্কর্য-নিচয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের অথবা সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাদামীর নিদর্শনে অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্যপর দেবতার হাতের সংখ্যা ষোল; বাম হাতগুলির একটি গজহস্ত এবং দক্ষিণ হাতগুলির একটি চতুর ভঙ্গীতে বিন্যস্ত; তাঁর কয়েকটি হাত ভাঙা, অক্ষুণ্ণ হাতগুলিতে ত্রিশূল, দণ্ড, ডমরু, পরশু ইত্যাদি দৃশ্যমান; তাঁর বাম দিকে বাহন নন্দী, দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান গণেশ ও ঢোলক বাদনরত জনৈক পুরুষ। এলোরার অষ্টম শতকের প্রতিমাতে কটিসম ভঙ্গীতে নৃত্যরত শিবের হাতের সংখ্যা আট; কয়েকটি হাত ভেঙে গেছে, দক্ষিণ হাতের একটিতে ডমরু এবং একটি কটকভঙ্গীতে প্রদর্শিত, বাম হাতগুলির একটি ত্রিপতাক ভঙ্গীতে বিন্যস্ত; তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর অনুচর ও ভক্তবৃন্দ, বিমুগ্ধভাবে তারা দেবতার নৃত্যকলা নিরীক্ষণে নিরত। অসনপত, সিরপুর, বাদামী ও এলোরার এই মূর্তিগুলির কোনটিতেই অপস্মার-পুরুষ নেই। সুতরাং অপস্মার-পুরুষের সংযোজন পরবর্তী কালের এবং বিশেষভাবেই এটি দক্ষিণী ব্রোঞ্জমূর্তিগুলির স্বাতন্ত্র্যসূচক। দ্বিতীয়তঃ এই ব্রোঞ্জমূর্তিগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং তাদের সমসাময়িক নিদর্শনগুলিতে নটরাজ-শিব বহুহস্ত-বিশিষ্ট, তাঁর হাতের সংখ্যা আট, দশ, বারো এবং ষোল। দক্ষিণ ভারতীয় কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যমূর্তিটি অষ্টভুজ।

দুই: বাংলার ভাস্কর্যে নটরাজ

বাংলার নটরাজমূর্তিগুলির কিছুসংখ্যক উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নিদর্শনগুলির (দক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জমূর্তিগুলি বাদে) মতোই বহুহস্তবিশিষ্ট ও পীঠিকার উপর নর্তনরত; এগুলির কোথাও অপস্মার-পুরুষ নেই। কিন্তু বাকিগুলিতে একটি বিশেষ রূপভেদ পরিস্ফুট। বস্তুতঃ ধর্মীয় প্রতিমাশিল্পের ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব কত গভীর হতে পারে বাংলার নটরাজমূর্তিগুলি তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। মধ্য-যুগীয় বঙ্গীয় শিল্পশৈলীর এই মূর্তিগুলির অধিকাংশ পাওয়া গেছে পূর্ববঙ্গে, ঢাকা জেলার রামপাল, কুমিল্লা এবং অন্যত্র; দু-চারটি উত্তরবঙ্গে[৩] ও

২ এই লেখটির প্রতি আমি দীনেশচন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তিনিও এটিকে পঞ্চম শতাব্দীর বলে মনে করেন। শ্রীযুক্ত সরকার এটি সম্পাদনা করছেন।

৩ উত্তরবঙ্গের একটি মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামে আছে।

ত্রিপুরাতে[৪] আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ধরনের দু'টি সুন্দর মূর্তির একটি ঢাকার রামপালের কাছে শংকরবান্দায়, অন্যটি কুমিল্লা জেলার পালগিরিতে[৫] পাওয়া গেছে, বর্তমানে দু'টিই ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এই মূর্তি দু'টিতে নাগোপবীত-পরিহিত শিব তাঁর বাহন নন্দীর পিঠের উপর নৃত্য করছেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে নন্দী তার প্রভুর দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার সামনের ও পিছনের দু'টি পা তোলা থাকাতে মনে হচ্ছে যে, সেও যেন প্রভুর নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যগ্র; নৃত্যশীল শিবের দশহাতে ত্রিশূল, দণ্ড, গদা, ঢাল, পাশ ইত্যাদি নানাবিধ আয়ুধ, তাঁর দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে তাঁর শক্তি পার্বতী ও গঙ্গা স্ব স্ব বাহন সিংহ ও মকরের উপর দণ্ডায়মানা; মূর্তির প্রভাবলী ও পীঠিকায় উৎকীর্ণ নাগ-সিংহ ও গণাদি দেবতা-কল্পগণ মুগ্ধভাবে নটরাজ শিবের নৃত্যকৌশল নিরীক্ষণ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত নিদর্শনটি শংকরবান্দা-পালগিরির প্রতিমার তুলনায় শিল্পগুণে নিকৃষ্ট হলেও, মূর্তিতত্ত্বগতভাবে সমতুল্য, এতেও দেবতা অষ্টভুজ।

পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের অন্যান্য কিছু দৃষ্টান্তে নটরাজ মহাদেবের হাতের সংখ্যা বারো। ত্রিপুরার (সমতল-ত্রিপুরার) ভারেল্লা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্তর্ভুক্ত) প্রাপ্ত অনুরূপ একটি মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখতে 'নর্তেশ্বর' রূপে দেবপ্রতিমার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বারো হাতের এই মূর্তিগুলিতে দেবতার উপরের দুই হাতে ধৃত সর্পটি চন্দ্রাতপের মতো আচ্ছাদনরূপে তাঁর শিরোপরি বিস্তৃত এবং মূল দুই হাতে আছে বীণা; এই উভয় বৈশিষ্ট্যই মূর্তিগুলিকে অসনপত-সিরপুরের দৃষ্টান্ত দু'টির সমগোত্রীয়রূপে চিহ্নিত করেছে। যাই হোক, পূর্ববঙ্গে বৃষোপরি নর্তনশীল শিবের রূপ যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তা ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক নিদর্শনেই যে সপ্রমাণ তা নয়, কয়েকটি গ্রামের নাম থেকেও তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। রামপালের কাছে একটি গ্রামের নাম নাটেশ্বর, কুমিল্লা জেলার নাটঘর গ্রামে এখনও নটরাজ শিবের পূজা হয়।

বাংলার এই বৃষোপরি নর্তনশীল শিবের মূর্তি বাঙালী শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টি, এ ধরনের মূর্তি ভারতবর্ষের অন্য কোথাও দেখা যায় না। মৎস্যপুরাণে নটরাজ শিবের বিশদ বর্ণনাতেও দেবতার বৃষোপরি নর্তনের উল্লেখ নেই, যদিও অন্যান্য অনেক বিষয়ে এই সব মূর্তির সঙ্গে এই পুরাণটির বর্ণনা মিলে যায়। শাস্ত্রীয় নির্দেশের বেড়া ডিঙিয়ে বাঙালী শিল্পী যে তাঁর কল্পনাকে সহজ মুক্তি দিতে পেরেছিলেন, রামেশ্বরের শিবায়নের মতো বাংলার নটরাজ মূর্তিগুলিও তার নির্ভুল প্রমাণ হিসাবে নন্দনযোগ্য।

৪ ত্রিপুরার খোয়াইতে প্রাপ্ত এই মূর্তি আবিষ্কার করেছেন আগরতলা মিউজিয়ামের শ্রীমতী রত্না দাস।

৫ পালগিরির মূর্তিটি কয়েক বছর আগে পাওয়া গেছে; ১৯৭৬ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বঙ্গীয় শিল্পকলা সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ঢাকায় গিয়েছিলাম, সে সময় মূর্তিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ ১ ॥

চিরন্তনের উপর অবস্থিত ছিলেন বলে বিবেকানন্দের পক্ষে স্বচ্ছন্দে মডার্ন হওয়া সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একবার "শাশ্বতভাবে আধুনিক" কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। ঐ কথা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সহজেই ব্যবহার করা চলে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন ভারতবর্ষে অন্যান্য মনীষীদের তুলনায় বিবেকানন্দের অগ্রবর্তিতার কথা বহুভাবে বলেছি। [বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ১-৪]। সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গণশিক্ষা, সমাজসংস্কার, কলাশিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার রূপ আমরা দেখেছি। এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যন্ত্রশিল্পায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাব লক্ষ্য করব। এক্ষেত্রে গোড়াতেই সমকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ইতিহাস কিছুটা উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করা যায়।

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বিখ্যাত পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটার একটি পত্র মুদ্রিত আছে। কিন্তু কোন্ পটভূমিকায় সেটি লিখিত হয়েছিল তার কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। অথচ পটভূমিকা ছিল বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক ভারতবর্ষে বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত একটি বিষয়ের সঙ্গে তা যুক্ত।

জামসেদজী টাটার সঙ্গে স্বামীজীর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছিল—যখন তিনি অখ্যাত সন্ন্যাসী—বিনা পরিচয়পত্রে আমেরিকা যাচ্ছেন চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে। স্বামীজীর জীবনীগুলি পড়ে মনে হয়, তিনি বোম্বাই থেকে ৩১ মে, ১৮৯৩ তারিখে 'পেনিনস্থলার' নামক জাহাজে উঠে, সেই জাহাজে করেই আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিলেন, যদিও স্বামীজী স্বয়ং ১০ জুলাই, ১৮৯৩-এর চিঠিতে জাপানের কোবি থেকে জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। স্বামী চেতনানন্দ আশ্বিন, ১৩৮০, উদ্বোধনে, এক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে ("বিবেকানন্দ : বম্বে থেকে বঙ্কুবর")—"ডেইলি নিউজ অ্যাডভারটাইজার, ভ্যাঙ্কুবর" পত্রিকার ২৬ জুলাই, ১৮৯৩-এর সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, স্বামীজী ২৫ জুলাই সন্ধ্যায় ভ্যাঙ্কুবরে পৌঁছান "এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া" জাহাজ-যোগে। ঐ সংবাদপত্র থেকেই দেখা যায়, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে "মিঃ এস বিব্সকানন্দ্র" ও স-ভৃত্য মিঃ টাটাও ছিলেন।

স্বামীজীর সঙ্গে আমেরিকা যাত্রাপথেই যে টাটার পরিচয় হয়েছিল, সে-সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"ইয়াকোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে ভ্যাঙ্কুবারে চলিয়া যান।...সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, 'জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র। এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমারও লাভ হবে, দশটা লোকের প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।' কিন্তু টাটা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নানারূপ আপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন। সে সময়ে টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিয়া ছিল।"*

* শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩

তিরিশ বৎসর বয়স্ক এক অখ্যাত ছোকরা সাধু টাটার মতো বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে উপদেশ দিচ্ছেন —এ-ব্যাপারটা ঈষৎ বিস্ময়কর মনে হতে পারে, কিন্তু অন্যত্রও যেমন এখানেও তাই—বিবেকানন্দের পরিচয়পত্রের প্রয়োজন কদাপি হয়নি। পরবর্তী কালে নিবেদিতাকে টাটা বলেছিলেন, (নিবেদিতার ৩ অক্টোবর, ১৯০১-এর চিঠি), "স্বামীজী যখন জাপানে ছিলেন তখন যে-কেউ তাঁকে দেখেছে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য দেখে চমকিত হয়ে উঠেছে।"

এই পর্বে স্বামীজীর সঙ্গে টাটার পরিচয় ঠিক কখন হয়—এবং তার বিস্তৃতি কতদিনের ? স্বামী চেতনানন্দ অনুমান করেছেন, স্বামীজী যখন জাপানের দেশলাই কারখানা দেখতে গিয়েছিলেন —সেখানেই তাঁর সঙ্গে টাটার প্রথম পরিচয় হয়। হতে পারে। জাপানের ইয়াকোহামা "ওরিয়েন্টাল হোটেল রেস্টুরাণ্ট"-এ থাকার সময়েও তাঁদের প্রথম আলাপ হতে পারে—যেমন স্বামী বলরামানন্দ অনুমান করেছেন। [প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯৭৮]। কিন্তু কোনো সন্দেহই নেই, সে পরিচয় গাঢ়তর হয়েছিল ইয়াকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুবর পর্যন্ত জাহাজে যাত্রাকালে। ভালো আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রায় বারো দিন লাগত ঐ জাহাজযাত্রায়।

॥ ২ ॥

১৮৯৩ সালে অখ্যাত তবু বুদ্ধসদৃশ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় দিব্যাগ্নিতে জ্বলে উঠলেন, যার ফলে ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়ন শুরু হয়ে গেল, তখন বলা বাহুল্য জামসেদ টাটার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পরে ভারতীয় জনমনে কোন্ সমুচ্চ শ্রদ্ধার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন—তাও টাটা লক্ষ্য করলেন। এর অল্পদিন পরে তিনি নিজেও চাঞ্চল্যকর একটি কাণ্ড ঘটালেন, যাতে দারুণ নাড়া খেল সরকারী ও বেসরকারী মহল। সে সম্বন্ধে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদটি অংশতঃ এই :

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহদান
মিঃ জে এন টাটার বদান্য প্রস্তাব

"বোম্বাইয়ের সুপরিচিত লক্ষপতি ব্যবসায়ী মিঃ জে এন টাটা উপযুক্তভাবে সংগঠিত একটি কমিটির হাতে কিছু শর্তাধীনে ভূসম্পত্তি দিতে চান, যার থেকে বাৎসরিক আয় হবে সওয়া লক্ষ টাকা। [সম্পত্তি—তিরিশ লক্ষ টাকার]। দানের উদ্দেশ্য, স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন। শিল্প ও বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষার মূল্য সবিশেষ—মিঃ টাটার এই ধারণার কথা সকলেরই জানা আছে। তিনি প্রায়শঃই কিছুসংখ্যক গ্র্যাজুয়েটকে নির্বাচন ক'রে তাঁর কোনো না কোনো মিলে তাদের তি বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশীরূপে নিয়োগ করেন এবং প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই গ্র্যাজুয়েটদের ঐকালে ভাতা দেন।…মিঃ টাটা অধিকন্তু কিছুকাল ধরে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করছেন।…তিনি অনুভব করেছেন—যেখানে জাপানের পক্ষে পৃথিবী-খ্যাত গবেষণা করা সম্ভব হয়েছে, এবং দুজন জাপানী এমনকি চিকাগোয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, সেখানে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অনুরূপ কোনো সাফল্যের নিদর্শন দেখাতে পারেনি। মিঃ টাটা না ভেবে পারেননি —দেশের প্রাকৃতিক ও অন্য সম্পদসমূহের উদ্ধার ও সদ্ব্যবহার করতে পারে প্রতিভাবান তরুণেরাই, যারা শিল্প-বাণিজ্যগত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে।…এদেশের ছাত্রদের গবেষণাকার্যে প্রণোদিত করবার জন্য…গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে ছাত্রা

প্রখ্যাত শিক্ষকদের অধীনে কাজ করবে।

"মিঃ টাটা বুঝেছেন এজন্য দরকার—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্নাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির (যথা জন হপকিনস্ বা ক্লার্ক) আদর্শে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা আমাদের কোনো একটি ইতিমধ্যে-স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন। তাই হবে ভারতবর্ষে গবেষণার মনোভাব-সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ। মিঃ টাটা ইউরোপে প্রাথমিক খোঁজখবর নিয়ে, এবং ইংলণ্ড ও পাশ্চাত্ত্যের অন্যত্র সর্বোচ্চ শিক্ষাবিজ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ ক'রে, উপরিউক্ত প্রস্তাব করেছেন।"

সংবাদটি যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে অপরিসীম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে, তা সহজেই অনুমেয়। তি-রি-শ ল-ক্ষ টাকা দান !! হৃতসর্বস্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার তখন। সে টাকা দিচ্ছেন একজন ব্যবসায়ী—কিন্তু কোনো সরকারী প্রসাদ কামনায় নয়—শিক্ষাবিস্তারের জন্য !!! প্রস্তাবটি তখনই এল যখন ভারতে শিক্ষা-সংকোচের জন্য সরকারী আয়োজন চলেছে। দারুণ সাহস টাটার—তিনি তাঁর এই আপাত-নিরীহ দানের মধ্য দিয়ে সরকারকে কঠোর আঘাত হানলেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য পুঁথিপড়া বিদ্যার যেটুকু বিস্তার ইংরেজ এদেশে করেছিল—তার মূল উদ্দেশ্য আমলাতন্ত্রের মসীভৃত্য তৈরী। মৌলিকতার সঙ্গে যে এই শিক্ষার কোনো সম্পর্কই ছিল না, তা মেরী হেলকে লেখা স্বামীজীর চিঠিতেই (৩০ অক্টোবর, ১৮৯৯) উল্লিখিত হয়েছে। দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গেও ঐ শিক্ষার যোগ বিশেষ ছিল না, কারণ ফলিত বা তাত্ত্বিক বিজ্ঞানশিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতেই জামসেদ টাটা এগিয়ে এলেন বিপুল অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। শিক্ষিত ভারতবর্ষ টাটার জয়ধ্বনি দিল সমস্বরে।

কলকাতার বেঙ্গলী কাগজ কয়েকদিনের মধ্যে টাটা-পরিকল্পনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ হাজির করে বলল, শেষপর্যন্ত অবশ্য সঠিক পরিকল্পনা নির্ধারণ করবে একটি কমিটি, যথোপযুক্ত অনুসন্ধানাদির পরে। বেঙ্গলীর ৮ অক্টোবরের সংবাদে পাই: এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষাদানের বিশ্ব-বিদ্যালয়—পরীক্ষাগ্রহণের বিশ্ববিদ্যালয় নয়। উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে যারা আসবে, তারাই এখানে প্রবেশ করতে পারবে। এখানে গৃহীত হবে ইউরোপে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি, যথা 'জার্মান সেমিনারিয়া', 'ফ্রেঞ্চ কনফারেনসেস', আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রিসার্চ ক্লাসসমূহে অনুসৃত পদ্ধতি। ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষের আশঙ্কা নেই, কারণ যেখানে অপরাপর বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা সমাপ্ত করবে, সেখান থেকে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান আরম্ভ হবে। এবং এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নয় বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণ বন্ধ করা—এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অবশ্যই বিদেশে পরবর্তী শিক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এখানে প্রদত্ত সকল শিক্ষাই বিশেষজ্ঞ স্তরের ইত্যাদি।

টাটার এই বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে সরকার কি করল? বলা বাহুল্য স্বাভাবিক কর্মই করল। ভারতবর্ষে যে-জিনিসকে শাসকশ্রেণী ঠেকাতে চেষ্টা করেছে স্বদেশের স্বার্থে, (ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-জ্ঞান ও কারিগরি-দক্ষতা অবশ্যই বিলেতি শিল্পবাণিজ্যের অবাধ শোষণের সহায়ক হবে না)—সে বস্তুর প্রসার তারা স্বচ্ছন্দে ঘটতে দিতে পারে না, যত কৌশলেই সে চেষ্টা করা হোক। টাটা-প্রস্তাব ঠেকাতে সরকার চতুর ও নিম্নশ্রেণীর কৌশল দেখাতে লাগল যৎপরোনাস্তি। ভাইসরয় লর্ড কার্জন টাটা-পরিকল্পনার সমালোচনা করলেন প্রকাশ্যে, যদিও সহানুভূতি প্রদর্শনের পরিশীলিত ভঙ্গিটি ঠিকই বজায় রাখলেন। বেঙ্গলী ১৪

জানুআরি, ১৮৯৯, লিখল :

"লর্ড কার্জন মিঃ টাটার পরিকল্পনার বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েও, কতকগুলি ব্যাপারে সুগভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যথেষ্টসংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাবে কিনা সে-সম্বন্ধে লর্ড-বাহাদুর সুনিশ্চিত নন। শূন্য বেঞ্চের সামনে উচ্চ-মাহিনার অধ্যাপকদের বক্তৃতা করতে নিয়োগ করা সঙ্গত নয়। লর্ড-বাহাদুরের আরও সন্দেহ, সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে-সমস্ত ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুবে, তারা অবিলম্বে চাকুরি পাবে না, কেননা, বিরাটসংখ্যক শিক্ষিত ভারতীয় উপযুক্ত চাকুরি, এমন কি কোনো চাকুরিই তো এখন পাচ্ছে না।"

ঐ মন্তব্যেই দেখি, মহীশূরের দেওয়ান তাঁর রাজ্যের পক্ষে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা দেবার প্রস্তাব করেছিলেন।

অতঃপর সরকারী প্ররোচনায় টাটা-কর্তৃক নিয়োজিত অধ্যাপক রামজে অনুসন্ধানের পরে যে-রিপোর্ট দিলেন, তাতে অধিকতর অর্থের প্রয়োজনের কথা বলা হল, এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহির্গত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল নয়, সেই কার্জনী-ভাষ্যের সমর্থনও রইল—কিন্তু একইসঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান-শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার কথা না বলে পারা গেল না !!

সরকারী বিরোধিতায় টাটা ধাক্কা খেলেন। যেখানে আরও অর্থের প্রয়োজন, সেখানে বেসরকারী হস্ত গুটিয়ে গেল, কারণ পরাধীন ধনীগণ সরকারের শক্ত চোয়াল দেখতে ভালবাসেন না। এই পরিস্থিতিতে শোনা গেল, টাটা গত্যন্তরহীন হয়ে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করছেন। সারা দেশের বুদ্ধিজীবী-মহল আর্তনাদ করে উঠল, কারণ দেশভাবুকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, এই "ইনস্টিটিউট অপূর্বভাবে ভারতের শিল্প-জাগরণের দিন-সূচনাকে ত্বরান্বিত করতে উদ্দিষ্ট। শিল্প-জাগরণের উপরই নির্ভর করছে ভারতের লক্ষ-লক্ষ মানুষের পরিত্রাণ। ...ভারতের পুরাতন শিল্প অতীতের বস্তু এখন। নবযুগের প্রয়োজন নতুন শিল্প, অব্যবহৃত সম্পদের পুনরুদ্ধার, এদেশে সর্বত্র ছড়ানো কাঁচা মালের পূর্ণ ব্যবহার। ও-সবই অপেক্ষা করে আছে সন্ধানী প্রতিভার যাদুস্পর্শের জন্য।" [বেঙ্গলী, ৫ মার্চ, ১৮৯৯]।

বেঙ্গলী ৬ এপ্রিল লিখল: "মিঃ টাটার ইনস্টিটিউট ভাবীকালে সমুচ্চ মনন-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠার জন্য নির্ধারিত। সেই প্রতিযোগিতা-ভূমিতে আমাদের সর্বোত্তম ও মহত্তম যুবকগণ মৌলিক গবেষণার দিব্য উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়ে, পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করে যাবে, বস্তুর উপর মানব-মনের সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এইসকল বিরাট আশা মিঃ টাটার প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তিনিই জাগিয়েছেন আশা। এখন তিনি সরে যেতে পারেন না। না—তাঁর সমাজবোধ—তাঁর জনকল্যাণেচ্ছা—তাঁকে সরে যেতে দেবে না।"

॥ ৩ ॥

পাঠকগণ অবশ্যই বুঝবেন—টাটা-পরিকল্পনায় স্বামীজী কতখানি আগ্রহবোধ করেছিলেন। 'আগ্রহ' কথাটিও যথেষ্ট নয়—বলা উচিত, স্বামীজী এ-সম্বন্ধে ব্যাকুলতাবোধ করেছিলেন। এ যেন তাঁর একটি জীবনস্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাবনা। ফেলে-আসা ইতিহাসের দিকে যদি আমরা দৃষ্টি ফেরাই দেখতে পাব—স্বামীজীর আমেরিকা গমনের অন্যতম কারণ—দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা প্রতিকারের উপায় সন্ধান। পরিব্রাজক-জীবনে ভারত-ভ্রমণকালে তিনি ভারতের বিধ্বস্ত নিঃস্ব অবস্থা দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন,

ভেবেছেন—কেবল কৃষিতে এদেশের দারিদ্র্য দূর হবে না, পরিপূরক শিল্প চাই। সেই শিল্পায়নের পদ্ধতি শিখে নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে শিল্প-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে। স্বামীজী তাঁর এই উদ্দেশ্যের কথা নানা জায়গায় নানাভাবে বলেছেন। সে-সকলের উল্লেখ থাক। কিন্তু আমেরিকায় পৌঁছেই, ধর্মমহাসভায় আবির্ভূত হবার আগেই, তিনি এ-সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কিছু অংশ উপস্থিত করা যায়। লুই বার্ক তাঁর 'ডিসকভারিজে' আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে নিম্নের সংবাদগুলি সংকলন করে দিয়েছেন :

"বক্তা তাঁর দেশবাসীদের জন্য তাঁর কর্মোদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন : তিনি দেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সন্ন্যাসীদের সংগঠিত করতে চান—যাতে এই সন্ন্যাসীরা জনগণকে তাঁদের শিল্প-জ্ঞানের ফলদান করতে পারেন। তার দ্বারা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।" ['ডেইলি গেজেট', ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩]।

'বক্তা তীব্রভাবে ভারতের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কথা বলেন।...অর্ধেক মানুষ দিনে একবার খাবার জোটাতে পারে, বাকি অর্ধেক জানে না, পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে।... বক্তা বলেন, ভারতের লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত, পীড়িত মানুষের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমেরিকান জনগণকে অবহিত করবার জন্য তিনি এসেছেন।... আমেরিকানরা ভারতে ধর্মশিক্ষাদানের জন্য মিশনারি না পাঠিয়ে, জনগণকে শিল্পশিক্ষা দিতে পারবে, এমন লোক পাঠালেই ভালো করবে।" ['সালেম ইভনিং নিউজ', ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩]।

"আধুনিক ভারতবর্ষে...মিশনারিরা জনগণকে ধর্মশিক্ষা না দিয়ে সামাজিক ব্যাপারে এবং শিল্প-সম্বন্ধীয় বিষয়ে শিক্ষিত করলেই ভালো করবেন।" ['ডেইলি গেজেট', ৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩]*

আমেরিকায় পদার্পণ করেই যখন স্বামীজী এইসব কথা বলেছেন, তখন ধরে নিতে পারি, তার সামান্য আগে আমেরিকার পথে জামসেদজী টাটার মতো দেশহিতব্রতী বদান্য ব্যবসায়ীকে কাছে পেয়ে, এই বিষয়ে আরও বহু কথা বলেছিলেন। নিশ্চয় তিনি টাটাকে ভারতে শিল্প-শিক্ষাদানের জন্য সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ করার পরিকল্পনার কথা সবিশেষ বলেছিলেন। কে জানে, টাটার মনে এই কথাগুলি বীজাকারে বর্তমান থেকে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরিকল্পনায় অঙ্কুরিত হয়েছিল কিনা।

জামসেদজী টাটা যে স্বামীজীর সঙ্গে পাঁচ বছর আগেকার প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা স্মরণ করেছিলেন, তা ২৩ নভেম্বর ১৮৯৮, তারিখে স্বামীজীকে লেখা তাঁর পত্র থেকে দেখা যায়। পত্রটি এই :

> "প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, আমার বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর পথে জাহাজে সহযাত্রীরূপে আমাকে মনে রেখেছেন। ভারতে সন্ন্যাসীসুলভ ত্যাগের আদর্শের পুনর্জাগরণ, তাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান মুহূর্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে।
>
> "ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন সম্বন্ধে আমার পরিকল্পনার কথা

* 'ক্রিটিক' পত্রিকায় কিছু পরে (১১ নভেম্বর, ১৮৯৩) লুসি মুনরো লিখেছিলেন, "তাঁর [স্বামীজীর] আমেরিকায় আসার আদি উদ্দেশ্য ছিল ভারতে হিন্দুদের মধ্যে নতুন শিল্পোদ্যোগে আমেরিকানদের আগ্রহী করা।" ['ডিসকভারিজ', ৯৮]

আপনি নিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন। এই প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথা আমি স্মরণ করছি। মনে হয়, ত্যাগব্রতী মানুষেরা আশ্রমজাতীয় আবাসিক স্থানে অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রে যদি প্রাকৃতিক ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ করে—তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগাদর্শের শ্রেষ্ঠতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে না। আমার ধারণা, এই জাতীয় ধর্ম-যুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ করলে তার দ্বারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের উন্নতি হবে, এবং দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। আর এই অভিযানে বিবেকানন্দের তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি কি এই পথে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে নবজীবন দান করবার জন্য আত্মনিয়োগ করবেন? বোধহয় শুরুতে এ-ব্যাপারে জন-সাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য অগ্নিময় বাণী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রচার করলেই ভালো করবেন। প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার সানন্দে বহন করব। শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় স্বামীজী, আপনার বিশ্বস্ত, জামসেদজী এন টাটা।"

টাটা বুঝেছিলেন, তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে শুধু টাকাই যথেষ্ট নয়, মানুষ চাই—আর মানুষকে আহ্বান করে জাগাতে তাঁর কাছে বিবেকানন্দের চেয়ে বড় সেনাপতি কেউ ছিলেন না। স্বামীজী টাটার প্রস্তাবিত প্যামফ্লেট প্রচার করেছিলেন কিনা জানা যায়নি, সম্ভবত করেননি, কিন্তু টাটার আবেদনের উত্তরে প্রবুদ্ধ ভারতে এপ্রিল, ১৮৯৯ সংখ্যায় তাঁর দ্বারা বা তাঁর নির্দেশে যে-লেখা হয়েছিল, আমরা এখানে তা উপস্থিত করছি :

মিঃ টাটার পরিকল্পনা

"ভারতের মঙ্গলের জন্য এ-পর্যন্ত যত পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মিঃ টাটার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি পরি-কল্পনার অপেক্ষা সময়োচিত ও সুদূরপ্রসারী ফলপ্রদ আর কিছু হয়েছে কিনা সন্দেহ। পরিকল্পনাটি আমাদের জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে ঠিক দুর্বল জায়গাটি কোথায় তা পরিষ্কার অনুধাবন ক'রে, তার দূরীকরণে যে-প্রকার স্বচ্ছদৃষ্টি, সুনির্দিষ্ট বুদ্ধি দেখিয়েছে, তার অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র দেখা গেছে ঐ পরিকল্পনার সহগামী বিপুল বদান্যতার মধ্যে।

"মিঃ টাটার পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে এখানে প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের পাঠকগণের সকলে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে মিঃ পাদ্‌শার প্রাঞ্জল রচনা পড়েছেন। এখানে কেবল আমরা এর পশ্চাদ্বর্তী নীতির রূপটিই তুলে ধরব।

"যদি ভারতকে বাঁচতে ও উন্নতি করতে হয়, যদি পৃথিবীর মহান জাতি-সমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে স্থানলাভ করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হবে। আর এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে ঐ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে—মানবজাতির প্রধান দুই অন্নদাতা—কৃষি ও বাণিজ্যের অস্থি-সন্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের দ্বারা।

"এখন প্রতিদিন আধুনিক মানুষ যে-হারে চতুর কলাকৌশল বাড়িয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতি কদাপি টিকতে পারবে না। যারা সবচেয়ে কম শক্তি ও অর্থব্যয় ক'রে প্রকৃতির কাছ

থেকে সবচেয়ে বেশি আদায় ক'রে না-নিতে পারবে—তাদের পক্ষে দ্বার রুদ্ধ—পতন ও বিনাশই তাদের নিয়তি—কোনোই অব্যাহতি নেই।

"কারো-কারো কাছে মনে হয়েছে, পরিকল্পনাটি কল্পনাবিলাসে পূর্ণ, কারণ এর জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন, অন্ততঃ ৭৪ লক্ষ টাকা। এই আশঙ্কার উপযুক্ত উত্তর: যদি একজন মানুষ, যিনি আবার দেশের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি নন, একলা ৩০ লক্ষ টাকা দিতে পারেন, তাহলে অবশিষ্ট দেশ কি বাকি অর্থ জোটাতে পারে না? তেমন চিন্তা কি বিসদৃশ হবে না—যখন আমরা জানি, এই পরিকল্পনার কোন্ বিশাল গুরুত্ব?

"পুনর্বার বলছি: আধুনিক ভারতে সমগ্র জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনায় আকীর্ণ এই ধরনের আর কোন পরিকল্পনা উপস্থিত হয়নি। সুতরাং সমস্ত জাতি যেন শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে উঠে পরিকল্পনাটিকে সফল করবার জন্য আত্মনিয়োগ করে।"

প্রবুদ্ধ ভারতের এই সময়ের সম্পাদকীয় রচনা-রীতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই বুঝবেন, এই পত্রিকাটি মন্তব্য করার সময়ে কতখানি কঠোরভাবে সংযত ছিল। সেই 'সংযম' সে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে। ক্ষুদ্রাকার সম্পাদকীয়ের মধ্যে দু'বার বলা হয়েছিল—আধুনিক ভারতের মঙ্গলের জন্য এর অনুরূপ কোনো পরিকল্পনা করা হয়নি। বলা বাহুল্য এই মন্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব অনেকখানি প্রকাশিত।

॥ ৪ ॥

টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে স্বামীজীর আগ্রহ কেবল প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশ্য সমর্থনের পথেই প্রবাহিত হয়নি—অন্তরালের প্রচেষ্টাতেও তাঁর হাত ছিল। স্বামীজীর ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর শিষ্য ও বন্ধুরা। এক্ষেত্রে নিবেদিতা ও মিসেস বুলের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। স্বামীজীর নানা কাজে সহায়িকা মিস ম্যাকলাউড টাটার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে সে-সম্বন্ধে স্বামীজীকে জানালে তিনি উত্তরে লেখেন (১৭ ফেব্রুআরি, ১৯০১): "মিঃ টাটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ, এবং তাঁকে উত্তম ও দৃঢ়চেতা মানুষ বলে জেনেছ, এতে আমি খুবই খুশি। শরীরে যদি কুলোয় আমি অবশ্যই তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বোম্বাই যাব।"

টাটা-পরিকল্পনার পক্ষে আন্দোলনে নিবেদিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনি দেখলেন, এই পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে স্বামীজীর দীর্ঘপোষিত একটি আকাঙ্ক্ষার পূর্তি ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি এর পক্ষে সংগ্রামে নেমে পড়েছিলেন।

জামসেদজী টাটার জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন, বারজোরজি পাদ্শা, একথা টাটার জীবনীতে বলা হয়েছে। পাদ্শাই টাটার শিক্ষা-পরিকল্পনার সংগঠনকর্তা। নিবেদিতার চিঠি থেকে দেখতে পাই, পাদ্শা ও তাঁর বোন স্বামীজীর কাছে ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে এসেছিলেন, এবং গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে স্বামীজীর পাদমূলে বসে শিক্ষা নিয়েছিলেন। ঐকালে নিবেদিতা পাদ্শার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। (মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ৩০ জানুআরি, ৭ ফেব্রুআরির চিঠি দ্রষ্টব্য)। অনুমান করতে বাধা নেই—পাদ্শা টাটা-পরিকল্পনার বিষয়ে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষ রকম

আলোচনা করেছিলেন। স্মরণ করতে পারি, এর কিছুদিনের মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারতে টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য করা হয়।

অন্তরাল থেকে নিবেদিতা টাটা-পরিকল্পনার জন্য কতখানি করেছেন, তার কিছু পরিচয় আমরা তাঁর চিঠিপত্র থেকে পাই। ভারতের সরকারী মহলে প্রচণ্ড বাধা পেয়ে টাটা ইংলণ্ডে যান—সেখানকার কর্তাদের স্বমতে আনবার চেষ্টায়। এই আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নিবেদিতা অগ্রণী ভূমিকা নেন। শিক্ষাবিভাগের কর্তা স্যার জর্জ বার্ডউডকে প্রভাবিত করার জন্য, কিংবা তাঁদের আসল মতলব কী তা আঁচ করার জন্য, মিসেস বুলের দ্বারা নিবেদিতা এক ভোজসভার আয়োজন করালেন—যাতে উপস্থিত থাকলেন বার্ডউড, টাটা, মিসেস বুল ও নিবেদিতা। ভোজসভায় কী ঘটেছিল তা নিবেদিতা অব্যবহিত পরে এক দীর্ঘ পত্রে (৫ নভেম্বর, ১৯০০) ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীমতী অবলা বসুকে লিখে পাঠান। টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিবেদিতার অতিরিক্ত এক আগ্রহ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যদি সত্যই এই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়, তাহলে তার সঙ্গে ডাঃ বসুকে যুক্ত করে দেওয়া যাবে, যাঁর কর্মজীবনকে অবিচারে অপমানে দুঃসহ করে তুলছিল শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি নীচ সাহেব কর্মচারী।

নিবেদিতার সংশ্লিষ্ট পত্র থেকে দেখা যায়, স্যার জর্জ বার্ডউড এ-ব্যাপারে একেবারেই ঘাড় পাততে চাননি। নির্ভেজাল মানুষ তিনি, পরিষ্কার বলেছিলেন, ভারতবাসীর হিতের জন্য নয়—ইংলণ্ডের হিতের জন্যই ইংলণ্ডের ভারতশাসন। তিনি আরও বলেন, কোনো ব্যাপারে ভারতবাসীর ইচ্ছাপূরণ না হলে তারা রেগে গিয়ে কিছু কাণ্ড করে বসবে, এমন সম্ভাবনা নেই, কারণ লোকগুলি নিরামিষাশী। এলোমেলো নানা কথার মধ্যে নিবেদিতা অনেক কষ্টে টাটা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি তুলতে পারেন সেখানে যাতে ভারতীয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সেই প্রস্তাব তিনি তোলেন। তৎক্ষণাৎ বার্ডউড উদার বিশ্বমানবিকতায় আক্রান্ত হয়ে বলেন, বিজ্ঞান ব্যাপারটা তো ভারতীয় কিছু নয়—ওটি বিশ্বব্যাপার—সুতরাং পৃথিবীর দরজা ওখানে খোলা রাখতেই হবে। আর তা ঘটতে পারবে সরকারের কাছে টাটার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে। (অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যাপার তাতে থাকবে না)। অসতর্কভাবে বার্ডউড বলে ফেলেন—কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা জঘন্য ("কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়"), —তাতে নিবেদিতা বিঁধিয়ে বলেন—কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তো পুরো সরকারের কব্জায়। সরকারী পরিচালনার মানে যদি এই ধরনের দুর্গতি বোঝায় তাহলে মিঃ টাটা কি করে সরকারের হাতে টাকা তুলে দেবেন? বিপাকে পড়ে বার্ডউড কথা ঘোরাবার চেষ্টা করেন। রেগে গিয়ে বলেন, গত ৫০ বছরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কেউ বেরোয়নি। (জলজ্যান্ত জগদীশ বসু তখন ইংলণ্ডে, তবু বার্ডউড একথাটা নির্বিকারে বলতে পেরেছিলেন!)। নিবেদিতা ধারালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন, "ইতিহাসে এই প্রথম রয়াল সোসাইটি এক্মাস ছুটির শুরু থেকে শেষ অবধি তার দরজা খোলা রেখেছিল পদার্থবিদ্যার এক হিন্দু অধ্যাপকের জন্য।" ভারতে দেশীয় অধ্যাপকরা ইংরাজ অধ্যাপকদের তুলনায় কম মাইনে পান, এই অসুবিধাজনক কথাও নিবেদিতা শোনান। ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি না হবার কারণ যে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে সরকারের অনিচ্ছাগত শৈথিল্য, সেকথা বলতেও ছাড়েননি। অপর পক্ষে বার্ডউডের ধরতাই-বাক্য ছিল : "মিঃ টাটা, আপনি আর

A Native Indian Post-Graduate University.

To

Dear Sir or Madam.

A Parsi Gentleman, Mr. Tata, who is anxious to promote higher Education among the Natives of India, and especially to encourage Scholarship & scientific research, has offered to find a sum of £200 000 for the purpose. The question arises how best the objects in view can be attained.

Mr Tata has been in communication with the Government of India, and he has appointed an Advisory Committee, to discuss the preliminaries of his scheme.

On this Committee, the European element is, in the opinion of many interested in the success of Mr. Tata's proposals, unduly large. It is felt that [illegible] would [illegible] proposed settlement [illegible] guided by the advice & opinion of the [illegible] Native Community.

Mr. Tata, [illegible] himself a [illegible] [illegible] that such a [illegible] which would be a wise one to adopt. Some of his friends — who are anxious [illegible], and who [illegible] second his own wish that his endowment should be devoted purely to the advancement of Native [illegible] on National lines — are aware that he would be greatly influenced by the opinion of impartial English people, especially those possessing some knowledge of India.

In order therefore to strengthen his hands in making such arrangements as may best give effect to his intention, the accompanying statement of opinion is being signed by a few influential [illegible]

and will be forwarded to him in India immediately. Being intended solely to afford Mr Tata personally the assistance of English advice which he desires to obtain, it will not commit those signing it to any further active interest in the scheme. If therefore you approve of the object in view, you will perhaps be good enough to attach your signature to the Statement of Opinion, & return it to

Your obedient Servant

Margaret E Noble.

Address:— Miss Noble
C/o Mrs Ole Bull
Messrs. Baring Bros. & Co.
London.

চিত্র ১ : নিবেদিতার পত্র (আবেদন)

Statement of Opinion to be forwarded to J. N. Tata Esq.

Having read the accompanying statement with regard to Mr. Tata's Scheme for promoting higher Education in India, I am of opinion that for the attainment of this object he would do well to be guided by the best educated Native as distinguished from European opinion.

I am also of opinion that on all the permanent governing bodies of the Institution the four communities, — Parsi, Mohammedan, Hindu & European, — ought always to be equally represented, no one in excess of [illegible].

And I [illegible] the [illegible] ought to be conducted entirely by Natives [illegible] guarantees being now given that Native students shall have every facility & encouragement at all times to distinguish themselves in scientific studies and to hold the highest posts in the Institution.

(Signed) Wm. James (with doubts as to the permanent wisdom of the second provision)

চিত্র ২ : নিবেদিতার পত্রসংলগ্ন বিবৃতি (স্বাক্ষরসংগ্রহার্থ)

Dear Miss Noble,

I gladly sign your plea, even at the risk of seeming impertinently to ~~thrust~~ myself into regions of which I am totally ignorant. I do so on the general principle of letting at the inflated pretensions of the "Anglo-saxon". Hereafter I shall be for the "native" every time.

I regret to say that for practical purposes I am no better than I was in August. So vault Regina!

A happy New Year and Century to both yourself and Mrs. Bull.

Sincerely yours,

Wm. James

Albergo Primavera

Roma, Jan. 3. 1901

চিত্র ৩ : নিবেদিতাকে লিখিত উইলিয়ম জেমসের পত্রের কিয়দংশ

কারো সঙ্গে পরামর্শ করবেন না ; আপনি আপনার ঐ তিরিশ লক্ষ টাকা এবং কর্মদায়িত্ব প্রাণখুলে সঁপে দিন প্রফেসার রামজের হাতে।"

বার্ডউডের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও নিবেদিতা থামেননি। তিনি ভারতীয় বিষয়ে আগ্রহী পৃথিবীর বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে টাটা-পরিকল্পনার সম্বন্ধে মতামত চেয়ে পত্র পাঠাতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, ঐ সকল মত উপস্থিত করে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করা। রেমঁ-সংগ্রহে এই বিষয়ে মূল্যবান কিছু দলিল আছে। তার মধ্যে পেয়েছি নিবেদিতার স্বহস্ত-লিখিত আবেদন-পত্রটি (চিত্র ১ ও ২ দ্রষ্টব্য) এবং দার্শনিক উইলিয়ম জেমসের স্বাক্ষরিত উত্তরপত্র (চিত্র ৩ দ্রষ্টব্য)। নিবেদিতা তাঁর পত্রে টাটা-পরিকল্পনার সুন্দর সারসংক্ষেপ করে বলেন : সরকারের নির্দেশক্রমে এই পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য মিঃ টাটা যে অ্যাডভাইসারি কমিটি করেছেন, তাতে "ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা অহেতুকভাবে বেশি। যদি শিক্ষিত দেশীয় মানুষদের মতামত ও উপদেশের দ্বারা ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় তবেই এর ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা বর্ধিত হবে।" "ভারতীয় ধারায় ভারতীয়দের শিক্ষাবিস্তার" যাতে হয়, সেজন্য নিবেদিতার প্রস্তাব ছিল : "এই প্রতিষ্ঠানের সকল ধারার কার্যকরী সমিতিতে পার্শী, মুসলমান, হিন্দু ও ইউরোপীয়—এই চার সম্প্রদায়ের সদস্যসংখ্যার সমানুপাত থাকুক।··· শিক্ষা পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারায়। দেশীয় ছাত্ররা যাতে সর্বসময়ে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যাপারে সর্ববিধ সুযোগলাভ করে, তার গ্যারান্টি থাকবে—সেইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের উচ্চতর পদের গ্যারান্টিও।"

নিবেদিতা এখনো অদম্য। টাটা-পরিকল্পনা নিয়ে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ২৫ জানুআরি, ১৯০১ তারিখে পত্রে তিনি মিস ম্যাকলাউডকে জানান : "পরের সপ্তাহে তোমাকে ও রাজাকে [স্বামীজীকে] টাটা-পরিকল্পনার উপরে প্রবন্ধটি পাঠাব, যা সদ্য মিঃ ম্যাকনীলের কাগজে বেরিয়েছে। প্রিয় মিঃ ম্যাকনীল! কিভাবে যে তাঁকে আমার আনন্দ বোঝাব জানি না।" নিবেদিতা এইকালে ভারতীয় ব্যাপারে সুবিধা আদায়ের জন্য লণ্ডনের প্রভাবশালী মহলে ঘোরাফেরা করেছেন। ইংরাজ মহিলা হিসাবে তাঁর কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল। পরবর্তী কালেও টাটা-পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল দেখা যায়। নিবেদিতা বিদ্যালয়ে রক্ষিত নিবেদিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে টাটা-পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংবাদপত্রের কিছু বিবরণ আছে। বৃটিশ বুরোক্র্যাটদের মুখপত্র এলাহাবাদের "পায়োনীয়ার" যখন কটু সন্দেহ প্রকাশ করে লেখে —টাটার ঐ দানের উদ্দেশ্য সরকারের সাহায্যে "ফ্যামিলি ট্রাস্ট" তৈরি করে নেওয়া—তখন নিবেদিতা জামসেদজীর মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি লেখেন :

"কয়েক বছর আগে লণ্ডনে যখন টাটা-পরিকল্পনা নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের সদস্য ও অন্যান্যদের নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছিল—তখন তাদের অনেকগুলিতে ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত ছিলাম। মিঃ টাটা জাতির উদ্দেশ্যে তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন···যা থেকে সেইকালে বাৎসরিক সওয়া লক্ষ টাকা আয় হবে বলে মনে হয়েছিল। সরকার তৎক্ষণাৎ আপত্তি করে বলেন—টাটার প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য ভবিষ্যতে হ্রাস পেতে পারে। টাটা বলেন, উল্টোটাই হবার সম্ভাবনা। কিন্তু সরকারকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে, নিজ পুত্রদের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে, তিনি স্থির করেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পূর্বোক্ত অর্থসাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য তিনি আরও তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যাবেন,

যা অন্যথা পেতেন তাঁর পরিবারবর্গ। অর্থাৎ দাঁড়াল —টাটা নিজপুত্রদের 'লাভের' জন্য সরকারকে এমন একটি পরিকল্পনায় জড়াতে চাইছেন, যার পরিণাম নিজ পুত্রদের অনাহার পর্যন্ত গড়াতে পারে !!"

নিবেদিতা, টাটাকে এবং তাঁর মহৎ অভিপ্রায়কে কতখানি সমাদর করতেন, তা শ্রীমতী টাটার মৃত্যুর পরে লেখা তাঁর পত্রে (১০ এপ্রিল, ১৯০৪) প্রকাশিত :

"এস কে র‍্যাটক্লিফ গত রাত্রে আমাকে বলেছেন—ইণ্ডিয়ান মিরার জানিয়েছে যে, ভারত সরকার শেষপর্যন্ত মিঃ টাটার দান-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে !!!!

"মিসেস টাটারও সত্য মৃত্যু হয়েছে। বিচ্ছেদের পালা বোধ হয় এসে গেছে—পৃথিবী-মঞ্চে বৃদ্ধ মানুষটির ভূমিকা বোধ হয় শেষ ! আমি যথার্থই দুঃখিত।

"বস্তুতঃ দেখা যায়, যাদের বাঁচা উচিত নয় তারাই বাঁচে, খাঁটি লোকেরা মরে যায়। আমাদের মনোজগৎ ছাড়া পৃথিবীর নীতিবিধানের নিশ্চয়-ভূমি বোধ হয় অন্যত্র নেই।"

॥ ৫ ॥

নিবেদিতার পত্রাদি থেকে বোঝা যায়, সরকার ভারতীয় পরিচালনাধীনে কোনো উচ্চতর শিক্ষা-সংস্থা রাখতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। টাটা অপরপক্ষে গোটা ব্যাপারটির উপরে ভারতীয় কর্তৃত্ব চাইছিলেন। সরকার যে টাটা-পরিকল্পনাকে স্বীকৃতি দিতে গড়িমসি করছিলেন, তার মূল কারণ এই কর্তৃত্বের প্রশ্নেই নিহিত ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হল—ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস-লিখিত টাটার বিস্তারিত জীবনী (যে-জীবনী টাটা-পরিবারের সহায়তায় লিখিত হয় ; সুতরাং বলা যায় 'সরকারী' জীবনী) পড়লে মনে হবে, টাকার অভাবের জন্যই বুঝি সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থনে অনিচ্ছুক ছিল। সত্যের এমন ব্যত্যয় অল্পই দেখা যায়। নিবেদিতার পূর্বে-উল্লিখিত পত্র থেকে ভিতরের কথাটা পরিষ্কার হয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকার তৎকালীন লণ্ডন-সংবাদদাতা ছিলেন কোনো ভারত-সমর্থক ইংরাজ ; তিনি টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে একাধিকবার লিখেছেন। অমৃতবাজারে ইংলণ্ড থেকে ১৯ নভেম্বর, ১৯০০ তারিখে প্রেরিত পত্রে তিনি কৌশলে এই ভারতীয় কর্তৃত্বের প্রশ্নটিকে বড় করে তুলেছিলেন। টাটার লণ্ডনে গমন, পরিকল্পনা নিয়ে সরকারী মহলের সঙ্গে তাঁর নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির বিবরণ দেবার পরে তিনি আসল কথাটি পেড়েছিলেন—কর্তৃত্ব ভারতীয়দের হাতেই থাক। ঐ ব্যাপারে সরকারী আপত্তি ছিল বলেই তিনি বিষয়টি নিয়ে অনেকখানি লিখেছিলেন। তিনি বলেন : "আমি অন্ততঃ এই আশা পোষণ করতে পারি, জনৈক ভারতীয় ব্যক্তির বৃহৎ হৃদয় এবং দূরদর্শিতা থেকে এই-যে মহান পরিকল্পনার আবির্ভাব হয়েছে—তা যেন প্রধানতঃ ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ভারতের যা পরিস্থিতি তাতে না বললেও চলে যে, কার্যকরী সমিতিতে সরকারী প্রতিনিধিত্ব নির্ঘাত থাকবে ; কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব যেন গৌণ ব্যাপার হয়, কেবল উপদেষ্টারূপেই তাঁরা যেন থাকেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বব্যাপারে যত বেশি ভারতীয়করণ ঘটবে তত বেশি সাফল্য ঘটবে তার। মুখ্যতঃ এটি ভারতীয় ব্যাপার হওয়া চাই।"

বুঝতে অসুবিধা হয় না—এই লেখার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল সরকারের আসল আপত্তির মোকাবিলা করা—যে কাজ নিবেদিতা যথেষ্ট করেছেন। নিবেদিতা যেমন উইলিয়ম জেমসকে টাটা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—তেমনি লেখেন শিক্ষাবিষয়ে অভিজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেসকেও। উত্তরে গেডেস যা লেখেন, তা সমকালে "জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিত পত্ররূপে" ভারতের সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল। গেডেস তাঁর পত্রে শিক্ষা-

নীতির ভারতীয়করণের উপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আমন্ত্রণ করতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। সমন্বয়ের সেই শ্রেষ্ঠ ভাবী সভ্যতার কল্পনা তিনি করেছিলেন।

পটভূমিকা যখন এই—তখন ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নিতান্ত নিরীহভাবে লিখেছেন: "১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে টাটা তাঁর অভ্যাসমতো ইউরোপভ্রমণ করবার কালে লণ্ডনে হাজির হয়ে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে সরকারী মহলে আলোচনাদি করেছিলেন।" (পৃষ্ঠা ১৩৪)। টাটা যে সরকারী বাধা দূর করার জন্যই লণ্ডনে আলোচনার পর আলোচনা করেছেন, সে-বিষয়ে এই ইংরাজ জীবনীকার মনোযোগী হতে পারেননি। অথচ, মিঃ হ্যারিস ইংরাজশাসকদের যতই চুনকাম করার চেষ্টা করুন, তাঁর লেখা থেকে কখনো-কখনো ফুটে বেরিয়েছে ওনারা কি পদার্থ ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "ভাইসরয়ের বিবৃতিতে যখন প্রকাশ পেল, টাটার এই দানের ফলে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই উপকৃত হবে···তখন সাধারণের উৎসাহ বেশ ঠাণ্ডা মেরে গেল।" কার্জনের মন্দ অভিপ্রায় সম্বন্ধে সর্বদাই সহৃদয় সহিষ্ণুতা ইনি দেখিয়েছেন, কিন্তু এঁর লেখা থেকেই পাওয়া গেছে—যে-কার্জন অপ্রচুর অর্থের কারণে টাটা-পরিকল্পনায় অধিক লোকের উপকৃত হবার সম্ভাবনা নেই বলে সমালোচনা করেছিলেন—সেই কার্জনের পরামর্শেই মহীশূর সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুত বাৎসরিক একলক্ষ টাকা কমিয়ে তিরিশ হাজার করে দিয়েছিলেন!! (পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৯)।

জামসেদজী টাটার মুখ্য জীবনীকাররূপে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের ব্যর্থতা এইখানে—তাঁর গ্রন্থে টাটার এই বিষয়ক সংকল্প, এবং তাকে সিদ্ধ করার জন্য দীর্ঘ গৌরবময় সংগ্রামের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি। এখানে স্মরণ করিয়ে দেব—ব্যবসায়িক জীবনে সাফল্য-শিখরে উঠেও জামসেদজী তাঁর দেশহিতৈষণার সর্ব-বৃহৎ পরিকল্পনার সাফল্য দেখে যেতে পারেননি—যে আশাভঙ্গ তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলির উপরে ধূসর ছায়াপাত করেছিল।

রামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্য

আবেদন

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে এবং মোরভিতে (গুজরাট) ১৯৭৯ সালে বিধ্বংসী বন্যায় গৃহহীন পরিবারদের পুনর্বাসন-প্রকল্পের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন বর্তমানে ত্রিপুরা হাঙ্গামা-ত্রাণ, বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে খরা-ত্রাণ এবং সম্প্রতি মালদা, কাটিহার ও গৌহাটিতে বন্যা-সেবাকার্য করিতেছেন। ব্যাপক সময়োপযোগী সেবাকার্য তাৎকালিক অকুণ্ঠ অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত ত্রাণকার্য যথোচিতভাবে চালু রাখিবার জন্য আমরা আরও অধিকতর আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। আপনাদের উদার দান একাউণ্ট পেয়ী চেকে, ড্রাফটে অথবা মনি অর্ডার সহযোগে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করি: সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া ৭১১২০২ (পশ্চিমবঙ্গ)।

রামকৃষ্ণ মিশনে দান, ১৯৬১ সালের ৮০-জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।

ফোন: ৬৬-২৩৯১, ৬৬-৩৫৭৮, ৬৬-৫৮৬৫

স্বামী বন্দনানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ
২৭-৯-১৯৮০

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ভারতে জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি বৈদিক যুগেই (আনুমানিক ২০০০-৬০০ খ্রীঃ পূঃ) হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। এই প্রথার উদ্ভব হয়েছিল অংশত নৃতাত্ত্বিক কারণে এবং অংশত সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতীয় আর্যসমাজে কোনো বৃত্তি বা জীবিকাই বংশানুক্রমিক ছিল না। একই পরিবারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন (ঋগ্বেদ, ৯:১১২)। কিন্তু ঐ সময়কার আর্যেরা অত্যন্ত গাত্রবর্ণ-সচেতন ছিলেন এবং শ্বেতকায় আর্য ও কৃষ্ণকায়, খর্বনাসা অনার্যদের পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁরা যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। এই পার্থক্য শুধু গাত্রবর্ণের জন্য নয়, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখার জন্যও তাঁরা মেনে চলতেন। পরাজিত অনার্যদের তাঁরা 'শূদ্র', 'দাস', 'দস্যুবর্ণ' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। গাত্রবর্ণের পার্থক্য থেকে এই সামাজিক প্রভেদের উৎপত্তি হওয়ার জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আদিতে 'জাতি' শব্দের পরিবর্তে 'বর্ণ' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, 'বর্ণাশ্রম' কথাটির মধ্যেও 'বর্ণ' কথাটির অবস্থিতি লক্ষণীয়। ('জাতি' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়নি।) কালক্রমে বিজেতা আর্যদের মধ্যেই তিনটি বর্ণের উৎপত্তি হল। যজন-যাজন এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা (বিশেষত শাস্ত্র-অধ্যয়ন) নিয়ে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ নামে, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ যাঁরা করতেন তাঁরা ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে, এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন ও অন্যান্য যাবতীয় বৃত্তি যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বৈশ্য নামে পরিচিত হন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত 'পুরুষসূক্তে'র মধ্যেই চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সূক্তে বলা হয়েছে যে 'পুরুষ' বা স্রষ্টার মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, রাজন্য বা ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহুরূপে নিষ্পন্ন হলেন, বৈশ্যেরা হলেন তাঁর ঊরু, এবং শূদ্রেরা তাঁর পদদ্বয় হতে জাত হলেন। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত"। (ঋগ্বেদ, ১০:৯০)। কিন্তু চারটি বর্ণের সৃষ্টি হলেও এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই 'দ্বিজবর্ণ' হিসাবে উপবীত ধারণের অধিকারী ছিলেন, এবং এঁদের মধ্যে বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জন্মের দ্বারাই সব সময় বর্ণ নির্ধারিত হত না, এবং কোনো বৃত্তিই সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল না। তবে শূদ্রদের থেকে অপর তিনটি বর্ণের প্রভেদ ভালোভাবেই বজায় রাখা হয়েছিল। শূদ্রেরা বেদাধ্যয়ন বা যাগ-যজ্ঞ করতে পারতেন না, এমন কি তাঁদের শবদেহ দাহ করাও চলত না।[1]

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ হতে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আনুমানিক নয় শত বৎসর কালকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব বা যুগ বলে গ্রহণ করতে পারি। এই যুগের সূচনায় ভারতীয় আর্য সমাজে সর্বোচ্চ স্থান লাভের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই বর্ণের মধ্যে এক সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণেরা অবশ্যই শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী উপস্থিত করেছিলেন। কিন্তু এই যুগে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যই

1. R. C. Majumdar, Ancient India (Delhi, 1960), pp. 48-49, 87-89

সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের প্রতিবাদই সূচিত হয়েছে, এবং এই দুই বর্ণের লোকেই অন্তত প্রথম দিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[২] তবে প্রথম তিন বর্ণের মধ্যে বিবাহ তখনো প্রচলিত ছিল, এবং এক বর্ণের লোকে বৃত্তি-পরিবর্তনের দ্বারা অপর বর্ণে স্থান-লাভ করতে পারতেন। অবশ্য সবর্ণ বিবাহই ক্রমশ আর্যসমাজে জনপ্রিয় হচ্ছিল।

আলোচ্য যুগে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ব্যবস্থায় দুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমত, আইনের দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের লোকদের নিম্নবর্ণীয়দের তুলনায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ঋণের টাকার উপর সুদের হার ব্রাহ্মণদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কম এবং শূদ্রদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ছিল। আবার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দেখা যায়, যে অপরাধে শূদ্রদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেদের সেই অপরাধেই অনেক লঘু-দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্টান যাজক এবং সন্ন্যাসীরা যেমন বিশেষ কতকগুলি অধিকার ভোগ করতেন, এই যুগের ব্রাহ্মণেরাও তেমনি বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুযোগের অধিকারী ছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে মৌর্যসম্রাট অশোক (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) এই বিশেষ অধিকার লোপ করে তাঁর সাম্রাজ্যে 'দণ্ড-সমতা' ও 'ব্যবহারসমতা' প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করলে ব্রাহ্মণেরা স্বভাবতই তাঁর উপরে অসন্তুষ্ট হন এবং সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবার চেষ্টা করেন।[৩] তবে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে অসবর্ণ বিবাহের ফলে এবং বহু বিদেশাগত এবং ভারতীয় আদিম অনার্য জনগোষ্ঠিকে আর্য সমাজে স্থান দেওয়ার ফলে নানা মিশ্রবর্ণ বা উপবর্ণের উৎপত্তি হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা এই মিশ্রবর্ণগুলিকে বোঝাবার জন্য 'জাতি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বর্ণ এবং জাতি কথা দুটির অর্থ আদিতে পৃথক্ ছিল, পরে অবশ্য এ দুটি প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে স্মৃতিকারেরা 'অনুলোম' বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ অনুমোদন করেন, এবং এই ধরনের বিবাহের ফলে জাত সন্তানদের পিতৃবর্ণের অধিকার দেন। 'প্রতিলোম' বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রী ও নিম্নবর্ণের পাত্রের বিবাহ স্মৃতিকারেরা অনুমোদন না করলেও সমাজে এ ধরনের বিবাহ যে ঘটত তার অনেক প্রমাণ আছে। বিদেশাগত আক্রমণকারী এবং ভারতীয় অনার্য জনগোষ্ঠি-গুলিকে তাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হয়, এবং এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তারা সমাজে গৃহীত হয়। স্মৃতিকারেরা অনেক সময় তাঁদের অসবর্ণ বিবাহের ফলে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণরূপে পরিচিত করেন, যদিও এ প্রচেষ্টা সব সময় বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। হিন্দু-সমাজে এইভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বহু আর্যেতর জনগোষ্ঠি স্থান পায়, এবং প্রতিটি জাতির সামাজিক মর্যাদা এবং বৃত্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, কর্মফল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি

২ Romila Thapar, **A History of India**, Vol. I. (Penguin Books, 1966), pp. 67-68

৩ **R. C. Majumdar, Ancient India**, pp. 202, 471

হিন্দুসমাজের কয়েকটি মৌলিক ধ্যান-ধারণা ও আচার তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল।[৪] আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের অবলুপ্ত করে দিয়ে বিজয়ী ইউরোপীয়েরা যেমন তাঁদের সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন, ভারতে বিজয়ী আর্যেরা সেভাবে কখনোই বিজিত লোকেদের উচ্ছেদ করেননি। তার ফলে সামাজিক প্রভেদ ও বৈষম্য আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে সত্য, কিন্তু অন্য ধরনের সমাধান মানবিক হত কিনা সন্দেহ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে জাতিভেদপ্রথা ক্রমশ কঠোর হতে থাকে। অসবর্ণ বিবাহ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানাহার সমাজের চক্ষে হেয় হয়ে পড়ে। শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচারও প্রবল হয়ে উঠে। কতকগুলি খাদ্য ও পানীয়, যথা গোমাংস, অশুদ্ধ বলে গৃহীত এবং উচ্চবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে কতকগুলি বৃত্তি অপবিত্র বলে বিবেচিত হয় এবং যাঁরা ঐ সব বৃত্তির অনুসরণ করতেন তাঁরা সমাজে হেয় বা অপাঙ্‌ক্তেয় হন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে সমাজে স্বভাবতই তাঁদের বেশ কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্মৃতিকারেরা ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা কমিয়ে আনবার চেষ্টা করতে থাকেন, ক্ষত্রিয়মর্যাদাকে মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। অনুরূপভাবে বৈশ্যদের সংখ্যাও হ্রাস করা হয়। কালক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বংশধরেরা অধিকাংশই শূদ্র পর্যায়ে নেমে আসেন এবং বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রয়ী উপবর্ণ বা জাতিরূপে পরিচিত হন। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি এর ফলে আরো বৃদ্ধি পায়। হূন, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীর দল এই সময়ে ভারতীয় হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে আশ্রয় পেতে থাকেন। চন্দেল্লা প্রমুখ ভারতীয় আদিম অনার্য-গোষ্ঠির লোকেরাও স্থানে স্থানে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তারের চেষ্টা করেন। যেখানে এঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে কোনো বিশেষ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে ঐ রাজবংশের লোকেরা ক্ষত্রিয়মর্যাদা লাভ করার জন্য স্থানীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের আনুকূল্য প্রার্থনা করেন, এবং ঐ আনুকূল্য লাভের জন্য ব্রাহ্মণদের নানাভাবে সন্তুষ্ট করে তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য আরো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিজবর্ণের মর্যাদা একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য হয়। অন্যদিকে শূদ্রদের মধ্যে চণ্ডাল, শবর, নিষাদ প্রভৃতি কয়েকটি নিম্ন-জাতির লোকেরা অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত হন। শহর বা গ্রামের ভিতরে তাঁদের বসবাস করতে দেওয়া হত না। এঁদের কারো ছায়া স্পর্শ করলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিজেদের অপবিত্র বলে বিবেচনা করতেন। এই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে আজও কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়নি।[৫]

বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা প্রতিটি বর্ণ ও জাতির জন্য এক বা একাধিক বৃত্তি নির্দেশ করেন। গীতাতেও বলা হয়েছে যে, ভগবান গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছেন ('চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।' গীতা : ৪।১৩)। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, বৃত্তি ও বর্ণের এই যোগ প্রথম ইংরেজ রাজত্ব-

৪ **Ibid,** p. 202; J. N. Bhattacharya, **Hindu Castes And Sects** (Calcutta, 1968), p. 4

৫ R. C. Majumdar, **op. cit.**, pp. 470-472; Romila Thapar, **op. cit.**, p. 153.

কালে এসে ছিন্ন হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয় তাঁর 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০' বইয়ে লিখেছেন যে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে "গ্রামের কৃষক কারিগর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা বংশপরম্পরায় কৌলিক বৃত্তি পালন করত, কদাচ তার ব্যতিক্রম ঘটত না।"[৬] কিন্তু এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মনুই (আনুমানিক কাল—খ্রীঃ পূঃ ২০০-২০০ খ্রীঃ) যে সব ব্রাহ্মণ স্বকুলোচিত বৃত্তিতে জীবিকা উপার্জনে অসমর্থ, তাঁদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, তবে শূদ্রদের বৃত্তি ব্রাহ্মণ কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করতে পারবেন না, এই ছিল তাঁর নির্দেশ। অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যদের এবং বৈশ্যরা শূদ্রদের বৃত্তি আপৎকালে গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য ব্রাহ্মণদের বৃত্তি কোনো নিম্নবর্ণের লোকে গ্রহণ করতে পারতেন না।[৭] মনুর এই নির্দেশ থেকেই বোঝা যায় যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের বৃত্তি পরিবর্তন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, সমাজে এ রকম ঘটনা ঘটত। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্তযুগে পশ্চিম ভারতের একদল রেশম-শিল্পী তাঁদের বাসস্থানের ও বৃত্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে অধিকতর মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন।[৮] খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত গদ্যকাব্য "দশকুমারচরিতে" বিন্ধ্য-পর্বতনিবাসী এক ব্রাহ্মণ দস্যুদলের কথা আছে, যাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।[৯] অনুরূপভাবে এ যুগের বহু ঐতিহাসিক সূত্রে ব্রাহ্মণ রাজা ও সেনাপতি এবং ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কথা অবশ্যগ্রাহ্য যে, বৈদিক যুগ বা পৌরাণিক যুগের তুলনায়, পরবর্তী যুগে বৃত্তি পরিবর্তন ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছিল। তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকেরা এখন স্বীকার করেন যে ব্যক্তিগত রুচি, প্রভাব-প্রতিপত্তি-কামনা, অর্থনৈতিক প্রেরণা ইত্যাদির ফলে প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন করতেন। বাংলা দেশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নীহার-রঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, পাল-চন্দ্র এবং সেন-বর্মন আমলে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ রাজা, সামন্ত, সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, অম্বষ্ঠবৈদ্যেরা মন্ত্রী হয়েছেন, করণ-কায়স্থেরা সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অনুসরণ করেছেন, এবং কৈবর্তেরা রাজকর্মচারী ও রাজ্য-শাসক হয়েছেন।[১০] বাংলা দেশের বাইরে ভারতের অন্যত্রও এ ধরনের উদাহরণ একেবারে বিরল ছিল না।

বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের বা জাতির যোগ কিন্তু তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় ছিল। কতকগুলি জাতির নাম থেকেই তাদের বৃত্তি বোঝা যেত, যেমন—কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায়, তৈলিক ইত্যাদি। এইসব বৃত্তি-পরিচালিত জাতিগুলির (trade castes) সঙ্গে মধ্যযুগের ইউরোপের trade guild-গুলির কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জাতিভেদপ্রথার সামাজিক বিধিনিষেধগুলিও এইসব জাতির মধ্যে কঠোরভাবে

৬ বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০' (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ৯

৭ 'মনুসংহিতা', ৯।৩১৯, ১০।৮০-৮২, ৯৫-৯৯, ১০১-১০২

৮ Romila Thapar, **op. cit.**, p. 153

৯ 'দশকুমারচরিত', পূর্বপীঠিকা, দ্বিতীয়োচ্ছ্বাস

১০ নীহাররঞ্জন রায়, 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ' (কলিকাতা, ১৩৫২ সন), পৃঃ ১১৩-১৪

পালিত হত।[১১] বৃত্তির সঙ্গে বংশানুক্রমিক জাতিভেদপ্রথার এই সংযোগ সমাজের পক্ষে যে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ছিল তা বলা যায় না। এই ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শোষণ, মনুষ্যত্বের অবমাননা ইত্যাদি সবই হয়ত ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কও স্বীকৃত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনে স্বীয় গুণ বা প্রতিভা অনুসারে যে ব্যক্তি যে কাজ করে, সে-কাজেই সে বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত থাকবে, এবং সমাজও সেই ব্যক্তিকে ও তার বংশধরদের জীবিকার অভাবে মরতে দেবে না, এই নীতিই ছিল জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি। ভারতের কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ সমাজে এইভাবে একটি প্রতিযোগিতা-বিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং মোটের উপর এই ব্যবস্থা যে কয়েক হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় জনসমাজকে সন্তুষ্ট রেখেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলনগুলি স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর মতে "বর্ণব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থৈর্যের বশেই ভারতীয় সংস্কৃতির স্থৈর্য সম্ভব হইয়াছিল।"[১২]

মধ্যযুগে, ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২০০-১৭৫৭), জাতিভেদপ্রথার উপরে বর্ণিত কাঠামো মোটের উপর একই রকম ছিল। ইসলাম ধর্মে সামাজিক সাম্যের ভাব হিন্দু-ধর্মের তুলনায় অনেক বেশি ছিল সন্দেহ নেই। বংশগত জাতিভেদপ্রথা ইসলামের মৌল নীতির বিরোধী। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর মুসলমান রাজত্বে বাস, এবং হিন্দু ও মুসলিম রাজপরিবারগুলির মধ্যে কিছু কিছু বৈবাহিক আদান-প্রদান হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথায় একটুও ভাঙন ধরেনি। অধিকতর সামাজিক মর্যাদা লাভ এবং জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিম্নজাতির কিছু কিছু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ যে তাঁদের ধর্ম ও জাতির প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিন্দুসমাজের উপর ইসলামিক সংঘাতের প্রতিক্রিয়া দুই ধরনের হয়েছিল। এক-দিকে আমরা লক্ষ্য করি যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (১৫২০-'৭৫) প্রমুখ স্মৃতিকারেরা জাতিভেদপ্রথাকে কঠোরতর করে হিন্দুসমাজকে লৌহদৃঢ় শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন, যাতে বহিরাগত ভাবধারা তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে না পারে। অপর দিকে আমরা দেখি যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে একদল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা এই দুই পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ের লোককে কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন, দুই ধর্মের মূলগত ঐক্যের উপর জোর দিয়ে। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য, দাদু, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রায় সবাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য, পুরোহিত-প্রাধান্য এবং জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জাতিভেদপ্রথার অর্থ-নৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় থাকায় তাঁদের প্রচারকার্য বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি। হিন্দু-সমাজের আপামর জনসাধারণ এই সব মহাপুরুষের অনুচরদের এক একটি নতুন জাতি বলে গণ্য ক'রে, পরোক্ষভাবে তাঁদের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাকে পরাহত করে। কবীরপন্থী, শিখ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি কালক্রমে এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই বৃহত্তর হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান

১১ M. Monier Williams, **Hinduism** (Calcutta, 1951), pp. 107-108

১২ নির্মলকুমার বসু, **'হিন্দু সমাজের গড়ন'**, (কলিকাতা, ১৯৪৯), পৃঃ ১৪৯, ১৫১-১৫৩

পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম সমাজেরও প্রায় এই দশা হয়েছিল।[১৩]

জাতিভেদপ্রথার সর্বগ্রাসী প্রভাব মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমান সমাজকেও স্পর্শ করেছিল। ভারতীয় মুসলানদের অনেকেই ছিলেন ধর্মান্তরিত হিন্দু। সুতরাং পুরাতন সংস্কার বা সামাজিক রীতিনীতি যে তাঁদের উপর কিছুটা প্রভাব রেখে যাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতীয় মুসলিম সমাজ প্রধানতঃ 'আশরফ' (মাননীয়) ও 'আজলাফ' বা আতরাফ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 'আশরফ'রা ছিলেন বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, এঁদের মধ্যে চারটি প্রধান ভাগ ছিল,—সৈয়দ, শেখ, পাঠান ও মুঘল। 'আজলাফ'রা ছিলেন মূলতঃ ধর্মান্তরিত ভারতীয় হিন্দু। এঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা সব চেয়ে বেশি ছিল ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষতঃ রাজপুতদের। তারপর আসতেন ধর্মান্তরিত শূদ্রেরা, যেমন জোলা, দরজি, কুমোর, তেলী, ধোবী, হাজাম (নাপিত) ইত্যাদি। হিন্দুসমাজে থাকলে এঁরা সৎশূদ্র নামে পরিচিত হতেন।[১৪] বাংলা দেশের মুসলমান সমাজে এই ধরনের বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগের কথা মুকুন্দরাম-রচিত 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে (রচনাকাল-আনুমানিক ১৫৭৯ খ্রীঃ) সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে।[১৫] সমাজের সর্বনিম্নস্তরে ছিলেন ভাঙ্গী, চামার প্রভৃতি অস্পৃশ্য হিন্দু যাঁরা কোনো না কোনো কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের বলা হত 'আরজাল'। যদিও হিন্দু সমাজের মতো কঠোর বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথা মুসলমান সমাজে কোনোদিনই ছিল না, এবং শুদ্ধি-অশুদ্ধির বিচার হিন্দুদের মতো মুসলমানেরা কখনো করেননি, তবু বিবাহের ব্যাপারে মুসলমান সমাজে বংশগৌরবের ব্যাপারটি যথেষ্ট বিবেচিত হত, এবং সৈয়দ, শেখ, পাঠান বা মুঘলেরা নিম্নস্তরের মোমিন, পটুয়া প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে একত্র মসজিদে প্রার্থনায় যোগ দিলেও একাসনে অন্নগ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। শেখ এবং সৈয়দদের বংশমর্যাদা অনেকটা হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মতোই ছিল। অপরদিকে মুসলমান ভাঙ্গী বা চামারেরা পরিষ্কার বেশভূষা থাকলেও মসজিদে প্রবেশ করতে পারতেন না, বা প্রবেশ করলেও সামনের সারিগুলিতে কখনোই আসন নিতে সাহস করতেন না। মুসলমান ভাঙ্গীদের কোরাণ পাঠের অধিকার থাকলেও তাঁরা কোরাণ পড়াতে পারতেন না।[১৬] হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমানেরাও আহারাদির ব্যাপারে কতকগুলি আচার-বিচার মেনে চলতেন। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' (১৬শ শতাব্দী) নবদ্বীপের মুসলমান মুলুক-পতি চৈতন্যের অনুগামী যবন হরিদাসকে এই সব আচার-অনুষ্ঠান লঙ্ঘন করার জন্য ভৎর্সনা করছেন দেখা যায়।

"আমরা হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥

---

১৩ তদেব, পৃঃ ১৫১

১৪ Ghaus Ansari, **Muslim Caste In Uttar Pradesh** (Lucknow, 1960), pp. 35-37

১৫ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সং) মুকুন্দরামের 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' (কলিকাতা, ১৯৫২), পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬

১৬ Imtiaz Ahmad, **Caste And Social Stratification Among The Muslims,** (Delhi, 1973), pp. xxviii-xxxi, 113-131

জাতি-ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য-ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার॥"[১৭]

বলা বাহুল্য, এ সবই হিন্দু পরিবেশের প্রভাবে হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও মুসলিম সমাজে এই ধরনের স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দু-বৌদ্ধ রাজত্বকালের মতো মধ্যযুগেও আমরা হিন্দুসমাজে, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে, বৃত্তি পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাই। ব্রাহ্মণেরা অনেকেই তখনো শাস্ত্রচর্চা ও অধ্যাপনা করতেন, কিন্তু যজন-যাজনরত মূর্খ বিপ্রেরও সমাজে অভাব ছিল না। মুকুন্দরাম তাঁর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে' কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে নগরে যাজন করে
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বান্ধে টান॥"[১৮]

সমসাময়িক কালের মূর্খ ব্রাহ্মণদের কটাক্ষ করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও (১৪৮৬-১৫৩৩) পরাঙ্মুখ হননি।

"প্রভু কহে, 'সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার'॥"[১৯]

আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা' পাঠে মনে হয় যে ব্রাহ্মণেরা সেই সময় শুধু শাস্ত্রচর্চা বা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করতেন না, অন্ততঃ তাঁদের মধ্যে কিছু লোক রাজনীতিচর্চাও করতেন।

"দক্ষিণে বসিয়া বেদবেত্তা দ্বিজগণ।
রাজনীতি কহে, কহে ব্রহ্মনিরূপণ॥"[২০]

বৈদ্যেরা প্রধানতঃ চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ করলেও কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের মতোই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নবদ্বীপ-নিবাসী, চৈতন্য-অনুচর মুরারি গুপ্ত চৈতন্যদেবের মতোই বড় বৈয়াকরণ ছিলেন। চৈতন্যদেব তাই তাঁকে পরিহাস করে বলছেন,—

"প্রভু বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দড়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষমের অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি॥"[২১]

আবার চৈতন্যদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসী চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের ন্যায় লিখনবৃত্তি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।[২২] শ্রীখণ্ড অঞ্চলের বহু বৈদ্য আবার গৌড় সরকারের কর্মচারী ছিলেন।[২৩] কায়স্থেরা সাধারণতঃ মসীজীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো রাজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের দায়িত্ব পালন করতেন। বাংলার বারভূইঞাদের মধ্যে অনেকে জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, আবুল ফজলের রচিত 'আইন-ই-আকবরী'তে (১৬শ শতাব্দী) বাংলা দেশে বহু কায়স্থ রাজার নাম পাওয়া যায়। সমাজে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠবর্ণের মর্যাদা পেলেও কায়স্থদের বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধ হয় বেশিই ছিল।[২৪]

---

১৭ বৃন্দাবনদাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত' (বসুমতী সংস্করণ, কলিকাতা, তারিখ নেই), পৃঃ ৮১

১৮ মুকুন্দরাম, 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', পৃঃ ৩৪৯

১৯ বৃন্দাবনদাস, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', পৃঃ ৪৮

২০ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়', ২য় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯১৪), পৃঃ ১৪৮৭

২১ বৃন্দাবন দাস, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত', পৃঃ ৪৮

২২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আঃ ১৬০৬-১৫ খ্রীঃ), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সং) (কলিকাতা, ১৩৫৯ সন), পৃঃ ১৯৫

২৩ সুকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী (বিশ্বভারতী ১৯৬২), পৃঃ ১৬

২৪ H. S. Jarrett (Ed.) Abul Fazl's **Ain-i-Akbari** (Calcutta, 1949), vol. II, p. 147 ; R. P. Chanda, **The Indo-Aryan Races** (Calcutta, 1969), pp. 104-106

আবার কাশীরাম দাস, গুণরাজ খান, কাণা হরিদত্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকেরা কায়স্থবংশোদ্ভব ছিলেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের লোকেরা একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনবান ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (—বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি তার প্রভূত সাক্ষ্য বহন করছে), অপরদিকে তেমনি বিদ্যাচর্চা ও গ্রন্থরচনার প্রতিও তাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। ষষ্ঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকেরা মধ্যযুগে গ্রন্থ রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন।[২৫] তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু লোকের পশুপালনবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে তেলি ভিন্ন কলু নামে একটি নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন।[২৬] মধ্যযুগের শেষ দিকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা যে আর ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সমকালে বা তার কিছু পূর্বে মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত ধুপী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরা পুঁথি-লেখক বলে উল্লিখিত হয়েছেন।[২৭] রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন যে বাল্যকালে (জন্ম : ১৮২৬) ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে তিনি যে গুরুমশায়ের কাছে প্রথম লেখাপড়া শেখেন, তিনি আগুরি জাতির লোক ছিলেন।[২৮] তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেরা মধ্যযুগে কখনো কখনো ধর্মগুরুর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছেন। চৈতন্যদেবের অনুবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বহু ব্রাহ্মণ নরহরি সরকার ও নরোত্তম ঠাকুরের মতো অব্রাহ্মণের মন্ত্রশিষ্য হয়েছেন বলে জানা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়' বইয়ে মধ্যযুগের বহু কায়স্থ সাধক ও ধর্মগুরুর নাম উল্লেখ করেছেন।[২৯] অষ্টাদশ শতাব্দীতে সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বহু উচ্চজাতির লোকও ছিলেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ব্যাপকভাবে দেখা দেবার আগেই এ সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

২৫ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলা দেশের ইতিহাস—মধ্যযুগ' (কলিকাতা, ১৩৭৩ সন), পৃঃ ৩০৫-৩০৬

২৬ H. R. Sanyal, 'Continuities of Social Mobility in Traditional and Modern Society in India' in **The Journal of Asian Studies**, February, 1971, pp. 319-322

২৭ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৬

২৮ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (কলিকাতা, ১৯১৬) পৃঃ ৭

২৯ নগেন্দ্রনাথ বসু, 'কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়' (কলিকাতা, তারিখ নেই), ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৮৬

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সঙ্কট ও সমাধান

অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন

একটি জাতির জীবনে পরাধীনতাই চরমতম সঙ্কট। কারণ প্রত্যেক জাতি তাহার জাতীয় জীবনের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট জাতীয় চরিত্রকে অনুসরণ করিয়া চলে। জাতির সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পে, সামাজিক উৎসবে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একটি নিজস্ব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশলাভ করে। একটি জাতি যখন অপর একটি জাতির প্রভুত্বাধীন হইয়া পড়ে, তখন বিজেতা জাতির ভাব, চিন্তা ও বিশিষ্ট জীবনতত্ত্ব ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী বিজিত জাতির মন, বুদ্ধি ও হৃদয়কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে সে আপন স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়া প্রভুর চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-ধারাকে জড়ের ন্যায় অনুকরণ করিতে থাকে। ফলে জাতি তাহার স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরধর্মের ভয়াবহতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে যেদিন ইংরেজী শিক্ষা বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন পরধর্মের প্রবল বন্যায় ভারতবর্ষের স্মরণাতীত কালের মহিমান্বিত সংস্কৃতি বাংলা দেশ হইতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহী সমর্থক রামমোহন সেদিন ইংরেজশাসনকে বিধাতার আশীর্বাদরূপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বলিয়াছিলেন—"Divine Providence at last, in its abundant mercy, stirred up the English nation to break the yoke of those tyrants (Muslim rulers), and to receive the oppressed Natives of Bengal under its protection." কেবলমাত্র ইহাই নহে, ইংরেজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি আরও বলিয়াছিলেন— "...Your dutiful subjects consequently have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not only as a ruler, but also as a father and protector." (Appeal to the King in Council: রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, পৃঃ ৫০৮-৫০৯)।

ইংরেজশাসন যে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইবে এই প্রবল প্রত্যাশা রামমোহন তাঁহার Lord Amherst-কে লেখা পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—"We already offered up thanks to Providence for inspiring the most generous and enlightened of the Nations of the West with the glorious ambitions of planting in Asia the Arts and Sciences of modern Europe." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৪)। আধুনিক ইউরোপের সেই কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের তুলনায় ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে রামমোহন আপনার ধারণাটিও সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন—"The Sangerit [Sic] language, so difficult that almost a lifetime is necessary for its acquisition, is well known to have been for ages a lamentable check on the diffusion of knowledge; and the learning concealed under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it." (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫)।

রামমোহনের এই ইউরোপভক্তি ও ভারতীয়

সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ণা ডিরোজিওর শিষ্য 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। গুরু ডিরোজিওর ভারত-প্রীতির কণামাত্রও গ্রহণ না করিয়া তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় দেশকে রাতারাতি দ্বিতীয় ইউরোপে পরিণত করিবার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ এবং সাহেব সাজিবার প্রাণান্ত প্রয়াসে জাতির ইতিহাসে একটি বিভ্রান্তিকর অপচয়ের অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন।

এই ভ্রমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না।...পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিলটি পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল...নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।" (বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃঃ ৩৫৮)।

এই কথা বলিয়াই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন নাই কালিদাস ছাড়িয়া যাহারা Swinburn পড়িত, গীতা ছাড়িয়া যাহারা কেবল Mill পড়িত, উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া যাহারা সাহেববাড়ির চীনা পুতুল হাঁ করিয়া দেখিত তাহাদের মোহভঙ্গ করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির সংস্কৃতির মূল্য কি অপরিসীম তাহা তিনি বুঝিতে শিখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, প্রেম ও বিরহ লইয়া যে বিশ্বসাহিত্যে অমরকীর্তি স্থাপন করা যায় সে সত্যও তিনি আপনার অসামান্য প্রতিভাবলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মধুসূদনও 'বঙ্গভাষার প্রতি' কবিতায় পরদেশের নিকট ভিক্ষাবৃত্তি আচরণের নিন্দা করিয়া আপনার পূর্ব-জীবনে সাহেব হইবার প্রচেষ্টার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। বঙ্কিম ও মধুসূদন হইতে বাংলা-সাহিত্যে জ্যোতির্ময় নবযুগের সূচনা। সে নবযুগ একদিকে যেমন মৌলিক সৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, অপর দিকে তেমনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির চিরন্তন বাণীর মহিমান্বিত দীপ্তিতে অম্লান। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাই ত অসীম ঐশ্বর্য-মণ্ডিত স্বর্ণযুগের উদ্বোধন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত মৌলিক সৃষ্টি ও জাতীয় সংস্কৃতির নবজীবনের স্পন্দনে বাংলা-সাহিত্যের গৌরবময় জয়যাত্রা অব্যাহত। তখন দেশজননীর মহৎ সৌন্দর্য, জাতীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মচেতনা এবং ভারতসংস্কৃতির অবিনশ্বর গৌরবগাথায় বাংলাসাহিত্যের জগৎ দিগন্ত পর্যন্ত প্লাবিত।

কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে বাংলা-সাহিত্যে আবার একটি সঙ্কটের যুগ দেখা দিল। সাম্প্রতিক কালের বাংলাসাহিত্যের দিগন্তে সঙ্কটের কালো মেঘ সেদিন গুরুতর বিপদের সঙ্কেত বহন করিয়া আনিয়াছিল; সেদিন আবার পুরাতন কালের 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষকে পুনরায় দ্বিতীয় ইউরোপে পরিণত করিবার উন্মাদনা জাতিগত আত্মবিলোপের প্রচেষ্টায় উগ্রমূর্তিতে দেখা দিয়াছিল। সে যুগের তরুণ দলের একাংশ স্বদেশ, স্বজাতি ও জাতির সংস্কৃতির প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণাকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাসত্বের উপর সাংস্কৃতিক দাসত্ব আরোপ করিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। সে যুগের 'কল্লোল', 'প্রগতি', 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই দুষ্কৃতির স্বাক্ষর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় ভাবধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর ক্রীতদাসোচিত স্তাবকতা এবং স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রচণ্ড বিরূপতা এই পত্রিকাগোষ্ঠির লেখকদের একমাত্র উপজীব্য ছিল। ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতির অপরি-সীম সৌন্দর্য তাহাদের নিকট যেমন অবহেলিত ছিল, বহুযুগব্যাপী প্রবহমাণ ভারতীয় সংস্কৃতির

অসামান্য ঐশ্বর্যও তাহাদের দৃষ্টিতে ছিল তেমনি অবজ্ঞার বস্তু। দেশজননীর মৃন্ময়ী মূর্তি ও চিন্ময়ী মূর্তি উভয়ের প্রতি তাহাদের মনোভাব ছিল একান্ত বৈরিতার। স্বদেশ ও স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি যে ঘৃণা ও ধিক্কার তাহারা সাহিত্যের অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যদি বাংলাসাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করিত, তবে বিদেশী ভাবধারা ও বিদেশী সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণ নিষ্ফল আগাছায় পূর্ণ হইয়া উঠিত। স্বধর্মচ্যুতির পরিণামে ভারতবর্ষ যেমন চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত, হীন নকলনবিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বাংলাসাহিত্যকেও তেমনি তাহার অবশ্যপ্রাপ্য সম্মানের আসন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত।

জাতির জীবনে সেই সঙ্কটের কালে সৌভাগ্যক্রমে এমন কয়েকজন সাহিত্যসাধকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহাদের প্রতিভায় দেশের মৃন্ময়ী ও চিন্ময়ী মূর্তির প্রতিফলন বাংলাসাহিত্যকে সঙ্কটের পথ হইতে সার্থক সৃষ্টির রাজপথে উত্তীর্ণ করিয়াছিল। কোন বিদেশী সাহিত্যকে বিন্দুমাত্র অনুকরণ না করিয়া তাঁহারা রচনারীতির নিজস্বতায় এবং স্বজাতির জীবনের সহিত প্রাণের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের কল্যাণে বাংলাসাহিত্যের এক পরম গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। সেই তিন মহৎ সাহিত্যশিল্পী ছিলেন—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও বনফুল

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহার আবির্ভাব সর্বপ্রথম বাংলাসাহিত্যে বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি বিভূতিভূষণ। দেশজননীর অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভারতবাসীর জীবনধারায় মানবিকতার অপরূপ মহত্ত্ব এবং ভারতসংস্কৃতির সুগভীর অধ্যাত্মদৃষ্টির অবিনশ্বর মহিমা বিভূতিভূষণের সাহিত্যসাধনায় বাংলাসাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছিল। বস্তুত বিভূতিভূষণের অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তী কালের বাংলাসাহিত্যে কালজয়ী সৃষ্টিশীল রচনার সূচনা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল দেশের যে বিরাট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাশ্চাত্য মোহান্ধ 'কল্লোল'-গোষ্ঠির লেখকদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, বিভূতিভূষণই প্রথম তাহাকে অসামান্য লেখনীনৈপুণ্যের সাহায্যে বাংলার সাহিত্যজগতে অবিস্মরণীয় প্রতিষ্ঠা দান করিলেন। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির সে আশ্চর্য মাধুর্যকে 'পথের পাঁচালী'তে তিনি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 'অপরাজিত' ও 'আরণ্যকে' সেই একই বিস্ময়কর দক্ষতায় তিনি ভারতবর্ষের অরণ্য-অঞ্চলের ধ্যানগম্ভীর অপার মহিমাকে চিরন্তন রূপ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের মৃন্ময়ী মূর্তির এক সার্থক শিল্পী বিভূতিভূষণ।

এই মৃন্ময়ী মূর্তির আর একটি দিক তারাশঙ্করের বলিষ্ঠ লেখনীতে রূপায়িত হইয়াছে। বাংলাসাহিত্যে 'আঞ্চলিক' উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা তারাশঙ্কর। কালিন্দী, ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্কর বীরভূম অঞ্চলের মাটি ও মানুষের ছবি এবং তাহাদের মধ্যে নিগূঢ় যোগসূত্রটিকে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলের এই গ্রামজীবন যে চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবে না, বরং সাহিত্যের অমরলোকে এই বিশিষ্ট গ্রাম-জীবন চিরকালের আসন লাভের উপযুক্ত একথা তারাশঙ্কর প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। একদিকে ভূ-প্রকৃতি, অপরদিকে মানবপ্রকৃতি—এই উভয়ের সম্মিলনে সাহিত্যের যে ঐশ্বর্যময় অধ্যায় তারাশঙ্কর রচনা করিয়াছেন মাটি ও মানুষের সহিত তাঁহার একান্ত আত্মীয়তা ছিল বলিয়াই তিনি তাহা করিতে সক্ষম

হইয়াছেন। সর্বদা পাশ্চাত্য জগতের প্রতি লুব্ধদৃষ্টি ও তদ্গতচিত্ত কল্লোলগোষ্ঠির লেখকদের নিকট ইহা অকল্পনীয় ছিল।

ভারতবর্ষের মৃন্ময়ী মূর্তির আর এক সুদক্ষ রূপকার বনফুল। হাস্যরসে অসামান্য নিপুণ এই ক্ষণজন্মা সাহিত্যশিল্পী একটি সুসমৃদ্ধ কবিচিত্তের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত কবিত্ব-শক্তি স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণাঢ্য চিত্রটি 'মৃগয়া' ও 'ডানা' গ্রন্থে অম্লান উজ্জ্বলতায় প্রতিফলিত করিয়াছে।

কেবল স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নহে, দেশের মানুষের মানবিকতার মাধুর্য ও মহত্বও এই তিন বরেণ্য সাহিত্যিকের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বজাতির নিন্দাই তাঁহাদের রচনার একমাত্র উপজীব্য নহে, কারণ সকল দোষত্রুটির মধ্যেও ভারতবাসীর জীবনযাত্রায় হৃদয়বত্তার যে একটি গভীর সুর ধ্বনিত হইতেছে তাহা তাঁহারা আপনাদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেশের মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁহাদের জানা ছিল। তাই জাতির জীবনের নানা স্তরে মানসিক সম্পদের রত্নময় ভাণ্ডারের সংবাদ তাঁহারা পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছিলেন।

মনুষ্যত্বের মহৎ দীপশিখাটি যে আমাদের দেশের নিতান্ত নগণ্য শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও কত উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিতেছে তাহা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'দৃষ্টি-প্রদীপ' ও 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রভৃতি গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। সমাজে যাহাদের অর্থ, পাণ্ডিত্য, প্রতিপত্তি প্রভৃতি কিছুই নাই এমন অতি তুচ্ছ মানুষগুলিও যে কি মহৎ মানসিক ঐশ্বর্যে দীপ্তিমান্ এই সাহিত্যকীর্তিগুলি তাহার নিদর্শন।

তারাশঙ্কর দেখাইয়াছেন যে নিতাই অতি তুচ্ছ শ্রেণীর মধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেও যথার্থ কবির মহৎ হৃদয়ানুভূতি এবং উদার ও গভীর জীবন-দৃষ্টি তাহার ধূলিলিপ্ত ললাটে কবিত্বের রাজটিকা আঁকিয়া দিয়াছে।

'কবি' উপন্যাসের ন্যায় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য়ও তারাশঙ্কর অন্ত্যজ জাতির জীবনধারায় সুখ, দুঃখ, বিরহ, মিলনের মধ্য দিয়া হৃদয়ের যে ঐশ্বর্য বিকশিত তাহার আশ্চর্য রূপটি পাঠকসমাজের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ব্যতীত স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতি যে জীবন-পণ করিয়া শৃঙ্খল মোচনে অবতীর্ণ হইয়াছিল 'ধাত্রীদেবতা' প্রমুখ উপন্যাসে তাহার বন্দনাও তিনি রচনা করিয়াছেন।

বনফুল 'সপ্তর্ষি' ও 'অগ্নি' উপন্যাসে জাতির মুক্তি-সংগ্রামে আত্মাহুতির চিত্র আগ্নেয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জাতির এই মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি কল্লোলগোষ্ঠির কঠোর অবজ্ঞা উপেক্ষামূলক নীরবতার মধ্য দিয়াই উচ্চারিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের যে চিন্ময়ী মূর্তি ভারতসংস্কৃতির মধ্যে যুগে যুগে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধস্তাবকতায় তাহা কল্লোলগোষ্ঠির লেখকদের দ্বারা ধিক্কৃত হইলেও এই তিন মহৎ সাহিত্য-রচয়িতা নির্ভুলভাবে তাহার মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নির্ভীকভাবে আধুনিক-কালে ভারতসংস্কৃতিকে তাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে মনে-প্রাণে ও আচার-আচরণে ইংরেজ হইবার যে প্রবল বাসনা বাংলার শিক্ষিত সমাজে উদ্দামরূপে দেখা দিয়াছিল, কল্লোলগোষ্ঠির লেখকদের মধ্যে সেই একই উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। সে গোষ্ঠির অন্যতম বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের পরবর্তী কালের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। An Acre

of Green Grass পুস্তকে বুদ্ধদেব বসুর এই অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে "Rabindranath made Bengal a part of Europe"—একার্যে রবীন্দ্রনাথ দুই প্রধান সহায়ককে পাইয়াছিলেন রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে। বুদ্ধদেব বসুর মতে কেবল বাংলা দেশই ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল—"That the conquered, despite the fact of subjugation and the horrors that must precede and accompany it, should acclaim the conqueror is rather curious, but this is what happened when Bengal met Europe…Only Bengal absorbed Europe with a speed and thoroughness that should be marked as a record in human relations" (An Acre of Green Grass, p. 59)

এই ইউরোপীয় জীবনবাদ ও চিন্তাধারার স্রোতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইবার যে উদ্দামতা কল্লোল পত্রিকার প্রচলনকালে বাংলাসাহিত্যে জাতিগত চরিত্র ও ভাবধারা বিসর্জনে সাহিত্যিক-সমাজকে ডাক দিয়াছিল তাহার দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া আলোচ্য সাহিত্যিক-ত্রয়ী যথার্থ সৃষ্টিমূলক ও মৌলিক সাহিত্যের নব অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। সে সাহিত্যে যে জীবন চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় জীবন, সে সাহিত্যে জীবনের যে মহিমা ঘোষিত হইয়াছিল তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির বন্দনা-গান। তাঁহারা বাংলাসাহিত্যকে এইভাবে অপমৃত্যুর সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যে, উপনিষদে ও আরণ্যকে যে বিশ্বদেবতার প্রকাশ বনস্পতিতে, লতায়, ওষধিতে নিত্য বন্দিত, তাঁহারই দর্শনলাভের বার্তা বিঘোষিত। বিশেষত 'হে অরণ্য কথা কও' এবং 'কুশল পাহাড়ী' পুস্তকে আধুনিক ভারতে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অনুকরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভূতিভূষণ ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীর জয় ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু গ্রাম্য মানুষের মধ্যে বিভূতিভূষণ যে উদারতা, মহত্ত্ব ও অনাড়ম্বর সাহসিকতার জীবন্ত প্রকাশের চিত্র আমাদের উপহার দিয়াছেন তাহা ভারত-সংস্কৃতির মহৎ সৃজনশীলতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় দূর করে।

তারাশঙ্কর 'মাটি' গল্পে একটি অতি দরিদ্র মানুষের অন্তরের সম্পদের সংবাদ আমাদের দিয়াছেন। গঙ্গার মাটি আনিয়া তাহা শহরে বিক্রয় করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ করিত, গঙ্গার স্রোত তাহার নিকট পার্থিব কামনা হইতে উত্তরণের কোন্ অমৃতবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার অপূর্ব কাহিনী আমাদের শোনাইয়াছেন। তাঁহার 'ইমারৎ' গল্পে দেখি নিরক্ষর এক রাজমিস্ত্রী দেবতার দেউল রচনা করিতে করিতে কি আশ্চর্যভাবে এই বিশ্বকে বিশ্বদেবতার মন্দিররূপে দেখিতে শিখিল 'সপ্তপদী'তে, 'শিলাসনে' ও আরও একাধিক পুস্তকে তারাশঙ্কর এই মহৎ উত্তরণের কাহিনী পরিবেশন করিয়াছেন। 'আরোগ্য নিকেতনে' তিনি মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরমানন্দ মাধবের আগমনের চরণধ্বনি শুনিয়াছেন।

বনফুল 'নির্মোক' উপন্যাসে পাশ্চাত্য সভ্যতার খোলস আমাদের জীবনে কি দুর্গতির সৃষ্টি করে তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অগ্নীশ্বর, হাটে বাজারে, নবীন দত্ত, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি উপন্যাসে ভোগ-লোলুপতার ঊর্ধ্বে যে শান্ত, সমাহিত, আত্মোপলব্ধির গভীর আনন্দে পরিপ্লুত ভারতীয় জীবনাদর্শ তাহারই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন।

এইরূপে এই সাহিত্যিক-ত্রয়ীর সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধি আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে কঠিনতম সঙ্কট

হইতে উদ্ধার করিয়া চিরন্তন মহাজীবনের জয়-যাত্রার পথে পরিচালিত করিয়াছে।

পরিশেষে বিভূতিভূষণের একটি সাহিত্য সভার অধিবেশনে প্রদত্ত উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—

"জীবনের শাশ্বত ধ্রুব সত্যকে আমরা এখন অস্বীকার করে চলেছি। যে দেশে গীতার মত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার বৎসর ধরে স্বকীয় আলোয় উদ্ভাসিত, কত শত মনীষীর ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনীর অর্ঘ্যপুষ্পে যা এই দীর্ঘ দিন ধরে সৃজিত হয়ে এসেছে—আজ আমাদের দুর্ভাগ্য সেই দেশের সাহিত্যের আদর্শ আমাদের আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে।" (বিভূতিবীথিকা—পৃঃ ২৭৫-৭৬)। এ উক্তির মধ্যে বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুলের সাহিত্য-সৃষ্টির মূল লক্ষ্য উচ্চারিত।

'বেদে' অথবা 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' বাংলা সাহিত্যকে আবর্জনার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করিতে চাহিয়াছিল। 'পথের পাঁচালী' সত্যকার সাহিত্য-সৃষ্টির নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছিল। বিভূতি-ভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুলের মধ্যে আধুনিক বাংলাসাহিত্য নবসৃষ্টির রাজপথে সার্থক পদক্ষেপ করিয়াছে। তাই দেখিতে পাই 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী'কে কেহ স্মরণ করে না, 'পথের পাঁচালী' বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার আসনে বিরাজিত। 'বেদে'র লেখককে শেষজীবনে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ লিখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে এবং বুদ্ধদেব বসুরও শেষ পর্বের লেখা 'মহাভারতের কথা'।

ভারতবর্ষের সাহিত্যালোকে ভারতসংস্কৃতির মর্মবাণী অপরাজিত গৌরবে আজও উচ্চারিত। তাই বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুলের আবির্ভাবে আধুনিক বাংলাসাহিত্য সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নবমহিমায় উদ্ভাসিত।

ন্যায়বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে সৎপদার্থের স্বরূপ

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কার্যকারণভাবের আলোচনা একটি প্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। কারণ হইতে কার্যের উৎপত্তি, ইহা সর্বসম্মত। কিন্তু যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সৎ, এই সিদ্ধান্ত সর্বজনগ্রাহ্য নহে। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সৎ নহে, এই মতবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সৎ, ইহা স্বীকার করিলেও উৎপত্তির পূর্বে কার্যটি কোনভাবে বিদ্যমান ছিল কিনা, এই সম্বন্ধে মতানৈক্য রহিয়াছে। যাহা কার্য তাহা কারণ হইতেই নূতন করিয়া উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তাহার কোনপ্রকার সত্তাই ছিল না, সম্পূর্ণ নূতন একটি বস্তু কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—এইরূপ মতবাদ অসৎকার্যবাদ নামে প্রসিদ্ধ। অপরপক্ষে কেহ কেহ মনে করেন, কার্য কারণ হইতে আবির্ভূত হয় সত্য, কিন্তু আবির্ভাবের পূর্বেও কার্য অব্যক্ত বা সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং কারণ হইতে আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে প্রতীয়মান না হইলেও তাহার অস্তিত্ব বা সত্তা একেবারেই ছিল না, ইহা বলা যায় না। এই মতবাদ সৎকার্যবাদ নামে পরিচিত।

পূর্বের আলোচনা হইতে কার্য সম্বন্ধে তিনটি মতের আভাস পাওয়া গিয়াছে। এক, কার্য সৎ নহে; দুই, কার্য উৎপত্তির পূর্বে সৎ নহে, কিন্তু উৎপত্তির পরে উহা সৎ; তিন, কার্য সর্বদাই সৎ, কিন্তু উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম এবং উৎপত্তির

পরে ব্যক্ত বা স্থূল। এই তৃতীয় মতবাদই সৎকার্যবাদ নামে আখ্যাত হয়।

সৎপদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই জানা দরকার সৎ বলিতে কি বুঝায়। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সৎ বা অস্তিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমানার্থক। কিন্তু যাহা অনিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশীল, তাহাও সৎ, অপরপক্ষে যাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই, অর্থাৎ যাহা সর্বদেশে সর্বকালে বিদ্যমান, তাহাই সৎ, এইরূপ মতবাদও রহিয়াছে। সুতরাং নিত্য এবং অনিত্য—দ্বিবিধ পদার্থই সৎ, এইরূপ সিদ্ধান্তও বর্তমান। পক্ষান্তরে সৎ কখনও নিত্য নহে, এইরূপ মতবাদও আছে। এই দুইটি মতের আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উৎপত্তির পূর্বে যাহা ছিল না, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যাহা অসৎ, উৎপন্ন হওয়ার পর তাহা সৎ, এবং বিনাশের পরও সেই বস্তু অসৎ—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সৎ-এর এমন একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। যাঁহারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, তাঁহারা উৎপত্তিবিনাশশীল বস্তুকেই যে কেবল সৎ বলেন তাহা নহে, উৎপত্তিবিনাশরহিত অর্থাৎ নিত্য বস্তুও তাঁহাদের মতে সৎ। সুতরাং এই মতে সৎ এমন একটি সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে যাহা নিত্য এবং অনিত্য উভয়বিধ বস্তুতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা উৎপত্তির পরক্ষণেই সৎ-এর বিনাশ স্বীকার করে, তাহাদের মতেও সৎ-এর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইবে।

পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিজ নিজ দার্শনিক পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার পর্যবসিত ফল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-পদার্থের মৌলিক স্বরূপ কি, এবং কিভাবেই বা সেই মূল স্বরূপ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যরূপে বস্তুটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, এই বিষয়ে মতভেদকে ভিত্তি করিয়াই আলোচিত তিনটি মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং সৎ কাহাকে বলে, তাহার ধারণাও দর্শনশাস্ত্রের মৌল কাঠামো অনুযায়ীই নিরূপিত হইয়াছে।

সৎ কাহাকে বলে, প্রথমে তাহাই আলোচিত হইতেছে। অস্তিত্ব, সত্তা প্রভৃতি শব্দ লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রায়ই সমানার্থকরূপে প্রসিদ্ধ সহজ কথায়, যাহা আছে, তাহাই অস্তিত্বশীল এবং তাহাই সৎ। এই দিক হইতে বস্তুত্ব এবং অস্তিত্ব বা সত্তা সমপর্যায়ী। বস্তুত্ব বা অস্তিত্ব অনুভবের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি অনুভব ঘটে, সেই অনুভবের মূলে অবস্থিত বস্তুটিকেই সৎ বা অস্তিত্বশীল বলা হয়। যাহার অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন অনুভব প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ, অনুভবের যোগ্য বস্তু দেশকাল-সাপেক্ষ। কোন স্থান এবং কাল বর্জন করিয়া বস্তু অনুভূত হয় না। সুতরাং অনুভবের যোগ্য বস্তু কোন দেশে অবস্থিত হইবেই। যে বস্তু কোন দেশেই অবস্থিত নহে, অর্থাৎ কোন অধিকরণেই যাহাকে 'আছে' বলিয়া অনুভব করা যায় না, তাহা সৎ নহে; অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক। কারণ, 'আছে' বা 'অস্তি' এই বোধ কোন একটি দেশ-সাপেক্ষ। 'আছে' বলিলেই তাহার থাকার অধিকরণ সিদ্ধ হয়। কোন অধিকরণ নাই, অথচ 'আছে' ইহা সাধারণভাবে বলাই যায় না। অতএব অধিকরণসংশ্লিষ্ট প্রতীতির বিষয় হইলেই তাহাকে সৎ বা অস্তিত্বশীল বলা হয়। যাহা কোন অধিকরণে থাকে না, তাহা একেবারেই অসৎ বা অলীক। বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে শব্দ শুনিবার পর বুদ্ধি দ্বারা ঐ শব্দের

অর্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু ঐরূপ অর্থের বাহ্যিক সত্তা থাকে না। এইজন্যই এইরূপ জ্ঞানকে শব্দ-জন্য একটি জ্ঞানমাত্ররূপে দর্শনশাস্ত্রে 'বিকল্প' বলা হয়।[১] সুতরাং অনুভূতির অবলম্বনযোগ্য অধিকরণ-সংশ্লিষ্ট বিষয়কেই সৎ বা অস্তিত্বশীল বলা হয়। যাহা এইরূপ অস্তিত্বশীল, তাহাই বস্তু—এই বিষয়ে প্রায় মতভেদ নাই। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব কেবল-মাত্র উপলব্ধির রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত, অথবা উপলব্ধির বাহিরেও অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে—এই প্রশ্নে দার্শনিক মহল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহাকে বাহিরের বস্তু বলিয়া অনুভব করি, তাহা বৌদ্ধিক সত্তার অতিরিক্ত কিনা, ইহাও একটি প্রশ্ন। বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায় উপলব্ধির বিষয়টিকে বৌদ্ধিক সত্তার অতিরিক্ত স্বীকার করেন না। বুদ্ধি বা বিজ্ঞান অনাদি বাসনার প্রভাবে বিভিন্ন আকারে পরিণামপ্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানের এই বিভিন্ন পরিণামকেই বস্তুরূপে অনুভব করিয়া বাহ্যবস্তুরূপে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ইঁহাদের মতে বৌদ্ধিক সত্তার অতিরিক্ত বাহ্য সত্তা নাই। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বুদ্ধির প্রক্রিয়া দ্বারা বুদ্ধিতে অবস্থিত বস্তুর অনুভব স্বীকার করিলেও, বলেন যে, বাহ্যসত্তা ব্যতীত বুদ্ধি স্বকীয় প্রক্রিয়ায় বস্তুসত্তা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং বহিঃস্থিত বস্তুকেই বুদ্ধি স্বীয় ব্যাপারের দ্বারা অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতরূপে গ্রহণ করে। প্রধানতঃ সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন এই মতবাদের প্রবক্তা। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুভূতির ক্ষেত্রে বিষয়-ইন্দ্রিয়-মন-আত্মার পারস্পরিক একটি নির্দিষ্ট যোগ-সূত্রের দ্বারা বাহ্যিক বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং অনুভূতি বস্তুর অস্তিত্ব নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হইলেও অনুভূতি দ্বারা বস্তুর বাহ্যিক সত্তা অথবা বৌদ্ধিক সত্তা প্রমাণিত হয় —এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু অনুভূতি ব্যতীত বস্তুর অস্তিত্ব নির্ধারণ করার অন্য কোন উপায় নাই, এই বিষয়ে সকলেই একমত। অতএব অস্তিত্ব বা সৎ-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে হইলে অনুভূতিকেই অবলম্বন করিতে হইবে। যাহা কেহ কখনও কোনভাবেই অনুভব করে না, তাহা সৎ নহে—ইহা অনায়াসেই বলা যায়। অনুভূতি বস্তুর সন্ধান জানাইয়া দেয় এবং তাহার ফলে সেই বস্তুটিকে গ্রহণ অথবা বর্জন করিয়াই জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। পরিজ্ঞাত বস্তুটিকে জীবনযাত্রার অনুকূল বলিয়া মনে হইলে উহাকে আমরা গ্রহণ করি, অপরপক্ষে প্রতিকূল মনে হইলে তাহা বর্জন করি। এই গ্রহণ ও বর্জনই জীবনযাত্রার সাধারণ দুইটি দিক। বস্তুর কার্যকারিতা—অর্থাৎ বস্তুটি কি ফল বা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা বুঝিয়াই বস্তুটিকে গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়। বস্তুটির কার্যকারিতা-শক্তি জানা না থাকিলে তাহাকে গ্রহণ অথবা বর্জন কিছুই করা যায় না। যাহা আমার প্রয়োজন, বস্তুটি তাহা সম্পাদন করিতে পারে—ইহা বুঝিতে পারিলে বস্তুটিকে গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে বস্তুটির কার্যকারিতা-শক্তি আমার পক্ষে অনিষ্টকর—এইরূপ বুঝিলে বস্তুটিকে বর্জন করা হয়। সুতরাং কার্যকারিতা-শক্তি দ্বারাই বস্তুর অস্তিত্ব সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই দর্শনশাস্ত্রে কার্যকারিতা-শক্তির মূল উৎস হিসাবেই বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহা বস্তুর মৌলিক স্বরূপের ব্যবহারযোগ্য একটি দিক। কিন্তু সৎ বা অস্তিত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির সামর্থ্যকেই একমাত্র মান-দণ্ডরূপে সকলে ব্যবহার করেন নাই। বস্তুটি প্রয়োজনসিদ্ধির যোগ্য, অর্থাৎ যে কোন কার্য-নির্বাহের সামর্থ্য বস্তুত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সৎ-এর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মূল

১ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। (পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, নবম সূত্র)

সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞা বা লক্ষণ এক হয় নাই। কারণ, সৎ বা অস্তিত্ব এক—ইহা স্বীকার করিলেও যাবতীয় পদার্থকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ভাব এবং অভাব, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। নব্যন্যায় ও বৈশেষিকের মতে ভাব-পদার্থ ছয়টি এবং সপ্তম পদার্থরূপে অভাব স্বীকৃত হইয়াছে।[২] সুতরাং পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার ফলে এই উভয় দর্শনে অভাবেরও অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ভাবপদার্থ এবং অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও এই দুই শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। ভাবপদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম—এই তিনটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং স্বাভাবিকভাবে সাক্ষাৎ প্রয়োজন-সম্পাদক। দ্রব্য, গুণ, কর্ম—এই তিনটি দ্বারাই গ্রহণ বা বর্জনাত্মক জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়; অর্থাৎ গ্রহণীয় বা বর্জনীয়রূপে দ্রব্য, গুণ, কর্ম—এই তিনটিই মুখ্য বিষয়। অবশিষ্ট তিনটি ভাবপদার্থের মধ্যে সামান্য বা জাতি অনুগত প্রত্যয়ের কারণ; সুতরাং উহা বৌদ্ধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আবশ্যক, বাহ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামান্য বা জাতি পরম্পরায় উপযোগী হইলেও সাক্ষাৎ ব্যবহার্যরূপে সিদ্ধ হয় না। পদার্থনির্ণয়ের ক্রম অনুসারে সামান্য পদার্থটি চতুর্থ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর পঞ্চম পদার্থরূপে বিশেষ-এর উল্লেখ করা হয়। এই পদার্থটিও নিরবয়ব আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন এবং সমস্ত পরমাণু—ইহাদের পরস্পর ভেদ-সাধকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সাক্ষাৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই পদার্থটিরও উপযোগিতা নাই। কেবলমাত্র দার্শনিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি নিরবয়ব দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ-সম্পাদনের জন্যই এই পদার্থ স্বীকৃত হয়। ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়। ইহা একটি সম্বন্ধমাত্র। সুতরাং দুইটি পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োজনীয়তা। অতএব সাক্ষাৎভাবে ইহাও ব্যবহারযোগ্য পদার্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং এই ছয়টি ভাবপদার্থ অস্তিত্বশীল হইলেও গ্রহণীয় বা বর্জনীয়রূপে কেবলমাত্র প্রথম তিনটি পদার্থ—দ্রব্য গুণ ও কর্মকেই পাওয়া যায়। এইজন্য গ্রহণ-যোগ্যতা বা বর্জনযোগ্যতার দিক হইতে সৎ-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম—এই তিনটি পদার্থকেই সৎ বলিতে হয়। এইজন্যই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে সৎ-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—যাহা সত্তা-নামক জাতিবিশিষ্ট, অর্থাৎ সত্তা-জাতির আশ্রয়, তাহাই সৎ। ইহার তাৎপর্য এই যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম—এই তিনটি পদার্থের উপর যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্মত্ব নামক সামান্য বা জাতি থাকে। সুতরাং জাতির আশ্রয় বলিলে এই তিনটি পদার্থকেই বুঝা যায়। এইজন্য এই তিনটি পদার্থের উপর সত্তা নামক একটি মহাজাতি স্বীকার করা হয়। যাহা সত্তাসামান্যের আশ্রয়, তাহাই সৎ, ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিক মতে সৎ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা। সুতরাং সামান্য, বিশেষ, সমবায়—এই তিনটি ভাবপদার্থ এবং অভাবনামক সপ্তম পদার্থ অস্তিত্বশীল হইলেও তাহাদিগকে 'সৎ' এই সংজ্ঞার দ্বারা অভিহিত করা যায় না। অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম—এই তিনটি পদার্থই 'সৎ' সংজ্ঞার অভিধেয়। সুতরাং অস্তিত্ব এবং সৎ—এই উভয় সমানার্থক নহে। দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম—এই তিনটি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বটে, কিন্তু সমস্ত দ্রব্যেরই উৎপত্তি নাই। যাহা নিরবয়ব দ্রব্য (আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন ও পরমাণু) তাহাদের উৎপত্তি নাই অথচ উহারা পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সৎ। আবার দ্ব্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত দ্রব্য সাবয়ব। সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। অথচ ইহারাও সৎ। উৎপন্ন দ্রব্যের যে সমস্ত গুণ এবং

দ্রব্য, গুণ, কার্য, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব—এই সাতটি পদার্থ

কর্ম উৎপন্ন হয়, তাহারা অনিত্য হইলেও পূর্বের সংজ্ঞানুসারে সৎ। সুতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে সৎ নিত্য এবং অনিত্য দুই প্রকারের বস্তুই হইতে পারে। কিন্তু সৎ সংজ্ঞায় অভিহিত না হইলেও অস্তিত্বশীলরূপে অন্য তিনটি ভাবপদার্থ—সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়, ইহারা নিরবয়ব এবং নিত্য। যাহা সৎ তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই রহিয়াছে; কিন্তু যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই সৎ নহে। সুতরাং অস্তিত্ব ব্যাপক ধর্ম এবং সত্তা তাহার ব্যাপ্য ধর্ম। আরও কথা এই যে, উৎপত্তির পূর্বে এবং বিনাশের পরে যাহা অসৎ, তাহাই উৎপত্তির পর বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালে সৎ। কাজেই একই বস্তু কালভেদে সৎ এবং অসৎ—ইহাই অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণের সিদ্ধান্ত।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে নিত্য এবং অনিত্য—দ্বিবিধ সৎপদার্থই স্বীকৃত। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে সৎপদার্থ সর্বদাই অনিত্য বা ক্ষণিক। প্রত্যেক বস্তু প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণেই সেই বস্তুটির অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু সেই বস্তুর অনুরূপ অপর একটি বস্তু উৎপন্ন হয়। অপর একটি উৎপন্ন বস্তুকেই পূর্ববস্তুর বিনাশ বলা হয়। অর্থাৎ, বিনাশ বলিতে নৈয়ায়িকের মত বৌদ্ধগণ ধ্বংস বুঝেন না, কিন্তু অপর একটি বস্তুর উৎপত্তিকেই পূর্ববস্তুর বিনাশ বলা হয়।[৩] এই বিষয়ে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সারকথা এই যে, যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হইতে পারে না। কারণ একটি বস্তু সৎ এবং অসৎ—এই দুইটি স্বভাবাপন্ন হইতেই পারে না। প্রতি বস্তুর একটিই স্বরূপ, তাহার দুইটি স্বভাব থাকে না। সুতরাং প্রত্যেকটি বস্তু নিরংশ বলিয়াই নিজের উৎপাদক কারক হইতে সর্বাত্মকরূপেই উৎপন্ন হয়। অতএব পরবর্তী কালে অন্য কারণের দ্বারা সেই নিরংশ বস্তুটির অন্য স্বভাব সম্ভব নহে। কারণ, বস্তুটি উৎপন্ন হইলে যাহা সেই বস্তুটির মধ্যে নিষ্পন্ন হয় না, তাহা সেই বস্তুর স্বভাব নহে। অতএব উৎপন্ন একটি বস্তুর একটিই স্বভাব হইতে পারে, একাধিক স্বভাব হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং প্রত্যেকটি বস্তুর পরক্ষণে পূর্ববস্তুর অনুরূপ অন্য একটি বস্তুর যে উৎপত্তি, তাহা ভাবস্বরূপ এবং ইহাকেই পূর্ববস্তুর নাশ বলা হয় (যোঽসৌ উত্তরকালমুৎপদ্যতে নাসৌ আত্মাভাবঃ স অপরঃ স্বভাবঃ। তত্ত্বসংগ্রহ, পঞ্জিকাটীকা, ৩৫৯ কারিকা)। সুতরাং বস্তুর 'বিনাশ' শব্দের অর্থ পূর্ববস্তুটির অনুরূপ পৃথক্ আর একটি বস্তুর উৎপত্তি। সুতরাং প্রতিক্ষণেই প্রতিটি বস্তু উৎপন্ন হয় এবং প্রতিক্ষণেই উহা সৎ। প্রকৃতপক্ষে ক্ষণ ও বস্তু বৌদ্ধমতে সমার্থক শব্দ। প্রত্যেকটি ক্ষণ যেমন পরক্ষণে থাকে না, অথচ ক্ষণ থাকে, তেমনই ক্ষণের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত বস্তুও প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন ভাবে উদ্ভূত হয়, কিন্তু কোন ক্ষণেই তাহার পূর্বক্ষণের বস্তুটি থাকে না, ক্ষণের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত নূতন নূতন বস্তু থাকিয়াই যায়।[৪] এই ক্ষণ বা বস্তু প্রতিনিয়তই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্বের ক্ষণটি পরক্ষণে থাকে না, আরেকটি নূতন ক্ষণের আবির্ভাব ঘটে। ইহাই সাধারণভাবে ক্ষণভঙ্গবাদ নামে পরিচিত। যাহা সৎ তাহা এইরূপ ক্ষণিক ভিন্ন স্থির বস্তু হইতেই পারে না—ইহাই বৌদ্ধদার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। কারণ, বৌদ্ধদার্শনিকগণ অর্থক্রিয়াকারিত্ব (প্রয়োজন-

৩ ন চানংশে সমুদ্ভূতে ভবাত্মন্যাত্মহেতুতঃ।
তদাত্মৈব বিনাশোঽনৈরাধাতুং পার্যতে পুনঃ॥ (তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৫৯)

৪ বস্ত্বনন্তরভাবাচ্চ হেতুমানেব যুজ্যতে।
অভূত্বাভাবতশ্চাপি যথৈবান্যঃ ক্ষণমতঃ॥ (তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৬৯)

সিদ্ধিসামর্থ্য)-কেই সৎ বলেন। বস্তু স্থির হইলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব নহে।[৫] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থেই বর্তমান। এখানে সৎ বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব স্থির বস্তুর পক্ষে সম্ভব নহে কি কারণে, তাহার মূল যুক্তিটি আলোচিত হইতেছে মাত্র। অর্থক্রিয়াকারিত্ব দুইভাবে সম্ভব—ক্রমিক অথবা অক্রমিক। অর্থাৎ কোন বস্তু অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—কালত্রয়েই অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে। কিন্তু একটি সময়ে কালত্রয়ের অর্থক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কালেই বস্তুটি স্বকীয় অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। ইহার নাম ক্রমিক অর্থক্রিয়াকারিত্ব। পক্ষান্তরে বস্তু যুগপৎ অর্থাৎ কোন ক্রম অপেক্ষা না করিয়া স্বীয় অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে, ইহাকে অক্রমিক অর্থক্রিয়াকারিত্ব বলা হয়। সুতরাং অর্থক্রিয়া-কারিত্ব এই দুইভাবেই সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকারে হইতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, বস্তুটি স্থির হইলে তাহার পক্ষে ক্রমিক অথবা অক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কারণ বর্তমানে যে জল বিদ্যমান সেই জলই যদি অতীত এবং ভবিষ্যৎ-কালেও থাকে, তাহা হইলে জলের অর্থক্রিয়াকারিত্বও বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যৎ-কালের অর্থক্রিয়াকারিত্বও বর্তমানেই সম্পন্ন হয়। কারণ, বর্তমানের জল এবং ভবিষ্যতের জল স্থিরস্বভাব হইলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়-কালেই এক বা অভিন্ন জল স্বীকার করিতে হয়। তৃষ্ণানিবারণ প্রভৃতি অর্থক্রিয়ানিষ্পাদনশক্তিই জলের সত্তা, সুতরাং জল স্থিরস্বভাব হইলে বর্তমানকালের জলেও ভবিষ্যৎ-কালের জলের অর্থক্রিয়ানিষ্পাদনশক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ অর্থক্রিয়াকারিত্ব বর্তমান জলেরই থাকিয়া থাকিলে বর্তমানেই ভবিষ্যৎ অর্থক্রিয়া সম্পন্ন হয় না কেন? কারণ, বস্তুর যাহা স্বভাব, তাহা বস্তুর নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। সেই স্বভাব থাকিলে কোন প্রকারেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়াসাধনশক্তি বর্তমান জলে থাকিলে বর্তমান জলই এইক্ষণে অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত অর্থক্রিয়া কেন সম্পাদন করিবে না—তাহা প্রশ্ন হইবে। অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা জানি, বর্তমানে বিদ্যমান জল বর্তমানকালের অর্থক্রিয়াই সম্পাদন করে, ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না। কারণ, বর্তমান জল যদি অনাগত সমস্ত কালের অর্থক্রিয়া অর্থাৎ পিপাসানিবৃত্তি প্রভৃতি সম্পাদন করিতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ-কালে জলের প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না। কিন্তু তাহা যে হয় না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বলা হয় যে, প্রত্যেকটি বস্তু স্বীয় অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিলেও কাল নামক সহকারী কারণকে অপেক্ষা করে, সুতরাং ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়া সম্পাদনের সহকারী কারণ ভবিষ্যৎ-কাল। বর্তমানে সেই সহকারী কারণ না থাকায় ভবিষ্যৎ-কালের অর্থ-ক্রিয়াসাধনশক্তি থাকিলেও সহকারী কারণের অভাবে বর্তমান জল ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না। সুতরাং অর্থক্রিয়াসম্পাদনশক্তি স্থির হইলেও অর্থাৎ বস্তু স্থিরস্বভাব হইলেও কোন দোষ নাই। ইহার উত্তরে বৌদ্ধদার্শনিকগণ বলেন, সহকারী কারণ কাহাকে বলে তাহাই বিচার্য। সহকারী কারণ মূল কারণে কোন শক্তি সঞ্চার করে কি? মূল কারণে শক্তি সঞ্চারের ফলে যদি মূল কারণ কার্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে মূল কারণকে প্রকৃতপক্ষে কারণ

---

৫ অর্থক্রিয়াসু শক্তিশ্চ বিদ্যমানত্বলক্ষণম্।
ক্ষণেষ্বেব হি নিয়তা তথাঽবাচ্যে ন বস্তুতা ॥ (তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৪৭)

বলা যায় না। যাহার উপস্থিতির অব্যবহিত পরক্ষণে কার্যের উৎপত্তি হয়, তাহাই কারণ। অন্যভাবে বলা যায়, যাহা না থাকিলে কার্য হয় না, যাহা থাকিলেই কার্য হয়, তাহাই কারণ। সহকারী কারণের উপস্থিতি ভিন্ন কার্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব না হইলে এবং সহকারী কারণের উপস্থিতিতেই কার্যের উৎপত্তি হইলে উহাকে সহকারী না বলিয়া মূল কারণই বলিতে হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে যাহার উপস্থিতি সত্ত্বেও সহকারীর উপস্থিতি ব্যতীত কার্যোৎপন্ন হয় না, তাহাকেই মূল কারণ বলিতে হয়; অথচ যাহার উপস্থিতিতেই কার্যোৎপন্ন হয়, তাহাকে সহকারী কারণ বলা হয়, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং সহকারী কারণ সিদ্ধ হয় না। অতএব, সহকারী কারণ কল্পনা করিয়া স্থিরস্বভাববাদী পূর্বোক্ত দোষ পরিহার করিতে পারেন না। সুতরাং বুঝা গেল, বস্তু স্থিরস্বভাব নহে। অর্থাৎ ক্রমিক অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করিলে বস্তুকে স্থিরস্বভাব বলা যায় না। কিন্তু প্রতিক্ষণে বস্তুটি নূতন নূতন ভাবে আবির্ভূত হইলে প্রতিটি বস্তু সেই ক্ষণেই সৎ বলিয়া কেবলমাত্র সেই ক্ষণেই অর্থক্রিয়াকারী হইবে। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্বের ক্রমিকত্বের দিক হইতে বস্তুকে স্থিরস্বভাব বলা যায় না।

আবার অপরপক্ষ অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্বকে অক্রমিক বলিলেও বস্তুকে স্থির-স্বভাব বলা যাইবে না। কারণ, অক্রমিক অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকার করিবার অর্থ হইল—যুগপৎ সমস্ত অর্থক্রিয়াসাধনসামর্থ্য স্বীকার করা। সেখানে প্রশ্ন এই যে, বর্তমান ক্ষণে যে বস্তুটি তাহার অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকালের সমস্ত অর্থ ক্রিয়াসাধনে সমর্থ, তাহার এই সামর্থ্য পরক্ষণেও থাকিবে কিনা। যদি থাকে, তাহা হইলে বর্তমানের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্পূর্ণভাবে পরবর্তী কালেও বিদ্যমান থাকিবার ফলে অতীতকালের অর্থক্রিয়া বর্তমানকালেও সম্পন্ন হউক। যেমন একটি বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ। বর্তমানের এই বীজটিই যদি সমস্তকালে অঙ্কুরোৎপাদন-সামর্থ্যশালী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বীজটি দশদিন পরে অঙ্কুরোৎপাদন না করিয়া এই মুহূর্তেই অঙ্কুরোৎপাদন করে না কেন? এই দোষ পরিহারের জন্য বর্তমানকালের অর্থক্রিয়াকারিত্ব ভবিষ্যৎ-কালেও অনুবৃত্ত হয় না স্বীকার করিলে ফলতঃ বস্তুটিকে ক্ষণিক বলিয়াই স্বীকার করা হইল। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্বের অক্রমিকত্বও বস্তুর স্থিরস্বভাবের সাধক নহে। অতএব অর্থক্রিয়া-কারিত্বের উভয় পদ্ধতি—ক্রমিকত্ব এবং অক্রমিকত্ব—কোনটি অনুযায়ীই স্থিরস্বভাব বস্তুর পক্ষে অর্থক্রিয়াকারী হওয়া সম্ভব হয় না। অথচ অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তুর বস্তুতা বা সত্তা। সুতরাং অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ বস্তুকে অক্ষণিক বা স্থিরস্বভাব বলিবার কোন উপায় নাই। ইহাই সংক্ষেপে ক্ষণভঙ্গবাদের মূল বক্তব্য।[৬] সুতরাং বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তুত্ব বা সত্তা এবং তাহা ক্ষণিক। কিন্তু যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ নহে। কিন্তু প্রতিক্ষণে সৎ বা বস্তুটি নূতন নূতন ভাবে আবির্ভূত হয়, পূর্বক্ষণের সৎ পরক্ষণে থাকে না, অপর একটি সৎ আবির্ভূত হয়। সুতরাং কালভেদে একই বস্তু সৎ এবং অসৎ—দ্বিবিধ হইতে পারে, ন্যায়বৈশেষিকের এই মত বৌদ্ধদার্শনিকগণ স্বীকার করেন নাই। যাহা

৬ তত্র যন্নাম কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদুপজায়তে।
ক্বচিৎ কদাচিৎ তত্রৈব যুক্তা সত্তাব্যবস্থিতিঃ
তদ্রূপস্যৈব চার্থস্য ক্ষণিকত্বং প্রসাধ্যতে।
ব্যাপ্তিঃ সর্বোপসংহারা তস্মিন্নেবাভিধীয়তে। (তত্ত্বসংগ্রহ, কারিকা ৪২০-২১)

সৎ, তাহা সর্বদাই সৎ, কিন্তু প্রতিক্ষণেই তাহা ভিন্ন—ইহাই সংক্ষেপে বৌদ্ধমতে বস্তুত্বের পরিচয়।

ন্যায়বৈশেষিক এবং বৌদ্ধদর্শনের মত আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝা গেল যে, ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে অস্তিত্ব এবং সত্ত্ব সমানার্থক নহে। ন্যায়-বৈশেষিকমতে পদার্থসমূহ ভাব এবং অভাব—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব, ভাব এবং অভাব—এই উভয়েরই অনুগত কিন্তু ভাবপদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম—এই তিনটি পদার্থকেই পারিভাষিক সত্তাবিশিষ্টরূপে স্বীকার করা হয়। তাহার মধ্যেও আকাশ, দিক, কাল, আত্মা, মন এবং পরমাণু—ইহারা নিত্য বলিয়া সর্বদাই সৎ। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সত্তার আশ্রয় হিসাবে ইহারা সর্বদাই বিদ্যমান। সুতরাং কতগুলি সৎপদার্থ সর্বদাই আছে। পক্ষান্তরে উৎপত্তিবিনাশশীল ঘট প্রভৃতি দ্রব্য উৎপত্তির পূর্বে এবং বিনাশের পরে অসৎ, কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্তী সময়ে ইহারা সৎ। সুতরাং এই সমস্ত পদার্থ কালভেদে অসৎ এবং সৎ দুই প্রকারেরই হইতে পারে।

কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে সৎ-বস্তুকে ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় কোন বস্তুর পক্ষেই কালভেদের কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেকটি বস্তু এক ক্ষণমাত্র স্থায়ী বলিয়া সৎ ক্ষণিকই হইবে। ইঁহাদের মতে সত্তা এবং অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব সমানার্থক।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীসন্তদাস-কথামৃত : সঙ্কলয়িত্রী—শ্রীগঙ্গাদেবী। প্রকাশিকা : শ্রীগৌরীদেবী, 'শ্রীশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ-আশ্রম', বি ৩-১৮৯ শিবালয়, বারাণসী। (১৩৮৭), পৃঃ ২৭+২৯১ +১০৬, মূল্য : ১৫·০০ টাকা।

'প্রকাশিকার নিবেদনে' আছে : 'আমার অজ্ঞতা ও অক্ষমতাপ্রযুক্ত পুস্তকখানিতে কোথাও কোথাও কিছু কিছু ভুলত্রুটি (বিশেষ ক'রে দু' একটি ঘটনার এবং প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তি) রয়ে গেল, সেজন্য সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।' ক্ষমাপ্রার্থনার পরে আর পুনরাবৃত্তি ও অন্যবিধ ত্রুটির উল্লেখ শোভন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যৎ সংস্করণে যাতে গ্রন্থখানি সম্পাদনার দিক থেকে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠতে পারে, সে-কথা মনে রেখেই ত্রুটিগুলির আংশিক উল্লেখ দরকার এবং কীভাবে সেগুলি দূর করা যেতে পারে সে-সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা সম্ভবতঃ অসমীচীন হবে না।

যদিও প্রকাশিকা লিখেছেন, গ্রন্থটিতে 'দু'একটি ঘটনার এবং প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তি' রয়েছে, প্রকৃত-পক্ষে গ্রন্থটিতে ছোট-বড় অজস্র পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কয়েকটি বড় পুনরাবৃত্তির নমুনা—(১) পৃঃ ৫৯-এর দু-একটি পঙ্‌ক্তি বাদে সবটাই পৃঃ ৭৭-এ পুনরাবৃত্ত (অথচ পৃঃ ৫৯ আছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এবং পৃঃ ৭৭ অব্যবহিত পরবর্তী পরিচ্ছেদে; সুতরাং এ-জাতীয় ভুল কীভাবে হতে পারে, তা দুর্বোধ্য); (২) পৃঃ ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩ (আংশিক)—পৃঃ ৭৮-৮১ ও ৮২ (আংশিক)-এ পুনরাবৃত্ত [উল্লিখিত (১) ও (২) পুনরাবৃত্তি একত্র করলে মোটামুটি বলা যায়, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৫টি পৃষ্ঠা ৭ম পরিচ্ছেদে পুনরাবৃত্ত]; (৩) পৃঃ ৯৪ ও ৯৫ (আংশিক)—পৃঃ ২৭৮ (আংশিক) ও পৃঃ ২৭৯ (আংশিক)-এ পুনরাবৃত্ত; (৪) পৃঃ ১৯ ও ২০ (আংশিক)—পৃঃ ১৩৬(আংশিক) ও ১৩৭-এ পুনরাবৃত্ত; (৫) পৃঃ ১৭৪ (প্রথম ৬টি পঙ্‌ক্তি

বাদে)—গ্রন্থ-পরিচয়ের পৃঃ ৯০-৯১-এ পুনরাবৃত্ত ; (৬) পৃঃ ১২ (আংশিক) ও ১৪ (আংশিক)—পৃঃ ৮২ (আংশিক) ও ৮৩ (আংশিক)-এ পুনরাবৃত্ত ; (৭) পৃঃ ৯৮'র (১৬টি পঙ্‌ক্তি)—পৃঃ ১৭৫ ও ১৭৬-এ—পুনরাবৃত্ত। স্থানাভাববশতঃ ছোট ছোট পুনরাবৃত্তিগুলির নমুনা দিলাম না।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই ধরনের পুনরাবৃত্তির কারণ কী? যথোচিত সম্পাদনার অভাবই এর কারণ, নিঃসন্দেহে। কিন্তু যেহেতু আমরা প্রতিকারের কথার উল্লেখ করেছি, সেইহেতু বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া দরকার। সঙ্কলয়িত্রী 'মুখবন্ধে' জানিয়েছেন যে, প্রশ্নোত্তরগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির ডায়েরি থেকে সঙ্কলিত। এ-অবস্থায় গ্রন্থটির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদগুলি তো ডায়েরি-অনুযায়ীই সাজানো যেত! বর্তমানে পরিচ্ছেদ-গুলি 'এক', 'দুই', 'তিন' ইত্যাদি ক'রে 'নয়'-তে শেষ হয়েছে। কী ভিত্তিতে এই পরিচ্ছেদ-বিভাগ করা হয়েছে, তা বোঝা যায় না। (নবম পরিচ্ছেদটি সবচেয়ে বড়—মোট ১৬৬ পৃঃ; অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি তুলনায় অনেক—অনেক ছোট।) মনে হয় বিভিন্ন ডায়েরি-অনুযায়ী পরিচ্ছেদগুলি বিন্যস্ত করলে পূর্বোক্ত ছোট-বড় পুনরাবৃত্তিগুলি হ'ত না; অথবা বহুলাংশে কমে যেত (কারণ, এক ব্যক্তির ডায়েরিতে যে সন্তদাসজীর কথার পুনরাবৃত্তি একেবারেই থাকবে না, তা নয়)। অথবা 'আত্মকথা' (পৃঃ ৮৩, ৮৮, ৮৯, ১১৩, ১৭০, ১৭৮, ১৭৯, ১৯২, ২১৪, ২২৬ ইত্যাদি), 'আর্তি' (পৃঃ ১৯, ৯৮ ইত্যাদি), 'আহার' (৫১-৫৭ ইত্যাদি)—এভাবে আলোচিত বিষয়গুলি বর্ণানুক্রমিক সাজালে পুনরাবৃত্তি একেবারেই থাকতো না।

গ্রন্থটির অন্য ধরনের ত্রুটি সম্বন্ধে বলা যায়, যদিও নামটি 'শ্রীশ্রীসন্তদাস-কথামৃত' এবং ডঃ রমা চৌধুরী এবং শ্রীগঙ্গাদেবী যথাক্রমে ভূমিকায় ও মুখবন্ধে 'শ্রীমুখনিঃসৃত' (পৃঃ ॥ ৫ ॥) ও 'মুখ নিঃসৃত' [পৃঃ (২২)] শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তবু কথা ছাড়াও সন্তদাসজীর 'চিঠির অংশ' (পৃঃ ১৭৪, ১৭৬-৭৭, ২৪২), 'চিঠির মর্ম' (পৃঃ ১৮০), 'চিঠি হইতে উদ্ধৃত' (পৃঃ ১৮২, ১৮৩, ১৮৪) এবং সম্পূর্ণ চিঠিও (পৃঃ ১৯৭-৯৮) গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। [পৃঃ ২০২-তে শ্রীমতী অমিয়া দেবী (ফরিদপুর)-কে লিখিত পত্রটির শেষ কোথায়, কিছু বোঝা যায় না।]

অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রশ্নেই প্রশ্ন-কর্তার নাম একেবারেই নেই। আবার দেখা যায় কোন কোন প্রশ্নে অকস্মাৎ প্রশ্নকর্তার বা প্রশ্ন-কর্ত্রীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। যথা—সুরেন চৌধুরী (পৃঃ ১৭৩, ২১৮), জানকীবাবু (পৃঃ ২১৮), ক্ষিতীশ গাঙ্গুলী (পৃঃ ২৪২) ইত্যাদি। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য পৃঃ ২১৩-তে শ্রীশচীন্দ্রকুমার সেনের প্রথম প্রশ্নটি নেই, অথচ 'প্রশ্ন' বলে যা দেওয়া হয়েছে, তা বাবাজীমহারাজেরই এবং 'উত্তর'ও তাঁরই। কোথায় কি-যেন জট পাকিয়ে গেছে !)

খুব বেশী না হলেও গ্রন্থটিতে ছাপার ভুল আছে—দু' পৃষ্ঠার শুদ্ধিপত্রে যেগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ছাড়াও। এমনকি মন্ত্রেও ভুল আছে (পৃঃ ১৯৭), যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং এই ভুলটিও শুদ্ধিপত্রে নেই।

গ্রন্থটিতে তিনটি চিত্র আছে। প্রথম চিত্রটির উপস্থাপনা যথাযথ। দ্বিতীয় চিত্রটি (গার্হস্থ্যাশ্রমের) এ-গ্রন্থে অনাবশ্যক—জীবনীগ্রন্থেই এটির যথাযোগ্য স্থান। মনে রাখা দরকার, গ্রন্থটির নাম 'শ্রীশ্রীসন্তদাস-কথামৃত'। তৃতীয় চিত্রটিতে আলোক-চিত্র বা ব্লকের ত্রুটি লক্ষণীয়।

গ্রন্থটিতে অন্য একটি পুস্তক থেকে 'গ্রন্থ-পরিচয়' দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থ-পরিচয় যদি থাকতে পারে, ব্যক্তি-পরিচয় বা জীবন-পরিচিতিও অবশ্যই থাকতে পারে এবং সেটিরই প্রয়োজন ছিল বেশী। পরিশিষ্ট

—১ হিসাবে সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে দ্বিতীয় চিত্রটি সন্নিবিষ্ট করা যেত এবং গ্রন্থ-পরিচয়টি পরিশিষ্ট—২ হিসাবে রাখা যেত। উল্লেখ্য বর্তমানে গ্রন্থ-পরিচয়টি 'পরিশিষ্ট' হিসাবে দেওয়া হয়নি—'শেষ অধ্যায়' হিসাবে দেওয়া হয়েছে [মুখবন্ধ পৃঃ (২৭) দ্রষ্টব্য]। 'কথামৃতে'র 'শেষ অধ্যায়' 'গ্রন্থ-পরিচয়' হয় কী ক'রে ?

একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রপ্রবক্তা মহাপুরুষের অমূল্য উপদেশাবলী বঙ্গভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। বহু সাধক-সাধিকার নিত্য স্বাধ্যায়ের গ্রন্থ হিসাবে এটিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অবশ্য সেদিক থেকে বিচার করলে যে-সব ত্রুটির কথা বলা হ'ল, সেগুলির ভূমিকা সম্পূর্ণ গৌণ, আর পুনরাবৃত্তি সেক্ষেত্রে দূষণ নয়—ভূষণ। কারণ, 'ন মন্ত্রাণাং জামিতা অস্তি'—মন্ত্রসমূহের পুনরুক্তি-দোষ নেই। 'মননাৎ ত্রায়তে মন্ত্রঃ'—যা মনন করলে ত্রাণ করে তাই মন্ত্র। এ-গ্রন্থে যে-সব অমূল্য উপদেশ বিধৃত, তা মন্ত্রতুল্য। নিঃসন্দেহে সেগুলির পরম পাবনী শক্তি রয়েছে। সুতরাং এই সব উপদেশের পুনরুক্তি দোষাবহ নয়। এই সমালোচনার প্রথমাংশে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে, তা সাহিত্যকৃতির বিচারে, আর এখন যা বলা হ'ল, তা স্বাধ্যায়-গ্রন্থের বিচারে। সুতরাং বিরোধ কিছু নেই।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুন্দর। ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজও ভাল। সে-তুলনায় দাম যথাসম্ভব কম রাখা হয়েছে। স্থানাভাবে এ-সমালোচনায় শ্রীসন্তদাস-কথামৃতে'র কিছুই পরিবেশন করা গেল না। সে-কথামৃত যাঁরা আস্বাদন ক'রে, পান ক'রে পরিতৃপ্ত হতে চান, যাঁরা উন্নত জীবনের জন্য লালায়িত এবং যাঁদের অন্তরে এ-বোধ জেগেছে যে, ভগবদ্ভজন ছাড়া শান্তি নেই জীবনে বা মরণে, আশা করবো তাঁরা সাগ্রহে এই অমূল্য গ্রন্থটিকে নিত্যসঙ্গী করবেন।

শ্রীগঙ্গানন্দ দাস

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে ঃ

(ক) ত্রিপুরা—হাঙ্গামাত্রাণ ঃ ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণকার্য ঃ বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক অগস্ট মাসে (১৯৮০) ৩,০৬৪টি ধুতি ও শাড়ি, ১,০৪১টি পশমী কম্বল, ১,৭৮০টি নূতন পোশাক, ২,১০৪টি পুরাতন পোশাক, ২০৬টি বাসনপত্র, ৩৯৫টি মাদুর ও ১,৯৪৩টি হ্যারিকেন লণ্ঠন ৩,৫৮২টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। তাছাড়া ১৪,৮০০ শিশু ও পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে দুগ্ধ ও পাউরুটি বিতরিত হইয়াছে। ত্রাণ-শিবিরে পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসাদি করা হইয়াছে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ ঃ মালদা (১৯৮০-এর বন্যায়) বন্যাত্রাণ ঃ মালদা জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে চিঁড়া-গুড় বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ত্রাণকার্য ১৫ই অগস্ট, ১৯৮০ শুরু করা হয়। ২৫শে অগস্ট হইতে ২২টি গ্রামের ১০,০০০ জলবন্দী মানুষের মধ্যে রান্না-করা খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। ২০,০০০ ব্যক্তিকে টাইফয়েড ডিপথিরিয়া ও কলেরার প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) **পুনর্বাসনকার্য :** বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে দিঘড়ায় 'নিশ্চিন্ত নীড়'-সংলগ্ন গৃহনির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে। বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুদ্ধারের জন্য একটি কার্যসূচীও গৃহীত হইয়াছে।

(গ) সৌরাষ্ট্রে বন্যাত্রাণকার্যে গত জুলাই মাসে (১৯৮০) জুনাগড় জেলার মালিয়া-হাতিনা, কেশোদ ও অবানিয়া গ্রামের ৪২৫টি এবং রাজকোট জেলার সুপেদি, ঝাঁঝমের, ফেরিনি ও মোটা-গুণ্ডালা গ্রামের ২৬৮টি (মোট ৬৯৩টি) পরিবারের মধ্যে বাজরা ৪০০০ কেজি, পেঁয়াজ ৩০০০ কেজি, গম ২০০০ কেজি, শাড়ি ৫৩৬ খানি, বিছানার চাদর ২৬৮ খানি ইত্যাদি এবং শিশুদের পোশাক, লংক্লথ, গেলাস, থালা প্রভৃতিও বিতরিত হয়।

১৯৭৯-এর মোরভির বন্যায় **পুনর্বাসনকার্য :** ভানালিয়া গ্রামে ১৮৩টি গৃহের নির্মাণকার্য প্রাগ্রসর। দুইটি ডিসপেন্সারি নির্মাণের কাজ ও দুইটি কূপ খননের কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। একটি বিদ্যালয় ও বালমন্দির নির্মাণের কাজও শীঘ্রই আরম্ভ করা হইবে। লালবাগে ২৫০টি গৃহের নির্মাণকার্যও প্রাগ্রসর।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ১৩ই মে ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৩১শে মে ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১।৩।৩) ভক্তির তমঃ কিভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে তাতেই ভগবানলাভ এবং লোককল্যাণ হয়, সেটি উত্তম বৈদ্যের উপমা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়েছেন। এখন চতুর্থ পরিচ্ছেদের শুরুতেই একজন ব্রাহ্মভক্ত একটি নতুন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?' জিজ্ঞাসা ক'রে। মাষ্টারমশাই এই প্রসঙ্গ শুরু হওয়ার পূর্বেই উপনিষদের একটি মন্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'—যেখান থেকে মনসহ বাক্য ফিরে আসে। অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু বাক্য-মনের অতীত। কেন এই উদ্ধৃতিটি দিলেন তিনি? সেটি আমাদের বুঝতে হবে।

ব্রাহ্মভক্তের ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, 'তাঁর ইতি করা যায় না।'—'এইটিই তিনি' এ-কথা বলা যায় না। ব্রহ্মের লক্ষণ নানাভাবে শাস্ত্রে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত 'নেতি নেতি' (ন ইতি, ন ইতি) বলা ছাড়া যে অন্য কোন উপায়ই নেই, সে-কথা শাস্ত্রেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সেইজন্যই মাষ্টারমশাই ঠাকুরের কথার সূত্রস্বরূপ উপনিষদের ঐ মন্ত্রটি প্রথমেই উদ্ধৃত করেছেন।

ঠাকুর বলছেন, 'তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার।' কাজেই ঈশ্বর দু-রকমই। যিনি জ্ঞানী, তাঁর কাছে তিনি নিরাকার আর যিনি ভক্ত, তাঁর কাছে তিনি সাকার।

মানুষ যখন অধ্যাত্মপথে যেতে আরম্ভ করে, তখন তার যে-মনটা আগে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তার গতি পরিবর্তিত হয়ে

যোগশাস্ত্রে বর্ণিত সুষুম্নার পথে প্রবাহিত হয়। মানুষের যে-সব স্নায়ু আছে, তাদের দুটি বিভাগ—একটি স্পর্শাত্মক, অন্যটি ক্রিয়াত্মক। একজনের হাতে একটা মশা বসেছে, স্পর্শাত্মক স্নায়ু সেই অনুভূতিটা মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া মাত্র মস্তিষ্ক সেটি বিচার ক'রে ক্রিয়াত্মক স্নায়ুর সাহায্যে আর একটি হাতকে সক্রিয় ক'রে মশাটা তাড়িয়ে দেবে। এইভাবে সবকিছু অনুভূতি ও ক্রিয়া হয়। কিন্তু যোগশাস্ত্রে বলেছে এইভাবে স্নায়ুর পথে মনকে চালিয়ে না দিয়ে একটি স্নায়ুশূন্যপথে মনকে চালিয়ে দেওয়া যায়। মেরুদণ্ডের একেবারে নীচে থেকে সেটি আরম্ভ হয়েছে, এবং মস্তিষ্ক পর্যন্ত গিয়েছে। এই মেরুদণ্ডের প্রান্তসীমায় রয়েছেন কুণ্ডলিনী-শক্তি। সেই শক্তিকে যখন যোগী ঐ স্নায়ুশূন্য-পথের মধ্য দিয়ে উর্ধ্ব দিকে তুলতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁর সামনে আর একটি জগতের দ্বার খুলে যায়। দৃশ্যজগৎ এটি নয়। কুণ্ডলিনী যখন ঐ সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়ে উঠতে আরম্ভ ক'রে হৃদয়ে এসে পৌঁছন, তখন নানা দেবদেবীর মূর্তি-দর্শন হয়। তারপর যখন কণ্ঠে ওঠেন, তখন ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। এইভাবে ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে এলে ঈশ্বরের জ্যোতির্ময়রূপ দর্শন হয়, কিন্তু তখনও একটা পর্দার মতো আবরণ থাকে। তারপরে সহস্রারে এলে রূপদর্শনাদি লোপ পায়। সর্ববৃত্তিনিরোধ হওয়ায় দর্শন শেষ হয়ে যায়। তখন নিরাকার অনুভূতি। সেটি কেমন? না—'বোধে বোধ'। স্বামীজী এই নিরাকার অনুভূতির বর্ণনা ক'রে লিখেছেন, "…শূন্যে শূন্য মিলাইল 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্', বোঝে—প্রাণ বোঝে যার॥" এটি জ্ঞানীর অবস্থা। আর যাঁরা ভক্ত, তাঁদের কাছে ঈশ্বর সাকাররূপে আসেন। তাঁদের দৃষ্টিতে জগৎ মিথ্যা নয়। ঠাকুর বলছেন, "জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।' জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বলতে পারে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কত সুন্দরভাবে বলছেন! তাঁর একটা নিজস্ব বলবার ভঙ্গী আছে। তিনি কঠিন বিষয়কে উপমার সাহায্যে সহজ ক'রে বুঝিয়ে দেন। একজন বড় সাহিত্যিক বলেছেন যে, আগের যুগে যেমন বলা হয়েছে 'উপমা কালি-দাসস্য', তেমনি এ-যুগে 'উপমা রামকৃষ্ণস্য', অপূর্ব উপমা! তারই একটি নমুনা আমরা এখানে পাচ্ছি: 'কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল-কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কখন কখন সাকার রূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তাঁর রূপও দর্শন হয় না।' এই সুন্দর উপমাটির সাহায্যে ঠাকুর কত সহজে বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানীর কাছে নিরাকার, ভক্তের কাছে সাকার।

এরপর ঠাকুর উপমার পর উপমা দিয়ে দুরূহ তত্ত্ব সব বোঝাচ্ছেন। বলছেন, 'বিচার করতে করতে আমি-টামি আর কিছুই থাকে না। প্যাজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।' অর্থাৎ 'আমি কে?'—এই বিচার করতে করতে—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ইত্যাদি সব ছাড়িয়ে সাধক শেষে 'আমি'কে আর খুঁজে পান না। বিচারের শেষে যা থাকে, তাই আত্মা।

আরেকটি সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, 'একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যেই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?' অর্থাৎ যে-মন দিয়ে আমরা স্বরূপের বিচার করছি, সেই মন যে-মুহূর্তে

নির্বিকল্পসমাধিস্থ হল, তখন তার আর পৃথক্‌ অস্তিত্ব রইল না—সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবে গেল। সুতরাং মন কি ক'রে সচ্চিদানন্দস্বরূপের পরিচয় দেবে!

পূর্ণজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত বিচার শেষ হয় না। পূর্ণজ্ঞান হ'লে মানুষ আর বিচার করে না। সেই কথাই ঠাকুর উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'কলসী পূর্ণ হ'লে, কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয় ততক্ষণ শব্দ।'

আরেকটি উপমা দিচ্ছেন, 'আগেকার লোকে বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না।' কালাপানি মানে সমুদ্র। আগেকার দিনে সমুদ্রে জাহাজ গেলে আর না ফিরবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ তখনকার সময়ে জাহাজ চালানো এখনকার মতো এতো উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্ভর ছিল না। শুধু পাল ও হালই প্রধান ছিল। তাই প্রচণ্ড ঝড় বা অন্য কোন দুর্বিপাকে জাহাজ পড়তো। সেই কথাটি ঠাকুর বলছেন। তবে বলছেন, 'আগেকার লোকে বলতো', অর্থাৎ এটি তাঁর আগের লোকেদের ধারণা ছিল। তাঁর সময়ে তিনি জানতেন, সমুদ্র পার হওয়া যায় জাহাজে ক'রে। বিলেত যাওয়া যায়, এই সব তিনি জানতেন। এখানে কালাপানির অর্থ সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। সাধারণ জীবকোটি মানুষ সেখানে গেলে আর ফেরে না।

এরপর ঠাকুর বলছেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। হাজার বিচার কর, আমি যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।" বিচারকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না, বিচারের পথেও তত্ত্বলাভ হয়। বিরল কেউ কেউ বিচার করতে করতে নির্বিকল্পসমাধিস্থ হন। সে-অবস্থায় 'অহং' থাকে না। কিন্তু অন্যদের 'অহং' যায় না। তাহলে উপায় কি? না—'ভক্ত আমি' এই অভিমান রাখা। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি ঠাকুর ব্রাহ্মভক্তদের লক্ষ্য ক'রে বলছেন, যাঁরা সাকারে বিশ্বাস করেন না অথচ সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। তাঁদের ঠাকুর বলছেন, 'তোমরা যে প্রার্থনা করো, তাঁকেই করো।' অদ্বৈতবেদান্তবাদীদের মতে নিরাকার হলেই নির্গুণ হবে; তাই তাঁদের মতের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের মত মেলে না। ঠাকুর স্পষ্ট ক'রে বলছেন, 'তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও, তোমরা ভক্ত। সাকাররূপ মানো আর না মানো, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাকলেই হলো—যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি। ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।' কারণ কি? না—জ্ঞানপথের পথিক দুর্লভ। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের মধ্যে একমাত্র স্বামীজীকেই অদ্বৈতজ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলেন। কারণ, স্বামীজীই একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কাজেই আমাদের মতো সাধারণ জীবের পক্ষে ভক্তিপথই সহজ পথ ঈশ্বর লাভ করার

(১।৩।৪)

গীতা-

আগের দিন আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, জ্ঞান হ'লে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়ে যায়। কি ক'রে তা হয়, দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীভগবান বুঝাচ্ছেন, 'হে অর্জুন, যেমন প্রজ্বলিত আগুন সব কাঠ ভস্মীভূত করে, সেইরকম জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত করে।' (৪।৩৭)

সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয়, এ-কথার তাৎপর্য—জ্ঞান হ'লে সমস্ত কর্মের ভোগসম্পাদন করার যে শক্তি তা বিনষ্ট হয়ে যায়। মুণ্ডকোপনিষদেও আছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

(২।২।৮)

অর্থাৎ, কারণরূপে যিনি পর (শ্রেষ্ঠ) এবং কার্যরূপে অবর (নিকৃষ্ট) সেই 'পরাবর' ব্রহ্মের অনুভূতি হ'লে হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় এবং সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ সমস্ত পাপপুণ্যকর্ম ভস্মীভূত হয়ে যায়।

অর্জুনের মনে হতে পারে যে, যখন জ্ঞানের দ্বারাই এই অবস্থা লাভ হয়, তখন আমি জ্ঞানই পেতে চাই; আমার আর কর্ম করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীভগবান বলছেন, 'ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র, আর কিছুই নেই। কর্মযোগ করতে করতে কালে তাতে সম্যক্ সিদ্ধ হ'লে, তখনই সেই জ্ঞান লাভ করা যায়।' (৪।৩৮)

কাজেই অর্জুনকে কর্ম করতেই হবে। না হ'লে তাঁর জ্ঞানলাভ হবে না। এই শ্লোকটির ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলেছেন, 'যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতঃ যোগ্যতামাপন্নঃ মুমুক্ষুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভতে।' অর্থাৎ, কর্মযোগ ও ধ্যানযোগের দ্বারা সংস্কৃত হয়ে, যোগ্যতা লাভ ক'রে মুমুক্ষু ব্যক্তি, অনেক কাল পরে অন্তঃকরণে সেই জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু শ্রীধরস্বামী বলেছেন, 'তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে, ন তু কর্মযোগং বিনা।' অর্থাৎ, আত্মবিষয়ে যে জ্ঞান, সেটি দীর্ঘকাল কর্মযোগের দ্বারা সংসিদ্ধ হ'লে—যোগ্যতা প্রাপ্ত হ'লে, তখন সাধক নিজেই অনায়াসে লাভ করেন, কর্মযোগ ছেড়ে দিয়ে নয়। সেজন্য আমরা দেখি, শ্রীভগবান অর্জুনকে বারংবার বলছেন—তুমি কর্ম কর, কর্মের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হ'লে আপনা আপনি জ্ঞানের উদয় হবে।

এখন যে তিনটি উপায়ের দ্বারা কর্মযোগের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ অবশ্যম্ভাবী, সেগুলির উল্লেখ ক'রে শ্রীভগবান বলছেন, 'যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। জ্ঞানলাভ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরা শান্তি লাভ করেন।' (৪।৩৯)

এখন এই যে কথাটা 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্', এখানে 'শ্রদ্ধা' কথাটির তাৎপর্য একটু ভেবে দেখতে হবে। আমরা কঠোপনিষদে নচিকেতার মধ্যে দেখতে পাই 'শ্রদ্ধা'র উদয় হয়েছে—'শ্রদ্ধাবিবেশ'। নচিকেতা নিজেকে অধম ভাবেননি—তাঁর এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি অনেকের মধ্যে প্রথম, আবার অন্য অনেকের মধ্যে মধ্যম, কিন্তু অধম কখনই নন। এরই নাম শ্রদ্ধা।

বেদান্তশাস্ত্রে এই 'শ্রদ্ধা' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে—'গুরূপদিষ্টবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ'; অর্থাৎ, গুরুর উপদিষ্ট বেদান্তবাক্যসমূহে বিশ্বাস। কিন্তু নচিকেতার শ্রদ্ধা অন্যরকম। সেটি হ'ল আত্মবিশ্বাস। এই শ্রদ্ধা বা আত্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর আর বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যে-সব দেবতার আমদানি করেছে, তাদের সকলের ওপরই যদি বিশ্বাস থাকে, অথচ যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, তাহলে কখনই মুক্তি হবে না। তিনি আরও বলেছেন, প্রাচীন ধর্ম বলতো যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক; নতুন ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক। একটি চিঠিতেও স্বামীজী সংস্কৃত শ্লোকে এই ধরনের কথা লিখেছেন: দেহকেই যারা আত্মা বলে জানে, তারা কাতর হয়ে বলে—আমরা ক্ষীণ ও দীন; এরই নাম নাস্তিক্য; আর যখন আমরা অভয়প্রতিষ্ঠ বীর, তখনই আমরা আস্তিক।

কিন্তু শুধু শ্রদ্ধাশীল হ'লেই হবে না—'তৎপর'ও হতে হবে। অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে গুরুসেবা এবং

গুরূপদিষ্ট বাক্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। ঢিমে-তেতালার কাজ নয়। নিষ্ঠা চাই—উদ্যম চাই।

আবার শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা থাকা সত্ত্বেও অজিতেন্দ্রিয় হ'লেও চলবে না। 'সংযতেন্দ্রিয়' হতে হবে। সুতরাং এই তিনটিই একসঙ্গে চাই—শ্রদ্ধা, তৎপরতা এবং ইন্দ্রিয়সংযম।

প্রকৃত অধিকারীর কথা ব'লে এখন অনধিকারীর কথা শ্রীভগবান বলছেন, 'অজ্ঞ যে, শ্রদ্ধাহীন যে, সংশয়াত্মা যে, সে বিনষ্ট হয়। যে সংশয়াত্মা, তার ইহলোকও নেই পরলোকও নেই, সুখও নেই।' (৪।৪০)

এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন,—'অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ, তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা। সংশয়াত্মা তু পাপিষ্ঠঃ সর্বেষাম্।' যে অজ্ঞ এবং যে শ্রদ্ধাহীন, তাদের বিনাশ হয়। কিন্তু এই বিনাশটা সংশয়াত্মার বিনাশের মতো নয়। অজ্ঞ আর শ্রদ্ধাহীনের বিনাশ থেকে নিস্তার পাবার উপায় আছে, কিন্তু সংশয়াত্মার উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই, সে সকলের চেয়ে পাপিষ্ঠ। শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন, 'নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽস্তি, তথা ন পরো লোকো, ন সুখম্।' অর্থাৎ, সংশয়াত্মার ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই, কোন লোকেই সুখ নেই।

একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে যদি শুধুই সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, আমি পারবো কি পারবো না, তাহলে সে দাঁড়াতে পারে না। ফুটবল খেলতে গিয়ে যদি সব সময় ভাবে আমি ভাল খেলতে পারবো কি পারবো না—সে খেলোয়াড় কখনও ভাল খেলতে পারে না। এই সংশয়যুক্ত ব্যক্তিদের কোথাও সুখ নেই।

তাহলে উপায় কি? কি ক'রে এই সংশয় দূর করা যাবে? শ্রীভগবান বলছেন, 'হে ধনঞ্জয়, পরমার্থদর্শনরূপ যোগদ্বারা শুভ-অশুভ কর্মসমূহ যাঁর ত্যাগ হয়েছে আর জ্ঞানের দ্বারা যাঁর সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়েছে এইরূপ আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্মরাশি আবদ্ধ করতে পারে না।' (৪.৪১)

কাজেই জ্ঞানের ফলেই সব সংশয় দূর হয়। সেই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে কর্মযোগের সাধন করতে হবে। এবং কর্মযোগের সাধনের মধ্য দিয়ে গিয়ে জ্ঞানলাভ হ'লে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হবে, সাধক আত্মবান্ হবেন; তখন কোন কর্মই তাঁকে আর আবদ্ধ করতে পারবে না। শঙ্করাচার্য বলছেন, 'গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্মাণি ন নিবধ্নন্তি।' অর্থাৎ, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন যে, সব কর্মই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের ব্যাপার, আত্মা অকর্তা এবং নিজেকে অকর্তা আত্মা জানার ফলে কর্মসমূহ তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে না।

অর্জুনের মনে সংশয় হয়েছিল, আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করবো কি করবো না, ধর্মযুদ্ধ আমি করছি, কিন্তু সেই যুদ্ধে আমার পাপ হচ্ছে কিনা। সংশয় হয়েছিল, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ না জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ। এইসব সংশয় কাটাবার জন্য শ্রীভগবান বললেন, সংশয়াত্মার বিনাশ হয়, তার ইহকাল পরকাল দুই-ই যায়। এইজন্য এই চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলেছি, সেই 'জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞান হ'তে জাত তোমার মনের যে সংশয় সেটিকে ছেদন করো, নাশ করো, ক'রে যোগ অর্থাৎ কর্মযোগকে আশ্রয় করো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।' (৪।৪২)

চতুর্থ অধ্যায় শেষ হ'ল। এই চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞানযোগ'। এই জ্ঞান পরম জ্ঞান। কর্মযোগের দ্বারা এই পরম জ্ঞান কি ক'রে লাভ করা যায়, সে-কথা এ-অধ্যায়ে বলা হয়েছে। জ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য, জ্ঞানই আমাদের পরম গতি। জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই

নেই। সেই জ্ঞান লাভ করবার জন্য কর্মযোগের ভিতর দিয়ে চলবার উপদেশ অর্জুনকে দেওয়া হয়েছে, কেননা অর্জুনের পক্ষে কর্মযোগই শ্রেয়োমার্গ। শুধু অর্জুনের জন্য এই উপদেশ নয়, সকলেরই জন্য, যাঁরা সংসারে আছেন। তাঁদের জন্য এই কথা যে, আত্মবিশ্বাসী, তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে ভগবানে সমস্ত কর্মফল অর্পণ ক'রে কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধি হবে, তখনই পরম জ্ঞানের উদয় হবে, তখনই সমস্ত বন্ধন, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যাবে।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবসমাধি উৎসব

১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্ত যদুলাল মল্লিকের পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের ভবনে শ্রীশ্রীসিংহবাহিনীদেবীকে দর্শন করিয়া 'ভাবসমাধিস্থ হন। ঐ দিনটির স্মরণে উক্ত গৃহে ২১শে জুলাই ১৯৮০ তারিখে আয়োজিত এক সান্ধ্য মাঙ্গলিক উৎসবে স্বামী ভাবাতীতানন্দ কথামৃতের প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদটি পাঠ করেন। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ 'বিশ্বদর্শন ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়টি পর্যালোচনা করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের আসন্ন দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের পটভূমিকায় উক্ত পর্যালোচনার তাৎপর্য বিবৃত করেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। উৎসব উপলক্ষে রচিত দুইটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়। বেলুড়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীতাঞ্জলি'র ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

জন্মজয়ন্তী

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ ঈশ্বরকোটি শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী তীর্থ-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, নারায়ণ-সেবা, কথা-কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ভাষণ দেন সভাপতি স্বামী অমলানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী জিতাত্মানন্দ। সভান্তে শিবপুর 'প্রফুল্ল তীর্থ' 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' গীতিনাট্য পরিবেশন করেন। সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি স্মরণিক প্রকাশিত হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী শিবকৃষ্ণানন্দ (নরেন মহারাজ) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৮০) দ্বিপ্রহরে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে কাশীলাভ করেন। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা জেলায় তাঁহার জন্ম। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে অন্তর্ভুক্তির নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রম করায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত সংঘে যোগদানে অপারগ হইলেও ১৯[illegible] সাল হইতে আমরণ কাশীধামের রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম ও সেবাশ্রমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি হৃষীকেশের কৈলাস মঠ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্র অধ্যাপনা ও পূজা-অর্চনায় তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। তপোনিষ্ঠা, মিষ্টভাষণ ও বিনীত স্বভাবের জন্য তিনি কাশীর সাধু ও ভক্তগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪·০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১·৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩·৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬·০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২·৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭·০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪·০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮·০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১১·০০
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১·০০
৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১·০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮·৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯·২৫

স্তবকুসুমাঞ্জলি—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৭·০০

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য : ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬·০০, ৩য় খণ্ড ৪·০০, ৪র্থ খণ্ড ৩·০০ ; ২য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৩য় অধ্যায় ১৩·০০ ; ৪র্থ অধ্যায় ৯·০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি— পৃঃ ৬৪, মূল্য ১·৫০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২·০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০·০০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক : স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ১১৬, মূল্য ২·৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২·০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৭·০০

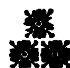
সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩·০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩·৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪·০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩·৫০





ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন। মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যা।

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হল।

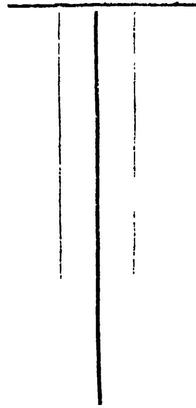
—শ্রীসারদাদেবী

তোমরা আহারের দ্বারা শরীরে পুষ্টি করিতেছ—কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, যদি উহাকে অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধ্যয়নাদির দ্বারা মনের পুষ্টি বা বিকাশ সাধন করিতেছ—ইহাতেই বা কি হইবে, যদি ইহাকেও অপরের কল্যাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার?

—স্বামী বিবেকানন্দ

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হ'য়ে থাকে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব



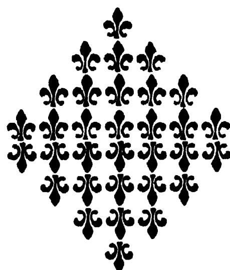
॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বলছি—'হে ভগবান, তুমি আমার সর্বস্ব ধন, এবং মনে বিষয়কেই সর্বস্ব জেনে ব'সে রয়েছি : এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥

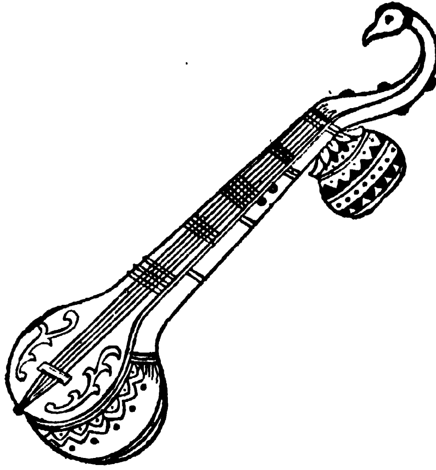
—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল, তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি কমবে।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব





What we need to-day is to know that there is a God and that we can see and feel Him here and now.

—Swami Vivekananda

Faith, sympathy, fiery faith and fiery sympathy ! Faith, faith, faith in ourselves, faith, faith in God—this is the secret of greatness.

—*Swami Vivekananda*



নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষা পরিষদের পত্রিকা 'সমাজশিক্ষা' দীর্ঘ তেইশ বছরের বেশী ধরে নিয়মিতভাবে বার হচ্ছে। তিনটি বিশেষ সংখ্যা সহ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক বারো টাকা। সমাজশিক্ষা পত্রিকা কম লেখা-পড়া ও বেশী লেখাপড়া জানা উভয় শ্রেণীর জন্য গ্রাম সংগঠনমূলক একমাত্র নিয়মিত বাংলা মাসিক পত্রিকা। গ্রামবাংলার প্রাচীন ও বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী জানতে হোলে 'সমাজশিক্ষা' আপনার অবশ্য পড়া উচিত। শুধু গ্রামের কথাই নয়, সময়োপযোগী বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর উন্নতমানের সুন্দর প্রবন্ধ-কবিতা-সমীক্ষা প্রভৃতি 'সমাজ-শিক্ষা'য় প্রকাশিত হয়ে থাকে। কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারে আর্থিক সংস্থান ইত্যাদি বিষয় পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। সমাজশিক্ষা আর পাঁচটি পত্রিকার থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্ন ধরনের। যে কোনো সংখ্যা দেখলেই তা বুঝতে পারবেন।

'সমাজশিক্ষা'য় লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

পোঃ- নরেন্দ্রপুর, পিন—৭৪৩ ৫০৮

জেলা-২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

ফোন—৬১৯২০১ (তিনটি লাইন)

॥ অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে ॥

—স্বামী বিবেকানন্দ


দশের কল্যাণে
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

Udbodhan—Phone : 55-2447 SEPTEMBER 1980 Regd. No. WB/NC-19

৮৩।৩ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

কার্তিক ১৩৮৭
৮২তম বর্ষ
১০ম সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত



উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২্ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭্ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩্ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১্ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। ৮৩তম বর্ষ হইতে চাঁদার হার পরিবর্তিত হইবে।

রচনা ঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময়** তাঁহারা যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ৮৩তম বর্ষ, ১৩৮৭-৮৮

নিবেদন

> গত কয়েক বৎসর যাবৎ পত্রিকা-প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে পরিস্থিতি এমনিই দাঁড়াইয়াছে যে, পত্রিকার চাঁদার হার বর্ধিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এজন্য আগামী ৮৩তম বর্ষ হইতে 'উদ্বোধনে'র বার্ষিক চাঁদা চৌদ্দ টাকা এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা নয় টাকা করা হইল। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ পরিস্থিতি বুঝিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখিবেন।

বর্তমান বৎসরের পৌষ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকার ৮২তম বর্ষ শেষ হইবে। আগামী মাঘ (১৩৮৭) মাসে পত্রিকা ৮৩তম বর্ষে পদার্পণ করিবে। পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে জানানো যাইতেছে, তাঁহারা যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের (১৯৮০) মধ্যে তাঁহাদের পুরা নাম ও ঠিকানা এবং গ্রাহক-সংখ্যা সহ বার্ষিক চাঁদা ১৪.০০ টাকা (ভারতের বাহিরে হইলে ৩৫.০০ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০৩.০০ টাকা) মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেন। তৎপূর্বে যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া জানাইবেন—মনিঅর্ডার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে গ্রহণ করিতে চান; কার্ডটিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট আঁটিয়া পোস্ট করিবেন। ভি. পি. পি.-তে লইলে টা. ১৭.৮০ পয়সা লাগিবে। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

অনিবার্য কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকা সম্ভব না হইলে তাহা উক্ত কার্ডেই জানাইয়া দিবেন!

উক্ত তারিখের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ১৪.০০ টাকা না আসিলে অথবা কোন পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি.-তে পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন কার্ডখানি অতি অবশ্যই অবিলম্বে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন।

সুদীর্ঘ ৮২ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবপ্রচারের কাজে আপনাদের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

অফিসে চাঁদা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥—১১টা; বিকাল ২॥—৫টা।

[রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।]

কার্যাধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ কার্তিক, ১৩৮৭ — ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

গ্রাহক নং…………………—

নাম……………………………………………………………………………………

ঠিকানা ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

(১) আগামী ৮৩তম বর্ষে (১৩৮৭-৮৮) 'উদ্বোধনে'র গ্রাহক থাকিবার জন্য দেয় ১৪·০০ টাকা আগামী ১২ই ডিসেম্বরের (১৯৮০) মধ্যে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতেছি।

(২) লোক মারফত টাকা পাঠাইতেছি।

(৩) আমার নামে ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠাইবেন।

(৪) অনিবার্য কারণে আমার পক্ষে আগামী বর্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না।

(স্বাক্ষর) ……………………………………………

তারিখ ………………………

এখানে
২০ পয়সার
ডাকটিকিট
আঁটিয়া দিবেন

Manager,
UDBODHAN OFFICE
1. Udbodhan Lane,
Calcutta-700003

অপর পৃষ্ঠায় যথাস্থানে গ্রাহক-নম্বর, নাম ও ঠিকানা লিখিয়া এবং ১, ২, ৩ ও ৪ নম্বরে লিখিত বিবরণের একটি মাত্র রাখিয়া এবং অন্যগুলি কাটিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবার পর কার্ডটি আজই ডাকে দিন। চেকে টাকা পাঠাইবেন না।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন

ভি. পি. পি. যোগে পত্রিকা লইলে পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা টা. ১৪·০০ ডাকখরচ টা. ৩·৮০ পয়সা, মোট টা. ১৭·৮০ পয়সা লাগে।




LIBRARY

উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।

যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
ভক্ত



৮২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

কার্তিক, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আসল কথা এই, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসিতাম, তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তাঁহার অপূর্ব পবিত্রতা দেখিয়াছি। আমি তাঁহার আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছি। তখনও পর্যন্ত তাঁহার মহত্ত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে যখন আমি তাঁহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তখন ঐ ভাব আসিয়াছিল। তাহার পূর্বে আমি তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক একটি শিশু বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম—এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করিতাম। তারপর আমাকেও মা-কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি গোপন রহস্য, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে। সে-সময় আমার খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলিতেছিল।···ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে আসিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলাম, 'আমি তোমার দাস।' রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০।২৮৮]

শুভ ৺বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী, অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৺বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতি-সম্ভাষণাদি জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপায় সকলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হউক, ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। —সম্পাদক

কথাপ্রসঙ্গে

'এ সংসার মজার কুটি'

৮ই অগস্ট, ১৮৯৬ তারিখে সুইজারল্যাণ্ড হইতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, 'It is all misery, this *Samsara*, don't you see!' [তুমি কি দেখছ না, এই সংসারটা কেবলই দুঃখে ভরা!]

কিন্তু সংসারটা কেবলই দুঃখে ভরা হয় কি করিয়া? সংসারে দুঃখ যেমন আছে, সুখও তো তেমনই আছে! স্বামীজী তাঁহার 'সখার প্রতি' কবিতায় সংসারের দুঃখ মর্মস্পর্শী ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'আঁধারে আলোক অনুভব,
দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান,
প্রাণসাক্ষী—শিশুর ক্রন্দন
হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান?';
'জেনেছি সুখের নাহি লেশ,
শরীরধারণ বিড়ম্বন;' ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ কবিতাটিতেই আছে—

'যতদূর যতদূর যাও,
বুদ্ধিরথে করি আরোহণ—
এই সেই সংসারজলধি,
দুঃখসুখ করে আবর্তন।'

সুতরাং সংসারজলধিতে কেবলই যে দুঃখের তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা নহে; সুখের তরঙ্গও উঠিতেছে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ'—ইহা তো অতি প্রসিদ্ধ কথা এবং সকলেরই অনুভবসিদ্ধ।

কিন্তু শঙ্করাচার্যও গীতাভাষ্যে (৫।২২) লিখিয়াছেন, 'ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রম্ অপি অস্তি।' [সংসারে সুখের গন্ধমাত্রও নাই।]

শঙ্করাচার্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য তাঁহার পঞ্চীকরণবার্তিকে লিখিয়াছেন—

'আদিমধ্যাবসানেষু দুঃখং সর্বমিদং যতঃ।
তস্মাৎ সর্বং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবেৎ সদা॥'
(শ্লোক ৫৪)

অর্থাৎ, যেহেতু আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে এই জগৎটা সম্পূর্ণ দুঃখময়, সেইহেতু সব-কিছু পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা তত্ত্বনিষ্ঠ হইবে।

আর আমরা সকলেই জানি ভগবান বুদ্ধের কথা—জন্ম দুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, শোক ও যন্ত্রণা দুঃখ, সন্তাপ ও নৈরাশ্য দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগে দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগে দুঃখ, আকাঙ্ক্ষিতের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ—জগৎটা দুঃখই দুঃখ!

সুতরাং এই সকল একই সুরের কথার সহিত সংসারটা যে সুখদুঃখময়—এই কথার সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। ইহার সামঞ্জস্য আমরা পাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথায়। গীতায় অর্জুনের প্রতি তাঁহার উক্তি—

'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥'

(৫।২২)

—হে কুন্তীপুত্র, বিষয়ের সহিত সংস্পর্শজনিত সুখসমূহ আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট এবং তাহারা দুঃখেরই কারণ; জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ-সকল সুখে প্রীতিলাভ করেন না।

সুতরাং অধিকাংশ মানুষ যে-সুখের জন্য লালায়িত, তাহা বস্তুতঃ দুঃখরূপী। এই কথাটিই মহর্ষি পতঞ্জলি আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যোগদর্শনের একটি সূত্রে তিনি লিখিয়াছেন, 'পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈঃ গুণবৃত্তিবিরোধাৎ চ, দুঃখম্ এব সর্বং বিবেকিনঃ।' (২।১৫)। তাৎপর্য এই যে, বিবেকী ব্যক্তির নিকট বিষয়ভোগজনিত সমস্ত সুখই দুঃখ বলিয়া পরিগণিত। কারণ, উহারা পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ ও সংস্কারদুঃখ—এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা বিদ্ধ; আরও কারণ এই যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ বৃত্তিগুলি পরস্পরবিরোধী। এই তাৎপর্যেরও বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সহজ কথায় বলা যায়, বিষয়সুখের পরিণাম বা অন্যথাভাব আছে, অর্থাৎ উহা স্থায়ী নহে, অধিকন্তু পরিণামে ব্যাধি আদি দুঃখও আছে। বিষয়সুখের ভোগ-কালেও উহার প্রতিবন্ধকসমূহের প্রতি দ্বেষরূপ তাপ থাকে। আবার বিষয়সুখ ভোগের ফলে উহার সংস্কার উৎপন্ন হইয়া ভাবী দুঃখের কারণ হয়। অধিকন্তু বিষয়সুখের ভোগকালে চিত্তে যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণের প্রকাশ ঘটে, তাহাও বিরোধী রজস্তমের দ্বারা অভিভূত থাকে, কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ পরস্পরবিরোধী এবং একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ফলে বিষয়সুখের ভোগকালেও চিত্তের চঞ্চলতা আদি দোষ থাকায় অতৃপ্তি থাকিয়াই যায়, ভোগসুখ নিরঙ্কুশ হয় না। সুতরাং সমস্ত বিষয়সুখই বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় দুঃখরূপী। বিবেকী ব্যক্তি বিষয়সুখের এই স্বরূপ জানেন বলিয়াই উহাতে প্রবৃত্ত হন না। সাধারণ মানুষ বিষয়সুখকে দুঃখস্বরূপ জানে না বলিয়াই উহার জন্য লালায়িত হয়।

সাংখ্যদর্শনেও বলা হইয়াছে, 'তদপি দুঃখশবলম্ ইতি দুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।' (৬।৮)। অর্থাৎ, বিবেচক ব্যক্তিগণ সুখকে দুঃখমিশ্রিত জানিয়া উহাকে দুঃখের মধ্যেই নিক্ষেপ করেন। (দুঃখের শ্রেণীভুক্ত করেন—সুখকে সুখ বলিয়া জ্ঞান না করিয়া দুঃখ বলিয়াই গণ্য করেন।) ।

ন্যায়দর্শনেও সুখকে দুঃখ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। মহর্ষি গৌতম যে-দ্বাদশ 'প্রমেয়'-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একাদশ পদার্থ হিসাবে 'দুঃখ'-এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐ দ্বাদশ পদার্থের মধ্যে 'সুখ'-এর উল্লেখ নাই। প্রকৃষ্টরূপে মেয় অর্থাৎ জ্ঞেয়, ইহাই 'প্রমেয়' শব্দটির অর্থ। সহজ কথায়, মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে এই বারোটি পদার্থ অবশ্যজ্ঞাতব্য: (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ (বিষয়), (৫) বুদ্ধি (বিষয়ের জ্ঞান), (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি (পুণ্যাপুণ্যকর্ম), (৮) দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ), (৯) প্রেত্যভাব (পুনর্জন্ম), (১০) ফল (সুখদুঃখের অনুভব), (১১) দুঃখ ও (১২) অপবর্গ (মোক্ষ)। এই বারোটি পদার্থের মধ্যে 'দুঃখ'-এর উল্লেখ আছে, অথচ 'সুখ'-এর উল্লেখ নাই, ইহার কারণ এই যে, মহর্ষি গৌতমের মতে সুখ দুঃখেরই নামান্তরমাত্র। বার্তিককার উদ্দ্যোতকর একুশ প্রকার দুঃখের উল্লেখ করিয়াছেন। শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয় বিষয়, ছয় বিষয়ের জ্ঞান, সুখ এবং দুঃখ—এই একুশ প্রকার দুঃখ।[১]

১ প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মহর্ষি গৌতমের মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ ('তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ' ১।১।২২)। মোক্ষের উপায় নির্দেশ করিতে তিনি সূত্র করিয়াছেন:

বিষ্ণুপুরাণেও আছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের বিস্তারিত বর্ণনান্তে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন—

'যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥'

(৬।৫।৫৫)

—হে মৈত্রেয়, যে যে বস্তু মনুষ্যগণের প্রীতিকর হয়, তাহাই দুঃখরূপ বৃক্ষের বীজ হইয়া থাকে।

বিষ্ণুপুরাণের এই কথা আর পূর্বে উল্লিখিত গীতার 'যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে' কথা হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যায়দর্শন অবধি যে-কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই।

দুঃখ সম্পর্কে আমরা—এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যের জন্য যতটা আলোচনা প্রয়োজন, তাহা করিলাম। এখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই বিষয়ে কি বলিতেছেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব। 'কথামৃতে' আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুরাগী মহিমাচরণ চক্রবর্তী একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তবৃন্দের সমীপে শঙ্করাচার্য-কৃত 'শিবনামাবল্যষ্টকম্' স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। আটটি শ্লোকের প্রত্যেকটির শেষ চরণ হইল—'সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ'; অর্থাৎ, হে জগদীশ্বর, সংসারদুঃখরূপ অরণ্য হইতে আমাকে রক্ষ করো।

স্তবটি পঠিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহিমাচরণকে বলিলেন, 'সংসারকূপ, সংসারগহন, কেন বল? ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাঁকে ধরলে আর ভয় কি? তখন—

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি!

কি ভয়? তাঁকে ধর। কাঁটাবন হলেই বা! জুতো পায়ে দিয়ে কাঁটাবনে চলে যাও! কিসের ভয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপরি-উক্ত কথার মধ্যে 'ও প্রথম প্রথম বলতে হয়'—বাক্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এই যে, বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সংসারটা যে দুঃখময়—একথা সাধনপথে প্রবর্তক ব্যক্তিকেই বলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সাধকের যখন এই দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, শ্রীভগবানই তাঁহার সর্বস্ব, তখন আর ঐ সকল কথা বলার সার্থকতা থাকে না। তাহার পূর্ব পর্যন্ত সংসারদাবানল, সংসারহলাহল, সংসার-অরণ্য, সংসারটা দুঃখই দুঃখ—এই সকল কথা শোনা এবং চিন্তা করা ভাল। সর্বাবস্থায় 'দুঃখ' 'দুঃখ' বলা বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরেকটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'কেবল দুঃখের কথা ভাল নয়, আনন্দ চাই।'

'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্ অপবর্গঃ' (১।১।২)। ইহার অর্থ: মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলেই, উহার কার্য 'দোষ' (রাগ, দ্বেষ, মোহ) দূর হয়; 'দোষ' দূর হইলেই, উহার কার্য 'প্রবৃত্তি' (পুণ্যাপুণ্যকর্ম) দূর হয়; 'প্রবৃত্তি' দূর হইলেই, উহার কার্য জন্ম হয় না; জন্ম না হইলে উহার কার্য দুঃখও হয় না—ইহাই মোক্ষ। নিষ্কর্ষ এই যে, দুঃখের মূল কারণ হইল মিথ্যাজ্ঞান ('অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ' অর্থাৎ, যেটি যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি। যথা, নিত্যে অনিত্যবুদ্ধি, অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, দেহে আত্মবুদ্ধি ইত্যাদি)। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলে পূর্বোক্ত ক্রমে মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শেষোক্ত ন্যায়সূত্রটি আচার্য শংকর বেদান্তদর্শনের 'তৎ তু সমন্বয়াৎ' সূত্রের ভাষ্যে পরম শ্রদ্ধার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদিও মোক্ষের স্বরূপ সম্বন্ধে ন্যায়মত ও অদ্বৈতবেদান্তমতের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য।

শুধু যে মহিমাচরণকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। ঐ ধরনের কথা তিনি একাধিক ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে গান গাহিতে বলায় নরেন্দ্রনাথ সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়-চপলম্' ইত্যাদি। দুই-এক চরণ শুনিবার পরই শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 'ও কি! ও সব ভাব অতি সামান্য!' তখন নরেন্দ্রনাথ গোপীভাবের গান ধরিলেন। দীর্ঘ গানটির শেষ দুই চরণে আছে—'কাননবল্লরী গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস/নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম জপই ছার তনু করিব বিনাশ।' গানটি শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। (ইহার পর নরেন্দ্র-নাথ গোপীভাবের আরেকটি গানও গাহিয়া-ছিলেন।)।

'এই সংসার মজার কুটি'[২]—আজু গোঁসাইয়ের এই গানটি 'কথামৃতে' অন্ততঃ দশবার পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ যখন গাহিতেন, 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'[৩] পরিহাসপটু বৈষ্ণব সাধক আজু গোঁসাই তাহার উত্তরে গাহিতেন, 'এ সংসার মজার কুটি।' আজু গোঁসাইয়ের গানের এই কলিটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয় ছিল এবং সিদ্ধ ব্যক্তি বা 'সিদ্ধের সিদ্ধ' ব্যক্তির অর্থাৎ 'বিজ্ঞানী'র দৃষ্টিতে যে এই জগৎটা আনন্দময়—দুঃখের আগার নহে, ইহা বুঝাইতে তিনি এই কলিটি প্রায়ই ব্যবহার করিতেন।

'ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থটিতে আছে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়া-ছিলেন, "ঠাকুর বলতেন, 'দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে জ্ঞাননেত্র আছে—সেটা ফুটলে চারদিক আনন্দময় দেখায়।'"

স্বামী বিবেকানন্দও নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত 'মানুষের যথার্থ স্বরূপ' শীর্ষক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "যাঁহার জীবনে এই ক্ষুদ্র 'অহং' একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঈশ্বর সেই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন···তাঁহার নিকট সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রতিভাত হয়। দুঃখকর, ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোল-মাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। যেখানে আমরা প্রতিদিন

২ 'কথামৃতে গানটির কিছু কিছু পাঠান্তর দেখা যায়। কথামৃত ৩।৯।২-তে অতিরিক্ত পাঠ আছে—'ওরে বস্তি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি।' ৪।১৯।১-এ 'মজার কুঠি' আছে। বিভিন্ন ভাগে বানানেরও ভেদ দেখা যায়—কোথাও 'কুটি', কোথাও 'কুটী'। যাহা হউক, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান অনুসারে 'কুটি' শব্দের অর্থ—পর্ণগৃহ, কুঁড়ে ঘর, মৃণ্ময়গৃহ, কোঠা, পাকাঘর। বলা বাহুল্য আজু গোঁসাইয়ের অভিপ্রেত অর্থ হইল 'পাকাঘর'। স্বামী নিখিলানন্দও 'মজার কুটি'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন, 'mansion of mirth' (The Gospel of Sri Ramakrishna দ্রষ্টব্য)।

রামপ্রসাদের 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'র উত্তরে 'এই সংসার মজার কুটি' অপেক্ষা 'এ সংসার মজার কুটি' পাঠ হওয়াই সঙ্গত। শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য় খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ১১৪১-এ 'এ সংসার রসের কুটি' পাঠ আছে। আমরা বর্তমান প্রবন্ধের শীর্ষকে 'কথামৃতে'র 'মজার কুটি' পাঠই রাখিয়াছি, তবে 'এই' স্থলে 'এ' গ্রহণ করিয়াছি।

৩ 'টাটি'র অর্থ: আগড়, ঝাঁপ, বাঁশের প্রাচীর, আবরণ (জ্ঞানেন্দ্রমোহন)। স্বামী নিখিলানন্দের ইংরেজী অনুবাদ—'framework of illusion' (The Gospel of Sri Rama-krishna দ্রষ্টব্য)।

এক টুকরা রুটির জন্য ঝগড়া মারামারি করি—সেই জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগার না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে। তখন জগৎ কি সুন্দর ভাবই না ধারণ করিবে! এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে—'এই জগৎ কি সুন্দর!'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজীকে তাঁহার শেষ অসুখের সময়ে এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'মহারাজ, আপনারা ভগবান দর্শন ক'রে জগতের সম্বন্ধে কি বুঝলেন, বলুন।' উত্তরে অদ্ভুতানন্দজী বলেন, 'দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে, এক ভাঁড় জল আলাদা ক'রে রেখে দিলে তা শুকিয়ে যায়; বাকী সেই ভাঁড়কে যদি গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখতে পারি, তাহলে জল আর শুকোতে পারে না। তেমনি এই জগতে হামাদের মনকে যদি ভগবানের পায়ে সঁপে দিতে পারি, তাহলে বিষয়বাতাসে হামাদের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারবে না; জগৎ আর হামাদের কাছে নিরানন্দ বোধ হবে না।' পুনরায় প্রশ্ন: 'মহারাজ, জগৎ কি এখন আর আপনাদের কাছে ভার বোঝা ব'লে মনে হয়?' উত্তর: 'দেখো, গঙ্গার জলে ডুব দিলে, মাথার উপর হাজার মন জল থাকলেও ভারটা বুঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে ধ'রে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর বোঝা ব'লে মনে হয় না সংসার তখন আনন্দের খেলা মনে হয়।'

অন্য এক দৃষ্টিকোণ হইতে স্বামী অদ্ভুতানন্দজী একদা বলিয়াছিলেন, 'সংসার কোনকালেই খারাপ নয়। যে সংসারে সব অবতার মহাপুরুষেরা জন্ম লন, তা কি কখন খারাপ হতে পারে রে! তাতে আসক্তিই হচ্ছে খারাপ, বন্ধনের কারণ—জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে বারবার নিয়ে যায়। আর হিংসা, দ্বেষ, কলহ—এইসব অশান্তি-দোষ, এই সবই খারাপ। ভগবানের সংসার মনে ক'রে সংসার করলে আর কোন গোল থাকে না।'

সিদ্ধের দৃষ্টিতে সংসারটা যে 'মজার কুটি' রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়া তাহা আমরা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখন এ-বিষয়ে শংকরাচার্য ও রামানুজাচার্য কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

'ধন্যাষ্টকম্'-এ শংকরাচার্য লিখিয়াছেন—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং
সর্বেঽপি কল্পদ্রুমা
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিবহঃ
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো
বারাণসী মেদিনী
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া
দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥

অর্থাৎ, পরব্রহ্মের দর্শন হইলে নিখিল জগৎই নন্দনকানন, সমস্ত বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ, সমস্ত জলই গঙ্গাজল, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রাকৃত (সাধারণ) বা সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্য। এই পৃথিবীই বারাণসী এবং এইরূপ [কৃতকৃত্য] ব্যক্তির সর্বপ্রকার অবস্থিতিই ব্রহ্মাবস্থিতি।

'ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৭)—ইহার ভাষ্যে রামানুজাচার্য লিখিয়াছেন, 'অনবধিকাতিশয়সুখরূপে ব্রহ্মণি অনুভূয়মানে ততঃ অন্যৎ কিম্ অপি ন পশ্যতি অনুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিভূত্যন্তর্গতত্বাৎ চ কৃৎস্নস্য বস্তুজাতস্য; অতঃ ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণ-বিশিষ্টং নিরতিশয়সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ তদ্ব্যতিরিক্তস্য বস্তুনঃ অভাবাৎ এব কিম্ অপি অন্যৎ ন পশ্যতি; অনুভাব্যস্য সর্বস্য সুখরূপত্বাৎ এব দুঃখং চ ন পশ্যতি।' অর্থাৎ, অসীম-সুখস্বরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে অনুভবকর্তা ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই দর্শন করেন না; কারণ সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাঁহার

বিভূতির অন্তর্গত ; সুতরাং ঐশ্বর্য যাহার অপর নাম সেই বিভূতি-রূপ গুণবিশিষ্ট নিরতিশয়সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন বলিয়া এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোনও বস্তু থাকে না বলিয়া অন্য কিছুই তিনি দর্শন করেন না ; অনুভবযোগ্য সব-কিছুই সুখরূপ [প্রতিভাত] হওয়ায়, দুঃখও দর্শন করেন না।

ইহার পর রামানুজাচার্য এই পূর্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়াছেন : এই জগৎ যখন দুঃখময় ও পরিমিত-সুখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভবসিদ্ধ, তখন এই জগৎই আবার সুখময় ও ব্রহ্মাত্মক বলিয়া কিভাবে অনুভূত হইবে ?

ইহার উত্তরে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : কর্মাধীন জীবগণ অবিদ্যাবশেই দৃশ্যমান জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের নিজ নিজ কর্মানুসারেই দুঃখময় ও পরিমিত-সুখবিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু জীব যখন অবিদ্যামুক্ত হয়, তখন এই জগৎকেই ব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া উপলব্ধি করায় ইহা কেবলই সুখময় বলিয়া প্রতিভাত হয়।

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণ : প্রভুত্ব

[ভাদ্র, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

পূর্ব সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৮৭) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুণ, অর্থাৎ, 'আনন্দময়ত্ব' ও 'প্রভুত্ব'কে যেন হঠাৎ মনে হয় পরস্পরবিরুদ্ধ, যদিও প্রকৃতকল্পে তা একেবারেই নয়—বরং এই দুটি গুণ পরস্পরাশ্রয়ী এবং 'আনন্দময়ত্বে'র মূলকথা 'প্রীতি', ও 'প্রভুত্বে'র মূলকথা 'শক্তি'কে চলতে হবে একত্রেই সর্বদা, নয়ত উভয়েরই হবে মর্যাদাহানি, পূর্ণতাহানি, কল্যাণকারকতাহানি।

বেশ কথা ! কিন্তু এর চেয়েও আরো অধিক 'বেশ কথা' হ'ল এই যে, বলদেবপ্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত বৈদান্তিকগণের মতে সত্যই শেষ পর্যন্ত, 'প্রভুত্বে'র সঙ্গে 'আনন্দময়ত্বে'র তথা-কথিত বিরোধ কেবল আপাতদৃষ্ট বিরোধই মাত্র ; সত্যসত্যই বিরোধ একেবারেই নেই। অর্থাৎ, 'প্রভু'রূপেও, শাসকরূপেও, পরিচালকরূপেও ব্রহ্ম ভীতির কারণ নন একেবারেই, বরং একমাত্র প্রীতিরই কারণ—যেহেতু 'প্রভু' রূপেও তিনি তাঁর দাস জীবকে আদ্যোপান্ত আনন্দই দিয়ে যাচ্ছেন অহরহঃ, দুঃখ একেবারেই নয়।

কিন্তু কি আশ্চর্যতম কথা এটি ! একজন কঠোর শাসনাধীন, একজন সম্পূর্ণ পদানত 'দাসে'র আবার জীবনে 'আনন্দ' কোথায় ? তাঁর 'প্রভু' ত তাঁকে আনন্দ দেন না ; দেন কেবল কঠোরতম আদেশ, যা নির্বিচারে 'দাস' বা ভৃত্য মানতে বাধ্যই 'টু'' শব্দটি না ক'রে। সুতরাং এরূপ সম্পূর্ণ পরাধীন জীবের জীবনে আনন্দ কোথায় ? সেজন্য স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রকার প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণও

বলেছেন সুন্দর উপমা সহকারে—

'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'

(ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩)

অর্থাৎ, পৃথিবীতে দেখা যায় যে, যিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম, যিনি সর্বত্র তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন, যাঁর কামনা-বাসনা সবই পরিতৃপ্ত হয়েছে, এবং সেজন্য যিনি আনন্দ-পরিপ্লুত, তিনি লীলা বা খেলায় আনন্দে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হন—যেমন, শত্রুহীন, একচ্ছত্র নৃপতি ; অথবা, পারমার্থিক দিক থেকে, স্বয়ং ব্রহ্ম আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত ব'লে তাঁর পরিপূর্ণ আনন্দও অনন্ত-অসীম এবং তারই বহিঃপ্রকাশ হ'ল 'লীলা' বা খেলা, যার থেকেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। কিন্তু বেচারা রাজভৃত্য পরাধীন, সুখশান্তিবিহীন তিনি জীবনে কি পান? কেবলই শাসন, কেবলই পীড়ন, কেবলই আজ্ঞা-বহতা, কেবলই পরাধীনতা প্রভৃতি! তাহলে, ব্রহ্মের প্রভুত্ব ও জীবের দাসত্ব কিরূপে জীবের জীবনে ভয়প্রদ না হয়ে প্রীতিপ্রদ হতে পারে? অসম্ভব!

এর উত্তরে বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ, বিশেষ ক'রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বৈদান্তিকগণ সজোরে বলেছেন যে, 'প্রভুত্ব' ও 'দাসত্ব'—এই দুটি অতি সাধারণ শব্দের অর্থ পরিবর্তিত করতে হবে। সাধারণ অর্থে, এই দুটি শব্দই ভয়াবহ এবং শোককারণ, কিন্তু বৈষ্ণব অর্থে নয়। বরং বৈষ্ণব অর্থে, জীবের সর্বাপেক্ষা কাম্যই হ'ল এই ভগবদ্দাসত্ব—'আমি চিরকালই ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বর চিরকালই আমার প্রভু'—এই ভাবটিই ত আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আনন্দের কারণ। কারণ, এই ত জীবের স্বরূপ, জীবের স্বরূপই হ'ল শ্রীভগবানের দাসত্ব করা, সেবা করা।

তার কারণ হ'ল এই : ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে শাশ্বত সম্বন্ধ হ'ল—(১) অংশ-অংশী, এবং (২) শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ। এস্থলে, ঈশ্বর অংশী, জীব তাঁর অংশ। পুনরায়, ঈশ্বর শক্তিমান, জীব তাঁর শক্তি।

এর থেকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি জীবের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা লক্ষ্য বা কাম্যকে। অর্থাৎ, যে কর্তব্য বা লক্ষ্য তাঁর স্বরূপ বা স্বভাব থেকেই উদ্ভূত হয়, তাই ত তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা লক্ষ্য বা কাম্য ; এবং একেই বলা হয় জীবের 'স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য'।

এস্থলে, জীবের স্বরূপ হ'ল এই যে, তিনি ব্রহ্মের অংশ এবং শক্তি। সুতরাং একটি 'অংশ' বা 'শক্তি'র যা স্বরূপগত কর্তব্য, তাই ত হ'ল জীবেরও স্বরূপগত কর্তব্য। কিন্তু কি সেই স্বরূপগত কর্তব্য? কি সেই 'অংশে'র কর্তব্য, এবং 'শক্তি'র কর্তব্য? তা ত হতে পারে একটি মাত্রই, যাকে বলা হয়েছে—'আনুকূল্যময়ী সেবা'।

এর অর্থ হ'ল এই : অংশের একমাত্র কর্তব্য হ'ল অংশীর সেবা, এবং সেই সেবা হবে নিশ্চয়ই অংশীরই অনুকূল, অংশীরই কল্যাণ-জনক, অংশীরই পরিপূর্তিমূলক। এ ছাড়া, অংশের কর্তব্য আর কি হতে পারে?—যেহেতু অংশ এবং অংশী অবিচ্ছেদ্য প্রাণের সম্বন্ধে আবদ্ধ ; এবং এই কারণে, অংশীর কল্যাণ ও উন্নতি না হ'লে অংশেরও কল্যাণ ও উন্নতি ত হতে পারে না কোনোদিনও কোনোক্রমেই। এ ত অতি সহজ সরল কথা। ধরুন, একটি অতি সাধারণ উদাহরণ—একটি পূর্ণ-উত্থিত বৃক্ষের উদাহরণ। এই অংশী বা সমগ্র বৃক্ষটির রয়েছে বহু অংশ। যথা—মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি। এক্ষেত্রে মূল অংশটি মৃত্তিকা থেকে রস আহরণ ক'রে সমগ্র বৃক্ষে তা সঞ্চারিত ক'রে দেয়, এবং এইভাবে এই মূলরূপ অংশটি সমগ্র বৃক্ষেরই বা অংশীর অনুকূল সেবা ক'রে চলেছে অহরহঃ ; এবং তাতে তার নিজেরও সেবা করা হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বলাই বাহুল্য, এরূপ

সেবা না ক'রে মূলটি পারেই বা কি ক'রে—যেহেতু, তা এইভাবে সমগ্র বৃক্ষে ভূমিরস ওতপ্রোতভাবে বিতরণ যদি না করত, তাহলে সমগ্র বৃক্ষটির এবং সেই সঙ্গে নিজেরও ত জীবনধারণ করা, বর্ধিত হওয়া প্রভৃতি একেবারেই সম্ভবপর হ'ত না। সেজন্য, নিজেকে বাঁচানোই যদি প্রত্যেকের স্বরূপগত কর্তব্য হয়, তাহলে বলাই বাহুল্য যে, সেই কর্তব্য পালন করার কালে, অপরকে বাঁচানোও হয়ে দাঁড়াবে তার পক্ষে সমান অবশ্যপ্রয়োজনীয়, যেহেতু অপর সকলের সঙ্গেই ত রয়েছে তার অবিচ্ছেদ্য প্রাণের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে, প্রত্যেক অংশেরই রয়েছে অংশী এবং অন্যান্য প্রত্যেক অংশের সঙ্গেও ঠিক এই রকমই অবিচ্ছেদ্য প্রাণের সম্পর্ক। সেজন্য, প্রত্যেক অংশের 'স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য' বা স্বরূপগত, স্বভাবজাত কর্তব্যই হ'ল অংশীর ও অন্যান্য অংশের 'আনুকূল্যময়ী সেবা'—যা উপরেই বলা হ'ল। সেজন্য, একটি সমগ্র বৃক্ষের প্রতিটি অংশ অংশী বা সমগ্র বৃক্ষটির এবং অন্যান্য অংশসমূহের 'আনুকূল্যময়ী সেবা' ক'রে চলেছে অহরহঃ। পুনরায়, এরূপ 'আনুকূল্যময়ী সেবা' হ'ল 'প্রীতিময়ী সেবা'। একই ভাবে, শক্তিও শক্তিমানের 'আনুকূল্যময়ী সেবা' ক'রে চলেছে অহরহঃ 'স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য'রূপে।

এইভাবে, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, অংশ কেবল অংশীরই এবং শক্তি কেবল শক্তিমানেরই সেবা করে, অন্য কারো নয়। যেমন, বাক্-শক্তি শক্তিমানেরই বা সেই বিশেষ বক্তারই সেবা করে, অন্য কোনো বক্তার নয়। মূল কেবল সেই অংশীটিরই বা সেই বিশেষ বৃক্ষটিরই সেবা করে, অন্য কোনো বৃক্ষেরই নয়।

সেজন্যই এরূপ 'আনুকূল্যময়ী সেবা'ই হ'ল 'প্রীতিময়ী সেবা'। অর্থাৎ, অংশ অংশীর, শক্তি শক্তিমানের সেবা করে—ভীতি থেকে নয়, প্রীতি থেকে।

বস্তুতঃ, অংশ ও অংশীর, শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত প্রীতির সম্বন্ধ, মৈত্রীর সম্বন্ধ, তৃপ্তির সম্বন্ধ, পূর্তির সম্বন্ধ, স্ফূর্তির সম্বন্ধ, শান্তির সম্বন্ধ। নয়ত অতগুলি অংশ পাশাপাশি একত্রে থেকে নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে এবং সমগ্র অংশীটির সঙ্গেও কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে, কি ক'রে থাকতে পারত? সেজন্যই অংশী সকল অংশসহ একটি বিরাট সমন্বিত সত্তারূপে গড়ে উঠেছে—যা বহুর মধ্যেও এক, এবং একের মধ্যেই বহুর একটি অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি উজ্জ্বল চিত্র।

সেজন্যই পরিশেষে আমরা পাই যে, 'আনুকূল্যময়ী সেবা'ই হ'ল 'কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য-ময়ী সেবা'। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ জীব অংশী ও শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা করে তা ত শেষপর্যন্ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই গভীর আনন্দের কারণ হয়। কারণ, তা যে তাঁর অনুকূল, এবং সেজন্যই তাঁর সুখপ্রদায়ক। সেজন্য শেষপর্যন্ত ব্রহ্মের অংশস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ জীব পরিপূর্ণ প্রীতি-সহকারে, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-সহকারে, পরিপূর্ণ ভক্তি-সহকারে অহরহঃ ব্রহ্মের সেবা ক'রে চলেছেন তাঁর চিরদাসরূপে, নিত্যসেবকরূপে, তাতে ত ভয়ের, সন্দেহের, দ্বিধার লেশমাত্রও নেই। বরং ব্রহ্মকে পরিপূর্ণভাবে ভালবেসে, তাঁকে পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা ক'রে, তাঁকে পরিপূর্ণভাবে ভক্তি ক'রে, তাঁরই শ্রীচরণারবিন্দে নিরন্তর আমি পূজা দিয়ে যাব, অর্ঘ্য দিয়ে যাব, এমন কি নিজেকে দিয়ে যাব—এই ত আমার জীবনের পরম আনন্দ, চরম সার্থকতা।

বস্তুতঃ, 'ভগবান ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য শাশ্বত সম্বন্ধে আবদ্ধ'—এই কথার মধ্যেই ত 'প্রভু ও দাস পরস্পরের সঙ্গে তুল্য অচ্ছেদ্য শাশ্বত সম্বন্ধে আবদ্ধ'—এই কথার প্রকৃত অর্থ

নিহিত হয়ে আছে। 'ভগবান' কে? যিনি সকল 'ভগ' বা ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, বীর্য, মাহাত্ম্য, ধর্ম, মোক্ষ, যশ, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির একমাত্র সমাহার—

'ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥'

আমাদের স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টি গুণের সমাহার হ'ল 'ভগ'।

ব্রহ্ম ব্যতীত এরূপ সমাহার আর অন্য কে? সেজন্যই তিনি 'ভগবান'।

আর 'ভক্ত' হলেন তিনিই, যিনি নিরন্তর ভজনা করেন (ভজ্-ক্ত-ক্ত)। জীব ব্যতীত এরূপজন আর অন্য কে?

সুতরাং জীবই হলেন স্বভাবতঃ 'ভক্ত', এবং 'ভক্ত'ই হলেন 'ভগবানে'র নিরন্তর ভজনাকারী, নিরন্তর উপাসক, নিরন্তর সেবক, নিরন্তর দাস। জীবের বা ভক্তের এই শাশ্বত স্বরূপ ব'লে এতে ভীতির কিছু নেই, দুঃখের কিছু নেই, অপমানের কিছু নেই—বরং এই ত তার চিরন্তন গৌরব, চিরন্তন পূর্ণতা, চিরন্তন সার্থকতা, চিরন্তন সৌভাগ্য, চিরন্তন শান্তি, চিরন্তন আনন্দ! এই ত তার চিরকাম্য মুক্তি বা মোক্ষ—এইভাবে চিরকাল ভগবানের উপাসক, সেবক, দাস-রূপে তাঁকে ভজনা করা, ভক্তি করা, শ্রদ্ধা করা।

সেজন্য বৈষ্ণব ভক্ত অন্য কোনো অর্থে মুক্তি চান না; চান না ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে; চান না তাঁর সমগোত্রীয় হয়ে তাঁর পূজা, তাঁর সেবা, তাঁর দাসত্ব, তাঁর অধীনতা, তাঁর প্রতি ভক্তি, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে—বরং ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ, বৈষ্ণব ভক্তের মতে শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকাই ত 'মুক্তি' এবং সেই দাসত্ব-বন্ধন ছিন্ন করাই ত 'বন্ধ'!

সেজন্য বৈষ্ণব ভক্ত এই সাধারণ অর্থে মুক্তি চান না—যে মুক্তিতে তিনি ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে অথবা ভগবৎসদৃশ বা ভগবানের সম-গোত্রীয় সমস্তরীয় হয়ে গিয়ে তাঁকে পূজা করবার, সেবা করবার, ভজনা করবার আর অবকাশ পাবেন না। এরূপ মোক্ষ-বাসনা 'কৈতব' বা কপটতাই মাত্র।

'অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম ॥'
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।১।৫০-৫২)

সাধারণতঃ বলা হয় যে, ধর্ম-অর্থ-কামে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখলাভের কামনা আছে ব'লে সেই সব পরিত্যাজ্য। কিন্তু কেবলমাত্র মোক্ষই নিষ্কাম ব'লে একমাত্র মোক্ষই সর্বজনকাম্য; অপরপক্ষে বৈষ্ণব ভক্ত এক্ষেত্রে বলছেন যে, ত্রিবর্গের ন্যায় চতুর্বর্গও সমান পরিত্যাজ্য, যেহেতু মোক্ষেও রয়েছে স্বার্থপরতার বীজ—আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দের কামনা। সেজন্য ধর্ম-অর্থ-কামে যেমন নিজের জন্য চাওয়া আছে, মোক্ষে ঠিক তেমনিই নিজের জন্য চাওয়া আছে, নিজের সুখ চাওয়া আছে, শ্রীকৃষ্ণের সুখ নয়। একমাত্র ভক্তিতেই আছে শ্রীকৃষ্ণসুখ-বাসনা, যা পূর্বেই বলা হ'ল। সেজন্য একমাত্র ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

বস্তুতঃ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের গতি নিজের দিকে—নিজের সুখের দিকে—হোক তা ঐহিক, হোক তা পারলৌকিক, হোক তা আত্যন্তিক। সেজন্য এই চতুর্বর্গ আদ্যোপান্ত সকাম, এবং পরিত্যাজ্য। অপরপক্ষে, ভক্তির

গতি শ্রীভগবানের দিকে, তাঁর সুখের দিকে। সেজন্য একমাত্র ভক্তিই নিষ্কাম ও গ্রহণীয়। এরূপে ভুক্তি-মুক্তি লাভের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে প্রীতি প্রদর্শিত হয়, তার অন্তরালে সাধকের নিজের ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা লুক্কায়িত থাকে ; শ্রীকৃষ্ণের সুখ নয় ব'লে তা 'কৈতব' বা কপটতাই মাত্র, প্রকৃত কৃষ্ণপ্রীতি নয়। সেজন্য পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে—

'ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

(পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড ৪৬।৬২)

অর্থাৎ, যতদিন হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তির জন্য পিশাচী স্পৃহা থাকবে, ততদিন তাতে ভক্তির আবির্ভাব হবে কিরূপে ?

সেজন্য, প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্ত নিজে ত মুক্তি চানই না ; এমন কি, স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপাভরে তাঁকে মুক্তি দান করতে এলেও তিনি তা নেন না। ভগবান কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলছেন—

'সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।'

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৯।১৩)

'যাঁরা আমার সেবাই (অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধিনী আনুকূল্যময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্যময়ী সেবাই) কামনা করেন, তাঁরা আমি (ভগবান) স্বয়ং উপযাচক হয়ে দিতে চাইলেও—সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্য-সাযুজ্যরূপ পঞ্চবিধা মুক্তি গ্রহণ করেন না।'

এরূপে, পূর্বেই যা বলা হ'ল—জীবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অংশ-অংশী, শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ নিত্য ব'লে সেব্য-সেবকভাবও নিত্য। অর্থাৎ, জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সেজন্য শ্রীপাদ সনাতনকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন—

'জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।২০।১০১)

কিন্তু ঈশ্বর-জীবের মধ্যে এই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ সাধারণ জাগতিক প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ নয়। কারণ, জাগতিক প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ উভয় দিক থেকেই ওতপ্রোতভাবে স্বার্থসঙ্কুল। প্রভু সর্বদাই চান ভৃত্যকে যতটা সম্ভব খাটিয়ে নিজের যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে। অপর পক্ষে, ভৃত্যও সর্বদাই চান প্রভুকে যতটা সম্ভব ফাঁকি দিয়ে নিজের যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও জীবের মধ্যে যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ, তাতে কোনো পক্ষ থেকেই স্বার্থের নামগন্ধপর্যন্ত নেই। কারণ, এক্ষেত্রে প্রভু ঈশ্বরের একমাত্র কামনা ভৃত্যবাঞ্ছাপূরণ, জীবের প্রীতি-বিধান ; এবং ভৃত্য জীবের একমাত্র কামনা প্রভুর সুখ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। সেজন্যই পরমেশ্বরের প্রধান স্বরূপ ভক্তবাৎসল্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং বলছেন—শ্রীকৃষ্ণের 'ভৃত্যবাঞ্ছাপূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য।' (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২।১৫।১৬৬)

এইভাবে, আমরা দেখলাম যে, বলদেব ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের প্রপঞ্চনা-প্রসঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় গুণ 'আনন্দময়ত্বে'র পরেই তাঁর তৃতীয় গুণ 'প্রভুত্বে'র যে উল্লেখ করেছেন, তা সর্বদিক থেকেই হয়েছে সুষ্ঠু-শোভন-সুন্দর-সুযোগ্য। এরূপ উল্লেখ প্রথমতঃ এই কথাই সুপরিস্ফুট করছে যে, ব্রহ্মের মাধুর্য-প্রধান দিকটি নিয়েই কেবল অত্যধিক মাতামাতি নাচানাচি করলেই চলবে না ; তাঁর ঐশ্বর্য-প্রধান দিকটিকেও দিতে হবে সমান মর্যাদা-গৌরব-সম্মান-স্বীকৃতি ; দ্বিতীয়তঃ তা বৈষ্ণব-ধর্মের এই মর্মোত্থ বাণীটিকেও সমান পরিস্ফুট করছে যে, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের নিত্যদাস হলেও, তা তাঁর ভীতি, হতাশা, দুঃখক্লেশাদির হেতু ত নয়ই একেবারেই—উপরন্তু তাঁর নিত্যানন্দেরই কারণ—যেহেতু, যা পূর্বেই বলা হ'ল, জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্তব্য = আনুকূল্যময়ী সেবা = প্রীতিময়ী সেবা = কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। সুতরাং ব্রহ্মের 'আনন্দময়ত্ব' ও 'প্রভুত্ব' পরস্পরবিরুদ্ধ ত নয়ই একেবারেই, বরং স্বরূপতঃই পরস্পর-পরিপূরক। [ক্রমশঃ]

অহো আমি

(অষ্টাবক্র-গীতা হইতে)

অনুবাদক : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

অহো অহং নমো মহ্যং
বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥
২।১১

অহো অহো কি অদ্ভুত আমি
অবিনাশী স্বরূপ যাহার
বিস্ময়বিভোর হয়ে তাই
আমারেই করি নমস্কার।
ব্রহ্মা হতে তৃণদলাবধি
এ সংসার মৃত্যুর কবলে
আমি কিন্তু রহি চিরকাল
সকল মরণ অবহেলে ॥

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥২।১২

অহো আমি এক সত্য নমি আপনারে
যদিও বা খণ্ডদেহবান।
কোথা হতে আসি নাই যাব নাকো কোথা
বিশ্ব ব্যাপি' মোর অবস্থান ॥

অহো অহং নমো মহ্যং
দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥
২।১৩

অহো আমি নমো মোরে
সুকৌশলী এ সংসারে
নাহি কেহ
আমার সমান।
শরীর-আশ্রয়হীন
তবু ধরি চিরদিন
চরাচর
এ বিশ্ব মহান ॥

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্বাঙ্ মনসগোচরম্ ॥২।১৪

অহো আমি আমারে প্রণমি
এক দিকে কিছু নাই মোর।
অথবা তো আমারি সকলি
যাহা বাক্য-মানস-গোচর ॥

কর ক্ষমা প্রভু

সেখ হাসান ইমাম

ফিরায়ে দিয়েছ মোরে বারবার,
সব পথ মোর ঢেকেছে আঁধার,
সম্মুখে হেরি দুখ-পারাবার
ভাসি আজ আঁখি-নীরে।
করেছি তখনই যখন যা সাধ,
জ্ঞানে-অজ্ঞানে শত অপরাধ,
নহে তা কাহিনী, নহে অপবাদ,
মেনে নিই নতশিরে।
তব অবহেলা কঠিন-কঠোর,
ভাঙিয়াছে ভুল, কেটে গেছে ঘোর,
কর ক্ষমা প্রভু, অপরাধ মোর
যাব না তো আর ফিরে।

কালীপূজার প্রাচীনত্ব

স্বামী প্রমেয়ানন্দ

কালী কালের কর্ত্রী লীলাময়ী মহাশক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়: 'যিনি আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না, একথা ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এসব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপ ভেদ।'[১] 'এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতি আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই; সাপ আর তির্যগ্‌গতি। সাপকে ছেড়ে তির্যগ্‌গতিকে ভাববার যো নাই; আবার তির্যগ্‌গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।'[২] —শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে উপলব্ধ তত্ত্বের ভিত্তিতে কালীরহস্যের অতি সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল—অপূর্ব ব্যাখ্যা!

বেদে যিনি জগতের মূল সত্তা অবিনাশী চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তন্ত্রে তিনিই মহামায়া লীলাময়ী আদ্যাশক্তি কালী। তফাত শুধু এই যে, তন্ত্রমতে এই মহামায়া কখনও নির্গুণা আবার কখনও সগুণা হন, জীব-জগতের রূপ ধারণ করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁরই অভিক্ষেপ, জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁরই বিরাট মূর্তি। তিনি 'নির্গুণা, সগুণাপি চ' আবার 'সাকারাপি নিরাকারা'। সগুণা নির্গুণা, সাকারা নিরাকারা উভয়-ই তিনি। কমলাকান্তের একটি গানে আছে, 'শ্যামা কখনও পুরুষ কখনও প্রকৃতি কখনও শূন্যরূপা রে।'

বিচিত্রলীলাময়ী অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী এই মহামায়ার হাতেই জীবের মুক্তির চাবিকাঠি। 'তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণ অনন্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তাঁর অনন্ত। তিনি ভক্তবৎসলা। অপার তাঁর করুণা।...তিনি না কৃপা করে আমাদের আধার অনুযায়ী প্রকাশিত হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনন্তের স্বরূপ একেবারে বোধগম্য করি।' তিনি প্রসন্ন হয়ে কৃপা করে দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায় 'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসগুরু তোতাপুরী এক সময় মাকালীকে মানতেন না। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করলে 'আরে কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো' বলে তাঁকে কটাক্ষ করতেও ছাড়তেন না। অবশ্য তাঁর এই না-মানার কারণও ছিল। 'তোতাপুরী স্বামীজী জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র; সৎ সংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষদের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া তো তাঁহাকে কখনও তাঁহার করাল বিভীষিকাময়ী মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখান নাই —তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনীমূর্তির ফাঁদে কখনও ফেলেন নাই। কাজেই গোঁসাইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্বিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'[৩] কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সাহচর্যে তোতাপুরী কৃপালাভ

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।২।৪ ২ তদেব ২।৯।৩

৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্দ্ধ ২৫৮

করেছিলেন চিন্ময়ী মাকালীর; উপলব্ধি করেছিলেন 'ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।' সেই উপলব্ধি স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়—'এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই মা শিবশক্তি একাধারে হরগৌরী মূর্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।'[৪] সে এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার স্থানও স্বতন্ত্র।

হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো নগরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে যেসব স্ত্রীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ঐগুলি দেবীমূর্তি। তাতে অনুমান করা খুবই সঙ্গত যে শক্তিপূজা ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছরেরও অধিককাল থেকে প্রচলিত। বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত এবং সামবেদের রাত্রিসূক্তই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্ অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীসূক্তের ঋষি। বাক্ পরাশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করেছিলেন, বলতে পেরেছিলেন, 'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।' ইত্যাদি।—আমিই জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি।

কালী-আরাধনা কখন কোথায় প্রথমে প্রবর্তিত হয় তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে প্রামাণিক প্রসিদ্ধ দু'একটি উপনিষদে কালীর উল্লেখ থাকায় দেবী যে অতি প্রাচীনা এবং তাঁর আরাধনাও যে অন্ততঃ বৈদিকযুগ থেকে অর্থাৎ অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগে থেকে প্রচলিত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে 'কালী' শব্দটি ব্যবহার করি উপনিষদ্গুলিতে বিশেষ করে প্রসিদ্ধ প্রামাণিক উপনিষদ্গুলিতে সেই অর্থে 'কালী' শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে পরবর্তী অপ্রসিদ্ধ কয়েকটি উপনিষদে কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচলিত অর্থে 'কালী' শব্দের উল্লেখ প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলিতে সাধারণভাবে না থাকলেও ঐসব উপনিষদে কালীর উল্লেখ যে একেবারে নেই, তা বলা যায় না। এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা পরে আসব। আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে বলে প্রাসঙ্গিক অন্য একটি বিষয়ের আলোচনা আমরা আগে করে রাখছি।

প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই দুর্গা ও কালী ভিন্ন নয়, একই দেবীর বিভিন্ন ভাব ও প্রকাশ মাত্র। মহাভাগবতপুরাণে আছে সতী (দুর্গা) দক্ষ-যজ্ঞে যোগদানের জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা করলে শিবনিন্দক দক্ষের যজ্ঞে সতীকে উপস্থিত থাকতে শিব অনুমতি দিলেন না। সতী তখন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করে দশদিক থেকে শিবকে মোহিত করলেন। এই দশমহাবিদ্যার প্রথম রূপই কালীরূপ বলে বর্ণিত। মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রু-পরাজয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গাদেবীর স্তব করতে পরামর্শ দেন—'পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রম্ উদীরয়।' শ্রীকৃষ্ণ-আদিষ্ট অর্জুন মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্তিপ্লুত চিত্তে দেবীর স্তব করলেন—'ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে। চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি।'[৫] ইত্যাদি। অর্জুনকৃত দেবীর এই স্তবে ভদ্রকালী, মহাকালী প্রভৃতি পদ আছে। তাছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায় কুমারী, কালী, কপালী, মহাকালী, চণ্ডী প্রভৃতি বহু নামে

---

৪ তদেব ২৬২; ৫ মহাভারত, ভীষ্মপর্ব ২৩।৪।১৫

দেবীকে অভিহিত করা হয়েছে। মহানির্বাণতন্ত্রে আছে, 'ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী' ইত্যাদি। অর্থাৎ কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি সবই তোমার বিভিন্ন রূপ। এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, কালী ও দুর্গা অত্যন্ত ভিন্ন নন; একই দেবীর বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ মাত্র।

এবার আমরা আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। প্রধান প্রামাণিক উপনিষদ্গুলির মধ্যে মুণ্ডকোপনিষদে আছে, 'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।'[৬] যদিও প্রচলিত অর্থে 'কালী' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়নি, অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতম জিহ্বা-রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি ঐ 'কালী' শব্দ যে কালীদেবীকে একেবারে বুঝায় না, তা নয়। কারণ সেখানে 'বিশ্বরুচী চ দেবী'—এই 'দেবী' শব্দের প্রয়োগ আছে। ব্রহ্মবিদ্যার প্রকরণে 'কালী' শব্দটির এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গতিমূলক—এ আশঙ্কারও কোন কারণ নেই। কেননা, কালী ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য-রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রের প্রথম শ্লোকটির উল্লেখ এখানে খুব যুক্তিযুক্তভাবেই করা যেতে পারে। ঐ শ্লোকটিতে আছে, 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং/নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।' তাৎপর্য এই যে, শিব শক্তিযুক্ত না হলে সৃষ্টি স্থিতি সংহার করতে সক্ষম হন না। শক্তি ছাড়া সেই দেব (শিব) স্পন্দিত হতেও পারেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন, শিব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই। সাধক রাম-প্রসাদেরও একটি গানে আছে, 'কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।' 'কথামৃতে' বারংবার উদ্ধৃত শ্রীরামকৃষ্ণের 'ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ' উক্তিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। কাজেই অগ্নির সপ্তজিহ্বা যেমন আহুতি গ্রাস করে, সেরূপ যিনি জগৎ-সংসার গ্রাস অর্থাৎ সংহার করেন, তিনিই কালী। অতএব মুণ্ডকোপনিষদের আলোচ্য মন্ত্রে 'কালী' শব্দটির দ্বারা শ্রীকালিকা-দেবীও সূচিত হয়েছেন।

কেনোপনিষদের 'উমা-হৈমবতী'-সংবাদে আছে, অগ্নি ও বায়ু দেবতা একে একে যক্ষরূপী ব্রহ্মের পরিচয় জানতে অসমর্থ হলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং পরিচয় জানার জন্য যক্ষের সামনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইন্দ্র উপস্থিত হতে না হতেই ব্রহ্ম অন্তর্হিত হলেন, আর তাঁর স্থলে আবির্ভূতা হলেন সর্বালঙ্কারভূষিতা বহুশোভমানা অপরূপা এক দেবী—উমা হৈমবতী। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যবর্তমান এই উমা হৈমবতীই দুর্গা বা আদ্যাশক্তি কালী।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মহানারায়ণ উপনিষদে আছে, 'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।'[৭]—আমি সেই বৈরোচনী, পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, স্বীয় তাপে শত্রুদগ্ধ-কারিণী, কর্মফলদাত্রী দুর্গাদেবীর শরণাগত। হে সংসারত্রাণকারিণী দেবী, তোমাকে প্রণাম।

ঐ উপনিষদেই দুর্গার গায়ত্রীমন্ত্রে আছে, 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।'[৮] বলা বাহুল্য, দুর্গা ও কালী অভিন্ন।

অপ্রসিদ্ধ উনিষদ্গুলির মধ্যে অথর্ববেদীয় কালিকোপনিষদে কালীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—'অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাম্।'[৯] দেব্যুপনিষদে

৬ মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।৪ ; ৭ মহানারায়ণ উপনিষদ্ ১০।২
৮ তদেব ১০।১।৭ ৯ কালিকোপনিষদ্ ১

আছে, উপাসনাপরায়ণ দেবগণ দেবীর বিচিত্র রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে তাঁর স্বরূপ জানতে চাইলে দেবী স্বস্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাঁদের বলেছিলেন, 'অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ।'[১০]—আমিই ব্রহ্মস্বরূপ প্রকৃতি-পুরুষাত্মক এই জগতের কারণ। যদিও পণ্ডিতদের মতে এইসব উপনিষদ্ পরবর্তী কালে রচিত, তথাপি উপনিষদ্গুলি বৌদ্ধযুগের আগেই রচিত বলে অনুমান।

নারদপঞ্চরাত্রেও দুর্গা, পার্বতী, ভদ্রকালী প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। যেমন 'পার্বতী ভদ্রকালী চ কার্তিকেয়ো নগেশ্বরঃ।'[১১] 'বুদ্ধ্যাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী। অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্বতী।'[১২] নারদপঞ্চরাত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থে কালীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকায় কালী-আরাধনা যে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তা বেশ বোঝা যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর তিন জায়গায় চণ্ডিকাদেবীর কালীরূপের বর্ণনা আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক পরাজিত ও স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ তাঁদের এই ঘোর বিপদে বিপত্তারিণী পার্বতীর স্তব করলে পার্বতীর দেহকোষ থেকে কৌশিকী উৎপন্না হলেন। কৌশিকী নির্গত হওয়ার পর দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিতা হয়ে হিমালয়ে অধিষ্ঠানপূর্বক 'কালিকা' নামে খ্যাতিলাভ করেন—'কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমালয়কৃতাশ্রয়া।' সপ্তম অধ্যায়ে আছে সসৈন্য চণ্ড-মুণ্ড যখন দেবী চণ্ডিকাকে অসুররাজ শুম্ভের নিকট ধরে নিয়ে যেতে উদ্যত হল, তখন চণ্ডিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হয়ে উঠলেন এবং ক্রোধে তাঁর মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল। সেই ক্রুদ্ধা দেবীর ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটদেশ থেকে করালবদনা কালী নির্গতা হলেন। সেই কালী চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করে এনেছিলেন বলে চণ্ডিকা কর্তৃক 'চামুণ্ডা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন—'চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি।' অষ্টম অধ্যায়ে আছে, রক্তবীজকে বধ করার জন্য চণ্ডিকা অস্ত্র প্রয়োগ করলে রক্তবীজের শরীর-নির্গত রক্তবিন্দু থেকে হাজার হাজার অসুর সৃষ্ট হতে লাগল। দেবতারা স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে উঠলেন। রক্তবীজের রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই নিঃশেষে পান করার জন্য চণ্ডিকা তখন কালীকে অনুরোধ করলেন। চণ্ডিকার আদেশে কালী মুখ ব্যাদান করে রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই খেয়ে ফেলতে লাগলেন। নীরক্ত রক্তবীজ তখন চণ্ডিকা কর্তৃক নিহত হল। চণ্ডীতে বর্ণিত চণ্ডিকার মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই তিনটি চরিত্রের প্রথম চরিত্রটিই মহাকালীর।

পুরাণে আছে, সতীকে যোগানলে দগ্ধ হতে দেখে মহাদেব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং সতীর মৃতদেহ নিজ স্কন্ধে স্থাপন করে উদ্ভ্রান্তচিত্তে নানা দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। মহাদেবের এ অবস্থা দেখে দেবগণ ভীত-বিচলিত হয়ে উঠলেন। অবশেষে ভগবান বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে সতীর দেহ ছেদন করলেন। একান্নখণ্ডে বিভক্ত দেবীর অবয়ব যে যে স্থানে পড়ল, সেসব পীঠস্থানে দেবী কালী তারাদিরূপে পূজিত হয়ে আসছেন। তাছাড়াও পুরাণের বিভিন্ন স্থলে দুর্গা, কালী, ভদ্রকালী প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। মহাভাগবতপুরাণ ও মহাভারতের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তন্ত্রশাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস (মহাভারত) বহু প্রাচীনকালের; সুতরাং কালীর আরাধনা বহু প্রাচীন বলেই প্রমাণিত হয়।

১০ দেব্যুপনিষদ্ ১-২

১১ নারদপঞ্চরাত্র ১।৮।২৮ ১২ তদেব ২।৩।৫৬

কালী-আরাধনা, বেদমুখী। বেদের গোমুখী থেকে নির্গত কালী-আরাধনার বিস্তার ও পরিপূর্ণ বিকাশ তন্ত্রশাস্ত্রে। পণ্ডিতদের অনুমান তন্ত্রশাস্ত্র বেদপূর্ব কাল থেকে সূত্রাকারে বিবর্তিত হয়ে পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধযুগ ও তৎপরবর্তী যুগেও ব্যাপকভাবে সাধনার অবলম্বন হয়েছে। তাতেও কালী-আরাধনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হয়।

বর্তমান প্রচলিত প্রথায় আনুষ্ঠানিক কালীপূজা কোথায় কবে প্রথম প্রচলিত হয় তার কাল নির্ণয় করা খুবই শক্ত। শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস 'ভারতীয় শক্তিসাধনা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন। তাতে লক্ষ্য করা গেছে, গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর, তাঞ্জোর, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং আরও বিভিন্ন অঞ্চলে অতি প্রাচীনকাল থেকে নানারূপে কালীপূজার প্রচলন ছিল। খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্নলিপিতে সপ্ত-মাতৃকার মন্দির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। অনেক জায়গায় লোকাচার-প্রভাবে কালী গ্রাম্য দেবীরূপে রূপান্তরিতা হয়েছেন।

কালীপূজা তথা শক্তিপূজার প্রচলন বৈদিক যুগের বহু পূর্ব থেকে ভারত ও ভারতের বাইরে প্রচলিত ছিল। দস্যুদের মধ্যেও শক্তিসঞ্চয়ের জন্য কালীপূজার প্রচলন দেখা যায়। আবার সাধকদের মধ্যেও অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখতে পাই।

অতি প্রাচীনকাল থেকে কেরলে কালীপূজা প্রচলিত। আদিবাসী মেয়েরা (চেরুমি) কেরলে প্রথম কালীপূজা শুরু করে। প্রবাদ আছে, ধান কাটতে গিয়ে কয়েকজন চেরুমি একটি পাথরে কাস্তে ধার দিচ্ছিল। তখন তারা দেখতে পেল পাথরের গা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ভয়ে তারা চিৎকার করে উঠল। প্রবীণরা দেখে বুঝল ঐ পাথরে কালী আছেন। তখন থেকে ঐ পাথর কালীরূপে পূজিতা হয়ে আসছেন।

এসব তথ্য থেকে সঙ্গতরূপেই অনুমান করা যায় যে, দেবী কালী অতি প্রাচীনা এবং তাঁর বিভিন্ন রূপের আরাধনাও অনেক প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত।

বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

[ভাদ্র, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বিষয়বস্তুর দিক থেকে এক হিসাবে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারতে'র চেয়ে দুরূহ গ্রন্থ। এতো হালকাচালে লেখা ব'লে অনেক তথাকথিত পণ্ডিত এর বিষয়বস্তুকেও লঘু বলে ভুল করেন। মেয়েদের একটি কলেজের কথা জানি, সেখানে বাংলাবিভাগের অতিশয় উচ্চ মনীষার অধিকারিণী প্রধানা অধ্যাপিকারা স্বামীজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সবচেয়ে নবাগতা এক কনিষ্ঠা অধ্যাপিকাকে পড়াতে দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, এ বইয়ের বিষয়বস্তু নতুনদের পক্ষে পড়ানোই ভালো, তাঁরা নিজেরা গুরুতর বিষয়বস্তুর গুরুভার মাথা থেকে নামাতে চান না। অথচ 'পরিব্রাজক' বা 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পড়াতে যে বিদ্যার দরকার, ক'জনের সে বিদ্যা আছে বলা কঠিন। জ্ঞানবিজ্ঞানের যে উচ্চতম বিষয়গুলি স্বামীজী এ বই দুটিতে জলের

মত সহজ করে বুঝিয়েছেন, সরস প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তার গভীরে যেতে হলে যে ধরনের পড়াশুনো দরকার সে রকম পড়াশুনোর সময় কোথায় আমাদের অধ্যাপকবৃন্দের! এই সোজা কথাটা একজন প্রবীণ বাংলাবিভাগীয় প্রধান-অধ্যাপক স্বীকারই করেছিলেন আমাদের কাছে।

ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তার দুটি প্রান্ত। একদিকে বৈদিক ধর্মানুসারী চতুরাশ্রমপ্রথা—যেখানে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এই চারটি স্তরে মানবজীবনের স্বাভাবিক স্তরবিন্যাস। এই ব্যবস্থাটি বৌদ্ধ আন্দোলনের সময় পরিবর্তিত হয়ে একেবারে সন্ন্যাসের উপরেই জোর দেওয়া হ'তে থাকে। কিন্তু খুব অল্প লোকের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের পরে একধাপে সন্ন্যাসে উপনীত হওয়া মনস্তত্ত্বসঙ্গত। স্বামীজীর মতে এদেশে বুদ্ধ এবং পাশ্চাত্যে যীশু এই সন্ন্যাসের উপরে অতিরিক্ত জোর দিয়ে সংসারধর্মকে অনেকটা উপেক্ষা করেছেন, তার ফলে অধিকাংশ মানুষের পক্ষে জীবনসাধনার স্বাভাবিক পর পর স্তরগুলি না এসে কৃত্রিমভাবে সন্ন্যাসের উপর জোর পড়েছে।

স্বামীজীর ভাষায়—"মোক্ষমার্গ তো প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বলো, আর যীশুই বলো, সব ঐখান থেকেই তো যা কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী—'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'—বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর ক'রে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষমার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বলো,—কিছুই নয়।...বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ !!! তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেস্টাণ্ট (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হ'ল।"

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মানবজীবনধারায় এই চিন্তার দ্বন্দ্ব ও তার নিরসন স্বামীজীর ইতিহাস-দৃষ্টিতে কতো স্বচ্ছ অথচ মৃদু পরিহাসজল্পনায় ফুটে উঠেছে। অথচ এই একটি বিষয় বুঝতে হিন্দুধর্মের ও খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের আবর্তগুলি স্বামীজী কী নৈপুণ্যের সঙ্গেই না পার হয়ে এসেছেন! স্বয়ং সন্ন্যাসী বিবেকানন্দই বুদ্ধ ও যীশুর বৈরাগ্যধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েও সে ধর্ম যে সাধারণ গৃহাশ্রিত মানুষের পক্ষে স্ব-ধর্ম নয়, এই মূল বক্তব্যটি ঘোষণা করতে পেরেছেন! সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয় যে, অধিকারীভেদেই স্বামীজীর এই ব্যবস্থা। অপরপক্ষে সন্ন্যাসের সর্বজয়ী মহিমার ঘোষণায় তিনিও এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য-প্রচারক। ভুল করে কেউ কেউ স্বামীজীর বৈরাগ্যবাদীরূপটিকে অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের জীবনাসক্তির প্রতি তাঁর অনীহার কথাই বেশী প্রচার করেন। তারই ফলে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিরোধ নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা! যে অংশটি আমরা তুলে ধরেছি, সেই অংশে অধিকাংশ মানুষের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে স্বামীজীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। আবার এ সহমর্মিতা এসেছে তাঁর খোলামেলা আনন্দময় হাস্যরসিক রচনাভঙ্গীর মাধ্যমে।

স্বামীজীর মতে এক মোক্ষই বৈদিক (হিন্দু) ও বৌদ্ধধর্মের লক্ষ্য। কিন্তু বৈদিকধর্মের চতুরাশ্রম-প্রথার উপযোগিতা সন্ন্যাস-কেন্দ্রিক বৌদ্ধধর্মে অনুপস্থিত। ফলে দেশসুদ্ধ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী যখন দেখা দিল, তখনই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের সূচনা। কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ—এঁরা সন্ন্যাসকে যথাস্থানে রেখে সমাজের পক্ষে চতুরাশ্রম-

প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করে সামাজিক সাম্য আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। এদিক থেকে ভারতীয় সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসটি স্বামীজী যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা এ কালের পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

এ সমালোচনায় বৌদ্ধেরা স্বভাবতঃই চটবেন। স্বামীজী তাঁর নিজস্ব কৌতুকভঙ্গীতে লিখেছেন—"বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবে।" আবার এদিকে গোঁড়া হিন্দুয়ানির প্রবক্তারা 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' ইত্যাদির উপর স্বামীজীর জোর দেখে ভাবছেন তাহলে স্বামীজী হয়তো তাঁদেরই দলে! একথা ভেবে আবার আর একদল গোঁড়ামি-বিরোধী হিন্দু স্বামীজীর উপর চটছেন। স্বামীজীও লিখেছেন—"...অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোশামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্য বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোশামোদ ক'রে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোক একমুঠো অন্ন দেয় না; ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে বাইরে থেকে এনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই তো তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা; যদি না পায় তো গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী! এই আমাদের দেশের লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু-দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সেই যথার্থ বন্ধু।" স্বামীজীর ব্যঙ্গের লাঠি এখানে দেশসুদ্ধ উন্মাদের যথার্থ ওষুধ, সন্দেহ কি! লাঠিটির পরিচয়ও নেওয়া ভালো। এদেশের অধিকাংশ মানুষের অকর্মণ্যতা ও অকৃতজ্ঞতার ইতিকথা স্বামীজীর এ ভর্ৎসনামিশ্রিত ব্যঙ্গে যেভাবে ফুটেছে তাতে বাঙালীর আত্মদর্পণের কাজ করেছে। আমাদের অধিকাংশ দেশ বা সমাজহিতৈষণার এই চেহারা। পরের সেবার নাম করে নিজের কোলে ঝোল টানতে সবাই ব্যস্ত! আর সেই ঝোল টানায় যদি বাধা পড়ে তা হলে চুলোয় যাক সমাজসেবা!

স্বামীজী গুণগত স্বধর্ম যে দু'চারপুরুষে জাতিগত ধর্মে পরিণত হয়, সেকথা উল্লেখ করে স্বধর্ম-নিষ্ঠার দ্বারা জাতিগত ভিত্তি সুদৃঢ় করতে বলেছেন। কিন্তু জাতিভেদকে চিরন্তন করে রাখারও তিনি বিরোধী। এদিক থেকে শিক্ষা-বিস্তারের দ্বারা সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের উচ্চ-স্তরের সমপর্যায়ে নিয়ে আসাই তাঁর লক্ষ্য।

তবে প্রত্যেক জাতিরই একটি নিজস্ব চরিত্র-লক্ষণ আছে, সেইটিই স্বামীজীর ভাষায় 'জাতিধর্ম'। ভারতবর্ষের অবনতির অন্যতম কারণ তার জাতীয় চরিত্র-বিচ্যুতি। যাঁরা মনে করেন, বিদেশী ভাষা, পোশাক বা মতবাদের অন্ধ অনুসরণের দ্বারাই জাতীয় উন্নতি সম্ভব, তাঁরা সেদিক থেকে 'জাতি-ধর্ম'-চ্যুত। স্বামীজীর এ মতবাদের সার্থকতা নিয়ে যাঁরা সন্দিহান তাঁদের উদ্দেশে স্বামীজীর বক্তব্য—"আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি, তাই তোমাদের বলছি; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানি হইনি যে, তোমাদের আহম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হ'ল। তোমাদের মুখে চুনকালি পড়লে যে আমার মুখে পড়ে, তার কি?"

আমাদের জাতীয় নানা কুসংস্কারকেও যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বলে দাঁড় করাতে চাইতেন, স্বামীজীর স্বধর্মপ্রীতি সেজাতীয় কিম্ভূত মতবাদ নয়। ভারত ও বিশ্বপরিক্রমার পর স্বামীজী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন—"দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ ক'রে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের

পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ ক'রে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা-ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে;[১] নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!"

স্বামীজীর লোকশিক্ষক সত্তাটির যে গভীর-সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় উদ্ধৃত অংশে মেলে, তারই সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গে ও অনেকখানি সহানুভূতিতে মিশে একান্ত বন্ধুজনোচিত সম্মিত বাক্যভঙ্গীর উদাহরণ-রূপে বাংলা গদ্যের বিস্ময়কর রূপ এ অংশে প্রকাশিত। "প্রাণ ধকধক করছে", "ওপরে ছাই চাপা", "ঘোড়ার ডিম," "রামচন্দ্র"!—এ সব "কলকাত্তাই" গদ্যরীতির সুষ্ঠু ও সফল প্রয়োগ। পড়তে পড়তে পাঠকও কখন স্বামীজীর অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত!

ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শ যাঁরা বোঝেন না, বা বুঝতে চান না, তাঁরা ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির অনেকটাই বোঝেন না—একথা স্বামীজীর এ লেখার আশি বছর পরেও আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদী চিন্তাধারা এখন সমার্থক হয়ে গেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসীরা পুরোহিতের হাতের পুতুল হওয়ার এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, সন্দেহ নেই। বামপন্থী চিন্তাধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক কার্ল মার্ক্‌স তাঁর ২৬ বছর বয়সের লেখাতেই মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ধর্মই জনসাধারণের আফিম'। (A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law.) স্বয়ং ইহুদী মার্ক্‌স ইহুদীধর্মের অন্তরালে কুসীদজীবী বণিকদের লোলুপতাকে বড়ো করে দেখেছিলেন এবং এক হিসাবে অর্থই কেমন করে ঈশ্বর ও দেবতাদের সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে নির্মম মন্তব্যের দ্বারা ধর্মকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন।

অথচ স্বামীজী সমকালীন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হয়েও ভারতবর্ষের সব আন্দোলনই ধর্মের মাধ্যমে হওয়ার উপরে জোর দিয়েছেন। স্বভাবতঃই বামপন্থী পণ্ডিতেরা 'ধর্ম' নামক জুজুর ভয়ে স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে আতঙ্কিত। এক্ষেত্রে মার্ক্‌সের দৃষ্টিতে ধর্মের বহিরঙ্গ ব্যাখ্যা ও স্বামীজীর দৃষ্টিতে ধর্মের অন্তর্মুখী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পার্থক্যই মার্ক্‌সবাদী ও বিবেকানন্দ-অনুগামীদের আদর্শগত পার্থক্যের কারণ।

'বর্তমান ভারতে' ভারতবর্ষ ও সমগ্র পৃথিবীতে আসন্ন 'শূদ্রযুগ' (A[illegible] of Labourers) সম্বন্ধে স্বামীজীর লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মার্ক্‌স্ ও এঙ্গেল্‌সের কম্যুনিজ্‌মের বা সাম্যবাদের সংগ্রামে বিশ্বের সর্বহারা শ্রমজীবীদের প্রতি আহ্বানের একটি সুরগত মিল থাকলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে মার্ক্‌স্ ও স্বামীজীর দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ পৃথক্—এ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের লক্ষ্য 'ধর্ম'—যে ধর্ম ইহজীবনকে সমৃদ্ধ করতে চায়; প্রাচ্য বা ভারতের লক্ষ্য 'মোক্ষ'—যে ধর্ম ইহজীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তায় আত্মস্থ হতে চায়। মার্ক্‌স্ যে মুক্তির সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তা বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা স্বাধীনতার জন্য আহ্বান। স্বামীজী মানব-

১ অধোরেখা বর্তমান লেখক প্রদত্ত।

জীবনের সমস্যা সমাধানে সর্বহারাদের অধিকারকে মনেপ্রাণে স্বীকার করেও জাতির বা মানবাত্মার লক্ষ্য হিসাবে বাসনার উর্ধ্বে অভয়প্রতিষ্ঠ পরম সত্যকে স্থাপন করেছেন। এ লক্ষ্য কোনো বিশেষ শ্রেণীর নয়, কেবল ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর নয়, এ সর্বমানবের শেষ ও সর্বোত্তম আদর্শ। তবে সমাজের বিবর্তনে সুবিধাভোগী শ্রেণীর হস্তান্তর হবেই, সে পরিবর্তন যদি বুদ্ধিগত দিক থেকে হয় তো ভালো, না হয় প্রচলিত ব্যবস্থা বিদীর্ণ করে নতুন বিপ্লব দেখা দেবে। কিন্তু যে শ্রেণীই ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন, মানুষের চিন্তা-ধারার নিয়ামক তার অন্তর্নিহিত পরম চৈতন্য—তার উদ্দেশেই মানুষের চিরন্তন তীর্থযাত্রা। এ চৈতন্যকে বামপন্থীরা 'বস্তু' বলে অভিহিত করতে চান—কিন্তু বস্তুই যে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ একথা কি বিজ্ঞানও প্রমাণ করতে পেরেছে? অপরপক্ষে বস্তুর অতীত মহাশক্তির দিকে আধুনিক বিজ্ঞান নানাভাবেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছে। স্বামীজীর মতে যাকে আমরা 'চৈতন্য' বলি, বস্তুবাদীরা তাকেই 'বস্তু' বলে অভিহিত করে থাকেন। বলা বাহুল্য, এ মন্তব্য তথাকথিত বামপন্থীরা কখনোই স্বীকার করবেন না। কারণ, মার্ক্‌স্‌ তো একথা বলেন নি!

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শগুলির যে অক্ষম অনুকরণ আমরা করে চলেছি সে সম্বন্ধে আশি বছর আগে স্বামীজী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা আজকের ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বিশেষভাবে স্মরণীয়—"তা ছাড়া উপায় তো সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান' বই তো নয়। ও তোমার 'পার্লামেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।"

ইংল্যাণ্ডের 'পার্লামেণ্ট', আমেরিকার 'সেনেট'—প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ-গুলিতে আমরা মেজরিটি বা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার যে নজির পাই, তাকেই মানুষের স্বাধীনতার চরম বলে পাশ্চাত্যের গর্ব ছিল। স্বামীজীর নির্মম ব্যঙ্গ এই অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করে দেখিয়েছে অধিকাংশ মানুষই ভেড়ার মতো অন্ধভাবে কোনো না কোনো নেতা বা দলের অনুগামী মাত্র। সুতরাং স্বাধীন মতানুসারে নির্বাচন অধিকাংশক্ষেত্রেই চতুর রাজনীতিকদের দাসত্ব-আদায়ের ফন্দী। এ দেশের মানুষ যে ধর্মবীরদের অনুসরণ করে থাকে, তাতে ঐসব ভোট ব্যালটের হাঙ্গামা নেই, উপরন্তু আদর্শ মনুষ্যত্বের অনুসরণ করে মানুষ পরম সত্যের দিকে আরো এগিয়ে যায়। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে স্বামীজীর পরে শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখদের নেতৃত্বের সঙ্গে এই ধর্মশক্তির মিলন ঘটেছিল বলেই তাঁদের মতো অবিসম্বাদী নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে আর কারও দ্বারা সম্ভব হয় নি।

একালে যাঁরা শুদ্ধমাত্র রাজনীতির কূট-কৌশলে নেতৃত্ব হাতের মুঠোয় আনতে চান, তাঁদের মধ্যেও শক্তিমানেরাই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী দেশকে পরিচালনা করেন। দু'চারজন মানুষের কথাই লক্ষকণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে হ'তে এক সময় সত্যের মর্যাদা পায়। পরবর্তী ইতিহাস সেই মিথ্যার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে একদিন নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ভোট ব্যালট প্রভৃতির দ্বারা সাধারণ মানুষেরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, সন্দেহ নেই। কিন্তু এসবের দ্বারা যে মিথ্যাচার, দলাদলি, ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ জেগে ওঠে, সেই গরলধারা জাতীয় জীবনকে কতখানি বিষাক্ত করে তোলে

আজকের ভারতবর্ষের গ্রামে-নগরে তার অজস্র প্রমাণ। পাশ্চাত্যের ভোট ব্যালটের পিছনে যে বিভীষিকা, স্বামীজীর ভাষায় তার স্বরূপ—"...রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।" ও-দেশের এই রাজনীতির বিষ আজকের ভারতেও জনজীবনকে কতখানি বিষাক্ত করেছে, সেকথা মনে রাখলে স্বামীজীর ওই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত বেদনা আমাদের মনেও সমান ভাবেই জাগে।

সব দেশের কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাঙালী তরুণের অনুকরণসর্বস্বতা সেকালে ইংরেজ বা য়ুরোপীয়দের অনুকরণে যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, তেমনি একালে আমেরিকা, রাশিয়া বা চীনের অনুকরণের হুজুগও সমান লক্ষণীয়। এই অন্ধ অনুকরণপ্রবৃত্তির হাস্যকরতা দেখিয়ে স্বামীজীর সরস মন্তব্য—"আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই-মাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস শিখতে হবে। বলি—খাওয়া তো সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে ব'সে খাই, বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে ব'সে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা ব'লে কি এদের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ি যাবার দাখিলে পড়ে—টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বইকি। ঐরকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মতো ক'রে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে।" এইভাবে বন্ধু-সম্মিত ভঙ্গীতে অনুকরণসর্বস্বতার হাস্যকরতা দেখিয়ে স্বামীজী কীভাবে পরের ভাবকে নিজের মতো করে নিতে হয় তার আনন্দময় প্রকাশ লিপিবদ্ধ করে নিজেকে নিয়ে রঙ্গকৌতুকে তৈয়ার—"বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান পুরুষ যে পোশাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর আমার মতো আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে ক'রে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।"

পোশাক মনুষ্যত্ব নয়, একথাটি বুঝতে আমাদের তরুণসমাজের এখনো ঢের দেরী। 'ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে' বেড়ানোর উদাহরণ এখন নিত্য নতুন বিদেশী ঢঙের পোশাক-পরা তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে বেড়েছে। অবশ্য হ্রস্ব পোশাকের দিকে ঝোঁকের কারণ অনেকটা অর্থনৈতিক; আর ধোপার কাজ এখনকার জামাকাপড়ে নিজেই করে নেওয়া যায়—এইখানে পার্থক্য। কিন্তু ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়ালে স্বদেশী সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যময় পোশাকের চেয়ে বিদেশী অনুকরণের একাকারিত্ব বেশী চোখে পড়ে। তার উপরে আবার একালে বৃদ্ধেরাও তরুণ সাজতে ব্যস্ত ব'লে বিদেশী অনুকরণের হাস্য-করতা আরো প্রকট। স্বামীজীর মন্তব্যই এ প্রসঙ্গে মোক্ষম—'কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে?'*

[ক্রমশঃ]

* এ প্রবন্ধের যাবতীয় উদ্ধৃতির জন্য 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (৬ষ্ঠ খণ্ড): 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ

শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী

'হে ঐশ্বর্যবান' বলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করি তখনই, যখনই সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীতের পরিমণ্ডলে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়ায় দেখি তাঁর ছায়া। সেটা তাঁর সত্যরূপ—যেখানে কবি রবীন্দ্রনাথ এক বিপুল বৈভব এবং অমিত বিত্ত নিয়ে আমাদের সাহিত্যের আকাশ ছেয়ে দিয়েছেন গৌরবে, সম্পদে। এই রূপের বাইরে আরেকটা রূপ তাঁর স্পষ্ট—সেটা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ, যিনি মহর্ষির অনুসংগে গ্রহণ ও বরণ করেছেন অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম। এই দ্বিতীয় পরিচয়ের আড়ালেই রবীন্দ্রনাথ যেন স্ববিরোধিতার জীবন্ত প্রতীক—যিনি ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ, যিনি বচনে ও ভাষণে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেন সংস্কারের সূত্রকে, অনায়াসেই মেনে নেন সংস্কারের শাসনই। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন পিতাকে—যিনি মুখে ব্রাহ্ম, কাজে ব্রাহ্মণ, প্রত্যক্ষ করেছেন স্বীয় জননী সারদাকে, যিনি অপৌত্তলিক স্বামীর মঙ্গলকামনায় গৃহমধ্যে দেবপূজা করেন। নতুন কিছু করার, প্রচলিত রীতি-নীতি ভাঙ্গার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে একমাত্র শালগ্রামশিলাবর্জিত অনুষ্ঠান ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ হয়েও আদিতে এবং অন্তে ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ।

এই যে স্ববিরোধিতা, এই যে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মণের দ্বৈতরূপ—এটাই রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র পরিচয়। এই প্রসঙ্গে আমরা ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের সত্য-স্বরূপ অনুসরণ করার প্রয়োজনে অতীত-ইতিবৃত্তের কথা স্মরণ করতে পারি—যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে এক বেদনামিশ্রিত সামাজিক ট্রাজেডী। ঠাকুরপরিবার যদিও গোঁড়া ব্রাহ্মণপরিবার—তবু ব্রাহ্মণসমাজে তাঁদের জন্য সম্মানের আসন নির্দিষ্ট ছিল না। কারণ, এই প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী পরিবারটি 'পতিত ব্রাহ্মণপরিবার' হিসেবেই চিহ্নিত ছিল। কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্রাহ্মণপরিবারের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতেও রাজি ছিলেন না। ফলে, তাঁরা স্বগোত্রের 'পিরালী' বা পতিত ব্রাহ্মণপরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করতেন।

ঠাকুরবংশের যিনি আদিপুরুষ, সেই জগন্নাথ কুশারীও 'পিরালী' ব্রাহ্মণের কন্যা বিয়ে করে 'পিরালী ব্রাহ্মণ' হয়েছিলেন। কেন এই পিরালী ব্রাহ্মণ, এবং কেন তাঁরা পতিত, সে সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রজীবনীর' প্রথম খণ্ডে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। আপাতত আমরা সেই তথ্যগুলিকেই আলোচনার সূত্রে মেনে নিচ্ছি। জনৈক পিরল্যা খাঁর চক্রান্তে এবং চাপে ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষ কামদেব ও জয়দেব জাতিচ্যুত হন এবং এই পিরল্যা খাঁ বা পীর আলির নাম থেকেই এই পতিত ব্রাহ্মণ-পরিবার পিরালী ব্রাহ্মণ হিসেবে চিহ্নিত হন।

যদিও তাঁরা 'পতিত' হন, তবু তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের মোহ ও অহঙ্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই সেযুগের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান দেবেন্দ্রনাথ দক্ষিণ ডিহির এক অখ্যাত পিরালী ব্রাহ্মণ-পরিবারের কন্যাকেই পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-ঘটিত বিষয়টিও উল্লেখ করতে পারি।

প্রভাতকুমারের রচনা থেকেই জানতে পারি, 'রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুপুরুষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের

জন্য বহু চেষ্টা হয়; কিন্তু সংকীর্ণ পিরালী ব্রাহ্মণ সমাজে সেরূপ কন্যা সুদুর্লভ। কারণ সেযুগে ছেলেদের বিবাহ হইত বিশ বৎসরের মধ্যে এবং বধূদের বয়স হইত নয় থেকে দশের ভিতরে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তেইশ পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকার সন্ধানে সবাই প্রবৃত্ত হইল। একবার এক অ-বাঙালী ধনী পরিবার হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। ...বিবাহ সেখানে না হইয়া হইল ফুলতলি গ্রামের এগারো বৎসরের এক কৃশ, রুগ্ন, অশিক্ষিত, অত্যন্ত সাধারণ পাড়াগেঁয়ে বালিকার সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিলেন—বহু সন্ধানেও যখন সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোন বধূ মিলিল না, তখন স্থির হইল ঠাকুর এস্টেটের সামান্য কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর একাদশবর্ষীয়া কন্যার সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক পিরালীত্ব ছাড়া আর কোন মিল ছিল না এই দুই পরিবারের মধ্যে।'

এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণত্বের মোহ বা আবরণ ছিন্ন করতে পারেননি। পারেননি বলেই নিতান্তই অন্ত্যজ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যাকে রবির মত এক সুপুত্রের বধূ নির্বাচন করেছেন, তবু ব্রাহ্মসমাজের কোন অব্রাহ্মণকে মেনে নিতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা গোঁড়া ছিলেন, তা আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হবে। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয়পাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের কুলতিলক। অথচ যেহেতু কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন না, সেইহেতু তাঁকে সমাজের আচার্যপদে দেবেন্দ্রনাথ বরণ করতে রাজি হননি—যার ফলে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন দেখা দেয়। গোঁড়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথকেই ১৮৮৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন এবং অন্য কোন অব্রাহ্মণ যাতে এই পদে না আসতে পারেন, সে পথেই প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই ঘটনাগুলিকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। কেন ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ লিখিত বয়ানে ব্রাহ্ম হয়েও সমাজ ও সংসার জীবনে আদৌ ব্রাহ্ম হতে পারেননি, সেটা আজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে হবে।

'ব্রাহ্ম ঠাকুরপরিবার' সেযুগের অন্যান্য কট্টর ব্রাহ্মণপরিবারের তুলনায় যে কিছুমাত্র উদার ছিলেন না, তা আমরা আরও দু'একটি ঘটনার উল্লেখে বুঝতে পারব। 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ২০৩) প্রভাতকুমার বলেছেন, 'হিন্দু-সমাজবিরোধী কোন অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণ বিবাহ-আন্দোলন (১৮৭২) তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই।'

শুধুই কি তাই? প্রভাতকুমার আরও বলেছেন, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ বিবাহাদি ব্যাপারে বর্ণবিচার করিতেন, উপনয়নাদি বিষয়ে কুলাচার পালন করিতেন।' প্রভাতকুমার আরও বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২): 'ঠাকুরবাড়ির জামাতাদের প্রায় সকলেই ঘরজামাই। তার বিশেষ কারণ ছিল; পিরালী ব্রাহ্মণপরিবারের ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিবাহ করিয়া পৈতৃক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া ধনী শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর থাকিত না।' অর্থাৎ, ঠাকুরপরিবারের অধিকাংশ জামাই-ই 'ঘরজামাই' হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যা বেলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ-পর্যন্ত বিষণ্ণ বেদনায় পরিণত হয়।

ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং সঠিক পটভূমিকায় বুঝতে হলে ব্রাহ্মণের আদর্শ

সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও বর্ণাশ্রম সম্পর্কে তাঁর চেতনা বুঝতে হবে। 'রবীন্দ্রনাথের মনে হইল, বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়।...হিন্দু ভারতের বর্ণাশ্রম আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি আজ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় করিয়া দেখিতেছেন।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপর্ব প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬) আরও বলেছেন: প্রাচীন ভারতের হিন্দু আদর্শ কিভাবে আধুনিক জীবনে সফল হইতে পারে, কিভাবে বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে কবি চিন্তা করিতেছেন। এই সময়ে লিখিত 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি এ যুগের মনোভাব-প্রকাশক।

'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি কবি লিখেছিলেন কেন এবং কোন্ উদ্দেশ্য-সাধনে, সেটা একটু জেনে নেওয়া ভালো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি যে, সমসাময়িককালে বোম্বাই অঞ্চলে একজন সাহেব তার ব্রাহ্মণ কর্মচারীকে পদাঘাত করেছিল। এই ঘটনায় সমগ্র দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, দেখা দিয়েছিল জনচিত্তে আলোড়ন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করার ঘটনাকে নিন্দা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথও এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ওভারটুন হলে এক জনসভা হয়—সেখানে রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজ-প্রতিষ্ঠানের যে যে আদর্শ তুলে ধরলেন, তাতে অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে, কবি বুঝি হিন্দুর প্রাচীন বর্ণাশ্রমপ্রথা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার পক্ষপাতী। অবশ্য অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কারুর কারুর একথাও মনে হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের যে রূপ তুলে ধরেছেন, তা দেশ-কালের বিপরীত। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন: 'ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল ও স্বার্থসংগ্রামের বাহিরে তপোবনে ধ্যানাসনে অধ্যাপকের বেদীতে আহ্বান করিতেছে—ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া ভারতবর্ষ আপনার অবমাননা দূর করিতে চাহিতেছে।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪, পৃঃ ৩৯৭) এই প্রসঙ্গে আমরা কবির 'হিন্দুত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩, পৃঃ ৫১৮-১৯) কথা স্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি হিন্দুর একনিষ্ঠতা ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষেই সওয়াল করেছেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার (কার্তিক, ১৩৪৮, পৃঃ ১০-১৩) অনুসরণে আমরা দেখতে পাই যে, ১৩০৯ সনের ৭ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজকুমারকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি বলেন: 'ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতিতে আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি।...আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে অনুভব করিয়া সেই আদর্শকে ক্ষত্রিয় সমাজে প্রচার করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্ত্বিক ভাবকে তোমরা বরণ করিলে চলিবে না।...ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীর্য না থাকিলে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা কোথায়?'

একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্ম হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় অনেক বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। সম্ভবত তাঁর চিন্তার জগতেও কখনও কখনও দেখা দিয়াছে নিঃস্বতার জটিলতা।

প্রভাতকুমার বলেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৪): রবীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে আদমসুমার

গ্রহণের সময়ে হিন্দুব্রাহ্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন ; এবারও (১৯১১ সালে) তিনি বলিলেন, 'আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি।...আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বিশ্বজনীন, তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি।' এই সূত্রে আমরা কবির 'আত্ম-পরিচয়' প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮, পৃঃ ৪৫২-৭৪) কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি বলেছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা পেয়েছে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে এবং হিন্দু সংস্কৃতির উপরেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই কবির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ব-কৌমুদী'তে প্রকাশিত হল 'আদিসমাজ ও উন্নতি-শীল ব্রাহ্মসমাজ' (বাংলা ১৩১৯ সন, ১ বৈশাখ) নামে একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল কবিকে আঘাত করা, কবির বক্তব্যকে সমালোচনা করা। কবি তাই প্রত্যুত্তরে ওই 'হিন্দুব্রাহ্ম' প্রবন্ধ লেখেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ)। ওই প্রবন্ধের মাধ্যমে কবি সরাসরি 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকাকে আক্রমণ করেন, বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে, ইহা সম্প্রদায় মাত্র।' অর্থাৎ, তিনি স্পষ্ট করেই ঘোষণা করলেন যে, হিন্দুত্বের আধারেই ব্রাহ্মধর্মের নিবাস।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্রম-বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, সেখানেও তিনি সনাতনী। আমরা 'রবীন্দ্রজীবনী'র (দ্বিতীয়, পৃঃ ৫১) অনুসরণে দেখতে পাই : "ব্রহ্মবান্ধবের (উপাধ্যায়) ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বোর্ডিং বিদ্যালয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমরূপ গ্রহণ করিল। শিষ্যরা গুরুগৃহে যেন বাস করিতেছে, ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ হইলেন গুরুদেব। এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের জুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন সার্বজনিক ; তবে আহারস্থানে বর্ণভেদ মানাই আবশ্যিক।"

আচারে-বিচারে-আহারে সেই আশ্রমবিদ্যা-লয়েও বর্ণাশ্রমের রীতিনীতি প্রবর্তিত হল। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। জাত-পাতের বিচার থেকে সেই আশ্রমও মুক্তি পায়নি।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রাহ্মণসত্তা কতটা প্রবল ছিল, সেটা আশ্রমবিদ্যালয় প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমারের কথাতেই জানতে পারি : 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে প্রাতে ও সায়াহ্নে ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। উপাসনার সময় কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শুচিস্নাত দেহমনে একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসনান্তে পূর্বতন গ্রন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া বেদমন্ত্র গাহিত ; ...অতঃপর ছাত্রেরা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া প্রণাম করিয়া বন-ছায়াতলে গিয়া পাঠ আরম্ভ করিত। কিন্তু একদিন অ-ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের পদধূলি গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছিল।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫২)।

শুধুমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েই নয়, যখনই কোন অব্রাহ্মণকে নিয়ে সামাজিক বা ধর্মীয় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তখনই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় পিতার অনুসরণে একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও পড়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীতে দেখি : 'শান্তিনিকেতনের পরি-চালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অশান্তি দুই-মাসের মধ্যেই দেখা দিল। অশান্তি বাধিল কবির আদর্শীকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া। আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় নিয়ম হয় যে, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি

লইয়া প্রণাম করিবে। সমস্যা বাধিল কুঞ্জলাল ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ, তাহার উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম। কায়স্থ অধ্যাপককে প্রণাম করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যার সৃষ্টি।' (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭)।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে শুধুমাত্র কায়স্থ নয়, কুঞ্জলাল ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্ম হয়েও তিনি কায়স্থ, আবার সাধারণ ব্রাহ্ম হয়েও তিনি আদি ব্রাহ্মের সগোত্র নন। দুদিক থেকেই তিনি ছিলেন বিজাতীয়। শেষপর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষায় এই সমস্যার সমাধান সাধনে কবি নিজে যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, তা আমরা জানতে পারি আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠি থেকে (স্মৃতি, পৃঃ ১৪-১৫)। কবি লিখছেন: 'প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে, ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।'

কবিপত্নীর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩০৯ সনের ৭ অগ্রহায়ণ। আর মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কবি চিঠিটি লেখেন ১৯ অগ্রহায়ণ। কবির এই মানসিকতা এবং আশ্রমের স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭) লিখেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের আদর্শ-বাদ বা উপদেশ অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনে ও আচরণে কোনদিনই কোনো রেখাপাত করিতে পারে নাই। কেহ তাঁহার সাহিত্য, কেহ তাঁহার কলাচর্চা, কেহ তাঁহার সংগীতকে জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তাঁহার ধর্মসাধনা বা তাঁহার প্রগতিশীল সমাজভাবনাকে জীবনে রূপদান করিয়াছেন।'

রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধী চিন্তাধারার পরিণাম সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করেছেন। আসলে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, আশ্রমবিদ্যালয় সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তনের কথা বললেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চরম সনাতনী। তাই, 'বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, প্রবন্ধ-রচনায় যতই যুক্তিতর্কের অবতারণা করুন, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্ল্যানচেটে মিডিয়াম প্রভৃতির আলোচনা করিতে দেখিলে অবাক হইতে হয়। আলমোড়া হইতে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রের মধ্যে তিনি প্ল্যানচেটের কথা বলিতেছেন। তাঁহার শরীর ও মন যখন স্বাভাবিক অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িত, তখনই তিনি এইসব তথাকথিত অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি মন দিতেন। কোষ্ঠীর ফলাফল মানিতেন কিনা জানিনা, তবে কোষ্ঠী লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেন। শিলাইদহ হইতে একবার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, রথীর কুষ্ঠি পরীক্ষা করতে দিতে হবে।'

প্রভাতকুমারের এইসব উক্তি রবীন্দ্রনাথের সত্যরূপকেই উদ্‌ঘাটন করে। হিন্দুসমাজের সকল রীতিনীতিকে মেনে নিয়েই তিনি ব্রাহ্ম হতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি আর অন্তরে ব্রাহ্ম হতে পারেননি, যদিও মৌখিকভাবে হওয়ার প্রয়াসী ছিলেন।

আমরা রবীন্দ্রজীবনীতেই দেখেছি যে, বৈদিক-মতে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পাদিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথেরও উপনয়ন সম্পন্ন হয় যথাবিহিত উপচারে। রবীন্দ্র-নাথের উপনয়ন সম্পর্কে প্রভাতকুমার বলেছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮): "...৮৭৩ মাঘোৎসবের পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই

অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কার্য করেন।…ব্রাহ্মণ মাত্রেই জানেন যে, উপনয়নের পর নতুন ব্রহ্মচারীকে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, 'নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রীমন্ত্রটা জপ করার দিকে খুব-একটা ঝোঁক পড়িল।'"

প্রভাতকুমারের জবানীতে আমরা আরও জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯): 'রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একসময় পর্যন্ত উপনয়নাদি হিন্দুসংস্কারে বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমরা দেখিতে পাই তিনি যথাবিধি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন করেন।…কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য বৃথাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল এইসব সামাজিক আচারকে স্বয়ং মানিয়া চলিয়াছিলেন।' শুধু নিয়মরক্ষার মত উপনয়ন নয়, একেবারে গোঁড়া ব্রাহ্মণের মত মুণ্ডিত মস্তকে উপনয়ন। তাই দেখি: 'উপনয়নের পর মুণ্ডিত মস্তকে কেমন করিয়া ফিরিঙ্গি বিদ্যালয়ে যাইবেন, এই ভাবনায় যখন বালক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ, এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা এবার তাঁহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন।'

রথীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে আমরা জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫): 'ইতিমধ্যে (১৮৯৮) স্থির হইল রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রের উপনয়ন হইবে।…(আদি ব্রাহ্মসমাজে) বর্ণভেদ স্বীকৃত হইত—বিবাহাদি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত নিষ্পন্ন হইতে পারিত না—উপনয়নাদি যথাবিহিত সম্পাদিত হইত; পৌরোহিত্যাদি কর্মে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না।…মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রথীন্দ্রের উপনয়ন হইল শান্তিনিকেতনে (১০ বৈশাখ, ১৩০৫)।…রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন নয় বৎসর মাত্র…এই অনুষ্ঠানে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়।…যথানিয়ম রথীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মণ বটুর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র লইয়া ঘুরিতে ও তিনদিন শূদ্রাদির মুখদর্শন না করিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়।'

বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ কতটা গোঁড়া ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ কতটা পিতৃপ্রভাবে আচ্ছাদিত ছিলেন, তা আমরা জানতে পারি তরুণ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীর দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রসঙ্গে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন, যাতে তাঁর আর দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার আয়োজন না হয়।

ভারতবর্ষের ধর্ম-আন্দোলনে ব্রাহ্মধর্মের ছায়া বা প্রভাব কতটা পড়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের উপর ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব পড়েছিল, সন্দেহ নেই—যে প্রভাব ছিল ক্ষণকালের। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন ব্রাহ্মধর্মের অসারতাই প্রমাণ করে দিয়েছিল। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে এপ্রসঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের একটা মৌলিক দুর্বলতার কথাই স্মরণীয়। সেটা হচ্ছে এই যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের দুর্গরূপে চিহ্নিত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ব্রাহ্মণত্ব বজায় রেখে ব্রাহ্ম হতে চেয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের অসারতাই হয়েছে প্রমাণিত।

ভ্রম-সংশোধন

এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের উপান্ত্য পঙ্‌ক্তিতে 'ব্রাহ্মণ' স্থলে 'ব্রাহ্ম' পড়িতে হইবে।

আশ্বিন, ১৩৮৭ সংখ্যার সূচীপত্রের শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'প্রচ্ছদপট'-এর স্থলে 'প্রচ্ছদপট ও শ্রীশ্রীদুর্গার চিত্র' পড়িতে হইবে।

উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদপ্রথা ধীরে ধীরে বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে। জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরণের যে রীতি জড়িত ছিল ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই উচ্চজাতিগুলির মধ্যে তা কিছুটা শিথিল হয়ে যায়, এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ায় নিম্ন জাতির লোকেদের মধ্যেও ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা অনুসারে বৃত্তিগ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যে শিল্পায়নের দিকে ধনতান্ত্রিক বিনিময়-প্রধান অর্থনীতির (Exchange Economy) স্বাভাবিক গতি থাকে, ভারতে সেই শিল্পায়নের পথে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকেরা আপন স্বার্থেই নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের দেশে কলকারখানা-নির্ভর শিল্প এবং নাগর সভ্যতার প্রসার দুই-ই ব্যাহত হয় এবং জাতিভেদপ্রথার পতনও বিলম্বিত হয়।

জাতিভেদব্যবস্থার সঙ্গে যে সকল সামাজিক কুপ্রথা দীর্ঘকাল জড়িত ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর একাংশ সে সম্বন্ধে সচেতন হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে আমাদের দেশে যে ধর্ম ও সমাজসংস্কার-মূলক আন্দোলনগুলি দেখা দেয়, সেগুলির অধিকাংশই স্বল্প বা অধিক-মাত্রায় জাতিভেদ-বিরোধী ছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদ-প্রথাকে আমাদের ঐহিক সুখের পরিপন্থী ও জাতীয় ঐক্য-বিনাশকারী বলে বর্ণনা করেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ঈশোপনিষৎ'-এর ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, পানাহারের ব্যাপারে প্রচলিত বিধিনিষেধের সামান্যতম লঙ্ঘনেও লোকের জাতি-নাশ হয়, কিন্তু মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাসাক্ষ্যদান, চুরি, এমন কি নরহত্যা করলেও কেউ জাতিচ্যুত বা সমাজে কলঙ্কিত হয় না। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত **The Brahmunical Magazine** বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন যে, জাতিভেদপ্রথাই আমাদের সমস্ত অনৈক্যের মূল। এর দুই বৎসর পর তাঁর 'কেনোপনিষৎ'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং সেই বইএর ভূমিকাতেও রামমোহন মন্তব্য করেন যে, জাতিভেদপ্রথার সামাজিক নিয়মগুলি কঠোর ভাবে বলবৎ করা হলে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যগুলিও বিনষ্ট হবে।[১] রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভার অধিবেশনগুলিতেও ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দেই জাতিভেদ-প্রথার নিরর্থক ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ-গুলির কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হত বলে জানা যায়।[২] ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়া-চার্যের লেখা জাতিভেদপ্রথার বিরোধী 'বজ্রসূচী উপনিষৎ'-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুআরি তারিখে লেখা একটি চিঠিতেও রামমোহন বলেছেন যে, জাতিভেদপ্রথা হিন্দুসমাজকে অসংখ্য ভাগে খণ্ডিত করে তাদের দেশপ্রেমের ভাব থেকে

---

১ K. Nag and D. Burman (eds.) **The English Works of Raja Rammohun Roy,** Part II (Calcutta, 1946), pp. 13, 51-52, 138.

২ **The Calcutta Journal,** dt. 18. 5. 1819, quoted in S. Das, **Selections From The Indian Journals,** Volume I, p. 159.

বঞ্চিত করেছে।[৩] ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের সমুদ্রযাত্রা যে সে-যুগের জাতিভেদপ্রথার রীতিবিরোধী ছিল, তা বলাই বাহুল্য। রামমোহনের অনুচর ও বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬) শুধু 'কালাপানিই' পার হন নি, স্বদেশে ও বিদেশে ইউরোপীয়দের সঙ্গে খানাপিনা করে এবং তার জন্য কোনো রকম প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করে তিনি সে-যুগের রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের, এমন কি তাঁর অনেক নিকট আত্মীয়-স্বজনের মনোবেদনার কারণ হন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আপন ব্যয়ে তিনি ক'লকাতা মেডিক্যাল কলেজের দুটি ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে নিয়ে যান।[৪]

রামমোহনের পরবর্তী যুগে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক যুক্তিবাদী ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) অনুবর্তী 'ইয়ং বেঙ্গল' দল জাতিভেদব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। এঁদের প্রভাবে পড়ে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান সে-যুগে উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজের 'প্রগতিশীল' ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই ১৬।১৭ বৎসর বয়সে সুরাপান ও গোমাংস ভোজনে বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশের ছিলেন, তাঁরা সন্ধ্যাহ্নিক পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইয়ে (১৯০৩) লিখেছেন,—"তাহাদিগকে (অর্থাৎ, এই ছাত্রদের) বলপূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমারের 'ইলিয়ড' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশসকল আবৃত্তি করিত।" কেহ কেহ "রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিলেই" 'আমরা গোরু খাই গো' বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত। ডিরোজিওর এক শিষ্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্য আদালতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হন, কারণ গঙ্গাজলের পবিত্রতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না।[৫] ডিরোজিওর অপর এক খ্যাতনামা শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮২২-৮৭) বর্ধমানের বিধবা মহারানী বসন্তকুমারীকে বর্ধমান থেকে ক'লকাতায় নিয়ে এসে ক'লকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের সামনে তাঁকে 'সিভিল ম্যারেজ' পদ্ধতিতে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ছিল সে-যুগে একাধারে বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বিবাহের নিদর্শন।[৬]

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ, বিশেষত কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) যুগ হতে, তাঁদের সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচীর মধ্যে জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বেদী হতে ব্রাহ্মণ আচার্যকে অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি বিষয়ে নবীন ব্রাহ্ম নেতারা,—কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী—বিশেষ সচেষ্ট হন। কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহর্ষি

---

৩ K. Nag and D. Burman (eds.) **Op. Cit.**, Part IV (Calcutta, 1947), p. 95.

৪ Kissory Chand Mittra, **Memoir of Dwarkanath Tagore** (Calcutta, 1870), pp. 74, 106-107 ; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সং) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' (কলিকাতা, ১৯৬২), পৃঃ ২৬০।

৫ শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (কলিকাতা, ১৯৫৭), পৃঃ ১০২, ১২১। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৬ রাজনারায়ণ বসু, 'আত্মচরিত' (কলিকাতা, ১৯৬১), পৃঃ ৭৬। প্রথম প্রকাশ-১৯০৯।

দেবেন্দ্রনাথ নিজের উপবীত ত্যাগ করেন, এবং তাঁর বাড়ীতে দুর্গোৎসবসহ সমস্ত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেন (১৮৫৯)। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মদের মধ্যে গোপনে প্রথম অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, এবং এর দুই বৎসর পরে, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবের অনুগামী ব্রাহ্মরা তাঁদের প্রথম অসবর্ণ এবং বিধবাবিবাহের প্রকাশ্য আয়োজন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে, উপাসনার সময় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্য বা উপাচার্য কখনোই বসতে পারবেন না, কেশব সেনের অনুগামীদের এই দাবী মহর্ষি গ্রহণ করতে পারেন নি, এবং তারই ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেনের অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।[৭] ব্রাহ্মসমাজে এরপর বহু অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হয়েও রামতনু লাহিড়ীর (১৮১৩-৯৮) মতো আদর্শবাদী শিক্ষক ও সংস্কারক জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য প্রকাশ্যে তাঁর পিতৃদত্ত উপবীত ত্যাগ করেন (১৮৫৬) এবং এর জন্য বহু সামাজিক উৎপীড়নও সহ্য করেন।[৮] উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং সত্তরের দশকে তাঁর কৌলীন্য ও বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দুটিই মূলত জাতিভেদপ্রথার বিরোধী ছিল। যে রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশ ছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই সম্প্রদায়েরই একজন হয়ে যেন তাঁদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য অপর এক রাঢ়ী কুলীন রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। বিদ্যাসাগরের প্রথম আন্দোলনটি আইনের সমর্থন লাভে সফল হয়, দ্বিতীয়টি হয় নি; কিন্তু দুটিই সে-যুগের শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়।[৯] বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ও বহুপত্নীক ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গের তারপাশা অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে স্বরচিত গান গেয়ে ও বই লিখে কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেন।[১০]

বাংলা দেশে ধর্মপ্রচাররত খ্রীষ্টান মিশনারি নেতৃবৃন্দও জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে চিরকাল সোচ্চার ছিলেন, এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা বিবাহ বা আহারাদির ব্যাপারে কোনো জাতিভেদ স্বীকার করতেন না, যদিও শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি কেরী ও ওয়ার্ড সাহেব তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য করেন নি (১৮০২)। ব্রাহ্মণের উপবীতকে তাঁরা সামাজিক আভিজাত্যের চিহ্ন বলেই গ্রহণ করেছিলেন, এর কোনো আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মূল্য তাঁরা দেন নি। তবে ধর্মান্তরিত

---

৭ Sivanath Sastri, **History Of The Brahmo Samaj,** Volume I, (Calcutta, 1911), pp. 137, 141, 151-156, 167-170, 178; প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (সং) 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী' (কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত), পৃঃ ৩৮, ৬১-৬২, ৭৫, ১৮০।

৮ Sivanath Sastri, **Op. Cit.,** Volume II, p. 225.

৯ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) এবং 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী : সমাজ' (১৩৪৫ সন) দ্রষ্টব্য।

১০ অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত' (১৮৮১) দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ (?) কৃষ্ণপ্রসাদ অল্পদিন পরেই ধর্মান্তরিত সূত্রধর কৃষ্ণ পালের কন্যাকে বিবাহ করে ১৮০) জাতিগত ব্যাপারে তাঁর ঔদার্যের পরিচয় দেন।[১১] স্কটিশ প্রেসবিট্যারিয়ান চার্চের পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফও জাতিভেদপ্রথার সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন, এবং একে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রধান ধারক বলে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর **India and India Missions** বইয়ে (১৮৪০) লিখেছেন,—"Idolatry and the superstitions are like the stones and bricks of a huge fabric and caste is the cement which pervades and closely binds the whole."[১২]

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, দক্ষিণ ভারতে রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারিরা এবং ট্র্যাঙ্কেবারের (Tranquebar) দিনেমার প্রোটেস্টান্ট মিশনের কর্তারা কিন্তু তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথাকে একটি অনিবার্য সামাজিক কুসংস্কার বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাঁরা বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে জাতিভেদব্যবস্থা মেনে চলতেন।[১৩] শূদ্র খ্রীষ্টান ও 'পারিয়া' (অস্পৃশ্য) খ্রীষ্টানের মধ্যে সেখানে কোনো সামাজিক যোগাযোগ ছিল না।[১৪]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নব্য হিন্দুবাদের প্রধান উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দও (১৮৬৩-১৯০২) জাতিভেদপ্রথার অর্থহীন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বহু অব্রাহ্মণ, এমন কি অহিন্দু শিষ্যকে তিনি প্রণবযুক্ত মন্ত্রে বা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি একবার বলেছিলেন, "ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।" আমেরিকায় যাঁদের তিনি মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি গুণে ব্রাহ্মণ বলে মনে করতেন।[১৫] ব্রাহ্মণেরা বহুকাল ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘৃণা করার ফলেই যে বর্তমান কালে জগতের ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছে, এ কথাও তিনি বলেছেন। উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি মন্তব্য করেছেন, "ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।... ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা। প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।"[১৬] আর একজন ভক্তকে (সুরেন্দ্রনাথ সেন) তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে inter-marriage-টা হওয়া দরকার, তা না

১১ J. C. Marshman, **The Life And Times Of Carey, Marshman And Ward** (London, 1859), Volume I, pp. 176-181.

১২ The Reverend Alexander Duff, **India And India Missions** (Edinburgh, 1840), p. 616.

১৩ E. Daniel Potts, **British Baptist Missionaries In India, 1793-1837** (Cambridge, 1967), p 158.

১৪ R. Heber, **Narrative Of A Journey Through The Upper Provinc of India** (London, 1828), Vol. III, pp. 444-445.

১৫ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (কলিকাতা, ১৩৬৯ সন), নবম খণ্ড, 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ', পৃঃ ৪০৯

১৬ ঐ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৭

হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।"[১৭] অস্পৃশ্যতার নিন্দাতেও বিবেকানন্দ চিরদিন মুখর ছিলেন। "ছুঁৎমার্গ হিন্দু ধর্ম নয়, শাস্ত্র-বহির্ভূত প্রাচীন আচার মাত্র", একথা তিনি নানাস্থানে বলেছেন। মাদ্রাজে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত, কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[১৮] অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধিবিচারকেও বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই; আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর···। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে!"[১৯] দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৎকালীন হিন্দু-সমাজের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণী থেকে আত্মসমালোচনার এই অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুধর্মের গৌরবের কথা গ্রহণ করে বৃথা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার মতো উদারতা বা সাহস তাঁদের ছিল না। স্বল্পায়ু বিবেকানন্দও তাঁর সন্ন্যাসজীবনে কোনো সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ পান নি। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজীর স্থাপিত মঠে হিন্দু আচারনিষ্ঠা সর্বথা পালিত হয় না, এ রকম সমালোচনাও সে-যুগের বহু রক্ষণশীল হিন্দু করতেন, কিন্তু স্বামীজী তাতে কর্ণপাত করেন নি।[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রণীত কয়েকটি আইনও জাতিভেদপ্রথার কঠোরতা হ্রাস করতে সাহায্য করে। এই আইনগুলির মধ্যে প্রথমেই ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের Lex Loci Act বা Castes Disabilities Removal Act উল্লেখযোগ্য। স্বধর্মত্যাগের ফলে জাতিচ্যুত হলেও কোনো হিন্দু পিতৃধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না, এটাই ছিল এই আইনের নির্দেশ। এই ধরনের একটি আইনের জন্য শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করছিলেন। ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফও এ-বিষয়ে সচেষ্ট হন। অপরদিকে 'সমাচার চন্দ্রিকা'-র মতো রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি জাতিরক্ষার সঙ্গে উত্তরাধিকারের সংযোগকে হিন্দুধর্মের পক্ষে একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচনা করতেন। যাই হোক, মিশনারিদের আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত সফল হয়।[২১] এই আইনের বিরুদ্ধে ক'লকাতায় হিন্দুরা সভাসমিতি করেন, এবং বিলাতে পার্লামেন্টের কাছেও একটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোনো সভ্য নাকি এই আবেদনে স্বাক্ষর করেন নি।[২২]

এর পরের আইনটি হচ্ছে Act XV of 1856 যার দ্বারা হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ আইনের

---

১৭ ঐ, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২০; ১৮ ঐ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৯৯; ১৯ ঐ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮

২০ ঐ, নবম খণ্ড, পৃঃ ২২৪; C. H. Heimsath, **Indian Nationalism And Hindu Social Reform**, (Princeton, 1964), p. 27.

২১ E. Daniel Potts, **Op. Cit.**, pp. 222-223; C. Ilbert, **The Government of India** (London, 1898), p. 392.

২২ সম্পাদকীয় মন্তব্য, 'সংবাদ প্রভাকর', ২৪শে ফাল্গুন, ১২৫৮ সন; বিনয় ঘোষের **'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'**, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ দ্রষ্টব্য।

অনুমোদন লাভ করে। হিন্দুসমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কোনো কোনো জাতির মধ্যে এবং বৈষ্ণব 'নেড়া-নেড়ীদের' মধ্যে বিধবাবিবাহ চিরকালই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি উচ্চজাতির লোকেরা কোনদিনই বিধবাবিবাহ করতেন না, এবং নিম্নজাতির লোকদের জাতিমর্যাদা-বৃদ্ধির একটি পন্থা ছিল আপন সমাজে বিধবাবিবাহের নিবর্তন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-আন্দোলনকেই তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' বলে বর্ণনা করেছেন, এবং এর জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেও হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে এ-ধরনের বিবাহ আজও তেমন আদৃত হয় নি, বিধবাবিবাহ কোথাও ঘটলে আজও তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে।[২৩] বিদ্যাসাগরের পর কেশব সেনের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ বিধবাবিবাহ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১৩টি ব্রাহ্মবিবাহের মধ্যে ৫টিই বিধবা-বিবাহ। বরাহনগরের ব্রাহ্ম নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি নিজে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরে দ্বিতীয়া পত্নীর সহায়তায় অন্যূন ৪০ জন হিন্দু বিধবার সৎপাত্রে বিবাহ দেন। পাত্রীদের মধ্যে অন্ততঃ একজন তাঁর নিকট আত্মীয়া ছিলেন এবং পাত্রটি এক্ষেত্রে সম্পত্তিসম্পন্ন হলেও পাত্রীর তুলনায় নিম্নজাতীয় (সদ্‌গোপ) ছিলেন। শশীপদবাবুকে এই বিবাহের জন্য নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে পানাহার ত্যাগ করেন, এবং তাঁর বাসগৃহেরও ক্ষতি করা হয়।[২৪]

জাতিভেদপ্রথার বিরোধী তৃতীয় আইনটি হচ্ছে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের Special Marriage Act বা Act III of 1872। এই আইনে বলা হয় যে, যে কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বৈধভাবে অন্য যে কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো নারীর পাণিগ্রহণ করতে পারবে, যদি তারা এই বিবাহকে আইনত নথিভুক্ত (register) করে, এবং ঐ সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম বা ঐ ধরনের কোনো প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাস করে না। প্রধানত কেশব সেনের অনুগামীদের চেষ্টায় এই আইনটি গৃহীত হয় এবং ব্রাহ্মরা যে ধরনের অসবর্ণ বিবাহ অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছিলেন, সমাজের চক্ষে সেগুলির বৈধতা প্রতিপাদনের জন্যই এ-ধরনের আইনের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতারা নিজেদের 'ধর্মহীন' বলে ঘোষণা করে বিবাহ করাটা আদৌ সম্মানজনক বলে মনে করেন নি। বিবাহ ব্যাপারটি এর ফলে একটি ধর্মীয় সংস্কার থেকে সামাজিক চুক্তিতে পরিণত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে যতগুলি ব্রাহ্মবিবাহ হয়েছিল (আদি ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে), তার প্রায় সবকয়টিই এই 'তিন আইনের' শর্ত অনুসারে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয়েছিল ১৪ বৎসর এবং ছেলেদের ১৮ বৎসর। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কেশব সেন নিজেই এই শর্ত লঙ্ঘন করে কুচবিহারের নাবালক মহারাজার সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের আয়োজন করেন তেরো বৎসর বয়সে। এর ফলে কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের বিরোধ বাধে,

---

২৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৪ Sitanath Tattvabhushan, **Social Reform In Bengal** (Calcutta, 1904), pp. 4-5, 89-92.

এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল ব্রাহ্মেরা কেশবের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫]

সব শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের Age of Consent Act বা সহবাস-সম্মতি আইনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজে মেয়েদের বিবাহের বয়স ছিল ৫।৬ থেকে ৯।১০ বৎসরের মধ্যে।[২৬] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল, এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৭৭২ শকাব্দ) বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন।[২৭] ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের আইনে কার্যত মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স দশ বৎসর ধার্য করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে এই আইনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন, এবং মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স আরো দুবৎসর বাড়ানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ক'লকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও এই আইনের বিরুদ্ধে এক তুমুল অন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নানা স্থানে সভাসমিতির আয়োজন করে আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয়, এবং লজ্জার বিষয়, এই সব সভাসমিতিতে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু স্নাতকের, এমন কি ব্যবহারজীবী ও চিকিৎসকদের উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দুদের জাতিভেদপ্রথা ও যৌথপরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এই সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে Age of Consent Act গৃহীত হয় সত্য, কিন্তু এই আইনকে অবিলম্বে সারা দেশে কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।[২৮] এই চারটি আইন ছাড়াও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সারা দেশে ফৌজদারী আইনের সমতা আনা হয় এবং জাতিপঞ্চায়েতগুলির বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা লোপ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার যে স্বেচ্ছায় ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গলবিধানের জন্য জাতিভেদপ্রথাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, কিছুটা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এবং কিছুটা নানা গোষ্ঠীর চাপে ও আন্দোলনের ফলে তাঁরা উপরে উল্লিখিত আইনগুলি গ্রহণ করেন। তবে আইন গ্রহণ করলেও সমাজে সেগুলি অবিলম্বে বলবৎ করা সব সময় সম্ভবপর হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী স্বভাবতই শাসিতদের সমাজে এমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে চান নি, যার ফলে তাঁদের প্রশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়। তাছাড়া ব্রিটিশ সমাজেও এই সময়ে অভিজাত ও সাধারণ লোকের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান ছিল। সুতরাং ভারতে জাতি-বৈষম্য তাঁদের দৃষ্টিতে সহনীয় মনে হয়েছিল।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-

---

২৫ C. H. Heimsath, **Op. Cit.**, pp. 92-95 ; Sivanath Sastri, **Op. Cit.**, Vol. I, pp. 251, 274, 285-290 ; Meredith Borthwick, **Keshub Chunder Sen : A Search For Cultural Synthesis** (Calcutta, 1977), pp. 142-144, 187 ; উপাধ্যায় গৌর-গোবিন্দ রায়, 'আচার্য কেশবচন্দ্র', পৃঃ ৯৩৭-৯৩৯ এবং ৫৩ অধ্যায়।

২৬ পঞ্চানন মণ্ডল, 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র', প্রথম খণ্ড (বিশ্বভারতী, ১৯৬৮), পৃঃ ১১৯

২৭ বিনয় ঘোষ, 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র', তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃঃ ৫৩৫-৫৪১

২৮ N. K. Sinha, **The History of Bengal (1757-1905)**, (Calcutta, 1967), P. Sinha's article on 'Social Change', pp. 407-408 ; 'বঙ্কিম রচনাবলী' (সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৭ সন), 'বিবিধ', পৃঃ ৩৮০

মূলক আন্দোলন এবং সরকারী আইনের চেয়েও জাতিভেদপ্রথাকে দুর্বল করে দেওয়ার ব্যাপারে অনেক বেশী কার্যকরী হয়েছিল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নতুন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নাগর সমাজের প্রসার (Urbanization)। এই নাগর সমাজ আমাদের দেশে ধীরে ধীরে এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে ডিরোজিওর শিষ্যেরাই বোধ হয় প্রথম ক'লকাতায় হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমাদের সনাতনী সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরায়। কিন্তু ক'লকাতার ধনী হিন্দুদের স্বেচ্ছাচারিতায় জাতির বন্ধন যে ডিরোজিও যুগের পূর্ব হতেই শিথিল হতে আরম্ভ হয়েছিল রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' পুস্তিকায় (১৮৭৫) 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গামের' বর্ণনাপ্রসঙ্গে তা সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। নিমতলার বিখ্যাত (কায়স্থ) মদনমোহন দত্তের পরিবারের যুবক কালীপ্রসাদ দত্ত অখাদ্য ভোজন ও মুসলমান উপপত্নী গ্রহণ করেও অর্থবলে নিজের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। রক্ষণশীল দলের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ধনী, একদা মদনমোহনের আশ্রিত, রামদুলাল দে (সরকার) তাঁর সহায়ক হয়ে দাঁড়ান ও অকাতরে অর্থব্যয় করেন। রামদুলাল নাকি এই উপলক্ষে পরিহাস করে বলেছিলেন,—"জাতি আমার বাক্সের ভিতর", অর্থাৎ টাকার সাহায্যে তিনি অক্লেশে জাতিগত বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করতে পারেন।[২৯] পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছেন যে, শুধু যে বিভিন্ন জাতির হিন্দুরা গোপনে একত্র পানাহার ও আমোদ-প্রমোদ করেন তা নয়, তাঁরা অনেকে বিজাতীয় ও বিধর্মীদের সঙ্গে গোপনে আহারের জন্য মিলিত হন, এবং উচ্চতম বর্ণের হিন্দুরাও নিষিদ্ধ আহার্য গ্রহণে সঙ্কুচিত হন না। সব শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন,—"Thousands of Hindoos daily violate the rules of the cast [sic] in secret and disavow it before their friends."[৩০] পাদ্রী ওয়ার্ড হিন্দুধর্মবিরোধী ছিলেন বলে তাঁর বিবরণকে আমাদের একদেশদর্শী বা পক্ষপাতপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) বইয়ে অভিযোগের সুরে লিখেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই ক'লকাতার হিন্দুদের মধ্যে জাতিগত আচারত্যাগের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। অন্ততঃ কেউ কেউ পিতামাতার মৃত্যুর পর যথারীতি অশৌচপালন এবং শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধ করতেন না। অশৌচকালের মধ্যে 'ব্রাণ্ডি'-পান এবং অন্যান্য সময়ে বাজারে রান্নাকরা মাংস, মিঠাই ও মুসলমানের দোকানের পাউরুটি ও শরাব সেবন করতে অনেককে দেখা যেত। কোনো কোনো ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্নিক ত্যাগ করার প্রবৃত্তিও দেখা গিয়েছিল।[৩১] বলা বাহুল্য নগর-জীবনের স্বাধীনতাই তাঁদের এই ব্যাপারে সাহস ও মনোবল যুগিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে রাজা রামমোহন রায়ও মুসলমানী পোশাক ও পানাহারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন।[৩২] ডিরোজিওর শিষ্যেরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও

---

২৯ রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', পৃঃ ৩৪-৩৫, মদনমোহন কুমার, 'রামদুলাল দে' (কলিকাতা, ১৯৭৬), পৃঃ ২৭-২৮

৩০ W. Ward, **A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos,** Vol. III (London, 1820), pp. xv-xvii, 183.

৩১ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা কমলালয়', পৃঃ ১০-১১

৩২ S. D. Collet, **Life and Letters of Raja Rammohun Roy,** edited by D. K. Biswas and P. C. Ganguli, pp. 230-232.

নীতি বা আদর্শের জন্য সনাতনী জাতিগত আচার লঙ্ঘন করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯) লিখেছেন যে, সুরাপান ও সাহেবী-খানা গ্রহণকে ডিরোজিওর শিষ্যেরা "সুসংস্কৃত ও জ্ঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্য্য" বলে বিবেচনা করতেন।[৩৩] হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের মুসলমানের দোকানে 'বিস্কুট' ভক্ষণের ঘটনা নিয়ে রক্ষণশীল দলের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও প্রগতিশীল দলের পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র মধ্যে যে লেখনী-যুদ্ধ চলেছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় তার উপভোগ্য বিবরণ পাওয়া যাবে।[৩৪] কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯) তাঁর 'বোধেন্দুবিকাশ' বইটিতে (১২৭০ সন) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের সামাজিক বিশৃঙ্খলার এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েই তিনি লিখছেন :

"ফিরেছে সবার মতি নাহি পূজে ভগবতী।
আহারের সময়েতে ভগবতী চলেছে ॥
পায়ে দিয়ে বাঁকা বুট দাঁতে কাটে বিস্কুট।
গো টু হেল ড্যাম হুট মা বাপেরে বলেছে ॥"[৩৫]

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আহারাদির ব্যাপারে জাতিগত বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা ক'লকাতা শহরে অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ব্যবসায় ও চাকরির জন্য অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকেও লোকে ক'লকাতায় আসা-যাওয়া অথবা বসবাস করতেন। অনেক সময় বিদেশী ও বিধর্মীদের পরিচালিত 'হোটেল-রেস্তোরাঁয়' তাঁদের পানাহার করতে হত। যাঁরা হিন্দু 'হোটেল' বা 'মেসে' আহারের ব্যবস্থা করতেন তাঁদের পক্ষেও সব সময় স্বজাতীয় বা ব্রাহ্মণ পাচকের হস্তের রন্ধন জুটত না, কারণ কোনো হোটেলের মালিকের পক্ষে বিভিন্ন জাতির ভোজনার্থীর জন্য বিভিন্ন রন্ধনশালা বা ভোজনাগারের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর ছিল না। এই সব ভোজনার্থীরা গ্রামে আপন আপন বাড়ীতে রন্ধনের ব্যাপারে এক ধরনের শুচিতা রক্ষা করতেন, আর শহরে এসে শুচিতার অন্য মানদণ্ড ব্যবহার করতেন।[৩৬] সে-যুগের একটি বহুল প্রচারিত ছড়া ছিল :

"জাত মারলো তিন সেনে—
স্টেসেন, উইলসেন ও কেশব সেনে।"

কেশব সেনের কথা আগেই বলা হয়েছে, উইলসন ছিলেন Great Eastern Hotel-এর মালিক, আর স্টেসেন হচ্ছে রেল স্টেশন।[৩৭] ক'লকাতার বাইরে সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলেও আহারাদির ব্যাপারে জাতিরক্ষার নীতি কিভাবে এ-সময় লঙ্ঘিত হচ্ছিল, বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী পাঠ করলে তা বেশ বোঝা যায়। শ্রীহট্টের শহর-অঞ্চলে উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল পরিবারের যুবকেরা উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে নিষিদ্ধ মাংসাদি গোপনে আহার করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করতেন, যদিও প্রকাশ্যে সমাজবিধি-লঙ্ঘনের সাহস এঁদের অনেকেরই ছিল না। বিপিনচন্দ্র আরো লিখেছেন যে, বাল্যকালে নবদ্বীপের জনৈক গোস্বামী-তনয় শ্রীহট্টে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। ইনি বন্য বরাহের মাংস বড়ো ভালবাসতেন, এবং

৩৩ রাজনারায়ণ বসু, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১

৩৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড, ১৮১৮-৩০ (কলিকাতা, ১৩৫৬ সন), পৃঃ ১৩৫-১৩৬

৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়', দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা, ১৯১৪), পৃঃ ১৪৩৯

৩৬ G. S. Ghurye, **Caste and Class in India** (Bombay, 1957), pp. 208-209.

৩৭ ক্ষিতিমোহন সেন, 'জাতিভেদ' পৃঃ ১৪৮

বিপিনচন্দ্রের মা স্বয়ং গোপনে সে মাংস রন্ধন করে দিতেন।[৩৮]

পানাহার ভিন্ন অন্য বিষয়েও জাতিগত বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ক'লকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উচ্চ-বর্ণের হিন্দু ছাত্রদেরও পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যিক হয়ে উঠে। বৈদ্যজাতীয় মধুসূদন গুপ্তই প্রথম এ-কাজ করতে এগিয়ে আসেন। ভিন্ন জাতির শব স্পর্শ করলে আগের যুগে জাতিচ্যুত হওয়া অনিবার্য ছিল।[৩৯] ট্রেনে ও স্টীমারে যাতায়াতের সময়ে জাতিগত ব্যবধান রক্ষা করা প্রায়ই সম্ভবপর হত না। পণ্ডিতেরা তখন বিধান দেন যে, বৃহৎ কাষ্ঠের উপর বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্র শয়ন বা ভোজনে দোষ নেই।[৪০] ক'লকাতার সংস্কৃত কলেজে আগে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির ছাত্রদের অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের দ্বার কায়স্থদের জন্য উন্মুক্ত করেন, এবং এর দু বৎসর পরে তিনি সরকারী শিক্ষা পরিষৎকে জানান যে, সর্বশ্রেণীর সম্রান্ত হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দেওয়ার সময় এসেছে। ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের পণ্ডিতদের মনে আঘাত না দেওয়ার জন্য ক'লকাতার এক সম্রান্ত সুবর্ণবণিকের পুত্রকে ঐ কলেজে প্রবেশাধিকার দেন নি। কিন্তু তাঁর অবসর গ্রহণের পাঁচ বৎসর পরে (১৮৬৩) সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা অ্যাটকিনসন সাহেবের (W. S. Atkinson) নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের দ্বার জাতিবর্ণনির্বিশেষে সব হিন্দু সন্তানের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।[৪১] অন্যদিকে ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে শুধু বৈদ্য জাতির সন্তানেরা শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সব জাতির ছাত্রের জন্যই এই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ছাত্রেরাও এখানে প্রবেশাধিকার পায়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বৎসর পরে মেডিকেল কলেজের ৫০ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন জন ছিলেন বৈদ্যজাতীয়। অন্যদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ১৫ জন কায়স্থ, ৬ জন তন্তুবায়, ২ জন সুবর্ণবণিক এবং অবশিষ্টেরা অন্যান্য জাতির।[৪২] ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হলে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিছু রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান এর ফলে কলেজ ত্যাগ করলেও কলেজের সুনাম এবং ঐতিহ্যের কোনো

৩৮ বিপিনচন্দ্র পাল, 'সত্তর বৎসর—আত্মজীবনী', পৃঃ ৮০-৮৫, ১২১

৩৯ L. S. S. O'Malley, **Modern India and the West**, p. 367 ; J. A. Richey, **Selections From Educational Records**, Part II, 1840-59, (Delhi, 1965), p. 313.

৪০ L. S. S. O'Malley, **Indian Caste Customs**, pp. 118-119.

৪১ সমকালীন, ফাল্গুন, ১৩৭৭, সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, 'বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী', পৃঃ ৫৫২-৫৬০

৪২ E. Leach and S. N. Mukherjee (eds.) **Elites In South Asia** (Cambridge, 1970), p. 58, quoting **Report On The Colleges And Schools For Native Education In Bengal for 1838-39**, published by the G. C. P. I, Calcutta, in 1840 ; J. A. Richey (ed.), **Op. Cit.**, p. 109.

ক্ষতি তাতে হয় নি।[৪৩] অন্যান্য সাধারণ স্কুল-কলেজেও বিভিন্ন জাতির ছাত্রেরা একত্র পড়াশোনা ও খেলাধুলার মধ্যে বড় হতে থাকে, এবং ছোট-বেলাকার এই মেলা-মেশা পরিণত বয়সে তাদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা জাতি-পার্থক্য ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে হ্রাস করার সহায়ক হয়। বিভিন্ন সভাসমিতিতে ও সার্বজনীন পূজায় নানা জাতির লোকের একত্র যোগদানও তাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ক'লকাতার উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল হিন্দুরাও ক্রমশঃ গঙ্গাজলের পরিবর্তে কলের জল পানে (তা চামড়ার মধ্য দিয়ে এলেও) অভ্যস্ত হন, ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ গ্রহণে তাঁদের আপত্তি ধীরে ধীরে দূর হয়। দেশী গুড়ের পরিবর্তে কলে পালিশ করা চিনি এবং চর্বিযুক্ত সাবান ব্যবহারে আপত্তিও প্রথমে শহরের ও পরে গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে দূর হয়।[৪৪] সমুদ্রযাত্রা করলেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এই বিধানও উনিশ শতকের শেষদিকে ক্রমশঃ অচল হয়ে পড়ে। এক কথায় বলা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য উৎপাদনব্যবস্থা এদেশে যে নতুন জীবনযাপনপ্রণালীর সৃষ্টি করে জাতিভেদপ্রথা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম হয়। সংঘবদ্ধ সমাজসংস্কার-আন্দোলন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। আমাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দু নবজাগরণ-আন্দোলন মিলে যাওয়ার ফলে ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা বাংলা দেশে অনেক হ্রাস পায়। কিন্তু নাগরিক জীবন ও নাগর সভ্যতার প্রসার ধীরে ধীরে জাতিভেদপ্রথার শিকড় যে ক্ষয় করে চলেছিল সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু দুটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথম, শহরাঞ্চলে জাতিভেদ-প্রথার প্রভাব যতটা হ্রাস পেয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে ততটা নয়। গ্রামাঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা নাগর সভ্যতার আলোক অনেক পরে প্রবেশ করে। জাতের দলাদলি এবং স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আমাদের পল্লীসমাজে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও কতটা প্রবল ছিল, তা অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত বাংলা উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই বোঝা যাবে। দ্বিতীয়ত, অন্য সব বিষয়ে জাতিভেদ-প্রথার বিধিনিষেধগুলি লঙ্ঘিত হলেও বিবাহের ব্যাপারে এই প্রথার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়টি অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলিই ব্রাহ্মবিবাহ। সব ব্রাহ্মেরা, এমন কি সব ভারতীয় খ্রীষ্টানেরাও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী সে-যুগে ছিলেন না।[৪৫] বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে আজও বাংলা দেশের হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ শতকরা কুড়িটি হয় কি না সন্দেহ!

---

৪৩ J. A. Richey, (ed.) **Op. Cit.**, p. 116 ; 'সংবাদ প্রভাকর', সম্পাদকীয় মন্তব্য, ১১।২।১৮৫৩।

৪৪ L. S. S. O'Malley, **Op. Cit.**, pp. 119-120.

৪৫ P. N. Bose, **A History of Hindu Civilization During British Rule in India** (Calcutta, 1894-96), Vol. II, p. 35.

সমালোচনা

নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা। সঙ্কলন, সম্পাদনা ও ভূমিকা : প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডি. লিট্. । প্রকাশক : শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। (১৩৮৬), পৃঃ ৪৬+ ১১৩, মূল্য : বারো টাকা।

বাংলা সাহিত্য যখন বোধনমন্ত্র উচ্চারণে ক্ষীণ-কণ্ঠ কিংবা মূক, আর বাগ্‌দেবীর পবিত্র বেদীতে পূজার ডালি শূন্যপ্রায়, অন্যদিকে রসসাহিত্য রঙীন ঘূর্ণীস্রোতে চতুর্দিক দিশাহারা,—তখন জীবনের গভীর উপলব্ধি ও মহৎ জাগৃতির দায়ব্রত নিয়ে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রন্থ বর্তমানকালে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আলোচ্য 'নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা' নিশ্চিতই একটি শোভন সংযোজন। ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার জাতীয় জীবনে নিবেদিতা এক অনন্য ব্যক্তিত্ব, বিবেকানন্দের আদর্শে আত্মনিবেদিতা ও আত্ম-উদ্বোধিতা হয়েই ইনি ভারতীয় অধ্যাত্ম-জীবন ও প্রেমের কবি-সাধিকা। গ্রন্থ-সম্পাদক নিবেদিতার এই পরমা প্রকৃতিটিকেই বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন নিবেদিতার স্ব-রচনার পরিবেশন-মাধ্যমে। গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রকাশন-ভূমিকাসূত্রে যথার্থই বলেছেন 'নিবেদিতার জীবন ও বাণী স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলব্ধ একটি মহাকাব্য। সে মহাকাব্যের মূল বিষয়বস্তু ভারতবর্ষ। তাই নিবেদিতাকে স্মরণ করার অর্থ স্বামীজীকে স্মরণ করা, তার মানেই ভারতবর্ষকে স্পর্শ করা, অন্তরে অনুভব করা।'

নিবেদিতার মহাজীবনের এই মর্মকথাকেই সম্পাদক-সঙ্কলক গ্রন্থকার যথাযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তিন স্তরে : এক ॥ প্রথমে নিবেদিতা সম্পর্কে একটি বিশেষ সুলিখিত ভূমিকা। সেখানে বহু মূল্যবান তথ্যযোগে এবং মনন-শোভন ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের বহুমুখী মহিমা—রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের মতো গুণীজনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা ও তাঁদের উপরে তাঁর সৃষ্টিধর্মী নিগূঢ় প্রভাব—লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা, কল্যাণকর্মের ও অধ্যাত্মবলের সর্বজয়ী স্বরূপ। সুদীর্ঘ এই ভূমিকা গ্রন্থটির একান্ত মূল্যবান সম্পদস্বরূপ। দুই ॥ ভূমিকা-অংশের পরেই মূল-গ্রন্থ দ্বিপর্যায়ে বিন্যস্ত : 'নিবেদিতা' ও 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এই 'নিবেদিতা' অংশেই কবি-সাধিকা নিবেদিতার পরম পরিচয় পাই তাঁরই কবিতায় : তাঁর ইংরেজীতে লেখা তিনটি গ্রন্থ থেকে এখানে নির্বাচিত হয়েছে দশটি কবিতা—নির্বাচন করেছেন সম্পাদক-সঙ্কলক স্বয়ং, এবং দশটি কবিতার বেশীর ভাগ অনুবাদ তাঁরই হাতের। ভাব-ভাষানুসারী এমন সার্থক অনুবাদ সত্যই প্রশংসাযোগ্য। জগন্নাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবাদ তিনটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটির শেষভাগ 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। এখানে ছেচল্লিশ জন কবির কবিতায় উদ্ভাসিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ ভাবমূর্তিটি। নিবেদিতাকে নিয়ে লেখা কবি বিবেকানন্দের ইংরেজী 'Peace' কবিতার বাংলা-অনুবাদ থেকে এর শুরু [অনুবাদক স্বামী নিরাময়ানন্দ] ; তারপরে মূল কবিতার অঞ্জলি-সংগ্রহে উল্লেখ্য নাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দিলীপকুমার রায়, বনফুল, অমিয় চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বাণী রায়, উমা দেবী, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং এমনি অতি আধুনিক কালেরও অনেকে। একলক্ষ্যমুখী এই

সুন্দর সঙ্কলনটিকে পরবর্তী সংস্করণে আরো পূর্ণাঙ্গ-শোভন করা যাবে—সঙ্কলক নিজেই তা যথাস্থানে উল্লেখ করেছেন।

সুলিখিত ভূমিকা, সার্থক অনুবাদ ও সুচিন্তিত নির্বাচন ও সঙ্কলনে এমন গ্রন্থ কমই চোখে পড়ে। সযত্ন ছাপা-বাঁধাই, ত্রিবর্ণ আবরণ-চিত্র মনোরম। সাহিত্যে অপসংস্কৃতির চতুর প্রসারের দিনে গ্রন্থটির সমাদর কামনা করি। **'চলমান'**

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) ত্রিপুরা-হাঙ্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণকার্য : বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৮০) ১,৪০৭টি ধুতি ও শাড়ি, ১,০৫৬টি পশমী কম্বল, ২,০৭৯টি পোশাক, ৬৫৪টি বাসনপত্র, ১,৩৩৯টি মাতুর, ১,০০৫টি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও ৭টি ট্রাংক ১,৩২০টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ১৭,১৫০ জন শিশু ও পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে দুধ ও পাউরুটি এবং ৮৪৮ জন ছাত্রছাত্রীকে বই, খাতা ও শ্লেট-পেনসিল দেওয়া হইয়াছে। তাছাড়া শচীন্দ্রনগরে বহির্বিভাগীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩,৫৯৭ জন পীড়িত ব্যক্তি চিকিৎসিত হইয়াছেন।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ : মালদা (১৯৮০'র বন্যায়) বন্যাত্রাণ : মালদা জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে প্রতিদিন প্রায় ২০,০০০ লোককে ২৫শে অগস্ট হইতে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রান্না-করা খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছে। কিছু বস্ত্রাদি বিতরণের পরেই এই ত্রাণকেন্দ্র বন্ধ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮'র বন্যায়) পুনর্বাসনকার্য : দিঘড়ায় 'নিশ্চিন্ত নীড়' সংলগ্ন আরও ৮৪টি গৃহের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুদ্ধারের কাজ অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ-খরাত্রাণ : বাঁকুড়ায় রামহরিপুর গ্রামে খরাপীড়িত দুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হইতেছে।

(গ) গুজরাত (১৯৭৯'র বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য : মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন জনগণের পুনর্বাসনকল্পে ভানালিয়া এবং লালবাগে গৃহনির্মাণ-কার্য সন্তোষজনকভাবে প্রাগ্রসর।

(ঘ) বিহার-বন্যাত্রাণ : কাটিহারের বন্যাদুর্গত জনগণের মধ্যে অরন্ধিত খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হইতেছে।

বিহার-খরাত্রাণ : জামসেদপুরের নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রামে খরাপীড়িত জনগণের সাহায্যার্থে গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যক সামগ্রী বিতরণ করা হইতেছে।

(ঙ) আসাম : গৌহাটি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ত্রাণকার্য : ১,৫০০টি ধুতি, ১,০০০টি শাড়ি, ৮০০টি শিশু-পোশাক ও ১০০টি পশমী কম্বল ৩,০০০ বন্যাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

(চ) অন্ধ্র : শ্রীকাকুলামে বন্যাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

বন্যাত্রাণ : মাণিকগঞ্জে (ঢাকা) ৫টি ত্রাণ-শিবিরের মাধ্যমে ৮,০৮৫ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ, ৭,০০০ টিন শিশু-খাদ্য, ১৪,৬০০ টিন ফলের রস, ৭,৫০০

পুরাতন বস্ত্রাদি এবং ৭ মন আটা ৭,২৮৬টি বন্যাগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

বিবিধ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী অডিটোরিয়াম'-এর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রীগোবিন্দনারায়ণ। এই সভায় বহু সাধু ও ভক্ত যোগদান করেন।

গত ২১শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ পর্যন্ত কলম্বো শাখাকেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়।

নিউ ইটানগরে অন্তর্বিভাগীয় হাসপাতালে চিকিৎসাদি কার্য গত ১লা জুন, ১৯৮০ হইতে শুরু হইয়াছে এবং পূর্বতন আবাসিক বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাবিভাগ হাসপাতালের নূতন ব্লকে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের বিষয়, গত সেপ্টেম্বর (১৯৮০) মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের তিনজন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামী অন্নদানন্দ (মণি মহারাজ) গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০, সকাল ৭-২৫ মিনিটে মস্তিষ্কে অকস্মাৎ রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ বৎসর। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য কিছুদিন ধরিয়া তাঁহার শরীর ভাল যাইতেছিল না। কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন। গত ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৮০, তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ সালে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। কাঁথি ও তমলুক কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত করাচী, বৃন্দাবন, ভুবনেশ্বর এবং মেদিনীপুর আশ্রমেও তিনি কাজ করিয়াছিলেন। সারগাছিতে ২০ বৎসর ধরিয়া স্বীয় গুরুর সেবা করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। স্বভাবসুলভ সারল্য ও অমায়িকতার জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

স্বামী সুখদানন্দ (বরদা মহারাজ) গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০, বিকাল ৩-৩০ মিনিটে সারগাছি আশ্রমে বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। গত ৭ বৎসর যাবৎ তিনি সারগাছিতে অবসরজীবন যাপন করিতেছিলেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩২ সালে হবিগঞ্জ আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ সালে স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। জানুআরি ১৯৪৩ হইতে নভেম্বর ১৯৭৩ পর্যন্ত—তিন দশকের অধিককাল তিনি সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরল ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

স্বামী বিবিদিষানন্দ (দ্বিজেন মহারাজ) গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০, রাত ১২-১৫ মিনিটে (স্থানীয় সময়) সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া সীয়াট্‌লে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) ৮৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছিলেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণ

করেন। ভুবনেশ্বর মঠ ব্যতীত তিনি মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে 'প্রবুদ্ধ ভারতে'র সম্পাদকের কাজ এবং রাজকোটেও কাজ করিয়াছিলেন। অল্প দিনের জন্য সান্ ফ্রানসিস্কো শাখার অধ্যক্ষতাও করেন। তিনি সীয়াট্‌ল শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ১৯৩৮ সাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উক্ত শাখার অধ্যক্ষতা করেন। তিনি হনোলুলুতে বেদান্তপ্রচারে গিয়াছিলেন এবং সেখানকার অনেক ভক্তকে বেদান্তে অনুপ্রাণিত করেন। সরল স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ২০শে মে ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ৭ই জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ভক্তদের কাছে ঠাকুর ভগবৎপ্রসঙ্গ করছেন, তাঁদের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রেখে কথা বলছেন। তিনি বলতেন, 'কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।' সেইজন্য তাঁদের ভাবের পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাব অবলম্বন ক'রে তাঁরা ধর্মের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। সেই হিসাবেই বলছেন, সহজতম পথ হচ্ছে ভক্তিপথ। এই পথেই সাধারণ মানুষ সাধন করলে তাতে তার ভগবানলাভ হবে। বিরল কেউ কেউ হয়তো জ্ঞানপথের অধিকারী। এটা কঠিন পথ। তাই কলিযুগের পক্ষে ভক্তি-যোগই প্রশস্ততর। আগের দিন চতুর্থ পরিচ্ছেদে (১৷৩৷৪) আমরা এ-সব কথা আলোচনা করেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদটির শুরুতেই মাষ্টারমশাই গীতা থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥
(১১৷৫৪)

—'হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই এই-প্রকার (বিশ্বরূপ) আমাকে জানতে ও স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে (মোক্ষলাভ করতে) ভক্তগণ সমর্থ হয়।' অনন্যা ভক্তির দ্বারাই যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই কথাই ঠাকুর এখানে আলোচনা করবেন। তাই মাষ্টার-মশাই ঐ শ্লোকটি দিয়ে পঞ্চম পরিচ্ছেদটি শুরু করেছেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করছেন, 'মহাশয়, ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায় দেখতে পাই না কেন?' এই প্রশ্ন যাঁরা একটু ধর্ম নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রশ্ন। আমরা সেইটাকেই সত্য বলি, যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, সে বিশ্বাসটার স্বতঃস্ফূরণ হয়েছে, আমরা যে পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি তা থেকে। এবং আমরা সেই বিশ্বাসটাকে নিয়েই চলি। কিন্তু ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে তাঁকে দেখা যায় কি করে? একটু চিন্তাশীল মানুষ হ'লে তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগবেই। আমরা বাড়ি, গাড়ি দেখছি; মানুষ, জীবজন্তু দেখছি। কারণ জড়-চেতন এগুলি আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। কিন্তু ভগবান যদি সত্য হন, তাহলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হচ্ছেন না কেন? কেন তাঁকে দেখা যাচ্ছে না? সেইজন্য ব্রাহ্মভক্ত ঐ প্রশ্ন করেছেন।

দুটি প্রশ্ন—একটি, দেখা যায় কি? অন্যটি, দেখতে পাই না কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। তা তোমাকে বুঝাব কেমন করে?' এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের মনে ঈশ্বরের দর্শন বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই। এ-বিষয়ে আমাদের কেউ প্রশ্ন করলে আমরা শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অথবা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি যে, ঈশ্বর আছেন; তা না হ'লে এই জগৎটা কে সৃষ্টি করলো? এই জগতের কারণ কি? না, ঈশ্বর। একটা কারণ না থাকলে কোন কার্য হয় না। এই জগৎ-রূপ যে কার্য, সেটি এই ঈশ্বর-রূপ যে কারণ, তা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ঠাকুর এই রকম উত্তর দিচ্ছেন না। তিনি সোজা উত্তর দিচ্ছেন, 'হ্যাঁ, অবশ্য দেখা যায়।' সকল রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন স্বচ্ছ উত্তর! যিনি সত্যটি নিঃসংশয়ে জেনেছেন, দেখেছেন মূলতত্ত্বটিকে, তিনিই এমনভাবে অকপটে অসংকোচে এক কথায় উত্তর দিতে পারেন। অন্যে অনেক কথা ব'লে কথার পর কথা বাড়িয়ে যায়। তাতে সংশয় দূরীভূত হয় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিধাহীন উত্তর। সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তিনি বলছেন, 'অবশ্য'—নিশ্চয়ই, নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরকে দেখা যায়। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এটি।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলছেন, তাঁকে সাকার-রূপে দেখা যায় আবার অরূপও দেখা যায়। রূপ আর অরূপ এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ব্রাহ্মরা অরূপকে মানেন, রূপ মানেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ব্রাহ্মভক্তদের মনে যাতে dogmatism বা 'মতুয়ার বুদ্ধি' না আসে, সেই-জন্যই বলছেন, ঈশ্বরকে সাকাররূপে আবার নিরাকাররূপেও দেখা যায়। এটা তাঁর অনুভূতির কথা। শুধু তর্কে এ-সব তত্ত্বের মীমাংসা হয় না। কঠোপনিষদে আছে, 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' —এই জ্ঞান তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম-সূত্রেও বলা হয়েছে, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ…' ইত্যাদি। তর্ক প্রতিষ্ঠিত নয়—একজনের তর্কযুক্তি অন্যে খণ্ডন করেন, তাঁরটা আবার অপরে। এইভাবে চলতে থাকায় কোন মীমাংসা হয় না। এ-বিষয়টি ঠাকুরের জানা ছিল, সেইজন্যই তিনি বলছেন, 'তা তোমায় বুঝাব কেমন করে?' তর্ক দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জিনিস এ নয়। এ অনুভব করতে হয়। '…বোঝে—প্রাণ বোঝে যার।'

গীতা—

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, এই যে কর্মযোগের কথা তোমায় বললাম, এটি আমি সূর্যকে বলেছিলাম। তিনি তাঁর পুত্র মনুকে বলেছিলেন। মনু তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই যোগ চলে আসছিল। কিন্তু কালধর্মে এটি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই কর্মযোগের কথা মানুষ ভুলে গিয়েছিল। তুমি আমার প্রিয় সখা। সেইজন্যই তোমাকে আমি আজ সেই পুরাতন যোগ বলেছি। এটি রহস্যবিদ্যা—সকলের জানা নেই।

কিন্তু অর্জুনের মনে সংশয় উঠলো—এ কি-রকম কথা! শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এ-যুগের মানুষ আর সূর্য হচ্ছেন কত প্রাচীন! শ্রীকৃষ্ণ কি ক'রে সূর্যকে শিক্ষাদান করলেন? তাই অর্জুন বললেন, 'কি-ভাবে বুঝবো যে, তুমি সূর্যকে এই যোগ বলেছিলে?' শ্রীভগবান তখন একটা অবসর পেলেন —নিজের স্বরূপ ও অর্জুনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করবার। তিনি বললেন, 'আমার বহু জন্ম গিয়েছে —এবং তোমারও। আমি সে সব জানি, কিন্তু তুমি জান না।'

এই উদ্ঘাটন করার অবকাশে তিনি হিন্দুধর্মের অন্যতম একটি প্রধান তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সেটি হ'ল জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব। তার

মূল কথা হচ্ছে, আমরা দেহান্তের পর নতুন দেহ ধারণ করি—একটি জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে আর একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করার মতো। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তাঁর জন্মমৃত্যু নেই, শুধুমাত্র দেহেরই পরিবর্তন হয়। কিন্তু একটি দেহ পরিত্যাগ ক'রে অন্য দেহ অবলম্বন করার পরে আমাদের পূর্ব-দেহের সম্পর্কে স্মৃতি থাকে না। সেকথা মনে রেখেই শ্রীভগবান বলছেন, 'আমি সেই সব জন্মের কথা জানি, কিন্তু তুমি সে সব জান না।' দুজনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শ্রীভগবান জানেন তিনি কে, আর অর্জুন জানেন না তিনি কে। পূর্বজন্মের স্মৃতি তাঁর নেই। সাধারণ মানুষ জন্মগ্রহণ করে মায়াধীন হয়ে। কিন্তু শ্রীভগবান নিজ মায়াশক্তিকে বশীভূত ক'রেই দেহধারণ করেন, কারণ তিনি মায়াধীশ। তিনি দেহধারণ করেন কখন? যখন-তখন যেখানে-সেখানে তিনি দেহধারণ করেন না। যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের উদ্ভব হয়, তখনই তিনি দেহধারণ করেন—সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। এই হচ্ছে তাঁর দিব্য জন্ম ও কর্ম। এটা যিনি ঠিক ঠিক জানেন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না, তিনি শ্রীভগবানকেই লাভ করেন।

শ্রীভগবানকে কারা জানতে পারেন? যাঁদের আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ চলে গেছে, শ্রীভগবানে যাঁরা তন্ময় এবং তাঁর শরণাগত তাঁরাই। জ্ঞান-তপস্যাপূত এ-রকম বহু ব্যক্তি মুক্ত হয়ে গেছেন।

এরপর শ্রীভগবান বলছেন, যারা যে যে ভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করে, তিনি তাদের সেই সেই ভাব অনুসারেই ফল দেন। যে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, সে তাঁরই উপাসনা করছে। কারণ, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। কোন কোন মানুষ নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করবার জন্য নানা দেবতার উপাসনা করে। নিজেদের কর্মানুসারে এই জগতে তারা শীঘ্র ফল-লাভ করে। শ্রীভগবান গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কর্তৃত্ব-বুদ্ধি তাঁর নেই, তিনি অব্যয়, অকর্তা। কোন কর্ম তাঁকে লিপ্ত করে না, কোন কর্মফলেও তাঁর স্পৃহা নেই—এটি যে জানে, সে আর কর্মের বন্ধনে পড়ে না। এই ব'লে শ্রীভগবান বলছেন, 'এই রকম জেনে পূর্বকালে অনেক মুমুক্ষু কর্ম ক'রে গেছেন। কাজেই, হে অর্জুন, তুমিও ঐভাবে কর্ম কর।'

এরপর শ্রীভগবান বলছেন, কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের (নিষিদ্ধ কর্মের) কথা। এটা জানা দরকার। যিনি কর্মের মধ্যে অকর্ম দেখেন এবং অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, যোগযুক্ত এবং অকর্তা হয়েও সমস্ত কর্মের কর্তা। অর্থাৎ, সব কিছুর মধ্যে একমাত্র সেই সদ্‌বস্তু রয়েছেন, যিনি নিষ্ক্রিয়-নির্লিপ্ত আর সব কিছুই অসৎ বহিরাবরণমাত্র, এই বুদ্ধি যাঁর হয়েছে তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান—তাঁর বুদ্ধিই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। তিনিই কর্মের রহস্য জানেন। যিনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে যদি তাঁর কামনা ও সংকল্প না থাকে, জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যদি তাঁর শুভাশুভ কর্ম দগ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞানীরা তাঁকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলেন। এই জ্ঞান কিন্তু পরমজ্ঞান নয়। একই 'জ্ঞান' শব্দ দ্বারা দুটি অর্থকে প্রকাশ করা হয়। বৃত্তিজ্ঞান আর স্বরূপজ্ঞান। এটি বৃত্তিজ্ঞান—বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে জানা। আমরা জানছি বুদ্ধি দিয়ে, বিচার ক'রে যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা। এটা পরোক্ষ জ্ঞান। অপরোক্ষ নয়। আইনস্টাইন বলেছেন যে, বস্তুকে শক্তিতে পরিণত করা যায়। Matter can be transformed into energy. এটা আমি বিশ্বাস ক'রে নিলাম বুদ্ধি দিয়ে, অঙ্ক ক'ষে বুঝে নিলাম। এটা পরোক্ষ জ্ঞান। কিন্তু এটা যখন laboratory-তে experiment ক'রে একটা

Atom Bomb তৈরী ক'রে দেখানো হয় যে, ঐ matter-টা energy-তে রূপান্তরিত করার ফলেই এটা সম্ভব হ'ল, তখনই হবে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার ক'রে হয়। কর্মে অকর্ম দর্শনের নাম জ্ঞান। অর্থাৎ, কর্ম যা কিছু করা হচ্ছে, তা সত্য নয়। একমাত্র ব্রহ্ম-বস্তুই সত্য। এইটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে যিনি কাজ করেন, তিনিই পণ্ডিত।

সমস্ত ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে সর্বদা সর্ববিষয়ে সন্তুষ্ট থেকে নিরবলম্বন হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও তিনি কিছুই করেন না। কারো যদি কর্মের ফলের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, এবং কাউকে অবলম্বন করবার অভ্যাস যদি না থাকে—যেমন অমুক ধনী ব্যক্তিকে ধরলে আমি অনেক কিছু পেতে পারি এই রকম ভাব মনে যদি না থাকে, তাহলে কাজ করেও তিনি কর্মবন্ধনে বাঁধা পড়েন না। যদি তিনি নিষ্কাম, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে সংযত এবং পরিগ্রহশূন্য হন, তাহলে শরীরের দ্বারা সাধ্য সমস্ত কাজ যথারীতি করলেও তাঁকে কোন পাপ স্পর্শ করে না। যা পান তাতেই যিনি সদা সন্তুষ্ট, সুখদুঃখ যাঁর কাছে সমান, সিদ্ধি-অসিদ্ধিকে যিনি সমান দৃষ্টিতে দেখেন, সেই নির্বৈর মহাপুরুষ কর্ম করলেও তাতে বাঁধা পড়েন না। যিনি মুক্তসঙ্গ, জ্ঞানে স্থিতবুদ্ধি এবং যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠানে রত, তাঁর কর্ম আর ফল প্রসব করে না। এখানে মনে রাখতে হবে, যজ্ঞ কথাটির অর্থ। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' —বিষ্ণুতে সমর্পণ ক'রে সব কিছু যদি করা যায়, তাহলে সমস্ত কর্মফল তিনি নিয়ে নেবেন, কর্মফল বিনষ্ট হবে। কাজেই ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে সব কাজ করতে হবে। কর্ম ও তার সব উপকরণ-উপাদান যেন যজ্ঞীয় উপকরণ-উপাদান এই যজ্ঞ-বুদ্ধিতে কর্ম করতে হবে। এই হবি, যা অর্পণ করা হচ্ছে; এই অগ্নি, যাতে অর্পণ করা হচ্ছে; যা দিয়ে অর্পণ করা হচ্ছে, যিনি অর্পণ করছেন—সবই ব্রহ্ম। এরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। তাই এই শ্লোকটি (৪।২৪) থেকে চরম জ্ঞান শুরু হয়ে গেল। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সব কিছুই ব্রহ্ম। এখানে ঠাকুরের সেই কাহিনীটা বেশ মনে পড়ে: একজন সাধু ভিক্ষা ক'রে এনে একটা কুকুরের পিঠে বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খাচ্ছিলেন আর কুকুরটাকেও খাওয়াচ্ছিলেন। তাই দেখে লোকেরা তাঁকে পাগল ব'লে উপহাস করতে লাগলো। তখন তিনি বললেন:

> বিষ্ণূপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
> কথং হসসি রে বিষ্ণো সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

এরপর নানা রকম যজ্ঞের কথা বলেছেন শ্রীভগবান—দৈবযজ্ঞ, দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, স্বাধ্যায়-যজ্ঞ, প্রাণায়ামযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি। বলছেন, বেদমুখে বহু যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে; সে-সবই কর্ম থেকে উদ্ভূত। কিন্তু নানান দ্রব্যাদি দিয়ে যজ্ঞ করার চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কারণ, সব রকমের কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। এই যে জ্ঞান এটি কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান নয়। এটি চরম ও পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানের স্বরূপ হচ্ছে একত্ব, যা স্বয়ংপ্রকাশ। সমস্ত কর্মযোগের লক্ষ্যই হচ্ছে এই জ্ঞানপ্রাপ্তি। এইটি জীবনের চরম উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান পাওয়া যাবে কিভাবে? না, তত্ত্বজ্ঞ গুরুর কাছে যেতে হবে, তাঁর শরণ নিতে হবে। কর্মযোগের দ্বারা যখন চিত্তের মালিন্য দূর হয়ে যাবে, তখন সেই শুদ্ধ চিত্তেই সদ্গুরুর উপদেশ কার্যকর হবে। তাঁর কাছে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে আত্মনিবেদন ক'রে প্রার্থনা করতে হবে—সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে আমাকে রক্ষা কর, প্রভু। আমি তোমার চরণে প্রণত, শরণাগত। এই প্রণিপাতের সঙ্গে 'এই যে সংসার, এর পিছনে কি আছে?' ইত্যাদি প্রশ্ন আনতে হবে মনে এবং তাঁর কাছে সমাধান চাইতে হবে। তারপর গুরুর প্রীতি-উৎপাদনের

জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁর সেবা করতে হবে। তখনই তত্ত্বদর্শী গুরু চরম জ্ঞানের উপদেশ দিবেন। এই জ্ঞান লাভ হ'লে আর কোন মোহ আসবে না। জগতে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকেও শ্রীভগবানের মধ্যে দেখবে। সর্বচরাচর সেই এক সত্যে বিধৃত—এই যে চরম জ্ঞান, এইটাই লক্ষ্য, উপেয়। উপায় হচ্ছে কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি হয়। জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে দেয়। এই জ্ঞানের সমান পবিত্র পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। কর্মযোগের দ্বারা যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা আপনাআপনিই যথাসময়ে এই জ্ঞান লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ আত্ম শক্তিতে বিশ্বাসী, গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসী, যিনি তৎপর আর সংযতেন্দ্রিয়, তিনিই এই জ্ঞান লাভ ক'রে পরমা শান্তির অধিকারী হন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন, অজ্ঞ, সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কারণ এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সংশয়ীর ইহপরকাল নেই, কোন সুখই নেই তার। পরমার্থদর্শনরূপ যোগ দ্বারা যাঁর কর্মত্যাগ হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারা সব সংশয় ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মবান্ ব্যক্তিকে কর্মসমূহ আবদ্ধ করতে পারে না। এই ব'লে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন, 'অজ্ঞান হতে জাত তোমার হৃদয়স্থ এই সংশয় (যুদ্ধ করবো কি করবো না, যুদ্ধ করলে পাপ হবে কি হবে না, ইত্যাদি) জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছিন্ন ক'রে তুমি নিষ্কাম কর্মব্রতে ব্রতী হও—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।'

এই অধ্যায়ে যদিও কর্মযোগের কথা আছে, পুনর্জন্মবাদের কথা আছে, অবতারতত্ত্বের কথা আছে, তবু এর মধ্যে শেষ কথা যা বলা হয়েছে তা জ্ঞানের কথা। এই পরম জ্ঞানই চরম শান্তি দিতে পারে। এই জ্ঞানে গিয়ে পৌঁছতে হবে। এই স্বরূপজ্ঞানই মূল লক্ষ্য। এইজন্য এই অধ্যায়কে বলা হয়েছে, 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ'।

বিবিধ সংবাদ

জন্মজয়ন্তী

নব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক গত ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল ১৯৮০, স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মঙ্গলারতি, ভজন, শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয় এবং মধ্যাহ্নে পাঁচশতাধিক ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ছাত্র-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনির্মলকুমার সেন। পরে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় 'নবাকাঙ্ক্ষী সব পেয়েছির আসর'। সান্ধ্য স্তব ও প্রার্থনার পর ধর্মসভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীসারদা সংঘের সদস্যাগণ। উক্ত সভায় স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী শিবময়ানন্দ ও সভাপতি স্বামী গহনানন্দ। স্বামী গহনানন্দ সভার প্রারম্ভে ছাত্র-সম্মেলনের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন। সর্বশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার। রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীঋষিবর বাউল। ২৮শে অপরাহ্নে বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ এবং স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী যোগস্থানন্দ। সান্ধ্য স্তব ও প্রার্থনার পর ধর্মসভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন

উক্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। উক্ত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন প্রধান অতিথি শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার। রাত্রে ব্রহ্মসংগীত যন্ত্রে ও কণ্ঠে পরিবেশনের পর বারাসত আনন্দ পরিষদ কর্তৃক 'সাধক রামপ্রসাদ' গীতি-আলেখ্যটি অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদকুণ্ড শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ মিলন মন্দিরে গত ৭ই ও ৮ই জুন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি, ভজন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিনের সভায় সভাপতি স্বামী শর্মানন্দ ও বক্তা স্বামী ভৈরবানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। অবিরাম বৃষ্টিতে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও সভায় সহস্রাধিক শ্রোতার সমাবেশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাগীতি ও ভজন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট ভজন-গায়ক শ্রীকরুণাসিন্ধু মণ্ডল (মুর্শিদাবাদ) ও সহশিল্পীবৃন্দ। ৮ই জুন ২,৫০০ প্যাকেটে লুচি ও হালুয়া প্রসাদ বিতরিত হয়। উভয়দিনই সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা-মন্দিরের সৌজন্যে যথাক্রমে 'রানী রাসমণি' ও 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

সোনামুড়া (পশ্চিম ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক ৯ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রত্যূষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, উপনিষদ্ পাঠ; সকালে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ ইত্যাদি হয়। অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীসুশান্তকুমার চৌধুরী, শ্রীসুধীরকুমার সাহা, শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীদেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী আলো ভৌমিক, শ্রীপ্রহ্লাদ আচার্য, শ্রীমতী জ্যোৎস্না ভৌমিক, শ্রীচিত্ত দাশগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্র মালাকার, শ্রীশিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মীরা চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী বসিয়া খিচুড়ি-প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পরলোকে

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য **সুধীরচন্দ্র পালচৌধুরী** ৭৮ বৎসর বয়সে গত ১২ই অগস্ট ১৯৮০, রাত্রি ১২-২০ মিনিটে সজ্ঞানে ইষ্টনাম করিতে করিতে তাঁহার পুত্রের কর্মস্থল খড়্গপুরে পরলোকগমন করেন।

ময়মনসিংহ জিলার চিথোলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। কৃতী ছাত্র সুধীরবাবু বি. এ., বি. এল. পাশ করিয়া প্রথম জীবনে কলিকাতায় শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ করেন। পরে বহু বৎসর লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকুরী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সনে সারগাছি আশ্রমে তাঁহার দীক্ষা হয়। তিনি বেলুড় মঠের বহু পূজ্যপাদ মহারাজদের সংস্পর্শে আসেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া ১৯৫৪ সনে সুধীরবাবু হুগলী জিলার অন্তর্গত কোতরং রাধাগোবিন্দ নগরে তাঁহার নিজ গৃহ 'রামকৃষ্ণ আলয়ে' ধর্ম-আলোচনা সভা আরম্ভ করেন। প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র'। ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৬ সনে কোতরং শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কার্যকরী সমিতি এবং অছিপরিষদের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু উক্ত উভয় প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

সুধীরবাবু বহু সৎপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলেরই আপনজন। তাঁহার নিরভিমান, অমায়িক সহানুভূতিশীল আচরণ সকলের চিত্ত জয় করিত। তাঁহার সততা, নিষ্ঠা, উদারতা ও সরল জীবন সকলেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ— স্বামী সারদানন্দ। দুই ভাগ, রেক্সিন-বাঁধাই: ১ম ভাগ, পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮·০০। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, মূল্য ২২·৫০

সাধারণ ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মূল্য ৫·২৫; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭·৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ মূল্য ৮·২৫; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯·৫০; ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি—অক্ষয়কুমার সেন। সুললিত কবিতায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী। পৃঃ ৬৪০, মূল্য ২৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩·৩০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬·০০; হাফ-রেক্সিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭·০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। পৃঃ ৩৬, মূল্য ১·২০

শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫০, মূল্য ৪·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২·০০, বাঁধাই ২·৫০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ—স্বামী ভূতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯·০০

শ্রীরামকৃষ্ণবাণী—স্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী—স্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা—অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪·২৫

শ্রীশ্রীমা-সম্বন্ধীয়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণের ডায়েরী হইতে। দুই ভাগে সম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭·৫০, ২য় ভাগ পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০·০০

মাতৃ-সান্নিধ্যে—স্বামী ঈশানানন্দ। পৃঃ ২৫৬, মূল্য ৬·০০

শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, মূল্য ১৭·০০

শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ৫০, মূল্য ৩·০০

স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয়

যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, মূল্য ১৬·০০; ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬·০০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮·০০

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২·৫০

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ। দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২·৫০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—(দুই খণ্ড একত্রে)। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজীর সহিত লেখকের কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭·০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি—ভগিনী নিবেদিতা। (অনুবাদ: স্বামী মাধবানন্দ)। পৃঃ ৩০৬, মূল্য ৮·০০

স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে—ভগিনী নিবেদিতা (বঙ্গানুবাদ)। পৃঃ ১২৪, মূল্য ১·২৫

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মূল্য ৩·৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৩·৫০

স্বামী বিবেকানন্দ—ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ ৫৭, মূল্য ২·৩০

অন্যান্য

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা — স্বামী গম্ভীরানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের জীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, মূল্য [illegible]

২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫·০০

ভারতের শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩·২৫

মহাপুরুষ শিবানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৯১, মূল্য [illegible]

গোপালের মা — স্বামী সারদানন্দ পৃঃ ৪৪ মূল্য ১·৫০

আচার্য শঙ্কর স্বামী অপূর্বানন্দ। পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬·০০

স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র— পৃঃ ৩৫২, মূল্য ৭·৮০

শিবানন্দ-বাণী— স্বামী অপূর্বানন্দ-সংকলিত। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫·৫০

২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫·০০

স্মৃতিকথা—স্বামী অখণ্ডানন্দ। পৃঃ ২৪৫ মূল্য ৪·০০

দিব্যপ্রসঙ্গে — স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬·৩৫

আরতি-স্তব— পৃঃ ৩১, মূল্য ১·০০

পুণ্যস্মৃতি— স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ। পৃঃ ১১৬, মূল্য ৩·০০

সৎকথা—পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭·৫০

পরমার্থ-প্রসঙ্গ — স্বামী বিরজানন্দ। পৃঃ ১৩০, মূল্য ৪·৫০

[illegible]—স্বামী [illegible]। পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২·৫০, বোর্ড বাঁধাই ৩·০০ [illegible] শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত সংক্ষিপ্ত "[illegible]" [illegible]

শঙ্কর-চরিত — [illegible] ভট্টাচার্য। ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬, [illegible] ২·৫০

[illegible]-চরিত—শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য পৃঃ [illegible], মূল্য ২·৫০

সাধক রামপ্রসাদ —স্বামী বামদেবানন্দ। পৃঃ ১৬৪, মূল্য [illegible]

সাধু নাগমহাশয়—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী। পৃঃ ১৪৪, মূল্য [illegible]

ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ— পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫·০০

পত্রমালা—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৮২, মূল্য ৪·০০

গীতাতত্ত্ব—স্বামী সারদানন্দ। পৃঃ ১৭৬, মূল্য ৫·০০

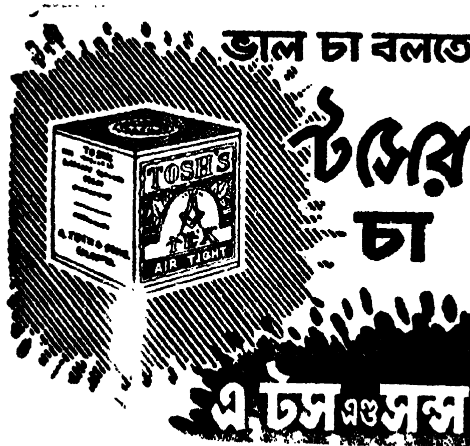
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতি-কথা — শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়। পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০·০০

ভগবানলাভের পথ—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৭৫, মূল্য ১·২৫

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী — স্বামী বীরেশ্বরানন্দ। পৃঃ ৩২, মূল্য ০·৭২

বিবিধ প্রসঙ্গ—পৃঃ ১২১, মূল্য ৩·৫০

প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩


ভাল চা বলতে
টসের
চা
TOSH'S
AIR TIGHT
এ টস এণ্ড সন্স
কলিকাতা—১

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শপূত যোগোদ্যান মঠটি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট পবিত্রতম তীর্থস্থানগুলির অন্যতম। এখানে শ্রীশ্রীমা শুভাগমন করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভজন-সঙ্গীতাদি দ্বারা ভক্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন এবং স্থানটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ষদদের অনেকের পুণ্যসাধনক্ষেত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহের অবসানের পর তাঁর পবিত্র অস্থির একভাগ প্রথমে এখানেই স্থায়ীভাবে সমাহিত হয়। যোগোদ্যানের বর্তমান নাটমন্দিরটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত হওয়ায় উৎসবাদিতে এবং সাপ্তাহিক ধর্মসভায় স্থান সঙ্কুলান হয় না। এজন্য নাটমন্দিরটি আরও প্রশস্ত করে নির্মিত হবে স্থির হয়েছে এবং নির্মাণকার্যের আনুমানিক ব্যয় ১,৭০,০০০ টাকা। এই সৎকার্যে সর্বপ্রকার দান সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হবে। বলা বাহুল্য, সরকারী নিয়মানুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠে প্রদত্ত দান আয়করমুক্ত।

একাউণ্ট পেয়ী চেক / ড্রাফট 'Ramakrishna Yogodyan Math' —এই নামে হবে।

নিবেদক
স্বামী ভুতেশানন্দ
অধ্যক্ষ
শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ
৭ যোগোদ্যান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪

১ কার্তিক, ১৩৮৭

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

পোঃ—কাঁথি : মেদিনীপুর।

(স্থাপিত—১৯১৩)

আবেদন

স্বামীজী বলিয়াছেন, "অন্যান্য যুগে যে সকল কঠোর তপস্যা ও যোগাদি প্রচলিত ছিল, তাহা আর এখন চলিবে না। এযুগে বিশেষ প্রয়োজন 'দান'—অপরকে সাহায্য করা। 'দান' বলিতে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর প্রাণদান, অন্ন বস্ত্রদান সর্বনিম্নে।" এই যুগোপযোগী নবীন উপচারে জনগণকে সেবার উদ্দেশ্যেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমটি বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা। এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন ধরিয়া স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণার্থে অকুণ্ঠভাবে সেবা করিয়া আসিতেছে। একটি গ্রন্থাগার, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি ছাত্রাবাস আশ্রমের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। মাঝে মাঝে বিপন্ন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে আর্থিক সহায়তা ভিন্ন নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আশ্রমের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণকার্যও সংগঠিত হইয়াছে।

স্বামীজী যে কথাটি বলিয়াছেন, "আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই মনুষ্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্য করা হয়," এই আশ্রম পূজা উপাসনা ধর্মপ্রসঙ্গ ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে সেই আদর্শটির বাস্তব রূপায়ণে সতত নিয়োজিত। এই আশ্রমের বর্তমান মন্দিরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সমাগত ক্রমবর্ধমান ধর্মার্থীদের স্থানসঙ্কুলানের পক্ষে একান্তই অনুপযোগী। এইজন্য বর্তমান মন্দিরটির পুনঃসংস্কার ও আয়তনবৃদ্ধি জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এই সমস্যার আশু প্রতিকার কল্পে আমরা বর্তমান মন্দিরটিকে পরিবর্ধিত করিয়া একটি নূতন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছি। বর্তমান মন্দিরটি সেই নূতন মন্দিরের নাটমন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর বিগ্রহ, বেদী ও মন্দিরটির নির্মাণে আনুমানিক একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী সহৃদয় জনগণের নিকট আমাদের আন্তরিক আবেদন যেন তাঁহারা সর্বপ্রকার সহায়তা করিয়া এই মহৎ প্রচেষ্টাটিকে ফলবতী করেন।

একাউণ্ট পেয়ী চেক / ড্রাফট 'Ramakrishna Math, Contai'—এই নামে হবে।

ভবদীয়
স্বামী আপ্তকামানন্দ
অধ্যক্ষ

১ কার্তিক, ১৩৮৭

[এই সেবাকার্যে সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত।]

৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ
বার্ষিক মূল্য ১৫·০০ টাকা

অগ্রহায়ণ ১৩৮৭
৮২তম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

উদ্ভিদ কুসুম পাপা বরান নির্বাচিত



উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে: তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। ৮৩তম বর্ষ হইতে চাঁদার হার পরিবর্তিত হইবে।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা: বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বাঁকুড়া

আবেদন

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। বিগত ১৯১৭ সাল হইতে এই কেন্দ্রটি দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি গ্রন্থাগার, একটি বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ত্রাণকার্যাদির মাধ্যমে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া এই আশ্রমের মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি আকর্ষণীয় মর্মর বিগ্রহ আছে। শ্রীভগবানের নিত্যপূজা, সান্ধ্য-আরাত্রিক ও ভজন, ধর্মালোচনা, মহাপুরুষদের জন্মতিথি উৎসব এবং প্রতি একাদশীতে সমবেতকণ্ঠে রামনাম-সংকীর্তনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ধর্মপিপাসু ও শান্তিকামী ভক্তদের নিকট ইহা যে প্রাণ জুড়াইবার একটি স্থান তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

অনেক দিনের এই সুন্দর মন্দিরটির একটি অংশ মাটির নীচে বসিয়া যাওয়ার ফলে সমস্ত মন্দিরটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় উহার আশু সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের এই সংস্কারকার্যে আনুমানিক এক লক্ষ টাকা লাগিবে

ইহা ছাড়া অসমাপ্ত প্রাচীরের সমাপ্তি ও ছোটখাট আনুষঙ্গিক কাজের জন্য আরও এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন

বাঁকুড়া অত্যন্ত দরিদ্র ও খরাপীড়িত অঞ্চল। সুতরাং এই জেলা হইতে অর্থ সংগ্রহের আশা খুবই কম। উল্লিখিত কার্যগুলির রূপায়ণে সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আর্থিক সাহায্যদানের জন্য আমরা সানুনয় আবেদন জানাইতেছি।

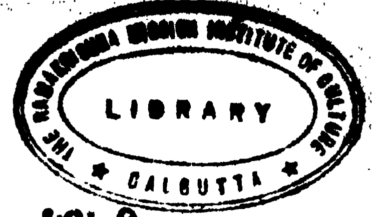
১। সাহায্যের চেক "রামকৃষ্ণ মঠ বাঁকুড়া" এই নামে লিখিতে হইবে।

২। এই সকল দান ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট ১৯৬১র ৮০-জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত

২৫শে নভেম্বর, ১৯৮০

নিবেদক
স্বামী অদ্বয়ানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বাঁকুড়া


তেল মাখা কি
ছেড়েই দিলি?
জবাকুসুম



উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

উদ্বোধনের মাধ্যমে

প্রচার হোক

এই বাণী।

—শ্রীসুশোভন চট্টোপাধ্যায়

জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।

যত এগোবে, ততই দেখবে তিনিই সব হয়েছেন—তিনিই সব করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
জনৈক ভক্ত

ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়।

—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত
ভক্ত



৮২তম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

ব্রহ্মজ্ঞ হওয়াই চরম লক্ষ্য, পরম পুরুষার্থ। তবে মানুষ তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ব্যুত্থানকালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তখন এমন কর্ম করা উচিত, যাতে লোকের শ্রেয়োলাভ হয়। এইজন্য তোদের বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর। কিন্তু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাঁচ যে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইজন্য ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্ম করতে হয়। গীতায় ঐ কথাই বলেছে। কিন্তু জানবি, ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের অনুপ্রবেশও নেই; সৎকর্ম দ্বারা বড়জোর চিত্তশুদ্ধি হয়। এ-জন্যই ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য) জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ—এত দোষারোপ করেছেন। নিষ্কাম কর্ম থেকে কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ-কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ—বিচারমার্গ ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞতা লাভ করা।···জ্ঞানপথই আশু-ফলপ্রদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক···। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন দুস্তর তর্কজালে বদ্ধ হয়ে যেতে পারে। এইজন্য সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌঁছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষ্যে) ঠিক পৌঁছানো যায়। আমার মতে, এই পন্থা সহজ ও আশুফলপ্রদ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৯।১৮৪]

কথাপ্রসঙ্গে

'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'—শংকরাচার্যের দৃষ্টিতে

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিতেছেন :

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্॥

—হে নিষ্পাপ [অর্জুন], ইহলোকে যাঁহারা জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহাদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং যাঁহারা কর্মের অধিকারী, তাঁহাদের জন্য কর্মযোগ —এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা আমি পুরাকালে (সৃষ্টির আদিতে) বলিয়াছি।

গীতার এই শ্লোকটির ভাষ্যে শংকরাচার্য বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্রীভগবানের বক্তব্য এই যে, কোনও যুক্তির দ্বারাই 'জ্ঞান' ও 'কর্মে'র সমুচ্চয় করা যায় না। এখানে 'জ্ঞানে'র অর্থ যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগ এবং 'কর্মে'র অর্থ যে কর্মনিষ্ঠা বা কর্মযোগ, তাহা শ্লোকটিতে প্রযুক্ত 'জ্ঞানযোগেন' এবং 'কর্মযোগেন' শব্দদ্বয় হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। সুতরাং শংকরাচার্যের মতে একই ব্যক্তি যুগপৎ এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারেন না। আরও সহজ কথায়, কোনও ব্যক্তি একই কালে কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী হইতে পারেন না—হয় তিনি কর্মযোগী হইবেন, না হয় জ্ঞানযোগী। অবশ্য এ-সকল কথা মোক্ষার্থীর প্রসঙ্গেই উঠিতেছে। কারণ কোনও যোগেরই ধার ধারেন না—এইরূপ লোকের অভাব তো নাই-ই, বরং অধিকাংশ লোকই যে মোক্ষ বা তাহার উপায় সম্বন্ধে চিন্তাও করেন না, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ।

শুধু যে গীতার এই শ্লোকটিরই ব্যাখ্যায় শংকরাচার্য জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয়বাদ স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা নহে। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকায় তিনি এই বিষয়টি লইয়া অতি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। গীতার অন্যত্রও তাঁহার ভাষ্যে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। শুধু গীতাভাষ্যে নহে, উপনিষদ্‌ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও যেখানেই তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, নানা যুক্তি-তর্কসহায়ে তাঁহার এই-বিষয়ক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফলে তাঁহার রচনায় জ্ঞান ও কর্মের বিরোধিতার বিচার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যুক্তি ও প্রমাণসহ আমরা তাঁহার বক্তব্যটি অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়[1] বা অসমুচ্চয়ের বিচার কেবলমাত্র সকাম কর্মের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; উহা নিষ্কাম কর্মকেও কুক্ষিগত করে। কারণ, গীতার 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র প্রসঙ্গে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐস্থলে 'কর্মনিষ্ঠা'র[2] অর্থ কর্মযোগ। এবং কর্মযোগে যে সকাম কর্মের কোনও স্থান নাই, তাহা বলাই

১ আচার্য শংকরের ন্যায় সকলেই জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয়বাদী নহেন। আচার্য ভাস্কর-প্রমুখ সমুচ্চয়বাদীরাও আছেন। তবে তাঁহাদের 'জ্ঞান' আর শংকরাচার্যপ্রমুখ অদ্বৈতবাদীদের 'জ্ঞানে'র মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। অর্থাৎ, অসমুচ্চয়বাদীরা 'জ্ঞান' শব্দটির যে-অর্থ করেন, সমুচ্চয়বাদীরা সেই অর্থ করেন না।

২ 'কর্মনিষ্ঠা' বলিতে কেবল সকাম কর্মে নিষ্ঠা বা কেবল নিষ্কাম কর্মে নিষ্ঠা বুঝায় না। উভয়বিধ নিষ্ঠা বুঝাইতেই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। আলোচ্য গীতাশ্লোকে 'কর্মনিষ্ঠা'র অর্থ কর্মযোগ; অর্থাৎ, নিষ্কাম কর্মে নিষ্ঠা। মীমাংসকগণের 'কর্মনিষ্ঠা' সকাম কর্মে নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত;

বাহুল্য। যিনি নিষ্কাম কর্ম করেন, তিনিই কর্মযোগী। সুতরাং শংকরাচার্য যখনই বলিতেছেন যে, কর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়, সমাহার বা সমন্বয় হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও কর্ম স্থিতি ও গতির ন্যায় পরস্পরবিরোধী, তখনই তিনি কর্ম বলিতে সকাম কর্মেরই কথা বলিতেছেন, নিষ্কাম কর্মের কথা নহে—এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং প্রমাণবিরুদ্ধ। এ-বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাংকরভাষ্য হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ আভাসভাষ্যে জ্ঞান ও কর্মের বিরোধিতাপ্রসঙ্গে শংকরাচার্য বহু যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন: 'যৎ তু কৈশ্চিৎ উচ্যতে—বিদ্যা-সহিতং কর্ম নিরভিসন্ধি বিষ-দধ্যাদিবৎ কার্যান্তরম্ আরভতে ইতি, তৎ ন; অনারভ্যত্বাৎ মোক্ষস্য। বন্ধননাশ এব হি মোক্ষঃ, ন কার্যভূতঃ; বন্ধনং চ অবিদ্যা ইতি অবোচাম। অবিদ্যায়াঃ চ ন কর্মণা নাশঃ উপপদ্যতে…।' অনুবাদ: কেহ কেহ যে বলেন, নিরভিসন্ধি (নিষ্কাম) কর্ম বিদ্যার (জ্ঞানের) সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় কার্যান্তরের উৎপাদক হয়, তাহাও [ঠিক] নহে; কারণ, মোক্ষ অনারভ্য (কোনও প্রকার কর্মের দ্বারা উৎপাদ্য নহে); বন্ধননাশই মোক্ষ; উহা কার্য বা উৎপাদ্য পদার্থ নহে; আর বন্ধন যে অবিদ্যা—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি; কর্মের দ্বারা [কখনও] অবিদ্যার নাশ হয় না [কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হয়]।[৩] এই আভাসভাষ্যেই তিনি 'নিরভিসন্ধি' অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞানের বিরোধিতার পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শাংকরভাষ্যেও জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ-সম্পর্কিত সুদীর্ঘ বিচার একাধিক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শীক্ষাবল্লীর একাদশ অনুবাকের ভাষ্যের এক স্থলে শংকরাচার্য লিখিয়াছেন: 'বিরোধাৎ চ বিদ্যা-কর্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। প্রলীন-কর্ত্রাদি-কারক-বিশেষ-তত্ত্ব-বিষয়া হি বিদ্যা তদ্‌বিপরীত-কারক-সাধ্যেন কর্মণা বিরুধ্যতে।…ন চ সম্প্রদানাদি-কারক-ভেদাদর্শনে কর্ম উপপদ্যতে।' অর্থাৎ, জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ থাকায় সমুচ্চয় যুক্তিযুক্ত নহে। জ্ঞান এমন একটি বিষয় যে, উহাতে কর্তা, কর্ম প্রভৃতি কারকসমূহ প্রলীন হইয়া যায় আর কর্ম উহার বিপরীত কর্তা প্রভৃতি কারকের দ্বারাই সাধ্য; সুতরাং বিদ্যা (জ্ঞান) কর্মের বিরোধী।…সম্প্রদান আদি কারক-সমূহের ভেদ না দেখিলে কর্ম সম্ভবই হয় না।

বলা বাহুল্য, এই ভাষ্যে শংকরাচার্য যে দার্শনিক বিচার উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মই তুল্যমূল্য।

সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, শংকরাচার্যের মতে নিষ্কাম কর্মও জ্ঞানের বিরোধী। বৃহদারণ্যক ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত ভাষ্যে এই বিরোধের কারণও আমরা লক্ষ্য করিলাম। গীতা-ভাষ্য হইতে এই বিরোধের কারণ আরও স্পষ্টতর-ভাবে প্রদর্শিত হইতে পারে, যেহেতু গীতায় নিষ্কাম কর্ম বিশেষভাবে আলোচিত। শংকরাচার্য বলিতেছেন, নিষ্কাম কর্মীর মনোভাব হইতেছে—'আমি কর্তা, ঈশ্বরার্থে ভৃত্যবৎ কর্ম করিতেছি'

কারণ, তাঁহারা স্বর্গাদিকামনায় বেদবিহিত কর্ম করেন। (ঈশোপনিষদের শাংকরভাষ্যভূমিকা ও দ্বিতীয় মন্ত্রের শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

৩ পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, বিষপানে মৃত্যু হয়, দধিসেবনে শ্লেষ্মাদি দোষের উদ্ভব হয়, কিন্তু বস্তুবিশেষের সংযোগে বিষকে রসায়নে পরিণত করা যায়; দধি শর্করার সহিত মিশ্রিত হইলে ক্ষতিকর হয় না, পুষ্টিকরই হইয়া থাকে; সুতরাং নিষ্কাম কর্ম অবিদ্যার অন্তর্গত হইলেও জ্ঞানের সহিত

('অহং কর্তা, ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ কর্ম করোমি'—গীতা ৩।৩০, শাংকরভাষ্য)। পক্ষান্তরে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির মনোভাব হইতেছে—'আমি অকর্তা আত্মা।' সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, একই ব্যক্তির যুগপৎ এই দুইটি বিপরীত মনোভাব থাকিতে পারে না। একই ব্যক্তি একই কালে 'আমি কর্তা, আমার সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই কর্ম করিতেছি' এবং 'আমি অকর্তা ; এক অদ্বিতীয় ক্রিয়া-কারক-ফল-ভেদ-শূন্য আত্মাই আছেন, ঈশ্বর-জীব-জগৎ তাঁহাতেই অধ্যস্ত এবং আমি সেই নিষ্ক্রিয় নিরবদ্য নিরঞ্জন আত্মা'—এইরূপ বিপরীত মনোভাব লইয়া সাধনা করিতে পারেন না। এইজন্যই শংকরাচার্য বলিতেছেন যে, জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম স্থিতি ও গতির ন্যায় পরস্পর-বিরোধী ('স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাৎ'—গীতা, ৫ম অধ্যায়, শাংকরভাষ্যভূমিকা)।

এখন প্রশ্ন : কে এই প্রথমোক্ত মনোভাবের অধিকারী, কেই বা শেষোক্ত মনোভাবের অধিকারী? শংকরাচার্য ইহার সুস্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন—গৃহী ব্যক্তিই প্রথমোক্ত মনোভাবের অধিকারী, গৃহীই কর্মযোগী ; সন্ন্যাসীই শেষোক্ত মনোভাবের অধিকারী, সন্ন্যাসীই জ্ঞানযোগী। গীতাভাষ্যে তিনি এই কথা বহুবার বলিয়াছেন।

কর্মযোগ যে ভেদদর্শী গৃহীদের দ্বারাই সম্ভব, অভেদদর্শী জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের দ্বারা সম্ভব নহে, তাহা গীতার 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাম্‌' ইত্যাদি শ্লোকটির (১২।১৩) ভাষ্যভূমিকায় শংকরাচার্য অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন : 'যাবৎ ধ্যানযোগারোহণাসমর্থঃ তাবৎ গৃহস্থেন অধিকৃতেন কর্তব্যং কর্ম…।' অর্থাৎ, গৃহী ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিনই তিনি কর্মে অধিকারী এবং কর্ম করিবেন। তাৎপর্য এই যে, ধ্যানযোগে আরোহণে সমর্থ হইলেই তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া উচিত। এই তাৎপর্য আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, ষষ্ঠাধ্যায়ের শাংকরভাষ্যেই ইহা স্পষ্টরূপে উল্লিখিত। প্রশ্ন হইবে, জ্ঞানযোগের কথা হইতেছিল, অকস্মাৎ ধ্যানযোগের কথার অবতারণা কেন? ইহার উত্তরে শংকরাচার্য বলেন, ধ্যান-যোগ জ্ঞানযোগেরই অন্তরঙ্গ সাধন। সুতরাং জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে ধ্যানযোগের কথা বলাতে অপ্রাসঙ্গিকতা কিছু নাই।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে 'একাকী' এবং 'রহসি স্থিতঃ'—এই দুইটি বিশেষণ সম্পর্কে শংকরাচার্য লিখিয়াছেন : 'রহসি স্থিতঃ একাকী চ ইতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা ইত্যর্থঃ।' অর্থাৎ, শ্রীভগবান যখন বলিতেছেন, ধ্যানী ব্যক্তি একাকী নির্জনে অন্তঃকরণকে আত্মাতে সমাহিত করিবেন, তখন ঐ দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য হইল—সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই ঐরূপ করিবেন।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের (১৮।৫২-৫৩) ভাষ্যেও তিনি অনুরূপভাবে দেখাইয়াছেন যে, ঐরূপ সাধক জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীই হইতে পারেন ('স জ্ঞাননিষ্ঠঃ যতিঃ' ; 'পরমহংস-পরিব্রাজকঃ ভূত্বা' ইত্যাদি)। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকাতেও ঐ একই কথা বলা হইয়াছে।

'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র প্রসঙ্গে আমরা এ-পর্যন্ত যাহা

সমন্বিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষরূপ শুভ ফলেরই উৎপাদক হইবে। ইহার উত্তরে শংকরাচার্যের বক্তব্য : ঐভাবে মোক্ষ হয় না। মোক্ষ কোনও 'জন্য' (উৎপাদ্য) পদার্থ নহে। বন্ধননাশই মোক্ষ এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই বন্ধননাশ (অবিদ্যার নাশ) সম্ভব।

আলোচনা করিলাম, তাহা সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে শংকরাচার্য-রচিত 'সাধনপঞ্চক'-এ বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথম শ্লোকটিতে তিনি বলিয়াছেন: গৃহস্থগণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন করিবেন, বেদোক্ত কর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করিবেন এবং সেই কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। কাম্য কর্মের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবেন। এইভাবে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ কর্মযোগী হইয়া তাঁহারা নিষ্পাপ হইবেন এবং সাংসারিক সুখে দোষদর্শন করিবেন। আত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা সুদৃঢ় সংকল্পে পরিণত করিবেন এবং নিজ গৃহ হইতে সত্বর বিনির্গত হইবেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

এখানে ব্যাখ্যাস্বরূপ এইটুকু বলিবার আছে যে, গৃহী ব্যক্তি কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্লোকটিতে উল্লিখিত নিষ্কাম কর্ম ইত্যাদি সাধনসমূহ করিতে থাকিলে পরিশেষে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়। কর্মযোগের ফলই যে এই চিত্তশুদ্ধি, ইহা শংকরাচার্য বারংবার বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধি হইলে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব—এই সাধনচতুষ্টয়ের অধিকারী হওয়া যায়[৪] এবং তখনই 'নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্'—সত্বর নিজগৃহ হইতে বিনির্গত হইবে, এই সন্ন্যাস-বিধি পালন করিবার যোগ্যতা হয়—তৎপূর্বে নহে। এইরূপ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বিবিদিষু সন্ন্যাসীদের[৫] জন্যই মহর্ষি বাদরায়ণ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—এই সূত্রের দ্বারা 'ব্রহ্মসূত্রে'র আরম্ভ করিয়াছেন—গৃহীদের জন্য নহে, কারণ শংকরাচার্যের মতে এই সূত্রে নির্গুণ ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট, সগুণ ব্রহ্ম নহেন।[৬] সগুণ ব্রহ্ম উদ্দিষ্ট হইলে গৃহে থাকিয়াই উপাসনা করা যাইত, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবার প্রয়োজন থাকিত না।

'সাধনপঞ্চকে'র পরবর্তী চারিটি শ্লোকে অতি হৃদয়গ্রাহিভাবে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল না। আমরা শুধু এইটুকুই লক্ষ্য করি যে, শংকরাচার্য এই 'সাধনপঞ্চকে'ও কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সম-সমুচ্চয় স্বীকার করেন নাই—ক্রম-সমুচ্চয় স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি প্রথমে কর্মযোগী এবং পরে জ্ঞানযোগী হন; একই সঙ্গে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী হইতে পারেন না।

আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান নিবন্ধের উপসংহার করিব। আলোচিত শ্লোকটিতে (গীতা, ৩।৩) শ্রীভগবান 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র কথা—কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু

৪ স্ববর্ণাশ্রমধর্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ। সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ম্॥—শংকরাচার্য-কৃত অপরোক্ষানুভূতি, শ্লোক ৩। অনুবাদ: নিজ বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান, তপস্যা এবং [উপাসনার দ্বারা] শ্রীহরির প্রসন্নতা হইতে বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়।

৫ গৃহীরাই যে চিত্তশুদ্ধি হইলে সাধনচতুষ্টয়ের উদয়ে বিবিদিষু সন্ন্যাসী হইবেন, তাহা নহে। ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থীদের জন্যও বিবিদিষা সন্ন্যাস বিহিত, যদি তাঁহাদের যথার্থ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এ-বিষয়ে শংকরাচার্যের প্রিয় জাবালশ্রুতির বচন: 'ব্রহ্মচর্যাৎ এব প্রব্রজেৎ, গৃহাৎ বা, বনাৎ বা…যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ' (চতুর্থ খণ্ড)। অর্থাৎ, যখনই বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, তখনই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বা বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই যাঁহারা সন্ন্যাসী হন, বুঝিতে হইবে তাঁহারা জন্মান্তরে প্রচুর নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বর্তমান জন্মে তাঁহাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।

৬ চতুঃসূত্রীর ভাষ্যে শংকরাচার্য ব্রহ্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে 'সর্বজ্ঞ', 'সর্বশক্তিমান' ইত্যাদি

গীতায় ভক্তিযোগের কথাও প্রচুর আছে। দ্বাদশ অধ্যায়টির নামই তো 'ভক্তিযোগ'। কিন্তু দ্বাদশ অধ্যায় ব্যতীতও অনেক অধ্যায়েই ভক্তির কথা রহিয়াছে। চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান স্বয়ং 'ভক্তিযোগ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' (১৪।২৬) ইত্যাদি। বস্তুতঃ খুব কম অধ্যায়ই পাওয়া যায়, যেখানে ভক্তির কথা একেবারেই নাই। তাহা হইলে 'ভক্তিযোগ' কোন্ নিষ্ঠার—কোন্ যোগের অন্তর্গত? কর্মযোগের অথবা জ্ঞানযোগের? এই প্রশ্ন স্বাভাবিক, কারণ গীতায় 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র কথাই বলা হইয়াছে—ত্রিবিধা নিষ্ঠার কথা নাই, এবং ঐ 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'কেই 'কর্মযোগ' ও 'জ্ঞানযোগ' বলা হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, শংকরাচার্যের মতে পরা ভক্তি আর জ্ঞাননিষ্ঠা একই (গীতা, ১৮।৫৪-৫৫ এবং ১২।১৩-২০'র শাংকরভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

ইহা সুবিদিত যে, ভক্তি দ্বিবিধা—বৈধী ও পরা। সুতরাং শংকরাচার্য যখন পরা ভক্তিকে জ্ঞাননিষ্ঠা বলিতেছেন, তখন বৈধী ভক্তিকে কর্মনিষ্ঠার অন্তর্গত বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইভাবেই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানকে 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এবং এইভাবেই সামঞ্জস্য-বিধান সম্ভব।[৭]

বিশেষণ বারংবার প্রয়োগ করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণও সূত্র করিয়াছেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। সুতরাং 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে সগুণ ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট বলিতে হইবে। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা যে পারমার্থিক নহে, ঔপাধিক, তাহা শংকরাচার্য বারংবার বলিয়াছেন ('সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং চ ন পরমার্থতঃ' ২।১।১৪ ভাষ্য)। নির্গুণ ব্রহ্মই যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য—ইহাও তিনি অসংখ্যবার বলিয়াছেন (৩।২।১১-২১ ভাষ্য)। আর মহর্ষি বাদরায়ণ প্রথমেই 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'—এই স্বরূপলক্ষণের কথা বলিলে উহা ধারণা করা কঠিন হইত, এইজন্য শাখাচন্দ্রন্যায়ে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—ব্রহ্মের এই তটস্থলক্ষণের উপস্থাপনা করিয়াছেন। এই তটস্থলক্ষণ স্বরূপলক্ষণেরই সূচক।

৭ শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে, শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন : যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥ (১১।২০।৬)। অর্থাৎ, মানবগণের কল্যাণবিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়াছি—এই তিনটি যোগ ছাড়া আর কোথাও কোনও অন্য উপায় নাই।

কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে 'দ্বিবিধা নিষ্ঠা' বলিয়া কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ শ্রীভগবান গীতায় পদে পদে ভক্তির কথাও বলিতেছেন। এইজন্যই সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।

"দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার আগে স্বামীজী বলেছিলেন, 'এই মঠের জমিতে আলু প্রভৃতির চাষ করবি, পরে দরকার হ'লে ঐ আলু প্রভৃতি মাথায় ক'রে নিয়ে বাজারে বেচে আসবি। আবার ধ্যানে যখন বসবি একেবারে সমাধি।'…এ-সব কথা যে গেঁথে গেছে। আমাদের প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এ-সব ভুলবো কি ক'রে? ম'লেও ভুলতে পারবো না।…'সন্ন্যাসী শুধু ভিক্ষাদি কর্ম রাখবে'—এ-সব পুরাণ কথা এত কাল চলেছে কিন্তু তাতে কি তৃপ্তি হয়? বিশেষ এখন ঠাকুর-স্বামীজীর আলোক পেয়ে। তাঁরা নতুন আলোক দিয়ে গেছেন। অথবা পুরাণ ভাবকেই নতুন ভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন।"

—স্বামী তুরীয়ানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[১৯২১ সালের শেষদিকে স্বামী দেবানন্দকে লিখিত]

শ্রীমান দেবানন্দ,

একাকী নির্জনে বাস ও ত্যাগতপস্যা যত করবে ততই আনন্দ পাবে, তবে বেশী কঠোরতা তোমার শরীরে চলবে না। ছত্রের অন্নের চেয়ে মাধুকরীর অন্ন অনেক পবিত্র জানবে। মানযশের কাঙ্গাল কখনও হবে না। হিমালয় খুবই পবিত্র ও সাধনোপযোগী স্থান। ঐ সব স্থানে তপস্যা করার সুযোগ মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে। তুমি হিমালয়ে থেকে তপস্যা করবে আনন্দের কথা। ঠাকুর তোমাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন। ভক্তিবিশ্বাস, ত্যাগতপস্যা নিয়ে আনন্দে থাক—এই আমার আশীর্বাদ। ভগবানলাভ ছাড়া শুধু কঠোরতা বা তীর্থভ্রমণাদি যেন তোমার লক্ষ্য না হয়। বিবেকবিচার, ধ্যানজপ ও পাঠপ্রার্থনাদি নিয়েই সময় অতিবাহিত করবে। একান্তে স্থির হয়ে বসে নিয়ত ধ্যানজপ, স্মরণমননে নিযুক্ত থাকাই নির্জনবাসের চরম ফল।

প্রার্থনা করি, ঠাকুরের কৃপায় তোমার মন যেন তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকে। জ্ঞানভক্তি লাভ ক'রে চিরশান্তির অধিকারী হও।

আমার আন্তরিক শুভাশীর্বাদ জানবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

ব্রহ্মানন্দ

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী দেবানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

উদ্বোধন আফিস

১নং মুখার্জ্জি লেন

৪. ১০. ২৫.

কল্যাণবরেষু

তোমার ৺বিজয়ার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে এবং তথাকার আমাদের মিশনের সাধুব্রহ্মচারীগণকে জানাইবে। সাধনভজনে জোয়ার ভাঁটা আছে। ভাঁটার সময়েও ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে সময়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারা যায়। আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা থাকিলে সমস্ত বাধা দূর হইয়া যায়। ব্যাকুলভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপায় নিশ্চয়ই মনে নূতন শক্তি ও উদ্যম অনুভব করিবে। আশীর্ব্বাদ করি যেন তাঁহার পাদপদ্মে দিন দিন তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আমার শরীর এক প্রকার ভাল আছে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

যুগসঙ্কটে শ্রীরামকৃষ্ণবাণী*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

ভারতবর্ষ আজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে। শুধু ভারতবর্ষই নয়, সারা বিশ্বই আজ সঙ্কটের সম্মুখীন। আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বিশৃঙ্খল অবস্থা লক্ষ্য করি; উদাহরণস্বরূপ শিক্ষার ক্ষেত্রের কথা বলা যায়। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকাল আমাদের অনেক জটিল বিষয় শেখান হয়, কিন্তু এই শিক্ষার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। আমাদের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে কিন্তু এরকম ব্যাপার ছিল না। আমাদের শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত যে, ভারতের ভাবী নাগরিকেরা জাতীয় সংস্কৃতির আদর্শগুলি আত্মগত করতে পারে—শুধু এইভাবেই তারা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক হতে পারবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আজকের শিক্ষাপদ্ধতি এক অতি বড় ব্যর্থতা। ফলে জাতিকে যা ঐক্যবদ্ধ ক'রে রাখতো, তা থেকে আজকের ছাত্রসমাজ সরে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মন্দ হতে মন্দতর হয়ে চলেছে। 'জাতীয় আয় শতকরা চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে'—এ ধরনের কথা আমরা কখনো কখনো শুনি। তা সত্যি হতে পারে, কিন্তু গরিবদের অভিজ্ঞতায় তা ধরা পড়ে না, কারণ এই বৃদ্ধির অতি অল্প অংশই তাদের কাছে পৌছয়। তাদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নতিবিধান ছাড়া দেশের কোনও আশাই নেই। এই উন্নতিবিধান শুধু সরকারের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না, সমস্ত সমাজকেই এই কাজে ব্রতী হতে হবে। তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ধনীদের অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে—শুধু তাদের তথা দেশের মঙ্গলের জন্যই নয়, পরোক্ষভাবে ধনীদের নিজেদেরও মঙ্গলের জন্য। ধনীরা আশা করতে পারেন না যে, সামাজিক ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক একচেটিয়া সুযোগসুবিধা তাঁরা চিরকাল ভোগ করতে থাকবেন। যত শীঘ্র তাঁরা গরিবদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, ততই তাঁদের নিজেদের তথা দেশের মঙ্গল।

প্রাচীনকালে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এটা প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে সমাজ ও জাতির সেবা করবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—কিছু স্বাধীনতা জীবনটা উপভোগ করার জন্য, তবে তাও নির্ধারিত সীমানার মধ্যে রাখা হয়েছিল, যাতে জাতীয় জীবন বিপন্ন না হয়। বর্তমানে কিন্তু আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই, যার ফলে এমন সব গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে, যার সমাধান আমরা করতে পারছি না। এবিষয়ে নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমরা সকলেই বেশ

* গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০, ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ আশ্রমের 'বিবেকানন্দ সেন্টিনারী অডিটোরিয়ম'-এর উদ্বোধন উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আশীর্ভাষণের শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ।—সঃ

ভালভাবেই জানি শিল্পে, শ্রমিক মহলে এবং ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আজ কী অবস্থা। এই সব ক্ষেত্রই আজ কলুষিত—চরম স্বার্থপরতার দ্বারা, যা দাবী করছে মৌল অধিকার, কিন্তু জাতির প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে, তার দিকে চেয়েও দেখছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তো অবস্থা আরও মন্দ।

সম্প্রতি কলকাতায় ফুটবল খেলা নিয়ে এক বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকেরা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করলেন। ফলে দশ জনের মৃত্যু হ'ল আর প্রায় পঞ্চাশ জন আহত হলেন। সারা শহর এই ঘটনায় নিদারুণ মর্মাহত হ'ল। পরের দিন আকাশবাণীর কার্যক্রমে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু লোকের মতামত চাওয়া হয়—আগের দিনের ঐ মর্মন্তুদ ঘটনা সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে ফুটবল-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হবে কিনা তা জানতে চেয়ে। বেশীর ভাগ লোকই প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। একজন কিন্তু ঘটনাটির খুবই যুক্তিসহ পুনরীক্ষণ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'প্রতিযোগিতা বন্ধ ক'রে দেওয়ার কী অর্থ? যা ঘটেছে, তা তো আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যহ যে সব ঘটনা ঘটছে, তারই একটি মাত্র। যে ব্যাধি আমাদের সারা জাতীয় জীবনকে কলুষিত করেছে, এ সব ঘটনা সেই ব্যাধিরই লক্ষণ মাত্র। তাই প্রতিকারের উপায় হচ্ছে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন।' ঐ ভদ্রলোকই ঠিকঠিক রোগনির্ণয় করেছিলেন। সংকটটা বহির্জগতে নয়—মানুষেরই অন্তরে। তাই ধর্মের দ্বারাই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব—সংবিধান বা পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা নয়। ধর্ম বলতে আমি অবশ্য কতগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের কথা বলছি না—আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথাই বলছি।

আমেরিকা থেকে ফেরার পরে দক্ষিণ ভারতের কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা স্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে কেন আসছেন না—রাজনীতিতে এসে দেশকে কেন স্বাধীন করছেন না?' উত্তরে স্বামীজী বললেন, 'আমি কালই তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারি, কিন্তু তোমরা কি তা রাখতে পারবে? মানুষ কোথায়? আগে মানুষ তৈরী করো। তখন স্বাধীনতা আপনি আসবে।' আর মানুষ তৈরী হবে কিসের দ্বারা? পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা নয়—ধর্মেরই দ্বারা, যে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

আজকের ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে এই যে ব্যাপার আমরা দেখছি, এটা নতুন কিছু নয়। আপনারা যদি পৃথিবীর ইতিহাস, বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, লক্ষ্য করবেন যুগে যুগে এই ব্যাপার প্রায়ই ঘটেছে। আমরা বহু অবক্ষয়ের যুগের সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহামানবদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাঁরা যুগোপযোগী এবং যুগের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক বাণীর সাহায্যে সমাজকে পুনর্গঠিত করেছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে সেই বাণীর প্রকাশ ঘটেছে। 'ঈশদূত যীশুখ্রীষ্ট' বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন:

'সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল এবং একটি শূন্য গহ্বর সৃষ্টি হইল। আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল—হয়ত উহা পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর; উহারও পতন হইল, আবার একটি উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সংসারের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমরা এইরূপ উত্থান-পতন দেখিয়া থাকি, আর সাধারণতঃ উত্থানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, পতনের দিকে নয়।

কিন্তু সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে, কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বজগতের ইহাই প্রকৃতি। কি চিন্তাজগতে, কি পারিবারিক জগতে, কি সমাজে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে—সর্বত্র এই ক্রমিক গতি, সর্বত্রই উত্থান-পতন চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে প্রধান ব্যাপারগুলি—উদার আদর্শসমূহ—সময়ে সময়ে সমাজের মধ্যে প্রবল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারপর অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমন্থন করিবার জন্য কিছুকালের মতো ইহা অদৃশ্য হয়, যেন ঐ ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার জন্য, উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্য, পুনরায় উঠিবার—পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে উঠিবার বল সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল ইহা কোথায় ডুবিয়া যায়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ উত্থান-পতনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।'

গীতাতেও আমরা পাই :

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—হে অর্জুন, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করি।

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্টদের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। (৪।৭-৮)

এইভাবে আমরা পেয়েছি শ্রীরামচন্দ্রকে, শ্রীকৃষ্ণকে, শ্রীবুদ্ধকে, শ্রীচৈতন্যকে এবং এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণকে। আজ এই অবক্ষয়ের যুগে শুধু ভারতের জন্য নয়, সারা বিশ্বের জন্যই প্রয়োজন এক নতুন আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহামানবের এবং নতুন বাণীর। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যেই আমরা সেই নতুন মহামানবকে এযুগে পেয়েছি। আমরা যদি বর্তমান অবস্থা এবং যে-বাণী শ্রীরামকৃষ্ণ রেখে গেছেন, বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো যে-যুগমানবের জন্য সারা বিশ্ব দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় ছিল, তিনিই সেই মহামানব। বিশেষতঃ আমরা যারা ভারতবাসী, আমাদের জন্য তাঁর বাণী অপরিহার্য—যদি আমরা আমাদের জাতি ও সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চাই, পুনরায় একটি মহান জাতিতে পরিণত হতে চাই এবং অন্যান্য জাতিরা যারা ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর জন্য অপেক্ষমাণ, তাদেরও সেই বাণীর অংশীদার করতে চাই। অতীতেও আমরা একাজ করেছি এবং এযুগেও পুনরায় সেই কাজই করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের বাণী মথুরা থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং শ্রীবুদ্ধের বাণী সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে। শ্রীরামকৃষ্ণের নববাণীর বিশ্বময় বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাঁর বাণী আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশে পরম আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হচ্চে। কিন্তু কী তাঁর বাণী? যত সংক্ষেপে পারি, তা আমি বলতে চেষ্টা করবো, কেননা ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি।

যুক্তি ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল সংশয়ী বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ অনুভূতিসহায়ে প্রমাণ করলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব—যে-অস্তিত্বকে বিজ্ঞানীরা অস্বীকার ক'রে এসেছিল, কারণ তাদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ ছিল না। তিনি যে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্বই প্রমাণ করলেন, তা নয়; আরও প্রমাণ করলেন যে, সব ধর্মই সত্য এবং সব ধর্মই একই পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরোপলব্ধি করিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী অতীব অর্থবহ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে,

কারণ এদেশে অনেক ধর্ম রয়েছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে লড়াই ও রক্তপাতও ঘটছে। একমাত্র এই বাণীই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সুসংহত ক'রে এক মহান জাতিতে পরিণত করতে পারে।

পরস্পর বিবদমান এবং প্রায়ই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত, শত শত সমাজগোষ্ঠীতে বিভক্ত আমাদের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন এই সত্যের প্রতি যে, এই সব বাহ্য ভেদের পিছনে একই আত্মা বিরাজমান এবং শুধু এই সত্যটি না জানার জন্যই যতকিছু অশান্তির সৃষ্টি। তিনি বললেন, জীবই শিব; শুধু তাই নয়; আরও বললেন, যে-কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবসেবা করেন, তিনি ভগবানলাভ করেন। আজকের দিনে আমাদের কাছে এই বাণী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকার ভেদ, কর্ম ও উপাসনার ভেদ—সব রকমের ভেদ এই বাণী নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কাজ সাধারণতঃ মনকে বহির্মুখী ক'রে ভগবানলাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী ভগবানলাভরূপ আমাদের জাতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনে যে-কোন রকমের কাজ করতে আমাদের সাহায্য করে।

অতএব এই মহান আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে এবং অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে সমাজের অনগ্রসর জনগণকে উন্নীত করতে আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। জনগণকে উপেক্ষা করাই যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের প্রধান কারণ—একথা স্বামীজী আমাদের বলে গেছেন। শত শত বছর ধ'রে আমরা জনসাধারণকে অবহেলা করেছি এবং তাদের অধঃপতিত ক'রে রাখার জন্য তাদের ওপর সব রকমের নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'রে এসেছি। আর তারই ফল হয়েছে সারা জাতির দাসত্ব। যেহেতু জনসাধারণ রাষ্ট্রের কোনও ব্যাপারেই আগ্রহী ছিল না, সেইহেতু যে-কেউ ভারতের বাইরে থেকে সহজেই এদেশে এসে রাজ্য বা সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারত। ভারতীয়েরাই শাসন করুন বা বিদেশীরাই শাসন করুন—দুই-ই জনসাধারণের কাছে সমান ছিল, কেননা তাদের ভাগ্য—দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ—একই থাকত। এই অবস্থায় সারা জাতির পক্ষেই দাসত্ব ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, কারণ উচ্চবর্ণের লোকেরা জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারত না। তাই আবার আমি স্বামীজীর সেই বাণী—জনগণকে অবহেলা না করার বাণী আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা ধারণা এবং সম্পদ ও সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ অহংকার থেকে নেমে এসে ধনী ও উচ্চবর্ণের লোকদের আজ জনগণের জন্য কাজ করতে হবে—শুধু জনগণের অবস্থার উন্নয়নের জন্যই নয়, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যও। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ আমরা এমনভাবে কাজ ক'রে চলেছি যে, নিঃক্ষেপকারীর নিজেরই কাছে ফিরে-আসা হাতিয়ারের মতো এ-সবের প্রতিক্রিয়া অবশেষে আমাদেরই ওপর আসবে এবং আমাদের নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে, কারণ জনগণ একদিন অবশ্যই জেগে উঠবে এবং সেই উত্থানের ফলে জাতির যা কিছু ভাল সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের জনগণকে সাহায্য করতে এবং উন্নীত করতে হবে। অতএব, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানাই—আপনারা এই কাজে প্রত্যেকে নিজে নিজে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হোন এবং এই ধরনের কাজ করবার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তুলুন। বন্ধুগণ, সরকারের কাছে বেশী কিছু

আশা করবেন না, কেননা সরকারের পক্ষে বেশী কিছু করা সম্ভব নয়। সরকার যে-সব আইন ও বৃহৎ পরিকল্পনা করেছেন, বা ভবিষ্যতে হয়তো করবেন ·· সে-সব আমাদের সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব নয়। সুতরাং সরকারের কাছে প্রত্যাশা ক'রে এবং তাঁদের প্রতি দোষারোপ ক'রে লাভ কি?—কারণ, তাঁরাও তো এই সমাজেরই অঙ্গ। নিজেরাই কাজ করুন এবং তা-ই—যে-সরকারই ক্ষমতায় আসুন না কেন, তাঁদের ঠিক পথে চালিত করবে। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে আমরা তাঁকে বুঝতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের তড়িৎপ্রবাহশক্তিকে তিনি নামিয়ে এনেছেন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও কাজে বহুভাবে কার্যকরী হবে। অতএব, আসুন আমরা স্বামীজীকে অনুসরণ করি এবং তাহলে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পৌছব। সে লক্ষ্য হ'ল এই নানাধর্মী স্বার্থপর জনপুঞ্জকে অতীতের যে-কোন সময়ের চেয়ে অনেক বড় একটি সমধর্মী মহান অখণ্ড জাতিতে পরিণত করা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

ধর্মপ্রসঙ্গ

স্বামী দেবানন্দ

ধর্মপ্রসঙ্গের কথা মনে হ'লে সর্বপ্রথমেই আমার স্মরণ হয় মহাভারতের সেই সুন্দর শ্লোকটি: 'ন ধর্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে। সদা হি ধর্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা যথা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ততে ॥'—মৃত্যু মানুষের সময়-অসময়ের প্রতীক্ষা করে না; অতএব মানুষের ধর্মসাধনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, মানুষ যখন মৃত্যুমুখেই রয়েছে তখন ধর্মানুষ্ঠান সব সময়েই শোভা পায়। 'নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্।'—কর্ম শেষ হোক বা না হোক কোন কিছুর জন্যই মৃত্যু প্রতীক্ষা করে না। তাই শাস্ত্রে আছে, 'যুবৈব ধর্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতম্। কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি ॥'—যখন মৃত্যুর সময়-অসময় নাই তখন যুবা বয়স থেকেই ধর্মকর্ম করা উচিত। মৃত্যুর সময় যখন অনিশ্চিত তখন ধর্মানুষ্ঠানে বিলম্ব করা মূর্খতা। কে জানে কার কখন মরণের দুন্দুভি কানে বেজে উঠবে! তাই, 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।'—মৃত্যু যেন কেশাগ্র ধ'রে আছে ভেবেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে কালবিলম্ব না ক'রে। 'অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।'—সর্বগ্রাসী মৃত্যু প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের প্রাণ হরণ করছে। সব ধন-রত্নের বিনিময়েও এক মুহূর্ত আয়ু ফিরে পাওয়া যায় না। তাই ধর্মসাধনে কালক্ষেপ করা অনুচিত। মৃত্যু নিকটবর্তী জেনেই সর্বদা ধর্ম-সঞ্চয় করতে হবে। মূর্খ সে, যে বার্ধক্যে ধর্মকর্ম করার আশায় থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দজীর প্রিয় এই সুন্দর শ্লোকটি যেন আমাদের স্মরণ থাকে: 'য ইচ্ছতি হরিং স্মর্তুং ব্যাপারান্তগতৈরপি। সমুদ্রে শান্তকল্লোলে স্নাতুমিচ্ছতি দুর্মতিঃ।'—সংসারের সব কর্ম শেষ ক'রে যারা তাঁকে আরাধনা করবে মনে করে, তাদের সেই আশা বৃথা, যেমন সমুদ্রের জল শান্ত হ'লে অর্থাৎ ঢেউগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হ'লে যারা স্নান করার আশা করে, তাদের সে আশা সম্পূর্ণ মূর্খতা।

কারণ, সমুদ্রের ঢেউ কখনও একেবারে শান্ত হয় না। তেমনি সংসারের সব কর্মও কখনও শেষ হয় না। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে ডাকার সুযোগ ভাগ্যে আর হয় না। যে-ব্যক্তি তরঙ্গের মধ্যেও নামতে পারে তারই যেমন স্নান করা হয়, তেমনি যে-ব্যক্তি শত কাজকর্ম, দুঃখ, ব্যথা, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁকে ডাকতে পারে তারই জীবন ধন্য হয়। নচেৎ সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ কারও ভাগ্যেই প্রায় হয় না। জরা, ব্যাধি, দুঃখ, দারিদ্র্য, জ্বালাযন্ত্রণা এই দ্বন্দ্বময় সংসারে লেগেই আছে। তাই সুদিনের আশায় বসে থাকা বৃথা। যাঁরা বিবেকী ও ভাগ্যবান তাঁরা অল্পবয়স থেকেই তাঁকে আশ্রয় করেন, বার্ধক্যের জন্য প্রতীক্ষা না ক'রে। যাঁরা ভক্ত, জ্ঞানী ও বিবেকী তাঁরা শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁকেই আশ্রয় ক'রে থাকেন সম্পদে বিপদে।

কাশীতে পূজ্যপাদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর মুখেও এ-সব কথা আমরা বহুবার শুনেছি। ৬১ বছর পূর্বে ১৯১৯ সালে তাঁর কাছে দুটি মাস আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল কনখল মিশন থেকে এসে। তাঁর কঠোর তপস্যা ও ত্যাগবৈরাগ্যের স্মৃতি ও হৃদয়স্পর্শী বাণী আজও আমাদের অন্তরে অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। তিনি পূর্বোক্ত শ্লোকটি বারবার বলতেন উদাত্ত কণ্ঠে। আমরা তাঁর সংস্পর্শে এসে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হই। তাঁর মত শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত, কঠোর তপস্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গলাভ মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে। কাশীধামে তাঁর মুখে শাস্ত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা ও গূঢ় মর্ম শুনে আমরা মুগ্ধ হতাম।

যে-সবের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে আমরা মায়া-মোহাচ্ছন্ন হই, সে-সবই যে অনিত্য, অধ্রুব, নশ্বর তা আমরা একটুও ভেবে দেখি না। বিষয়ের আনন্দ যে ক্ষণিক, একটু পরেই যে বিলীন হয়ে গিয়ে বিষাদ ও নিরানন্দে পৌঁছিয়ে দেবে তা ভুলে যায় মানুষ! এমন দুঃখ নাই যা মায়ামুগ্ধ সংসারাসক্ত ব্যক্তি ভোগ না করে। বাসনাভিভূত হয়েই মন নিজের বিনাশ নিজেই সাধন করে! বিষয়সুখ-মদিরায় যারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, উন্মত্ত, তারাই জন্ম জন্ম কষ্টভোগ করে ত্রিতাপ-অনলে দগ্ধ হয়ে! অনন্ত দুঃখব্যথার ভীষণ কষাঘাতেও যাদের মোহঘুম ভাঙে না, তাদের মনুষ্যত্ব কোথায় !!

অন্তহীন কামনাবাসনার পিছনে অনন্তকাল ধরে ঘুরলেও সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভের কোনও আশা নাই। মোহ ও অজ্ঞানতাবশতই আমরা সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি ভগবানকে ভুলে! অবিদ্যা ও মূর্খতাবশতঃ এ মরসংসারকেই সার ভেবে জন্ম জন্ম আসক্ত হই, শত দুঃখব্যথা, ঘাত-প্রতিঘাতেও আপাতরমণীয় এই সুখ-ভোগাশাকে ত্যাগ করতে পারি না!! তাই, আমাদের আর্য-ঋষিরা বলেছেন: 'বিজ্ঞানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্, ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা!'—সংসারের যাবতীয় সুখ, অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর ও বিপজ্জালে পরিপূর্ণ জেনেও আমরা কামনাবাসনা ত্যাগ করি না! মোহের—অজ্ঞানের কি আশ্চর্য মহিমা! চতুর্দিকের শোকতাপ, দুঃখব্যথার আগুন নিয়ত দেখেও আমরা বেহুঁশ হয়েই আছি! জন্মমৃত্যু, জরাব্যাধি ও ভোগবাসনার নিদারুণ কষ্ট ও বিষময় কুফলের কথা একটুও চিন্তা করি না! তাই রাজা যুধিষ্ঠির বলেছেন: 'কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।' নিয়ত ছোট বড় অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কবলে যাচ্ছে দেখেও আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি হতে পারে? একবারও ভেবে দেখি না এই ভোগপিপাসার রাজ্যে সেই নিত্যসুখ, শাশ্বতী শান্তির আশা কোথায়? কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা বলছেন: 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।' —অতুল ঐশ্বর্য কোনদিনই মানুষকে চিরতৃপ্তি দিতে পারে না। অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ভোগসমূহের

দ্বারা চিরতৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব। ভোগের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণার বীজ কখনও বিনষ্ট হয় না। ভোগের স্বভাবই এই যে, তা যতই ইন্ধন পায় ততই দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। পৃথিবীর সকল সম্পদ লাভ করলেও ভোগী ব্যক্তির তৃপ্তি নাই। একসময়ে রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের অভিশাপে জরায় আক্রান্ত হন। এজন্য তাঁর অন্তর দগ্ধ হতে থাকে দুরন্ত কামনাবাসনায়। তখন তাঁর পঞ্চমপুত্র পুরুর নবযৌবন লাভ ক'রে হাজারবছর বিষয়ভোগ ক'রেও: 'নাতৃপ্যৎ'—তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। পরে তাঁর মোহজাল কাটলে তিনি একদিন পুরুকে ডেকে বললেন: 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।' —কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা তৃষ্ণা কখনও দূরীভূত হয় না। শত ভোগেতেও তৃষ্ণা মেটে না, পরন্তু ঘৃতাহুতির দ্বারা আগুন যেমন বেড়েই চলে, তেমনি উপভোগের দ্বারা ভোগতৃষ্ণা দিনদিন বাড়তেই থাকে। তাই ত্যাগেই শান্তি।

'ভোগবাসনা হ'ল লক্ষফণা সাপ।' যারা ভোগোন্মত্ত তাদের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হতেই হবে। 'মোহ এব মহামৃত্যুঃ।'—যারা মোহান্ধ তারা কালরূপী জাঁতায় জন্ম জন্ম ধরেই পিষ্ট হ'তে থাকবে। প্রজ্জ্বলিত ঘরে তৃণশয্যায় শুয়ে যারা কল্পনায় গড়ে তোলে সুখের স্বর্গলোক, তাদের বুকে এসে বাজবেই তীব্র বিষময় বেদনা দুদিন যেতে না যেতেই। সর্বগ্রাসী মৃত্যু সময়-অসময় দেখে না বা কাউকেই ছাড়ে না। 'মৃত্যুশ্চ নৃত্যতি সদা কলয়ন্ দিনানি।'—বল, বীর্য, আয়ু হরণ করতে করতেই দিনরাত নৃত্য করছে মৃত্যু আমাদের চতুর্দিকে! তুচ্ছ নশ্বর বস্তুতে যার যত বেশী আসক্তি, তার তত বেশী দুঃখ, ব্যথা ও অশান্তি। তুচ্ছ সুখাসক্তি ও ভোগবাসনাই মানুষকে পুনঃপুনঃ উত্তম, অধম দেহ ধারণ করায়। এই জন্মপ্রবাহ ও দুঃখস্রোতের মূল কারণই হ'ল আসক্তি ও সকাম কর্ম। তাই শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে বলছেন, 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥' (৩।১৯)। 'অতএব তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে যাও; কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ অবশ্যই মুক্তিলাভ করবে।' উপনিষদেও আছে—'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।' (কৈবল্যউপঃ)। ত্যাগের দ্বারাই সেই চিরকল্যাণময় অমৃতত্ব লাভ করা যায়। আন্তর রাজ্যে বা আত্মাতেই শান্তি। পরিবর্তনশীল দুঃখময় বাহ্যজগতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আশা নাই। উৎসাহ-উদ্যমহীন, বিবেকবিচার-শূন্য, সংসারাসক্ত পুরুষ কখনও সফলকাম হ'তে পারে না। যাঁরা বাসনাশূন্য, সরল, পবিত্র, বীর্যবান ও অধ্যবসায়শীল তাঁরাই সিদ্ধিলাভ ক'রে থাকেন। যিনি জ্ঞানী ও নিরভিমান তিনিই প্রকৃত চক্ষুষ্মান। যখন বিবেক জাগ্রত হয়, তখন মায়ামোহপূর্ণ দুঃখময় সংসার হতে শান্তির রাজ্যে যাবার জন্য আগ্রহ হয় এবং মানুষ নিরন্তর আপ্রাণ চেষ্টা করে পরিত্রাণ লাভের জন্য। যেখানে ত্যাগ-সংযম, জ্ঞানভক্তির পূর্ণ বিকাশ সেখানেই প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী একদিন তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন: 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?' 'যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব লাভ করতে পারব না, তা দিয়ে আমি কী করবো?'—যা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সেই সব তুচ্ছ নশ্বর পদার্থ নিয়ে আমি কি করবো? আমি সেই আত্মজ্ঞানই চাই যার দ্বারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তি বা চিরশান্তি লাভ করা যায়। যে আনন্দ অনন্তকাল স্থায়ী, যে আনন্দ দুঃখব্যথা, অভাববোধকে চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেয় আমি সেই উৎকৃষ্টতম ব্রহ্মানন্দই লাভ করতে চাই।' এই ছিল মৈত্রেয়ীর বক্তব্য। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য

মৈত্রেয়ীর একথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে উপযুক্ত অধিকারিণী বুঝে সেই সূক্ষ্ম ও দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিলেন। 'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।' (গীতা, ৬।২২)। যা লাভ করলে অন্য কোন লাভ তার চেয়ে বেশী মনে হয় না এবং যে আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'লে মহাদুঃখেও বিচলিত হ'তে হয় না সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই মৈত্রেয়ীকে বললেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য।

ভগবান রামকৃষ্ণদেব বলতেন: দুর্লভ মানবদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে তার জন্মধারণ করাই বৃথা। শাস্ত্রও বলেছেন: যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপরতোঽত্র কঃ।' মুক্তির সোপানস্বরূপ এই দুর্লভ মানবদেহ লাভ করেও যে নিজেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে না তার চেয়ে পাপী আর কে আছে? তাই 'কাঁচা আমি', 'অবিদ্যার আমি'কে পরিত্যাগ ক'রে মানহুঁস' হয়ে সংসারে থাকলে আসক্তি ও অহংকাররূপী কালসাপ তাকে আর আক্রমণ করতে পারে না। 'নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।' ত্যাগী, অনাসক্ত যাঁরা তাঁদের সংসারই তপোবন। নির্বিষয় মনই চিরপবিত্র। বিষয়ে অনাসক্তি ও সর্বভূতে প্রেমপ্রীতিই সকল ধর্মের মূলমন্ত্র। যাঁরা সিদ্ধিতে আত্মহারা ও অসিদ্ধিতে ধৈর্যহারা না হয়ে ধীর স্থির থাকেন ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে, তাঁরাই প্রকৃত নিষ্কামকর্মী বা কর্মফলত্যাগী।

তীব্র বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা ব্যতিরেকে এই জগজ্জাল হ'তে অব্যাহতি লাভের অন্য কোন উপায় নেই। মুমুক্ষত্বই অর্থাৎ মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছাই যাবতীয় ধর্মের ভিত্তি ও প্রধানতম অবলম্বন। সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের পক্ষে সৎসঙ্গ ও বিবেকবিচারই একমাত্র ঔষধ। ভগবান রামকৃষ্ণদেবও বলতেন: 'বিবেক-বৈরাগ্য ছাড়া ধর্মলাভ হয় না।...মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত।...বাসনাহীন মন যেন শুক্নো দেশলাই, একটু ঘসলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে।... তেমনি যে সরল, পবিত্র, সত্যনিষ্ঠ, তাকে একবার উপদেশ দিলেই ঈশ্বরানুরাগের উদয় হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শতশতবার উপদেশ করলেও কিছুই হয় না।...সংসারাসক্তি থাকলে সব সাধনাই বিফল হয়ে থাকে।...বদ্ধ সংসারী লোকের কিছুতেই হুঁস হয় না নানা দুঃখকষ্ট ও বিপদে পড়লেও!...সরলবিশ্বাস ও অকপটতা থাকলেই ভগবান লাভ হয়।'

কামনাবাসনাশূন্য প্রশান্ত নির্মলচিত্তেই স্বর্গীয় ভগবৎপ্রেম প্রবাহিত হয়ে থাকে। শাস্ত্র এবং আমাদের আর্য-ঋষিরা সমস্বরেই বলেছেন: ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্ব লাভ হয়। আসক্তি, অহংকার একবিন্দু থাকলেও মুক্তি বা ভূমাসুখের কোনও আশা নাই। সরলতা, পবিত্রতা, ত্যাগতপস্যা ব্যতীত সংসারসাগরের পারে কেহই যেতে পারে না। ভারতের ধর্মকর্ম সবই এই ত্যাগের সুমহান ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের সেই শাশ্বত-বাণী যেন আমরা না ভুলি: 'তমেব বিদিত্বাঽতি-মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' এই জন্মমৃত্যুর পারে যেতে হ'ল ভগবানকেই জানতে হবে। তাছাড়া জন্মমৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হবার অন্য কোনও পথ নাই। 'মহতা পুণ্যপুঞ্জেন'—বহু-পুণ্যফলে এ দেহরূপী নৌকা আমরা পেয়েছি ভবসাগর পার হবার জন্য। যেন মূর্খতা ও কর্মদোষে সৎসঙ্গ ও বিচাররূপী চক্ষুদুটা হারিয়ে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন না হই, বারবার ভোগাকাঙ্ক্ষার জ্বলন্ত পাবকে দুর্লভ মানব-জীবনকে যেন আহুতি না দিই।

যে ব্যক্তি ভগবানকে ভুলে ধর্মকর্ম বিসর্জন দিয়ে কামনাবাসনার অনলে দুর্লভ মানবজীবনকে আহুতি দেয়, তাকে লক্ষ্য ক'রে আমাদের আর্য-ঋষিরা বলেছেন: 'ধিক্ তস্য জন্ম কুমতেঃ

পুরুষাধমস্তু।'—সেই মূর্খ পুরুষাধমকে ধিক্কার! শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দও বলেছেন, 'যাদের মনুষ্যত্ব নাই, তারাই ক্ষণিক সুখলাভের জন্য অনন্ত সুখকে বলি দেয় এবং জন্ম জন্ম মহাকষ্ট ভোগ করে জ্ঞানবিচারের অভাবে। যতদিন না মনের গলদ বের ক'রে তার সম্যক্‌নাশ ক'রতে পারবে ততদিন সেই ধর্মরাজ্যের বা চিরশান্তির পথের সন্ধান কোন উপায়েই পাবে না।' সংসারবন্ধনের মূল কারণ আসক্তি ও অজ্ঞান দূর না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি বা চিরশান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আসক্তি ও অহংকাররূপী কালসাপ যাদের দংশন করে, তাদের দুঃখব্যথার অন্ত নাই, তাদের দুর্গতি ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। অজ্ঞান-আসক্তি দূর না হওয়া পর্যন্ত জন্মান্তরস্রোত রোগশোক, জরামৃত্যু চলতেই থাকবে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হোক, একবার পড়তে পারলেই অমর হওয়া যায়; কেউ যদি স্তবস্তুতি ক'রে পড়ে, সেও অমর হয়, আর কাউকে যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয় তেমনি ভগবানের নাম জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হোক, নিলে তার ফল হবেই হবে।'

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

তৃতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস করছেন। শরীর কালব্যাধিতে পর্যুদস্তপ্রায়, কিন্তু তিনি সর্বদাই লোককল্যাণের ভাবে বিভোর থাকেন।

আজ ৪ঠা মার্চ, ১৮৮৬ খ্রীঃ। বৃহস্পতিবার, ২১শে ফাল্গুন, ১২৯২। শিবচতুর্দশী।

নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, যোগীন্দ্র, বুড়ো-গোপাল, মাষ্টারমশাই একত্রে গঙ্গাস্নান করেন।

মাষ্টারমশাই গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফিরে যান। স্কুল করেন। কাশীপুর বাগানে প্রত্যাবর্তন করেন বিকাল সাড়ে পাঁচটায়। সেখানে দেখেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাপস নরেন্দ্রনাথ বাগানের পথে পায়চারি করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শরৎচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

এদিকে ভক্ত কালীপদ ঘোষ পুকুরের ঘাটে বসে হিসাবের খাতাপত্র দেখছিলেন। হুটকো গোপাল বাগানবাড়ীর হিসাব রাখতেন। সম্ভবতঃ কালীপদ ঘোষ মুরুব্বি রামবাবু ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে আপসের একটা চেষ্টা করছিলেন।

মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রাখালচন্দ্রের। রাখাল বলেন: "আজ একটি নূতন [বিষয়] শিখলুম।

"গিরিশবাবু বলছিলেন, ভূধর সাহেব ডাক্তার বত্রিশটাকা ফিস্ দেবে। দিগ্‌গে। যেমন পরমহংসদেব বলতেন, 'সেজবাবু (মথুর বিশ্বাস) আমায় [কেউ] মানলে আহ্লাদ করতো।' [ভাবটা এই,] মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু।"

ভূধর চাটুজ্যে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির শিষ্য। তাঁর কলকাতার বাড়ীতেই শশধরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ হয়েছিল। বেদব্যাসে (মাঘ, ১২৯৪ সালে) এ-খবর প্রকাশিত হয়। রক্ষণশীল শশধর তর্কচূড়ামণির পত্রিকা লিখেছিল, 'মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্যের পর সেরূপ ভগবদ্ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রামকৃষ্ণ যেরূপ অহেতুকী ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে সাহস হয় না।'

মাষ্টারমশাই বলেন রাখালকে : "গানে আছে, 'মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে।'"

রাখাল : 'আপনার নাম করে জিজ্ঞাসা করব।'

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। বাগানবাড়ীর দোতলায় ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র যান। তাঁর পিছনে কিছুটা দূরত্ব রেখে মাষ্টারমশাই ঘরে ঢোকেন। সেবক শশী লুকিয়ে এসে মাষ্টারমশায়ের পাশে বসেন। মাষ্টারমশায়ের পায়ে হাত দেন। তিনি বিস্মিত হন। সেবক রাখালচন্দ্র মাষ্টারমশাইকে বলেন : 'চলুন আমরা নেবে যাই।'

মাষ্টারমশাই নেমে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সেবক শশী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : 'মাষ্টারমশাই চোরটির মত এসে চলে যাচ্ছেন।'

করুণাপরবশ শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে ডেকে পাঠান। মাষ্টার ঘরে ঢুকলে তাঁকে নিকটে বসতে বলেন।

৺শিবরাত্রি। সকলেই ভাবে মাতোয়ারা যেন। উপরের হলঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি। সেবানিরত কয়েকজন যুবকও উপস্থিত। সিদ্ধির সরবৎ ও খাবার শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে রাখা হয়। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহজানন্দ। তিনি বলতেন, 'তিনি কারণানন্দদায়িনী। তাঁকে লাভ করলে সহজানন্দ হয়।' তিনি সিদ্ধি স্পর্শ করেন না। খাবার একবার মাথায় ছোঁয়ান মাত্র।

গিরিশচন্দ্র বলেন : 'ও তো এখনও এল না।' শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসেন মাত্র।

এমন সময় ভক্ত কালীপদ ঘোষ প্রবেশ করেন। তিনি সম্ভবতঃ শিবসহচর নন্দী সেজে-ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেন : ও কে ?

ক্রমে ভক্তগণ ঠাকুরের ঘর হতে বিদায় নেন।

দোতলার হলঘরের সংলগ্ন ছোট ঘরটিতে থাকতেন রাখাল। মাষ্টারমশাই খাওয়া-দাওয়ার পর রাখালের ঘরে যান। মাষ্টারমশাই কথাপ্রসঙ্গে রাখালের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল। জিতেন্দ্রিয়। তিনি বলেন : '[স্ত্রীকে] মনে আছে, তবে আপনাকে যেমন [দেখছি জানছি সেরকম কিছু নয়।]'

মাষ্টারমশাই : 'সে (রাখালের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী) যদি ভাবে ?'

রাখাল : 'অভ্যাস হয়ে গেছে—প্রায় বেশী [দিন] দেখা হয় নি।

'দূরে থাকা ভাল।'

রাখালের মনে বৈরাগ্য প্রবল। তাঁর তীর্থে যাবার আকাঙ্ক্ষা।

রাখাল বলেন মাষ্টারমশাইকে : 'তীর্থে গেলে দুবছর সাধনের কাজ হয়।

[আপনি চৈতন্যভাগবত বেশ সুন্দরভাবে পড়েন।] আপনার কাছে পড়া শিখবো।'

অপর এক দৃশ্যপট। প্রেমোন্মাদের প্রসঙ্গ চলেছিল। গিরিশচন্দ্র কালীপদকে বাগানবাড়ীর খরচপত্রের হিসাবের কথা বলেন। আলোচনাতে গিরিশচন্দ্র বলে ওঠেন : '…করতে পার তবে হবে —হিসাব-ফিসাব হবে না।'

এদিকে আকাশের উত্তরপূর্ব কোণে বিদ্যুতের চমক ও মেঘের ডাক সকলকে সচকিত করে।

যুবক তাপসেরা যাঁরা উপবাস করেছিলেন, তাঁরা ৺শিবপূজার আয়োজন করেছিলেন। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধূর্জটির বেশে নরেন্দ্রের রূপ হয় নয়নানন্দকর। অনুমান করা যেতে পারে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এই বেশে দেখে খুব প্রীত হয়েছিলেন।

মাষ্টারমশাই সেখান থেকে চলে আসেন। নিঃসঙ্গ হয়ে যান। বাগানে পায়চারি করতে করতে থামেন ধ্যান করবেন বলে। নরেন্দ্রনাথ সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করেন: 'কে?'

মাষ্টারমশাই: 'নাহং

সেদিন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। পাগলিনী[১] আজ বেশ উপদ্রব করেছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে প্রথম ঠাকুরকে দেখেছিল। মিষ্টকণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত গাইত। কাশীপুর বাগানে তার অকস্মাৎ উপদ্রব সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুলত। প্রহারাদিতেও তাকে ক্ষান্ত করা যেত না। তাকে বাগানের বাইরে দিয়ে আসা হয়।

সেবক নিরঞ্জন গিয়েছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের নিকটে। বিষাদমগ্ন সেবকেরা শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য চিন্তিত। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন যে গলার বাইরের ঘায়ে গাঁদা পাতা দিতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হল।

এদিকে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে নীরবে নিভৃতে গড়ে উঠছিল এক বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রস্তুতি। মহানায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ। সকলের বা অধিকাংশের অলক্ষ্যে তাঁর নির্দেশে তাপসদের মধ্যে চলেছিল জপধ্যান, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, ভজন-কীর্তন, কখনও হাস্য-কৌতুক। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল। দেখা গেল আন্তরিক ভালবাসা। 'এত প্রবল ভালবাসা যে, বাপ-মা, আত্মীয়স্বজন সকলই ভুলিয়া যাইল। এই কয়জন সর্বদা একত্রে থাকিলে বোধ করিত যেন স্বর্গলাভ হইল; তাহাও নয়—স্বর্গ বা মর্ত ভাবিবার সময় তাহাদের ছিল না। সকলের হৃদয় হইতে ভালবাসার একটি মহা উৎস উঠিয়াছিল। জলন্ত প্রত্যক্ষ ভালবাসা।'[২]

প্রত্যক্ষ অংশভাক্ সেবক শরৎ (পরে স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন: '১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামীজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুইতিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন ঐ কাব সুসিদ্ধ হইলেই আবার

১ গিরিশচন্দ্র এই উন্মাদিনী রমণী সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন: "সে পাগলী ধন্য! পাগল হোক আর ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো অষ্টপ্রহর চিন্তা করছে! সে যে ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।" (কথামৃত ২।২৬।৩) এই পাগলিনী গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকে (প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৬ খৃঃ ১২ই জুন) স্থান পেয়েছে। সেখানে পাগলিনী পরমা সাধিকা, সাধনার উচ্চস্তরে উপনীতা।

২ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান, ১৩৮০, পৃঃ ২৩

পূর্ববৎ সুস্থ হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মতো সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধারণা সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।'[৩] তদানীন্তনকালের প্রাত্যহিক চর্যা হতে সুস্পষ্ট যে নরেন্দ্র 'ঐ ধারণা' অনেক সময়েই ধরে রাখেন নি বা রাখতে পারেন নি।

নরেন্দ্রনাথ ও কয়েকজন ব্রতোপবাস করেছিলেন।[৪] সারারাত পূজা জপধ্যান করার অভিলাষ। গোলমালে যাতে ঠাকুরের বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত না হয় সেজন্য 'বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূর পূর্বে অবস্থিত রন্ধনশালার জন্য নির্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন' করা হয়েছিল।

এই ঘরটি সম্বন্ধে শ্রীম'র উক্তি স্মরণযোগ্য। দোতলা বাসগৃহের পূর্বদিকে ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহ। "উত্তর-পূর্ব দিকের একটি গৃহ দেখাইয়া" শ্রীম বলেন, "এটি ছিল অশ্বশালা। Here the disciples practised austerities. পূর্বদিকের ঘরটি দেখাইয়া বলিলেন, here oneday the would-be Swamis, forgetting the external world, danced in joy divine. And on their lips was a song on Shiva, the symbol of complete renunciation, the ideal of the sannyasins. They were then filled with the fire of renunciation of the worldly enjoyments.

"The song described Shiva dancing in the joy of His own self living in the cremation grounds, signifying full and perfect renunciation although He was the Lord of the Universe. It was just then composed by the would-be Swami Vivekananda, their leader. They were then only with 'coupinam' (loin cloth) on.

"শ্রীম গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন, 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।'"[৫]

পূর্বেই বলা হয়েছে, সেদিন সন্ধ্যার সময় দেখা দিয়েছিল আকাশে মেঘ। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। "নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন।"

বাগানবাড়ীর এক প্রত্যন্তে কয়েকজন তাপস পূজা-ধ্যান, কীর্তন-নর্তনে প্রমত্ত। সেসময়ে পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণ কি করছিলেন? সেবক লাটুর স্মৃতিচারণায় পাই, "শিবরাত্রির দিন ঠাকুর রাতভোর শিবনাম শুনলেন। সেদিন লোরেন-ভাই ধুনি জেলে কাশীপুরের বাগানে বসে গেলো। সেইখানে সবাই মিলে রাতভোর শিবপূজা আর কীর্তন করেছিলো! সে রাতে তিনি বলেছিলেন—দ্যাখ্! শিব হচ্ছেন মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক আবার মহাত্যাগী। সচ্চিদানন্দ-সাগরের তিন গণ্ডূষ জল তিনি পান করেছিলেন, তাই তাঁর নাম ভোলা মহেশ্বর। শুকদেব মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, সন্ন্যাসীর রাজা। তিনি সেই সাগরের জল স্পর্শ করেছিলেন আর দেবর্ষি নারদ দূর থেকে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর দেখেছিলেন, তাই তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ। সেখানকার এক কণা

৩ স্বামী সারদানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৮৩, ২। পৃঃ ৬-৭

৪ শিবরাত্রি উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, নিরঞ্জন ও হুট্কো গোপাল উপবাস করেছিলেন। (আমার জীবনকথা, পৃঃ ১০৬)

৫ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ: শ্রীম-দর্শন, দশম ভাগ, পৃঃ ১৬৮-৯

বাতাস জীবের গায়ে লাগলে জীব গলে যায়। দরশন-পরশন ত দূরের কথা !"[৬]

তাপসদের কয়েকজনের উপস্থিতিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন নরেন্দ্রনাথ। রাত্রি দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সমাপ্ত হয়। "নরেন্দ্রনাথ মধুরকণ্ঠে শিবমহিমা গান করিয়াছিল।"[৭]

নরেন্দ্রনাথ পূজার আসনে বসেই বিশ্রাম করেন, কথাবার্তা বলতে থাকেন। সঙ্গীদের মধ্যে হুট্‌কো গোপাল যান তামাক সাজতে। অপর একজন (সম্ভবতঃ নিরঞ্জন) বসতবাটীতে যান কোন একটি কাজ সারবার জন্য। এমন সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : সাধনবলে স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথের) ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও, কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন নাই।[৮] ···এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে (কালীপ্রসাদ) বলিলেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক তো।' নরেন্দ্রনাথ স্থিরাসনে গভীর ধ্যানস্থ। কালীপ্রসাদও ধ্যানস্থ, তাঁর ডান হাত নরেন্দ্রের ডান জানু স্পর্শ করে রয়েছে। এদিকে তাঁর হাত ঘন ঘন কাঁপছে। হুট্‌কো গোপাল তামাক হাতে ফিরে এসেছিলেন ইতোমধ্যে। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন : ব্যাস হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি ?

কালীপ্রসাদ বলেন : ব্যাটারি ধরলে যেমন কি একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।

অপর একজন কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন : স্বামীজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনাআপনি ঐরূপ কাঁপছিল ?

কালীপ্রসাদ বলেন : হাঁ, স্থির করে রাখতে

---

৬ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৭

৭ স্বামী গম্ভীরানন্দজীর মতে ১৮৮৭ খৃঃ শিবরাত্রি উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' রচনা করে সুরসংযোগ করেছিলেন। (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ১৮) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য হতে মনে হয় ১৮৮৬ খৃঃ শিবরাত্রির দিন নরেন্দ্রনাথ মুখে মুখে গানটি রচনা করে সুর সংযোগ করেছিলেন। স্বামী অভেদানন্দও 'আমার জীবনকথাতে' (পৃঃ ১০৭) লিখেছেন, "শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রনাথ শিববিষয়ক একটি গান রচনা করিয়া গাহিতে লাগিল : তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম বম বাজে গাল···"

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকারের বিবরণীতে পাই, নরেন্দ্রনাথ বলছেন : কাশীপুরে তিনি (ঠাকুর) শক্তি সঞ্চার করে দিলেন। মাষ্টার : যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জেলে বসতে, না ? নরেন্দ্র : হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কি একটা shock তোমার গা ধরতে আমার গায়ে লাগল। (কথামৃত, ৩। পরিশিষ্ট ২)

স্বামী শঙ্করানন্দ-রচিত "স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা" (১৩৫৩, পৃঃ ৪৭) গ্রন্থে শক্তিসঞ্চারের তথ্য অস্বীকৃত না হলেও ভাবসঞ্চালন স্বীকৃত হয় নি। লেখকের মতে "সেই সময়ে তাঁহার (নরেন্দ্রের) কুলকুণ্ডলিনী জাগরিত হইতেছিল এবং তাহারই ফলস্বরূপ নরেন্দ্রনাথের শরীরে কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল।" স্বামী অভেদানন্দ "আমার জীবনকথা" গ্রন্থে (পৃঃ ১০৬) লিখেছেন, "দুঃখের বিষয় এই ঘটনাটি অতিরঞ্জিত করিয়া···বলা হইয়াছে যে, স্বামীজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গে আনিয়াছিলেন।"

চেষ্টা করেও রাখতে পারছিলুম না।

অতঃপর দ্বিতীয় প্রহরের পূজা আরম্ভ হয়। সবাই ধ্যান করেন। কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানস্থ হন। "ঐরূপ গভীর ভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল।"[৯]

প্রহরে প্রহরে পূজার মাঝে গানও হয়। "শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা; / সুধাপানে ঢল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা! / বিপরীত রতাতুরা, পদভরে কাঁপে ধরা, / উভয়ে পাগল পারা, লজ্জাভয় তো মানে না মা॥"—এই গানটি খুবই জমেছিল।

চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হয় প্রায় রাত্রি চারটায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেবক শশী নরেন্দ্রনাথকে ডাকতে আসেন। নরেন্দ্রনাথ যান ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে। নরেন্দ্রনাথকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে, তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি?…যা হবার হয়েছে, এখন হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।"[১০]

নরেন্দ্রনাথ চুপ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভর্ৎসনা সহ্য করেন। বিস্মিতচিত্তে ভাবেন, পূজার সময় ঐ নির্জন ঘরে তিনি যা কিছু করেছেন তা সবই জানতে পেরেছেন অন্তর্যামী ঠাকুর। ঠাকুরের এ-ধরনের প্রাণতোষিণী ক্রিয়াকলাপ সেবকদের করে তাঁর অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

নরেন্দ্র নীচের তলায় নেমে আসেন। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে গঙ্গাস্নান করতে যাবেন। মাষ্টারমশাইকে ডাকেন। মাষ্টারমশাই যান না। বিছানাতেই [বসে] থাকেন। নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান[১১] করতে যান। ফিরে এসে দানাদের ঘরে বসে আবৃত্তি করেন:

> অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো
> বিভুর্ব্যাপ্য সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
> ন চাসঙ্গতং নৈব মুক্তির্ন মেয়-
> শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
> ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ অতঃপর রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড হতে আবৃত্তি করেন:

> মূলং ধর্মতরো বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদম্।
> বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘহরং ধ্বান্তাপহং তাপহম্॥

নরেন্দ্রনাথের কিন্নরকণ্ঠ। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন: "তোর গান শুনলে এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোঁস করে যেন ফণা ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।" সেই নরেন্দ্রনাথ একের পর এক গান গাইতে থাকেন। তিনি প্রথমে গান করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত—

> জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা,
> জয় জয় মঙ্গলদাতা।
> সংকটভয়দুঃখত্রাতা, বিশ্বভুবনপাতা,
> জয় দেব জয় দেব॥
> অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা প্রভু,
> নাহি তব উপমা।
> প্রভু বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু চিন্ময় পরমাত্মা,
> জয় দেব জয় দেব॥

---

৯ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, তদেব, পৃঃ ৯

১০ তদেব, পৃঃ ৯-১০

১১ মতিলাল শীলের উদ্যানস্থিত ঘাটে গঙ্গাস্নান করতেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৮৩, ৫।১৩৪২)

জয় জগবন্ধ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,
প্রভু প্রণমি তব চরণে।
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে,
জয় দেব জয় দেব ॥
কি আর যাচিব আমরা করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি।
এ লোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি,
জয় দেব জয় দেব ॥

(ব্রহ্মসঙ্গীত, পৃঃ ১০২)

তিনি দ্বিতীয় গান করেন ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল রচিত—

অগতির গতি, প্রাণপতি, দাও মতি রতি ও চরণে।
জুড়াই তাপিত হিয়া, দরশন পরশনে।
লইলে তব শরণ, সব ক্ষতি হয় পূরণ, অন্য কোন
আকর্ষণ থাকে না থাকে না মনে।
ধর হে আমায় ধর, প্রেমে বশীভূত কর, মিলাইয়ে
লও দেব, অনন্ত প্রেম-মিলনে ॥

(চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী, পৃঃ ২৬৫)

তাঁর তৃতীয় গানটি পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় রচিত —

কি সুখ জীবনে মম ওহে দয়ানাথ
দয়াময় হে,
যদি চরণ-সরোজে পরাণমধুপ চিরমগন
না রয় হে।
অগণন ধনরাশি তায় কিবা
ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে
যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেমমুখ
দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে;
যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেমচাঁদ
নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি
নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে;
যদি মোহ পরমাদে নাথ
তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে;
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি
আনন্দনিলয় হে।

(ব্রহ্মসঙ্গীত, পৃঃ ৫৩০)

মাঝে নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: আমি সাধক। আমি কেন ও কথা বলবো?

নরেন্দ্রনাথ এবার পরিবেশন করেন শেষ গানটি—

শিব শঙ্কর বম্ বম্ (ভোলা), কৈলাসপতি মহা-
রাজরাজ!
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যালমাল,
লোচন বিশাল, লালে লাল;
ভালে চন্দ্র শোভে, সুন্দর বিরাজে ॥

মধুর ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে বর্ণোজ্জ্বল বহিরঙ্গ, তাছাড়াও তাপসদের অনেকেই অনুভব করেন একটি ধ্যানগম্ভীর অন্তরঙ্গ।

ইতিপূর্বেই দানাদের ঘরে জমায়েত হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র, মাষ্টারমশাই, রাখাল প্রমুখ যুবকবৃন্দ। নরেন্দ্রের গান শেষ হলে রাখাল উঠে পড়েন, বলেন: নিতাইবাবুর কাছে যেতে হবে—নরেন খুব ছেলে—তাই ওর কাছে আসতে ইচ্ছা।

কিছু সময় অতিবাহিত হয়। নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারকে বলেন: আজ গঙ্গায় ন্যাঙ্‌টো হয়ে স্নান করলাম।

মাষ্টারমশাই তাঁকে অনুরোধ করেন: শিবের কথা বল।

তখন নরেন্দ্রের সেদিকে মন নাই। নরেন্দ্র

রাজি হন না। এবার মাষ্টারমশাই অনুরোধ করেন গিরিশবাবুকে।

গিরিশচন্দ্র: যত ঘৃণিত জিনিস নিয়েছি।

একথা শুনে মাষ্টারমশাই যোগীন্দ্রকে অনুরোধ করেন শিবের কথা বলতে।

যোগীন্দ্র: শিব হলেন ভোলানাথ।

মাষ্টারমশায়ের অধ্যবসায় দেখে গিরিশচন্দ্র তাঁকে দণ্ডবৎ করেন। সহানুভূতিশীল পরিবেশে মধুর অধ্যাত্মভাব, সঙ্গীতরস ও বিনোদনের সার্থক সমন্বয় ঘটেছিল সেই সকালে। কিন্তু মাষ্টার-মশাই বোধ করি তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পরিতৃপ্তি-লাভ করেন নি।

মাষ্টারমশাই গঙ্গায় যান। স্নান করে বাগান-বাড়ীতে ফিরে আসেন। দোতলার হলঘরে গিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরে জ্বালা। মাষ্টার তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাস করেন। তাঁর পেটে তেল মালিস করে দেন।

ইতিমধ্যে কালীপ্রসাদ এসে মাষ্টারমশাইকে বলেন: মাষ্টারমশাই, নীচে চলুন।

শ্রীরামকৃষ্ণ: কি! কি!

মাষ্টার: নীচে যেতে বলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ: আচ্ছা।

এমনসময়ে নরেন্দ্রনাথ উপরে উঠে আসেন। তিনি জানান যে নীচে মাষ্টারমশায়ের জলখাবার প্রস্তুত হয়ে আছে।[১২] [ক্রমশঃ]

১২ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৭৬-৬৭৮

বিপ্লবী নরশার্দূল যতীন্দ্রনাথ

ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর অবিস্মরণীয় ভূমিকা এবং ভারতীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধনে তাঁর পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের বিশিষ্ট অবদানের কথা স্মরণ রেখেও বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র এই আন্দোলনের ফলেই ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসে নি। ভারতের স্বাধীনতালাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, বর্তমান শতকের বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা এবং তৎসহ কৃষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বিপ্লবীদের গুপ্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা দেশ যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য, যদিও এই আন্দোলনের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলা দেশে এই আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ; আর দ্বিতীয় দশকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫)।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার পূর্ব হতেই বিপ্লবীদের কার্য-কলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবে স্বদেশী আন্দোলন যে বিপ্লবী নেতাদের উৎসাহ ও মনোবল বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্যারিস্টার পি মিত্র (প্রমথনাথ মিত্র) ও সতীশচন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় কলিকাতায় যে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয়, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ

হতে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকে। এদের মধ্যে পুলিন-বিহারী দাশের নেতৃত্বে পরিচালিত ঢাকা অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই বিপ্লবী আন্দোলনের সব চেয়ে খ্যাতনামা মুখপত্র 'যুগান্তর' আত্মপ্রকাশ করে। এর সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এই কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল উত্তর কলিকাতার মাণিকতলার কাছে মুরারিপুকুরে অরবিন্দ ঘোষের পৈতৃক বাগান-বাড়ী। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল এই দলেরই ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরের অত্যাচারী ব্রিটিশ প্রশাসক কিংস-ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে দুজন নিরীহ ইংরেজ মহিলার প্রাণহরণ করেন। ক্ষুদিরাম পরে পুলিশের হস্তে বন্দী হন, এবং প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করেন। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ীতে হানা দিয়ে অরবিন্দ ঘোষের অনুচরদের গ্রেপ্তার করে, এবং অরবিন্দ নিজেও গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ এই সময় বিপ্লবীদের দ্বারা সংগৃহীত বহু অস্ত্র-শস্ত্র ও তাঁদের সংগঠন-সংক্রান্ত কিছু কাগজ-পত্র আটক করে ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সব কাগজ-পত্রের ভিত্তিতে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়ে যায়।

১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের দমনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। অরবিন্দ নিজে আলিপুর বোমার মামলায় বিখ্যাত ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন দাশের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ যুক্তি-নৈপুণ্যের জোরে মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্তের ফাঁসির আদেশ হয় এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই ব্রিটিশ সরকার কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির নেতৃত্বে পরিচালিত আত্মোন্নতি সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করে। পরের বৎসর জানুয়ারি মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি এবং ফরিদপুরের ব্রতী সমিতিও বেআইনি ঘোষিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন আইনের (Regulation III of 1818) সাহায্যে সরকার স্বদেশী আন্দোলনের নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেও নির্বাসিত করেন (১৯০৮)। এঁদের মধ্যে ছিলেন বরিশালের স্বনামধন্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাশ, 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশচন্দ্র নাগ এবং শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। ১৯০৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের শাস্তিদান ও স্বদেশীভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধের জন্য কয়েকটি নতুন দমনমূলক আইনও বিধিবদ্ধ করা হয়। এই সব দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে বাংলা দেশের বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সাময়িক-ভাবে, স্বল্পকালের জন্য, স্তিমিত হয়ে পড়ে। আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তিলাভ করবার কিছুকাল পরেই অরবিন্দ পণ্ডিচেরীর ফরাসী উপনিবেশে আশ্রয় লাভ করেন, এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন

হয় (মার্চ, ১৯১০)। পুলিনবিহারী দাশ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করলেও অল্প দিন পরেই আবার তাঁকে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। এর ফলে বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে সাময়িকভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাকে পূর্ণ করতে এগিয়ে আসেন বীর বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়[১], যাঁর জন্মের এক শত বৎসর ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর পূর্ণ হয়েছে।

নদীয়া জেলার কয়া গ্রামে, মাতুলালয়ে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ তাঁর মাতুল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে লালিত-পালিত হন। ছোটবেলা হতেই খেলা-ধুলা ও শরীরচর্চার দিকে তাঁর প্রবণতা দেখা যায়। সন্তরণ এবং অশ্বারোহণেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। স্কুলের ছাত্র থাকা কালেই তাঁর বহু অনুচর জুটে যায়, যারা পরবর্তী জীবনেও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে নি। এদের সঙ্গে মিলে তিনি যেমন পূজার সময় গ্রামে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন, তেমনই আবার প্রয়োজন হলে সমাজসেবা-মূলক কার্যে,—দুঃস্থ, অনাথ ও আতুরের সেবায়,—আত্মনিয়োগ করতে পশ্চাৎপদ হতেন না। দেশপ্রেম এবং নির্ভীক হওয়ার শিক্ষা কৈশোরে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলেই জানা যায়।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর অ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুল হতে যতীন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স (Entrance) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলিকাতার সেণ্ট্রাল কলেজে প্রবেশ করেন। প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ক্ষুদিরাম বসু তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যাপারে যতীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নি, কিন্তু কলিকাতায় থাকার সময় তিনি এমন কিছু লোকের সংস্পর্শে আসেন, যাঁরা তাঁর চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন, এবং জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে তাঁকে সাহায্য করেন। প্রথমত, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোনো এক সময়ে যতীন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে আসেন, এবং তাঁর নৈতিক চরিত্র গঠনে এঁদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ১৮৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সময় তিনি ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে ত্রাণকার্যে যোগ দেন। দ্বিতীয়ত, কলিকাতায় বসবাসের কালে তিনি আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রেরণা লাভ করেন, এবং হরিদ্বারের প্রসিদ্ধ সন্ত ভোলানন্দ গিরি মহারাজের নিকট দীক্ষিত হন। ভোলানন্দ গিরি মহারাজ শুধু যে যতীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সহায়তা করেন তা নয়, তাঁকে দেশসেবার কার্যেও অনুপ্রাণিত করেন। তৃতীয়ত, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁর অনুগামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (পরবর্তী কালে নিরালম্ব স্বামী নামে প্রসিদ্ধ) ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তার ফলেই তাঁর মনে দেশপ্রেমের আগুন জলে ওঠে। অরবিন্দের কাছেই যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শ শিক্ষা করেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সহায়ক হিসাবে শরীরচর্চাকেও যতীন্দ্রনাথ

১ ঐতিহাসিক উমা মুখোপাধ্যায় তাঁর সুলিখিত **Two Great Indian Revolutionaries** (কলিকাতা, ১৯৬৬) বইয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন (পৃঃ ১৬৩) যে যতীন্দ্রনাথ নিজের নামের বানান লিখতেন 'জ্যোতীন্দ্রনাথ'। কিন্তু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর নামের প্রচলিত বানানই অনুসরণ করেছি। তা ছাড়া ব্যাকরণের বিচারে জ্যোতিঃ+ইন্দ্র=জ্যোতিরিন্দ্র হয়, জ্যোতীন্দ্র হয় না বলেই মনে হয়।

বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ ক্ষেত্রচরণ গুহের কাছে যতীন্দ্রনাথ এই সময় কুস্তি শিক্ষা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই ক্ষেত্রচরণের পিতা অম্বিকাচরণের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং কৈশোরে কুস্তি শিক্ষা করেছিলেন।

সম্ভবত ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়াস ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কলেজে পাঠাভ্যাসের সময়েই তিনি 'শর্টহ্যাণ্ড' ও 'টাইপ' করার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথমে কলিকাতার একটি সওদাগরি প্রতিষ্ঠানে তিনি কিছুকাল 'স্টেনোগ্রাফারের' চাকরি করেছিলেন। পরে মজঃফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডির কাছেও তিনি ঐ কাজ করেন। অতঃপর তাঁর সরকারী চাকরি লাভের সুযোগ আসে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তিনি বাংলা সরকারের সদর দফতরে 'টাইপিস্ট' হিসাবে নিযুক্ত হন, এবং পর বৎসর ১৫ই মে তারিখে তিনি মাসিক এক শত টাকা বেতনে অর্থসচিব হেনরি হুইলারের 'স্টেনোগ্রাফারের' পদ গ্রহণ করেন। (এই হেনরি হুইলার পরবর্তী কালে বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাটের পদ অলঙ্কৃত করেন।) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কোনো বিশেষ কাজে তাঁকে দার্জিলিঙে পাঠানো হয়। এই সময় নিম্নপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা সামান্য অজুহাতে পরাধীন ভারতীয়দের অপমানিত করবার জন্য শারীরিক বলপ্রয়োগ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। স্বাধীনচেতা ও বলবান যতীন্দ্রনাথ ইউরোপীয়দের এই ধরনের উদ্ধত আচরণ দেখলেই তাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হতেন। দার্জিলিঙেও কয়েকবার ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর মারপিঠ বাধে। ইতিপূর্বে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে, কয়া গ্রামের কাছে এক জঙ্গলে একটি বড় ছোরা বা ভোজালির সাহায্যে ব্যাঘ্র শিকার করে যতীন্দ্রনাথ তাঁর শারীরিক শক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন (তাঁর 'বাঘা যতীন' নামের সৃষ্টি সম্ভবত এই কারণেই হয়েছিল); এখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় সাফল্যলাভের জন্য তাঁর বীর্যবত্তার কাহিনী লোকমুখে আরো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শিলিগুড়ি স্টেশনে তুজন ইংরেজ সেনানায়কের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি একটি মামলায় জড়িত হয়ে পড়েন, যদিও এই মামলা অল্প দিনের মধ্যেই প্রত্যাহৃত হয়। এরপর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কলিকাতায় বদলি হন, এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হওয়া পর্যন্ত সরকারী চাকরিতেই নিযুক্ত থাকেন।

সম্ভবত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, দার্জিলিঙে থাকার সময়েই, যতীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। পুলিশ 'রিপোর্ট' থেকে জানা যায় যে, দার্জিলিঙে আরো কয়েকজন সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে যতীন্দ্রনাথ বান্ধব সমিতি নামে অনুশীলন সমিতির একটি শাখা স্থাপন করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর যতীন্দ্রনাথ পূর্ণোদ্যমে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম একান্ত অপরিহার্য, যতীন্দ্রনাথ একথা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে, এবং তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে হবে এ ধারণাও তাঁর মনে ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে 'মেস' স্থাপন করে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিপ্লবী চেতনা সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'গেরিলা যুদ্ধ' পরিচালনা করা

তাঁর আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অত্যাচারী ব্রিটিশ আমলাদের হত্যা করা এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের স্বার্থে অর্থসংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করাকেও যতীন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় বলে বোধ করতেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনো পন্থাকেই নীতি-বিগর্হিত বলে পরিত্যাগ করা উচিত নয়,—যতীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস তিলক ও অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তাধারার অনুসারী ছিল। উপায়কে লক্ষ্যের মতোই বিশুদ্ধ হতে হবে এমন কথা তিনি কখনো মানতেন না।

১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর বোমার মামলা কলিকাতা তথা বাংলা দেশে এক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই মামলা পরিচালনার ব্যাপারে দুজন ভারতীয়,—'পাবলিক প্রসিকিউটর' (Public Prosecutor) আশুতোষ বিশ্বাস ও পুলিশের 'ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট' (Deputy Superintendent) শামসুল আলম,—সরকার পক্ষের বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এঁরা দুজনেই বিপ্লবীদের কোপে পড়ে প্রাণ হারান, এবং দুটি ক্ষেত্রেই যতীন্দ্রনাথের অদৃশ্য হস্তক্ষেপ ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আশুতোষ বিশ্বাসের হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসু এবং শামসুল আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত উভয়েই যতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ অনুচর ছিলেন। শামসুল আলমের হত্যার অব্যবহিত পরে পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে এই ব্যাপারে জড়িত বলে গ্রেপ্তার করে (২৭শে জানুয়ারি ১৯১০), কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এর পরেই কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে পুলিশ আবার যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে, এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অন্যতম প্রধান আসামী হিসাবে আদালতে উপস্থাপিত হন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অপরাধেরই প্রমাণ না পাওয়া যাওয়ায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, তিনি ভারত সরকারের দশম জাঠ 'রেজিমেণ্টের' সৈন্যদের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক প্রচারকার্যে রত ছিলেন। সরকার পক্ষ এই অভিযোগের সত্যতা আদালতে প্রমাণ করতে না পারলেও তারা এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয় নি, এবং মামলা শেষ হবার পর দশম জাঠ 'রেজিমেণ্ট' ভেঙ্গে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গেও যতীন্দ্রনাথ যে ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, কিন্তু তা প্রমাণ করার মতো পর্যাপ্ত তথ্য সরকারের হাতে ছিল না।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও যতীন্দ্রনাথ তাঁর সরকারী চাকরিটি হারান। এরপর 'কণ্ট্র্যাক্টর' হিসাবে তিনি জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করেন, এবং ঐ সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে খ্যাত), হরিকুমার চক্রবর্তী, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতারা যতীন্দ্রনাথকেই তাঁদের গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। রাসবিহারী বসু এই সময় উত্তর ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে এক গোপন সাক্ষাৎকারে যতীন্দ্রনাথের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও অসাধারণ সংগঠনশক্তির পরিচয় পেয়ে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন পরিচালনায় তিনিও যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ও মেদিনীপুর

জেলায় ভয়াবহ বন্যার প্রকোপের সময় যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা বন্যাপীড়িত ব্যক্তিদের ত্রাণ-কার্যের জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু বন্যাত্রাণের সঙ্গে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা এবং নিজেদের মধ্যেও ভালভাবে বোঝাপড়া করা তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি বা যুগান্তর দল, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি সমিতি, ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও মুক্তি সঙ্ঘ, চন্দননগরে মতিলাল রায়ের গোষ্ঠী, উত্তরপাড়ায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুগামীগণ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরীর বরিশাল দল ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ না হলেও পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে এই সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র ভারতব্যাপী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারী ব্রতী হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট কলিকাতার রাজপথ হতে প্রকাশ্য দিবালোকে রডা কোম্পানীর (Messrs Rodda & Co.) ৫০টি 'মসার' (Mauser) পিস্তল ও ৪৬,০০০ কার্তুজ চুরি যায়। প্রধানত আত্মোন্নতি সমিতি ও মুক্তি সঙ্ঘের সদস্যেরাই এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু চুরি-যাওয়া পিস্তলগুলি বাংলার নয়টি সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে বণ্টন করা হয়, এবং পরবর্তী কালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে এগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল। সে যুগে পুলিশের লোকেরা সাধারণত যে ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত, এগুলি তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল ও দূর পাল্লার আঘাত হানবার ক্ষমতা রাখত।

কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদের কাছে এর চেয়েও অনেক বেশি আশাপ্রদ মনে হয়েছিল জার্মান সরকারের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনা, যার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে যতীন্দ্রনাথ উদ্যোগী হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জার্মান প্রধানমন্ত্রী বেথম্যান হলওয়েগ (Bethmann Hollweg) জার্মান-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য বার্লিনে শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি (Indian Independence Committee) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা), অবিনাশ ভট্টাচার্য, ডক্টর বিষ্ণু সুখটঙ্কর, চম্পকরমণ পিল্লাই প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামে একজন বিপ্লবী বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে জার্মান সাহায্যের পরিকল্পনার কথা জানাতে আসেন। ইতিমধ্যে, ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষুব্ধ ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্যে সমগ্র উত্তর-ভারতে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা রাসবিহারী করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায় এবং রাসবিহারী ঐ বৎসর মে মাসে ছদ্মবেশে জাপানে পলায়ন করেন। যতীন্দ্রনাথ এতে কিছুটা আশাহত হলেও জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করেন। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাটাভিয়া ও ব্যাংককে ভারতীয় বিপ্লবীদের দুটি বড় কেন্দ্র ছিল। এই দুটি কেন্দ্র থেকে ভারতে জার্মান রণসম্ভার ও আর্থিক সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'মার্টিন' ছদ্মনামে ব্যাটাভিয়াতে চলে যান, সেখানকার জার্মান 'কন্‌সালের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে বিপ্লবীদের

সুবিধামতো জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার জন্য (এপ্রিল, ১৯১৫)। ব্যাংককের বিপ্লবীদের নেতা ছিলেন আত্মারাম, কিন্তু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী বিপ্লবীও ঐ অঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন। এঁদের মাধ্যমে বাংলা দেশের সন্ত্রাসবাদীদের কাছে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৩,০০০ টাকা জার্মান সাহায্য হিসাবে পাঠানো হয়, যদিও তার সবটাই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এসে পৌছায় নি। শেষ দফায় পাঠানো ১০,০০০ টাকা পুলিশের হাতে পড়ে যায়। জার্মান রণসম্ভার 'ম্যাভেরিক' নামে একটি জাহাজে ভারতে পাঠানোর কথা হয়। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো এই সব অস্ত্র সুন্দরবন অঞ্চলে রায়মঙ্গল নামে একটি জায়গায় নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সেখান থেকে অস্ত্রগুলি গোপনে পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা, পূর্ববঙ্গের হাতিয়া এবং উড়িষ্যার বালেশ্বরে সুবিধামতো পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। অস্ত্রগুলি সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আসা মাত্র তাঁরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করে দেবেন এবং ক্রমশ কলিকাতার দিকে এগিয়ে আসবেন বলে স্থির করা হয়। এই সময় সারা ভারতবর্ষে পনেরো হাজারের বেশি ইংরেজ সৈন্য ছিল না। এদের কলিকাতায় আসার পথ বন্ধ করার জন্য বাংলা দেশের সঙ্গে প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সংযোগ সাধনকারী তিনটি প্রধান রেলসেতু 'ডিনামাইটের' সাহায্যে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অস্ত্রাগারগুলি লুণ্ঠন করে শেষ পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করবেন ও সেখানে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করবেন বলেও স্থির করা হয়।

ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আয়োজিত এই অভ্যুত্থানের সাফল্যের জন্য যতীন্দ্রনাথ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার একটি পরিকল্পনা করেন। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে এই অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠে গার্ডেনরীচ ও বেলিয়াঘাটায় দুটি ডাকাতির মাধ্যমে ৪০,০০০ টাকা সংগ্রহ করা হয়। নীরদ হালদার নামে পুলিশের এক গুপ্তচর এবং পুলিশ 'ইনস্পেক্টর' সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যতীন্দ্রনাথের অনুচরেরা এই সময় হত্যা করেন। নীরদ হালদার তাঁর মৃত্যুকালীন বিবৃতিতে যতীন্দ্রনাথকে তাঁর আততায়ী বলে উল্লেখ করেছিলেন। ফলে যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর অনুচর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বার হয়। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন নিকট অনুচর তখন বাধ্য হয়ে কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং (উড়িষ্যার) বালেশ্বরের কাছে কাপ্তিপাদা নামে একটি অখ্যাত গ্রামে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বালেশ্বরে জার্মান অস্ত্রের সাহায্যে সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজন তাঁরাই করবেন বলে স্থির করা হয়। বালেশ্বর ও চক্রধরপুরের দুটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং মাদ্রাজের সঙ্গে কলিকাতার সংযোগসাধনকারী রেলসেতুটি ধ্বংস করে দেবার দায়িত্বও তাঁদের দেওয়া হয়। কাপ্তিপাদার কাছেই ময়ুরভঞ্জের গভীর জঙ্গল ছিল, যেখানে বিপ্লবীরা প্রয়োজনবোধে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন। বালেশ্বর শহরে বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তীর 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' (Universal Emporium) নামে একটি দোকান ছিল। এটি তাঁর কলিকাতার ভুয়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'হ্যারি এণ্ড সন্স'-এর (Harry & Sons) শাখা ছিল এবং এই দুটি সংস্থার মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় রাসবিহারীর পরিকল্পনার মতো যতীন্দ্রনাথের এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনাও কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। জুনের শেষ বা জুলাইএর গোড়ার দিকে জার্মান রণসম্ভার নিয়ে 'ম্যাভেরিক'

জাহাজটির রায়মঙ্গলে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু ব্যাংককের বাঙ্গালী ব্যবহারজীবী কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়ের অসতর্কতার জন্য এই অস্ত্র-সরবরাহের পরিকল্পনাটি ইংরেজ সরকার জেনে যায় এবং 'ম্যাভেরিক' কোনো দিনই ভারতীয় বিপ্লবী-দের জন্য অস্ত্র এনে দিতে পারে নি। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কিছু সৈনিককে তাঁদের দলে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এদিকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কলিকাতার পুলিশ বাহিনী 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স' প্রতিষ্ঠানটি খানাতল্লাসী করে বালেশ্বর শহরের 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের' সন্ধান পেয়ে যায়। পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট (Charles Tegart) স্বয়ং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের দুই উচ্চপদস্থ কর্মচারী বর্ড ও ডেন্‌হ্যামকে সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করেন। 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে' ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেদের কাছে অনুসন্ধান করে তাঁরা বিপ্লবীদের কাপ্তিপাদায় গোপন আশ্রয়স্থলের কথা জানতে পারেন। একটি বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এর পর কাপ্তিপাদা অভিমুখে যাত্রা করে। যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠ অনুচর পুলিশের আগমন-বার্তা পেয়ে কিছু অর্থ ও অস্ত্র নিয়ে গোপনে কাপ্তিপাদা ত্যাগ করেন, কিন্তু অপরিচিত স্থানীয় লোকেদের সন্দিগ্ধতা ও অসহযোগিতার জন্য তাঁরা বেশি দূর যেতে পারেন নি। বুড়িবালাম নদীর কাছে একটি শস্যক্ষেত্রের সন্নিহিত মাটির টিলার উপর তাঁরা আশ্রয় নেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পাঁচজন আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর মধ্যে চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। যতীন্দ্রনাথ গুরুতরভাবে আহত হয়ে বালেশ্বরের হাসপাতালে আনীত হন ও পরের দিন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫)। অন্য তিন জনের মধ্যে মনোরঞ্জন ও নীরেন্দ্রকে আদালতে বিচারের পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এবং জ্যোতিষ পাল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তী কালে বহরমপুর জেলে উন্মাদ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও বিপ্লবীরা ভারতের বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রমশ ভারতে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমনমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়, এবং তার ফলে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের ফলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পূর্ণ অন্য রূপ ধারণ করে, যদিও বিপ্লবীদের গুপ্ত আন্দোলন কোনো দিনই একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র আবার দুই বিদেশী শক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা আনবার চেষ্টা করেন। যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর দেশপ্রেমের আদর্শ বাংলার বিপ্লবীদের দীর্ঘকাল অনুপ্রাণিত করেছিল, সন্দেহ নেই। তাই যতীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষের শুভলগ্নে তাঁর জীবন-কাহিনী পর্যালোচনা করে তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।*

---

* প্রবন্ধটি রচনা করতে প্রধানত তিনটি বইএর সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

১ Uma Mukherjee, **Two Great Indian Revolutionaries** (Calcutta, 1966)

২ Biman Behari Majumdar, **Militant Nationalism In India** (Calcutta, 1966)

৩ Justice Rowlatt (ed.) **Sedition Committee Report (1918)**

—লেখক

আহ্নিক

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কালের আসনে বসি হে জননী অহোরাত্র !
চিরকাল করিছ আহ্নিক--
জ্বালাইয়া আকাশের রবি শশী তারা দীপ আরতির ।
কোশাকুশী করিয়াছ পারাবার নদ ও নদীর
চন্দন নিতেছ ছানি' প্রান্তরে মাটীর ।
ধরণীর বুকভরা পুষ্পপাত্রে ফুল অঞ্জলির ।
মেঘে মেঘে বাজে শঙ্খধ্বনি
বায়ুকণ্ঠে মন্ত্র জাগে মৃদু স্বনস্বনি
ঊর্ধ্বে অধঃ ভরি দশদিক ।

শুনেছেন সে-অশ্রুত অজপা সঙ্গীত
অনাদি বিশ্বের মুনি ঋষি কবি যোগী ধ্যানস্তব্ধচিত !
কবিতায় স্বপ্নসম কভু শুনিয়াছি আমি তুমি ধরার পথিক !
মধুময় বৃষ্টিবিন্দু শান্তিহীনে ক্ষণে ক্ষণে দেয় শান্তিজল ।
রবি শশী মেঘ মাটী সমীর সলিল
সব নিয়ে করিতেছ হে আদিজননী !
মহা সন্ধ্যা-আরাত্রিক
আদিপুরুষের ।

মূঢ় মুগ্ধ দাঁড়ালাম ক্ষুদ্রপ্রাণ জীব --নরনারী ।
নিবেদিত সব ধন--সব উপচার !!
হে প্রভু আমার !
কী দিয়ে করিবে পূজা মূঢ় বিশ্বের পথিক !!!

সূফীসাধনা ও সূফীসাধক

শ্রীরঞ্জিতকুমার আচার্য*

মানুষের ধর্মীয় চেতনার ইতিহাসে অতীন্দ্রিয়া-মুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের প্রয়াস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের সাধকেরা ভাগবত প্রেম ও ঐকান্তিক আরাধনাকে প্রেমময় পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সহজতম উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। সূফীবাদ এমনি একটি অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তি, যার মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সান্নিধ্যলাভের জন্য ভক্ত-হৃদয়ের আকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সূফীবাদের উদ্ভব বহুবিতর্কিত বিষয়। সাধারণভাবে সূফীমতকে ঐস্লামিক ধর্মচেতনার একটি বিশেষরূপ বলে মনে করা হলেও পণ্ডিতদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদের অন্ত নেই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একটি বিরাট অংশ সূফীবাদের অভ্যুদয়ের পিছনে খ্রীষ্টধর্মের এবং নবপ্লেটোনিজমের প্রভাব রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ সূফীবাদকে ইরানীয় দ্বৈতবাদের পরিণতি বলে ধরে নিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই আবার বেদান্ত ও বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে সূফীসাধনার অঙ্কুর খুঁজে পেয়েছেন; এঁদের মতে সূফীবাদের উদার-দৃষ্টিভঙ্গি, উন্নত-ধর্মমত, বিশেষ কোন ধর্ম-প্রবর্তিত সুনির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর প্রতি অনাসক্তি, সর্বোপরি ঈশ্বরকে স্বর্গস্থ কোন শক্তিমান পুরুষরূপে কল্পনা না করে প্রেমময়-রূপে কল্পনা করা, ইসলাম-ধর্মচেতনার সঙ্গে পরি-পূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ নয়। কাজেই অনেকেই অনুমান করেন যে সূফীবাদের অভ্যুদয়ের পিছনে কোন অ-ঐস্লামিক ধর্মচেতনার অবদান রয়েছে। সূফীবাদের গভীর অন্তর্মুখিতা ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে পরম প্রাপ্তির প্রয়াসের সঙ্গে বৈদান্তিক চিন্তাধারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করে কেউ কেউ সূফীবাদকে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের একটি বিশেষরূপ বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের অবতারণা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের (৩২৭-৩২৫ খৃঃ পূঃ) পূর্বে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পশ্চিম এশীয় দেশগুলি, মিশর ও গ্রীসদেশে প্রভাব বিস্তার করেছিলো এবং তার পরেও বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। মহামতি সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রচারের জন্য খুরেশান, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। এসব সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ ও সাধন-প্রণালী, বিশেষ করে বেদান্তের আত্মোপলব্ধি তত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদ, পাতঞ্জলদর্শনের যোগাভ্যাস-প্রণালী, নারদীয়ভক্তিসূত্র, পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের ভক্তিবাদ, বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণতত্ত্ব, প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী এশিয়ার দেশগুলির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সহায়ক হয়েছিল—এরূপ অনুমান অলীক বা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। সূফীবাদ এমনি একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল হতে সম্ভবতঃ তার প্রাণশক্তি লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বরেণ্য মনীষী সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। আচার্য সুনীতিকুমার বলেন, 'The more we would study the matter closely, the greater would appear to be the points of contact between Indian religion and

* অধ্যাপক, দর্শনবিভাগ, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, কৈলাসহর, ত্রিপুরা।

Sufistic Islam. Sufism was deeply influenced by the Vedanta in its formative period···' (The Cultural Heritage of India, Vol. IV Preface, p. xviii) পাশ্চাত্যের একাধিক মনীষী অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। Dr. Bouquet মনে করেন, মরমিয়াবাদের প্রথম উৎপত্তি ভারতীয় ঔপনিষদিক চিন্তাধারায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতকে পাশ্চাত্যে নব্যপ্লেটোবাদ বলে যে দার্শনিক মতটি প্রচলিত ছিল, তার উৎস তিনি ঔপনিষদিক মরমিয়াবাদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হলো, 'This system... was in no sense Christian... but had much in common with Upanisadic Hinduism. (Dr. A. C. Bouquet: Comparative Religion, p. 287)

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয় সূফীসাধন-ধারা মোহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই পশ্চিম এশীয় দেশগুলিতে প্রচলিত ছিল এবং পরে মোহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলামধর্ম যখন প্রবল ধর্মীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সূফীসাধকেরা এই নবধর্মকে বরণ করে নিলেও তাঁদের স্বতন্ত্র সাধন-পদ্ধতি ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা কখনও বিসর্জন দেননি। প্রকৃতপক্ষে শরিয়তী ধ্যানধারণার সঙ্গে সূফীবাদের মৌল প্রত্যয়ের পার্থক্য উপেক্ষণীয় নয়। তাই প্রাচীনপন্থী সংস্কারবিমুখ মুসলমান উলেমারা সূফীমতকে কোরাণ-সমর্থিত নয় বলে নিন্দাবাদে মুখর হয়েছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ কোরাণের মধ্যে সূফীমতের অঙ্কুর আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে কোরাণের নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ তাঁদের মতে এগুলো হলো সূফী-প্রচারিত সর্বেশ্বরবাদ ও প্রেমসাধনার প্রেরণা। 'Everyone on earth is passing away, but the glories and honoured face of the Lord abideth for ever'. (Koran 55. 26) 'Wheresoever ye turn, there is the face of Allah' (Koran 29.19) 'He loveth them. And they love Him'. (Koran 5.59) কিন্তু কোরাণবর্ণিত ঈশ্বরতত্ত্ব ও সুপরিকল্পিত সাধন-প্রণালীর সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এ সিদ্ধান্ত সংশয়াতীত বলে মনে হয় না। আলোচনার আর গভীরে না গিয়ে সাধারণভাবে সূফীবাদকে ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্ট এক উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মমত বলে স্বীকার করে নেওয়া সঙ্গত বলে মনে হয়।

'সূফী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে সূফীসাধকেরা পশমের পোশাক (সূফ্) পরে থাকতেন বলেই তাঁদের এই নামকরণ করা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন 'সূফী' কথাটি 'সাফ্' শব্দ হতে নিষ্পন্ন, কাজেই 'সূফী' আন্তঃশুচিতার দ্যোতক। অন্যদের মতে, গ্রীক শব্দ 'সফিয়া' (Sophia=Wisdom) 'সূফী' শব্দের মূল উৎস। আমাদের মনে হয় এই শব্দের অর্থনিরূপণ পণ্ডিতদের কাছে যতই জরুরী বলে বিবেচিত হোক না কেন, সূফীবাদের মর্মকথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা যদি এ বিতর্ক পরিহার করি, তাহলে বোধহয় সূফীভাবধারার পরিচয় পেতে সামান্যতম অসুবিধা হবে না।

সূফীমত ও সাধনার একটি বিশিষ্টরূপ ও অনবদ্য আবেদন জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিল। সূফীমত মুখ্যতঃ একটি বিশেষ সাধনপন্থারূপে, মানুষের আত্মিক উজ্জীবনের সহায়করূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং ক্রমবিকাশের পথে একে আশ্রয় করে গড়ে উঠে মননসিক্ত নানা দার্শনিকতত্ত্ব। অধ্যাপক J. S. Trimingham ঠিকই বলেছেন,

'It is not primarily an intellectual process, though the experience of the mystics led to the formulation of various types of philosophy ; but rather a reaction against the external rationalization of Islam in law and systematic theology, aiming at spiritual freedom whereby man's intrinsic intuitive spiritual senses could be allowed full scope.' (The Sufi Orders in Islam, p. 1) কাজেই দেখা যাচ্ছে সূফীবাদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের অতি-বোধায়নের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিবাদ। সূফীরা মনে করেন শুধু তাত্ত্বিক বিচার-বিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়। তাই তাঁরা আপন অন্তরের অন্তর্গূঢ় অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হতে চান; তাঁকে পেতে চান প্রেম ও প্রীতিতে, অন্তরের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে। এ হচ্ছে যেন অন্ধকার হতে আলোর পথে অভিসার।

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখতে গেলে সূফীবাদকে প্রথমদিকে মননসিদ্ধ দার্শনিক তত্ত্বরূপে দেখতে পাই না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশে যখন অবক্ষয়ের করাল ছায়া জনজীবনকে ক্লিষ্ট করে তুলেছিল, তখন কিছুসংখ্যক জাগ্রতচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি সংসারের কলকোলাহল হতে দূরে, নির্জনে, একান্তে আন্তর-সাধনায় তথা আত্ম-উন্নয়নে মগ্ন হন। এঁদের মধ্যে সংসার-বিমুখতা ও কৃচ্ছ্রসাধনার প্রতি আগ্রহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এঁরা আত্মজ্ঞানলাভে ছিলেন উন্মুখ। আদি সূফীসাধকেরা কিন্তু কোরাণকে বর্জন করেননি, এবং তাঁরা কোরাণবর্ণিত কিছু আদর্শ—যথা, দিকির বা কোরাণ আবৃত্তি ও ঈশ্বরের নিয়ত নামকীর্তন, তোয়াক্কুল বা ঈশ্বরবিশ্বাস ও তাঁর কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ সাধনমার্গের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নবম শতাব্দীর শুরুতে সূফীসাধিকা ভক্তিমতী রাবিয়ার (জন্ম: খ্রীঃ ৮০১) জীবনে ঈশ্বরপ্রেম জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। রাবিয়া ছিলেন অসাধারণ নারী যাঁর সমস্ত সত্তা ঈশ্বর-অনুরাগের গৈরিকরঙে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরকে তিনি প্রেমাস্পদরূপে অনুধ্যান করতেন, তাই সাংসারিক বিবাহবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হননি। রাবিয়ার ঈশ্বর-উন্মাদনার সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী মীরাবাঈ-এর সাধনধারার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মীরাবাঈ তাঁর অসংখ্য ভজনগানের মাধ্যমে আজো ভক্তহৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। মীরাবাঈ-এর মত, রাবিয়াও অনেকগুলো ভক্তিগীতি রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়। রাবিয়া-রচিত বিখ্যাত প্রার্থনা হলো, 'হে প্রভু, নরক-ভয়ে ভীত হয়ে যদি তোমাকে ভজনা করি, তবে আমাকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করো। স্বর্গকামনায় যদি আমি তোমার আরাধনা করি, তাহলে আমার জন্য স্বর্গলোকের দ্বার রুদ্ধ করে দাও। কিন্তু হে প্রভু, শুধু তোমার জন্য তোমার চরণে যদি আমার হৃদয় অবনত হয়ে থাকে; তাহলে তোমার অনন্ত রূপমাধুরী হতে আমাকে বঞ্চিত করো না।' অনুরূপ একাধিক প্রার্থনার মধ্য দিয়ে রাবিয়ার ঈশ্বরপ্রেম ও আত্মনিবেদনের আকুল আর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রার্থনা ও প্রেমসাধনা, সূফীবাদের এ দুটো মৌলিকতত্ত্ব হচ্ছে রাবিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

ক্রমে এলো পরিবর্তন, সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রতা নব-মূল্যায়নের মাধ্যমে নূতন তাৎপর্য নিয়ে এলো সাধকের জীবনে। আত্মজ্ঞানলাভের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলো আত্যন্তিক। নিছক কৃচ্ছ্রতা প্রাণ-হীন ঊষর পন্থা-রূপে পরিত্যক্ত হলো। তার স্থলে ভাগবত প্রেম এবং গভীর ও অন্তরঙ্গ ঈশ্বরানু-ভূতি সাধনমার্গের সুনির্দিষ্ট পন্থা-রূপে স্বীকৃতিলাভ করলো। ইসলামের অতিবর্তী ঈশ্বর রূপ নিলেন

মানব-হৃদয়ের অন্তরতম প্রেমময় পুরুষরূপে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে মরমীসাধক মনসুর-অল্-হল্লাজের (জন্ম : ৮৫৮ খ্রীঃ) আবির্ভাব সূফীমতকে একটি বলিষ্ঠরূপ দিতে সাহায্য করেছিল। তিনি ছিলেন ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ। মহর্ষি হল্লাজ প্রতি মানুষের দেবত্বে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন; জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতি এই অভেদত্ব উপলব্ধির একমাত্র উপায়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'অন্-ল্-হক্' 'আমিই পরমসত্তা' (ঈশ্বর) বেদান্তের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'সোঽহং' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাণীর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর জীব-ব্রহ্মবাদ ঐস্লামিক ঈশ্বরতত্ত্বের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ নয় বলে তিনি গোঁড়া মুসলমানদের রোষদৃষ্টিতে পড়েছিলেন। তাঁর মতকে ঈশ্বরত্বের দাবী বলে মনে করা হয়েছিল। তাই তিনি ইসলামবিরোধী বলে হয়েছিলেন নিন্দিত। অবশেষে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। বরেণ্য মনীষী অধ্যাপক নিকলসন তাঁর বিখ্যাত 'Studies in Islamic Mysticism' গ্রন্থে হল্লাজের যে অমৃত-বাণীগুলো তুলে ধরেছেন, তা ভাগবত প্রেমের আরক্ত আবেগে প্রদীপ্ত, অদ্বৈতবোধে অনুরঞ্জিত।

'I am He whom I love, and He whom I love is I.
We are two souls dwelling in one body.
When thou seest me, thou seest Him :
And when thou seest Him, thou seest us both.'

হল্লাজের চিন্তাধারার মধ্যে যে আদর্শগুলো প্রাধান্যলাভ করেছে, তা হলো ঈশ্বরের প্রেমঘনরূপ, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেমের সম্বন্ধ ও অভিন্নতা এবং সর্বোপরি একেশ্বরবাদ হতে সর্বেশ্বরবাদের দিকে প্রবণতা। হল্লাজের বিশ্বাস, ঈশ্বর প্রতিটি মানবহৃদয়ে অন্তর্লীন সত্তারূপে বিরাজিত। মানুষ হচ্ছে একাধারে জীবসত্তা (নসূত Nasut) ও দেবসত্তার (লহুত Lahut) সমন্বিতরূপ। মানুষ অজ্ঞানবশতঃ যখন এ সমন্বয়ের মধ্যে দ্বৈতভাব দেখতে পায়, তখনই বিচ্ছেদ-বেদনার সূত্রপাত হয়। তাই হল্লাজের মতে অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভ, যার ফলে অদ্বৈততত্ত্বের সার্থক উপলব্ধি ঘটবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Miss Underhill একেই বলেছেন, 'Soul's solitary adventure' অথবা Plotinus-এর ভাষায় 'the flight of the Alone to the Alone'.

প্রকৃতপক্ষে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে সূফীবাদ একটি সুস্পষ্ট ধর্মমত ও সাধনপন্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই মতের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করা হয়। প্রখ্যাত সূফীকবি ও দার্শনিক মোহাম্মদ অল্-ঘজ্জালী (জন্ম : ১০৫৯ খ্রীঃ) সূফী-মতের দার্শনিক ভিত্তিভূমি রচনা করে ইসলাম-ধর্মচেতনার সঙ্গে এর সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা ; তাঁর রচনার মধ্যে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। কি ধর্মতত্ত্বে, কি কাব্যে, এটাই ছিল সূফীবাদের স্বর্ণযুগ। পারস্যের সূফীকবিরা অনেক মহিমময়, কাব্যসুষমামণ্ডিত কবিতা রচনা করেন। সনাই, নিজামী, আত্তার, 'মহানবী' প্রণেতা রুমী, সাদী, হাফিজ, জামী হচ্ছেন প্রথমসারির সূফীকবি। ভাগবত-আকুলতা ছিল তাঁদের কাব্যের প্রধান উপজীব্য। ইবন্-অল্-আরবি (জন্ম : ১১৬৫ খ্রীঃ) এ যুগের প্রখ্যাত সূফীদার্শনিক, যাঁর চোখে ছিল প্রজ্ঞার আলোক। জন্মসূত্রে তিনি স্পেন-দেশীয়। উদার সমন্বয়বাদের মাধ্যমে আরবি সূফীবাদকে দিয়েছেন এক বিশ্বজনীন রূপ। আরবির ঈশ্বর-চিন্তায় অদ্বৈততত্ত্ব ও ঈশ্বরের গুণাতীতরূপ বিশেষভাবে প্রকট। তাঁর মতে, 'সবই এক এবং

অখণ্ড সত্তার প্রকাশ। পরমসত্তা (Absolute Being) মানুষের বুদ্ধির অধিগম্য নন। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। বাক্যের অতীত ঈশ্বরকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তিনি গুণাতীত এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয় দ্বিত্বের দ্বারা খণ্ডিত নন। এটাই হচ্ছে সত্তার অখণ্ডত্ব।' (State of Oneness) জগৎ-সৃষ্টি সম্পর্কে আরবির অভিমত আকর্ষণীয়। সৃষ্টি বলতে অসৎ হতে কোন কিছুর নবায়ন বুঝায় না, সৃষ্টির রহস্য হচ্ছে, যা পরমসত্তার মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনারূপে, অঙ্কুর-আকারে অব্যক্ত ছিল, তা স্থান-কালের জগতে নামরূপ ধারণ করে বাস্তব হয়ে উঠে। সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ স্রষ্টার চেতনায় ভাবরূপে বর্তমান ছিল। জগৎ-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করছেন। তবে ঈশ্বরের সার্থক প্রকাশ মহাত্মা—পয়গম্বরের জীবনে, তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে। পয়গম্বরই হচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি যাঁরা বিশ্বে তাঁর অনন্ত মহিমা কীর্তন করেন।

আরবি উদার ধর্মচেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাই তাঁর চিন্তায় কোন সংকীর্ণতা, ধর্মান্ধতা বা পরমত-অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায় না। আরবির বিশ্বাস, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মমত ও সাধন-প্রণালীর মধ্যে সত্য নিহিত আছে। সুতরাং নিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহকারে যে কোন একটি পথ বা আদর্শ অনুসরণ করলে পরমজ্ঞানলাভ, নির্বাণ-প্রাপ্তি বা ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব। মূর্তি বা প্রতীকের মাধ্যমে একই ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। আরাধনার সহজতম ও সুনিশ্চিত উপায় হচ্ছে ভাগবত আকুলতা ও প্রেম। আরবির ধর্ম-সমন্বয়ের চিন্তার মধ্যে ঋগ্বেদের 'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় একই সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সুফীসাধনার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে যে প্রত্যয়গুলো প্রধানরূপে দেখা দিয়েছে, সেগুলো হলো—এক ঈশ্বরে (অল্ হক্) বিশ্বাস, ঈশ্বর কোন সুদূর স্বর্গলোকের অধিবাসী নন। তিনি নির্মল, অনন্ত, সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রেমময়। অধিকাংশ সুফীসাধক ও কবি মানবাত্মাকে প্রেমিক ও ঈশ্বরকে 'প্রেমিকা' রূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বর হচ্ছেন 'পরাণসখা বন্ধু'। পার্থিব মানুষ যেন বহু-দূরে নির্বাসিত ও বিরহব্যথায় ক্লিষ্ট। মানুষ তাই ঈশ্বরের সঙ্গে পরমানন্দময় মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। ঈশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক অপার্থিব আনন্দ-সাগরে অবগাহন করে। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি—

'তুমি আছো বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমা নিলয়ে ॥
অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্তলোকে
তুমি আছো মোরে চাহি আমি চাহি তোমা-
পানে।

স্তব্ধ কোলাহল শান্তিমগ্ন চরাচর
এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥'

সুফীমরমিয়াদের মধ্যে যাঁরা ঈশ্বরকে বিশ্ব-মানবের অন্তরতম কল্পনা করেন এবং জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভিন্নতায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা কিন্তু আত্মজ্ঞানলাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন অধিক, কারণ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই শুধু জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্ভব হবে। কাজেই তাঁকে পেতে হবে অন্তরঙ্গ অনুভূতিতে, ধ্যানের তন্ময়তায়। ধ্যানের মধ্য দিয়ে 'জীবনদেবতা' মানবচিত্তে তাঁর প্রকৃত স্বরূপে ধরা দেন। পারস্যের সুফীকবিরা ঈশ্বরকে দেখেছেন 'প্রিয়তমা'রূপে। বৈষ্ণবকবিদের মত, তাঁরা মানব-মানবীর আসঙ্গ-লিপ্সার উপমার সাহায্যে ঈশ্বরলাভের জন্ত ব্যাকুলতা ও তীব্রতা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা যেসব প্রতীক ও উপমা ব্যবহার করেছেন, অনেকক্ষেত্রে তা সুরুচির সীমারেখা অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক ইন্দ্রিয়জ নয়—পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক; কাজেই স্বফীকবিদের রচনাকে আমরা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার জয়গান বলে যেন তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর মনে না করি। আমরা দেখেছি স্বফীসাধনার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে পরমপ্রিয় ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়া এবং প্রিয়মিলনহেতু অনাবিল আনন্দলোকে অবস্থান। এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে Encyclopaedia of Religion & Ethics (Vol. XII, 1921 Edn., p. 14)-এ বলা হয়েছে, 'The Sufi Theory of Ecstasy recognises two aspects of the experience of oneness with God. These aspects are symbolised by such negative terms as *fana* ('passing-away' from individuality), *faqd* ('Self-loss'), *Sukr* ('intoxication') with their positive counterparts *baqa* ('abiding in God'), *wajd* ('finding God') and *Sahw* ('sobriety').' 'ফনা'তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে সংকীর্ণ অহংবোধের (ego-consciousness-এর) আত্যন্তিক বিনাশ, যা প্রিয়মিলনের পথে প্রধান অন্তরায়। শ্রীরামকৃষ্ণ একেই বলেছেন 'কাঁচা আমি'। অহংবোধের অবলুপ্তিতেই ভাগবত চেতনার প্রতিষ্ঠা। অধ্যাপক নিকলসন তাই বলেছেন, 'When the individual self is lost, the Universal Soul is found.' ঈশ্বরের মধ্যে মানবাত্মার অতীন্দ্রিয় সমাধিই হচ্ছে মিলন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে: এ মিলন কি ব্যক্তিসত্তার চির-অবলুপ্তির ইঙ্গিত করে? এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে মরমিয়া সাধক ও মনীষীদের মধ্যে মতভেদ থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। মিলন বলতে যদি ব্যক্তিসত্তার আত্যন্তিক বিনাশ বুঝায়, তাহলে দেহাবসানে তা সম্ভব হবে। ভারতীয় দর্শনে একেই 'বিদেহ মুক্তি' বা 'পরিনির্বাণ' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে হয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বা একাত্ম হওয়ার কথা যেভাবে স্বফীসাহিত্যে আভাসিত, তা বোধহয় জীবসত্তার সার্বিক বিনাশের ইঙ্গিত করে না; এ যেন একপ্রকার ভাবমিলন। (Qualitative union and not existential union) পাশ্চাত্য পণ্ডিত A. J. Arberry বলেন, 'The muslim mystic may hope even in this mortal life to win a glimpse of immortality, by passing away from self (*fana*) into the consciousness of survival in God (*baqa*). [Sufism, p. 14] তাই মিলন-শূন্যতার অমানিশায় আত্মবিসর্জন নয়, পূর্ণতার ও পরমপ্রাপ্তির প্রশান্তিতে অবগাহন। এতে নেই রিক্ততার গ্লানি, আছে অনাবিল আনন্দমাধুরী।

বিভিন্ন ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ও নানাবিধ তত্ত্বে পরিপুষ্ট স্বফীমতের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। স্বফীবাদের পর্যালোচনা হতে যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, তা হলো ভারতীয় ঈশ্বরচিন্তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য। আবার যে সাধনমার্গ অবলম্বন করে আত্মার অভিযাত্রা শুরু হয় পরমাত্মার দিকে, তার সঙ্গে ভারতের যোগসাধনা ও বৈষ্ণব সাধন-প্রণালীর মৌলিক সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। প্রবন্ধের প্রস্তাবনা-পর্বে বৈষ্ণব দর্শন বিশেষ করে নারদীয়ভক্তিসূত্র, পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-পুরাণের ভক্তিবাদের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সঙ্গতকারণে অধিকাংশ বিদগ্ধ মনীষী স্বফীবাদকে Devotional Mysticism বা Love Mysticism বলে অভিহিত করেছেন। বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পাঁচটি অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে; যথা—শান্ত, দাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা মাধুর্য। সুফীসাধকেরা শুধুমাত্র মাধুর্য (মহব্ব—Mahabba) অর্থাৎ প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়ার অনুরাগ-সদৃশ গভীর প্রেমানুভূতির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব বলে মনে করতেন। বৈষ্ণবদর্শনের আলোকে সুফী-অনুসৃত প্রেমভক্তিতত্ত্বকে বেদান্তের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের 'মাধুর্যপ্রধান ভক্তি'র সঙ্গে তুলনা করা চলে। অবশ্য রামানুজ ও মধ্ব সম্প্রদায় 'ঐশ্বর্য-প্রধান ভক্তিবাদে'র সমর্থক। বৈষ্ণবদার্শনিকদের মত সুফীরাও মনে করেন যে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও আত্ম-জ্ঞানলাভ (মরিফত Marifat) একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাবলে সম্ভব হতে পারে এবং এর জন্য প্রয়োজন ঈশ্বর-চরণে ঐকান্তিক আত্মনিবেদন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের বাণীর মধ্যে এ পথের সন্ধান রয়েছে—'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' বৈষ্ণবসাধকেরা একেই বলেছেন প্রপত্তি বা শরণাগতি, আর সুফী তোয়াক্কুল (Tawakkul) দিকির (Dikir) রিদা (Rida) প্রত্যয়গুলোর মাধ্যমে অনুরূপ ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। বেদান্ত ও সুফীবাদের সাদৃশ্য সম্রাট শাজাহানপুত্র দারাশিকোকে 'Majna al-bahrin' গ্রন্থ রচনা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ সর্ব্ব-পল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেন, 'Sufism is akin to Advaita Vedanta. It believes in the non-dual Absolute and looks upon the world as the reflection of God, who is conceived as light.' (Eastern Religions and Western thought, p. 339) আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলা চলে যে সুফীবাদীরা ধর্ম ও ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তঃস্থলের নিবিড় ব্যক্তিগত অনুভূতিরূপে উপলব্ধি করার উপর যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনচিন্তার সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ এবং অনেকক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

সুফীসাধনা মরমী-অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্টরূপ ও আধ্যাত্মিকতার দ্যোতক। আবার আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) হচ্ছে প্রতিটি ধর্মের প্রাণবিন্দু। সুফীবাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি, আত্ম-উদ্বোধন ও আত্ম-নিবেদনের কথা বলা হয়েছে, সে তো প্রতিটি ধর্ম-চেতনার শাশ্বত বাণী। সুফীবাদের ব্যবহারিক তাৎপর্য হলো এই যে আন্তঃশুচিতার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষকে দিব্যজীবনের অধিকারী হতে হবে। যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ, বিরোধ ও সংঘাত মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সেগুলি অতিক্রম করে বিশ্বমানবিকতায় উত্তরণের প্রয়াসই হবে প্রতি মানুষের চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক। দেশ-কালের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না থেকে সুফীমত আমাদের একটি উদার এবং বিশ্বমানবিক চেতনার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। সুফীসাধনার সঙ্গে কর্ম-সন্ন্যাসের কোন অনিবার্য যোগ নেই। কাজেই মরমীসাধক যে স্বাভাবিক নিয়মে জীবনবিমুখ হবেন, এমন কোন কথা নেই। কারণ যেখানে অহংবোধের বিনাশের ফলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটেছে, আত্মার স্বরূপ-পরিচয় সম্ভব হয়েছে, সেখানে বরং সাধক প্রেমে ও কর্মে সুরভিত শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠবেন। আলোর অধিকারী যাঁরা হয়েছেন, তাঁরাই তো অন্ধকারে বিভ্রান্ত মানুষকে দেবেন আলোর সন্ধান!

সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির স্বরূপ। লেখক ও প্রকাশক: দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ২/৪ নারায়ণ রায় রোড, কলিকাতা-৮। (১৯৭৬), পৃঃ ১৬, মূল্য: দুই টাকা।

এটি ষোল পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। কিন্তু অনেক অনেক বৃহদাকার গ্রন্থ পাঠ করার পরেও যখন দেখা যায় নতুন কিছুই জানতে পেলাম না, কেবল চর্বিত-চর্বণ বা রোমন্থন কিংবা খোড়বড়ি খাড়া খাড়াবড়ি খোড়, তখন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাকার পুস্তিকাটিতে জানবার মতো কিছু (কারো কারো কাছে বা অনেক-কিছু) পাওয়ার জন্যে লেখক নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। লেখক যে যথাবাক্ ও সংযত—এটা উল্লেখ্য হতে পারে।

গীতাঞ্জলি-র ইংরেজী রূপ-রূপান্তর নিয়ে বহুদিন থেকে বহুরকম জলঘোলা কারবার হয়েছে—কবি রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার যোগ্যতা-যোগ্যতা সম্পর্কে এবং সেইসঙ্গে ইংরেজী 'Song Offerings'-এর ভাষা-সৌষ্ঠবে অন্যহাতের (রবীন্দ্র-সুহৃদ আইরিশ কবি নোবেল লরিয়েট ইয়েট্স-এর) কাজ কতটা সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে; কিন্তু ওসব কচকচি গবেষণার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে লেখক এখানে অতি স্বল্পস্থানে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশন করেছেন—যেটা অনেকেরই অজানা অথচ জানা থাকা দরকার:

১ ॥ রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা-গ্রন্থটি নোবেল কমিটি কর্তৃক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল তা পুরোপুরি বাংলা গীতাঞ্জলিরই ইংরেজী অনুবাদ নয়।

২ ॥ নোবেল প্রাইজ-ভূষিত রবীন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থের নাম 'Song Offerings' হলেও সেখানে সঙ্কলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই নয়টি কবিতা-গ্রন্থ ও একটি নাটক থেকে মোট একশ চারটি কবিতা-সঙ্গীত বা সঙ্গীত-কবিতা। এদের মধ্যে গীতাঞ্জলি থেকে নির্বাচিত হয়েছে ৫৩টি, গীতিমাল্য থেকে ১৬টি, নৈবেদ্য থেকে ১৬টি, খেয়া থেকে ১১টি, শিশু থেকে ৩টি এবং অচলায়তন, স্মরণ, কল্পনা, চৈতালি, ও উৎসর্গ-এর প্রত্যেকটি থেকে এক-একটি। উল্লেখ্য এদের মধ্যে সবগুলিই কাব্যগ্রন্থ, একটি মাত্র নাটক অচলায়তন। (গ্রন্থকার ইংরেজীতে যে ক্রমিক সংখ্যা দিয়েছেন, তাতে পৃষ্ঠা ১২-তে 'Even so, in death the same unknown'—কবিতাটিতে কোনও সংখ্যা দেন নি। ফলে পরবর্তী সব কবিতা-গুলির সংখ্যাই বদলে যাবে। শেষ কবিতাটির সংখ্যা 104 হবে, ছাপা আছে 103. পৃষ্ঠা ১৩'র প্রথম লাইনেও '১০৩টি' লেখা আছে হবে '১০৪টি'। পৃষ্ঠা ৪-এও ঠিক এই ভুলটিই আছে।)

৩ ॥ গ্রন্থকারের ষোল পৃষ্ঠা পুস্তিকার আট পৃষ্ঠা খুবই মূল্যবান—এখানেই পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে ইংরেজী গীতাঞ্জলি তথা 'Song Offerings'-এর প্রত্যেকটি কবিতার ক্রমিক-সংখ্যা; বাংলা মূল কাব্য/নাটক গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত কবিতা-সঙ্গীতের প্রথম পঙ্ক্তি এবং গ্রন্থ/কবিতার ক্রমিকসংখ্যা। এই কাজটি তুলনামূলক বোধের এবং যথাযথ আলোচনার সহায়ক এবং এই ক্ষেত্রে ইংরেজী গীতাঞ্জলির ৫৭-সংখ্যক কবিতাটি (দ্রঃ Light, my light, the worldfilling light) যে—অচলায়তন নাটকেরই 'আলো আমার আলো, ওগো, আলো ভুবনভরা' সঙ্গীত-কবিতাটিরই ইংরেজী অনুবাদ, অন্য কোন গানের নয়—এই সিদ্ধান্ত লেখক প্রতিষ্ঠিত করেছেন যথাযথ তথ্যবিচার দ্বারাই।

৪ ॥ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ও বাংলা গীতাঞ্জলির প্রসঙ্গে লেখক 'গীতাঞ্জলি'-র

সার্বজনীন আবেদন ও গদ্যছন্দের কাব্যসৌন্দর্য সম্পর্কে অজিত চক্রবর্তী লিখিত ও ষ্টপফোর্ড ব্রুক কথিত অভিমতের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন পুস্তিকাটির প্রথম দিকে ; শেষের দিকে যোজনা করেছেন শিল্পী রোটেনষ্টাইন ও কবি ষ্টপফোর্ড ব্রুক সূত্রে গীতাঞ্জলির প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশস্তি-বাণী পরিশেষ অংশে অধ্যাপক ডক্টর উজ্জ্বলকুমা মজুমদার লিখিত 'নোবেল কমিটির চোখে রবীন্দ্র নাথ' নামক আলোচনার কিছু উদ্ধৃতিও মূল্যবান

'চলমান

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ত্রাণকার্য

ভারতে :

(ক) ত্রিপুরা-হাঙ্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণকার্য : বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক অক্টোবর মাসে (১৯৮০) ৩,১৫৭টি ধুতি ও শাড়ি, ৩৪৪টি পশমী কম্বল, ৪০৫টি নূতন পোশাক ১২০টি পুরাতন পোশাক, ১১২টি মাদুর, ১৩৭টি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও ৪টি ট্রাঙ্ক ২,৯১১টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। তাছাড়া ৬৫২ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বই, খাতা ও শ্লেট-পেনসিল দেওয়া হইয়াছে।

(খ) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য : বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুদ্ধারের কার্য এবং বন্যাদুর্গত যে-সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য-সীমার নীচে রহিয়াছে, তাহারা যাহাতে খাদ্যে স্বনির্ভর হইতে পারে সেজন্য গৃহীত কার্যসূচীর রূপায়ণ প্রাগ্রসর। দিঘড়ায় নির্মিত ৮৪টি গৃহের চতুর্থ কলোনীটি হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। রামহরিপুর শাখাকেন্দ্র কর্তৃক নির্মিত 'সারদা পল্লী' নামক তেরটি গৃহ ও একটি সার্বজনীন সভাগৃহ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখে তেরটি বাউড়ি পরিবারকে দেওয়া হয়।

(গ) অন্ধ্র প্রদেশ : শ্রীকাকুলামে ৪টি গ্রামের ৭২৪টি পরিবারের মধ্যে এক মাসে ৪,৫০০ কেজি চাল, ২৭৫ কেজি পেঁয়াজ, ২০০ প্যাকেট লবণ ও ৪৯৫টি শিশু-পোশাক বিতরিত হইয়াছে।

(ঘ) উড়িষ্যা : কোরাপুট জেলার গুন্নুপুর অঞ্চলে ১১টি গ্রামের ৩০৮টি পরিবারের মধ্যে ১,৮০০টি বাসনপত্র, ১৩৩টি ধুতি ও শাড়ি ও ১০০টি শিশু-পোশাক বিতরিত হইয়াছে।

(ঙ) গুজরাত (১৯৭৯'র বন্যায়) পুনর্বাসন-কার্য : ভানালিয়া গ্রামে গৃহনির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ-প্রায়। স্কুল ও ডিস্পেনসারীর নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে।

আসাম ও বিহারে বন্যাত্রাণকার্য বন্ধ করা হইয়াছে।

বাংলাদেশে :

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা গত ৩০শে ও ৩১শে আশ্বিন এবং ১লা কার্তিক যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নবমীর দিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ব্যতীত পূজার অন্যান্য দিনগুলিতে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। তিন দিনই সকলকে হাতে হাতে খিচুড়িপ্রসাদ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নলিখিত ২৪টি শাখাকেন্দ্রেও যথারীতি এই বৎসর প্রতিমায়

দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে :

আসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোম্বাই, কাঁথি, ঢাকা, গৌহাটি, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লক্ষ্ণৌ, মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জী), শিলং, শিলচর, শ্রীহট্ট এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম।

দ্বারোদঘাটন

মাদ্রাজে জর্জ টাউনে ৩রা অক্টোবর (১৯৮০), শ্রীরামকৃষ্ণ ন্যাশনাল স্কুলের নূতন ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত্য করেন তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল।

ছাত্রদের কৃতিত্ব

এই বৎসরের (১৯৮০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর** রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের আটজন ছাত্র চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম (যুগ্মভাবে), পঞ্চদশ ও ঊনবিংশ (যুগ্মভাবে) স্থান অধিকার করিয়াছে এবং **রহড়া** রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের দুইজন ছাত্র নবম ও চতুর্দশ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সাহিত্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

এলাহাবাদ রামকৃষ্ণ মঠে ১৫ই নভেম্বর (১৯৮০), স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের প্রচারহেতু একটি সাহিত্য-কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ৩রা জুন ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ১৪ই জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

১৮৮২ সালের ২৮শে অক্টোবর। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভগবৎপ্রসঙ্গ করছেন। জনৈক ব্রাহ্মভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের সাকার রূপও দেখা যায়, আবার অরূপও দেখা যায়। ঠাকুরের এ-কথার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এরপর ব্রাহ্মভক্তটি প্রশ্ন তুললেন, 'কি উপায়ে তাঁকে দেখা যেতে পারে?' এই উপায়ের কথা কথামৃতে বারংবার আলোচিত হয়েছে। এটি সাধারণ সংজ্ঞাতে দর্শনগ্রন্থ নয় বা ধর্মীয় বিধি-বিধানের গ্রন্থও নয়। এতে আছে অনুভূতির কথা, এবং কি ক'রে ভগবানকে পাওয়া যায়, কোন্ পথ অবলম্বন করলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়, তারই অভ্রান্ত নির্দেশ। তাই ব্রাহ্মভক্তটির প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, 'ব্যাকুল হয়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার?' আমরা কাঁদি কখন? হৃদয়ের একটা আবেগ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখনই কাঁদি। সুখের আবেগ বা দুঃখের আবেগ যখন আসে, তখনই আমাদের চোখে জল আসে। সেজন্য সেই আবেগটি আমাদের চাই, আমাদের এই অভাববোধটি আনতে হবে যে, ভগবানকে আমরা পাচ্ছি না, তাঁকেই আমরা চাই, আর কিছুই চাই না। এই তাঁকে না পাওয়ার অভাববোধজনিত ব্যাকুলতা নিয়ে আসতে হবে। আমি কেন পাচ্ছি না? আমাদের পরিবারের কোন প্রিয়জন যখন দূরে যান—বাবা, মা, ভাই বা পত্নী দূরে গেলে তাঁদের জন্য মন ব্যাকুল হয়, তাঁদের জন্য আমরা কাঁদিও। এই যে কান্না, এটি অন্তরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। নারদ-ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে, '…তদ্‌বিস্মরণে পরম-ব্যাকুলতেতি'—তাঁর বিস্মৃতি ঘটলে যে পরম

ব্যাকুলতা, সেইটাই হচ্ছে ভক্তি—ভগবানকে পাওয়ার উপায়। আর একটি উপায়ের কথাও নারদ বলেছেন, 'তদর্পিতাখিলাচারতা'—লৌকিক, শাস্ত্রীয়, সমস্ত কর্মই তাঁকে সমর্পণ করা, তাঁরই প্রীতির জন্য করা। এটাও ব্যাকুলতার আর একটি প্রকাশ। ব্রজগোপিকারা কত করছেন—রাঁধছেন, স্বামীর সেবা করছেন, ছেলেকে দোলায় শুইয়ে দোল দিচ্ছেন সংসারের সমস্ত কাজের মধ্যেও তাঁরা কিন্তু স্মরণ করছেন গোবিন্দকে। তাঁদের এই স্মরণ চলছে নিরন্তর। আর যখনই তাতে ছেদ পড়ছে, তখনই আসছে সেই পরম ব্যাকুলতা—যে ব্যাকুলতার কথা কবি বিদ্যাপতি বলছেন :

[শ্রীরাধিকার উক্তি]

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈসে গমাওব
হরি বিনু দিন রাতিয়া ॥

—আনন্দে মত্ত ডাহুকী পাখী ডাকছে, দাদুরি (ভেকী) ডাকছে, কিন্তু আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। চারিদিক অন্ধকার, ঘোর রাত্রি, চঞ্চল বিদ্যুৎ-পঙ্‌ক্তি! বিদ্যাপতি বলছেন, হরি বিনা রাধা কেমন ক'রে দিনরাত কাটাবেন। এই হচ্ছে ব্যাকুলতা। ভগবানকে পাওয়ার জন্য এই আর্তি চাই কাঁদতে হবে। এই কথাই ঠাকুর বলছেন, 'ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদতে পার ?'

মানুষ ঈশ্বরের জন্য কাঁদতে পারে না। তাই ঠাকুর বলছেন, 'লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রী টাকার জন্য, এক ঘটি কাঁদে। কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে ?' তিনি উপমা দিচ্ছেন ছেলের চুষিকাঠি নিয়ে ভুলে থাকার কথা ব'লে। আবার সেই চুষি যদি সে ফেলে দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে, তখন মা-ও সব কাজ ফেলে ছুটে আসেন তাকে শান্ত করতে। এই যে কান্না, এর ফল কি তাই দেখাচ্ছেন তাঁর তুলনাহীন উপমার সাহায্যে। এই সংসারকে আমরা চুষিকাঠির মতো নিয়ে মেতে আছি। জগন্মাতা বলছেন, বেশ খেলছে, খেলুক। কিন্তু যখন এই খেলা আর ভালো লাগে না, মনে বৈরাগ্য জাগে, বিবেকবুদ্ধি জাগে, তখন চুষিকাঠি-রূপ সংসার পরিত্যাগ ক'রে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। জগন্মাতাও তখন আনন্দের সঙ্গে মোক্ষদ্বার অপাবৃত ক'রে দেন। 'মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী' তিনি। কিন্তু চাই ঐ ব্যাকুল ক্রন্দন। তবেই তাঁর দর্শনলাভ সম্ভব

এই তীব্র ব্যাকুলতাই আমরা দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। ভক্তিপথের যাঁরা সাধক, তাঁদের পক্ষে এই ব্যাকুল ক্রন্দন মস্ত বড় উপায় শ্রীভগবানকে লাভ করার। গোপীদের বিরহ, শ্রীরাধিকার বিরহ, শ্রীচৈতন্যদেবের বিরহ অমর হয়ে আছে বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে। সেখানে প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বরের জন্য মানবহৃদয়ের যে আর্তি সেটি অপূর্বসুন্দর ভাবে ও ভাষায়। পরবর্তী যুগে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত থেকে মাতৃ-দর্শনলুব্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পর্যন্ত একই ব্যাকুলতা দেখি। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা তুলনাহীন। তিনি বিরহযন্ত্রণায় ছটফট ক'রে মাটিতে মুখ ঘষটে কেঁদেছেন—মুখ কেটে রক্ত ঝরেছে। দিনের শেষে আরতির শঙ্খঘণ্টার শব্দ শুনে কাতর ক্রন্দনে চীৎকার ক'রে বলেছেন, 'মা, আরও একটা দিন চলে গেল তবু তো তোর দর্শন পেলাম না।' মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছেন, 'মা, এখনও দেখা দিলি না' ব'লে। এই হচ্ছে পরম ব্যাকুলতা। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যা উপদেশ করেছেন তা তাঁর মৌখিক কথা নয়। প্রতিটি কথা তাঁর নিজের জীবনের অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে সত্য। এই যে আর্তি, এই যে ক্রন্দন ভগবানের জন্য, এইটিই পরম সাধন।

এইটি ব্রাহ্মভক্তদের শিক্ষা দিচ্ছেন। কারণ তাঁদের যে ভক্তিভাব সেটি কেবলমাত্র আচরণগত ভাব। তাঁরা সভায় গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, নানারকম প্রশংসাপর কথা বলেন। কিছু স্মরণ-মনন হ'ল, কিছু কল্যাণ তাতে হ'ল নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে ব্যাকুলতার অভাব। সেইজন্য তাঁদের কাছে এই ব্যাকুলতার কথা, ক্রন্দনের কথা বলছেন।

এরপর ব্রাহ্মভক্তটি প্রশ্ন করছেন, 'মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার—কেউ বলে নিরাকার—আবার সাকারবাদীদের নিকট নানা রূপের কথা শুনতে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?' এই প্রশ্নটি চিরন্তন—শুধু তখনকার যুগের নয়, বর্তমান যুগেরও প্রশ্ন এটি। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

সাকার আর নিরাকার। ব্রাহ্মভক্তেরা সাকার রূপ মানতেন না, তাঁরা নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার যাঁরা অদ্বৈতবাদী, তাঁদের লক্ষ্য নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম। সাকারবাদী যাঁরা, তাঁদের মধ্যেও আবার নানা শ্রেণী—কেউ বিষ্ণুভক্ত, কেউ শিব-ভক্ত, কেউ গণেশভক্ত, কেউ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, কেউ আবার দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির উপাসক। আবার শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি নানা দেবদেবীর উপাসকও সাকারবাদীদের মধ্যে আছেন। কোন্‌টা ভগবানের আসল রূপ? এইটাই ব্রাহ্মভক্তটির প্রশ্ন। আগেই বলেছি, এটি চিরকালের প্রশ্ন। এর উত্তরে ঠাকুর বলছেন, 'যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন। সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে?'

কেউ যদি কালীভক্ত হয়, সে কালীরূপই দেখবে। কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, সে কৃষ্ণরূপই দেখবে। যে-সাধক যে-রূপ দেখতে চায়, সে সেই রূপটিই দেখতে পায়। এক ব্রহ্মই আছেন নানা বস্তু, গাছপালা, জীবজন্তু—এই সব কিছুর পিছনে অধিষ্ঠানভূমি হিসাবে। তাঁকে অবলম্বন ক'রেই আমরা বহুত্বকে দেখছি। যখন জ্ঞানের রাজ্যে ওঠা যায়, তখনও আমাদের বৃত্তি অনুসারে নানা রূপ দেখা যায়। মানুষ যে-রূপকে অবলম্বন করতে চাইবে, ভগবান সেইরূপেই সামনে আসবেন। মনই সেইরূপের আকারে আকারিত হবে। কারও যখন কোন দর্শন-অনুভূতি লাভ হয়, তখন ভগবানই বুঝিয়ে দেন, মনই তখন সব বুঝতে পারে। সাকার কি? নিরাকার কি? —এ-সবই তখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধকভাব আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন যে, ঠাকুর যতরকম সাধন করেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ষোল আনা সেই ভাবে ভাবিত হয়ে করেছেন। যখন ইসলাম সাধন করেছেন, তখন পুরোপুরি সেইভাবে নিজেকে ভাবিত করেছেন। সাধনভজন, বেশভূষা ইত্যাদি সব মুসলমানী ঢঙে, শুধু মুসলমানকে দিয়ে রান্নাটা মথুরবাবু করতে দেননি। এমন কি তাঁর এত প্রিয় যে মাকালীর মন্দির সেখানেও এই সাধনের সময় যাননি। কালীবাড়ীর ভিতরেও যাননি একবারও। বাইরে কুঠিবাড়ীতেই ছিলেন। আর এই একমন একপ্রাণ সাধনার ফলে ইসলাম ধর্মের সাধনার যে-তত্ত্ব সেই তত্ত্বের উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি ক'রে তাঁর মন তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে তিনি প্রত্যেকটি ধর্মমতের সাধন ক'রে একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছেন। এই একত্বের সাধনাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা। সেইজন্য তিনি

বলতে পেরেছেন, 'যত মত তত পথ।' 'যত মত তত পথ'—এই কথাটির অর্থ আমাদের বোঝা দরকার। এর অর্থ এই নয় যে, ঐ মত বা পথগুলি দিয়ে যা আমরা পাচ্ছি বা যেখানে আমরা পৌঁছচ্ছি, তাই চরম বা পরম তত্ত্ব। চরম তত্ত্বটি হচ্ছে একত্ব, যেখানে গিয়ে সব পথ মিলেছে, সব পথের শেষ অনুভূতি, চরম অনুভূতি যেটি। যে-কোন পথকেই আমরা অবলম্বন করি না কেন, পরিশেষে আমরা ঐ একত্বরূপ চরমতত্ত্বে গিয়ে পৌঁছব। কিন্তু ক'জন এইভাবে একটি পথকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে চরমতত্ত্বে পৌঁছতে পারেন? বেশীর ভাগ লোকই পল্লবগ্রাহী হয়ে ভাসাভাসাভাবে মতামত প্রকাশ করেন—কোন মতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সাধনপথে অগ্রসর হন না। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, 'সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে?' এই ব'লে ঠাকুর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ ইত্যাদি বিতর্কের উৎপত্তি কিভাবে হয় এবং এর সমাধানই বা কি। তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত বহুরূপীর গল্পটি বললেন। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমাদের আংশিক দর্শন হয়—সামগ্রিক জ্ঞান লাভ হয় না। তবে যাঁরা সর্বক্ষণ 'গাছতলায়' বাস করেছেন, ব্রহ্মানুভূতি লাভ করেছেন, তাঁরাই জানেন ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ কি। 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।'—সাধকদের কল্যাণের জন্যই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন সাধকদের ভাবানুযায়ী। তিনি বহুরূপী। 'সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।' যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার হন। এই গাছতলার মানুষ হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এই একটি মানুষ যিনি সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ করে-ছিলেন। গীতায় আংশিকভাবে সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণের পরিপূর্ণ সমন্বয় করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই তিনি বলতে পেরেছেন, 'যত মত তত পথ।' তিনি ঐ 'গাছতলা'তেই বাস করতেন। সেইজন্যই তিনি বলতে পেরেছেন ঐ বস্তুটি কি বস্তু। আবার তিনি অন্য জায়গায় এও বলেছেন, 'ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।'

এটা তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যিনি সদা-সর্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করেন। তিনি জানেন যে, ভগবান ভক্তের কাছে নানারূপে নানাভাবে দেখা দেন। ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবানকে তার পছন্দমতো মূর্তি ধারণ করতে হয়। ভক্তের মহিমা বাড়ানোর জন্য ভক্তবৎসল ভগবান তার ইচ্ছা পূর্ণ করেন। যেমন দ্বারকায় মহাবীরের মনস্তুষ্টির জন্য কৃষ্ণ-রুক্মিণীকেও রাম-সীতার রূপ ধারণ করতে হয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, রাম-লক্ষ্মণ যখন নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছেন তখন তাঁদের মুক্তির জন্য গরুড় সেখানে আসেন। কিন্তু গরুড় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে রামচন্দ্রকে কৃষ্ণরূপ ধারণ করতে হয়েছিল। এই যে ঈশ্বরের নানারূপ ধারণ এটি হচ্ছে সাধকের প্রীতির জন্য, কল্যাণের জন্য। তাই শাস্ত্র বলছেন, 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' কাজেকাজেই আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করতে পারি, সেটা দোষের নয়। কিন্তু ঠাকুর যে কথাটা বলেছেন, সেইটাই আসল কথা—'মতুয়ার বুদ্ধি করো না।' অর্থাৎ আমার মতটাই ঠিক, আমি যেটা বুঝেছি, যে-পথে সাধন করেছি, সেটাই ঠিক আর অন্য সব পথ মত বেঠিক—এই ভাব ভাল নয়। (১।৩।৫)

গীতা—

আমরা দেখেছি, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান অর্জুনকে যুদ্ধ করবার জন্য প্রোৎসাহিত করেছেন। এদিকে তার আগে ঐ অধ্যায়েই তিনি

জ্ঞানের অনেক প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, অখিল কর্ম জ্ঞানেই পরিসমাপ্ত হয়। সমস্ত কর্ম ত্যাগ ক'রে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের কাছে গিয়ে কি উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ করতে হয়, তাও বলেছেন। তৃতীয় অধ্যায়েও বলেছেন, যে-ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট তাঁর কোনও কার্যই নেই। এই সব কথা শুনে অর্জুনের মনে সংশয় জেগেছে, কোন্‌টা তিনি করবেন—কর্মযোগ না জ্ঞানযোগ ?, কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ ?

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই তাই অর্জুন বলছেন : 'হে কৃষ্ণ, কর্মের সন্ন্যাস, অর্থাৎ কর্মত্যাগ এই যে-কথা তুমি বলছ, ব'লে আবার বলছ যে, কর্মযোগ অবলম্বন কর। এটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এইজন্য এই দুটির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, সেটি আমাকে বল।' (৫।১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের যোগ্যতা জানেন। অর্জুন জ্ঞানযোগের অধিকারী কি কর্মযোগের অধিকারী, তা তিনি জানেন। জানেন ব'লেই তিনি অর্জুনকে কর্মযোগ অবলম্বন করতে বলছেন। কিন্তু সোজাসুজি বলছেন না যে, জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ অর্জুন জ্ঞানযোগের অধিকারী নন। যদি তিনি সোজাসুজি অর্জুনকে বলতেন, 'তুমি জ্ঞানযোগের অধিকারী নও', তাহলে অর্জুনের মনে একটা হতাশা আসতো। সেইজন্য ঠিক ঐভাবে না ব'লে তিনি তাঁকে বলছেন : 'কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ দুটিই মোক্ষের সাধন ; কিন্তু এ দুটির মধ্যে কর্মযোগই কর্মসন্ন্যাসের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।' (৫।২)

কর্মসন্ন্যাস মানে হচ্ছে কর্মপরিত্যাগ করা। কর্মপরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়ে 'নেতি নেতি' বিচার করা—এ হ'ল জ্ঞানযোগের সাধনা। আর কর্মযোগের সাধনা হচ্ছে, কোন কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা না ক'রে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম করা। শ্রীভগবান বলছেন, এ দুটোর দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্বাতে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন'—এই দুটিই মোক্ষ নিয়ে আসে, কারণ তারা জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কারণ। অর্থাৎ এই দুটি সাধনই অজ্ঞান দূর ক'রে দিয়ে যে-পরমজ্ঞান, তাতে পৌঁছে দেয়। এই ব'লে শ্রীভগবান আবার বলছেন, এই দুটোর মধ্যে কর্মযোগ বিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর। এটি বলার কারণ সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'কর্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্মযোগং স্তৌতি'—'কর্মযোগ উৎকৃষ্টতর', এই কথাটি কর্মযোগের প্রশংসাপর বাক্য মাত্র। কথাটা এই যে, অর্জুনের পক্ষে কর্মযোগ প্রয়োজন। সেইজন্য তাঁর কাছে যদি তিনি বলতেন যে, কর্মযোগটা কিছুই নয়, জ্ঞানযোগটাই আসল, তাহলে তাঁর কর্ম করার উৎসাহ চলে যেত, যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা থাকতই না। একজন ভক্তির অধিকারীকে যদি বলা হয় যে, কর্মই হচ্ছে ভাল ভক্তির চেয়ে, তাহলে তার ভক্তির হানি হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, কারও ভাবে আঘাত দেওয়া উচিত নয়। অর্জুনের যে-প্রকৃতি, যে-ভাব, যে-অধিকার, সেটা কর্মযোগের অনুকূল ব'লেই শ্রীভগবান তাঁর কাছে কর্মযোগের প্রশংসা করলেন। তারপরেই আবার বলছেন: 'যাঁর দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নেই, সে-ব্যক্তিকে নিত্যসন্ন্যাসী ব'লেই জানবে ; অর্থাৎ, কর্মানুষ্ঠানকালেও তিনি সন্ন্যাসীই ; কারণ হে মহাবাহো, যে-ব্যক্তি রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বরহিত তিনি অনায়াসেই সংসারবন্ধন হ'তে মুক্ত হন।' (৫।৩)

এইভাবে প্রথমে কর্মযোগের স্তুতি ক'রে পরে কর্মযোগের মাহাত্ম্যের কথা শ্রীভগবান অর্জুনকে বললেন, যাতে অর্জুন কর্মযোগী হ'তে উৎসাহী হন।

তবে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে মানুষ পার্থক্য করে কেন ? এই শঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন : 'যারা অনভিজ্ঞ, তারা সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ ব'লে থাকে ; কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন না ;

এই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে-কোন একটিরও যথাবিধি অনুষ্ঠান করলে উভয়েরই ফল লাভ করতে পারা যায়।' (৫।৪)

যারা বালসুলভ-বুদ্ধিসম্পন্ন অবিবেকী, তারা সাংখ্য আর যোগকে পৃথক্ ব'লে থাকে। 'সাংখ্য' মানে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তার অঙ্গ হিসাবে কর্মসন্ন্যাসকেও এখানে বুঝে নিতে হবে, কারণ অর্জুনের প্রশ্নটা ছিল—কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ; আর প্রশ্নের অনুরূপই উত্তর হয়ে থাকে। 'যোগ' মানে কর্মযোগ। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌রা এ দুটিকে পৃথক্ বলেন না। কারণ শ্রীভগবান বলছেন, একটা উপায় অবলম্বন কর; হয় জ্ঞান, যদি জ্ঞানের অধিকারী হও; অথবা কর্ম, যদি নিষ্কামভাবে করতে পার। তাহলে যে-কোন একটি উপায় অবলম্বন করলে দুটোরই ফল পাবে। কি ক'রে? যদি তুমি জ্ঞান লাভ কর, তাহলে তোমার কর্ম নিষ্কাম কর্ম হয়ে যাবে। আর কর্মযোগে যদি তুমি সিদ্ধ হয়ে যাও, তোমার আপনিআপনি কর্মত্যাগ হয়ে যাবে—তখন জ্ঞানের উদয় হবে। কাজেই একটাতে প্রতিষ্ঠিত হ'লেই দুটোরই ফল লাভ করা যায়।

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের যে-কোন একটি নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন করলে কিরূপে উভয়েরই ফল-লাভ হয়, তার উত্তরে শ্রীভগবান বলছেন: 'জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সাংখ্য ও যোগ এই দুটি উপায়কে যিনি এক ব'লে দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।' (৫।৫)

এখানে আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'সাংখ্যৈঃ'-এর অর্থ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের দ্বারা; আর 'যোগৈঃ'-এর অর্থ কর্মযোগীদের দ্বারা। 'যৎ সাংখ্যৈর্জ্ঞান-নিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তৎ যোগৈরপি…গম্যতে'—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের দ্বারা যে 'স্থানং মোক্ষাখ্যং' অর্থাৎ মুক্তিপদ লব্ধ হয়, কর্মযোগীদের দ্বারাও তাই লব্ধ হয়। তাই আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'অত একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতি'—অতএব ফলের একত্বহেতু সাংখ্য এবং যোগ এই দুটিকে যিনি এক ব'লে জানেন, তিনিই সম্যক্‌দর্শী। যদিও এ দুটি এক নয়, একটা কর্মপরিত্যাগ করতে বলছে, অন্যটা কর্ম করতে বলছে; কিন্তু তবু এক বলা হচ্ছে 'ফলৈকত্বাৎ'—এক রকম ফল পাওয়া যাচ্ছে ব'লে।

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা

গত ২১শে কার্তিক, শুক্রবার (৭ই নভেম্বর, ১৯৮০) রাত্রে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা যথারীতি ভজনকীর্তনসহ সমারোহে সুসম্পন্ন হয়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে গত ১৭ই নভেম্বর ১৯৮০, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার দিন পূর্বাহ্নে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নবনির্মিত মর্মরবিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। পরে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্রধারক ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী হিতানন্দ এবং পূজারী ছিলেন বেলুড় মঠের স্বামী অনুরাগানন্দ।

শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ, স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী গহনানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ডক্টর রমা চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু ভক্ত নরনারী এই অনুষ্ঠানে

যোগদান করেন। এই দিন শতাধিক সাধু এবং পরদিন প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ১৭ই পূর্বাহ্নে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও ডক্টর রমা চৌধুরী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু বলেন। আমাদের প্রতিবেদক শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক তাঁহাদের কথাগুলি টেপরেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত হয়। নিম্নে সেই কথাগুলি পরিবেশিত হইল:

'আমি আজকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে খুব খুশি হয়েছি। খুব আনন্দ পেলুম। সবাই এখানে এসে আনন্দ পাবেন, এরপর ঠাকুরের মর্মরমূর্তি দেখে খুব inspired হয়ে যাবেন—এই আমি আশা করি।'

—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ।

'আজ ১৭ই নভেম্বর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মরবিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। পূজ্যপাদ ভরতমহারাজও উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসীও উপস্থিত ছিলেন। কাজেই আজ একটি বিশেষ পুণ্যদিন। জগদ্ধাত্রীপূজোর দিনই পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এই বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই আজকের দিনটি সবিশেষ স্মরণীয় এবং আজকের অনুষ্ঠানটি সার্থক।'

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

'আজকের এই পরম পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমি নিজেকে পরম কৃতার্থ ব'লে মনে করছি। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এবং সংশ্লিষ্ট জনেরা অতি সুষ্ঠুভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাঁদের সকলকে আমি আমার প্রণতি নিবেদন করছি।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পরম পবিত্র বিগ্রহ স্থাপিত হওয়ায় আমাদের এই অঞ্চলের লোকেদের কত যে কল্যাণ সাধিত হ'ল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কারণ, ইচ্ছা থাকলেও সবসময় আমরা বেলুড় মঠে যেতে পারি না। শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ভাবধারা মূর্ত ক'রে তুলেছেন তাঁর নিজের আচার-আচরণে। তার উপরে তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব মূর্তিটি স্থাপনা করলেন। তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করছি এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য স্বামীজীগণের নিকট প্রার্থনা করছি, যাতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের শুভ আদর্শে আমরা নিজেদের উদ্‌বুদ্ধ করতে পারি এবং আমাদের সামান্য শক্তি দিয়েও সেই মহৎ আদর্শের আলোক যেন চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করতে পারি। তাতেই আমাদের জীবন ধন্যাতিধন্য হবে। সকলকে প্রণাম।'

—ডক্টর রমা চৌধুরী

আলোচনা-চক্র

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ গত ২৬শে এপ্রিল ১৯৮০, এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচারে মিশন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়। আলোচনার বিষয় ছিল: উন্নয়নশীল দেশে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গুরুত্ব।

সকাল দশটায় প্রারম্ভিক অধিবেশন শুরু হয়। মঙ্গলাচরণ করেন নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ। আলোচনার ভূমিকা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘ-সম্পাদিকা অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্ঘ-সভানেত্রী ডঃ রমা চৌধুরী। মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন উদ্বোধনী ভাষণ দেন। পরিশেষে প্রারম্ভিক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ ভাষণ দেন।

দ্বিপ্রহরের বিরতির পর মূল অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমা চৌধুরী। 'উন্নয়নশীল দেশে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্য-বোধের গুরুত্ব' বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা। তাঁহার বক্তব্য বিশ্লেষণ করেন ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী এবং ডঃ সুধীর নন্দী। ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় 'বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা : উন্নয়নের পটভূমিকায়' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। অধ্যক্ষ সমরেশচন্দ্র মৈত্রের আলোচ্য বিষয় ছিল : 'বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে আধুনিক উন্নয়নের ভূমিকা'। এঁর বক্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। এরপর 'উন্নয়নের সমস্যা ও সাংস্কৃতিক সঙ্কট' সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। এ সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ সেন। ডঃ রমা চৌধুরী সভানেত্রী হিসাবে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিয়া এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিরতির পর শুরু হয় বৈকালিক অধিবেশন। প্রথমে 'বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, উন্নয়ন ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্পর্কে বলেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেন-শর্মা। তাঁহার ভাষণের উপর মন্তব্য রাখেন ডঃ ধ্রুব মার্জিত ও শ্রীসলিলকুমার মুখোপাধ্যায়। 'উন্নয়নে নারীজাগরণের ভূমিকা' সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। সে প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন ডঃ চিত্রা দেব ও শ্রীমতী ধৃতি নন্দী। 'উন্নয়ন সম্পর্কিত বিবেকানন্দের চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা' সম্পর্কে বলেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন ও শ্রীমতী রাইকমল মজুমদার। 'উন্নয়ন সম্পর্কিত বিবেকানন্দের চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে রামকৃষ্ণ মিশনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থাসমূহের ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করেন ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপরি-উক্ত ভাষণগুলির সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। এরপর সভাপতির ভাষণ দেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ সবশেষে অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পরলোকে

গভীর দুঃখের বিষয়, বোম্বাই-এর **নটবরলাল মানেকলাল চিনাই** গত ১০ই নভেম্বর ১৯৮০, সকাল ১০-৩০ মিনিটে ৭৬ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে রক্ত-সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হওয়ায় তাঁহার দেহান্ত হয় ছয় মাস পূর্বেও তাঁহার একবার হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ হইয়াছিল এবং প্রায় ৪।৫ মাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে ছিলেন। পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হইলে ৫ সপ্তাহ বৃন্দাবনবাস করিবার অভিলাষে গত ২৪শে অক্টোবর তিনি তাঁহার ভগিনীসহ বৃন্দাবন সেবাশ্রমে আসেন। ২রা নভেম্বর তাঁহার দুই কন্যা এবং এক জামাতাও বৃন্দাবনে তাঁহার নিকট আসেন। বোম্বাই-এর পরিচিত বন্ধুরাও আসেন। বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তিনি ভালই ছিলেন। কেবল দেহান্তের মাত্র দুইদিন পূর্বে পেটে বায়ু হওয়ায় অল্পক্ষণের জন্য অস্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন। শেষ দিন যথারীতি সকালে উঠিয়া চা ও নয়টায় কমলালেবুর রস গ্রহণ করেন এবং সকলের সহিত স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ১০-১০ মিনিটে অস্বস্তিবোধ করেন এবং সেবাশ্রমের ডাক্তারদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার দেহান্ত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার উল্লিখিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গ এবং বলা বাহুল্য, সেবাশ্রমের সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিনাইজী বিগত ৩৫ বৎসরের অধিককাল বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্বে সেবাশ্রম যখন

যমুনাতীরে অবস্থিত ছিল, তখনও তিনি উহার উন্নতিকল্পে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। পরে মথুরা রোডের উপর নূতন হাসপাতাল নির্মাণ করিতে এবং উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি যে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এবং তাহার সাফল্য বিস্ময়কর। নূতন হাসপাতাল ভবনগুলির নির্মাণের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং হাসপাতালের পরিচালনার জন্য ১৫ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গঠন করেন। ইহা ব্যতীত, আরও নয়টি তহবিলের জন্য ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। ফলে হাসপাতালের জন্য তাঁহার মোট সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। ইহার মধ্যে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিগত দানও আছে। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে স্থপতি ডক্টর আর. এম. বাদেলওয়ালা এবং বাস্তুকার শেঠ শাপুরজী পালনজী মিস্ত্রির নিঃস্বার্থ সেবার মূল্যাঙ্ক নাই। ইঁহারা চিনাইজীর পরম অনুরাগী বন্ধু ছিলেন এবং চিনাইজীর অনুরোধেই বিনা পারিশ্রমিকে হাসপাতাল ভবনগুলি নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

সেবাশ্রম নূতন জমিতে উঠিয়া আসিবার পর উহার সংলগ্ন পৃথক্ জমিতে একটি মঠ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ইহা বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র। এই মঠ কেন্দ্রের জন্যও তিনি বিভিন্ন খাতে মোট ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের জন্যই সাড়ে চার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।

বৃন্দাবন সেবাশ্রম ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইলেও বহু বৎসর উহার কোন পরিচালিকা সমিতি ছিল না। নূতন হাসপাতাল নির্মিত হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে পরিচালিকা সমিতি গঠিত হয় এবং চিনাইজী উহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তদবধি আমৃত্যু তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেবাশ্রমের জন্য প্রতি বৎসর তাঁহার নিজস্ব দান প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যতীত প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার মুখ্য কেন্দ্র হইলেও বোম্বাই ও আমেদাবাদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের—হাসপাতাল ও বিদ্যালয়েরও তিনি সেবা করিয়া গিয়াছেন। আমেদাবাদ তাঁহার জন্মস্থান এবং সেখানেই তাঁহার ছাত্রাবস্থা অতিবাহিত হয়। তবে তিনি বোম্বাই-এরই বাসিন্দা ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ন্যাশন্যাল রেয়ন করপোরেশনের সেলস ডিরেক্টর এবং কিছুকাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরও ছিলেন।

নটবরভাই সুদর্শন, ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান ও অমায়িক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার চারিত্রগুণে আকৃষ্ট হইয়া পরোপচিকীর্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসরই তিনি সেখানে আসিতেন। নানাভাবে বৃন্দাবনের সেবা করিয়া তিনি নিজ নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। নিঃসন্দেহে তিনি অন্বর্থনামা পুরুষ—শ্রীবৃন্দাবনে রজঃপ্রাপ্তিতেই উহার শেষ পরিচয়।

ভাইরাস-জনিত অসুখ ও ক্যানসার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা—ইণ্টারফেরন

চিকিৎসাজগতের আধুনিক বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও ভাইরাস (virus বা জীবপরমাণু)-জনিত অসুখ ও ক্যানসার—এই দুটি ক্রমবর্ধমান অসুখের কোন সন্তোষজনক চিকিৎসা না থাকায়, বিশেষতঃ অনেকরকম ক্যানসার মৃত্যুর অগ্রদূত ব'লে পরিগণিত হওয়ায়, সমগ্র মানবসমাজের কাছে এরা যেন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই

পরিপ্রেক্ষিতে 'ইণ্টারফেরন' (Interferon) নামক পদার্থ সম্বন্ধে গবেষণার সাম্প্রতিক ফলাফল সকলকে বিস্মিত ও আশান্বিত করে তুলেছে।

শরীর অসংখ্য জীবকোষ (cell) দিয়ে তৈরী। ভাইরাস জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেই জীবকোষকে বাধ্য করে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির কাজ করতে। আক্রান্ত জীবকোষকে বিনষ্ট ক'রে নবজাত ভাইরাসগুলি অন্যান্য জীবকোষকে আক্রমণ ক'রে ব্যাধির সৃষ্টি করে। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে এলিক আইজাকস (Alick Isaacs) এবং জিন লিণ্ডেনম্যান (Jean Lindenmann) ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস নিয়ে গবেষণাকালে আবিষ্কার করলেন যে, ভাইরাস আক্রান্ত জীবকোষ ইণ্টারফেরন নামক এক ধরনের প্রোটিন তৈরী করে, যা আক্রান্ত জীবকোষকে রক্ষা করতে পারে না বটে, তবে জীবকোষ থেকে বের হয়ে গিয়ে অন্য জীবকোষদের সতর্ক ক'রে দেয়, যাতে তারা সেই ভাইরাস বা অন্য অসুখের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হ'লেও তাকে বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। গোড়ার দিকে ইণ্টারফেরন অনেক আশার সৃষ্টি করলেও চিকিৎসকদের কয়েকটি বাধার সম্মুখীন হ'তে হ'ল, যেমন (ক) এক শ্রেণীর জন্তুর জীবকোষে তৈরী ইণ্টারফেরন, কেবল সেই শ্রেণীর জন্তুর দেহেই কার্যকর হবে, অন্য শ্রেণীর জন্তুর দেহে হবে না। অর্থাৎ মানুষের জীবকোষে তৈরী ইণ্টারফেরন মানুষেরই জন্য ব্যবহার করতে হবে। স্মরণযোগ্য যে, ঘোড়ার দেহে তৈরী ডিফথিরিয়ার সিরাম, বা গরু এবং শূকরের দেহ থেকে নেওয়া ইনসুলিন মানুষের পক্ষেও কার্যকর। (খ) মানবদেহের বহুরকমের জীবকোষ ইণ্টারফেরন তৈরী করে সত্য, কিন্তু এর পরিমাণ এত অল্প যে, প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও ইণ্টারফেরন নাকের মধ্যে বাষ্পাকারে ঢুকিয়ে দিয়ে (spray ক'রে) ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিহত করা গেছে, চোখে ফোঁটা ফেলে একরকমের চোখের অসুখ আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে জলবসন্ত এবং হারপিস জষ্টার (Herpes Zoster) মারাত্মক আকার ধারণ করে, তা থেকে রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে।

ইত্যবসরে গত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্যানসার রোগের ওপর ইণ্টারফেরনের ফলাফল নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। গবেষণার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ। কয়েকটি জন্তুজানোয়ারের ক্যানসার (যার অনেকগুলিই ভাইরাস-জনিত ব'লে প্রমাণিত), ইণ্টারফেরন ইনজেকশন দিয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে। মানুষের ক্যানসারে (যা ভাইরাস-জনিত ব'লে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত নয়) এর ফলাফলও খুব আশাপ্রদ। প্রয়োজনমত পরিমাণে ইণ্টারফেরন পাওয়া যাচ্ছে না ব'লে বর্তমানে চূড়ান্ত মতামত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি প্রদত্ত প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যে কেনা ইণ্টারফেরনের সাহায্যে এখন ৭০ জন ক্যানসার রোগী চিকিৎসাধীন, যদিও সরবরাহের অভাবে এদের মধ্যে কেউ পুরোমাত্রায় ইণ্টারফেরন পাবে না। তবে এই পরীক্ষায় বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ওপর ইণ্টারফেরনের কার্যকারিতা অনেকটা জানা যাবে। বর্তমানে এই ওষুধ পাওয়া যায় ফিনিস রেড ক্রস এবং পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি থেকে। সেখানে বিভিন্ন লোক থেকে সংগৃহীত রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিকে (white blood cells) আলাদা ক'রে তাদের সেণ্ডাই (Sendai) নামক অক্ষতিকর একটি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত ক'রে ইণ্টারফেরন তৈরী করা হয়। ১৯৭৯ সালে ৪৫ হাজার লিটার রক্ত থেকে মোট ৪০০ মিলিগ্রাম (০·০১৪ আউন্স) ইণ্টারফেরন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এই হারে এক পাউণ্ড ইণ্টারফেরনের দাম পড়ে যাবে ১২

হাজার কোটি টাকা। কিন্তু ইণ্টারফেরনের ভবিষ্যৎ এত উজ্জ্বল যে, বিভিন্ন ওষুধের কারখানা এর তৈরীর জন্য ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন, কারণ কারখানার মালিকরা জানেন যে, ইণ্টারফেরন হবে একটি সোনার খনি। সকলেরই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, কি ক'রে সহজ উপায়ে বেশী পরিমাণে এটিকে তৈরী করা যায়। সেক্ষেত্রে ইণ্টারফেরনের দামও কমে যাবে। বর্তমানে এটি দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য। ইউরোপ আমেরিকায় এমন সপ্তাহ যায় না, যে সপ্তাহে ইণ্টারফেরন সম্বন্ধে নূতন কিছু আবিষ্কার নিয়ে খবরের কাগজে বা চিকিৎসা-পত্রিকায় কোন খবর বের হয় না।

অন্যধারে গবেষণা চলছে যাতে, অক্ষতিকর ভাইরাস বা অন্য কিছু রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন জোড়া-আর এন এ বা double stranded RNA) শরীরে ইনজেকশন দিয়ে শরীরের মধ্যেই ইণ্টারফেরন তৈরী বাড়ান যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় আশাপ্রদ গবেষণা চলছে—জীবকোষ থেকে বের ক'রে নেওয়া ইণ্টারফেরন তৈরীর জিন (gene) ই. কোলাই (E. Coli) নামক ব্যাকটিরিয়া (বা জীবাণু)-র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই ব্যাকটিরিয়াকে ইণ্টারফেরন তৈরী করতে বাধ্য করা। তাহলে সামান্য খরচে প্রচুরমাত্রায় ইণ্টারফেরন পাওয়া যাবে, কারণ ল্যাবরেটরিতে ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়া চাষ করা খুব সহজ। এই কাজে বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌছবার কাছাকাছি এসে গেছেন।

তা সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে, ক্যানসার চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে সকলের কাছে ইণ্টারফেরন পৌছতে বা ক্যানসার চিকিৎসা হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে।
(Time, March 31, 1980, pp. 38-44)

কার্যবিবরণী

হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭৮-৭৯ সনের প্রকাশিত কার্যবিবরণীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধর্ম ও সংস্কৃতি : আশ্রমে প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা, আরাত্রিক এবং স্তোত্র ও কথামৃত পাঠ হয়। প্রতি একাদশীতিথিতে রামনাম এবং সপ্তাহে দুইদিন সমবেতকণ্ঠে ভজনগান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ত্যাগী সন্তানদেরও জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। বুদ্ধ, চৈতন্য, শংকরাচার্য এবং যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও বাণীও আলোচিত হয়। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, সরস্বতীপূজা, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা প্রভৃতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৭৮ সালের ২২শে ও ২৩শে এপ্রিল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা : নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার : গ্রন্থাগারে পাঁচ হাজারের অধিক বিবিধ বিষয়ক পুস্তক আছে। মূলতঃ সভ্য, কর্মী এবং শুভানুধ্যায়ীদের জন্য এই গ্রন্থাগার। পাঠাগারে কয়েকটি দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। শিশুদের স্বতন্ত্র বিভাগে শিশুসাহিত্যও যথেষ্ট আছে।

অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় : অনুন্নত শ্রেণীর শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগ আশ্রমের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী-ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক, খাতা-পেন্সিল-কাগজ ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং আশ্রমের নিয়মিত প্রার্থনা, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করিতে উৎসাহিত করা হয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নেতাজী জন্মোৎসব, সরস্বতীপূজা, প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবস পালন করে।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন (উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভাগ) : পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত ছাত্রদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, চরিত্রগঠন, ভারতীয় ঐতিহ্য-ধর্ম-সংস্কৃতি এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের

দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। আলোচ্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত।

সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপ — রামকৃষ্ণ অনাথভাণ্ডার ও দাতব্য চিকিৎসালয়: আলোচ্য বর্ষে ৯১ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১৬টি ধুতি, ৩৭টি শাড়ি, ১৪টি জামা ও হ্যাফ-প্যান্ট এবং ২৪টি কম্বল দেওয়া হয়। উপরন্তু বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বন্যাত্রাণ ফাণ্ডে ১০০টি শাড়ি জমা দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে ২০টি অনাথ পরিবারকে মাসিক অর্থসাহায্য এবং দরিদ্র ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক ও স্কুলের বেতন দেওয়া হয়।

দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় হইতে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। দৈনিক রোগীর গড় সংখ্যা ৫০ এবং আলোচ্য বর্ষে মোট চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫,২০০।

শরীরচর্চা: ব্যায়ামের বহুবিধ সরঞ্জামযুক্ত একটি প্রশস্ত ব্যায়ামাগার আছে। এখানে একত্রে প্রায় ৫০ জন যুবক শরীরচর্চা করিতে পারে।

শিশু-উদ্যান: ব্যায়ামাগার-সংলগ্ন সুসজ্জিত শিশু-উদ্যানে দৈনিক গড়ে ১০০টি শিশু খেলাধূলা করে।

পুস্তকপ্রকাশন ও স্মারক-বক্তৃতা: স্বামী ওঙ্কারানন্দজীর পুণ্যস্মৃতিতে তৎকৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং সিদ্ধেশ্বর নিয়োগীর দান হইতে 'স্বামী ওঙ্কারানন্দ-বক্তৃতা ফাণ্ড' গঠিত হইয়াছে। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ এবং বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠেরও অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী ১৯৭৮-এর স্বামী ওঙ্কারানন্দ-স্মারক বক্তৃতা হিসাবে শ্রীশ্রীমায়ের উপর একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন।

হীরক-জয়ন্তী প্রকাশন: আশ্রমের হীরক-জয়ন্তী (১৯১৬-১৯৭৬) উৎসব উপলক্ষে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগের আলোকে' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার ফাণ্ড: 'আমাদের নিবেদিতা' পুস্তকের স্বত্ব হইতে প্রাপ্ত রয়্যালটির টাকা দিয়া 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার ফাণ্ড' গঠিত হইয়াছে। 'নন্দলাল বসুর জীবন ও শিল্পচেতনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব' সম্বন্ধে ১৯৭৮ সালের 'নিবেদিতা-বক্তৃতা' দেন প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীনিত্যানন্দ ভকতকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিল্পে তাঁহার প্রশংসনীয় কাজের জন্য 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ-স্মরণসভা: এই আশ্রমের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দজীর অকাল-মৃত্যুতে আশ্রম কর্তৃক গত ৮. ৪. ১৯৭৮ তারিখে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতি স্বামী সত্য-ঘনানন্দ, স্বামী অমলানন্দ এবং অপরাপর কয়েকজন বক্তা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

নির্মাণকার্য: আশ্রমের ফটক হইতে ভিতরে মন্দির পর্যন্ত নবনির্মিত বাঁধানো সড়কের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন শ্রীনবকুমার মুখোপাধ্যায়।

* * *

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া-র বাৎসরিক পত্রিকা—চৈত্র, ১৩৮৬-তে ছাত্রদের ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী ও খেলাধুলা সম্বন্ধীয় প্রতিটি লেখাই চিত্তাকর্ষক। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের নবজাগরণ', 'বিদ্যুতের উৎস সন্ধানে', 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। 'বিবর্তিত বাস্তরীতি ও বিপন্ন মানুষ' প্রবন্ধটির অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

বেদান্তের আলোকে খৃষ্টের শৈলোপদেশ—স্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, মূল্য ৪'০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, মূল্য ১'৫০

স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী—পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৪'৫০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা—পৃঃ ৮২, মূল্য ৩'৫০

স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩'৩০

পাঞ্চজন্য—স্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক সঙ্গীত। পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬'০০

শিব ও বুদ্ধ—ভগিনী নিবেদিতা। পৃঃ ৪৮, মূল্য ২'৫০

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন—পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭'০০

প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা—স্বামী পরমানন্দ। পৃঃ ৩৯৪, মূল্য ২৪'০০

সংস্কৃত

কেনোপনিষদ্—ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য-সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মূল্য ৮'০০

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ-সম্পাদিত

১ম ভাগ পৃঃ ৪৪৪, মূল্য ১৫'০০

২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১'০০

৩য় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১৫'০০

শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৮'৪৫

গীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনূদিত। পৃঃ ৫০০, মূল্য ৯'২৫

বেদান্তদর্শন—স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। মূল্য: ১ম অধ্যায়, ৩য় খণ্ড ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০; ২য় অধ্যায় ১৩'০০; ৩য় অধ্যায় ১৩'০০; ৪র্থ অধ্যায় ৯'০০

গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা—স্বামী রঘুবরানন্দ-সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২'০০

অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী

স্বামী প্রেমানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ লিখিত ভূমিকাসহ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'০০

সাধন সঙ্গীত—পৃঃ ২২০, মূল্য ২০'০০

জননী সারদাদেবী—স্বামী নির্বেদানন্দ। (অনুবাদক: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)। পৃঃ ১১৬, মূল্য ২'৮০

শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ৯০, মূল্য ২'০০

পরমহংসদেব—স্বামী প্রেমেশানন্দ। পৃঃ ২৪, মূল্য ১'০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ—সুরেশ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৭'০০

সঙ্গীত সংগ্রহ—পৃঃ ৩২০, মূল্য ১৩'০০

গল্পে বেদান্ত—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০

বীরবাণী—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, মূল্য ৪'০০

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩'৫০

Udbodhan—Phone : 55-2447 NOVEMBER 1980 Regd. No. WB/NC-19

• গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
৭ হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কালকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।
সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ

পৌষ ১৩৮৭
৮২তম বর্ষ
১২শ সংখ্যা



উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত

উদ্বোধনের নিয়মাবলী

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ। বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য (মাঘ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বার্ষিক গ্রাহক নয়; ৮০তম বর্ষ হইতে **বার্ষিক মূল্য সডাক ১২৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭৲ টাকা। ভারতের বাহিরে হইলে ৩৩৲ টাকা, এয়ার মেল-এ ১০১৲ টাকা।** প্রতি সংখ্যা ১.২০ টাকা। নমুনার জন্য ১.২০ টাকার ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হইবে না। ৮৩তম বর্ষ হইতে চাঁদার হার পরিবর্তিত হইবে।

রচনাঃ—ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। **পত্রোত্তর বা রচনা ফেরত পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠানো আবশ্যক।** প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন।

সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, **পত্রাদি লিখিবার সময় তাঁহারা** যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাদের **গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করেন।** ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌঁছানো দরকার। পরিবর্তিত ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্যই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঁদা মনি-অর্ডারযোগে পাঠাইলে **কুপনে পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিষ্কার করিয়া লেখা আবশ্যক।** অফিসে টাকা জমা দিবার সময়: সকাল ৭॥টা হইতে ১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে।

কার্যাধ্যক্ষ—উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

উদ্বোধন, ৮৩তম বর্ষ, ১৩৮৭-৮৮

নিবেদন

> গত কয়েক বৎসর যাবৎ পত্রিকা-প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে পরিস্থিতি এমনিই দাঁড়াইয়াছে যে, পত্রিকার চাঁদার হার বর্ধিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এজন্য আগামী ৮৩তম বর্ষ হইতে 'উদ্বোধনে'র বার্ষিক চাঁদা চৌদ্দ টাকা এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা নয় টাকা করা হইল। আশা করি সহৃদয় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ পরিস্থিতি বুঝিয়া তাঁহাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখিবেন।

এই সংখ্যায় (পৌষ ১৩৮৭) উদ্বোধন পত্রিকার ৮২তম বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ মাসে পত্রিকা ৮৩তম বর্ষে পদার্পণ করিবে।

আমরা পূর্বে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ করিয়া অবিলম্বে আমাদের জানান তাঁহারা কিভাবে—১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা পাঠাইয়া সাধারণভাবে যেমন পাইতেছেন সেভাবে, অথবা ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা পাইতে চান।

অধিকাংশ গ্রাহকই ইতিমধ্যে টাকা পাঠাইয়াছেন বা জানাইয়া দিয়াছেন, কিভাবে তাঁহারা পত্রিকা লইবেন। অনিবার্য কারণে গ্রাহক থাকা সম্ভব হইবে না, ইহাও কেহ কেহ জানাইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই এখনো কিছুই জানান নাই, বা টাকা পাঠান নাই; তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যেন অবিলম্বে কার্তিক সংখ্যায় সংলগ্ন কার্ডখানিতে ২০ পয়সার ডাকটিকিট লাগাইয়া জানাইয়া দেন:—

১। তাঁহারা কি ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইতে চান? [ভি. পি. পি.-তে পত্রিকা লইলে অনর্থক বেশী খরচ লাগিবে, ১৫·০০ টাকার জায়গায় ১৭·৮০ টাকা খরচ পড়িবে।

২। অথবা, তাঁহারা কি শীঘ্রই টাকা পাঠাইতেছেন?

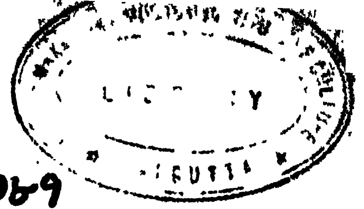
৩। অথবা, অনিবার্য কারণে তাঁহাদের পক্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব নয়?

দয়া করিয়া পত্রে জানাইতে বিলম্ব করিবেন না। তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ খবর না পাইলে তাঁহাদের নামে মাঘ মাসের পত্রিকা পাঠানো হইবে। ভি. পি. পি. ফেরত আসিলে আমাদের অযথা লোকসান হয়।

আশা করি সহৃদয় গ্রাহকগণ আমাদের অসুবিধা বুঝিবেন এবং যাঁহারা এখনো কিছুই জানান নাই, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদের ইচ্ছা পত্রে জানাইয়া দিবেন। সুদীর্ঘ ৮২ বৎসর ধরিয়া সকলের সহায়তা আমরা পাইয়া আসিয়াছি। আশা করি উহা অব্যাহত থাকিবে।

কার্যাধ্যক্ষ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০০৩

১ পৌষ, ১৩৮৭



উদ্বোধন, পৌষ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করবে। যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৩

সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য—২০৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা।

শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ: অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা। ...মানুষের প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সী নারী এযুগে বিরল।

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪৲

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা: বাঙালী যে আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর মেয়ে শ্রীগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদাহরণ॥

ষষ্ঠ মুদ্রণ দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৮৩৬

মূল্য—১৪৲

সাধনা

দেশ: সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক...সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম সংস্করণ—১৪৲

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

উদ্বোধন

৮২তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা — পৌষ, ১৩৮৭

দিব্য বাণী

ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবনিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা—সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধস্বভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমন কি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শস্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি, সুতরাং উহার বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমন কি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতি অমার্জিত গ্রাম্যভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গড়িয়া তুলিবার যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতাচরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে। আর প্রত্যহই আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৫।১৪৯]

কথাপ্রসঙ্গে

ক্লেশহারিণী

সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন যে-সকল সংবাদ পাই, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের অধিকাংশেই ক্লেশের কথা—সুখের সংবাদ, আনন্দের সংবাদ এতই অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সংবাদ-পত্রপত্রিকার দর্পণে আমাদের জীবনের কতটুকু সংবাদ প্রতিফলিত হয়! রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষের কথা, জাতীয় রাজনীতিতে দ্বন্দ্বের কথা, সমাজ-জীবনের কিছু অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কথা আমাদের পীড়া দেয়, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের কিছু কিছু বিশেষ ক্লেশকর দুঃসংবাদ ছাড়া কার্যতঃ আমরা আর কিছুই পাই না এবং পাওয়া সম্ভবও নহে। তথাপি আমরা সকলেই জানি প্রত্যেকটি মানুষ জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে ক্লেশের সম্মুখীন। আর এই ক্লেশ শুধু যে প্রবৃত্তিমার্গেই আছে, তাহাও নহে; নিবৃত্তিমার্গেও আছে। তাহা না হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেন না—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।' (১২।৫)। শ্রীভগবানের কথার তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা ভক্তিমার্গী—ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদেরও ক্লেশ আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের ক্লেশ অধিকতর।

ইহা সুবিদিত যে, ভক্তিপথই ভগবানলাভের সহজতম উপায়। তথাপি শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, ভক্তিপথেও ক্লেশ আছে! কিন্তু কেন? ইহার কারণ এই যে, অনাদিকাল হইতে আমরা বিষয়াসক্ত। বিষয়াসক্ত মনকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া শ্রীভগবানে যুক্ত করিতে আমাদের ক্লেশ হয়—বিষয়কে, ব্যক্তিকে আমরা খুবই ভালবাসি কিনা! 'ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা / প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে'—গান হিসাবে ভাল, গাহিতেও ভাল, শুনিতেও ভাল। কিন্তু 'সকল ভালবাসা' প্রভুকে দিতে যে বড় ক্লেশ!!

সুতরাং ক্লেশ যেমন বিষয়ী মানুষের আছে, সর্ববিধ সাধকেরও আছে। শুধু তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরই ক্লেশ নাই—পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্যমুনির ইহাই অভিমত। তিনি লিখিয়াছেন, প্রারব্ধের ভোগ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, উভয়েরই সমান, কিন্তু 'ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্যতঃ'—ধৈর্যহেতু জ্ঞানীর ক্লেশ নাই, অজ্ঞানী অধৈর্যহেতু ক্লিষ্ট হয়। বিষয়টি অবশ্য বিতর্কমূলক। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বথা নির্ভয় হইলেও, দেহে মন আসিলে তিনি যে ক্লেশ ভোগ করেন না, তাহা মনে হয় না। কিন্তু তিনি ধীর-স্থিরভাবে ক্লেশটি সহ্য করেন। মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইতে পারিলে তাঁহার যে কোনই ক্লেশ থাকে না, ইহা অবশ্য বুঝিতে অসুবিধা হয় না। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।' (ছান্দোগ্য উপ ৮।১২।১)—যাঁহার শরীর আছে, তাঁহার প্রিয়-অপ্রিয়ের বিরতি নাই, শরীর না থাকিলে প্রিয়-অপ্রিয়ও নাই। ইহার অবশ্য নানা ব্যাখ্যা আছে, যাহার ফলে জীবন্মুক্তিবাদ গৃহীত বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং ক্লেশের সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু ক্লেশের তত্ত্ব আমরা জানি না। সেই তত্ত্ব আমরা পাই পাতঞ্জল যোগ-দর্শনে। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের

সাধনপাদের তৃতীয় সূত্রে সর্ববিধ ক্লেশকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা, (৩) রাগ, (৪) দ্বেষ এবং (৫) অভিনিবেশ। ('অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ')। ইহার পরবর্তী সূত্রে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, অবিদ্যাই মূল ক্লেশ, উহা হইতেই অস্মিতা প্রভৃতি অন্য চারিটি ক্লেশের উদ্ভব হয় এবং এই চারিটি ক্লেশ অবিদ্যারূপ মূল ক্লেশে কখনও প্রলীন থাকে, কখনও সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, কখনও অভিভূত, কখনও বা প্রকট হয়। পরবর্তী পাঁচটি সূত্রে মহর্ষি অবিদ্যা প্রভৃতি পাঁচটি ক্লেশের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য, যাহা অশুচি তাহাকে শুচি, যাহা দুঃখ তাহাকে সুখ এবং যাহা অনাত্মা তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে করা—ইহারই নাম অবিদ্যা। আত্মা চেতন, অন্তঃকরণ জড়; তথাপি লোহিত-স্ফটিকের ন্যায় উহাদের একাত্মতা বা তাদাত্ম্য-বিভ্রমই অস্মিতা। সুখের অনুবৃত্তির নাম রাগ। সুখাভিজ্ঞ মানুষ বারংবার সুখভোগের ইচ্ছা করে এবং সুখসাধনদ্রব্যে আসক্ত হয়—এই আসক্তিই রাগ। দুঃখাভিজ্ঞ মানুষের দুঃখে অনভিলাষ এবং দুঃখের কারণে বিতৃষ্ণা থাকে—ইহাই দ্বেষ। যাহা হইতে মানুষ পূর্বে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার প্রতি দ্বেষ থাকে, ফলে প্রতিঘাত-চেষ্টাও থাকে। ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি এই দ্বেষেরই পরিণামমাত্র। প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যুভয় আছে। মূর্খেরও যেমন আছে, পরোক্ষজ্ঞানীরও তেমনই আছে। এই মরণত্রাসই অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশ। পূর্বপূর্বজন্মে অনুভূত মরণক্লেশ হইতেই ইহজন্মে এই মৃত্যুভীতির উদ্ভব হয়।

এই পঞ্চবিধ ক্লেশ দূর করিবার উপায়ও মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে 'ক্রিয়া-যোগে'র অভ্যাস করিতে হয়। ক্রিয়াযোগ হইল তপস্যা, স্বাধ্যায় (মন্ত্রজপ, মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন) এবং ঈশ্বরপ্রণিধান (ঈশ্বরে ভক্তি এবং সমস্ত কর্মফল সমর্পণ)। ('তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি ক্রিয়াযোগঃ'—২।১)। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে এই ক্রিয়াযোগের দ্বারা পঞ্চবিধ ক্লেশ সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সূক্ষ্ম হইয়া যায় এবং সূক্ষ্ম হইয়া যাওয়ায় উহারা যোগবিঘ্ন করিতে পারে না। ক্রিয়াযোগের অভ্যাসের ফলে সমাধিও হয়। ('স সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ'—২।২)। কিন্তু সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইলেও অবিদ্যারূপ মূল ক্লেশ থাকিয়াই যায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হইলে অবিদ্যা নিঃশেষে বিনষ্ট হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কোনও যোগীর পক্ষেই সরাসরি লভ্য নহে, সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপূর্বকই উহা লব্ধ হয়।

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্বন্ধে মহর্ষি অনেক কিছু বলিয়াছেন। তাঁহার প্রজ্ঞা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু সমাধি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুধু এইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, যোগী হইয়া সর্ববিধ ক্লেশের পারে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার।

ভারতের ধর্ম-দর্শনের ইতিহাসে মহর্ষি পতঞ্জলির নাম নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে, মননশীল মানুষমাত্রেরই নিকট তিনি চিরসমাদৃত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু মহর্ষির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ধারণা এবং ধর্মজীবনে ঈশ্বরের ভূমিকা ভক্তিযুগের মানুষকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার 'ঈশ্বর-প্রণিধান' এবং গীতা-ভাগবতের ঈশ্বরে ভক্তি ও কর্মফলসমর্পণে অনেক পার্থক্য। এই প্রবন্ধের শুরুতে আমরা ক্লেশের প্রসঙ্গে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকের পূর্বার্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি। পরবর্তী ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন :

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥

তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া, সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া, ঈশ্বরব্যতীত অন্য অবলম্বন-রহিত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করেন, উপাসনা করেন, ঈশ্বরে তদ্গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে ঈশ্বরই এই মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন।

গীতায় এই ধরনের আরও অনেক শ্লোক আছে, যেগুলি ভক্তকে নিশ্চিন্ত করে। আরও সহজ করিয়া শ্রীভগবান দুইবার ঠিক একই কথা বলিয়াছেন—'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু, মামেবৈষ্যসি' (৯।৩৪, ১৮।৬৫)—আমাতে মন রাখো, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, নমস্কার করো, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। ভগবানকে পাইলে কি কাহারও ক্লেশ থাকে? সুতরাং ক্লেশাতীত হইবার ইহাই সহজতম পন্থা।

শ্রীমদ্ভাগবতও প্রণামমন্ত্র বলিয়া দিতেছেন :

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥
(১০।৭৩।১৬)

—যিনি প্রণতজনের ক্লেশনাশক, সেই গোবিন্দ কৃষ্ণ বাসুদেবকে বারংবার নমস্কার, তিনিই পরমাত্মা হরি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি-লীলার অবতারণা সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত ব্যক্ত করিয়া অবশেষে কুন্তীদেবী তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তবে বলিতেছেন :

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন॥
(ভাগবত, ১।৮।৩৫)

—কেহ কেহ বলেন [শ্রীধরস্বামীর মতে এইটি কুন্তীদেবীর নিজেরই সিদ্ধান্ত], এই সংসারে জীব অবিদ্যা-কাম-কর্মের দ্বারা ক্লিষ্ট; সেই ক্লেশ দূর করিবার জন্যই শ্রবণীয় ও স্মরণীয় শ্রীকৃষ্ণলীলার অবতারণা।

সুতরাং ভাগবতকারের মতে অবতারলীলা শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারাই সর্ববিধ ক্লেশ দূর হয়

'অদ্বৈতসিদ্ধি'কার প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন :

ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে
যদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং স্বয়মস্ফুরৎ পরম্।
তদ্ ব্যর্থয়ন্ কঃ পুরতো নরাকৃতিঃ
শ্যামোঽয়মামোদভরঃ প্রকাশতে॥

—পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়ায় যে পরম ব্রহ্মসুখ স্বতঃই স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাকে ব্যর্থ করিয়া নররূপী কে এই পরমানন্দ শ্যাম সম্মুখে প্রকাশ পাইতেছেন !

মধুসূদন তাঁহার 'অদ্বৈতসিদ্ধি'তে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিরাকারবাদের শেষে) এবং গীতার টীকাতেও (পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে) শ্রীকৃষ্ণের সাকার বিগ্রহের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, 'কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।'—কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ত্ব আমি জানি না।

মধুসূদনের সমসাময়িক মহাত্মা তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিতমানসে'র (বালকাণ্ডের প্রারম্ভে) মঙ্গলাচরণের পঞ্চম শ্লোকে লিখিয়াছেন :

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্॥

—সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, সর্বকল্যাণ-কারিণী রামপ্রিয়া সীতাদেবীকে আমি প্রণাম করি।

ক্লেশহারিণী আদ্যাশক্তি যে-সীতাদেবীকে মহাত্মা তুলসীদাস প্রণাম জানাইয়াছেন, আধুনিক যুগে তিনিই সারদাদেবীরূপে আবির্ভূতা। এবিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১০ সালে শ্রীমা সারদাদেবী তাঁহার সঙ্গিনীদের সহিত জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে একজন পশ্চিমা কুলি তাঁহাকে দেখিয়া

ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'জানকী মাঈ, তুঝে মৈঁনে কিতনে দিনোঁসে খোঁজ রহা থা। ইতনে রোজ তু কাঁহা থী?' ইহা বলিয়া সে অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীমা তাহাকে শান্ত করিয়া একটি ফুল আনিতে বলিলেন। সে ফুল আনিয়া শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলে মা সেই স্টেশনে বসিয়াই তাহাকে মহামন্ত্রদানে কৃতার্থ করিলেন। পরম ভাগ্যবান কুলিটি শ্রীশ্রীমাকে ইতঃপূর্বে স্বপ্নে বা ভাবাবস্থায় সীতাদেবীরূপে দর্শন করিয়াছিল কিনা জানা নাই। কিন্তু শ্রীশ্রীমা যে স্বয়ং সীতাদেবী, ইহা তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন। রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছে।' ইহার পর দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'মা, রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?' তদুত্তরেও শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন।'

তাই শ্রীশ্রীমায়ের সমাগতপ্রায় শুভ আবির্ভাব-তিথি-স্মরণে রামভক্ত তুলসীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ক্লেশহারিণী মায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-প্রণতি নিবেদন করি :

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্।
সর্বশ্রেয়স্করীং বন্দে সারদাজানিবল্লভাম্॥

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[স্বামী দেবানন্দকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্

কলিকাতা
৮।৩।২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার ৫।৩।২৬ তারিখের পত্র পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুলভাবে মনের সকল কথা বলিবে। তোমরা তাঁহার আশ্রিত সন্তান। তিনি তোমাদিগকে সকল অবস্থায় রক্ষা করিবেন—কোনও ভাবনা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে—তাহা হইলেই সকল [সফল ?] হইবে।

আমার শরীর ভাল আছে। শ্রীমান ধীরেনের পত্র কিছুদিন হয় পাইয়াছি। দে [সে ?] উত্তর-কাশীতেই আছে—শরীর ও মন ভালই আছে। এখানকার কুশল। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে। মধ্যে ২ তোমার কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। মঠের পুঃ মহাপুরুষ প্রমুখ সকলে ভাল আছেন। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

মায়ের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ*

শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে আলোচনা শোনার চেয়ে নিজে অনুধ্যান করা ভাল। কারণ মা যে সকলের আপনার। একান্ত আপনার যিনি, তাঁর চিন্তা হৃদয়ের নিভৃতে করলে যত গভীরভাবে আস্বাদন হয়, সকলের সঙ্গে তা হয় না।

তবে সকলের সঙ্গে আলোচনা করারও একটা দিক আছে। যে রস ভাল লাগে, স্বভাবতঃই সকলের সঙ্গে বসে সকলের সহযোগে সেই রস আস্বাদন করতে আমরা বেশী আনন্দ পাই, বেশী তৃপ্তি হয়। সেইজন্য এরকম আলোচনারও প্রয়োজন আছে।

আসল কথা, আমরা সংক্ষেপে 'মা' এই শব্দটি ব'লে তাঁকে আহ্বান করি, কিন্তু এই শব্দটি যে কত গভীর অর্থবহ—কত নিবিড় আস্বাদন এর ভিতর দিয়ে হয়, তা সবসময় তলিয়ে দেখি না। তবে তলিয়ে না দেখতে পারলেও শিশু যেমন মাকে ডেকেই আনন্দ পায়, আমরাও সেইরকম মাকে ডেকেই আনন্দ পাই। সেটুকু অন্ততঃ আমাদের কাছে কম প্রাপ্তি নয়।

মায়ের সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরু-ভাইদের একজনকে লিখেছিলেন, 'দাদা, রাগ ক'রো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি।' কথাটি আগে বললেন, 'রাগ ক'রো না'; কারণ 'তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি' বললেই তো রাগ হবে গুরুভাইদের। কিন্তু বাস্তবিক স্বামীজীই মায়ের মাহাত্ম্য বুঝেছিলেন। মাকে স্বামীজী যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তেমন ক'রে বোঝা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে যাবার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে তবে গিয়েছেন। লিখেছিলেন একটি চিঠিতে আমেরিকা থেকে—'মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে...আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ ক'রে পগার পার।' ঠাকুর তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখিয়ে-ছিলেন, তাঁর পাশ্চাত্য দেশে যাওয়াটা ঠাকুরেরও অভিপ্রেত, তা সত্ত্বেও স্বামীজী মায়ের আশীর্বাদ না নিয়ে যাননি। তাহলেই বোঝা যায় স্বামীজীর মায়ের উপর কি অগাধ শ্রদ্ধা, কি প্রগাঢ় বিশ্বাস! সেই মায়ের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি! কতটুকু বুঝি! তবে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদরা যেভাবে মাকে দেখেছেন এবং সর্বোপরি স্বামীজী নিজে যেভাবে মার সম্বন্ধে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে আমরা কতকটা অনুমান করতে পারি মাত্র যে মায়ের মাহাত্ম্য কতখানি।

তবে মাহাত্ম্য না বুঝলেও মাধুর্য সকলেই বোঝে। সন্তান মায়ের মাহাত্ম্য বোঝে না কিন্তু তা ব'লে মাকে কম আস্বাদন করে না। অবোধ শিশু তার নির্বোধ মন দিয়ে আস্বাদন করে, তার অন্তর দিয়ে প্রাণ দিয়ে আস্বাদন করে। মাকে সে বোঝাতে পারে না, ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তাঁর মাধুর্য অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নিজে পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করে। তার ঐ ছোট্ট হৃদয়টি সেই আস্বাদনে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মায়ের মাতৃত্বের এই হ'ল মাধুর্য-আস্বাদনের দিক।

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ।

আর একটা দিক হচ্ছে পালন। তিনি মাতৃরূপে আমাদের পালন করেন, পোষণ করেন। সেদিক দিয়ে দেখতে হ'লে একটু বুদ্ধির সাহায্যে তাঁকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। মায়ের ভিতরে মহাশক্তির প্রকাশ, যে প্রকাশ অনুপম, ইতিপূর্বে জগৎ আর কখনো যার পরিচয় পায়নি। পূর্ব পূর্ব অবতারে, যখন ভগবানের সঙ্গে তাঁর শক্তি আবির্ভূতা হয়েছেন, তখন তাঁদের হয়ত সেই অবতারের লীলা-প্রকাশে কিছু অবদান আছে কিন্তু পতির লীলায় সহকারিণীরূপে মা যে অপূর্ব লীলা করেছেন, তার বাস্তবিকই তুলনা নেই। তাই তিনি অনুপমা। অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে এই রকম প্রকাশ আমরা কোথাও পাই না। যেমন ঠাকুরের অবতার নেওয়ার বৈশিষ্ট্য আমরা দিনে দিনে এখনও আলোচনার ভিতর দিয়ে, অনুশীলনের ভিতর দিয়ে একটু একটু ক'রে বোঝবার চেষ্টা করছি, মাকেও সেইরকম আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছি, তাও ইদানীংকালে।

পূর্বে এইভাবে মাকে বোঝার চেষ্টা আমরা করিনি। এমনকি ঠাকুরের পার্ষদদের ভিতরে সাধারণতঃ এই ভাবই ছিল যে, মাকে আবার বুঝবার কি দরকার, আস্বাদন করলেই হ'ল। ঠাকুরের সন্তানদেরই যখন এই ভাব ছিল, তখন অন্যদের আর কি কথা!

আমাদের বাল্যকালে মা যখন স্থূলশরীরে ছিলেন, তখনও মার কাছে সাক্ষাৎভাবে গিয়ে মায়ের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব ছিল না। মা 'লজ্জা-পটাবৃতা'। তিনি যদি নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, তাহলে অপরের সাধ্য কি সেই অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে মাতৃমুখ দর্শন করে! সত্যসত্যই আক্ষরিক অর্থে মা নিজেকে অবগুণ্ঠনে আবৃতা ক'রে রাখতেন। আর যেমন তিনি নিজেকে আবৃত ক'রে রাখতেন, তেমনি আমাদের মধ্যে যাঁরা মায়ের বিভূতি না জানলেও মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম, তাঁরাও প্রাণপণে চেষ্টা করেছি মাকে অবগুণ্ঠনাবৃতা ক'রে রাখতে। সে-সময়ে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল, মায়ের ছবি বাজারে কোথাও বিক্রি হ'ত না। যদি কারো দরকার হ'ত, নিতান্ত ঘনিষ্ঠ কোন ভক্তের মাধ্যমে চেষ্টা ক'রে হয়ত এক-আধখানি তিনি সংগ্রহ করতে পারতেন। এবং একথাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলে দেওয়া হ'ত, ঐ ছবি কোথাও প্রকাশ্যে রাখা চলবে না। মাকে আমরা এত লুকিয়ে রেখেছিলাম। কেন রেখেছিলাম? বোধ হয় এইজন্য যে, মা যখন নিজেই লুকিয়ে থাকেন, তখন আমরা জোর ক'রে তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করব কি করে?

কিন্তু মা নিজে জানেন কখন তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করবেন, কার কাছে করবেন। অন্য বিষয়ে তিনি খুব উদার কিন্তু এ-বিষয়ে একটু কৃপণই বলতে হবে। সহজে নিজে কারো কাছে ধরা দিতেন না, এমন কি তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের কাছেও না। ভক্তদের ভিতর বিরল কেউ কেউ ভাগ্যবান ছিলেন, যাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে আসতে পারতেন। বাকী যারা, তারা দূর থেকে তাঁকে দেখত বা অন্যের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে উপদেশ পেত। তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের সম্বন্ধেও এ-নিয়ম ছিল। বড় কড়া নিয়ম।

তবে ক্রমশঃ মায়ের সাম্রাজ্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, মায়ের সন্তানেরা চারিদিক থেকে বলছে, 'মা, তোমার আবরণ, তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর', যেমন উপনিষদের ঋষি বলছেন—

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥

(ঈশ উ. ১৫)

[হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। হে জগতের পোষণকারী, তুমি সেই আবরণ

অপসারিত কর, যাতে যথাভূত ধর্মের অনুষ্ঠাতা আমি তোমাকে দর্শন করতে পারি।] বোধ হয় জগতের বহুলোকের আর্তি-হৃদয়ের এরকম ব্যাকুলতা দেখে মা ধীরে ধীরে তাঁর আবরণ উন্মোচিত করছেন, ধীরে ধীরে আমরা তাঁর পরিচয় পাচ্ছি।*

[ক্রমশঃ]

* ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবতিথি-স্মরণে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, কাঁকুড়গাছি রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে আলোচনা। শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। —সঃ

সারদাস্তুতিঃ

অধ্যাপকশ্রীবিধুভূষণভট্টাচার্যসপ্ততীর্থেন কৃতা

সদানন্দরূপে চিদেকস্বরূপে
প্রমোহপ্রণাশে প্রসাদাধিবাসে।
অনন্তপ্রভাবে সমাধিস্বভাবে
নমঃ সারদে! তে স্থিতব্রহ্মভাবে ॥১

সদাসৎপ্রসঙ্গে মহাযোগিসঙ্গে
মহাজ্যোতিরঙ্গে পুনর্জন্মভঙ্গে।
কৃপাম্বোধিমাধুর্যধারাতরঙ্গে
নমো মোক্ষবীজপ্রদানৈকরঙ্গে ॥২

অয়ি জ্ঞানসূর্যপ্রভাদীপ্তভালে

অপধ্বস্ততূর্বৃত্তবৃত্তোপদেশে
নমস্তে দিবোভ্রষ্টতেজোবিশেষে ॥৩

সুতুচ্ছীকৃতক্ষুদ্রভোগে প্রবোধে
নমো বিশ্বকল্যাণসম্পৎপয়োধে।
মনোধ্বান্তনাশিপ্রভা সারদা ত্বং
স্থিতা রামকৃষ্ণে যথা কৌমুদীন্দৌ ॥৪

অপূর্বাঽসি মাত র্মহিম্না বিশালে
স্বরূপং বিচিত্রং দধানা হি কালে।
ক্বচিদ্ ভাসি বালা মনোজ্ঞা ত্রিলোকে
ক্বচিদ্ যৌবনস্থা নিরাসক্তচিত্তা ॥৫

অমর্ত্যাপি মর্ত্যং গৃহীত্বা শরীরং
জগন্মঙ্গলার্থং করোষি স্বলীলাম্।
ন বিত্তং ন রাজ্যং তবাস্তীহ ভৌমং
নৃপেন্দ্রাদিবন্দ্যা তথাপি ত্বমস্মিন্ ॥৬

অকল্যাণবিত্রাসনাক্ষিপ্রপাতে
নিরুদ্ধাপবিদ্যাভুজঙ্গপ্রয়াতে।
নরেন্দ্রপ্রসন্নে ত্রিলোকপ্রশস্তে
নতার্থীষ্টপূর্তে শরণ্যে নমস্তে ॥৭

ইহানাপ্তপুণ্যৈ র্যদি ত্বং দুরাপা
প্রমাণীকৃতং স্যাৎ কুতস্তে মহত্ত্বম্।
কৃতানল্পপাপং যদি ত্রায়সে মাং
তদা স্যাদ্ যথার্থং মহিম্নো মহত্ত্বম্ ॥৮

দশ বেদান্ত-সম্প্রদায়

ডক্টর রমা চৌধুরী

(দশম পর্যায়)

বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'

[কার্তিক, ১৩৮৭ সংখ্যার পর]

পূর্ব সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩৮৭) বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের 'আনন্দময়ত্ব' ও 'প্রভুত্ব'—এই দুটি গুণ পরস্পরবিরোধী একেবারেই নয়, যেহেতু জীবের 'দাসত্ব' তাঁর ভীতি অথবা দুঃখের কারণ নয়; বরং প্রীতি ও আনন্দেরই কারণ; এবং সেজন্য জীব চিরকালই শ্রীভগবানের দাসানুদাস-রূপেই নিজেকে দেখতে চান—অন্য কোনো কিছু রূপেই নয় কোনোদিনও, এমন কি, মোক্ষকালেও নয়।

এই প্রসঙ্গে, স্বামী বিবেকানন্দের সেই সুবিখ্যাত আবেগমথিত উক্তিটি মনে পড়ছে: 'A single word of his is to me far weightier than the Vedas and the Vedanta. তস্য দাসদাসদাসোঽহম্—Oh, I am the servant of the servants of his servants.' (C.W. Vol., VII., 1969, p. 481)—'তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহম্।' (মূল বাংলা চিঠি: পত্রাবলী, অখণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৫৫)

সেজন্য, যা বলা হয়েছে, বৈষ্ণব-ভক্ত শ্রীভগবানের এই চিরদাসত্ব প্রার্থনা ক'রে মোক্ষ পর্যন্ত চান না, যে মোক্ষলাভের অর্থ হ'ল—তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে গিয়ে তাঁকে ভক্তি করার, সেবা করার, পূজা করার, তাঁর দাসানুদাস হবার কোনো-রূপ অবকাশ আর না পাওয়া।

এই প্রসঙ্গেও মনে পড়ছে একজন সুবিখ্যাত আধুনিক মুসলমান কবি—কাজী নজরুলের আশ্চর্যজনক মর্মস্পর্শী কবিতাটি—

'(আমার) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা,
আমি তোরে চাই।
স্বর্গ আমি চাই না মাগো,
কোল যদি তোর পাই॥
(মা) কি হবে সে মুক্তি নিয়ে
কি হবে সে স্বর্গে গিয়ে,
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার
আর প্রয়োজন নাই॥'

('রাঙাজবা', কবিতা নং ৪৯, পৃঃ ৪১)

প্রচলিত গানেও আমরা পেয়েছি সেই একই সুরের উদাত্ত ঝঙ্কার—

'জ্ঞান দিও, ভক্তি দিও,
মুক্তি দিও না।
মুক্ত হ'লে মা'র কোলে
আর লীলাখেলা হবে না।
(তাই) মাগো, মোরে মুক্তি দিও না॥'

(প্রচলিত)

সেজন্য, বৈষ্ণব-বেদান্তের এই অভিনব মতবাদ —মুক্তি নয়, ভক্তিই পরমপুরুষার্থ—আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, তার প্রমাণের অভাব নেই।

ব্রহ্মের সপ্তবিধ গুণ: সৌহার্দ্য

পূর্বের দু'একটি সংখ্যায় (উদ্বোধন, ভাদ্র

১৩৮৬, ও আষাঢ় ১৩৮৭), বলদেব-প্রপঞ্চিত ব্রহ্মের সাতটি প্রধান গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—সর্বজ্ঞত্ব, আনন্দময়ত্ব, প্রভুত্ব, সৌহার্দ্য, জ্ঞানদাতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ও সৌন্দর্য।

এদের মধ্যে, প্রথম তিনটির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, এবং কার্তিক ১৩৮৭ সংখ্যায়। বর্তমান সংখ্যায় ব্রহ্মের চতুর্থ গুণ 'সৌহার্দ্য' সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে।

(৪) সৌহার্দ্য: বলদেবের মতে ব্রহ্মের চতুর্থ প্রধান গুণ হ'ল 'সৌহার্দ্য' বা বন্ধুত্ব।

অতি ভালো কথা। কারণ, 'প্রভুত্বে'র পরে পুনরায় আশাতীতভাবে অকস্মাৎ আমরা পেয়ে গেলাম ব্রহ্মকে অতি আপন জন, অতি নিকট জন, অতি প্রিয় জন রূপে। বস্তুতঃ, যিনি যাই বলুন না কেন, 'প্রভু' কথাটিই ত ভীতিজনক, দূরত্বজনক, অসাম্যজনক। সেক্ষেত্রে 'সৌহার্দ্য' একেবারে প্রীতির, একেবারে নিকটত্বের, একেবারে সাম্যের দ্যোতক। নেই এস্থলে একেবারেই উচ্চ-নীচ, শাসক-শাসিত, আজ্ঞাকারী-আজ্ঞাবহের সম্পর্ক—যেহেতু পৃথিবীতে যতপ্রকারের সম্পর্ক আছে, তাদের সকলের মধ্যেই 'সৌহার্দ্য' অতি নিশ্চিত সর্বাপেক্ষা সাম্যমূলক, নিকটতম, নিজতম সম্পর্ক। যেহেতু, পিতা-সন্তান, মাতা-সন্তান, এমন কি, পতি-পত্নীর সম্পর্কের মধ্যেও অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে কিছু-না-কিছু স্তরভেদ, উচ্চ-নীচের মধ্যে স্তরভেদ; কিছু-না-কিছু দূরত্ব—শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম-আদেশ-পালনাদিজনিত দূরত্ব; এবং কিছু-না-কিছু ভীতি এই সব কারণে। কিন্তু 'সৌহার্দ্যে'র ক্ষেত্রে ঠিক তার বিপরীত ব্যাপারই ঘটছে। কারণ, দুই সুহৃদ, সখা বা বন্ধু একেবারে একই সমান স্তর-ভুক্ত; বিন্দুমাত্রও উচ্চ-নীচাদি স্তরভেদ এক্ষেত্রে থাকতেই পারে না। পুনরায়, এঁদের মধ্যে সম্পর্ক একেবারে পরিপূর্ণভাবেই একমাত্র নির্ভেজাল, নিঃশর্ত প্রীতিরই সম্পর্ক—আর অন্য কোনো কিছুর প্রবেশাধিকার এতে একেবারেই বিন্দুমাত্রও ক্ষণমাত্রও নেই। সেইদিক থেকে 'সৌহার্দ্য' মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা, সুনিশ্চিত।

আমরাও পুনরায় পুলকিত, আশ্বস্ত হয়ে উঠলাম—যেহেতু, 'প্রভুত্বে'র ঠিক পরেই পুনরায় পেয়ে গেলাম 'সৌহার্দ্য'কে—দূরের, ভয়ের, উচ্চ-স্তরের 'প্রভু'র স্থলে নিকটের, প্রীতির, সমস্তরের সুহৃদকে। কিন্তু মনে ত সেই অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন থেকেই গেল—কেন প্রাজ্ঞবর, বৈদান্তিকশ্রেষ্ঠ বলদেব এইভাবে আমাদের নাগর-দোলায় দোলাচ্ছেন, একবার উঁচুতে, একবার নীচুতে—একবার শ্রীভগবানের 'ঐশ্বর্য'-ভাবের কথা ব'লে, একবার তাঁর 'মাধুর্য'-ভাবের কথা ব'লে। যথা—শ্রীভগবানের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে প্রথমটি বা 'সর্বজ্ঞত্ব' হ'ল তাঁর 'ঐশ্বর্য' বা কঠিন দিকের পরিচায়ক; দ্বিতীয়টি বা 'আনন্দময়ত্ব' হ'ল তাঁর 'মাধুর্য' বা কোমল দিকের পরিচায়ক; তৃতীয়টি বা 'প্রভুত্ব' হ'ল তাঁর 'ঐশ্বর্য' বা কঠিন দিকের পরিচায়ক; চতুর্থটি বা 'সৌহার্দ্য' হ'ল তাঁর 'মাধুর্য' বা কোমল দিকের পরিচায়ক। তাহলে শ্রীভগবান সম্বন্ধে আমরা কি ভাবব?—তিনি ঐশ্বর্যগর্বিত না মাধুর্যনন্দিত? তিনি কঠিন, না কোমল? তিনি দূরের, না নিকটের?

কি ভাবব, তা ত বলদেব পূর্বেই বলে রেখেছেন (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৮৭, পৃঃ ৪০৩)। অর্থাৎ, ব্রহ্ম একাধারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং মাধুর্যমণ্ডিত। তাঁর এই দুটি ভাবের কোনোটিকেই যেন আমরা অবহেলা না করি, সেজন্যই তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টা। দূরের 'ঐশ্বর্য' নিয়েই শেষ না ক'রে দিয়ে নেমে এলাম আমরা নিকটের 'মাধুর্যে'; কিন্তু কেবল তাতেই নিমগ্ন না হয়ে, পুনরায় উঠে গেলাম দূরের 'ঐশ্বর্যে'; পুনরায় নেমে এলাম নিকটের 'মাধুর্যে'—এ ত সত্যই উত্থান-পতন নয়; এ কেবল ব্রহ্মের দুটি

দিকের মধ্যে 'Balance' বা ভারসাম্য বা সমতা রক্ষার কল্যাণজনক উপায়ই মাত্র। সেই দিক থেকে স্থিরবুদ্ধি বলদেব প্রগাঢ় প্রজ্ঞার পরিচয়ই দিয়েছেন এক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে।

বৈষ্ণব-দর্শনে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের অতি নিকট, অতি নিজ, অতি মধুর সম্পর্ক বোঝাবার জন্য, সাধারণতঃ দু-প্রকারের সম্বন্ধের কথাই বিশেষভাবে বলা হয়। যথা—প্রিয়-প্রিয়ার (পতি-পত্নীর নয় —তার চেয়েও নিকটতর, নিজতর, মধুরতর সম্পর্ক বৈষ্ণব-মতে), এবং দুই সখার সম্বন্ধ। এ দুটির মধ্যে, যিনি যাই বলুন না কেন, প্রথমটিতে যেন কিছু-না-কিছু স্বার্থ—অথবা বাসনা-কামনা, দেনা-পাওনা, অশান্তি-অস্থিরতা, দৈহিক ভোগ-বিলাসাদির প্রশ্ন থেকেই যায়, যতই না তাদের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রং-এ রঞ্জিত করা হোক। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে এ সবের কণামাত্রও কল্পনাতীত; যেহেতু এতে আছে কেবলই বিশুদ্ধ ভালবাসা, কেবলই মনের আদান-প্রদান, কেবলই নিঃস্বার্থ কল্যাণকরণ, কেবলই লীলাখেলা, কেবলই আমোদ-আহ্লাদ, কেবলই শান্তি-স্থিরতা। সেজন্য অনেকেরই মতে, পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্য বা সখ্যভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ।

অবশ্য, শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বেদান্তের মতবাদ তা নয়, যেহেতু তা 'কান্তাভাব' বা কান্তা-প্রেম এবং রাধাভাব বা রাধাপ্রেমের প্রতিই সমধিক ও সর্বাধিক মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ করেছে। (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৬৩-৭৫)

সে যাহোক, বলদেব যে এস্থলে 'প্রভুত্বে'র পরেই 'সৌহার্দ্যে'র উল্লেখ করেছেন, তার আরেকটি কারণ হয়ত হ'ল এই:

উপরে, যে কান্তা-প্রেম ও রাধা-প্রেমের কথা বলা হ'ল এইমাত্র, সেই প্রসঙ্গেই এই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে বিশদভাবে 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'। সেখানে আমরা দেখি যে—

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায় রামানন্দের মুখ থেকে বের ক'রে নিতে চেয়েছিলেন জীবের 'সাধ্য' বস্তু কি। সেজন্য, সাধ্য-নির্ণয়ের জন্য তিনি রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করলেন:

'প্রভু কহে—পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৫৪)

উত্তরে রায় রামানন্দ ক্রমান্বয়ে এগারোটি 'সাধ্যে'র কথা বললেন: (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৫৪-৭৬)

(১) বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধর্ম
(২) কৃষ্ণে কর্মার্পণ
(৩) স্বধর্মত্যাগ
(৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি
(৫) জ্ঞানশূন্যা ভক্তি
(৬) প্রেমভক্তি
(৭) দাস্যপ্রেম
(৮) সখ্যপ্রেম
(৯) বাৎসল্যপ্রেম
(১০) কান্তাপ্রেম
(১১) রাধাপ্রেম

রায় রামানন্দ ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ সহ এগুলির প্রত্যেকটিকে ক্রমান্বয়ে 'সাধ্য'রূপে নির্দিষ্ট করলে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু প্রথম পর্যায়ে (১নং থেকে ৪নং পর্যন্ত)—অর্থাৎ 'বর্ণাশ্রমধর্ম বা স্বধর্ম', 'কৃষ্ণে কর্মার্পণ', 'স্বধর্মত্যাগ' এবং 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'র ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বলতে লাগলেন—

'এহো বাহ্য, আগে কহ আর।' (চৈতন্য-চরিতামৃত, ২।৮।৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮)।

'এহো বাহ্য' কথাটি আজ একটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে।

সে যাহোক, দ্বিতীয় পর্যায়ে (৫নং থেকে ৭নং পর্যন্ত), ৫নং বা 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি'র ক্ষেত্রেই মহাপ্রভু সর্বপ্রথম বললেন—

'প্রভু কহে—এহো হয়, আগে কহ আর।'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৫৯)

এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে, ৬নং ও ৭নং ক্ষেত্রেও অর্থাৎ, 'প্রেমভক্তি' ও 'দাস্যপ্রেমে'র ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই কথা বললেন। (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮। ৬০, ৬১)

তারপর, তৃতীয় পর্যায়ে, (৮নং ও ৯নং) ৮ নং বা 'সখ্যপ্রেমে'র ক্ষেত্রেই মহাপ্রভু সর্বপ্রথম বললেন—

'প্রভু কহে—এহোত্তম, আগে কহ আর।'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৬২)

এবং ৯নং-এর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ, 'বাৎসল্যপ্রেমে'র ক্ষেত্রেও মহাপ্রভু ঐ একই কথা বললেন। (চৈতন্য-চরিতামৃত, ২।৮।৬৩)

তারপর, চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ে,—অর্থাৎ, ১০ নং এবং ১১ নং অথবা 'কান্তাপ্রেম' ও 'রাধাপ্রেমে'র ক্ষেত্রে, তিনি যেন মেনেই নিয়েছেন, এইভাবে পর পর বললেন—

'প্রভু কহে·· কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়।' (চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৭৩)

'প্রভু কহে—আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।
অপূর্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ২।৮।৭৬)

'রাধাপ্রেম'কেই প্রকৃত 'সাধ্য' বলে স্বীকার ক'রে নিয়েও রায় রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের মহিমা আরো কিছু প্রকাশ করাবার জন্যই, মহাপ্রভু এস্থলে শেষ ক'রে না দিয়ে বলছেন—'আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে।'

এস্থলে, বৈষ্ণব-বেদান্তের দিক থেকে তত্ত্ব যাই হোক না কেন, তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন কেবল প্রথম তিনটি পর্যায় নিয়ে, যে সম্পর্কে মহাপ্রভু বলেছেন—'এহো বাহ্য', 'এহো হয়' এবং 'এহোত্তম'—পরেরটি আগেরটির অপেক্ষা উচ্চতর ও উৎকৃষ্টতর।

এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 'দাস্যপ্রেম' পড়েছে 'এহো হয়' রূপ দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষে; কিন্তু 'সখ্যপ্রেম পড়েছে 'এহোত্তম'-রূপ তৃতীয় পর্যায়ের প্রারম্ভে। তার কারণরূপে বৈষ্ণব-বেদান্তে বলা হয়েছে যে, একেবারে সমানে সমানে না হ'লে, প্রেম প্রগাঢ়তম হতে পারে না, যেহেতু তখন প্রেমের মধ্যে এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই অধিক পরিমাণে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম, গৌরববুদ্ধির ভীতি, সঙ্কোচ, অস্বাচ্ছন্দ্য, চঞ্চলতা প্রভৃতি; এবং এগুলি থাকলে, প্রেমাস্পদকে একেবারে আপন ক'রে নেওয়া যায় না, তাঁর প্রতি প্রকৃত-প্রকৃষ্ট মমত্ববুদ্ধিরও উদয় হতে পারে না। কিন্তু 'সখ্যপ্রেমে' মমত্ব-বুদ্ধির গাঢ়তাবশতঃ, তা 'দাস্যপ্রেম' অপেক্ষা উচ্চতর—যেহেতু দাস ত প্রভুকে 'ত্বং মম' বা 'তুমি আমার' বলতে সাহস করেন না; কিন্তু সখা বা বন্ধু করেন। বৈষ্ণব-বেদান্ত-মতবাদানুসারে এরূপ গৌরববুদ্ধিহীন ও মমত্ববিশিষ্ট সমান সমান ভাবে, স্বয়ং শ্রীভগবানও অত্যন্ত প্রীত হন; তিনিও নিজেই সখার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে যান; তাঁর বশ হয়ে যান। অবশ্য এরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবশ্যতা সকল স্তরেই আছে, দাস্যেও আছে। তথাপি, দাস্য অপেক্ষাও সখ্যে প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা বহু পরিমাণে অধিক আছে, কারণ, ভক্তের প্রেম যত গাঢ় হয়, যত তাঁর মমত্ববুদ্ধি দৃঢ় হয়, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতাও তাঁর নিকট তত নিবিড় হয়। এই কারণেই, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন আবেগ-ভরে, মর্মস্পর্শী ভাবে—

'আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥
আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন।
সর্বতোভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥'

(চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪।১৮-২০)

[ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

পর্ব

[ ]

কাশীপুর বাগানবাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ গুরুতর পীড়িত। দোতলার হলঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলতেন, 'যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহ ধারণ ক'রে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাত এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, ওঁরা যান হেসে হেসে⋯।'[1]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেবশরীরে ব্যাধির ফলে অশ্রুতপূর্ব একটি মহৎ ঘটনা সুসম্পাদিত হল। "⋯ঠাকুরের দেবশরীরে ঐ প্রকার রোগের বাহ্যিক বিকাশ ভক্তদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র সম্মিলিত করিয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব প্রণয়বন্ধনে যে গ্রথিত করিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, সন্ন্যাসী, গৃহী, জ্ঞানী, ভক্ত—এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ভক্তদিগের ভিতর এখানেই স্পষ্টীকৃত হয়। আবার ইহারা সকলে যে এক পরিবারের অন্তর্গত, এ ধারণার দৃঢ়ভিত্তি এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়।⋯ দক্ষিণেশ্বরে যেরূপ, এখানেও সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের নিত্য জনতা হইত।⋯ আমাদের মনে হয় জগদম্বা এক অদৃষ্টপূর্ব মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত করিবেন বলিয়াই ঠাকুরের দেবশরীরে ব্যাধির সঞ্চার করিয়াছিলেন। এখানে ঠাকুরের নিত্য নূতন লীলা ও নূতন নূতন ভক্তসকলের আগম দেখিয়া এবং ঠাকুরের সদানন্দমূর্তি ও নিত্য অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশ দর্শন করিয়া অনেক পুরাতন ভক্তেরও মনে হইয়াছিল, ঠাকুর লোক-হিতের নিমিত্ত একটা রোগের ভান করিয়া রহিয়াছেন মাত্র—ইচ্ছামাত্রেই ঐ রোগ দূরীভূত করিয়া পূর্বের ন্যায় সুস্থ হইবেন।"[2]

এরূপ কোন অজ্ঞাতপায় উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দুঃসহ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ভক্তদের বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ ভক্তদেরকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্য করে দুর্লভ এক অভিজ্ঞতা দান করেছিলেন। শ্রীমাতাঠাকুরাণী বলতেন, "যারা আপনার, তারা সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তারা ব্যথার ব্যথী।' এই সব ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।' তিনি যখন আসেন, তখন সব হাজির।"[3]

অপরাহ্নকাল। শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৮৮৬। ২২শে ফাল্গুন, অমাবস্যা তিথি। মাঠের উপর একটি মাদুর বিছিয়ে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ ও মাষ্টারমশাই।

দীর্ঘকয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর ভক্ত রাম দত্ত উপস্থিত হয়েছেন।

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের সাময়িক মন-কষাকষির ফলেই সম্ভবতঃ রামচন্দ্র অভিমান করে অনেকদিন আসেন নি। আজ তাঁকে আসতে দেখে মাষ্টার-

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৯৬
২ স্বামী সারদানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৮৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭১-২
৩ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ৯৭

মশাই বলেন নরেন্দ্রনাথকে : এস, এঁকে receive করে আন।

নরেন্দ্রনাথ : আপনিই আসবেন এখন।

মাষ্টার রামবাবুকে স্বাগত জানিয়ে বলেন : এসো না।

রাম দত্ত : যাও, যাও।

পরবর্তী দৃশ্যপটে রামবাবু এগিয়ে যান বসত-বাড়ীর দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাসগৃহের দিকে। খুবই সম্ভবতঃ এই দিনেরই ঘটনা। সেবক লাটু স্মৃতিচারণ করে বলেছেন : "রামবাবু একদিন কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যেতে চাইলেন। নিরঞ্জন-ভাই তাঁকে যেতে দিল না। তখন তিনি হামার হাতে কুছু মিষ্টি আর মালা দিয়ে বললেন—'ওরে! এগুলো ওপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।' এমন করে বলতে শুনে হামার মনে বড় দুঃখু হোলো। হামি ত নিরঞ্জনভাইকে বললুম—'ওনাকে উপরে যেতে দাও না, ভাই। আপনা আপনির মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে? হামার কথা নিরঞ্জনভাই তখন কানে তুললে না। হামনে তাই বললুম—'শ্যামপুকুরে সেদিন দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিলো, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে আর আজ এনার মত লোককে ছাড়তে চাইছো না!' নিরঞ্জনভায়ের তখন কি মনে হোলো, রামবাবুকে বললে—'আপুনি উপরে যান।' সেদিন উপরে যেতে উনি (ঠাকুর) হামায় বললেন—'ছাখ! কারুর কখনও দোষ দেখবি নি, লোকের কেবল গুণ দেখবি।' তাঁর কথা শুনে হামার বড় দুঃখু হোলো, হামনে ফিন্ তাঁর (নিরঞ্জন) কাছে এসে বললুম—'ভাই হামার মত মূখ্যুর কথায় দুঃখু করিস নি।'"[৭৪]

রাম দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের চরণবন্দনা করে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: [এতদিন] আসনি কেন?

রামচন্দ্র : ওসব কথা থাক—আপনি কেমন আছেন [বলুন]। মনে হয় নৃত্যগোপালের সঙ্গে পরামর্শ করে রামচন্দ্র এসেছিলেন, এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করেছিলেন

মাষ্টারমশাই ঘরে উপস্থিত। সাহেব ডাক্তার মিঃ রে (Rey) কে আনার কথা হচ্ছিল। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করেন: ডাক্তার ঠাকুরকে ছোঁবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ : তা [ব্যথার জায়গায়] মা, টিপলেই হলো।

রাখাল মাষ্টারকে বলেন : তবে ওঁর মত আছে।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই যান নরেন্দ্রনাথের নিকট। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে কথা ওঠে। গিরিশচন্দ্রের নিকট থেকে শোনা একটি মনোজ্ঞ কাহিনীর উল্লেখ করেন মাষ্টারমশাই। একদিন সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে আমগাছের তলায় নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ধ্যান করতে বসেছিলেন। মশার উৎপাতে গিরিশচন্দ্র মন স্থির করতে ব্যর্থ হন, মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র বলেন: "আমি চোখ খুলিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া আছে,...অবশেষে গাত্র স্পর্শ করিয়া কিঞ্চিৎ দোলাইলাম। কোনও সাড়া শব্দ নাই। গায়ে কম্বলের মত মশা বসিয়া আছে।...এ আবার কি ব্যাপার! আমি ধরিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলাম। নরেন্দ্রনাথ পদ্মাসনে যেমন আসীন ছিলেন তেমনই উল্টাইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা নাই।...তারপর নরেন্দ্রনাথ উঠিয়া হাস্য করিয়া আমাকে বলিলেন—'দূর শালা, জি. সি., অত

[৭৪] ...হারাজের স্মৃতিকথা, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৭-৮

ভয় খাস কেন ?[৩৫]

গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর উঁচু ধারণা।

নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণ বর্জন' সম্বন্ধে বলেন। ১৮৮১ সালে ৩১শে ডিসেম্বর প্রতাপ জহুরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। নয়টি দৃশ্যে গ্রথিত এক অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটক। কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে গৃহীত। প্রথম রজনীর অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র 'রামচন্দ্রের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভারতী পত্রিকা সমালোচনা করে লেখে: "রাম ও লক্ষ্মণ—হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চশ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান্ ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।" নরেন্দ্রনাথ বলেন যে গিরিশবাবু যেন দেহবুদ্ধি ত্যাগ করে এই নাটক লিখেছিলেন। রামচন্দ্রের শেষোক্তি, রাখ মান, মান করি দান,—/কে রে লক্ষ্মণ ধরেছ ছাতা,—/হে পুরুষ, কার্য সাঙ্গ এতদিনে তব,/কার্য সাঙ্গ সরযূ সলিলে নারায়ণ! দেহত্যাগ করবেন সঙ্কল্প করে রামরূপী গিরিশ মাথা ঠুক্‌ছিলেন।

এবার নরেন্দ্রনাথ অঘোরপন্থী সাধনের কথা বলেন। যে শিব অনাসক্ত, যাঁর আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ লোকাচার-বহির্ভূত, বিষ্ঠা-চন্দন যিনি সমজ্ঞান করেন, তাঁর অপর নাম অঘোরনাথ। সাধক প্রথমে সন্ন্যাস নিয়ে অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করেন। অঘোরীগণ কাপালিক নন। শিবের ন্যায় তাঁরা শ্মশানচারী, মৃতের মাংসভক্ষণেও তাঁদের অরুচি নাই। তাঁরা উলঙ্গ থাকেন। তাঁদের সাধনপদ্ধতি খুবই প্রাচীন। নির্বিকার ও নির্ঘৃণ্য হওয়াই তাঁদের ধর্মকর্মের মূল।

নরেন্দ্রনাথ আরও বলেন: আমাদের পরমহংসদেব ভালবাসেন। তাই জি. সি.র আমাদের প্রতি ভালবাসা। গিরিশবাবুর যেন বালকের স্বভাব। কয়টা গিরিশ ঘোষ এদের ভিতর পাওয়া যাবে?—এদের একজন বলে একটা পাপ কর, আরেকজন আরেকটা।

গিরিশবাবু সেদিন (কুচুটেদের) হিসাবের কথায় জ্বলে উঠেছিলেন।

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশায়ের সম্বন্ধে বলতে থাকেন। নরেন্দ্র তাঁর অভিমত খোলাখুলি বলেন। তিনি মাষ্টারমশাইকে বলেন: দেখুন হয় অঘোরপন্থী হয়ে সংসার করুন, নয়ত সব ত্যাগ করুন।

মাষ্টারমশাই অন্তরে আলোচনা করেন: কেন মনে মনে ত্যাগ?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তো গৃহস্থদের মনে মনে ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন।

[ক্রমশঃ]

৩৫ মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩

বেদান্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস'

স্বামী পুরাণানন্দ

ভারতীয় সংস্কৃতির বা বেদান্তের বিমল ও পোষণাত্মক জ্ঞানালোকে মানবমনের অজ্ঞান-জনিত রাগদ্বেষ, ঘৃণাসংঘর্ষ প্রভৃতি তমোময় বিনাশাত্মক ভাবগুলির অবসান-কামনায় স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমময় জগৎপিতার ইচ্ছায় চিকাগো নগরে আয়োজিত ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে অত্যন্ত লোকপ্রিয়ভাবে বেদান্ত প্রচারান্তে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে সিংহল (অধুনা শ্রীলংকা) এবং পরে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগরীতে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষারত দেশবাসীকে দর্শনদান ও যথোপযুক্ত ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া ঐ বৎসর ৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি মাদ্রাজ নগরে পদার্পণ করেন। ৬ই হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্বামীজীর মাদ্রাজ-স্থিতি, সেখানকার অনুরাগীবৃন্দের নিকট নবরাত্রির মতই পূত ও আনন্দময় অবসর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মাদ্রাজে এবং অন্যত্রও ভারতবাসীর যথার্থ কল্যাণচিকীর্ষু স্বামীজী সুপ্তপ্রায় দেশবাসীর উদ্দেশে একের পর এক যে-সব ভাষণ দিয়াছিলেন, সেইগুলিকে জাগরণ-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার এবং নানা কুশিক্ষার ফলে আত্মবিশ্বাসহীন জাতির পক্ষে ঐ ভাষণগুলি মৃতসঞ্জীবনীর মত কার্যকর হইয়াছিল। মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক ভাষণটিতে স্বামীজী বলেন—'আমার সঙ্কল্প এই: প্রথমতঃ আমাদের শাস্ত্রভাণ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্নগুলিকে প্রকাশ্যে বাহির করা, ঐ শাস্ত্রনিবদ্ধ তত্ত্বগুলিকে—শুধু যাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে হইবে না, উহা অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ তত্ত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে বাহির করিতে হইবে। এক কথায়—আমি ঐ তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে চাই; আমি চাই ঐ ভাবগুলি সর্ব-সাধারণের—প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক; তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। এই সংস্কৃত ভাষার—আমাদের গৌরবের বস্তু এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের এক মহান অন্তরায়, আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিখিতেছে, ততদিন ঐ অন্তরায় দূরীভূত হইবার নহে।… সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে। কারণ সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব—একটা শক্তির ভাব জাগিবে।'

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে স্বামীজীর যে-অভিলাষ, যে-পরিকল্পনা অভিব্যক্ত, তাহার সার্থক রূপায়ণ বর্তমান ভারতবাসীর অবশ্যকর্তব্য। তবে আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, সন্ত তুলসীদাস তাঁহার হৃদয়বল্লভ—তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীরাম-চন্দ্রের প্রেরণায় আজ হইতে অন্ততঃ সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে নানা শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রচার করিয়া-ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাঁহার অমর-সৃষ্টি 'রামচরিতমানস' অবলম্বনে এই বিষয়টি

আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

রাম-কথা কীর্তন শুরু করিবার পূর্বে তুলসীদাস 'রামচরিতমানসে' যে পৃষ্ঠভূমি রচনা করিয়াছেন, উদ্ধৃতিসহ তাহার অনুসরণ করিয়া ক্রমে আমরা প্রবন্ধের প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবেশ করিব। উদ্ধৃতিগুলি শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত ও অনূদিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রামচরিতমানসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত।

পরমরম্য গিরিবরু কৈলাসু।
সদা জহাঁ সিব উমা নিবাসু॥ (বালকাণ্ড, ১২৯)

(রামচরিতমানসে তালব্য 'শ' এর ব্যবহার প্রায় নাই)

—অর্থাৎ, কৈলাস পর্বত পরম রমণীয়, যেখানে শিব উমার সহিত সর্বদা নিবাস করেন।

তেহি গিরি পর বট বিটপ বিসালা।
নিত নূতন সুন্দর সব কালা॥ (ঐ, ১৩০)

—সেই (কৈলাস) পর্বতে চিরনবীন এবং সদাসুন্দর এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে।

বটবৃক্ষতলে ভগবদ্ভাবে বিভোর দেবাদিদেব মহাদেব ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন আছেন। তাঁহার চিত্র তুলসীদাস এই প্রকার আঁকিয়াছেন :

জটামুকুট সুরসরিত সির লোচননলিন বিসাল।
নীলকণ্ঠ লাবণ্যনিধি সোহ বালবিধু ভাল॥
(ঐ, ১৩০)

—তাঁহার মস্তকে জটার মুকুট ও গঙ্গা, নয়ন বিশাল কমলসদৃশ, কণ্ঠ নীল, তিনি সৌন্দর্যের আকর, তাঁহার ললাটে বালচন্দ্র শোভা পাইতেছে।

বৈঠে সোহ কামরিপু কৈসে।
ধরে সরীর শান্তরস জৈসে॥
পারবতী ভল অবসরু জানী।
গঈঁ সম্ভু পহঁ মাতু ভবানী॥ (ঐ, ১৩১)

—উপবিষ্ট মদনারি শিবের শোভা দেখিয়া মনে হয় যেন শান্তরস শরীর ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। জগন্মাতা পার্বতী সুঅবসর বুঝিয়া শিবের নিকট গমন করিলেন।

অর্ধাঙ্গিনী পার্বতীকে দেখিয়া শিব সাদরে তাঁহাকে বামাঙ্কে আসন প্রদান করিলেন। ঐ অবস্থায় পার্বতী সশ্রদ্ধভাবে শিবের নিকট আপনার মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিলেন—

জৌঁ মোপর প্রসন্ন সুখরাসী।
জানিয় সত্য মোহি নিজ দাসী॥
তৌ প্রভু হরহু মোর অজ্ঞানা।
কহি রঘুনাথ কথা বিধি নানা॥ (ঐ, ১৩২)

—হে আনন্দময়, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন, আমাকে যদি সত্যই আপনার দাসী মনে করেন, তবে, হে প্রভু, রাম-কথা বলিয়া আমার অজ্ঞান দূর করুন।

প্রভু জে মুনি পরমারথবাদী।
কহহিঁ রাম কহঁ ব্রহ্ম অনাদী॥
সেষ সারদা বেদ পুরানা।
সকল করহি রঘুপতি গুন গানা॥ (ঐ, ১৩২)

—পরমার্থদর্শী মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে অনাদি ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। শেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও পুরাণ প্রভৃতি সকলেই রঘুপতির গুণগান করেন।

তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী।
সাদর জপহু অনঙ্গঅরাতী॥
রামু সো অবধ নৃপতি সুত সোঈ।
কী অজ অগুন অলখগতি কোঈ॥ (ঐ, ১৩২)

—হে কামারি, আপনিও দেখি দিবানিশি সাদরে রামনাম জপ করেন। কিন্তু রাম কে ? অযোধ্যার রাজপুত্রই কি রাম, না জন্মরহিত, নির্গুণ ও মন-বুদ্ধির অগোচর কাহাকেও ঐ নামে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে ?

জৌঁ নৃপতনয় তো ব্রহ্ম কিমি
নারিবিরহ মতি ভোরি।

দেখি চরিত মহিমা সুনত
ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি ॥ (ঐ, ১৩২)

—যদি তিনি রাজপুত্র হন, তবে ব্রহ্ম কি করিয়া হন ? স্ত্রীবিরহে তো তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ও মহিমা দেখিয়া শুনিয়া আমার বুদ্ধি অত্যন্ত সংশয়াকুল হইয়াছে।

জৌ অনীহ ব্যাপক বিভু কোউ।
কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোউ ॥
অজ্ঞ জানি রিস উর জনি ধরহূ।
জেহি বিধি মোহ মিটই সোই করহূ ॥
(ঐ, ১৩৩)

—যদি ইচ্ছারহিত সর্বব্যাপী অপর কোন ব্রহ্ম থাকেন, তবে হে নাথ, তাহা আমায় বুঝাইয়া বলুন। অজ্ঞ জানিয়া আমার উপর রুষ্ট হইবেন না—যাহাতে আমার মোহ মিটিয়া যায়, দয়া করিয়া তাহাই করুন।

তুম্হ ত্রিভুবনগুরু বেদ বখানা।
আন জীব পাবঁর কা জানা ॥
প্রশ্ন উমা কে সহজ সুহাঈ।
ছলবিহীন সুনি সিবমন ভাঈ ॥ (ঐ, ১৩৫)

—শ্রুতি বলেন, আপনি ত্রিভুবনের গুরু, মূর্খ জীব আপনার মহিমা কি জানে ? উমার সরল, সুন্দর ও ছলহীন প্রশ্নে শিব প্রসন্ন হইলেন।

হরহিয় রামচরিত সব আয়ে।
প্রেম পুলক লোচন জল ছায়ে ॥
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আবা।
পরমানন্দ অমিত সুখ পাবা ॥ (ঐ, ১৩৫)

—(উমার প্রশ্নে) সমগ্র রামচরিত্র মহাদেবের স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাঁহার শরীরে প্রেমজনিত রোমাঞ্চ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। হৃদয়ে শ্রীরঘুনাথের আনন্দময় মূর্তির আবির্ভাবে তিনি অপরিমিত সুখ পাইলেন।

মগন ধ্যানরস দণ্ড জুগ
পুনি মন বাহের কীন্হ।
রঘুপতি চরিত মহেস তব
হরষিত বরনই লীন্হ ॥ (ঐ, ১৩৫)

—শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানজনিত রসাস্বাদনে মহেশ্বর দুই দণ্ড মগ্ন রহিলেন, পরে মনকে রাম-ধ্যান হইতে বিরত করিয়া প্রসন্নচিত্তে রামচরিত কীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রিয়তমা অর্ধাঙ্গিনী উমার সরল ও কল্যাণকর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-কীর্তনে প্রবৃত্ত মহাদেবের মুখ দিয়া এইবার তুলসীদাস—অন্ততঃ হিন্দীভাষী নিরক্ষর সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য-রূপে—বেদান্তের বহুশ্রুত তত্ত্বামৃত পরিবেশন শুরু করিতেছেন :

ঝুঠেউ সত্য জাহি বিনু জানে।
জিমি ভুজঙ্গ বিনু রজু পহিচানে ॥
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ।
জাগে জথা সপনভ্রম জাঈ ॥ (ঐ, ১৩৬)

—রজ্জু জ্ঞানের অভাবে যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তেমনি যাঁহাকে না জানিলে মিথ্যা, সত্য বলিয়া মনে হয় এবং জাগিয়া উঠিলে দৃষ্ট স্বপ্ন যেমন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, তেমনি যাঁহাকে জানিলে জগতের সত্যত্ববুদ্ধি দূর হয়—তিনিই রাম

তুলসীদাস এখানে অদ্বৈতবেদান্তের তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন এবং ঐ তত্ত্ব তাঁহার লেখনী-মুখে বড়ই উপভোগ্য, বড়ই সারল্য-সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। ব্রহ্ম ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য। কাল-কৃত, দেশ-কৃত ও বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদ তাঁহাতে নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই তাঁহার সত্তার অভাব হয় না। তদ্রূপ দেশের দ্বারা বা কোনও বস্তুর দ্বারা তিনি পরিচ্ছিন্ন নন। দৃশ্যমান জগৎ সেই এক-মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মবস্তুরই বিবর্ত। আমাদের মনে অজ্ঞান আছে বলিয়াই ব্রহ্মে আমরা জগদ্বুদ্ধি করিতেছি। শংকরাচার্য তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ

'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন—

অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা
বিবেকাভাবাদ্ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।
(১৩৮)

—অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্নদৃষ্টি ব্যক্তিরই 'যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা' বলিয়া ভ্রম হয়; বিবেকের অভাবেই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়।

আবার জ্ঞানোদয়ে, অজ্ঞান এবং তজ্জনিত ভ্রমাপনয়নের কথাও আচার্য শংকর উক্ত গ্রন্থেই সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সহমূলং বিনশ্যতি।
(১৯৯)

—জাগিয়া উঠিলে স্বপ্ন যেমন মিলাইয়া যায়, ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলেও তদ্রূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যারূপ মূলসহ সমগ্র জগৎ অপসৃত হয়।

কিন্তু ভ্রমের কারণ এই অজ্ঞান বা অবিদ্যা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরই দৃষ্টি আবৃত করে, ব্রহ্মকে প্রকৃতপক্ষে আবৃত করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ স্মরণীয়: বিষধর সর্পের ভয়ংকর বিষে সর্পের নিজের কোন হানি হয় না, কিন্তু সর্পদষ্ট হইলে আমাদের প্রাণসংশয় হয়। তুলসীদাস বিশ্বাস করেন, শ্রীভগবান সংসারস্থিতি ও মানবকল্যাণেচ্ছায় স্বমায়াবলম্বনে নরদেহে অবতীর্ণ হইলেও কখনও মোহগ্রস্ত হন না। তাই পার্বতীর উল্লিখিত আশঙ্কার—'স্ত্রীবিরহে তো শ্রীরামচন্দ্রের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, অতএব তাঁহাকে কেমন করিয়া ব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করি'—উত্তরে শিবের মুখ দিয়া তিনি বলিতেছেন:

নিজ ভ্রম নহিঁ সমুঝহিঁ অজ্ঞানী।
প্রভু পর মোহ ধরহিঁ জড় প্রাণী ॥
জথা গগন ঘনপটল নিহারী।
ঝাঁপেউ ভানু কহহিঁ কুবিচারী ॥
(ঐ, ১৪১)

—অজ্ঞানী মানুষ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে না—বরং ভাবে শ্রীভগবান মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। যেমন আকাশে মেঘসমূহ দেখিয়া অবুঝ ব্যক্তি মনে করে মেঘ সূর্যকে আবৃত করিয়াছে

অদ্বৈতবেদান্তমতে অজ্ঞানের দুইটি শক্তি—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ 'বেদান্তসার' বলেন: 'আবরণশক্তিঃ তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেকযোজনায়তম্ আদিত্যমণ্ডলম্ অবলোকয়িতৃ-নয়নপথপিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানম্ অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণম্ অব-লোকয়িতৃ-বুদ্ধি-পিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্।' অর্থাৎ, যেমন অল্প মেঘ দর্শক-দৃষ্টি আচ্ছাদন দ্বারা অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্য-মণ্ডলকেই যেন আচ্ছাদিত করে, তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন বা সীমিত অজ্ঞান অজ্ঞপুরুষের দৃষ্টি আচ্ছাদিত করিয়া অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকেই যেন আবৃত করে—অজ্ঞানের এতাদৃশ সামর্থ্যকেই আবরণশক্তি বলা হয়।

অদ্বৈতবেদান্ত আরও বলেন যে, ব্রহ্মের শক্তি মায়া বা অবিদ্যা অনাদি ও ত্রিগুণাত্মিকা। মায়ার পারমার্থিক সত্তা নাই—ব্রহ্মের সত্তাতেই মায়ার এবং মায়ার কার্য জগতের সত্তা। আচার্য শংকর 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন:

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া
যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে ॥ (১০৮)

অর্থাৎ, কারণস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা অনাদি অবিদ্যা বা মায়াই পরমেশ্বরের শক্তি। ইহাকে অব্যক্তও বলা হয়। জগদ্রূপ কার্যদর্শনে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা মায়া অনুমিত হয়, যাহা দ্বারা এই দৃশ্যমান্ জগৎ উৎপন্ন হয়।

মায়া এবং মায়ার কার্য জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে শংকরাচার্য 'বিবেকচূড়ামণি'তে বলিয়াছেন:

মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদিদেহপর্যন্তম্ ।
অসদিদমনাত্মতত্ত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্ ॥

(১২৩)

অর্থাৎ, মায়া এবং মহৎ-তত্ত্ব হইতে স্থূলদেহ পর্যন্ত মায়ার সকল কার্যই অসৎ (মিথ্যা)। অনাত্মবস্তুকে তুমি মরুভূমিতে জলভ্রমের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জান।

অদ্বৈতবেদান্তের এই তত্ত্বকে তুলসীদাস এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন :

জগত প্রকাস্য প্রকাসক রামূ ।
মায়াধীস জ্ঞান গুণ ধামূ ॥
জাসু সত্যতা তেঁ জড় মায়া ।
ভাস সত্য ইব মোহসহায়া ॥

(বালকাণ্ড, ১৪১)

—জগৎ প্রকাশ্য অর্থাৎ দৃশ্য এবং রাম জগতের প্রকাশক। তিনি মায়াধীশ এবং জ্ঞান ও গুণের আধার। জড় মায়া তাঁহারই সত্তায় মোহের সাহায্যে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে। অর্থাৎ, মায়া এবং মায়ার কার্য জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, তুলসীদাস ইহাই বলিতেছেন।

যাহার উপর কিছু আরোপিত হয় তাহাকে অধিষ্ঠান এবং যাহা আরোপিত হয় তাহাকে অধ্যস্ত বলে। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানই সত্য অর্থাৎ পারমার্থিক—জগৎ তাঁহাতে আরোপিত, অধ্যস্ত মাত্র। যাহা কোন অধিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়, তাহার প্রতীতি হইলেও তাহা সত্য নয়। এই তত্ত্ব তুলসীদাস বেদান্তদর্শনে বহু-উক্ত দৃষ্টান্ত-সহায়ে এইপ্রকার বলিয়াছেন :

রজত সীপ মহুঁ ভাস জিমি
জথা ভানু কর বারি ।
জদপি মৃষা তিহুঁ কাল সোই
ভ্রম ন সকই কোও টারি ॥ (ঐ, ১৪১)

—শুক্তিতে (ঝিনুক) রজতের প্রতীতি হইলেও অথবা সূর্যকিরণে জলের প্রতীতি হইলেও—উহারা তিনকালেই মিথ্যা। কিন্তু তথাপি এই ভ্রম কেহ দূর করিতে পারে না।

তুলসীদাস আরও বলিতেছেন :

এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ ।
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ ॥
জৌঁ সপনেঁ সির কাটই কোঈ ।
বিনু জাগে ন দূরি দুখ হোঈ ॥ (ঐ, ১৪২)

—এইভাবেই (অর্থাৎ উল্লিখিত শুক্তি-রজতাদি দৃষ্টান্তের মত) শ্রীহরির আশ্রিত থাকিয়া জগৎ, মিথ্যা হইলেও (জীবের) দুঃখের কারণ হয়। যেমন স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে, জাগিয়া না উঠা পর্যন্ত সেই (মাথাকাটার) দুঃখ দূর হয় না।

ভগবৎ-কৃপাতেই এই সর্বজন-অনুভূত ভ্রমের অপনয়ন সম্ভব—বেদান্তানুমোদিত এই তত্ত্ব তুলসীদাস শিবমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে পারি :

জাসু কৃপা অস ভ্রম মিটি জাঈ ।
গিরিজা সোই কৃপালু রঘুরাঈ ॥
আদি অন্ত কোউ জাসু ন পাবা ।...

(ঐ, ১৪২)

—হে গিরিজে, যাঁহার কৃপায় এই ভ্রম মিটিয়া যায়, তিনিই দয়ালু শ্রীরাম। কেহ তাঁহার আদি অন্ত পায় না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি কি সন্ন্যাসী—প্রভু,
শুধুই বৈরাগী ?
সংসারের প্রীতি অনুরাগ
কিছু কি স্পর্শে না তোমা ?
সন্ন্যাসীর বিশীর্ণ বল্কল, পূর্ণরূপে
পারে না ধরিতে তোমা।
বৈরাগ্য, আসক্তি তথা গ্রহণ বর্জন
সমভাবে অর্থহীন তোমা কাছে।
তবু অহরহ
ধরিত্রীর প্রতি প্রান্ত হ'তে
সংসার-বিরাগী কত ধনীর দুলাল
তব আকর্ষণে,
তোমারে সঁপিয়া মন প্রাণ
দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে
গৃহ ছাড়ে কেন ?
সন্ন্যাসী ধেয়ানে ধরে গৃহীর চরণ
এও কি সম্ভব ?
জানি জানি তুমি পূর্ণ এক।
তোমারি সত্তায়
প্রেম ও বৈরাগ্য তথা গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস
একসূত্রে ভিন্ন মণিরূপে
গাঁথা আছে।
যে যেমন ভাবে দেখে
সে তেমন পায় পরিচয়।
ভিন্নভাবে ভিন্নজনে
ভিন্নরূপে প্রকাশে তোমারে।

তুমি জ্ঞানী, তুমি প্রেমী
পরম তাপস তুমি
পরিগ্রহহীন কঠোর সন্ন্যাসী
বিবাগী বাউল।
বহুরূপে কর লীলা
তুমি সেই অখণ্ড একক
ভাবাতীত রূপাতীত
সর্বভাব-সর্বরূপময়।
ত্যাগ, ভোগ, সন্ন্যাস, সংসার—
এ সবের পারে তুমি।
তবু তারই মাঝে অনুক্ষণ
একমাত্র তুমি উদ্ভাসিত।
সন্ন্যাসী সংসারী পূজে সমান শ্রদ্ধায়
তোমার চিন্ময় রূপ
একই মন্ত্রে।

পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার তুমি রামকৃষ্ণ
নরাকারে নিরাকার।
খণ্ডরূপে যেবা ভাবে
তোমার বিরাট সত্তা,
সে তোমারে পারেনি জানিতে।

মোর কাছে—তুমি পিতা
মাতা মোর—বাণীরূপা সরস্বতী
পরমা প্রকৃতি
জগন্মাতা শ্রীসারদামণি।

রামমোহনের ব্যক্তিত্বঃ সাংবাদিক ও লেখক

ডক্টর উজ্জ্বলকুমার মজুমদার*

পাণ্ডিত্য ও মানসিক প্রসার—এই দুটি গুণ মানুষের মধ্যে সব সময় সহাবস্থান করে না। মানসিক প্রসার না থাকলে পাণ্ডিত্য সময়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রামমোহন যে 'চিন্তা-নায়ক' তার কারণ তাঁর পাণ্ডিত্য দেশের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের, ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্-নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। রামমোহন সমস্ত রকম মতামত ও আলোচনার জন্যে যে চারটি পথ নিয়েছিলেন (বিদ্যালয়স্থাপন, সভাসমিতি ডাকা, কথোপকথন ও আলোচনা এবং বই ও পত্রিকা প্রকাশ) তার মধ্যে সংবাদপত্রপ্রকাশ ছিল জনমত সংগঠনের অন্যতম উপায়। রামমোহনের বয়স যখন সাত-আট বছর সেই সময় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে যে সংবাদপত্র ভারতে প্রথম বেরোয় তা ওয়ারেন হেস্টিংসের মামলার জোরে বন্ধ হয়ে যায় দশ-মাসের মধ্যেই। তারপর ১৭৯১ সালে উইলিয়াম ডুয়ান (Duane) নামে এক সাংবাদিকের Bengal Journal-এ আপত্তিকর অনুচ্ছেদ লেখার জন্যে প্রথমে জেল হয় ও পরে তাঁকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 'এশিয়াটিক মিরর'-এর সম্পাদক ডঃ ব্রাইম বার বার সেন্সরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পাঠান। ১৮২৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা জার্নালের জেম্স্ বাকিংহামের লাইসেন্স্ কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে দুমাসের মধ্যে ভারত-ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজেই রামমোহনের সমকালেই সাংবাদিকতার ওপর শাসক-গোষ্ঠীর কড়া নজর পড়তে থাকে।

ব্রিটিশ শাসনের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ প্রবণতার কথা ভেবে রামমোহন শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে সচেতনতা আর সতর্কতা আনবার জন্যেই সংবাদপত্র প্রকাশে মন দেন। পত্রিকাগুলির নাম 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন'-ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১ সেপ্টেম্বর), সংবাদ কৌমুদী (১৮২১ ডিসেম্বর) এবং মিরাৎ-উল-আখবার (১৮২২ এপ্রিল), প্রথমটি ইংরেজী, দ্বিতীয়টি বাংলা এবং শেষেরটি ফারসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোকের স্থাপিত ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসেবে সংবাদ কৌমুদীই প্রথম। উদ্দেশ্য ছিল জনকল্যাণ। শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক—সব রকম বিষয়েই তাঁর সংবাদপত্রে আলোচনা থাকতো। কিন্তু রামমোহন জানতেন, শিক্ষিত ভারতবাসীকে এখন থেকে ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম করে যেতে হবে। বাকিংহামের ভারত-ত্যাগের পনের দিনের মধ্যে সরকারের মুখ্যসচিব সরকারী গেজেটে সংবাদপত্র বিষয়ক আইনের একটি খসড়া প্রকাশ করলেন। তাতে সংবাদপত্রের জন্যে লাইসেন্স্ নেবার কথা বলা হলো। আইনটি তখন সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের অপেক্ষায়। এই আইনের বিরুদ্ধে যে শাসনতান্ত্রিক সংগ্রাম

---

* কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রীডার। 'বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব', 'রবীন্দ্র-অন্বেষা', 'রবীন্দ্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। বিশিষ্ট প্রবন্ধকার ও সমালোচক। বর্তমান লেখাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামমোহন ফাউণ্ডেশন বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা।

শুরু হয় (রমেশচন্দ্র দত্তের মতে এই আবেদনই Constitutional agitation-এর বা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা করে) তাতে দেখা যায় ছজন দেশপ্রেমিক বাঙালী সই করে কর্তৃপক্ষের কাছে একটি দাবি পেশ করেন। স্বাক্ষরকারীরা হলেন চন্দ্রকুমার ঘোষ, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যাই হোক, দাবিটি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে এবং রাজার কাছে অগ্রাহ্য হয়ে ফিরে আসে। এই দাবিটি রামমোহনের পুত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রামমোহনেরই খসড়া করা এবং দাবির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব ছিল, সংবাদপত্রের অভাবে ব্রিটিশ শাসন এবং আইনে অভিজ্ঞ যে নেটিভ সম্প্রদায় তারা দেশীয় অন্য লোকেদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের ভালো দিকগুলো বুঝিয়ে বলবার উপায় খুঁজে পাবে না। এবং সরকার পক্ষে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি হবে সে সব সম্পর্কে দেশীয় মানুষের অভিযোগ রাজা বা কাউনসিলের কাছেও পৌছাবে না। সরকারের উচিত সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার খাতিরে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু দিয়ে দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কাজেই মূল কথা হলো, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, প্রায় একশো বছর বাদে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের পুলিশী তাণ্ডবের বিরুদ্ধে লর্ড চেমসফোর্ডকে যে কণ্ঠরোধ বা 'gagged silence'-এর কথা বলেছিলেন সেই কণ্ঠরোধের আশঙ্কাই রামমোহন করেছিলেন ওই দাবিতে, যাতে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথেরও স্বাক্ষর ছিল। রামমোহনের দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল, শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজখবর নেবার জন্যে মাঝে মাঝে কমিশন নিযুক্ত করা। অবশ্য তাঁর মতে এই শ্রমসাধ্য কাজটির চেয়ে স্বাধীন সংবাদপত্রই সহজে দেশীয় শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ফুটিয়ে তুলতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট এই দাবি অগ্রাহ্য করলে রাজার কাছে আবেদন পাঠান। তাতে রামমোহন চেয়েছিলেন কোনো আইন পাশ করার আগে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হোক। প্রচলিত আইনে আভ্যন্তরীণ রাজকর্মচারীরা তখন নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করতে পারতেন। এই সুপারিশগুলি সপারিষদ বড়লাট বিবেচনা করতেন এবং তাঁরা অনুমোদন করলে সেইভাবে আইন পাশ হতো। রামমোহন বললেন, শুধু রাজকর্মচারীরা নয়, সমাজের ধীশক্তিসম্পন্ন ও বিত্তশালী ব্যক্তিদেরও এ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার দেওয়া হোক। আরও বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি, রামমোহন মনে করতেন, আইনের সঙ্গে শুধু ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও রাজকর্মচারীদের স্বার্থই বিজড়িত। অতি সাধারণ ব্যক্তির জীবনের সঙ্গেও যে আইনের সম্পর্ক আছে এবং প্রত্যেক বয়স্ক ও সুস্থ ব্যক্তির যে আইন প্রণয়নে অংশ নেবার অধিকার থাকা উচিত এ ধারণা তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রেই গৃহীত হয় নি। বেন্থামের মতো কেউ কেউ সাধারণের ভোটাধিকারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আদর্শকে ইউটোপিয়ান বলা হতো। রামমোহন এই ইউটোপিয়ান আদর্শে বিশ্বাস করতেন না এবং সেইজন্যে তখনকার অবস্থায় পূর্ণ গণতন্ত্রের কথা ভাবতেও পারতেন না। সাধারণ ভারতবাসীর শিক্ষার মান সম্পর্কে তিনি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন। কোন দেশের বিত্তশালী বুদ্ধিমান অভিজাত সম্প্রদায়ই প্রস্তাবিত আইনের সমালোচনা করতে পারবেন এই কথা বলে রামমোহন অভিজাততন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর দেশপ্রেম ছিল তাঁর এবং জনমতের অভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সজ্ঞান ছিলেন। তখনকার কালে আইনসভার দাবি করা তাঁর কাছে

অর্থহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহন এটুকু বুঝেছিলেন যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আলোচনার স্বাধীনতা দিলে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই। বোর্ড অব ডিরেক্টররা ভেবেছিলেন কাগজে শাসনব্যবস্থার সমালোচনা হলে জনসাধারণের আস্থা হারাবার আশঙ্কা। তাঁরা আরও বলেছিলেন, সংবাদপত্র জনশিক্ষার উপযুক্ত বাহনই নয়। প্রেসরেগুলেশন কার্যকর হলে (১৮২৩) রামমোহন বুঝিয়েছিলেন স্থানীয় ভাষায় যে চারটি সংবাদপত্র আছে তার সবকটিতেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের খোলাখুলি আলোচনা থাকায় ইতিমধ্যে কিছুটা স্বাস্থ্যকর জনমত গঠিত হয়েছে এবং দেশের সাধারণ অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। উদ্দেশ্য সাধু হলে কোনো সরকারই সংবাদপত্রের সমালোচনাকে ভয় পায় না। রামমোহনের এই বক্তব্য তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পরেও ঘটনাচক্রে আমাদের বিবেকে হানা দিয়েছে বার বার— যাই হোক, আগেই বলেছি, দেশের শীর্ষস্থানীয়দের মতামত গ্রহণের যে সামান্য দাবিটুকু রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি করেছিলেন তা অন্যান্য দাবির সঙ্গেই অগ্রাহ্য হয়েছিল। জনসাধারণ পর্যন্ত এগোতে না পারলেও ব্যক্তিগত চারিত্রিক আভিজাত্য-প্রবণতায় রামমোহন অন্ততঃ নিজের শ্রেণীভুক্ত দেশীয় মানুষের শাসনতান্ত্রিক অধিকার-দানের কথা ভেবেছিলেন। মনের গভীরে সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতিচিন্তা থেকে গিয়েছিল। 'মিরাৎ-উল-আখবারে'ই রামমোহন আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষে relief fund (সাহায্য ভাণ্ডার) খুলে জন-সেবার মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ করতে গেলে লাইসেন্স নিতে হবে এই নিয়ম প্রবর্তিত হলে মিরাৎ-উল-আখবার প্রকাশ বন্ধ করে দিয়ে রামমোহন যা লিখেছিলেন তা একদিকে যেমন তীব্র বিদ্রূপে পূর্ণ তেমনি অন্যদিকে সংযত অভিমানে বিষণ্ণ ও গম্ভীর। বক্তব্যের সারাংশ বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায় :

'প্রধান সেক্রেটারীর সঙ্গে যে-সব ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে তাঁদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হলেও আমার মতো সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দরোয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যদের মাধ্যমে এইরকম উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তির কাছে যাওয়া খুবই দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায়, যা নিষ্প্রয়োজন সেই কাজের জন্যে নানাজাতীয় লোকে ভরতি পুলিস আদালতের দরোজা পার হওয়া কঠিন। কথায় আছে [ফারসি বয়েৎ উদ্ধৃত করে বলেছেন]: যে সম্মান হৃদয়ের শেষ রক্ত-বিন্দুর বিনিময়ে কেনা, কোনো অনুগ্রহের আশায় সে সম্মান দরোয়ানের কাছে বিক্রি করোনা।'

এর পর নিজেকে সংযত করে তিক্ত অভিমান-ভরে বলেছেন :

'...মানুষ মাত্রেই ভুল করে। সত্যি কথা বলতে গিয়ে হয়তো এমন ভাষা প্রয়োগ করতে হবে যা সরকারের কাছে অপ্রীতিকর হতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করছি। [হাফিজের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন]: হাফিজ! তুমি কোণঠাসা ভিখিরি ছাড়া কিছু নও। চুপ করে থাকো। নিজেদের রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব রাজারাই জানেন।' [ক্রমশঃ]

যীশুজননী মেরী

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

এক

খ্রীষ্টধর্মানুসারী সমাজে, বিশেষত রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যীশুজননী মেরী ভাগবতী (Divine) মাতা রূপে পূজা পেয়ে আসছেন। খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বর পরমপিতা, যীশু ঈশ্বরপুত্র—একেশ্বরবাদে দেবদেবীর স্থান নেই। খ্রীষ্টান সাধক বা ভক্তের কল্পনায় ঈশ্বর দয়াবান, মঙ্গলময়—ঈশতনয়ও পরমকারুণিক। কিন্তু অনন্ত করুণা অপার স্নেহের উৎসার যে মাতৃরূপা আবির্ভূতি, সেই পরমা শরণ্যার কাছে হৃদয়ের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা, জীবনের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা মর্মবেদনা, যত সন্তাপ যত হুতাশ সঁপে দেওয়ার জন্য যে আকুলতা মানুষের স্বভাবে মিশে আছে, ভক্ত খ্রীষ্টান ভাগবতী জননী মেরীর মধ্যে তার সাড়া পেয়েছেন।

হয়তো মাতার প্রেমসুকোমল হৃদয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে স্নেহের নির্ঝরধারায় নিয়ত নিষ্ণাত হবার প্রত্যাশা সংযুক্ত ছিল বলেই ইউরোপের জনসমাজ সাগ্রহে সাদরে যীশুর ধর্মকে বরণ করেছিল। রোমসম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের কাল থেকে শুরু করে কয়েকশো বছরের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম সারা ইউরোপে প্রসারিত হয়ে সমাজ-সংস্কৃতির সর্বস্তরে প্রাণসঞ্চার করেছিল। বাৎসল্যরসপ্রেরণা ইউরোপের ভাবজীবনে কত গভীরভাবে প্রবিষ্ট হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপের সাহিত্য, স্তবগীতি, ভাস্কর্য, বিশেষত চিত্রকলা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। রাফায়েল থেকে শুরু করে ছোটো বড়ো অখ্যাত অজ্ঞাত কত চিত্রশিল্পী ম্যাডোনার স্নেহময়ী দিব্যমানবীমূর্তি সজীব করে তুলে প্রাণবন্ত এক ঐতিহ্যকেই রূপায়িত করে তুলেছেন!

ম্যাডোনার কল্পনা বিশেষভাবে খ্রীষ্টান ধর্মসাধনা বা সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ হলেও ভারতের মাতৃভাবাশ্রিত শক্তি-সাধনায়, বিশেষত বাংলায়—রামপ্রসাদে উদ্ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণে পরিপুষ্ট পরিপূর্ণ—সন্তানের ভূমিকা থেকে বিশ্বমাতৃকার স্নেহলালনে সঞ্জীবিত অধ্যাত্মসাধনার যে সংস্কার ভক্তহৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে, তা, মনে হয়, এই মাতৃভাবনার রসগভীরতা মাতৃধ্যানের বিমলানন্দ উপলব্ধি করার পক্ষে অনেক বেশি উপযোগী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, ভারতের ধর্মভাবনায় ম্যাডোনার ঠিক অনুরূপ কল্পনা নেই। ভক্তবৎসলা জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী দেবী মহেশানী সাধকের পরম আশ্রয়; কিন্তু তাঁর গণেশজননী মূর্তি বাৎসল্যভাবের পরিপোষক হলেও যীশু-মাতৃকার রসস্বাদ গাঢ়তর। ভারতীয় ধর্মভাবনায় বা রসকল্পনায় বাৎসল্যের চরমতম দৃষ্টান্ত গোপালময়ী নন্দরানীই কেবল এদিক থেকে ম্যাডোনার সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত-গ্রন্থে, বিশেষত লোক-ভাষায় বিরচিত কৃষ্ণগাথায় বা কীর্তনগানে বাল-গোপালের বিচিত্র লীলামাধুর্যের সহচারী বাৎসল্য-রস অবশ্যই আমাদের কাছে স্বাদুতর সমৃদ্ধতর বলে মনে হয়। কিন্তু যশোমতী ম্যাডোনার মতো অধ্যাত্মজীবনের আশ্রয় নন। কৌশল্যা বা শচী-দেবী সম্পর্কেও ঐ কথা বলা যায়। যুগপৎ স্নেহৈশ্বর্য আর অধ্যাত্মশক্তিতে গরীয়সী মানবী মা মেরীর সঙ্গে নারীরূপধরা একজনেরই কেবল তুলনা করা যায়—তিনি অগণিত-ভক্তকুলজননী অনন্ত স্নেহ অপার করুণার ঘনীভূত মূর্তি অধ্যাত্মশক্তি ও সাধনার উৎসস্বরূপা ও প্রেরয়িত্রী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী।

দুই

অবিশ্বাস্য হলেও একথা সত্য যে চার দিব্য-কথায় মা মেরীর অপরিসীম স্নেহমাধুর্য বা মহিমার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। যীশুর আবির্ভাবের বিবরণের সূত্রে লুক-বর্ণিত দিব্যকথায় [লুক ১] তাঁর প্রসঙ্গ তুলনায় একটু বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে; ম্যাথিউ-বর্ণিত কথায় [ম্যাথিউ ১] তাঁর প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্ততর। কথাচতুষ্টয়ে এ ছাড়া অন্য দুচার জায়গায় যেন প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। তিনি ঈশতনয় যীশুর জননী, এই মাত্র তাঁর পরিচয়—পরমেশ্বর তাঁকেই যে নির্বাচন করেছেন এতেই তাঁর গৌরব; এ ছাড়া তাঁর স্বকীয় কোনো মহিমা যে আছে এ যেন মনেই হয় না।

ম্যাথিউ আর লুক দুজনেই মা মেরীর গর্ভে যীশুর অপৌরুষেয় আবির্ভাবের কথা বলেছেন। এ কাহিনী অবশ্যই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত; রূপকযোগে তত্ত্বসংকেত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তর্ক বা বিচারের প্রয়াস নিতান্তই নিষ্ফল।

দিব্যকথাদুটির বর্ণনা অনুসারে গ্যালিলি প্রদেশের ন্যাজারেথ নগরীর মেরী নামে এক কুমারী ডেভিডের এক বংশধর যোশেফের বাগ্‌দত্তা। ঈশদূত গ্যাব্রিয়েল একদিন মেরীর কাছে এসে বললেন, 'অহো! রূপাধন্য তুমি! প্রভু তোমায় অবস্থিত।'

দেবদূতের এ কথায় কুমারী স্বভাবতই শঙ্কাতুর চিত্তে এই বিচিত্র সম্ভাষণের তাৎপর্য কী তা ভেবে আকুল হচ্ছিলেন। দেবদূত তখন বললেন, 'ভয় কোরো না মেরী, কেননা পরমেশ্বর তোমাকে কৃপা করেছেন। তোমার গর্ভে আসবে এক সন্তান, যীশু নামে ডাকবে তাঁকে। সুমহান হবেন তিনি—পরমপুরুষের সন্তান বলে অভিহিত হবেন। পরমেশ্বর তাঁকে তাঁর পিতৃপুরুষ ডেভিডের সিংহাসনে বসাবেন—চিরকাল তিনি জেকবের পরিবার-পরিজনের অধীশ্বর হবেন, তাঁর রাজ্যের পরিসরের সীমাপরিসীমা থাকবে না।'

মেরী বললেন, 'কী করে হবে তা! আমার তো কোনো পুরুষের সঙ্গে সংস্রব নেই।'

দেবদূত বললেন, পূতাত্মা তোমায় উপনীত হবেন, পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে আবিষ্ট করবে। যিনি জাত হবেন, তাঁর আখ্যা হবে সুপবিত্র, ঈশতনয়। অবধান করো—তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথের গর্ভে এক পুত্র এসেছে। যাঁকে, সবাই বন্ধ্যা বলে জানত তিনি এখন ছমাস গর্ভিণী। ঐশী বাণী নিঃশক্তি হয় না।'

মেরী বললেন, 'অবহিত হোন—আমি প্রভুর পরিষেবিকা। আপনার কথানুসারে আমার যা হবার হোক।'

দেবদূত চলে গেলেন। মেরী ত্বরান্বিত হয়ে এক পাহাড়িয়া নগরের অভিমুখে চললেন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জ্যাকারিয়ার গৃহে প্রবেশ করে এলিজাবেথকে ডাকলেন। এলিজাবেথের গর্ভের শিশু যেন লাফিয়ে উঠে সাড়া দিল।—তারপর মেরী আর এলিজাবেথ দুজনে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেছেন।

জ্যাকারিয়া আর এলিজাবেথ প্রৌঢ় বয়স পর্যন্ত নিঃসন্তানই ছিলেন। পৌরোহিত্যের পালা অনুসারে জ্যাকারিয়া যখন জেরুজালেমে জিহোভার গর্ভ-মন্দিরে একাকী প্রবেশ করে সুগন্ধি ধূপাদি দিয়ে শ্রীভগবানের অর্চনা করছিলেন, তখন ঈশদূত গ্যাব্রিয়েল গর্ভমন্দিরেই আবির্ভূত হয়ে ঐশ অনুগ্রহে তাঁর সন্তানলাভের কথা জ্ঞাপন করেছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ধর্মপ্রাণ এই দম্পতীর দেবানুগ্রহজাত সন্তানই দীক্ষাদাতা জন, যিনি যীশুর পূর্বগামী, তাঁর দীক্ষাগুরুও।

মেরী এলিজাবেথের গৃহে মাস তিনেক ছিলেন। তারপর পিতৃগৃহে ফিরে গেছেন। বিশেষভাবে কোথাও উল্লেখ করা না হলেও, মনে হয়, এই সময়ই যোশেফের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

যোশেফ যখন জেনেছেন যে তাঁর বধূ সসত্ত্বা, তিনি গোপনে তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। —অধর্মাচরণ বা কলঙ্করটনা কোনোটাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য এক ঈশদূত স্বপ্নযোগে এসেছেন। বলেছেন যে তিনি যেন নিঃশঙ্ক হয়ে মেরীকে গ্রহণ করেন, কেননা তিনি পূতাত্মায় অন্তর্বত্নী। যে পুত্র জাত হবেন, যীশু নামে অভিহিত হয়ে তিনি জগজ্জনের পাপহরণ করবেন। দেবদূত যোশেফকে এই অলৌকিক আবির্ভবনের প্রামাণ্য শাস্ত্রবাণীও শুনিয়েছেন।

তিন

এই অপ্রাকৃত কাহিনীর অবতারণার উদ্দেশ্য অবশ্যই যীশুর ভাগবতী সত্তা প্রতিপাদন। ভারতে অবতারপুরুষ বা অন্য মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্বগামী বা সহগামী অলৌকিক ঘটনাদির বর্ণনা থাকলেও জননীর নিষ্কলুষত্ব প্রতিপাদন করার কোনো প্রয়াসই করা হয়নি। কেনন: ভারতীয় ভাবদৃষ্টিতে মা—মা। সন্তানের কাছে জননী স্নেহ-স্বরূপা পূতমূর্তি, তাঁর প্রসঙ্গে অন্য কোনো চিন্তাই আসে না।

কিন্তু ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মচিন্তা বাইবেল-কথিত আদিম পাপ সম্পর্কে অতিসচেতন। সুতরাং যীশু যে অপাপসম্ভব শুদ্ধসত্ত্ব ঈশতনয় এ তত্ত্বটি প্রতিপাদন করবার জন্য, মনে হয় পরবর্তী কালে, মা মেরীর পাপসংস্পর্শহীন গর্ভধারণ কল্পিত হয়েছে। মা মেরীর, এমনকি যোশেফেরও 'নিষ্পাপতা' প্রতি-পাদনে কোনো কোনো খ্রীষ্টান শাস্ত্রব্যাখ্যাতা কতদূর উদ্যোগী ছিলেন একটি উদ্ধৃতি থেকে তার আভাস পাওয়া যাবে।—

"To Jerome the perpetual virginity not only of Mary but even of Joseph appeared of so much consequence that while a young man he wrote (387) the long and vehement tract Against Helvedius, in which he was the first to broach the theory (which has gained wide currency) that the brethren of our Lord were children neither of Mary by her husband, nor by Joseph by a former marriage but of another Mary, sister of the Virgin and wife of Clopas or Alphæus."

[Encyclopædia Britannica (9th Edition/1883) Vol. XV, Page 590—'Mary']

ভাবার্থ :—জেরোমের কাছে কেবল মেরীর নয়, যোশেফেরও অটুট ব্রহ্মচর্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে (৩৮৭ খ্রীঃ) তিনি 'হেলভেডিউসের বিরুদ্ধে' নামে একটি সুদীর্ঘ তীব্র প্রতিবাদাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনিই প্রথম এই তত্ত্ব (পরে যেটি বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল) উপস্থাপনা করেন যে বাইবেলে কথিত প্রভুর ভ্রাতৃমণ্ডলী স্বামীর সহযোগে মেরীর সন্তান তো নয়ই, এমনকি যোশেফের পূর্ববিবাহের সন্তানও নয়। তারা কৌমারীর ভগিনী অপর এক মেরীর সন্তান; ইনি ক্লোপাস বা অ্যালফিউসের পত্নী।

চার

ম্যাথিউ আর মার্ক এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর উল্লেখ করেছেন বটে [ম্যাথিউ ১২, মার্ক ৩], কিন্তু বিস্তৃত পরিচয় দেননি। ভ্রাতৃমণ্ডলী এমনকি জননীর জন্যও যীশুর যে কোনো আগ্রহ বা আকর্ষণ ছিল, দিব্যকথার বর্ণনা থেকে তা অনুভব করা যায় না। বরং যেন একটু প্রতিকূল মনোভাবের আভাস আমাদের একটু আঘাতই করে।

বর্ণনাটি এই রকম।—যীশু জনসমাজে ভাগবত

প্রসঙ্গে উপদেশাদি দিচ্ছেন। এমন সময় তাঁর মা আর ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সেখানে এলেন, কিন্তু এত ভিড় যে তাঁর কাছ পর্যন্ত যেতে পারলেন না, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কে একজন যীশুকে জানালেন যে তাঁর মা আর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

উত্তরে যীশু বললেন, 'কে আমার মা? কারা আমার ভাই?'

তারপর তাঁকে ঘিরে যারা বসেছিল তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখো, এরাই আমার মা, এরাই আমার ভাই। কেননা যে কেউ দিব্য-ধামস্থ আমার পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই আমার ভাই, আমার বোন, আমার মা।'

এই সূত্রে লুকের একটি বর্ণনা [লুক ১১] উল্লেখ করা যেতে পারে। যীশু যখন জনসমাজে উপদেশ দিচ্ছিলেন, জনমণ্ডলীর মধ্য থেকে এক মহিলা বলে উঠলেন, 'ধন্য সেই গর্ভ যা তোমাকে ধারণ করেছে। ধন্য সেই স্তনযুগল যার দুগ্ধ তুমি পান করেছ।'

যীশু কিন্তু বললেন, 'বরং বলো, ধন্য তারাই যারা শ্রীভগবানের বাণী শোনে আর শুনে তা পালন করে।'

'ভ্রাতৃমণ্ডলী' বা জননীর প্রতি যীশুর এই উপেক্ষা কেন? মা মেরী কি সন্তানের দিব্য বৈভব সম্পর্কে অচেতন? তা তো নয়! জনের একটি বর্ণনা [জন ২] থেকে জানা যায় যে তিনি তাঁর সন্তানের লোকাতীত শক্তির কথা জানেন, অথচ তখনও তাঁর অসামান্য বিভূতি লোকসমাজে ব্যক্তও হয়নি।

যীশুজননী গ্যালিলি প্রদেশের ক্যানা শহরে একটি বিবাহোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। যীশুও তাঁর কয়েকজন শিষ্যসমেত এই ভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।—পরিবেশন করতে করতে মদ ফুরিয়ে গেল। যীশুজননী যীশুকে বললেন, 'এদের আর মদ নেই।'

মাতার অভিপ্রায় তাঁর অজানা ছিল না। তিনি বললেন, 'নারী, তোমায় নিয়ে আমি কী যে করি! আমার লগ্ন যে এখনও আসেনি।'

মা মেরী চাকরবাকরদের বলে রাখলেন, 'ও যা বলবে, তাই করবে।'

যীশু চাকরদের ডেকে মদ চোলাই করবার জন্য যে ছটা পাথরের জলপাত্র ছিল তা জলে ভর্তি করতে বললেন। তারা পাত্রগুলো জল দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি করল

যীশু তখন বললেন, 'এবার পাত্রগুলোয় যা আছে তা ঢেলে ফেলে ভোজাধিকারিকের কাছে নিয়ে যাও।'

চাকররা তাঁর কথা অনুসারে কাজ করল। ভোজাধিকারিক উৎকৃষ্ট সুরায় পরিণত জল আস্বাদ করলেন। কোথা থেকে বা কী করে এই সুরা এল তা জানতে না পারলেও তিনি তাই দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়িত করলেন।

[ক্রমশঃ]

তোমারে করি শত নমস্কার

অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী

এই শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে যিনি 'দেবকন্যা'-রূপে পরিচিত, সেই মহীয়সী রমণী হেলেন কেলারের (১৮৮০-১৯৮০) জন্মশতবর্ষ-পূর্তি-উৎসব এদেশেও শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধী মানুষের কাছে তিনি সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা, এবং রবি ঠাকুরের মত বিশ্বকবির কাছে ইনি হলেন সেই 'অপরূপা রমণী'—যিনি জোয়ান অব আর্ক এবং মিস ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতন স্বাধিকার-ভূমিকায় জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে শেষদিন পর্যন্ত নিয়োজিত রেখেছিলেন। বহু কবি মিস নাইটিঙ্গেলকে যখন 'লেডি উইথ দি ল্যাম্প'-আখ্যায় ভূষিত করেন, তখন মিস হেলেন কেলারকে বলেন, 'লেডি অফ হোপ'। অগাধ ব্যক্তিত্ব, অসীম সৌন্দর্য নিয়ে ইনি সুদীর্ঘ ৮৭ বছর অন্ধত্ব-বধিরত্বের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সংগ্রাম করেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, যিনি নিজে পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-বর্ণ-শব্দের জগৎ থেকে নির্বাসিত—সেই যুবতী বহু প্রতিবন্ধীর ধূসর জীবনে রঙিন ফুলের বাগিচা তৈরী করেছেন প্রায় একক প্রচেষ্টায়। অলৌকিক যাদুকরের মতন তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী। মানবতা-বোধ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ঐশ্বরিক প্রেম-ভালবাসার জীবন্ত প্রতিমূর্তি তিনি। ৮৮তম জন্মদিন পালনের উৎসব-আয়োজনকে ম্লান করে তিনি ১লা জুন ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চির-বিদায় গ্রহণ করেন। শেষ দু-বছর তিনি শয্যাশায়ী থেকেও উৎসুক ছিলেন বিশ্বের সকল ঘটনায়। দেশে দেশে স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন।

সারা বিশ্বের কোটি-কোটি মানুষ দূরদর্শনে, পত্র-পত্রিকায়, বেতারে এঁর কথা জেনেছেন, বহু রাষ্ট্রনায়ক শোক-বার্তা পাঠিয়েছেন। আপন প্রচেষ্টায় এই মহিলা নারী-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে চিরকালের পৃষ্ঠায় নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছেন। মাত্র উনিশ মাস বয়সে অজ্ঞাত-জ্বরে দু-চোখের দৃষ্টি হারান, সেই সঙ্গেই ঘটে মূক-বধিরত্ব। সেদিনের ছোট্ট মেয়ে হেলেন দুঃখী বাবা-মার সংসারে বোঝা না হয়ে নিজেকে শুধু পরিবারের নয়, শুধু সমাজের নয়, সারা বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। পৃথিবীর দুঃখী মানুষের বোঝা হালকা করার মহান কর্মযজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গিত করেন। দীর্ঘকাল ইনি পৃথিবীর অসংখ্য দেশে, বিশেষত এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় অন্ধ এবং মূক-বধির বিদ্যালয় ও প্রতিবন্ধী কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে যোগরক্ষা করেছেন। একাজে তিনি মার্ক টোয়েন, অলিভার ওয়েণ্ডেল-হোমস্, জন গ্রীনলীফ হুইটিয়ার, এণ্ড্রু কার্নেগি, চার্লি চ্যাপলিন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মতন বিশ্ব-খ্যাত ব্যক্তিদের সাহায্য এবং পরামর্শ পেয়েছেন।

সুস্থ-সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ২৭শে জুন, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা প্রদেশের তুসকাম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন সাংবাদিক। শুধুমাত্র আধো-আধো স্বরে গুটিকয়েক শব্দ উচ্চারণ অসম্পূর্ণ রেখেই চিরকালের জন্য শব্দহীন এবং বর্ণহীন জগতে প্রবেশ করেন। অন্ধত্ব ও বধিরত্ব বা এদের একটিই কত ভয়ংকর, শুধুমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। হেলেনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে দুই প্রতিবন্ধকতার শুরু। সাত বছর বয়সে এ্যানে

সুলিভ্যান (তিনি পরে মিসেস জন মেসি নামে পরিচিত)-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই স্বল্প-দৃষ্টিসম্পন্ন হৃদয়বেত্তা মহিলা হেলেনের দীক্ষাগুরু, বন্ধু ও সুখ-দুঃখের অভিন্ন সমব্যথী হয়ে আমৃত্যু (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁকে সঙ্গদান করেছিলেন। ব্রেইল্-শিক্ষণ-পদ্ধতির পাঠশেষে সুলিভ্যানের সঙ্গে হেলেন ক্যাম্ব্রিজের র‍্যাডক্লিফ কলেজে প্রবেশ করেন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের আশায়। ক্লাসে যা পড়ানো হতো সুলিভ্যান তা হেলেনের হাতে লিখে দিতেন। হাতের স্পর্শ দ্বারা হেলেন তা শিখে নিতেন। তাঁর গভীর উপলব্ধি-শক্তি, মানসিক প্রত্যয়, অকল্পনীয় স্মৃতি এই যুগের যে কোন বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের কাছেও ঈর্ষার বিষয়। হেলেন তাঁর আত্মজীবনী "দি স্টোরি অফ্ মাই লাইফ" রচনা করেন ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে যা ৭২টি ভাষায় পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ পাঠকের কাছে অনুবাদের মাধ্যমে পরিচিত। লেখিকা হিসেবে তাঁর রচিত ১১টি গ্রন্থের মধ্যে 'মিডস্ট্রীম', 'অপ্টিমিজিম্', 'মাই রিলিজিয়ান', 'আউট অফ্ দ ডার্ক', 'দি সঙ্ অফ্ দি স্টোন ওয়াল' এবং সবশেষে 'লেট আস হ্যাভ ফেথ' (১৯৪১)। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কুমারী হেলেন কেলার তাঁর একটি গ্রন্থ কবি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গ-পত্রে 'কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার' এবং 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী' কবিতা দুটি উদ্ধৃত করেন। কবির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক।

হেলেন কেলার বার্লিন, দিল্লী, গ্লাসগো, জোহান্সবার্গ ও রেঙ্গুন—পৃথিবীর এই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রী, এবং টেম্পল ও হার্ভার্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। দু-বার তিনি ভারত সফরে এসেছিলেন ১৯৪৮ এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামে তিনি আইনস্টাইন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জাঁ-পল্-সাঁত্রের সঙ্গী ছিলেন। বিশ্বমৈত্রীর প্রসার ছিল তাঁর জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য। রবি ঠাকুরের বিশ্বমানবতা এবং গান্ধীজীর অহিংসনীতির তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। দীর্ঘজীবনে বার্মা, জাপান, ফিলিপিন্স, পাকিস্তানসহ প্রায় পঞ্চাশটি দেশ সফর করেছেন। আমেরিকার ফাউণ্ডেশন অফ্ ওভারসীজ ব্লাইণ্ড (বর্তমানে যা হেলেন-কেলার ইণ্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত), রেড ক্রশ সোসাইটি, স্যাল্ভেশন আর্মি, লায়ন্স্ এবং রোটারি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন এদেশের অন্ধ-বধিরদের জন্য নতুন উন্নয়ন-কর্মসূচী সঙ্গে ক'রে, নতুন বিদ্যালয়-কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায়।

বিশ্বের নারী-মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মাদাম হেলেন কেলার। ১৯৫৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী মিসেস রুজভেল্ট স্বয়ং উপস্থিত থেকে হেলেনের বিদেশ সফরের সূচনা করেন। বোম্বাই বিমান বন্দরে ভারতের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতা কাউর সরকারী তরফ থেকে অভিনন্দন জানান। কলকাতায় ২৮শে ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন হেলেন। কলকাতার পার্শ্ববর্তী বেহালায় অন্ধ-বিদ্যালয় এবং মানিকতলায় মূক-বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষক-ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। মাদাম হেলেন কেলার প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে সারা পৃথিবী থেকে প্রায় দু-কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। কলকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ে ইনি বলেন, 'আমার জীবনে অন্ধত্ব অপেক্ষা বধিরত্ব-ই বেশী বেদনা-দায়ক। প্রকৃতপক্ষে অন্ধত্ব অসহনীয় নয়, যেটা অসহ্য সেটা হচ্ছে দৃষ্টিহীনদের প্রতি দৃষ্টিমানদের নিষ্ঠুর ব্যবহার।' শেষ জীবনে মাদামের সহকারী ছিলেন পলি টমসন। ভারতের লক্ষ-লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশুদের দুর্দশার কথা শুনে তিনি খুব-ই বিচলিত হন। গ্রামে-শহরে অন্ধ-বধির যুবক-যুবতীদের কর্মকেন্দ্র খোলার যে

পরামর্শ ২৫ বছর পূর্বে ইনি দিয়েছিলেন আজও আমাদের দেশে তা বাস্তবায়িত হয়নি। হেলেন মনে করতেন—ভগবান সমাজসেবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি অন্ধ ও বধির মানুষকে অন্ধকার আর শব্দহীন জগতের নিষ্ঠুর নিষ্প্রাণ চার-দেয়ালের বাইরে আসার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন সারা জীবন।

হেলেন সেই নারী—বাল্যকালেই যাঁর খ্যাতি জুটেছিল। মাত্র দশ বছর বয়সে রানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড তাঁকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। চোদ্দ বছরের বালিকাকে দেখে প্রখ্যাত আমেরিকান লেখক মার্ক টোয়েন বলেন—'মেয়েটির চোখে-মুখে অলৌকিক প্রতিভার আলো, তার কাছে এলেই যেন স্বর্গীয় উদ্যানে ফোটা-ফুলের পবিত্রগন্ধ!' বাংলা ভাষায় হেলেনের 'আমার জীবন' ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ আজো অনূদিত হয়নি। বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; ইংরেজী, লাতিন, ফরাসী, জার্মান ও গ্রীক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বোস্টনের বিখ্যাত পারকিনসন অন্ধ-বিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী-জীবন। হেলেনের জীবন নিয়ে প্রামাণিক তথ্য-চিত্র Unconquired (অপরাজিত) ভারতে এই সময়ে দেখানো উচিত। হেলেন ছিলেন চিরকুমারী। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি অন্ধ-বধির শিশুদের জন্য দান করে গেছেন উইলের মাধ্যমে। হেলেন কবিতা-গান ভালবাসতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দু-বার আমেরিকা সফরে কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। আইনস্টাইন বিবৃত করেছিলেন তাঁর ফ্যাসীবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস।

হেলেন লোকের হাত স্পর্শ করে ঠোঁটের উপর হাতের আঙুল রেখে বলে দিতে পারতেন সেই ব্যক্তি কি কথা বলছেন, কি বক্তব্য তাঁর। কারও সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক করার স্মৃতি ফটোগ্রাফের মতন মনে রাখতেন। দশ বছর পর আবার তার হাত ধরে অবলীলাক্রমে বলে দিতে পারতেন ব্যক্তিটির নাম-ধাম-পরিচয় এবং শেষ সাক্ষাৎ কোথায়। হেলেন বলতেন, মুখের চেয়ে যে কোন লোকের হাত ধরে বলা যায় ব্যক্তিটি পুরুষ, না নারী। লেখক ভন্‌-ব্রুক হেলেনের স্মৃতিশক্তির কথা তাঁর এক গল্পে লিখেছেন: একবার নিউইয়র্ক শহরে বাসে ভ্রমণের সময় হেলেন বলে ওঠেন, 'এই বাসে যে লোকটি খুক-খুক করে কাশছেন সেই ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই একজন চিত্রশিল্পী।' আশ্চর্য, বাসের শেষ আসনের সেই অসুস্থ যুবক-যাত্রী ছিলেন অভিজ্ঞ একজন চিত্রশিল্পী—পরে পরিচয়ে জানা গেল। হেলেন জীবনে কারুর কাছে কোনরূপ করুণা প্রার্থনার বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আহত মার্কিন পঙ্গু সৈনিকদের হাসপাতালে ও শিবিরে তিনি দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন,—অন্ধকার থেকে আলোর জগতে—শব্দহীন জগৎ থেকে সুরের ঝর্ণাধারায় ভাসিয়েছিলেন। এক সময় বলা হত,—ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীরা আমেরিকা বলতে জানে দুটি নাম, 'লিঙ্কন' ও 'কেলার'। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেহরু নিজে বলতেন, 'মানুষের ইচ্ছাশক্তি কতদূর বাস্তবায়িত হতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ এই অসামান্যা মহিলা।'

হেলেন প্রথম যে শব্দটি শিখেছিলেন সেটা হচ্ছে 'Doll'। শিক্ষিকা সুলিভ্যানের সঙ্গে নদীতে বেড়াতে গিয়ে 'Water' শব্দটির অর্থ অনুভব করেছিলেন নদীর শীতল জলে হাত-ডুবিয়ে। সাঁতার, নৌ-চালনা, ঘোড়ায় চড়া, দাবাখেলা, এমন কি বাজনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'আমার নিঃসঙ্গতাবোধ নেই। একা যখন থাকি তখন পাড়াপ্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের কথা ভাবি। একাকিত্ব কেটে যায়।'

স্পর্শ ও অনুভবের যে অতি-সুকুমার জগৎ সেই জগতের রানী হেলেন। ইতালির ফ্লোরেন্স্ সফরকালে মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর ভাস্কর্য এবং শান্তি-নিকেতন সফরকালে উত্তরায়ণে কবি-গৃহ স্পর্শ দ্বারা তিনি অনুভব করেন এবং তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। ১৯৬৪ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'স্বাধীনতাপদক' অর্থাৎ সেই দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৬০ সালে ৮০তম জন্মদিনে বিশ্ব অন্ধ-পরিষদ তাঁর নামে দেশে-দেশে 'প্রতিবন্ধী-পদক' প্রদানের ব্যবস্থা করে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেডিস হোম-জার্নালে প্রকাশিত প্রথম রচনা থেকে জানা যায় কি পরিহাস-প্রিয় মহিলা ছিলেন তিনি। কলকাতার অন্ধ-বিদ্যালয়কে ১৫০ টাকা এবং মূক-বধির বিদ্যালয়কে ২০০ টাকা (বক্তৃতা-অর্জিত) দান করেছিলেন। তাঁর ভাগ্যে নোবেল পুরস্কার জোটেনি বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব-বিকাশে তিনি এক ঐতি-হাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন—যে কারণে চার্চিল ও কেনেডির মতন রাষ্ট্রনায়কও কেলারের আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কলকাতা সফরকালে (২. ৪. ১৯৫৫) হেলেন কেলার তাঁর দুটি মূল্যবান ভাষণে প্রতিবন্ধী মানুষের সমস্যা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন পঁচিশ বছর পরেও তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

'...Speaking to the children of the Blind School, Behala, Dr. Keller said that the blind... differed not in the number but in the spirit with which they met circumstances. Today new life forces were beckoning the blind onwards....'

মাদাম কেলার তাঁর দূরদৃষ্টির দ্বারা বয়স্ক অন্ধদের কথাও বলেছেন, তাদের সমস্যার কথা ভেবেছেন।

'...সমাজে এই শ্রেণীর অন্ধ-মানুষদের জন্য এখনো পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। তারা বয়সকালে দৃষ্টিহীন হওয়ায় অন্ধ-স্কুলে যাবার সময় ভাগ্যে জোটে না। তারা বেঁচে থাকার জন্য কাজ করতে চায়। কিন্তু কোথায় কাজ? কে দেবে তাদের এই বয়সে কাজ? লোকে ভাবে—এদের দ্বারা এ জন্মে আর কিছুই হবে না। পরের দয়াতেই বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু প্রকৃত সাহায্য ও শিক্ষা দ্বারা এই বয়স্ক দৃষ্টিহীন মানুষদের সমাজে যোগ্যস্থান দেওয়া সম্ভব...।' (ঐ ভাষণের অংশবিশেষ। অনুবাদ প্রবন্ধকার-কৃত)।

মাদাম মূক-বধিরদের সভায় (কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়) ৪. ৪. ১৯৫৫ তারিখে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বিবরণীও উল্লেখ্য : 'Deafness was a more severe handicap for her than lack of sight. She felt it a privilege to speak to the world of the Deaf. In the silence around her she felt an endearing bond between the deaf students and herself. To live in a World of Silence was not so terrible as to be deaf to the sorrows of others and indifferent to their needs. While aware of the many obstacles in their path, she was sure that with perseverance, the students would become self-reliant and independent.'

হেলেন বিভিন্ন সভায় বলেছেন, '...Blindness is not burden at all but the burden of the attitude of the society to the blind is the hardest thing to bear.' দীর্ঘ তিন দশক শেষেও ভারতের জনগণের কাছে

(যার মধ্যে এক কোটি অন্ধ এবং এক কোটি মূক-বধির মানুষ মূল জীবনধারার স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সমাজের চোখে বোঝা), সুস্থ মানুষের কাছে প্রতিবন্ধী মানুষ অবহেলা এবং ঘৃণার পাত্র। এদের স্বপ্ন, এদের আশা পূরণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নেওয়া হচ্ছে, সেটা নজরে আসার মতন নয়। তবে আমাদের বিশ্বাস রাষ্ট্রসংঘের সদর-দপ্তর থেকে ১৯৮১ সালটি বিশ্ব-প্রতিবন্ধী বর্ষ হিসেবে পালনের প্রচেষ্টায় ভারত অবশ্য-ই অংশ-গ্রহণ করবে। হেলেনের হাতে, গ্রাহাম বেল এবং লুই ব্রেইলের মতন মহানুভবের আদর্শ যে-ভাবে রূপায়ণের জন্য এগিয়েছিল সেই আদর্শগুলি বাস্তবে আবার প্রয়োগের জন্য সবাই উদ্যোগী হবেন।

হেলেন ছিলেন মনে প্রাণে ভারতের মহান ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাশীল। ১৯১৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে প্রতিষ্ঠিত American Federation for over-seas Blind (বর্তমানে যার নাম Helen Keller International) হেলেনের শেষ-ইচ্ছানুযায়ী ভারতের মতন অর্ধোন্নত দেশে শিশুদের অন্ধত্ব-বধিরত্ব প্রতিরোধ এবং মোচনের শিক্ষার জন্য বিশদ সাহায্য-কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পঙ্গু ও অন্ধ সৈনিকদের মানসিক মুক্তির জন্য সর্বপ্রথম Blind Relief War Fund গড়ে তুলেছিলেন মাদাম কেলার প্রায় একক প্রচেষ্টায়, এবং তাঁর কর্মতৎপরতা আরো ব্যাপকভাবে ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিস্তৃত হয়েছিল। American Braille Press ছয়টি মহাদেশের অন্ধ-বিদ্যালয়ে হেলেনের নির্দেশে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ শুরু করে। দীর্ঘ ৫৩ বছর (১৯১৫ —১৯৬৮ সাল পর্যন্ত) তিনি মার্কিন সরকারের প্রতিবন্ধী সংস্থার 'ভারপ্রাপ্ত প্রধান' ছিলেন। অন্ধত্বের বিরুদ্ধে, বধিরত্বের বিরুদ্ধে তাঁর 'জেহাদ' (ক্রুশেড্) কতদূর সফল হয়েছিল তার জলন্ত প্রমাণ দেখি আফ্রিকা-এশিয়া-লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে পর্যন্ত প্রতিবন্ধী—লক্ষ-লক্ষ মানুষের জন্য বেঁচে থাকার মতন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণে। জীবনে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবার দাবী সেখানে উপস্থিত।

নানা কারণে তিনি ভারতের মানুষের প্রতি এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কবির জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩১ সালে যে অভিনন্দন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেশ-বিদেশের বহু মনীষীদের সঙ্গে হেলেন কেলারের একটি রচনা মুদ্রিত হয়। তাঁর রচনার কিছু অংশ এইরূপ :

'…কবি-জীবনের সুন্দর অনুভূতির মাধ্যমে তুমি সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছিলে যা তোমার চারিপাশের মানুষগুলির মধ্যে তোমার দ্বারা সঞ্চারিত। তুমি জনস্রোতের মাঝে যেখানে অজ্ঞতা গভীর, সেই পথ নির্ভীক-ভাবেই অতিক্রম করেছিলে। ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে তাদের আনন্দের উদ্যানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পরস্পরের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ শিখিয়েছিলে আর সেই সঙ্গে ভালবাসার জগতে প্রত্যেকেই সমান অংশীদার এই সত্য।

'তুমি এক দেশ থেকে অন্যদেশে জ্ঞানের সন্ধানে দৃষ্টি প্রসারিত এবং শ্রবণশক্তিকে সতর্ক রেখেছিলে, তুমি দেশে-দেশে বিভেদের বিষফল আর অন্ধ-কুসংস্কারের, মূক-ঘৃণাবোধের, যার মধ্যে মানুষ অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতন পরস্পরের প্রতি শত্রুতায় জর্জরিত—দৃশ্য দেখে দুঃখ পেয়েছিলে। আর এই দুঃখের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছিলে মানুষের ভিতরের সেই সুপ্তশক্তি মানবতা, মানুষের ভালবাসার অসীম শক্তি…।' ('গোল্ডেন বুক অফ টেগোর'-এ প্রকাশিত হেলেন কেলার লিখিত অভিনন্দন-বাণীর অংশবিশেষের অনুবাদ)।

হেলেন কেলার নিজের জীবনেও কবির পথ

অনুসরণ করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তুলে আমেরিকা সফরকালে রবীন্দ্রনাথের জন্য সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থেকে একই মঞ্চে আন্তর্জাতিকতা-বাদ-মানবতাবাদের প্রচার অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—'I believe Miss Helen Keller is the purest-minded human being ever in existence.'

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে হেলেন কেলার বলেছিলেন, তিনি ভারতবাসীর ভালবাসার কথা জীবনে কোন-দিন ভুলে যাবেন না। এই দেশ প্রেমের ও মহামিলনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তিনি আরও বলেছিলেন, 'I believe that God is using me for His plans of good which I shall some day understand and be content.' ব্যক্তিগত জীবনে হেলেন মনে করতেন, 'life is either a daring adventure or nothing.' পরিহাস-প্রিয় মানুষটি একবার এক সেক্সপীয়ার-বিশারদের কাছে বলেছিলেন, 'তুমি সেক্সপীয়ার সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলেছ তার অর্থ হল, সেক্সপীয়ার ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, বিবাহ করেছিলেন এবং একদিন মারাও গিয়েছিলেন অর্থাৎ জীবনে কোন কাজ করতে আর বাকী রাখেননি।'

নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কখনো ভাবতেন না বলেই দুঃখবোধ হেলেনকে কখনো গ্রাস করেনি। আনন্দ মানুষের জীবনের গতিকে সুদৃঢ় করে। যে পৃথিবীর বুক থেকে সৌন্দর্য-সুখ ভালবাসা কুড়োতে পারে না তার পক্ষে জীবনের সঙ্গীত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একজন জীবনীকার হেলেন সম্পর্কে লিখেছেন, 'Wherever she goes light floods dark-ness, pride and hate dissolve, kindness prevails.' স্বাধীনতা, সাম্য এবং মানবতার একনিষ্ঠ সেবক হেলেনের নাম মহাত্মা গান্ধী, আব্রাহাম লিঙ্কন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, জোয়ান অব আর্কের পাশে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত। হেলেন ভারত সফরে আসছেন জেনে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'She is America's gift to India. ...We have all heard of the noble work she has done in the United States and else-where and her presence in India will not only be welcome to us but will bring relief and solace to many in this country.' নৈঃশব্দ্যলোকজয়ী, অন্ধকারজয়ী এই নারী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে কর্মজগতে সবার মাঝে ব্যস্ত রেখেছিলেন অন্ধত্ব, বধিরত্ব-এর বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন আগামী দিনেও তার যথেষ্ট মূল্য থাকবে।

সমালোচনা

সাহিত্যতীর্থ ১৩৮৬ বনফুল স্মরণিকা: রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। প্রকাশক : সাহিত্য-তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৬। পৃঃ ২৩৬, দাম : ছ টাকা।

ষড়বিংশ বার্ষিকী সংখ্যারূপে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলেও পত্রিকাটি আদ্যন্ত বনফুল-স্মরণিকা। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি অবশ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের বিবরণাত্মক, তবে পরিবেশনাগুণে সুপাঠ্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষণের সারোৎকলনে মূল্যবানও। সম্পাদক মহাশয় স্বনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন—'বঙ্গসাহিত্যে বনফুল'। নামকরণ থেকে যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রত্যাশা করা যায়, প্রবন্ধটির 'প্রারম্ভিকায় বনফুল' নামে উল্লিখিত প্রথমাংশে তার ক্ষীণ রেখাচিত্র আছে। দ্বিতীয়াংশ 'তীর্থ-পতি বনফুল' বিস্তৃততর—'সাহিত্যতীর্থ' নামক সাহিত্যসংসারের স্মৃতিকথারূপে স্বাদুতর ও সমৃদ্ধতর। সাহিত্যসমালোচকরূপে সুপরিচিত হলেও সম্পাদক-লেখক যে স্মৃতির পটভূমিকায় বনফুল তথা অন্তরঙ্গ বলাইদার জীবন্ত ছবি এঁকেছেন, এটি এই সংকলনগ্রন্থটির পক্ষে সংগত ও শোভন হয়েছে।

সংকলিত নিবন্ধ আর কবিতাকটির বিষয়বস্তু বা ভাবমর্ম বিচার করলে 'স্মরণিকা' নামকরণটি সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই। দুটি গুচ্ছে বিভক্ত মোট উনিশটি কবিতা আছে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্যরূপেই সেগুলি গ্রহণীয়। নিছক স্তুতিমূলক না হয়ে ব্যক্তি-সম্পর্কান্বিত হওয়ায় প্রতিটি কবিতায় আন্তরিকতার ছাপ ফুটে উঠেছে। একটি কবিতার নামকরণে ('বনফুল তুমি বলরাম') সাহিত্যস্রষ্টা বনফুলের গভীর সংকেতময় পরিচয় ফুটে উঠেছে।

সংকলনে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বনফুল অর্থাৎ ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় যে ভাগলপুরে নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবন যাপন করে একান্তে সাহিত্যচর্চা করেন নি, এঁদের রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পকার, ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার বনফুল যেমন পরিচিত অপরিচিত সব পাঠকের মনোহরণ করেছেন, তেমনই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের চিত্তও যে তিনি জয় করেছিলেন, এই স্মৃতিকথামূলক নিবন্ধগুলিতে (মোট ছত্রিশটি) তা অনুভব করা যায়। সম্ভবত কালের গতিকে মানুষের জীবনের পরিধি এমন সংকীর্ণ, বিশেষ করে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিশ্লিষ্ট, সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, তাতে সবদিকে সমভাবে জীবনের সবল সুস্থ প্রসারণ ঘটাতে পেরেছেন এমন মানুষ দুর্লভ। অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণে গোটা মানুষরূপে বনফুলের সুপ্রসারা বলিষ্ঠ জীবনের আভাস দিয়ে সর্বতোভাবে অগ্রযায়ী শিল্পস্রষ্টার অনুজ-অনুজারা অনুরাগী পাঠকপাঠিকাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কেননা বনফুলের মতো শক্তিমান মহৎ সাহিত্য-কারের শিল্পকৃতির যথার্থ বিচার বা পরিমাপ তাঁর সমকালে বা স্বল্পকালের ব্যবধানে করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিপুরুষের স্মৃতিচিত্র তাঁরা যদি ধরে না রাখতেন তাহলে কালক্রমে তা হারিয়ে যেত। বনফুলের লেখা কয়েকটি পত্রের সংকলনও আকর্ষণীয় ও একই কারণে মূল্যবান্। 'স্মরণিকা'র পরিকল্পনার জন্য 'সাহিত্যতীর্থ'-ব্রতীরা ধন্যবাদার্হ।

প্রচ্ছদপটে বনফুলের ছবিটি যেন জীবন্ত। বনফুলের আঁকা দুটি ছবির প্রতিলিপি অনুরাগীদের তৃপ্ত করবে। স্মৃতিবহ কয়েকটি আলোকচিত্রও 'স্মরণিকা'য় সংযোজিত হয়েছে। অল্পকিছু ত্রুটি থাকলেও মুদ্রণাদি প্রশংসনীয়।

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০)

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে। মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর থেকে সোমবার, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৮০, সপ্তাহব্যাপী এই মহাসম্মেলন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রায় চারশ সন্ন্যাসী সহ ন্যূনাধিক বারোহাজার প্রতিনিধি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশ থেকে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

বেলুড় মঠে মূল মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে শিল্পসুষমায় বিমণ্ডিত বিশাল সভামণ্ডপ, মঠপ্রাঙ্গণের বিভিন্ন অংশে আহারের জন্য পাঁচটি মণ্ডপ এবং রান্নাবাড়া ও ভাণ্ডারের চালা নির্মিত হয়েছিল। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবীদের, প্রাথমিক চিকিৎসার ও অনুসন্ধানের অফিসগুলি বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সাজসজ্জা বিশেষতঃ জি. টি. রোডের উপর ও মঠপ্রাঙ্গণের প্রবেশস্থলে মনোরম গেট (প্রবেশ পথ) মহোৎসবের আনন্দময় পরিবেশ রচনা করেছিল। সম্মেলনের জন্য সংগঠিত পরিচালক সমিতি, আটটি উপসমিতি, প্রায় দেড়-হাজার স্বেচ্ছাসেবী এবং বেলুড় মঠ ও শাখাকেন্দ্র-গুলিতে অগণিত সেবকদের সক্রিয় সাহায্যে এই মহাসম্মেলনের সংগঠন সম্ভবপর হয়েছে।

প্রথম মহাসম্মেলনও হয়েছিল বেলুড় মঠেই, ১৯২৬ সালে। সেবারে যোগদান করেছিলেন প্রায় পাঁচশ প্রতিনিধি। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান, আদর্শের গভীর অনুধ্যান ও তার বাস্তব রূপায়ণে নূতন উদ্যমের সঞ্চার এবং সঙ্ঘের অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকতর সুসংহতি। সম্মেলনের প্রভাব হয়েছিল ব্যাপক ও দূরপ্রসারী।

বিগত চুয়ান্ন বছরের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে, তদুপরি সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের যথেষ্ট বিস্তৃতি ঘটেছে। উপস্থিত হয়েছে বহুবিধ ও বিচিত্র সমস্যাবলী। এই পটভূমিকায় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

এই মহাসম্মেলন উপলক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দিরের (বি. এড. কলেজ) ত্রিতল বাড়ীতে। প্রদর্শনী চারটি ভাগে বিভক্ত: পুতুল দিয়ে গড়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গল্প, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের প্রসার, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি প্রখ্যাত শিল্পীদের প্রণতি এবং গ্রামীণ শিল্প ও কারুশিল্প। সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর বিকালে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ। ১লা জানুয়ারী, ১৯৮১ তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও শিল্প-সমালোচকদের সপ্রশংস মতামতে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে।

মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, ঊষালগ্নে মঙ্গলারতি ও প্রাতে বিশেষপূজা ও হোম দিয়ে মহাসম্মেলন-উৎসব সুরু হয়।

সকাল নয়টায় বেদপাঠ, রামকৃষ্ণবাণীপাঠ এবং স্বামী অপূর্বানন্দ ও অন্যান্যদের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ স্বাগত-ভাষণ দেন। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম

কেন্দ্রীভূত সংগঠন গড়ে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে, সংগঠন ব্যতীত কোন বৃহৎ পরিকল্পনারই রূপায়ণ সম্ভব নয়। ত্যাগের ভিত্তিতেই স্বামীজী এই সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। আরেকটি প্রধান লক্ষ্য সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন। আজকের সমস্যাপীড়িত কালে এই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করে রয়েছে। সেই সঙ্ঘের মহাসম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যবহ।

তারপর মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সহ-সভাপতি এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দ ভাষণ দেন।

মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন : স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের কোন কোন বিষয়ে যদিচ আমরা উন্নতি করেছি, কিন্তু অন্যান্য বহু বিষয়ে, বিশেষতঃ আদর্শগত ও নৈতিক মূল্যায়নের দিক থেকে আমাদের অধঃপতন ঘটেছে প্রচুর। পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভাবধারার অন্ধ অনুকরণের ফলে পৃথিবী-ব্যাপী এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ না করা। প্রকৃত ধর্মমতে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধি, সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভব। বিভিন্ন ধর্মমত ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। সব কিছুর মধ্যে এক আত্মাই বর্তমান। অজ্ঞতায় আবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন ভেদ-বৈচিত্র্য কল্পনা করে থাকে। ঈশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের সেবা পরিণতিতে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত আদর্শ অনুসরণ করে ভারতের অবহেলিত নারীসমাজ ও জনগণের উন্নতির জন্য সার্বিক চেষ্টা অবিলম্বে করতে হবে। সকল ভক্তের কাছে তিনি আবেদন করেন তাঁরা যেন ব্যক্তিগতভাবে ও প্রতিষ্ঠান সংগঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নবনির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্বোধনী ভাষণের হিন্দী, বাংলা, তামিল ও কানাড়া ভাষায় তর্জমা করে বলেন যথাক্রমে স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী সর্বজ্ঞানন্দ ও স্বামী সোমনাথানন্দ। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট মহারাজ প্রায় ৬৮০ পৃষ্ঠার একটি স্মারকপত্রিকা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঙ্কলিত "Rebuild India" শীর্ষক পুস্তিকার প্রকাশ ঘোষণা করেন। মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সম্পাদক স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সমাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমাপ্তিসূচক গান করেন শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিকালের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল "রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন"। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী গম্ভীরানন্দ সভাপতিত্ব করেন। মূল ভাষণে স্বামী বুধানন্দ বলেন যে, দৈবনির্দেশে উত্থিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক ধর্ম-আন্দোলন। শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় সাধনা লোককল্যাণের জন্য, নিজের হিতার্থে নয়। এই ভাবধারার আদর্শ চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন জননী সারদাদেবী তাঁর নিজের জীবন দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঞ্চারিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে স্বামীজী এই মহাকল্যাণকারী ধর্মান্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে বিধৃত উপনিষদের বাণী "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ভোগবাদী সমাজের কাছে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। মানুষে মানুষে ভেদ মানুষের কল্পিত। এক সত্তাই সর্বত্র বিরাজমান। শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের শাশ্বত বাণী সমগ্র বিশ্বের জন্য।

এই অধিবেশনে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রী টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গম (তামিলনাড়ু), শ্রীমতী ইন্দিরা প্যাটেল (বরোদা),

বিচারপতি এস. সি. ঘোষ (কলিকাতা), শ্রী কে. পি. গণপতি (জামসেদপুর), অধ্যাপক সি. এস. রামকৃষ্ণন (মাদ্রাজ), বিচারপতি কে. এল. পাণ্ডে (রায়পুর), শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন (ত্রিবান্দ্রাম) ও প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও স্বামী তপনানন্দ।

২৪শে ডিসেম্বর। মঠের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সকালের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল "রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ"। বেদপাঠের পর মূল ভাষণ দেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ। তিনি বলেন যে, আত্ম-দুর্বলতা ও বহিঃশক্তির প্রবল প্রবাহের ফলে ভারত যখন প্রায় নিমজ্জমান সে-সময়ে মহাশক্তির উত্থান হয়েছিল। সেই শক্তিই শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল কয়েকজন যোগ্য আধিকারিক পুরুষের মধ্যে। তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যন্ত্ররূপে গড়ে উঠেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। বৌদ্ধদের উপাস্য ছিল বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। সারা বিশ্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রাণশক্তি আবর্তিত হচ্ছে এই ত্রিশরণ-মন্ত্রকে কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার সন্ন্যাসিগণ সংগঠিত হন স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বাধীনে। এই সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গস্বরূপ। এই সঙ্ঘের কেন্দ্রে ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ। কিন্তু গৃহীরাও এই সঙ্ঘের আবশ্যিক অঙ্গ। শুধু মন্ত্রদীক্ষা নিলেই রামকৃষ্ণের প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত আদর্শে চরিত্র গঠন করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের প্রকৃত গুরু। সকল মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু-শক্তিই প্রবাহিত হচ্ছে। এই মহাসম্মেলনের শুভক্ষণে সকলকে নব ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামীজী-প্রদর্শিত শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এবং তাঁর সঙ্ঘের শরণাগতিই এই মন্ত্রের লক্ষ্য।

সভাপতির ভাষণে মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী ভূতেশানন্দ বলেন যে, সন্ন্যাসীদের মত গৃহীদেরও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্কার আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে সত্যের হীরা-মানিক তুলে ধরেছিলেন। রামকৃষ্ণানুরাগি-গণের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব, ঐ সত্যের আলোকে জীবন গড়ে তোলা এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে সেই সত্য জনসমাজে প্রচার করা। এ ভাবেই স্ফুরিত হচ্ছে প্রবল মহতী শক্তি যার দ্বারা স্বামীজী বিশ্বজয় করতে চেয়েছিলেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্রপুরের স্বামী অসক্তানন্দ, অরুণাচলের টি. এল. রাজকুমার ও ওয়াংফা লোয়াং, জেনেভার স্বামী নিত্যবোধানন্দ, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ও মাদ্রাজের এস. কে. শিবরামন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বিজ্ঞানন্দ। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ।

বিকালের অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল "কর্মে পরিণত বেদান্ত"। মূল ভাষণ দেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দ। তিনি বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের সারভাগ বেদান্তকে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। মানবসেবার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটাতে পারা যায়, সেসঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণও ঘটতে পারে। এই দুয়ের মিলনেই মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ।

সভাপতির ভাষণে স্বামী তপস্যানন্দ কর্মে পরিণত বেদান্তের দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করে এর উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারী মালতী বোলার, অধ্যাপিকা মহাশ্বেতা চৌধুরী, স্বামী অনন্তানন্দ, ডাঃ ভি. আর. বেণুগোপাল (মাদ্রাজ), শ্রীগিরিধারী প্রসাদ, শ্রীমতী অনুসূয়া সুব্রহ্মণ্যম (মাদ্রাজ), শ্রী কে. ভি. নাগেশ্বর রাও (হায়দ্রাবাদ), শ্রী এস. জি. সুন্দরস্বামী (ব্যাঙ্গালোর) ও ডঃ তাপস শঙ্কর দত্ত।

ধন্যবাদ জানান স্বামী ব্যোমানন্দ। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী জিতাত্মানন্দ।

তৃতীয় দিন। বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর। সকাল সাড়ে ছ'টায় বাসে করে দেড় হাজার আবাসিক প্রতিনিধি তীর্থ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর উদ্যানবাটী ও বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী দর্শন করেন।

মহাসম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন বসে সেদিন বেলা তিনটায়। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। হলুদ রঙের চাদর দিয়ে মেঝে ঢাকা। মাঝে মাঝে লালকাপড়ের পথ। হলুদের ওপর গাঁদাফুলের বিচিত্র সুন্দর আলপনা। ৫৪টি আলপনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্যবর্তী চুয়ান্ন বছরগুলিকে। বক্তৃতামঞ্চের ওপরে ফুলের মালায় সুশোভিত শ্রীরামকৃষ্ণের দণ্ডায়মান প্রতিকৃতি। একটা আনন্দময় মহোৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী"। বৈদিক মঙ্গলাচরণের পর ভাষণ শুরু হয়। প্রথমে বলেন শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। দ্বিতীয় বক্তা স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বজনীনতার প্রতীক। মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত সম্ভাবনা, তাকেই তুলে ধরেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বর্তমানকালে দর্শন ও বিজ্ঞান এই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হলেই বিশ্বশান্তি সম্ভব। লোকসভার সদস্য ডঃ করণ সিং বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর তিনটি সার কথা—মানুষ অমৃতের পুত্র, জগতের হিত করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং সত্য এক বৈ দুই নয়। বিবেকানন্দ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধিকা ভগিনী গার্গী (মেরী লুই বার্ক) বলেন যে, আজকের দিনে হিংসায় খিন্ন, দ্বন্দ্বে দীর্ণ দুনিয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে সক্ষম। তাছাড়াও বিচারপতি পদ্মা খাস্তগীর, ডঃ কালী-কিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রী এ. সি. ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক নীলকণ্ঠ সিং (মণিপুর) ভাষণ দেন।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার মূল কথা শিবজ্ঞানে জীব সেবা। তিনি মানুষকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানতেন। নারীসকলের মধ্যে দেখতেন চৈতন্যময়ী জগদম্বার প্রতিফলন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম ও সেবার বাণীই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁর প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ (Spiritual humanism) জগতে অশেষ কল্যাণ আনয়ন করবে।

পনেরো হাজার শ্রোতা নিবিষ্টমনে এই ভাষণগুলি শোনেন। ধন্যবাদ জানান স্বামী গণানন্দ (কালাডি) এবং সমাপ্তিসূচক গান করেন স্বামী অক্ষতানন্দ।

শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর সকালে বেলুড় মঠের সভামণ্ডপে ষষ্ঠ অধিবেশন বসে। আলোচনার বিষয় ছিল "ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী"। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করে সভার কাজ শুরু হয়। মূল ভাষণে স্বামী গীতানন্দ মঠ ও মিশনের সেবাকর্মের ইতিহাস ও বর্তমানের ১৩৮টি কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, মানুষের সেবায় বেদান্ততত্ত্বের প্রয়োগ এবং পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের সমন্বয়ই হ'ল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ অবদান।

সভাপতির ভাষণে স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত কাজকর্মের

বিবরণ দিয়ে সকলকে সেবাযজ্ঞে আত্মোৎসর্গ করার জন্য আহ্বান জানান।

শিবশঙ্কর চক্রবর্তী (নরেন্দ্রপুর) তথ্যাদি দিয়ে গ্রামোন্নয়নে রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাপক ভূমিকা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ (রায়পুর), অধ্যাপক কপিল চট্টোপাধ্যায় (শিলং), শ্রী এন. এস. কৃষ্ণান (উটি), স্বামী গণানন্দ (কালাডি) ও ডঃ সি. বি. কামাথ (ম্যাঙ্গালোর)। ধন্যবাদ জানান স্বামী গোকুলানন্দ। সমাপ্তি গান করেন স্বামী পুরাণানন্দ।

শুক্রবার বিকাল তিনটায় "আন্তর্ধর্ম মত-বিনিময়" বিষয়ে আলোচনা হয় সপ্তম অধিবেশনে। স্থান নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে। প্রায় পনের হাজার আগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাগণ নিজ নিজ ধর্মের সার্বজনীন ভাবটি তুলে ধরেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে স্বামী শান্তানন্দ বলেন, চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর কণ্ঠে উচ্চারিত মহামিলনের বাণীই সনাতন ধর্মের মূল কথা। ইসলাম সম্বন্ধে বলেন ডাঃ এম. এ. ওয়ালি, খ্রীষ্টধর্মের কথা বলেন রেভারেণ্ড মাইকেল ওয়েস্টাল, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন ভিক্ষু রাহুল, জৈনধর্ম সম্বন্ধে বলেন কে. সি. লালবনী ; জরাথুষ্ট্র ধর্মের প্রবক্তা বেহেরাম আর. ভকিলের ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করে। জুডাইজম সম্বন্ধে বলেন রবিন টোয়াইট, শিখধর্মের কথা বলেন ক্যাপ্টেন ভাগ সিং এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ. এন. রায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন যে, সকল মানুষ এবং সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য বর্তমান, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্যই প্রচার করেছেন। মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ (সানফ্রানসিস্কো) উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করে যথাক্রমে স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ ও স্বামী অক্ষতানন্দ

শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, দুবেলাই বেলুড় ম প্রাঙ্গণে অধিবেশন বসে। সকালের অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল "ভারতের বাইরে মঠ ও মিশনের কাজকর্ম"। সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্বাহানন্দ (হলিউড)। তিনি বলেন, বিদেশে বেদান্ত প্রচারের জন্য প্রয়োজন অধিকসংখ্যক উৎসর্গীকৃত তরুণ। সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে ক্যাথলিক পোপের মত একাধিক সংস্থার উপর সভাপতিত্ব করতে হবে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট মহারাজকে। সানফ্রানসিস্কোর স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ বলেন যে, বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রাবল্য সত্ত্বেও বেশ কিছু আমেরিকান নরনারী তাঁদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাবার জন্য রামকৃষ্ণ কেন্দ্রে এসে থাকেন। ভগিনী গার্গী বলেন, মিশনের কর্মীসমস্যা সমাধানের জন্য পবিত্র ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করেন এরূপ ভক্তের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। এছাড়াও বলেন, স্বামী ভব্যানন্দ, স্বামী নিত্য-বোধানন্দ (জেনেভা), স্বামী অক্ষরানন্দ (ঢাকা), স্বামী ভাস্করানন্দ (সিয়াটেল) ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ (পূর্ব দিনাজপুর)। স্বামী রুদ্রানন্দের ভাষণ পাঠ করেন স্বামী কীর্তিদানন্দ। এঁদের ভাষণ হতে বোঝা যায় যে, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা মানুষের বাহ্যপ্রয়োজনের চাইতে আত্মিক প্রয়োজনের উপর বেশী গুরুত্ব দেন এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত প্রচারকবৃন্দ। ধন্যবাদ জানান স্বামী কীর্তিদানন্দ। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পুরাণানন্দ।

বিকালের অধিবেশন বসে বেলা তিনটায়। আলোচনার বিষয় ছিল "রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্যাসমূহ"। মূল ভাষণে

স্বামী আত্মস্থানন্দ বলেন যে, বর্তমানে দেশের কোন কোন জায়গায় মিশনের কর্মীরা বিদেশী ও জনবিরোধী বলে নির্যাতিত হচ্ছে। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থ অপপ্রচার ও হামলা করে চলেছে। সমাজব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারের উপর অনেক বিষয়ে নির্ভর করতে হচ্ছে। সরকার সাহায্য দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বিধিনিষেধ আরোপ করে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। একই সুরে কথা বলেন সভাপতি স্বামী বন্দনানন্দ। তিনি ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের আহ্বান জানান মঠ ও মিশনের কাজকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হবার জন্য। এই অধিবেশনে আরও বলেন অধ্যাপক ডি. এন. বোস, শ্রী এ. কে. ব্যানার্জী (রাঁচী), অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, অধ্যাপক রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী (বাঁকুড়া), শ্রী এস. শঙ্কর (ব্যাঙ্গালোর), অধ্যাপক এস. মধুমঙ্গল সিং (মণিপুর), শ্রী এস. এম. গৌরীশঙ্কর (মাদ্রাজ) ও শ্রী এম. এন. কে. নায়ার (কেরালা)। ধন্যবাদ দেন স্বামী গৌতমানন্দ। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত করেন যথাক্রমে স্বামী তপনানন্দ ও স্বামী অক্ষতানন্দ।

রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর ছিল শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথি। ষোলশ'র বেশী প্রতিনিধি বাসে করে পুণ্যতীর্থ কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করতে যান। অপর প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ বেলুড় মঠে, কেউ বা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উৎসবে যোগদান করেন।

সোমবার, ২৯শে ডিসেম্বর সকালবেলা। দশম অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল "ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের ভূমিকা"। মূল ভাষণে স্বামী প্রভানন্দ বলেন, শোষিত ও পদদলিত সাধারণ মানুষের জন্য ভক্ত ও বন্ধুদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতি সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। ভক্তবৃন্দ যেন কখনও কিছু পার্থিব সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য ব্যগ্র না হন। রামকৃষ্ণ-ভাবধারার মূল কথাই হ'ল, সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার অবসান। নূতন সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা, সম্পদ ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সকলের একই সুযোগ সুবিধা থাকবে। সভাপতির ভাষণে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সকল সাধু ও গৃহী ভক্তদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেন। সহনশীল এই ভারতবর্ষেই কাশ্মীররাজের হাতে বৌদ্ধমতাবলম্বীদের, এবং ইউরোপে রোমানদের হাতে খ্রীষ্টভক্তদের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তা হ'তে উদ্ভূত হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও উৎসাহ। হতাশার ভাব ত্যাগ করে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন গড়ে তুলতে হবে। চিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামীজীর প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ভূত হয়েছিল নূতন হিন্দুধর্ম। প্রচলিত হিন্দু ধর্মমত হতে এ ভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে উদ্ভাসিত ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত বেদ উপনিষদ গীতা দিয়ে গড়া এই ধর্মমত। স্বামীজী বলেছেন, সাধারণ মানুষকে শেখাতে হবে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। প্রহ্লাদ-মার্কা ভক্তি দিয়ে কাজ হবে না। সর্বশক্তিমান আত্মাই সর্বত্র বিরাজমান—এই সত্য বিশ্বাস করে জীবন গড়ে তুলতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, যে আত্মবিশ্বাসী নয় সেই অধার্মিক। "আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে ঠাকুর-স্বামীজীর কাজে মন প্রাণ সমর্পণ করতে পারলে তবেই আমরা কর্মীর অভাব দূর করতে পারব। আপনাদের প্রত্যেকের বাড়া হোক্ এক একটি আশ্রম, রামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রচারকেন্দ্র। বিশ্বাস করুন, ব্রহ্মকুণ্ডলিনী জাগরিত হয়েছেন ও ঠাকুর মা স্বামীজীর মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছেন। সেই জাগরিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ আমরা যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করে যাব, কৃতকৃতার্থ হব।" অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেন, বর্তমান ভারতবর্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মীয় শক্তি রামকৃষ্ণ

মিশন। তার বিরুদ্ধে ক্রমেই সংগঠিত হচ্ছে *বিদেশাগত ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদগুলি।* সকল ভক্ত ও বন্ধুদের এবিষয়ে হুঁশিয়ার হতে হবে। এই অধিবেশনের অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিস্টার কল্যাণী, ডঃ কমল নন্দী (শিলং), শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, ডাঃ অনিল দেশাই (রাজকোট), বিচারপতি জি. এন. রায়, ডঃ চম্পকলাল মেহতা (বোম্বাই), শ্রী আর. এন. দত্তগুপ্ত (ঢাকা), শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী (মধ্যপ্রদেশ), ডঃ শশাঙ্কভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরামেশ্বর সরকার। ধন্যবাদ দেন স্বামী শক্রানন্দ। সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পুরাণানন্দ।

সেদিন বিকালবেলায় বিদায় অধিবেশন বসে সাড়ে তিনটায়। স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ কর্তৃক মঙ্গলাচরণ ও স্বামী তপনানন্দের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর স্বামী বন্দনানন্দ বিদায়ী অভিভাষণ দেন। অধ্যাপক এলান আর. ফ্রীডম্যান ও ভেলমরী এন. শর্মা (রাজমুন্দ্রী) বলেন। স্বামী স্মরণানন্দ বলেন যে, ধর্ম ব্যতিরিক্ত সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তি প্রকৃত কল্যাণ করতে পারে না। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন যে, মহাসম্মেলন থেকে তিনটি বিষয় পাওয়া গেছে। আমরা বারংবার স্মরণ করেছি আমাদের আদর্শকে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে নানা ধর্ম, নানা ভাষা, সব কিছুর মধ্যে ঐক্য পরিস্ফুট হয়েছে। তৃতীয়তঃ সঙ্ঘ আমাদের আপনার বস্তু। এই সঙ্ঘকে ভালবাসতে হবে, সর্বপ্রকারে এর সেবা করতে হবে, সম্পদে বিপদে সর্বাবস্থায় এর পাশে দাঁড়াতে হবে। মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেন যে, এধরনের মহাসম্মেলন কোন কাজেই আসবে না যদি না উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ কর্মস্থানে ফিরে গিয়ে আলোচিত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা না করেন। অনগ্রসর, দরিদ্র, অনাথ ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে সেবা করার জন্য সকলকে তিনি সাদর আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন যে, এই মহাসম্মেলন সকল প্রতিনিধিকে উদ্বোধিত করবে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে নূতন সমাজ গড়ে তুলতে। এই ভাষণের সংক্ষিপ্তসার হিন্দী ও বাংলাতে অনুবাদ করে শোনান যথাক্রমে স্বামী আত্মানন্দ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ। স্বামী আত্মস্থানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে কনভেনশন কমিটির সভাপতি স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বলেন, বিদায়ক্ষণ বেদনাদায়ক। গত সাতদিন আমরা যেন আনন্দপ্রবাহের মধ্যে ভেসে বেড়িয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেখানেই অনেক ভক্তের সমাবেশ হয় সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। ভক্তজনের এই বিশাল সমাবেশ নিঃসন্দেহে রচনা করেছে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বরূপ। স্বামী অক্ষতানন্দের সমাপ্তি-সঙ্গীত মহাসম্মেলনেরও সমাপ্তি সূচনা করে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ২৩শে রাত্রি ৮টায় একঘণ্টার জন্য শ্রীশিবশঙ্কর মুখার্জী ধ্রুপদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২৪শে সন্ধ্যায় খ্রীষ্ট-সন্ধ্যা উদ্‌যাপিত হয়। বাইবেল পাঠের পর স্বামী নিত্যবোধানন্দ প্রমুখ তিনজন ভগবান যীশুর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে বলেন। ক্যারল গান ছিল এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ।

২৭শে সন্ধ্যা ৮টায় শিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের শিল্পিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ জীবনের তিনটি দৃশ্য অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

২৯শে সন্ধ্যা ৮টায় অরুণাচলের নরোত্তমনগরের ছাত্রগণ দুটি উপজাতি-নৃত্য পরিবেশন করেন। তারপর পুরুলিয়ার কয়েকজন গুণী শিল্পী ছৌ-নাচের মাধ্যমে মহিষাসুর বধ, কিরাতার্জুন যুদ্ধ ও অভিমন্যু বধ পরিবেশন করেন।

৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলায় একটি মনোজ্ঞ সভায় মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সভাপতি

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ প্রায় দেড়হাজার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেককে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঙ্কলিত "Rebuild India" পুস্তিকা ও একটি অভিজ্ঞানপত্র বিতরণ করেন। এই সভায় ভাষণ দেন স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, স্বামী অমলানন্দ, স্বামী স্মরণানন্দ ও স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ।

—স্বামী প্রভানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী—উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত ১০ই জুন ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং ২১শে জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল :

কথামৃত—

আগের দিন আমরা আলোচনা করেছি—ঈশ্বর সাকার এবং নিরাকার দুই-ই; তিনি ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী নানা রূপ ধারণ করেন। 'ভক্ত যে রূপটি ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্তবৎসল।' (১।৩।৫)। এখন এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে ঠাকুর বেদান্ত-বিচারের কথা বলছেন। বলছেন: 'বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপ-টুপ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা।' এটা আমরা বেশ বুঝতে পারি যদি একটু বিচার করি। প্রসিদ্ধ পুরানো দৃষ্টান্ত: রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তি—একটা দড়ি পড়ে আছে তাকে সাপ মনে ক'রে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি। মনে হচ্ছে সত্যিকারের সাপ, ভয় পাচ্ছি দারুণ। যতক্ষণ আলো না আসছে, এই ধারণা থেকেই যাচ্ছে। সেইরকম এক ব্রহ্মবস্তুকেই আমরা ভ্রান্তিতে জগৎরূপে দেখছি। বর্তমান যুগে নতুন দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা বলতে পারি, এই যে মানুষ দেখছি—এ তো মানুষ নয়, Electron ও Proton-এর সমষ্টি। কোন্‌টা ঠিক? যা আমরা দেখছি, এই মানুষ-রূপ? না, ঐ Electron-Proton-এর সমন্বিত মূর্তি? ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেখলে আসল রূপটি দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়ের দেখাটা যদি বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়, মন-বুদ্ধিও যদি স্থির হয়ে যায়, তাহলেই জীব-জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানতে পারি। তখন বোঝা যায় যে, ব্রহ্মই সত্য এবং নামরূপযুক্ত যা-কিছু সবই মিথ্যা। আবার শ্রুতি-অনুকূল বিচারের দ্বারা নামরূপযুক্ত সমস্ত দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব আগে নির্ণীত হ'লে ব্রহ্মবস্তুর সত্যত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হয়। ঠাকুর এখানে সেই শ্রুতি-অনুকূল বিচারের কথাই বলছেন—যে-কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১।৪) বলা হয়েছে: 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।' অর্থাৎ, মাটি দিয়ে তৈরী হাঁড়ি, কলসী, জালা ইত্যাদির নাম ও রূপ কথার কথা মাত্র।—মাটিই সত্য। মাটি ছাড়া ওগুলিতে আর কিছুই নেই। সেই রকম জগতের প্রত্যেকটি বস্তুতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নেই—নামরূপ সব মিথ্যা।

তারপর ঠাকুর বলছেন: "যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Person) ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে।" গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন, 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্'—জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপই। অন্ন

ভক্তরা—আর্ত, জিজ্ঞাসু অর্থার্থীরা ভগবান থেকে একটু দূরে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর —এই পাঁচভাবের যে-কোন একটিতে ভক্ত-ভগবানে একটু ব্যবধান থাকেই। ঈশ্বরের আর ভক্তের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এই পাঁচ প্রকার ভক্তিতে কোন-একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে সাধন করতে হয়—ফলে রূপের জগৎ এসে যায়। যে কোন বিরাট জিনিস দূর থেকে দেখলে ছোট দেখায়, কাছে গেলেই তার বিরাট রূপ বোঝা যায়। ঠিক তেমনি ঈশ্বরের বিরাট রূপ অনুভব হয় না তাঁর সঙ্গে আত্মসম্পর্ক স্থাপন যতদিন না হচ্ছে। নানান উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর এইটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, কালীরূপ কি কৃষ্ণরূপ 'চৌদ্দ পোয়া' দূরে ব'লে। কালী, কৃষ্ণের শ্যামবর্ণ—দূরে ব'লে। যেমন, দূরে ব'লে সূর্য ছোট দেখায়। দীঘির জল কাল বা নীল দেখা, দূরে ব'লে। দূরে ব'লে আকাশও নীল দেখায়। আসলে জলের বা আকাশের কোন রঙ নেই

ঠাকুর আরও বলছেন: 'তাই বলছি, বেদান্ত-দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।' ঈশ্বরের স্বরূপ কি তা মুখে বলা যায় না। বলবে কি ক'রে? ঈশ্বরের স্বরূপ যে-অবস্থায় প্রকাশিত, সে-অবস্থায় যে মনের বৃত্তি শেষ হয়ে গেছে! কে বলবে? কি বলবে? মনোবৃত্তি দিয়েই দেখা, বলা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবহার; সেই বৃত্তিই চলে গেছে; মনের সব বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে গেছে—এই যে অবস্থা এইটি চরম অনুভূতির অবস্থা। তখন মুখে কিছু বলার অবস্থা থাকে না। তবে যতক্ষণ ঐ অবস্থা না হচ্ছে, দেহবোধ থাকছে, অহংবৃত্তি থাকছে, ততক্ষণ ব্যবহারিক-ভাবে জগৎ সত্য। আর ঈশ্বরের সগুণ অবস্থা, নানান রূপ এসবও সত্য।

এই সব উচ্চতম জ্ঞানের কথা ব'লে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের জন্য ভক্তির কথা বলছেন। জ্ঞানপথ কঠিন। উচ্চ অধিকারী না হ'লে হয় না। তাই সকলের জন্য সহজ পথ ভক্তিপথ। আর সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের স্বরূপকে জানবারই বা প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি হলেই হ'ল। অল্প জলে যদি তৃষ্ণা মিটে যায়, পুকুরে কত জল আছে জানবার কোন প্রয়োজন নেই। আধ বোতল মদে যদি মাতাল হওয়া যায়, শুঁড়ির দোকানে কত মন মদ আছে সে হিসাবে কি দরকার! (১।৩।৫)

গীতা—

'জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে-স্থান প্রাপ্ত হন, কর্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সাংখ্য ও যোগ—এই দুটি উপায়কে যিনি এক ব'লে দেখেন তিনি যথার্থদর্শী।' (৫।৫) শ্রীভগবানের এই কথা আমরা আগের দিন আলোচনা করেছি এখন শ্রীভগবানের এই কথা শুনে অর্জুনের হয়তো মনে হ'তে পারে যে, দুটি যোগই যখন এক জায়গায় নিয়ে যায় তখন জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল, কাজকর্ম আর কিছু করতে হবে না, এই রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধও আর করতে হবে না। এইজন্য শ্রীভগবান অর্জুনকে আগে থেকেই বলছেন: 'হে মহাবাহো, কর্মযোগব্যতিরেকে সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর। কর্মযোগযুক্ত মুনি শীঘ্রই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।' (৫।৬) কর্মযোগ না ক'রে কর্মসন্ন্যাস করতে গেলে, তার ফলে অশেষ দুঃখই সার হয়। সংসারে সকলেই কাজকর্মে আছে, সেখানে কেউ যদি হঠাৎ সব কাজ ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে—কর্মসন্ন্যাস ক'রে, তাতে কি হবে? না, তার দুঃখই সার হবে। কারণ, মন থেকে তো কর্মস্পৃহা যাচ্ছে না। মনের ভিতর সব কিছু বাসনা রয়ে গিয়েছে। অথচ বাহ্য কর্ম

বন্ধ ক'রে সে বসে আছে। এটা ভণ্ডামিমাত্র। কর্মযোগ করতে করতে আপনাআপনি যখন কর্ম-ত্যাগ হয়ে যাবে, নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা যখন আসবে, তখনই ঠিক ঠিক কর্মসন্ন্যাস হবে। সেইজন্যই 'যোগযুক্তমুনি' অর্থাৎ কর্মযোগী সাধক অতি সত্বর পরব্রহ্মকে লাভ করেন। শংকর অবশ্য মূল শ্লোকের 'ব্রহ্ম' শব্দটির অর্থ করেছেন 'সন্ন্যাস'। তাঁর মতে কর্মযোগী তো সরাসরি ব্রহ্মকে লাভ করতে পারেন না—সন্ন্যাসের মাধ্যমে, জ্ঞাননিষ্ঠার মাধ্যমেই পারেন। এইজন্যই তিনি ঐরকম অর্থ করেছেন। শ্রীধরস্বামী 'ব্রহ্ম' শব্দটির ঐরকম অর্থ না ক'রে প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে এও বলেছেন যে, কর্মযোগী 'মুনি' অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়ে অচিরেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

এরপর শ্রীভগবান বলছেন: 'যে ব্যক্তি যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মা যাঁর আত্মভূত, অর্থাৎ যিনি একই আত্মাকে সর্বভূতে এবং নিজেতেও দর্শন করেন, তিনি কর্মের অনুষ্ঠান ক'রেও লিপ্ত হন না। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন, শ্বাস, প্রলাপ, বিসর্গ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য ক'রেও তত্ত্বজ্ঞানী মনে ক'রে থাকেন যে, ইন্দ্রিয়গুলিই বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, আমি অকর্তা আত্মা—আমি কিছুই করি না।' (৫।৭-৯) কর্মযোগ-যুক্ত যিনি, তিনি ক্রমে তত্ত্ববিদ্ হন। তখন তাঁর এই দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ঘ্রাণে, ভোজনে, গমনে, বচনে ইত্যাদি যাবতীয় কর্মে ইন্দ্রিয়গুলিই বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তিনি নিজে কিছুই করেন না, যেকথা আগেই বলা হয়েছে—'গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে' (৩।২৮)—'গুণাঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ 'গুণেষু' অর্থাৎ বিষয়সমূহে—প্রবৃত্ত আছে, আমি নই ;—এই মনে ক'রে তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি নির্লিপ্ত থাকেন।

তারপর শ্রীভগবান বলছেন: 'যে ব্যক্তি কর্ম-সমূহ ব্রহ্মে অর্পণ ক'রে সঙ্গত্যাগপূর্বক কর্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলের দ্বারা আর্দ্র হয় না।' (৫।১০) এখানে 'ব্রহ্ম' বলতে নির্গুণ ব্রহ্ম নন, সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বর। কর্মযোগী নিজ ইষ্ট—কালী, কৃষ্ণ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতির উদ্দেশে ফলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করেন। আচার্য শংকর বলছেন, 'ব্রহ্মণি ঈশ্বরে'। কর্মযোগী ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ ক'রে মনে করেন, 'আমি ঈশ্বরের প্রীতির জন্যই কর্ম করছি, যেমন ভৃত্য তার প্রভুর জন্য সব কাজ করে, তাঁকে খুশী করার জন্য।' এই বুদ্ধিতে কাজ করলে কি হবে? না, পদ্মপত্রকে জল যেমন সিক্ত করতে পারে না, তেমনি কোন পাপই কর্মযোগীকে স্পর্শ করবে না।

কর্মযোগীরা কিভাবে কাজ করেন, সে-সম্বন্ধে শ্রীভগবান আরও বলছেন: 'যোগীরা ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে আত্মশুদ্ধির জন্য মমত্ববুদ্ধিরহিত হয়ে দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন।' (৫।১১) কর্মযোগীরা ফলকামনা ত্যাগ ক'রে আত্মার শুদ্ধির জন্য কর্ম করেন। এখানে 'আত্মা' কথাটার অর্থ অন্তঃকরণ। এই অন্তঃকরণের মধ্যে চারটি ভাগ আছে—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। মন সংকল্পবিকল্পাত্মক—এটা ভাল কি ভাল নয়—এইরকম চিন্তা করা মনের কার্য। বুদ্ধি হচ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা চিত্তবৃত্তি—যেটা ঠিক ব'লে দেয় এটা এই জিনিসই। আর চিত্ত হচ্ছে বৃত্তিগুলি যার মধ্যে থাকে; অর্থাৎ, সংস্কার-গুলি যার মধ্যে থাকে। আর অহংকার হচ্ছে—এই সব আমার, আমি করেছি, এই ভাব। সব কিছুর মূলে এই অহংকার। অন্তঃকরণ থেকে এই অহংবুদ্ধি দূর করার জন্য নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ ক'রে নির্বাসনা হয়ে শরীর-মন-ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করতে হবে চিত্তশুদ্ধির জন্য। যোগীরা সমস্ত ফলকামনা ত্যাগ

ক'রে আত্মশুদ্ধির জন্য, অহংকার দূর করার জন্য শরীর প্রভৃতির দ্বারা কর্ম করেন।

তারপর শ্রীভগবান বলছেন: 'কর্মযোগী কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন। আর ঈশ্বরার্থে কর্মের অনুষ্ঠান যে না করে, সে কামনা-বশে ফলে আসক্ত হয়ে নিবদ্ধ হয়।' (৫।১২) 'নৈষ্ঠিকী শান্তি' বলতে আত্যন্তিকী শান্তি অর্থাৎ মুক্তি। কর্মযোগী মুক্তিলাভ করেন। শংকর বলছেন, মুক্তিলাভের একটা ক্রম আছে। সেটা হ'ল—কর্মযোগ, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি), সর্বকর্মসন্ন্যাস, জ্ঞাননিষ্ঠা, মুক্তি। কর্মযোগী এই ক্রমে মুক্তিলাভ করেন। আর যারা ফলাসক্ত হয়ে কর্ম করে, তাদের বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে প্রচণ্ড কর্মের উন্মাদনা সেখানে দাঁড়িয়ে শ্রীভগবান তাই অর্জুনকে বলছেন, 'তুমি যুদ্ধ কর, কিন্তু তারও একটি নিয়ম আছে; যোগ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ কর।' কর্ম করবার যে কৌশল সেটির নামই যোগ—'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।' আমাদের সকলের কাছেই এই সংসার যুদ্ধক্ষেত্রের মতই। এখানে আমাদের পক্ষে বাঁচবার একমাত্র উপায়, বন্ধনে না পড়বার একমাত্র উপায় এই কর্মযোগ অবলম্বন করা। এই উপায়েই আমরা পরমা শান্তি লাভ করতে পারি।

বিবিধ সংবাদ

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

কলিকাতা মিলন-মন্দির বা ফেডারেশন হলের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ফেডারেশন হল সোসাইটি কর্তৃক ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৮০ হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সোসাইটির সভাপতি এবং ঐদিনের অনুষ্ঠানেরও সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য স্বাগত-ভাষণ দেন এবং সোসাইটির সম্পাদক শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত তাঁহার সম্পাদকীয় বিবৃতিতে ফেডারেশন হলে অন্যান্য ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত উদ্বোধনী ভাষণ হিসাবে ইংরেজীতে লিখিত একটি সুচিন্তিত, গবেষণামূলক, মূল্যবান-তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি নানা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া দেখান যে, ঐ আন্দোলন একদা সর্বভারতীয় আন্দোলনের মর্যাদা পাইলেও পরবর্তী কালে উপেক্ষিত হয়; 'বয়কট' আন্দোলনই গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের উৎস। তিনি আরও বলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক ছিল, বর্তমান রাজনীতিতে উহার একান্ত অভাব। সভাপতির অভিভাষণে শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপক আনন্দমোহন বসুর জীবনীমূলক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীকমলকুমার বসু। ১৪ই সঙ্গীত-সন্ধ্যায় পূজা-অঙ্গের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসুবিনয় রায়, শ্রীমতী বুলবুল সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী শিবানী দাশগুপ্ত। ১৫ই অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় 'স্বদেশী আন্দোলনে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার অবদান' প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণ দেন। তৎপরে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস বাউল। ১৬ই প্রাক্তন বিচারপতি এস. এ.

মানুদের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর উপাচার্য, অধ্যাপক অম্লান দত্ত 'ভারতে জাতীয় সংহতির সমস্যা ও তাহার প্রতিকার' বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরে শ্রীমতী নীলিমা সেন ও শ্রীমতী রুমা দাশগুপ্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৭ই 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' সম্বন্ধে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সভাপতির ভাষণ দেন। ১৮ই শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু 'স্বদেশী আন্দোলন ও লোকমাতা নিবেদিতা' বিষয়ে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিভিন্ন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্রীমতী মঞ্জুলিকা দাস রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও নজরুল-গীতি এবং শ্রীমতী কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। ১৯শে মুদ্রিত সমাপ্তি-ভাষণে শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনের পটভূমি, ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত। রজনীকান্তের গান পরিবেশন করেন তাঁর সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীদিলীপকুমার রায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজীতে পরিবেশন করেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মাধুরী মুখোপাধ্যায়।

জন্মজয়ন্তী

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে বিগত ২৩শে মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ২৩শে মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদির পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ এক সুন্দর শোভাযাত্রা নামকীর্তন করিতে করিতে ইস্পাতনগরীর বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। মন্দিরাভ্যন্তরে চলিতে থাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ ইত্যাদি এবং 'শ্রীগুরুসঙ্ঘে'র পরিচালনায় মধুর নামসংকীর্তন। সকাল দশটায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইস্পাতনগরীর ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীর প্রায় ১১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়; প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীনিমাইকুমার মিত্র। মধ্যাহ্নে প্রায় ১৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর এক মহতী ধর্মসভায় স্বামী মিত্রানন্দ এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ২৪শে অপরাহ্নে প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গ করেন সমবেত ভক্ত মহিলাদের মধ্যে। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ধর্মসভায় প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণা ও সভানেত্রী শ্রীমতী গীতা ঘোষ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রাত্রে 'কথায় ও সুরে' 'কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী প্রত্যয়ানন্দ। ২৫শে প্রাতে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ-প্রসঙ্গে যুব-সমাবেশে বক্তব্য পেশ ক'রে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ধর্মসভায় 'স্বামী বিবেকানন্দের চোখে আগামী পৃথিবী' বিষয়ে স্বামী সোমেশ্বরানন্দ এবং 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মানুষ' বিষয়ে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ ভাষণ দেন। ২৬শে সান্ধ্য আরাত্রিকের পর কলিকাতার 'ঋত্বিক সঙ্ঘ' প্রযোজিত শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গ্রন্থনা এবং শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-সমৃদ্ধ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গীতি-আলেখ্য' পরিবেশিত হয়। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই অগণিত ভক্তপ্রাণ নরনারী যোগদান করেন। উৎসবের চার দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সেবাশ্রমের বিক্রয়কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত সাহিত্যের ক্রেতাদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়।

খড়্গপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ১২ই হইতে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, নগরসংকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ইত্যাদি হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় দুই হাজার ভক্তনরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া অন্নপ্রসাদ ধারণ করেন। ইহা ব্যতীত প্রায় ১৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, স্বামী উমানন্দ ও স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস (বাউল) ও শ্রীমতী গায়ত্রী দেবী রামায়ণগান, ভক্তিসঙ্গীত প্রভৃতি পরিবেশন করেন

তপন (পশ্চিম দিনাজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘ কর্তৃক গত ১৩ই ও ১৪ই বৈশাখ (১৩৮৭), শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব ও শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সংঘের বার্ষিক উৎসব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ও উষা-কীর্তনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৫০০ জন ভক্ত-নরনারায়ণ বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হয়। উভয় দিনের ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী বাগীশানন্দ ও প্রধান অতিথি স্বামী বিকাশানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীপ্রীতিশ ঘোষ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও বক্তৃতা দেন। উভয় রাত্রিতে পদাবলী কীর্তন হয়। সভান্তে সংঘের সাধারণ সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দোমড়া (বর্ধমান) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৭শে ও ২৮শে বৈশাখ (১৩৮৭), শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১৪৫তম আবির্ভাব-উৎসব প্রভাতফেরি, অখণ্ড হরিনাম-সংকীর্তন, বিশেষ পূজা, পালা-কীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, প্রসাদবিতরণ, নারায়ণসেবা, ধর্মসভা ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা **সুহাসিনী সেনগুপ্তা** গত ২রা ডিসেম্বর ১৯৮০ অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটে ৯০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে রাঁচীতে পরলোকগমন করেন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ইন্দুভূষণ সেনগুপ্তের সহধর্মিণী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত একটি পরিচিত নাম। রাঁচীতে ইন্দুবাবুর গৃহে স্বামী সুবোধানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের কেহ কেহ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য সুহাসিনী দেবীর হইয়াছিল। পরবর্তী কালেও স্বামী শান্তানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ ইন্দুবাবুর গৃহে যখনই অবস্থান করিয়াছেন, সুহাসিনী দেবী নিষ্ঠাভরে তাঁহাদের সেবাযত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান অমায়িক সেবাপরায়ণতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। সততা, সরলতা, উদারতা, অনাড়ম্বর জীবনচর্যা প্রভৃতি গুণরাজির জন্য তিনি সকলের পরম শ্রদ্ধেয়া ছিলেন।

সংযোজন

এই সংখ্যার পৃঃ ৬৮৩, কলম ২, পঙ্‌ক্তি ৮-এ 'ভট্টাচার্য'-এর পর 'মিঃ তেজভান নাগপাল', পৃঃ ৬৮৪, কলম ১, পঙ্‌ক্তি ৯-এ '(কালাডি)'-র পর 'মিঃ জি. কে. শেঠ (ইন্দোর)', পৃঃ ৬৮৪, কলম ১, পঙ্‌ক্তি ৯-এ (নীচ হইতে) 'সিং'-এর পর 'অধ্যাপক এচ্. জি. সূর্যনারায়ণ রাও' এবং পৃঃ ৬৮৪, কলম ২, পঙ্‌ক্তি ১২-এ (নীচ হইতে) '(পূর্ব দিনাজপুর)'-এর পর 'ও এরিক জোন্স' সংযোজিত করিয়া পড়িতে হইবে।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৮২তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৬ হইতে পৌষ, ১৩৮৭ ; ইংরেজী : ১৯৮০)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক
স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০০০৩

বার্ষিক মূল্য ১২'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'২০ টাকা

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন—বর্ষসূচী

৮২তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮৬ হইতে পৌষ, ১৩৮৭)

সমালোচনা

চিত্রসূচী







Udbodhan—Phone : 55-2447 DECEMBER 1980 Regd. No. WB/NC-19

[illegible] ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী [illegible]ময়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক—স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ : সংযুক্ত সম্পাদক—স্বামী ধ্যানানন্দ

বার্ষিক মূল্য ১২·০০ টাকা

